শারদীয়া
১৩৫৪

রূপ-মঞ্চ

সপ্তম বর্ষ
৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

আমাদের আজকের কথা—

প্রতি বছর শরৎ আসে। আসে আমাদের দুয়ারে। সে আসে তার কত বিচিত্র সম্ভার নিয়ে। সারা বছরের ক্লান্তি ও অবসাদ—জড়তা ও হতাশা দূর করে আনন্দের উৎসে সে আমাদের অন্তর ভরিয়ে দেয়। সে আসে—আসে তার সৌন্দর্য-সমারোহ নিয়ে—আসে আমাদের জীবন থেকে দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার রুদ্ধ করে দিতে। ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে—কারোর মনে সে কোন ফাঁক রাখতে চায় না। জাতিধর্মনির্বিশেষে কেউ তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না। ঈদের চাঁদ শরতের আকাশে তাঁর অভয় আশীষ নিয়ে দেখা দেয়। বোধনের সাঁনাই সুরের ঝঙ্কারে মাতিয়ে তোলে। প্রতি বছর এমনি ভাবে সে আসে—আমরা তাকে সাদর অভ্যর্থনায় গ্রহণ করি। গতবারও সে এসেছিল—এসেছিল তার পরিপূর্ণতা নিয়ে—কিন্তু আমরা তার মর্যাদা রাখতে পারি নি। গতবার সে এসেছিল আমাদের চরম দুর্দিনে—এসেছিল আমাদের হীন আত্মকলহের মত্ততার মাঝে। গত বছর সে এসেছিল আমাদের নিঃস্বতার মাঝে—এসেছিল তখন, যখন আমরা আমাদের মানবধর্ম—মনের সুকুমার প্রবৃত্তি সমস্ত হারিয়ে ফেলে পশু-প্রবৃত্তির প্রভাবে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছি। তাই ঈদের চাঁদের পবিত্রতা আমরা রক্ষা করতে পারি নি। বোধনের সানাইর মাধুর্যের মর্যাদাও রাখতে পারি নি। ভ্রাতৃহত্যার কালিমা দিয়ে আমরা তাকে কলুষিত করে দিয়েছিলাম। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে যেমনি এসেছিল, তেমনি বিদায় নিয়ে চলে যায়। একটী বছর বাদে আবার সে এসেছে, সে এসেছে স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ দ্বিশতাব্দী পরে এই সর্বপ্রথম। আমাদের মনের মালিন্য এখনও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি। এখনও দেশের এখানে ওখানে পশুপ্রবৃত্তির আস্ফালনের সংবাদ আমাদের কানে আসছে। কিন্তু বাংলাকে ধন্যবাদ, বাঙ্গালীকে ধন্যবাদ—আমাদের সে চরম দুর্দশা থেকে আমরা মাথা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি—আমাদের মনের সমস্ত জঞ্জাল ও আবিলতা—ভুল ও ভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে—অনুশোচনার কষাঘাতে নিজেদের সবলভাবে দাঁড় করাতে পেরেছি। এসো, বাংলার হিন্দুমুসলমান—ভাই ও ভগ্নিগণ—সাক্ষী রইল মাথার ওপরে শরতের শুভ্র ওই ঈদের চাঁদ, সাক্ষী রইল—বোধনের ঐ সাঁনাই—আমরা শুধু হিন্দুমুসলমানেরই নয়—সর্বশ্রেণীর বাঙ্গালীর হাতে হাত ধরে স্বাধীন বাংলার মাটিতে নতজানু হ'য়ে—তার শস্য-শ্যামল মাটিকে চুম্বন করে দ্বিশতাব্দী পর সর্বপ্রথম যে শরৎ আজ এসেছে, তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শিখরে উঠেও মানুষ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অত্যাচারিত। রোগে, শোকে ও দুঃখে মানুষ আজও জর্জরিত। কাতর হয়ে মানুষ প্রশ্ন করছে—এ অত্যাচার অবিচারের জন্য দায়ী কে? কে মানুষের ভগবান? এর উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। তবু আবাহমান কাল ধরে মানুষ এই প্রশ্ন করেই চলেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছবিকে হঠাৎ ওর বিদ্রোহী বন্ধু অমরনাথ টেনে নিয়ে এলো কঠিন বাস্তবতার মাঝে। উচ্চ সম্প্রদায়ের হাসি-কল্লোল ছাপিয়ে ওর কানে ভেসে এলো দেশময় বঞ্চিতদের বুকফাটা আর্তনাদ। অমরনাথ ওকে প্রশ্ন করে বৈষম্যের জন্য দায়ী কে? ছবি এর উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু প্রশ্ন ওকে ভাবিয়ে তুলে। সে ভাবে, এইসব অন্যায় অবিচার কি ভগবান লক্ষ্য করছেন না? সবই কি পুঁজিবাদীদের কারসাজি—না সত্যিই ভগবান নেই! এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য সে অমরের দুর্গম পথের সহযাত্রী হয়ে আরম্ভ করে ওর নূতন পথের যাত্রা। যাত্রার মাঝ পথে নেমে এলো যবনিকা, শুধু সেই আদর্শ নিয়ে বড় হয়ে উঠলো পথে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সুকুমার।

সুকুমার বড় হলো, সেবাব্রতকে জীবনের আদর্শ করে এগিয়ে চললো। রেণুকা হঠাৎ ওর জীবনে বিপর্যয়ের মত দেখা দিল। শুধু ওর বংশ পরিচয় নেই বলেই রেণুকার বাবা তার মেয়ের সংগে বিয়ে ভেংগে দিল। আদর্শবাদী তরুণের বুকে কঠিন আঘাত এলো। বিদ্রোহের রক্ত মাথায় চেপে বসলো। সে রিভলবার শূন্যে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলো, ভগবান তুমি কি জানছ না এসব পুঁজিবাদীদের কারসাজি? এই যুগান্তকারী সমস্যাকে ঘিরেই ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্সের মানুষের ভগবান চিত্র রচিত। চিত্র গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে—বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। এর মধ্যে অভিজ্ঞ শিল্পী বিপিন মুখার্জী, প্রমীলা ত্রিবেদী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী ও রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি আছেন। নবাগত শিল্পী স্বপন, শুভ্রা, গৌরশী, সুলতা, শুরুচি, দেবকুমার, অনিল মিত্র প্রভৃতি আছেন।

মানুষের ভগবানের কর্মীবৃন্দ চিত্রজগতে নবাগত হলেও শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে, অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা উন্নত। পরিচালনায় সহকারীরূপে আছে চিত্ত মুখার্জী ও যতীন চট্টোপাধ্যায়। সংগীতে বিশ্বনাথ মৈত্র কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দৃশ্যশিল্পে দেবব্রত মুখার্জী স্টুডিও জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। প্রচারের ভার গ্রহণ করেছেন বিমলেন্দু ঘোষ ও ব্যবস্থাপনা করেছেন সমর রায়।

রচনা ও পরিচালনা করছেন——উদয়ন

অনাদৃত চিত্র ও নাট্য-শিল্পের সংস্কার সাধনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি

১৫ই আগষ্টের আশায় সমস্ত দেশ মেতে উঠেছে—জাতির দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্খা মূর্ত হ'য়ে দেখা দেবে ঐ দিনে। বৈদেশিক শক্তির বন্ধন থেকে—সর্বপ্রকার শোষণ ও নিপীড়ণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে জাতি এতদিন যে সংগ্রাম করে এসেছে, ঐ দিনে এতদিনের সে সংগ্রাম জয়যুক্ত হ'তে চলেছে। একদিকে বৈদেশিক শক্তির অদৃশ্য হস্তের চাতুর্যে আভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার তাণ্ডব নর্তন—অন্যদিকে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম-সাফল্যে জাতির হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। একদিকে বেদনার ভারে মুহ্যমান, অন্যদিকে কৃতকার্যতায় উদ্বেলিত—এমনি সময় যেয়ে হাজির হলাম, বাংলার শার্দুল-শাবক স্বনামধন্য শিক্ষাবীদ—দুর্গত বাংলার অন্যতম কাণ্ডারী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আমি কোন শান্তিবাহিনী গঠনের প্রস্তাব নিয়ে যাইনি—সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর কাছে হাজির হইনি—হাঙ্গামায় বিপন্নদের ব্যথায় তাঁর কাছে কোন সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করিনি বলে যদি কেউ পাষণ্ড বলে আমায় নিপাত যাবার অভিশাপ দেন—তাও মাথা পেতে নোবো। একজন নগণ্য অখ্যাতনামা সাংবাদিক রূপে—'রূপ-মঞ্চে'র প্রতিনিধি হিসাবে আমি এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম—আমি দাঁড়ালাম, সেই সমস্যা নিয়ে—যে সমস্যার প্রতি বৈদেশিক সরকার মোটেই দৃষ্টিপাত করেনি—যে সমস্যা বড় হ'য়ে কোনদিন দেশবাসীর সামনে দেখা দেয়নি। দেশের মাটিতে দেশীয় ও বিদেশীয়দের দ্বারা সমানভাবে যে সমস্যা কণ্টকিত শিল্প এতদিন পদদলিত হ'য়ে এসেছে—হ'য়ে এসেছে অবহেলিত ও অনাদৃত—আমি সেই চিত্র ও নাট্য-জগতের কয়েকটী সমস্যা নিয়ে হাজির হলাম। নিতান্ত নেহাৎ ভাল ছেলের মত তাঁর সামনে সমস্যাগুলি উপস্থিত করে সমাধানের জন্য অনুনয় বিনয়ের সুরে আমি তাঁর করুণা কামনায় দাঁড়িয়ে রইলাম না। আমি তাঁর এবং তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলাম। অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে আমি বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, কেন—আপনারা আজও মুখ ফিরিয়ে থাকবেন—চিত্র ও নাট্য-জগতের দিক থেকে? আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রে—জাতীয় সংগ্রামে—সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আমাদের চিত্র ও নাট্যকলার কী কোন দানই নেই?"
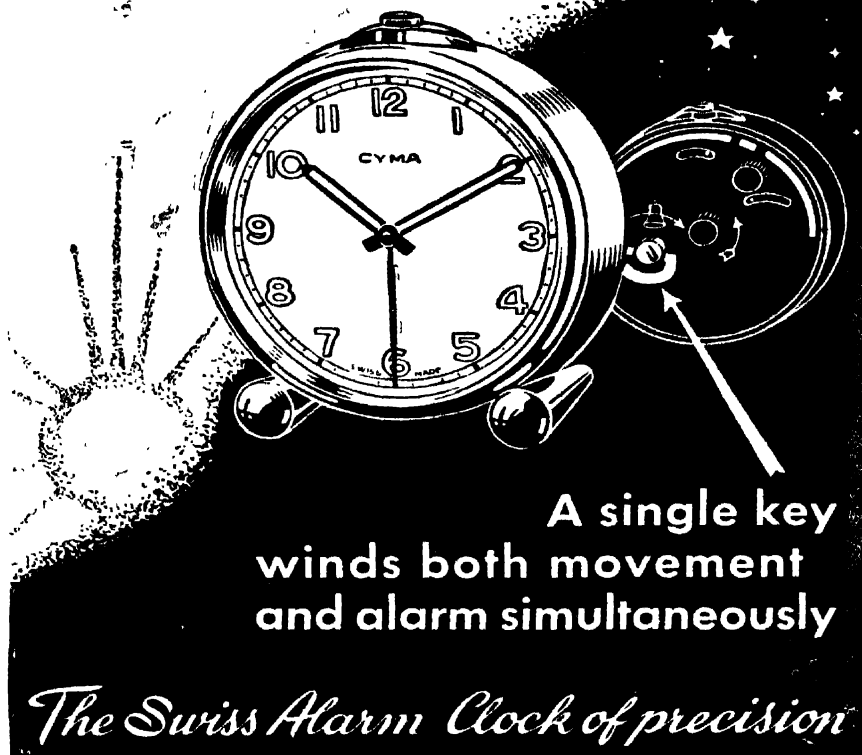
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডাঃ প্রসাদ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন "কেন থাকবেনা?" নিশ্চয়ই আছে। কে তা অস্বীকার করবে?"

"তবে আজও কেন তাঁদের দিক থেকে আপনারা মুখ ফিরিয়ে নেন—যাঁরা সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে এই শিল্পের বেদীমূলে। তাঁদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই—আর্থিক সংগতির কোন নিরাপত্তা নেই—নেই কোন সামাজিক মর্যাদা। তাঁদের ত দূরের কথা, যে শিল্পের বেদীমূলে তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত, সেই শিল্পই বা স্বীকৃতি পেল কৈ?"

ধীর স্থির ভাবে ডাঃ প্রসাদ উত্তর দিলেন, "এতদিন যখন এই তাচ্ছিল্যকে সহ্য করতে পেরেছো—আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এতদিন বৈদেশিক সরকারের আওতায় আমাদের কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনাই সুষ্ঠুরূপ গ্রহণ করতে পারেনি। আজ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ করেই এঁরা হয়ত কিছু করতে পারবেন না—কিন্তু চিত্র ও নাট্যজগতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবার মত অদূরদর্শী আমাদের জাতীয় সরকার হবেন না। কোন দেশেই সরকারের সাহায্য ব্যাতিরেকে—কোন শিল্পকলা, ব্যবসা বাণিজ্য সুষ্ঠুরূপ গ্রহণ করতে পারেনি। কোন দেশেই জাতির রাষ্ট্রীক, কৃষ্টিগত ও অর্থনৈতিক জীবন সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতা ব্যাতিরেকে উন্নতিলাভ করতে পারেনি। এতদিন বৈদেশিক সরকার দ্বারা আমরা শাসিত হ'য়ে এসেছি, আমাদের দেশ বা জাতির প্রতি এ সরকারের কোনই মমত্ববোধ ছিল না। তাঁরা শোষণ করবার জন্তই শাসন করে এসেছে।" বলতে বলতে ডাঃ প্রসাদ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন—আমি এক এক করে আমাদের সমস্তাগুলি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে তুলতে চেষ্টা করি। আমি তুলে ধরি—(১) জাতীয় নাট্য-বিদ্যালয়—(২) শিশু আমোদ প্রমোদ এবং (৩) শিক্ষা ও দেশের কল্যাণকর কাজে চিত্র ও নাট্য-মঞ্চকে সুপরিকল্পিত পথে চালনা করার কথা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—"বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খাতা-কলম নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা দিতে না বসে থাকুন, তাতে কী হ'য়েছে—তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জন্মগত প্রতিভায় চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের মারফৎ এতদিন দেশ ও জাতির যে-সেবা করে এসেছেন—দেশ এবং জাতিকে নূতন আদর্শের বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন-তার কী কোন মূল্য নেই—তাঁদের সে যোগ্যতা কী কোন দিন আমরা পুরস্কৃত করবোনা?"

ডাঃ প্রসাদ আমার প্রত্যেকটী অভিযোগ সহানুভূতির সংগে শ্রবন করেন। এবং আজ আমি আমার অগণিত চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের শ্রদ্ধেয় শিল্পী ও বন্ধুদের এই আশার বাণীই শোনাতে চাই—আমাদের চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের এই প্রত্যেকটি সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ প্রসাদ ওয়াকিবহাল আছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নিজেও এনিয়ে বহুবার চিন্তা করেছেন। এবং তাঁর শক্তি ও সামর্থের দ্বারা এগুলি সমাধানের জন্য যত্নবান হবেন।

যে বিশৃঙ্খলার মাঝে আমি তাঁর সংগে দেখা করি—সাম্প্রদায়িক সমস্যার ভারে তাঁর মন ভারাক্রান্ত থাকা সত্বেও, যে টুকু সময় তিনি আমায় দেন, তাতে তাঁর গভীর আন্তরিকতারই পরিচয় পাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু শান্ত ভাব ধারণ করলে, তিনি আমায় আবার দেখা করতে বলেন এবং তখন আমাদের এই সমস্যাগুলি সমাধান কল্পে কার্যকরী পরিকল্পনা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন।

ডাঃ প্রসাদের কার্যক্ষমতায় বিশ্বাসী চিত্র ও নাট্য জগতের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে বলেছিলেন—ডাঃ প্রসাদ চিত্র ও নাট্য জগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁদের সে ভুল ধারণা ভেংগে দিতে আমি স্পষ্ট করে এই প্রসংগে বলতে চাই—চিত্রশিল্প কতখানি অবনতির দিকে পা বাড়িয়েছে—নাট্য-মঞ্চের স্থিতিশীলতা এমনকী আজকাল যে শিশু-নাট্যাভিনয়ও শুরু হয়েছে—সে সম্পর্কেও তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সন্ধান রাখেন।

ডাঃ প্রসাদকে প্রণাম জানিয়ে আসবার সময় রূপমঞ্চের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর উপদেশ কামনা করি। মৃদু হেসে তিনি উত্তর দেন, "তোমাদের সম্পর্কেও খোঁজ খবর রাখি। তোমরা যে আন্দোলন চালাচ্ছো, যেভাবে চলছো—সেই ভাবেই চলতে থাকো।"

—শ্রীপার্থিব।

এবার ৺পূজায় আবার দেখবার মত ছবি !
কবিগুরুর
বিরাট উপন্যাস
চিত্রজগৎকে
নূতন পথের
সন্ধান দিয়েছে
BOMBAY TALKIES LTD
নৌকাডুবি
বিরাট ছায়াচিত্ররূপে বিশ্বকবির মহান উপন্যাস
প্রধান চরিত্রে
মীরা সরকার
মীরা মিশ্র
অভি ভট্টাচার্য্য
পাহাড়ী · বিমান
পরিবেশক
পরিচালনা
নীতিন বসু
চিত্রনাট্য রচয়িতা
সজনী দাস
সুর-পরিচালনা
অনিল বিশ্বাস
রবীন্দ্রসঙ্গীততত্ত্বাবধায়ক
অনাদি দস্তিদার
মিনার · বিজলী · ছবিঘর
২, ৫॥, ৯টা
২, ৫॥, ৯টা
১, ৪।০, ৭॥০টায়

মহাভারতের মহামানব মহাত্মা গান্ধী

শারদীয়া

১৩৫৪

ফটো : পান্না সেন

রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল

শারদীয়া

১৩৫৪

অংকন : ঐক্ষু

লণ্ডন ও পারিসের রঙ্গমঞ্চ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পঁচিশ বছর হ'য়ে গেল, লণ্ডনে দু'বছর আর এক বছর পারিসে ছাত্র-রূপে অবস্থানের সময়ে, নানা রকমের নাটক দেখবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। তার কিছু কিছু স্মৃতি মনের পটে এখনও বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। নানা রকমের অভিনয়ের ধারা ইউরোপে আর অন্যত্র প্রচলিত আছে আর ছিল; সেগুলির কথা ভাব্‌লে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিকে মানুষের কল্পনার আর উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না—কি ভাবে, কত অজ্ঞাত অদৃষ্টপূর্ব সুন্দর বস্তু মানুষ কল্পলোক থেকে আবিষ্কার ক'রেছে, তার নিজের এই রসসৃষ্টি থেকে সে কি ভাবে ব্রহ্মরসাস্বাদন-সহোদর অপূর্ব আনন্দের অধিকারী হ'য়েছে।

সুধী সমাজের কাছে ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমারের পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও গবেষণা আমাদের জাতীয় সম্পদ্। শিক্ষাক্ষেত্রে বোধিবৃক্ষের জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্য নিয়ে যে মুষ্টিমেয় জনকয়েক রয়েছেন ভাষাচার্য্য তাঁদেরই অন্যতম—এঁদেরই অক্লান্ত সাধনায় আমাদের সংস্কৃতি-ক্ষেত্র দিন দিন সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠ্‌ছে।

লণ্ডনে অবশ্য বিভিন্ন নাট্যালয়ে নানা ধরণের নাটক দেখেছিলুম; যে সময়ে, প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগে, আমরা লণ্ডনে গুরুকুলবাস করি, সে সময়ে প্রায় পঞ্চাশটী বিভিন্ন নাট্যশালা ছিল লণ্ডনে। কিন্তু ফরাসী জা'ত যে ভাবে নাট্য-কলার অনুরাগী, ইংরেজরা সে ভাবের নয়—লণ্ডনে বেশী বৈচিত্র্য দেখি নি। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে পৌঁছোই। আমার শিক্ষক-স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় Sir George Abraham Grierson স্যর জ্যর্জ্ আব্রাহাম গ্রিয়র্সনের নির্দেশে, ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে প্রথম নাটক দেখি, Drury Lane Theatre ড্রুরি লেন থিয়েটারে বিখ্যাত pantomime প্যাণ্টোমাইম নাটক Puss in Boots—এই প্যাণ্টোমাইম ইংরিজি রঙ্গমঞ্চের একটী বিশিষ্ট জিনিস, এতে রূপকথার মত কাহিনীর-ই অভিনয় হয়, খুব বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্যপট, পশু পক্ষী ইত্যাদির বেশে অভিনেতাদের নাচ ও অভিনয়, আর মেয়ে আর পুরুষ সঙের নাচ, এই-সব এই নাটকের একটা মুখ্য উপাদান। ছেলেমেয়েদের পক্ষেই এই রকম প্যাণ্টো-

মাইম বেশ উপযোগী বস্তু, জিনিসটী কিন্তু বুড়োদেরও অপছন্দ নয়। মামুলী ধরণের নাটকই ইংলাণ্ডে বেশীর ভাগ দেখেছি; তবে ইংলাণ্ডে নোতুন ধরণের জিনিস পরিবেশন কর্‌বার চেষ্টাও মাঝে মাঝে হয় না যে, তা নয়। Chu Chin Chow "চু চিন্ চাউ" বলে একটী নাটক প্রায় চার বৎসর ধ'রে একটানা লণ্ডনে চ'লছিল—এটী হ'চ্ছে "আরব্য-রজনী"র আলিবাবা আর চল্লিশ দস্যুর কাহিনীর ভিত্তিতে গঠিত, খুব জমকালো "প্রাচ্য দেশীয়" পোষাক আর "প্রাচ্য দেশীয়" পরিবেশ দেখানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। গভীর ভাবের নাটকের চাহিদা ইংলাণ্ডে তখন খুব ক'মে গিয়েছিল। হাল্‌কা সামাজিক নাটক, যাতে প্রচুর হাস্যরস আছে, এইটাই ছিল লোকপছন্দ জিনিস। Shakspere শেক্‌স্পিয়র আর তেমন জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন না। বিশেষ একটী সম্প্রদায়--যেমন Southwark সাদার্ক্ পল্লীর Old Vic নাট্যশালা—শেক্‌স্পিয়রের নাটকের অবতারণা মাঝে মাঝে রঙ্গমঞ্চে ক'রতেন বটে, কিন্তু তাতে সাধারণ অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পর্য্যায়ের ইংরেজ মেয়ে বা পুরুষ রস পেত না। আমি এই Old Vic রঙ্গমঞ্চে শেক্‌স্পিয়রের কয়েকটী নাটকের অভিনয় দেখে আসি; দেখেছিলুম, এগুলিতে ভীড় মন্দ হয় না; তবে বোঝা গেল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বিশেষ ধরণের intellectual বা সুধী ব্যক্তিবর্গ, আর ইংরিজি নাট্যসাহিত্যের আর শেক্‌স্পিয়রের নাটকের আর তাঁর প্রতিভার অনুরাগী আমাদের মত বিদেশী বিদ্যার্থী বা ভ্রমণকারী ছাড়া, শেক্‌স্পিয়রের নাটকের জন্য সাধারণ ইংরেজের তেমন বিশেষ আগ্রহ নেই। শেক্‌স্পিয়র এভাবে একটু অন্তরালে প'ড়ে যাবার কারণ কি? আমার পূজনীয় শিক্ষক স্বর্গীয় H. M. Percival এইচ এম্ পার্সিভাল সাহেব, যিনি ক'লকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত ও সর্ব-জন-মান্য অধ্যাপক ছিলেন, অধ্যাপনা-কার্য্য থেকে অবসর নেবার পরে পেন্‌শনের টাকায় তিনি বিলেতে গিয়ে বাস ক'রছিলেন। লণ্ডনে তাঁর সংগে মাঝে মাঝে দেখা ক'রতে যেতুম, পুরাতন ছাত্র ব'লে তিনি খুবই স্নেহের সংগে আমার সঙ্গে গল্প ক'রতেন। শেক্‌স্পিয়রের মতন এত বড় কবির জনপ্রিয়তার এই অভাবের কারণ তাঁকেও আমি জিজ্ঞাসা করি। তাতে, ইংরেজ জা'তের মানসিক, নৈতিক আর আধ্যাত্মিক পতন হ'য়েছে ব'লেই তারা আর শেক্‌স্পিয়রের রস গ্রহণ ক'রতে পারে না—তিনি এই রকম রায় দেন। হয় তো তাঁর কথাটাই ঠিক, কারণ ইংরেজ জা'তের মানুষকে বহু বৎসর ধ'রে দেখ্‌বার সুযোগ তাঁর হ'য়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়—নানা কারণে শেক্‌স্পিয়র যে আর এ যুগের সাধারণ মানুষ, যে উঁচুদরের মানসিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারী নয়, তার পক্ষে উপযোগী থাকৃতে পার্‌ছেন না, সেটাও একটী কারণ। প্রথম কারণ, শেক্‌স্পিয়রের ভাষা। সাড়ে তিন শ' বছরের পূর্বেকার ইংরিজি এখনকার ইংরেজের কানে একটু কঠিন আর দুর্বোধ্য ঠেক্‌বেই। হালের ইংরিজিতে শেক্‌স্পিয়রের অনুবাদ হয়তো কিছুদিন পরে আবশ্যক হবে। "নিউ-টেস্টামেণ্ট" গ্রন্থকে যেমন করা হ'য়েছে। দ্বিতীয় কারণ—শেক্‌স্পিয়রের নাটকের stately অর্থাৎ ধীর-গম্ভীর চাল, আর তার প্রাচীন যুগের কবিতাময় বাতাবরণ। এটা আধুনিক ব্যস্তবাগীশ গদ্যময় মানুষের কাছে খুব ভাল লাগ্‌তে পারে না। Culture বা মানসিক উৎকর্ষের তাগিদ, অথবা ইংরিজি সাহিত্য সম্বন্ধে আকর্ষণ, যাঁর মনে নেই, তিনি শেক্‌স্পিয়রের নাটকের অভিনয় দেখে আনন্দ পাবেন না।

লণ্ডনে একই ধরণের নানা সামাজিক কমেডি বা মিলনান্তক নাটক, আর সামাজিক আর অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখা একটু চিন্তোত্তেজক নাটক—এই দুইয়েরই বেশী আদর তখন ছিল মনে হয়। আইরিশ নাট্যকারদের The White-headed Boy অর্থাৎ "পাকা-মাথাছেলে" বলে একটী চমৎকার কমেডি একবার লণ্ডনে দেখে আসবার সুযোগ হয়। এই বইয়ের রচনা যেমন হাস্যরসপূর্ণ আর বিশিষ্টতাযুক্ত ছিল, তেমনি এর অভিনয়পটুতাও অনিন্দ্যসুন্দর ছিল। The Beggar's Opera ব'লে লণ্ডনের নিম্নস্তরের লোকদের জীবন নিয়ে আঠারোর শতকে লেখা একখানি বিখ্যাত অপেরা বা গীতি-নাট্য, Hammersmith হ্যামারস্মিথ্ থিয়েটারে বিশেষ যোগ্যতার সংগে বহুদিন ধ'রে অভিনীত হয়; এটী, আর শেক্‌স্পিয়রের যুগের The Knight of the Burning
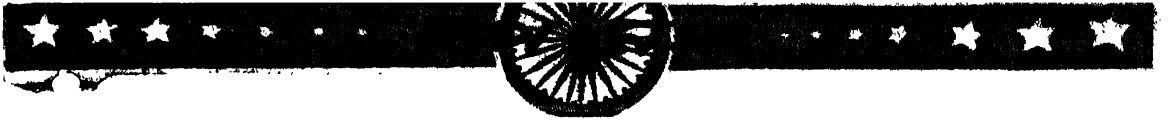
Pestle নাটকের অভিনয়, এটীও, পুরাতন কালের নাটকের পারিপার্শ্বিক, মায় সে যুগের যন্ত্রসঙ্গীত পর্য্যন্ত, পুনরুজ্জীবন ক'রে অভিনয় করানোতে, ইংরেজ অভিনেতা আর প্রযোক্তাদের বিশেষ কৌশল আর সুরুচির পরিচয় দিয়েছিল।

পারিসে এসে দেখলুম, সেখানকার নাটক আর অন্য সুকুমার কলা সম্বন্ধে বাতাবরণই আলাদা। নাটক আর অভিনয় এই দুটোকেই, আর সংগীতকে, ফরাসীরা খুব বড় জিনিস ব'লে দেখে। ফরাসীদের আর তাদের দেখাদেখি ইউরোপের কন্টিনেণ্ট-এর (অর্থাৎ ইংলাণ্ডের বাইরেকার) নানা রাষ্ট্রের সরকার, রঙ্গমঞ্চকে, শিক্ষা আর সাহিত্যিক রুচির আর নানা শিল্পের আর সংগীতের প্রয়োগের ক্ষেত্র ব'লে, তাদের রাষ্ট্র-পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটী পৃথক্ বিভাগ ক'রে রেখেছে। পারিস শহরেই, সরকারী রঙ্গমঞ্চ যতদূর আমার মনে আছে তিনটী আছে, Ope'ra অপেরা, Come'die Francaise কমেদি-ফ্রঁাসেজ. বা Theatre Francaise তেআত্র্-ফ্রঁাসেজ., আর Ode'on ওদেঅঁ। এ ছাড়া, ব্যক্তি অথবা নাট্য-সম্প্রদায় বিশেষের অনেকগুলি নাট্যশালা ছিল। বেশীর ভাগ সেগুলি হ'চ্ছে, যাকে ইংরিজিতে বলে Music Hall অর্থাৎ নাচ, গান, সঙ, ব্যঙ্গ, অভিনয়, আর সৌন্দর্য্য বা কসরতের প্রদর্শনী। পারিসের বিখ্যাত Folies Bergeres ফোলি-বেয়ার্‌ঝেয়ার্-এর নাট্যশালা ছিল এই শ্রেণীর। এর উপর, অভিনয় আর নাটকের অতি উচ্চ আদর্শ নিয়ে, রসজ্ঞ আর কলা-প্রেমী সজ্জনদের পক্ষ থেকে ছোট-খাট দু'চারটী রঙ্গমঞ্চ গঠিত হ'ত, সেগুলির আয়ু প্রায়ই বেশী দিনের হ'ত না—এই রকম একটী রঙ্গমঞ্চের নাম ছিল Vieux Colombier ভিয়্য-কলঁবিয়ে। ১৯২১ সালে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার জন্য আমি প্রথম যখন পারিসে আসি, তখন পারিসের নাট্যকলার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বা ধারণা কিছুই ছিল না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, আমি পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অধ্যয়নের জন্য যোগদানের এক বছর আগে থেকেই পারিসে বাস ক'রছিলেন; তিনি হ'চ্ছেন গুণজ্ঞ, কলা আর সাহিত্যের সত্যকার রসিক; পারিসের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সম্বন্ধে তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশী অনুসন্ধিৎসু আর ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁরই সংগে থেকে আমারও এ বিষয়ে নানা তথ্য আর নানা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়—এই ভাবে আমার মানসিক সংস্কৃতির প্রসারের জন্য তাঁরই কাছে আমি ঋণী।

পারিসের অপেরা রঙ্গমঞ্চ হ'চ্ছে বিশেষ ধরণের একরকম সঙ্গীতময় নাটকের অভিনয়ের পীঠস্থান। এই প্রকার নাটকে সমস্ত পাত্রপাত্রীর কথোপকথন হয় গানে, আর গানের সংগে থাকে Orchestra-র অর্থাৎ সমবেত বাদ্যের সঙ্গত। পোষাক পরিচ্ছদ সাজসজ্জা চিত্রপট প্রভৃতিতে কানও কার্পণ্য করা হয় না। পারিসের অপেরা প্রেক্ষা-গৃহটী ইউরোপের সমস্ত দেশের অপেরা-গৃহের সেরা। অপেরা নাটকের উদ্ভব হয় ইটালিতে। তারপরে ফ্রান্সে এই সঙ্গীত-নাট্য বিশেষ লোকপ্রিয় হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ফ্রান্স আর ইটালি থেকে কন্টিনেণ্ট-এর সব দেশে অপেরা ছড়িয়ে পড়ে। জর্‌মানিতে Wagner ভাগ্‌নরের মত সঙ্গীতনাট্য-রচকের হাতে অপেরা চরম উন্নতিতে ওঠে। অস্ট্রিয়া, হঙ্গেরি, পোলদেশ, রুষদেশ, ফিনদেশ, চেখোশ্লোভাকিয়া, সব দেশেই তাদের "জাতীয় অপেরা" খুব গৌরবের আসন নিয়ে আছে। ফ্রান্সের অপেরার প্রেক্ষা-গৃহটী যেন অপূর্ব একটী রাজপ্রাসাদ। "অমরাবতী-তুল্য পারিস-নগরী"র শ্রেষ্ঠ সৌধগুলির মধ্যে এটী অন্যতম। প্রজাতন্ত্রের দেশ ফ্রান্স, জন-সাধারণেরও এই রাজপ্রাসাদে যাবার অধিকার আছে। Place de l' Ope'ra 'প্লাস্-দ্য-ল্-অপেরা' ব'লে পারিসের অন্যতম প্রধান রাস্তার মাথায় অপেরা প্রাসাদ। কতকগুলি ধাপ দিয়ে উঠ্‌তে হয় এমন উঁচু পোতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। Facade ফাসাদ্ বা বাড়ীর সামনেটীতে নীচে কতকগুলি পাথরের মূর্তি-পুঞ্জ আছে, ফ্রান্সের প্রধান ভাস্করদের কৃতি রূপকর্ম; একটী মূর্তি-সমূহ হ'চ্ছে নাচের দল নিয়ে, সেটী খুবই বিখ্যাত—আধুনিক ফরাসী ভাস্কর্য্যের একটী সেরা নিদর্শন, এর শিল্পী হ'চ্ছেন J. B. Carpeaux কার্পো। অপেরার ভিতরের সাজও ঐশ্বর্য্যময়—তার প্রধান সিঁড়িটা, তার একটা বিরাট দরদালান, সেখানে

অভিনয়ের অবকাশে শ্রোতারা ব'সে থাকে বা ঘুরে বেড়ায়, এগুলি যে কোনোও রাজপ্রাসাদের উপযোগী। অল্প দামের টিকিট যারা কেনে, তাদেরও এখানে আসবার অধিকার আছে। অপেরাতে বার কয়েক গিয়ে সংগীত-নাট্য দেখেছিলুম। বোধ হয় তিন বার দেখেছিলুম—ভারিক্কে চালের বা গম্ভীর ভাবের নাটক—একখানি বোধ হয় ইটালিয়ান সংগীতনাট্যকার Verdi ভের্দির রচিত ছিল, একখানি Wagner ভাগ্নরের, আর একখানি বিখ্যাত ফরাসী composer বা সংগীত-রচক Debussy দ্যব্যুসির। ভাগ্নরের বইয়ের কথাগুলি ফরাসী ভাষায় অনূদিত ক'রে গাওয়া হয়। দ্যব্যুসি বা ভের্দির চেয়ে, ভাগ্নরের সংগীতের গাম্ভীর্য্য আর তার বিরাট্ ভাব আমায় বেশী আকৃষ্ট করে। পরে বের্লিনে গিয়ে জরমান ভাষায় ভাগ্নরের Parzifal পার্ৎসিফাল্ দেখি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জরমানির ভাঙনের দশা, তবুও তা অপূর্ব লেগেছিল। তবুও, ভাগ্নরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি Der Ring des Nibelungen নামে অপরূপ ঐশ্বর্য্যময় সংগীতনাটক, যার চারটী খণ্ডে বা অংশে জরমান জাতির পুরাণ-কথা আর বীর-গাথার অদ্ভুত সঙ্গীতময় প্রকাশ হ'য়েছে, তা দেখবার সুযোগ আমার হয়নি—আর এইজন্য মনে মস্ত একটা খেদ র'য়ে গিয়েছে। একটী হাল্কা ধরণের pastoral অর্থাৎ গ্রামজীবনের প্রেম-কাহিনী নিয়ে অষ্টাদশ শতকের লেখা একটী ফরাসী সংগীত-নাট্য পারিসের অপেরায় দেখেছিলুম, তার স্নিগ্ধ আলোকপাতের সৌন্দর্য্য আর ধীরোদাত্ত সংগীত আর বাদ্য, আর ললিত নৃত্যচ্ছন্দ, সমস্ত মিলিয়ে আমার মনে এক অদ্ভুত মোহময় মাদকতাময় অপার্থিবের অনুভূতি বা অনুভূতির আভাস এনে দিয়েছিল—অবসর-বিনোদনের পক্ষে এ জিনিস ছিল অদ্ভুত, কিন্তু খুব গভীর কিছু নয়। অপেরার সাহায্যে, আর কেবল যন্ত্র-সংগীতের কনসার্টের সাহায্যে, বুঝতে না পারলেও, ইউরোপীয় উচ্চাংগের সংগীত আর বাদ্যের মধ্যেকার একটা রস—একটা আনন্দ পাবার অধিকার, অল্প-স্বল্প পরিমাণে আমার হ'য়েছে। অভিজ্ঞতার প্রসারের দিক থেকে জীবনে এই রূপ টুকিটাকি আনন্দ-অর্জনের সুবিধা বা সুযোগ, একটা বস্তু তুচ্ছ নয়।

কমেদি ফ্রাঁসেজ-এ হয়, শুদ্ধ অভিনয়াত্মক নাটক; সংগীতের পাট এখানে নেই। কালিদাস-বাবুর আগ্রহে এখানে Le Gendre de M. Poirier 'ল্য-ঝাঁদ্র্ দ্য মসিয়্য পোআরিয়ে' অর্থাৎ 'শ্রীযুক্ত পোআরিয়ের জামাই' ব'লে একটী সাদা-সিধে ধরণের হাস্যরসোজ্জ্বল সামাজিক নাটক দেখি। ফরাসী রংগ-মঞ্চের একজন প্রাচীন আর নামী অভিনেতা, কালিদাস বাবু তাঁর সংগে ভাব ক'রে নিয়েছিলেন, এ-তে ছোট একটী ভূমিকা গ্রহণ ক'রে তাকে অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তোলেন—ভূমিকাটী হ'চ্ছে M. Vatel মসিয়্য ভাতেল্ ব'লে এক chef শেফ্ বা ওস্তাদ রাঁধুনির; এঁর অভিনয়ে এই চরিত্রটী এত চমৎকার ফুটে উঠেছিল যে, পারিসে Chez M. Vatel "শে মসিয়্য ভাতেল্" অর্থাৎ 'শ্রীযুক্ত ভাতেলের বাড়ীতে' এই নাম দিয়ে একটী রেস্তোরাঁ-ই খোলা হয়। ফরাসী শিখ্তে হ'লে, ইংরিজির শেক্স্পিয়রের নাটকের মত ফরাসী ভাষার ট্রাজেডি-নাট্যকারদ্বয় Corneille করনেয়্ আর Racine রাসীন-এর, আর ফরাসী হাস্যরসাত্মক নাট্যকার Moliere মোলিয়ের-এর দু-চারখানা বই সকলকেই প'ড়তে হয়। করনেয়ির Cid 'সীদ্' নাটকখানি ফরাসী ভাষার একখানি নামজাদা জনপ্রিয় বই, খুব উচু দরের চরিত্র-চিত্রণ আর কাব্য-সৌন্দর্য্যের জন্য গত তিনশ' বছর ধ'রে এই বই আদর পেয়ে এসেছে। 'সীদ্' বইখানি আমার ফরাসীর মাষ্টারের সংগে বেশ ভাল ক'রে প'ড়েছিলুম, বইটী চমৎকার লেগেও ছিল; এমন সময়ে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরকারী থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে খবর দেখে ভারী খুশী হ'লুম—কমেদি-ফ্রাঁসেজ্-এ 'সীদ'-এর অভিনয় হবে, একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী নাটকের নায়িকা Chimene শিমেন্-এর ভূমিকা গ্রহণ ক'রবেন। বিজ্ঞাপনে যেমনিই খবরটী দেখা, তেমনিই টিকিট কিনে ফেলা। একটু দামী টিকিট তিন চার দিন আগে থেকে কিন্তে হয়, আর নিম্নশ্রেণীর শস্তা টিকিট অভিনয়ের ২।৩।৩।। ঘণ্টা আগে থেকে রংগমঞ্চের দ্বারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে তবে কিন্তে পারা যায়। লণ্ডনেও এই রীতি—তবে পারিসে গরীব বেকার লোকে, আগে থেকে এসে সারিতে দাঁড়ায়, একটী জায়গা দখল ক'রে থাকে, তার পরে যখন অভিনয়ের কিছু আগে নোতুন টিকিট-ক্রেতাদের
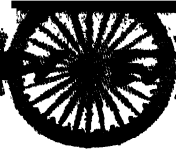
আগমন হয়, তখন এরা Une place ! une place ! "ইউন্ প্লাস ! ইউন প্লাস !" —'একটা স্থান, একটা স্থান' ক'রে হাঁকে, আর নবাগত লোকেরা ওদের সংগে দর ক'রে, কিছু পয়সা দিয়ে ওদের জায়গা কিনে নেয়—অর্থাৎ ওদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবার অধিকার পায় ;—এইভাবে, দেরী ক'রে এসেও, পয়সার বদলে সারির মধ্যে ঢুকে টিকিট কেনবার অধিকার পায়। যাক্ ; ফরাসীদের মধ্যে এই classical বা প্রাচীন সাহিত্যের নাটকের অভিনয়ে কিন্তু একটা নোতুন জিনিস পেলুম, যার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না ; সেটা হ'চ্ছে, আমাদের পয়ারের মত মিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় লেখা নাটকের বক্তৃতাগুলি, স্বাভাবিক কথাবার্তার ধরণে declaim ক'রে, অর্থাৎ গদ্য বক্তৃতার ধরণে, পাঠ করা হ'ল না ; কতকটা সেকেলে ধরণে, যেন সুর ক'রে ক'রে, পাঠ ক'রে যাওয়া হ'ল। তাতে ক'রে, নাটকের অভিনয়ে, নাচুনি ছন্দে ছড়া প'ড়ে যাওয়ার ভাব একটু যেন আস্‌ছিল —একটা অদ্ভুত রসের অবতারণা এতে ক'রে হচ্ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত। ফ্রান্সে কম-সে-কম তিন শ' বছর ধ'রে এই কমেদি-ফ্রাঁসেজ্ রংগমঞ্চ চ'লে এসেছে—সরকারী ব্যাপার ব'লে এর যোগসূত্র কখনও ছিন্ন হয় নি ; কমেদি-ফ্রাঁসেজ্-এ একটা সংগ্রহ-শালা আছে, তাতে মোলিয়ের থেকে আরম্ভ ক'রে এখনকার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী প্রভৃতির জীবন বা নটবৃত্তির সংগে সংশ্লিষ্ট নানা বস্তু সংগৃহীত আছে। এই সংগ্রহশালাটী দেখবার সুযোগও একবার হয়েছিল। তিনটী বর্ষশতক ধ'রে ফরাসীদের নাট্যকলার আর রঙ্গমঞ্চ সজ্জার বিকাশের পূরা ইতিহাস এই সংগ্রহ-শালায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আমরা পারিসে থাক্‌তে থাক্‌তে সেখানে ১৯২২ সালে মোলিয়ের-এর Tercentenaire 'তেয়ার্‌সাঁৎনেয়ার্' অর্থাৎ 'ত্রিশতাব্দীর উৎসব' বা 'জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হয়। (১৬২২ সালে মোলিয়ের-এর জন্ম হয়, তাঁর মৃত্যু হয় খ্রীষ্টীয় ১৬৭৩ সালে)। সেই সময়ে প্রায় সপ্তাহ খানেক ধ'রে নানা উৎসব অনুষ্ঠান, বিশেষ অভিনয়, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, এ-সব মোলিয়ের-এর জীবন-চরিত আর তাঁর রচনা অবলম্বন ক'রে হয়। যতদূর মনে আছে, এই উৎসবের সময়ে ওদেওঁ থিয়াটারে মোলিয়ের-এর বিখ্যাত হাস্য-কৌতুকময় নাটক Le Bourgeois Gentilhomme "ল্য বুর্ঝোআ ঝঁাতিল্‌-অম্" অর্থাৎ 'দোকানদারের হঠাৎ জমীদার হওয়া' দেখি। এই অভিনয় কিন্তু বিশেষত্ব বর্জিত ছিল। আর দেখি, মোলিয়ের-ত্রিশতবার্ষিকীর জন্য বিশেষ ক'রে লেখা, মোলিয়ের-এর জীবন-কথা নিয়ে একখানি নাটকের অভিনয়। এই অভিনয় দর্শনে, মোলিয়ের-এর জীবনের সম্বন্ধে মোটামুটি খবরগুলি তো জানাই গেল ; তা ছাড়া, তাঁর জীবনের সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধেও বেশ একটা ধারণা হ'ল। আর সংগে সংগে খ্রীষ্টীয় সতেরোর শতকের পারিসের নাগরিক আর অভিজাত সমাজের জীবনের একটা সুন্দর আলেখ্য দেখা গেল। বইখানি লেখ্‌বার ভংগীটি বেশ ছিল। প্রথমেই দেখালে, পারিসের বিখ্যাত সাঁকো Pont Neuf পঁ-ন্যুফ্-এর উপরে একটা মেলার দৃশ্য ; সেখানে হরেক রকম লোকের—মেয়ে আর পুরুষ দর্শকের, দোকানদারের, ফেরিওয়ালার, বাজীকরের, বৈদ্যের সমাবেশ। দাঁতেতোলার বৈদ্য ঘটা করে রোগীর দাঁত তুল্‌লে, তার দাঁতের যন্ত্রণা ভোলাবার জন্য বা যন্ত্রণার চীৎকারের আওয়াজ ডুবিয়ে দেবার জন্য ঢোল আর শানাইয়ের বাদ্য। তাঁবু পেতে স্কারামুচ্চি বা Scaramouche স্কারামুশ্ নামে ইটালীয় নাটকের দলের অধিকারী, নিজের সম্প্রদায় নিয়ে অভিনয় দেখাবার জন্য জমা হ'য়েছে। কেউ কিন্তু তার তাঁবুতে নাটক দেখ্‌তে ঢুক্‌ছে না—স্কারামুশ কাতরভাবে লোকেদের ডাক্‌ছে। এমন সময়ে ছোকরা মোলিয়ের এল, এদের অবস্থা দেখে চেঁচামেচি ক'রে এদের হ'য়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত লোক ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রলে—মোলিয়ের-এর আহ্বানে দর্শকের ভীড় লেগে গেল, বেচারী স্কারামুশ-এর কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি ঘ'টল। এই স্কারামুশ মোলিয়ের-এর হিতৈষী আর পরামর্শ-দাতা রূপে এই নাটকে বার কয়েক দেখা দেন। মোলিয়ের ক্রমে ক্রমে অভিনেতা থেকে দলের অধিকারী হ'লেন। গুণ-গ্রাহী রাজা ষোড়শ লুই, যিনি নিজেকে le Roi Soleil অর্থাৎ "রাজসূর্য্য" আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতেন,

তাঁর সভায় মোলিয়ের নিজ গুণে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। তার পরে ঈর্ষ্যার বশবর্তী হ'য়ে মোলিয়ের-এর শত্রুরা জনকয়েক দরবারী লোকের—অমাত্য রাজপারিষদ প্রভৃতির—সাহায্যে, মোলিয়ের-এর পতনের জন্য নানা ষড়যন্ত্র ক'রলে। কিন্তু শেষটা তাদেরই পরাজয় হ'ল। রাজা ষোড়শ লুইয়ের দরবারের দৃশ্য, তাঁর সভাসদ্‌দের আদব-কায়দা শিষ্টাচার প্রভৃতি, চমৎকার ভাবে আমাদের চোখের সামনে চলন্ত চিত্রপটের মত প্রসারিত হ'ল। ফ্রান্সের মহামহিম সম্রাট্-পদবাচ্য ষোড়শ লুই আস্‌ছেন। তাঁর আগমনের ঘোষণা করে গেল নকীবেরা—তারপরে প্রধান প্রধান রাজাত্মীয় আর পারিষদরা আস্‌ছেন, তাঁদের নামও ঘোষিত হ'ল। শেষ দুইটী সুদর্শন কিশোর রাজভৃত্য, সাদা পোষাক প'রে অতি সহজ নাচের ভঙ্গীতে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে, সমবেত জনসভার কাছে ব'লে চ'লে গেল le Roi arrive "ল্য রোআ আরীভ!"—রাজা প্রবেশ দিচ্ছেন। অম্‌নি সমবেত পুরুষেরা মাথার টুপি খুলে ঘাড় নীচু ক'রে সংহত ভাবে কোমর-ভাঙা হয়ে দাঁড়াল, মেয়েরাও সকলে মাথা নীচু করে অভিবাদনের ভংগীতে রাজার অপেক্ষায় দাঁড়ালেন। রাণী ছিলেন—তিনিও সেইভাবে দাঁড়ালেন। তারপরে, ধীর পদ-বিক্ষেপে, অপূর্ব ভব্যতার সংগে, গর্বোদ্ধত মাথা তুলে, মাথার টুপি না খুলে রাজা লুই প্রবেশ দিলেন। ফরাসীদেশের ইতিহাসে রাজা ষোড়শ লুইয়ের গৌরবময় রাজত্বের কথা, তাঁর অনন্যসাধারণ সমৃদ্ধির আর গৌরব-বোধের কথা, খুব প'ড়েছিলুম; কিন্তু এই অভিনয়ে ঐ ভাবে রাজমহিমার যে নাট্যরূপ, যে অভিনয় দেখ্‌লুম, সেটা একটা দেখবার জিনিস বটে। রাজা প্রবেশ ক'রে চারদিকে তাকালেন, কেবল রাণীর উদ্দেশে নিজের মাথার টুপিটা একবার মাত্র ঈষৎ একটুখানি তুলে (বা তোলার ভাব দেখিয়ে) তাঁকে সম্মান জানালেন—ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম, তাঁকে সেবা দিলেন। এই ছোট-খাট ব্যাপারে রাজগৌরবের (বা রাজদম্ভের) প্রকাশ অভিনেতারা অতি সুনিপুণ-ভাবে ক'রলে। এই নাটকের একটী করুণ-মনোহর দৃশ্য আমার এখন বিশেষ ক'রে মনে প'ড়ছে। মোলিয়ের-এর পত্নী ছিল অত্যন্ত লঘুপ্রকৃতির প্রগল্‌ভা কলহপরায়ণা নারী। মোলিয়ের-এর প্রতিভার মহত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা তার ছিল না, কিন্তু রাজদরবারে তাঁর প্রতিষ্ঠার সুবিধাটুকু পুরা আদায় ক'রত। আবার পান থেকে চুন খ'সলেই, মোলিয়ের-এর প্রতি তার ক্রোধের অন্ত ছিল না—যা তা ব'লে মোলিয়েরকে অপমান ক'রত, তাঁর মনে কষ্ট দিত। একদিন স্বামী-স্ত্রীতে এইভাবে সামান্য কারণে ঝগড়া হ'য়েছে. মোলিয়ের-এর স্ত্রী তারস্বরে চীৎকার ক'রে লোক জড়ো ক'রেছে—"il m' insulte! ই ম্যাঁস্যুল্‌ৎ"—'ও আমায় অপমান ক'রছে', এই তার বক্তব্য। মোলিয়ের বুঝিয়েও তাকে ঠাণ্ডা ক'রতে পারছে না। স্ত্রী রেগে চেঁচাতে চেঁচাতে কাঁদতে কাঁদতে তার কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ বন্ধুর সংগে বেরিয়ে গেল; আর বেচারী মোলিয়ের, ক্ষোভে আর দুঃখে ব'সে ব'সে নীরবে কাঁদতে লাগ্‌ল। এমন সময়ে তাঁর প্রবীণ সাহিত্য-বন্ধু স্কারামুশ্ সেখানে হঠাৎ এসে হাজির। মোলিয়েরকে সেই অবস্থায় দেখে সহানুভূতিতে তার মন ভ'রে গেল তাঁর পিঠ চাপড়ে ব'লে উঠ্‌ল, "tu pleures! তুই কাঁদ্‌ছিস্?" তারপরে স্কারামুশ চেঁচিয়ে নিজের সংগীদের আর মোলিয়ের-এর দলের লোকেদের ডেকে উঠ্‌ল—"ওরে, কে কোথায় আছিস্, দেখে যা দেখে যা—যে মোলিয়ের বিশ্বজগৎকে হাসিয়ে হাসিয়ে পাগল ক'রেছে, সেই মোলিয়ের নিজে কোণে ব'সে কাঁদ্‌ছে!" ২৫ বছর—শতকপাদ—হ'য়ে গেল, এই নাটকের অভিনয় দেখি, কিন্তু এই দৃশ্যটী (রাজা ষোড়শ লুইয়ের সভার মত আর কয়েকটী দৃশ্যের সংগে) এখনও ভুল্‌তে পারিনি—আর এই দৃশ্যটীর অন্তর্নিহিত কারুণ্যভরা কথা—যে, জগৎকে যে হাসায়, সে নিজেই কাঁদে—তার দুঃখ কেউ বোঝে না—তখন আমাকে বিশেষভাবে বিচলিত ক'রেছিল, এখনও এর মানব-সাধারণতার কথা উপলব্ধি করি।

পারিসে অন্য রঙ্গমঞ্চে যে-সব অভিনয় দেখেছি, সেগুলির নাটক-হিসাবে তেমন কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না। অন্ততঃ কোনটাও মনে তেমন ছাপ দিতে পারে নি। তবে একটী রুষ নাটক-সম্প্রদায়, Maria Kouznezoff মারিয়া কুস্নেজ.ফ আর তাঁর দল, পারিসে এসে তাদের রকমারি অভিনয় আর সংগীত দেখায়। তাদের দলের
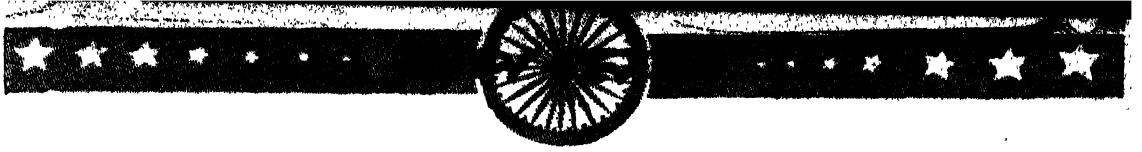
লোকেরা সামাজিক কি ঐতিহাসিক বড় নাটকের অভিনয় ক'রত না; তারা দেখাত, নানা টুকিটাকি জিনিস,—বিশেষ নাচ, বিশেষ গান, ছোট্ট একটা সামাজিক দৃশ্য, একটী রূপকথার কাহিনীকে নাটকরূপে রূপায়িত ক'রে দেখানো, এই সব। কিন্তু এদের প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান-পত্রের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানটী আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে নোতুন ধরণের জিনিস ব'লে মনে হ'ল। এই দলের নট নটী গায়ক বাদক সকলেই ছিল রুষ দেশের। দলটীর অভিনয় হয় Theatre Femina তেয়াত্র্ ফেমিনা ব'লে রঙ্গমঞ্চে। কয়েকটী অনুষ্ঠানের মধ্যে দু'তিনটীর স্মৃতি এখনও মনে জ্বল্‌জ্বল্ ক'র্ছে। একটী ছিল, "দোলনার গান"—La Balancoire "লা বালঁসোআর"—রুষদেশের দক্ষিণে ঘাসে ভরা steppe বা ক্ষেত্রভূমিতে গাছের ডালে দোলনা টাঙিয়ে মাথায় কান-ঢাকা লাল রুমাল বেঁধে, তিনটী রুষ চাষার মেয়ে দুলছে আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গান ক'রছে, আর মাটির উপরে একখানা কাঠের গুঁড়ির উপরে ব'সে তিনটী রুষ যুবক কন্সার-টিনা যন্ত্র বাজিয়ে গানে মেয়ে তিনটীর সংগে যোগ দিচ্ছে। যুবক কয়টীর পরণে রংগীন muzhik মুঝি.ক বা রুষ চাষার 'পাঞ্জাবী' জামা, কালো বা সবুজ পেণ্টুলেন, আর হাঁটু পর্যন্ত বুট্ জুতা। ঐ জুতা-পরা পায়ের চাল দেখিয়ে, ব'সে ব'সেই তারা নাচের করতব ক'র্‌ছে। যুবক তিনটীর মধ্যে একজনের চোখে অদ্ভুত কৌতুকহাস্যময় ঔজ্জ্বল্য, আর এদিকে খুব দ্রুত তালে পা চ'ল্‌ছে, সে এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার ছিল। পারিসের এক পাঁচতলা বাড়ীর সবচেয়ে উঁচুতে চিলের কুঠরীতে গরীব রুষ ছাত্র ঘর ভাড়া নিয়ে আছে, সে ব'সে ব'সে তারস্বরে ফরাসী শেখার বই খুলে পাঠ মুখস্থ ক'র্‌ছে, এমন সময়ে পাঁচ পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে তার ঘরে এসে উঠ্‌ল এক বুড়ো, ভাড়া আদায় কর্‌বার জন্য মালিকের সরকার, হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা ভাঙা চেয়ারে ব'সে খুব তড়বড়ে' ফরাসীতে সে আবল-তাবল ব'কে চ'ল্‌ল। তার নাকি বুকের অসুখ আছে। ছোকরা অনেক কষ্টে তার ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে তাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌লে যে, তার হাতে টাকা নেই—সে তখন টাকা দিতে পার্‌বে না। শুনেই shock পেয়ে বা ঘা খেয়ে, বুড়ো চেয়ারে ব'সে ব'সেই ম'রে গেল। রুষ ছোকরা এই অনাশঙ্কিত বিপদে বিব্রত, এমন সময়ে বাসাবাড়ীর ঝী ঘরে এসে প'ড়্‌ল,: মরা বুড়োকে দেখে আঁত্‌কে উঠে, ছোকরাই তাকে খুন ক'রেছে ভেবে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। তখন হঠাৎ ছোকরার মাথায় খুন চাপ্‌ল—সে ঝীকে ধ'রে তার গলা টিপে তাকেও শেষ ক'রলে। তার পরে, পর পর আর দুজন লোক ঘরে ঢুকে যাওয়ায়, তাদেরও হত্যা ক'রলে। তারপরে চোখে মুখে পাগলের চাউনি আর খুনের বীভৎস ভাব নিয়ে সে যেন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে চায় প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মধ্যে, যাকে সামনে পাবে তাকেই গলা টিপে খুন ক'রবে, এমন সময়ে পর্দা প'ড়ে গেল—দর্শকরা এক আতঙ্ক থেকে যেন বাঁচ্‌ল। এ হ'ল যেন নিছক বীভৎস রসের অবতারণা। ফরাসী ভাষায় এই ছোট নাটিকাটীর উপযোগী নাম দেওয়া হ'য়েছে Le Cauchemar "ল্য কোশ্‌মার" অর্থাৎ বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন। একটী পুরাতন রোমান্টিক কবিতার নাট্যরূপ দেওয়া হ'ল যে ভাবে, তেমনটী আমি আগে কোথাও দেখি নি। রুষ চাষার বাড়ীর ছবি—বাইরে থেকে দেখানো হ'য়েছে; ঘর, বাগান, বাগানের ফুল—সমস্ত, খুব ছোট ছেলেদের জন্য আঁকা রঙীন ছবির বইয়ের মত ক'রে দৃশ্যপটে আঁকা। বড় বড় পাতা, বিরাট্ বিরাট্ অস্বাভাবিক আকারের লাল লাল ফুল। একটী মেয়ে, তার নাম Grounka গ্রুন্‌কা, ঠিক যেন পুতুলের মত সাজ, দু'গালে দুই লাল রঙের পোঁচ, মেয়েটী বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে; আর তার মা বাড়ীর ভিতরে—প্রৌঢ়া রুষ চাষার বউ, খোলা জানলার মধ্য দিয়ে ফ্রেমে বাঁধা ছবির মত সামনাসামনি তার মুখ দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে সৈন্যদের বাদ্যের ধ্বনি আসছে, জয়ঢাক বাজছে। মেয়েটী শুনে, রুষ ভাষায় ছড়া কাটার সুরে গানের মতন ক'রে তার মাকে ব'ল্‌লে—"মা, দেখ, দেখ, ঐ বাজনা, দূরে সৈন্যদল আস্‌ছে।" মা ব'ল্‌লে, সেই রকম সুর ক'রে, "বাজে বকিস নি—ওরা চ'লে গেলে আমায় ব'ল্‌বি।" গ্রুন্‌কা—"মা, ঐ সৈন্যরা এসে গিয়েছে।" মা—"গ্রুন্‌কা, যা, সেনাপতিকে যবের সুরা দে।" গ্রুন্‌কা—"মা, আমার বড্ড ভয় ক'র্‌ছে।" পুঁতুলের মত রঙ করা পিজবোর্ডের সেপাইয়ের সারি,
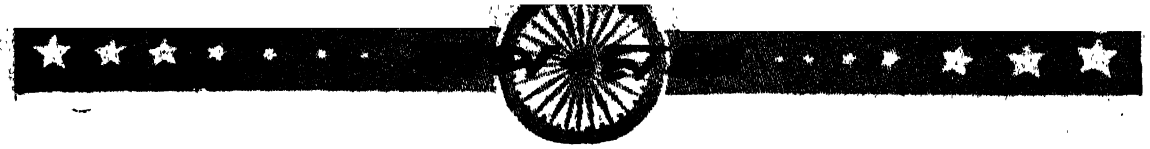
আড়াল দিয়ে তাদের চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেনাপতি এবার এলেন, ঠিক যেন পুতুল সেনাপতি। ভারী গলায় তিনিও ছড়ার সুরে আহার্য্য আর বাসস্থান প্রার্থনা ক'রলেন। গুনকা যবের সুরা এনে দিলে, মাকে ছড়া গেয়ে ব'ললে, "মা, সুন্দর সেনাপতি আমার ক'ড়ে আঙুল ধ'রেছে।" সেনাপতি আবার ব'ললেন, "গুনকা, আমায় এখনি ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হবে, শীগ্‌গির পান ক'রে আমায় যেতে হবে।" তার পরে তরুণ সেনাপতি একটী লাল গোলাপ-ফুল গুনকাকে দিয়ে চ'লে গেলেন। মা বরাবর তেমনি জানালার মধ্যে ছবির মত র'য়েছে, আর মাঝে মাঝে ছড়ায় টিপ্পনী কাটছে। গুনকা ব'ললে, "মা, সুন্দর সেনাপতি চ'লে গেল কেন?—আমায় ফুল দিয়ে গেল, কিন্তু এত অল্পক্ষণ রইল কেন?" ছোট্ট রূপকথার মত উপাখ্যানকে, মোটা রঙে আঁকা ছবির আকারে দেখিয়ে, আর ছন্দে কবিতা প'ড়ে, জিনিসটীতে এক অদ্ভুত সেকেলে আব-হাওয়া আনা হ'য়েছিল। আমার মনে হ'চ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "শুভক্ষণ" ('ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে……')-এর কথা। মনে হ'চ্ছিল, এই ভাবে যদি রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটীর নাটকীয় রূপ দেওয়া যেত, তাহ'লে কেমন সুন্দর একটী জিনিস হ'ত! খালি রুষদেশের কথা নিয়ে এই-সব ছোট ছোট নাটিকা নয়, - জাপানী, স্পানীয় আর ঈরানী নাটকও এই ভাবে এরা দেখিয়েছিল। বিখ্যাত রুষ "বেশকারী" চিত্রকর Leon Bakst বাক্‌স্ট্ এদের সব পোষাকের পরিকল্পনা করেন। যতদূর মনে হ'চ্ছে, পারিসের আর একটী নাট্যদলের অভিনয় দেখি—এই দলের নাম ছিল Chauve-souris 'শোভ্-সুরি' অর্থাৎ 'বাদুড়'। এ যেন 'রূপচাঁদ পক্ষীর' দল। ফ্রান্সের বিখ্যাত অভিনেত্রী Sara Bernhardt সারা বেয়ার্ন্‌হার্ট—যাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তেরা তাঁকে la divine Sara 'দিব্যগুণযুক্তা সারা' আখ্যায় অভিহিত ক'রত—একবার ৭৭ বৎসর বয়সে অভিনয় ক'রতে অবতীর্ণ হন। ১৯২১ সালে লণ্ডনে এসে, তিনি একটী নাটকে এক পুরুষ পাত্রের অভিনয় করেন। সারা তখন চ'লে ফিরে বেড়াতে পারেন না, কিন্তু যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন, সেটী একটী পঙ্গু পুরুষের; তাই ব'সে ব'সেই, মুখের, হাতের আর কথার ভংগীতেই, তাঁর অভিনয় ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর দ্রুত ফরাসী কথা কওয়া বুঝতে পারি নি—তবুও বেশ একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল তাঁর অভিনয়ে।

লণ্ডনে মেয়েদের কলেজ বেডফোর্ড কলেজের ছাত্রীরা গ্রীক কবি Theokritos থেওক্রিতোস্ থেকে দুটী ছোট্ট নাটিকা গ্রীক ভাষায় ক'রে দেখিয়েছিলেন, তাঁরা বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই অভিনয় হ'য়েছিল খোলা আকাশের তলায়। গ্রীক ট্রাজেডি নাটকের পদ্ধতির খানিকটার পুনরুজ্জীবন ইউরোপের আধুনিক অভিনয়কেও প্রভাবিত ক'রেছে। প্রাচীন গ্রীক রীতিতে খোলা আকাশের তলায় অভিনয়, চারদিকে গোল হ'য়ে দর্শকদের বসবার স্থান, এটারও অনুকরণ হ'চ্ছে। বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি Gilbert Murray গিলবর্ট্ মারের কৃত গ্রীক নাটকাবলীর অনুবাদ আজকালকার ইংরিজি সাহিত্যে একটা খুব বড় জিনিস। মাঝে মাঝে মারের অনুবাদে গ্রীক নাটকের অনুবাদ ইংরিজি রংগমঞ্চে অভিনীত হ'য়ে থাকে। Euripides এউরিপিদেস-এর Medeia মেদেইআ নাটকের অভিনয় এই-ভাবে লণ্ডনে একবার দেখেছিলুম। যেমন ভাষার ঐশ্বর্য্য আর ভাবের মহত্ত্ব, তেমন ছিল অভিনয়ের পরিপাট্য। প্রাচীন গ্রীক ধরণের নাচ, আর প্রাচীন গ্রীক অভিনয়ের কয়েকটী অংগ, এই অভিনয়কে আমাদের কাছে বেশ একটু বিশিষ্টতা আর একটু মর্য্যাদা দিয়েছিল।

খুব উচ্চ কোটির নাটক - সংগীতময় নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক, নৃত্য নাটক, একাংক নাটিকা,—খুব বেশী না হ'লেও, এগুলির লক্ষণীয় কতকগুলি নিদর্শন লণ্ডনে আর পারিসে দেখেছি। কিন্তু এ কথাও ব'লবো যে, দেশে ব'সে আমাদের ক'লকাতায় যে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয় দেখেছি, তারও তুলনা হয় না। একটা লক্ষণীয় জিনিস, এক বাঙালাপ্রদেশ ছাড়া ভারতে অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে কোথাও আধুনিক রীতির নাটকই হ'ল না। রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্রা"য় অনুষ্ঠিত 'ডাকঘর' 'রাজা', 'ফাল্গুনী', আর শান্তিনিকেতনে অভিনীত 'নটীর পূজা' —এগুলির তুলনা পৃথিবীর সমস্ত নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে মেলা কঠিন; তেমনি বন্ধুবর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা', 'যোড়শী' প্রমুখ কতকগুলি নাটকের প্রযোজনাও, উচ্চ কোটির নাট্যশিল্পের প্রকাশ হিসাবে আধুনিক ভারতের সংস্কৃতির গৌরবের বিষয়, আর এই অভিনয়গুলি পৃথিবীর যে-কোনও দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয়ের প্রতিস্পর্ধী হ'তে পারে॥

বেটি ডেভিস-গ্রেটা গার্বো বা অন্য কোন বৈদেশিক চিত্রাভিনেত্রী বলে ভুল করবেন না। রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিশেষ ভংগীমায় বাংলার প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবী এম, পি, প্রডাকসনের 'অনির্বাণ' চিত্রে দেখা যাবে

— নবাগতা আরতি মজুমদার —

শ্রীযুক্ত সুখেন্দু বসু প্রযোজিত বোমাট প্রডাকসনের, প্রথম চিত্র 'প্রিয়তমায়'। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি

বেতারের নাটক

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বেতার রাজ্যে বীরেন ভদ্রের অনেক নাম ; তিনি সেখানে কখন বিষ্ণুশর্মা, কখন বিরূপাক্ষ, কখন অরূপের আসর-পরিচালক আবার মাঝে মাঝে 'সবিনয় নিবেদন' করবার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। সব নামেই তিনি সর্বজনপ্রিয় —শুধু তাঁর বিশিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্যে নয়, তাঁর বলবার অনন্যসাধারণ ভংগীর জন্যে নয়, তাঁর রসরচনার মনোহারিত্বে তিনি সকলের প্রীতি অর্জন করেছেন—আশ্চর্যের তিনি হাসতে হাসতে ও হাসাতে হাসাতে মানুষের খুঁটিনাটি ত্রুটি বিচ্যুতি, অভ্যাস ও স্বভাবের কথা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনের সমালোচনা করেন যা রূঢ় ও অপ্রিয় হলেও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। একাধারে নাট্য রচনায় ও নাট্যাভিনয়ে, রসরচনায় ও আবৃত্তি মাধুর্যে তিনি আজ সকলের অন্তরের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।

ব্রিটীশ ব্রড্কাষ্টিং কর্পোরেশনের সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-প্রযোজক ভ্যাল্ গিল্গুড্ লিখেছেন যে, জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বেতার নাটক তাঁদের দেশে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। বাংলাদেশের বেতারে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত অবস্থা। এখন না হ'লেও বেতারের জন্মগ্রহণের পর থেকে তিন চার বছর আগে পর্যন্ত, বেতারে নাট্যাভিনয় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে বসেছিল। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশ নাটক দেখতে ভালবাসে এবং শুনতে ভালবাসে। একমাত্র বাংলা দেশেই পাঁচটা থিয়েটার চলে, গ্রামোফোন কোম্পানীর পালা-রেকর্ড তৈরী হ'লে বাজারে বেশ বিক্রি হয় এবং এখনও বেতারে কোন ভাল নাটকের অভিনয় হ'লে অসম্ভব ভিড় জমে যায়।

১৯২৭ সালে আমরা যখন বেতার আরম্ভ করি, সেই সময় থেকেই শ্রোতাদের নাট্য-প্রীতির পরিচয় আমরা পেতে থাকি। সত্যকথা, বেতারের অসম্ভব শ্রোতার সংখ্যাবৃদ্ধি করার কারণ নির্দেশ ক'রতে গেলে তৎকালীন বেতার নাটুকে দলের অভিনয়কেই প্রথম স্থান দিতে হয়। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ছোট গল্পকে অতি কাঁচাভাবে নাট্যে রূপান্তরিত করে প্রথম অভিনয় হয় এবং তারপর জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুরের অলীকবাবু, পরশুরামের চিকিৎসা সঙ্কট ইত্যাদি কয়েকটি নাটকের বেতার রূপ শ্রোতৃবর্গকে অভূতপূর্ব আনন্দ দান করে। এ ছাড়া সেকালে নাট্য-মন্দির থেকে আংশিক অভিনয়ও রীলে ক'রে শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল—লোকে পুরো খুশী না হলেও সে সমস্ত অভিনয় শোনার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতো। তারপর দেখা গেল যে, রঙ্গমঞ্চ থেকে রীলে করার বাধা এই যে, সেখানে মূল নাটকের অভিনয় নানা রকম অবাঞ্ছিত শব্দে বার বার ব্যাহত হয়, তা ছাড়া কয়েকটি নির্দিষ্ট নাটকাভিনয় বার বার রীলে করতে হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই বেতার নাটুকে দলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং রঙ্গমঞ্চের নাটক নিয়েই তাকে বেতারের উপযোগী করে অভিনয় করা হ'ত। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, বেতারে রঙ্গমঞ্চের নাটক অসাধারণ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্ছে।
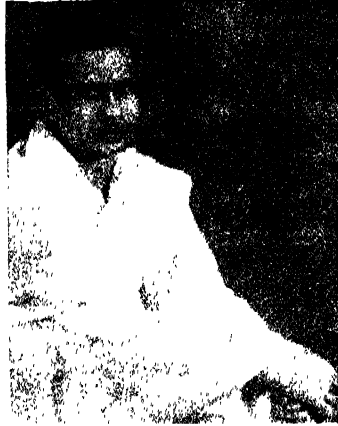
রঙ্গমঞ্চের নাটক যদিও ঠিক বেতার নাটক নয়, তবুও এই নাটক শুনতে দর্শক সাধারণের কেন এত আগ্রহ ছিল তার কারণ নির্দেশ করতে গেলে বলতে হয় যে, অধিকাংশ
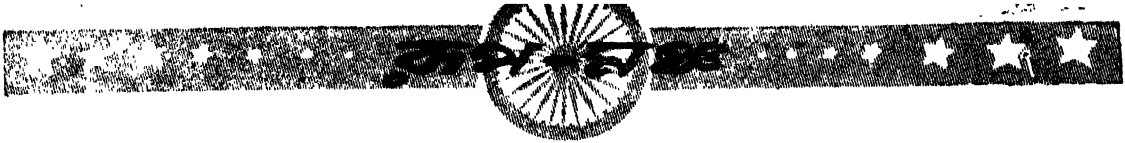
শ্রোতার সংগে নাটকগুলির পরিচয় থাকাতে অভিনয় না দেখতে পেলেও কল্পনা নেত্রে তাঁরা চরিত্রগুলিকে দেখতে পেত এবং প্রতি শুক্রবার শুধু কলকাতায় নয়, মফঃস্বল পর্যন্ত দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য লোক এসে এক একটি বেতার সেটের পাশে জমা হ'য়েছে এমন বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

থিয়েটারের নাটকের সময় সংক্ষেপ করা নিয়ে এবং রঙ্গমঞ্চে নাটকের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য তৎকালীন দিল্লীর কর্তৃপক্ষের সংগে আমার মতান্তর ও মনান্তর ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পায় যে, আমি বেতারের পরিচালনা কার্য থেকে ইস্তফা দিই। অবশ্য আমি এটুকু জানি যে, বেতার নাটক ঠিক রঙ্গমঞ্চের নাটক নয় এবং শুধু জনপ্রিয়তার দিকটা দেখলে বেতার নাটক স্বতন্ত্রভাবে উন্নত হয়ে উঠতে পারেনা। তা ছাড়া সে যুগে যতদীর্ঘক্ষণ বেতার নাটক চলতো, এখকার দিনে অত দীর্ঘক্ষণ ধৈর্য শ্রোতাদের থাকতো না। তবে একথা এখনও সত্য যে, রঙ্গমঞ্চের নাটক এখন যা মাঝে মাঝে বেতারে অভিনয় হয়, তার জন্যে যে সময় নির্ধারিত করা আছে সেও যথেষ্ট নয়। অন্ততঃ দেড়ঘন্টা সময়ের কম কোন রঙ্গমঞ্চের নাট্য বস্তুকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং অন্ততঃ কম করে পাঁচহাজার বার নাট্য প্রযোজনা করে একথা বলতে পারি। রঙ্গমঞ্চের নাটকের সংগে বেতার নাটকের এতখানি পার্থক্য অনুভব করেও তবু আমি রঙ্গালয়ের নাটক প্রযোজনা করতে এত উৎসাহ দেখাতাম কেন, এ প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন। তার কারণ, বেতারের জন্য নাটক লিখতে হ'লে যে মুন্সীয়ানা দেখানো দরকার, তা অধিকাংশ লেখকই দেখাতে পারেন না, বেতারের নাটক অতি অবহেলা ভরে লেখা চলে না, স্বল্প টাকা এবং মাত্র একদিন বা বছরে দুদিনের বেশী কারুর খুব ভাল নাটকও অভিনয় করা চলে না। সেই জন্য পাকা লিখিয়েরা এইদিকে মন দেন না, তার ফলে আদর্শানুযায়ী নাটক গড়ে ওঠেনা।

প্রথমতঃ, বাংলাদেশ নাটকের ভক্ত হ'লেও এখানকার নাট্যকারের সংখ্যা খুবই অল্প এবং নাট্য-সাহিত্য এখনও সমৃদ্ধ নয়। বিদেশী নাট্যকাররা যে অর্থ ও সম্মান নাটক লিখে পান, এ দেশের নাট্যকাররা তা কল্পনাও করতে পারেন না। বরং উপন্যাস লিখে যে প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম ক'রেও অনেক নাট্যকার সফলকাম হ'তে পারেন না। ফলে নাট্য-সাহিত্যের দিকে ঝোঁক আছে খুব কম লেখকের—আর তা ছাড়া নাটক রচনা করাও অতি দুরূহ কার্য। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে পাত্র পাত্রীদের চরিত্র যথাযথ রূপায়িত করা অতি কঠিন কার্য। মাত্র কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকার বাংলাদেশে এই দুরূহ ব্রতে অবতীর্ণ না হ'লে আমাদের নাট্য-সাহিত্য যেটুকু গড়ে উঠেছে তাও বোধ হয় গড়ে উঠতো না।

রঙ্গালয়ে যে সমস্ত নাটক হ'য়েছে, তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই নাটকে অন্ততঃ একটি আখ্যানবস্তু ও কিছু কিছু সংলাপের জোর পাওয়া যায়, যেটা নিতান্ত নবীন লেখকদের লেখায় পাওয়া শক্ত। অবশ্য ব্যাতিক্রমের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। রঙ্গালয়ে অভিনীত অনেক অপদার্থ নাটকও আছে। যে দেশে রঙ্গালয়ের জন্য নাটকই রীতিমত সমৃদ্ধি লাভ করেনি, সে দেশে বেতার নাটক কতখানি উন্নত হয়ে উঠতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

অবশ্য বেতার নাটক একেবারে গড়ে উঠবে না বলে হতাশ হয়ে পড়লেও চলবে না। নবীন লেখকদের মধ্যে যাঁরা খুব ভাল সংলাপ লিখতে পারেন এবং সংলাপের ভিতর দিয়েই আখ্যানবস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাঁদের সন্ধান করতে হবে এবং একটি সংঘ গড়ে তুলে বারবার পরীক্ষা করতে হবে। এর জন্য চাই সাধনা ও শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকারের তহবিলে এখনও সে অর্থ আছে কিনা জানিনা। তবে এর জন্য রীতিমত গবেষণার ব্যবস্থা দরকার এবং প্রথম প্রথম নামজাদা লেখকদের নিয়ে এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা আবশ্যক। এই সমস্ত আয়োজন না করে বেতারের উচ্চ কর্তৃপক্ষ রঙ্গমঞ্চের নাটকের প্রতি অকস্মাৎ বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করতে গিয়ে খুব লাভবানও হ'য়ে ওঠেন নি—অন্ততঃ বাংলাদেশে। কিন্তু দেখা গেছে, যখনই বেতারের জন্য বড় কয়েকজন লেখক নাট্য-রচনা

করেছেন তখনই তা পাকা হাতের স্পর্শে সজীব হ'য়ে

কাব্যের দুটি ভাগ করেছেন আলঙ্কারিকরা—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। তার মধ্যে দৃশ্যকাব্যের মূল্য যে রঙ্গালয়ে খুব বেশী তা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা কাব্য শোনার সংগে সংগে যদি তাকে রূপায়িত হ'তে দেখি তাহলে তার রসটা বেশী উপভোগ করতে পারি—সেইজন্ত সবদেশেই দৃশ্যকাব্য বা নাটককেই খুব বড় জায়গা দেওয়া হয়েছে। শ্রব্য-কাব্যের মূল্য রংগালয়ে বিশেষ নেই কিন্তু বেতারে শ্রব্যকাব্যের সাহায্যেই একটি বিশেষ রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। শ্রুতিই যেখানে প্রধান, সেখানে শ্রব্যকাব্যের মূল্য যে যথেষ্ট হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের দেশে এযাবৎ প্রচলিত নাটকগুলিকে বেতারে রূপদান করার পক্ষে সহজ ছিল এই কারণে যে, নাট্য-ক্রিয়ার চেয়ে নাট্য সংলাপের মধ্য দিয়েই নাট্যগুলি অধিকাংশ গড়ে উঠেছে। সেকস্‌পিয়ারের টেক্‌নিক অবলম্বন করে অধিকাংশ নাটকই রচিত হয়ে এসেছে ব'লে বেতারের পক্ষে এইগুলি অভিনয় করলে রসহানির কোন সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। অবশ্য কয়েক বছর পূর্ব হতে বাংলার আধুনিক নাট্যকাররা সংলাপ ও তার সংগে নাট্য-ক্রিয়ার নানারূপ বৈচিত্র্য আমদানি ক'রেছেন ব'লে সেগুলিকে আবার বিশেষ ভাবে বেতারের জন্য রূপান্তরিত করে নিতে হয় এবং মাঝে মাঝে অসুবিধাও ঘটে। তবে গিরিশচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অপরেশচন্দ্র পর্যন্ত যে সমস্ত নাটক লিখে গেছেন, তার বেতার রূপদান করা কঠিক নয়।

তবে অতি সহজ তাও বলা যায়না। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের ভেতর দিয়ে, সংক্ষেপ করে কোনরূপ রসবৈচিত্র্য-হানি না ঘটিয়ে, নাট্যের মূল আখ্যানবস্তুকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে, যাতে মুহূর্তের জন্যও শ্রোতারা ভাবতে না পারেন যে, এর অংগহানি করা হয়েছে। বেতার-নাট্য প্রযোজকের সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট রসজ্ঞান না থাকলে শুধু নাটকের দৃশ্য বা সংলাপ বাদ দিয়ে দিয়ে বেতার নাট্যের রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকে সেইরূপ সহজ পন্থা অনুসরণ করতে গিয়ে নাটককে বিকৃত করে শ্রোতাদের বিরক্তিভাজন হ'য়েছেন তাও দেখা গেছে। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে, কোন রঙ্গমঞ্চের নাটকেরই সময় অন্ততঃ দেড় ঘণ্টার কম হ'লে বিশেষ উপভোগ্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনা।

এত গেল রঙ্গমঞ্চের নাটকগুলির বেতার-রূপের কথা। কিন্তু বেতারের জন্য নাটক বিশেষভাবে রচনা করতে গেলে কি ক'রতে হবে। প্রথমত নূতন নাটক সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই, আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টার মধ্যে নাট্য বস্তুকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা দরকার, বিষয় বস্তুর জটিলতা না থাকা দরকার, অল্প অভিনেতৃ সংখ্যার প্রয়োজন এবং সংলাপ, আবহ সংগীত ও শব্দের ইংগিতে ক্রিয়াকলাপ ফুটিয়ে তোলার কৌশলের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্য-বস্তুকে প্রকাশ করার রীতি নাট্যকারের বিশেষ ভাবে যদি জানা থাকে তাহ'লে সময় সময় আবহ সংগীত বা কোন শব্দের ইংগীত দানেরও প্রয়োজন হয় না।

একটি ছোট্ট বিষয়বস্তু বা ছোট্ট ঘটনাকে নিয়েও অতি উপভোগ্য বেতার-নাটক রচনা করা যেতে পারে। তবে প্রত্যেকটি সংলাপ এমন কৌশলে লিখিত হওয়া চাই, যার সাহায্যে কৌতূহল জাগাতে পারে। সংলাপ গেঁথে গেঁথেই যাতে গল্পটি জমাট বেঁধে ওঠে এবং ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় সেইদিকে নজর রাখতে হবে নাট্যকারের। নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে সূত্রধারের আগমন বা ঘোষকের আগমন অত্যন্ত বিরক্তিকর। বেতার-বিচিত্রা রচনায় ঘোষক বা সূত্রধারের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু বেতার নাটকে তার স্থান নেই। পূর্বে ছিল বটে কিন্তু বর্তমানে এই পুরাতন টেক্‌নিক অত্যন্ত বিরক্তিকর। তবে রংগমঞ্চের নাটক অভিনয় করতে গেলে দৃশ্যান্তর ঘোষণা করা যেতে পারে কিন্তু বেতারের জন্য বিশেষভাবে লিখিত নাটকে এই প্রথা অবলম্বন করা চ'লতে পারেনা।

পাত্রপাত্রীদের নাম পাত্রপাত্রীদের মুখেই এমনভাবে বলানো দরকার, যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারেন তাঁরা কে, কার সংগে: কি সম্বন্ধ, কোন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নাটক অগ্রসর হচ্ছে, প্রস্থান ক'রছে, কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি সব কিছুই

সংলাপ দিয়ে গ'ড়ে তুলতে হবে। অথচ সেগুলি এমন হবে না, যাতে করে বোঝা যায় যে, এগুলি জোর করে বোঝানোর জন্যেই লেখা হয়েছে। নিতান্ত স্বাভাবিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে।

বেতার নাটকের যেমন অসুবিধা আছে তেমনি সুবিধাও আছে প্রচুর। যে কোন বিষয় নূতন নূতন ভাবে প্রকাশ করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। রংগমঞ্চে যে সমস্ত জিনিষ ভাল ভাবে ফুটিয়ে তোলার অসুবিধা হয়, বেতারে শব্দ ও সংগীতের মাধ্যমে তা সহজে ফুটিয়ে তোলা যায়। দুর্দান্ত কল্পনাকে অনেক সময় রংগমঞ্চে রূপায়িত করা কঠিন কিন্তু বেতারে নয়। বেতারে শ্রোতারা অনেক কিছু না দেখেও মাত্র বেতার নাটকের টেক্‌নিক গুণে বাস্তব রূপকে অনুভব করতে পারেন— অবশ্য শ্রোতাদের সেই ভাবকে জাগ্রত করার কৌশল নাট্য-প্রযোজকের আয়ত্বের মধ্যে থাকা চাই। রংগমঞ্চের নাটকও যেমন নির্বাচনের ত্রুটিতে ও প্রযোজকের অর্বাচীনতার ফলে অসাফল্য অর্জন করে, বেতারেও তার ব্যাতিক্রম হয়না। খুব ভাল নাটকও পাত্র পাত্রীর নির্বাচনের অব্যবস্থায় অত্যন্ত কর্ণপীড়াদায়ক হ'তে পারে, কণ্ঠস্বর এক ধরণের হ'লে কে কথা ব'লছেন তা বুঝতে অসুবিধে হ'তে পারে, অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ভূমিকা বলার দোষে বিরক্তিজনক হওয়ার সম্ভবনাও থাকে। রংগমঞ্চে বাচনভংগীর ত্রুটী দেহভংগী দিয়ে ঢাকা যায় কিন্তু বেতার নাটকে তা হবার জো নেই। জিহ্বার সামান্য জড়তা সেখানে মারাত্মক।

তবে একথা ঠিক যে, নাটকের মধ্যে বিষয়বস্তু থাকলে বেতার নাটক অধিকাংশ সময় সাফল্য অর্জন করে থাকে। বাংলার নবীন লেখকরা যদি এই নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন, তাহ'লে আমি ব'লতে পারি যে, বাংলাদেশ হয়তো বেতার নাট্য-রচনায় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সব চেয়ে এগিয়ে যাবে। তবে বেতার নাটক রচনা করার আগে নাট্যকারকে সাধারণ নাটক কি, তার কি কি গুণ, স্বদেশে ও বিদেশের নাট্যরূপ, তার টেক্‌নিক কি এবং এর সংগে সেই টেক্‌নিকের পার্থক্য কতখানি সে সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি জানতে হবে। বহু বিষয়বস্তু রয়েছে তাকে অবলম্বন করে-বেতার নাট্যরচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। বর্তমানে বেতারের নাট্য-বিভাগের ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত, আমার বিশ্বাস তাঁরাও নবীন নাট্যকারদের এবিষয়ে পরমর্শ দিয়ে বেতারের নিজস্ব নাট্য-আন্দোলনকে সফল করে তুলবেন।

লটারীর টিকিট

কাজী নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও যে মুষ্টিমেয় জনকয়েক কবি তাঁদের স্বাতন্ত্রের দাবী পুরোমাত্রায় বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম, শুধু এই কথা বললেই নজরুল সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয় না। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে সুরের বহ্নি শিখায় নজরুল যে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছেন, চিরদিন জাতি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

পু—(কথায়) অ গিন্নি! বলি অ গ্যাজারীর মা! হুনছিনি? দুইটা টাহা দিয়া আজ লটারীর টিকস্ কিনছি।

স্ত্রী—কি কও? লাটাইএর টিকস্ কিইন্যা দুইটা ট্যাহা জলে দিছ?

পু—আরে লাটাইয়েব টিকস্ নয়, লটারীর টিকিট। বিলাতের ময়দানে ঘোড়দৌড় হইব। এই টিকিটের যে ঘোড়া, হেয় যদি ফাষ্ট হয়—আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইমু।

স্ত্রী—পঞ্চাশ হাজার ট্যাহা? সে যেন বুঝলাম, কিন্তু তোমার টিকসের ঘোড়া ফাষ্ট হইব কিমুন কইর‍্যা। বিলাতের ঘোড়া বুঝি ইস্কুলে পড়ে?

পু—আ আমার পোড়া কপাল! ঘোড়ায় ইস্কুলে পড়্‌ব কেন। দৌড় দিয়া যদি হেই ঘোড়া হক্কলের আগে যায় তবেই হেই ঘোরা ফাষ্ট হইব।

স্ত্রী—হয় সে যেন বুঝলাম, তা তোমার ঘোড়া হক্কলের আগে যাইব কেমন কইর‍্যা, তুমি ত রইল্যা এই হ্যাশে, ঘোড়া রইল বিলাতে—ওরে খেদাইয়া লইয়া যাইব কেডা?

পু—আ আমার পোড়া কপাল! হেইনা দেশে সাহেব ঘোড়ার আবার সাহেব সহিস আছে নি, হেই সাহেব সহিসে চালাইব। গিন্নি, হানজ্যা লাগছে নয়? ত আজ থাইক্যা ঠাকুর দেবতার পূজা না দিয়া ঘোড়ার পূজা করুম। ঠাকুর দেবতার পূজা কইর‍্যা ত কপালে এই হইল যে, তিন বছরে চারড্যা কইরা পোলাপান বারে, আর বেতন তোমার ঐ ঠাকুরের লাগন এক-জাগাতেই থারাইয়া আছে। বিশ ট্যাহা আর একুশ টাকা হইল না এই বিশ বছরে। আমি অফিসে বইস্যা একটা ঘোড়া পূজার গান শিখছি—হেইটা গাই—তুমিও সাথে সাথে গাও।

স্ত্রী—কি কও আমি গান করমু? আমারে কি শহরের বাইজী পাইছ?

পু—আরে গেরামে বিয়া হইলে ত গান গাও, ঐ ছুন কইর‍্যাই আমার গলায় গলা দিয়া গাইয়া যাও। পঞ্চাশ হাজার ট্যাহা পাইবা। বুঝলা?

স্ত্রী—সে যেন বুঝলাম, আমি কিন্তু আস্তে আস্তে গাইমু।

পু—হঃ হঃ আস্তে আস্তে গাইলেই হইব।

—গান—

নমস্তে শ্রী বিলাতি অশ্ব, যায়েব হর্স নমোনমঃ
চতুঃষ্পদ একগুচ্ছ পুচ্ছহীন জীব আদর্শ
বিলাতি অশ্ব যায়েব হর্স নমোনমঃ

—সে যেন বুঝলাম, কিন্তু ঐ ফিরিঙ্গি মন্তর আমি কইবার পারুম না। ঘোড়ার বাঙলা মন্ত্র নাই?

পু—হয় হয় আছে বৈ কি? তাও লিইখ্যা আনছি। সাথে সাথে দোহার ধইর‍্যা গাইয়া যাও।

—গান—
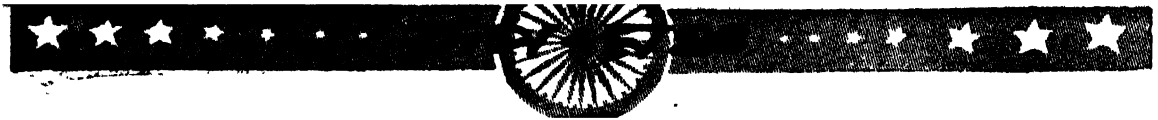
পক্ষীরাজের বাচ্চা আমার ঘোড়া ছুইট্যা যাও,
কে রোইয়া তুই চক্ষুরে, ঘোড়া ছেরোইয়া বরে পাও ॥
স্বর্গপানে ল্যাজ উচাইয়া চিঁহি চুঁহুঁ ডাক্যা
আমরা হেথায় রাত্রি জাগমু ছোলা ভিজাইয়া রাইখ্যা ॥
তোমার সাথী ঘোড়াগুলায়
চাট মাইর‍্যা ফেইল্যা ধূলায়
না যদি জিতরে ঘোড়া ঘোড়ানীর মাথা খাও ॥

স্ত্রী—ঘোড়ায় টাকা আন্‌লে আমি কিন্তু একশ ভরি সোনা দিয়া গয়না গরামু।

পু—কি কও, সে সব হইব না। আগে জমি জায়গা কিনমু, বাড়ীঘর করুম তারপর গয়না।

স্ত্রী—কখ্‌খনো না, আমি যদি একবাপের মাইয়্যা হই, তাইলে আগে গয়না করুম তারপর অন্য কিছু।

পু—আমিও যদি একবাপের পোলা হই তাইলে এই লাঠি দিয়া তোমার মাথা ভাইঙ্গ্যা—

স্ত্রী—আর একটা বৌ লইয়া আসবা—নয়? এই তোমার টিকস্‌ রইল আমার আঁচলে বাঁধা—উয়ারে উনানে দিয়া পুরাইয়া ফেলাম—তবু তোমারে আর বিয়া করবার দিমু না।

শিল্পী আর কর্মীর স্বপ্ন ও সাধনায় ছবি পায় প্রাণ আর গতি

বিভূতি লাহা

সিনেমা-ছবি ক্যামেরারই কারসাজি, সুতরাং যে জিনিসটি না হ'লে ছবি তোলা যায় না—তার দায়িত্ব যাঁর ওপর থাকে, তিনি সর্বাংগীন সাফল্যের পরিচয় না দিতে পারলে ছবি কখনও ভাল হয় না। ভাল ছবি যিনি গ্রহণ করেন তাঁকে চিত্রকাহিনীর গতি ও নাট্যরস উপলব্ধি করতে হয়। বাঙলাদেশের চিত্ররাজ্যে বিভূতি লাহা আলোক শিল্পীরূপে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর চিত্রগ্রহণের অভিজ্ঞতা তাঁকে চিত্রপরিচালনার ব্যাপারেও সহায়তা করেছে। তিনি 'অগ্রদূত' পরিচালক-গোষ্ঠির অগ্রতম দূত।

চিত্রনির্মাণই হোক আর ফুটবল খেলাই হোক—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায় সকলের সমবেত এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। ফুটবল খেলায় যেমন কোন দলের গোল দেওয়া নির্ভর করে দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজ দায়িত্বের যথাযথ প্রতিপালনের ওপর, তেমনি ছায়াছবির বেলাতেও সাফল্যলাভ করতে হলে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। কিন্তু ভাল ছবি করতে গেলে একটি ভাল গল্পের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম। একটি ভাল কাহিনী পেলে চিত্রপরিচালক থেকে সুরু করে সাধারণ কর্মীরা পর্যন্ত সকলেই উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাই যেমন দরকার পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ গল্পের মূলভাবটিকে হৃদয়ংগম করে গল্পের পরিস্থিতি বা Situation অনুযায়ী নিজেরা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন, তেমনি তার সংগে সংগে এটাও দরকার যে, কর্মীরাও তাঁদের নিজের নিজের অংশের কর্তব্য সুসম্পন্ন করছেন। আবার অন্যদিকে চিত্রকাহিনীটি যদি চিত্তাকর্ষক না হয় তাহলে সকলের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। অনুপযোগী কাহিনীতে পরিচালক যদি কৃত্রিম বৈচিত্র্যসঞ্চারের চেষ্টা করেন, তাহলে তা উল্টে অভিনেতা-অভিনেতৃদের চরিত্ররূপায়ণের সাবলীলতাকে ব্যাহত করে দেয় এবং সমগ্র শিল্প-প্রচেষ্টাটি পর্যবসিত হয় কেবলমাত্র অযথা অর্থব্যয়ে ও পণ্ডশ্রমে।

ভাল ছবি তৈরী করতে গেলে প্রত্যেক কর্মীর বিশ্বাস ও মনোবল অটুট রাখাও খুবই দরকার। এবং সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে, গল্প ভাল হলে তা রাখা যথেষ্ট সহজ হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, গল্প হৃদয়গ্রাহী হলে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালকের মত সাধারণ কর্মীদেরও গল্পের প্রতিটি পরিস্থিতি বেশ মনে থাকে। এটা একটা নিয়ম বলে ধরা যেতে পারে যে, চিত্রকাহিনী যদি চিত্রনির্মাণে লিপ্ত প্রত্যেকের মনোহরণে সমর্থ হয়, তাহলে কর্মীদের মধ্যে তা অধিকতর উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে নব নব শিল্পকুশলতার পরিচয় দেবার প্রেরণা জোগায়। এইরকম মনোভাব সৃষ্টি করা বিশেষ কঠিন নয় বলে বহু বিখ্যাত চিত্রপ্রতিষ্ঠান এই প্রথাই এখন অনুসরণ করছেন। আর এই মনোভাব অনেকটা যেন হাওয়ায় ভেসে একজনের থেকে আরেকজনে সঞ্চারিত হয়। কর্মীদের কাছ থেকে এই মনোভাব গ্রহণ করে প্রচারবিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে তাঁদের ছবিটি সম্বন্ধে রীতিমত অত্যুক্তি করে বেড়ান। এর জন্যে প্রযোজক এবং অর্থনিয়োগকারীরাও অনেক সময় যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে সময় ও অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেও রাজী হন। চিত্রপরিদর্শকরাও বাদ পড়েন না। তাঁরাও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রদর্শককে তাঁদের ছবি সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করবার জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। এইভাবে যদি দেখা যায় যে, সকলেই ছবিটির প্রতি সত্যসত্যই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং উপলব্ধি করছেন যে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন একজনকার সহস্র চেষ্টাও কার্যকরী হবে না, একমাত্র তাহলেই শুধু তাঁদের সকলের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে ছবিটি সত্যই সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্ম হয়। শৈশব ও কৈশোর গয়াতে অতিবাহিত হয়। সেখানেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক ৺ওস্তাদ হনুমান দাসজীর নিকট উচ্চাংগ সংগীত (ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী) শেখবার সুযোগ পান। যতদিন ওস্তাদজী জীবিত ছিলেন (প্রায় ২০ বৎসর কাল) তাঁর প্রিয় শিষ্যরূপে একমাত্র তাঁরই কাছে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত শিক্ষা করেছেন। ওস্তাদজীর একমাত্র সুযোগ্য পুত্র ও সারা ভারতে হারমোনিয়াম বাদনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ৺শনি মহারাজের নিকট ইনি হারমোনিয়াম (Solo) বাজাতে শেখেন। ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় এসে উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ করেন। বি, এ, পাশ করবার পর এক সংগে এম, এ, ও ল' পড়তে আরম্ভ করেন। অসুস্থতাবশতঃ এম, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নি। ১৯৪০ খৃঃ-এ, ল, পাশ করে কিছুদিন কোর্টে যাতায়াত করেন। কলেজে পড়বার সময়েই ইনি পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট গুণীর নিকট মনোহরশাহী কীর্তন শেখেন। কবি নজরুল ইস্‌লামের সংস্পর্শে এসে তাঁর স্নেহ লাভে সমর্থ হন। নজরুলের সহযোগিতায় বাংলা গানের যতরকম শ্রেণী আছে প্রায় সবগুলি নিয়েই ইনি চর্চা ও তার সুরের গবেষণা করেন। কয়েকটা যন্ত্র সংগীতেও এঁর রীতিমত দখল আছে। বর্তমানে ইনি চিত্রজগতের সাথে সংগীত পরিচালকরূপে সংশ্লিষ্ট আছেন। এঁর পরিচালিত সংগীত 'বনফুল', রাজলক্ষ্মী', 'পথ বেধে দিল' ও 'অলকানন্দা'য় শুনতে পাওয়া গেছে। প্রথমোক্ত তিনটা ছবিতেই বাংলার কিন্নরকণ্ঠী কানন দেবী নায়িকার ভূমিকাতে ছিলেন। বহুদিন ধরে ইনি বেতারে নিয়মিতভাবে শ্রোতাদের গান গেয়ে শুনিয়েছেন। তবে বর্তমানে বেতার কর্তৃপক্ষ এঁর প্রতি বিশেষ অবিচার করায় ইনি বেতার পরিত্যাগ করেছেন। সংগীত সম্পর্কে এঁর প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।
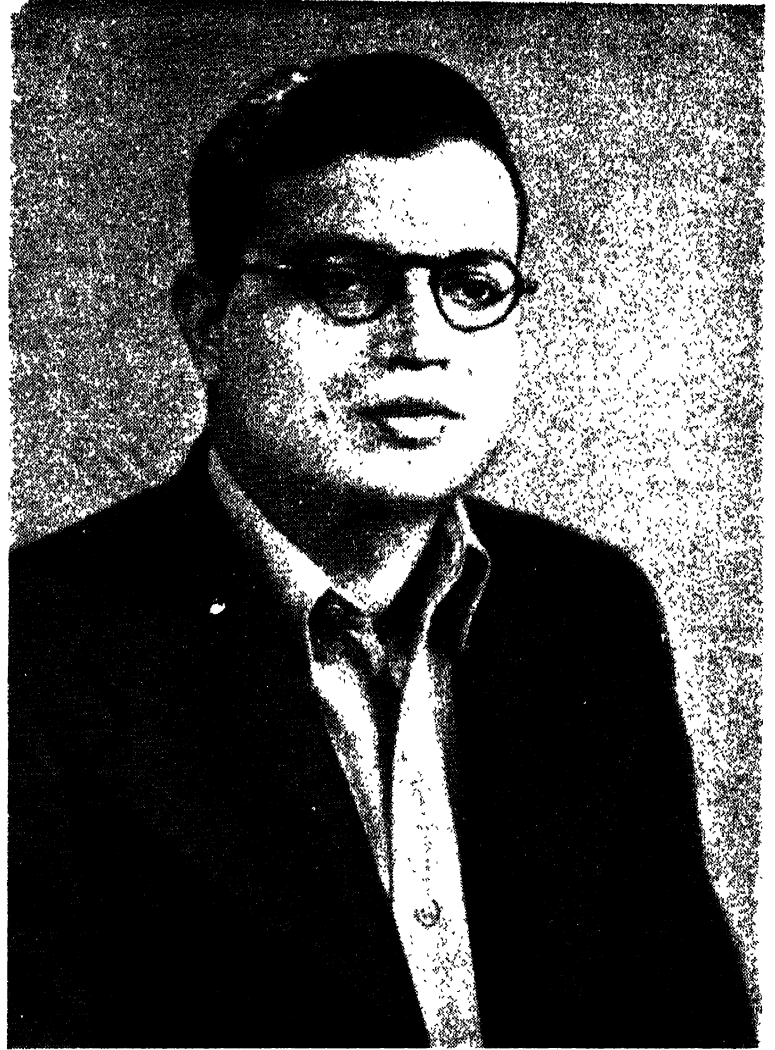
শারদীয়া

১৩৫৪

শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেন

১৩১৮ সালে ফাল্গুন মাসে রাজসাহী সহরে জন্মগ্রহণ করেন। মূল বাসস্থান পাবনা জেলার 'ভাঙ্গাবাড়া' গ্রামে। পিতা চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় এঁর সাতবছর বয়সের সময় মারা যান। রাজসাহীর ভোলানাথ এ্যাকাডেমীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ছোটবেলায় পিতার কাছে সংগীত শিক্ষা আরম্ভ হয়। এঁর বাবা, মা ও পরিবারের সকলেরই সংগীতে যথেষ্ঠ দখল ছিল। এঁর স্ত্রী শ্রীমতী গৌরী সেনও একজন সুগায়িকা এবং এঁর প্রত্যেকটী সংগীত সৃষ্টির মূলে তাঁর অবদানও কম নয়। ভোলানাথ একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করে রাজসাহী কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৫ খৃঃ, নভেম্বর মাসে কলকাতায় আসেন। ১৯৩৫ খৃঃ-এ আগষ্ট মাসে হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ এঁর প্রথম সংগীত রেখাবদ্ধ করেন। তখন থেকেই কলম্বিয়া,—এইচ্, এম্, ভি, মেগাফোন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সংগীত শিক্ষকরূপে (Trainer) কাজ করেন। এবং তারপর সেনোলায় প্রধান সুরকাররূপে যোগদান করেন। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের একজন উদ্যোগী কর্মী। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 'অভ্যুদয়' গীতি নাট্যটী এঁর প্রধান অবদানরূপে সর্বসাধারণের প্রশংসা লাভ করে। 'বন্দেমাতরম্' চিত্র খানির সুর সংযোজনা করেও যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেন। বর্তমানে বিভিন্ন রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত থাকলেও কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের গঠনমূলক কার্যেই নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। 'জাতীয় সংগ্রামে জাতীয় সংগীত ও নাট্যের অবদান এঁর এই রচনাটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। আশা করি রচনাটি পাঠক সাধারণকে খুশী করবে।

সংগীত পরিচালনা ও বর্তমান চিত্রশিল্প

ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, তাই অবাক হ'য়ে শুনি।' বেতার, সিনেমা ও রেকর্ডে রেকর্ড ব্রেক করেন এরকম অনেক উঁচুদরের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীর গান শুনে আমরা পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু ধীরেন মিত্র শুধু গায়ক নন, তিনি গুণী। গায়কের গানের লালিত্য আমাদের মুগ্ধ করে কিন্তু গুণীর গানে নব নব বিস্ময় সৃষ্টি হয়।

সম্পাদক মহাশয় আমাকে ছায়াচিত্রের সংগীত পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, য়ুনিভার্সিটী ছাড়ার পর থেকে লেখাতো একেবারে আমার অভ্যাসের বাইরে চ'লে গেছে বল্লেই হয়, তাই আশংকা হয় যে, এই লেখার মধ্যে বহু ত্রুটি, বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। তবে সংগীত-পরিচালক হিসেবে চিত্র জগতের সম্পর্কে এসে আমার বক্তব্য অনেক কিছুই আছে। এই প্রবন্ধে আমি সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করছি।

বাংলা ছায়াছবির সংগীত সম্বন্ধে এখন অনেকেরই নালিশ এই যে, ছায়াচিত্রের বেশীর ভাগ গানই একেবারে বাজে। সাহিত্য-সৃষ্টি ও সুর-সৃষ্টির দিক থেকে তাদের কোনই অভিনবত্ব, ভাববৈচিত্র ও উপযোগীতা নেই। অনেকেরই মতে সেগুলি রচয়িতাদের প্রাণ থেকে নদী ধারার মতন স্বাভাবিক প্রবাহের বেগে বেরিয়ে আসেনি। প্রায় প্রত্যেক ছবির গানই একই রকমের আর একঘেয়ে। এই কারণে রসজ্ঞ শ্রোতাদের কাছে সেগুলি চিত্তাকর্ষক না হয়ে বরং ক্লান্তিজনক ও বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও অক্ষমতা কেন হয় আর এর জন্য দায়ী কে তা কেউ একবারও ভেবে দেখেন না। ছবির গান কথা, সুর ও ভাবের দিক থেকে একঘেয়ে, প্রাণহীন নিকৃষ্ট হলে সে সমস্ত দোষ music-directors অর্থাৎ সংগীত-পরিচালকদের উপর এসে পড়ে আর তার জন্যে তাঁদের অজস্র নিন্দাবাদ করা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সংগীত পরিচালকদের কিরকম পরিস্থিতির মধ্যে কাজ ক'রে যেতে হয় সে সম্বন্ধে সাধারণ শ্রোতা বা দর্শকেরা জানতে পারেন না। দু'চারজন সংগীত পরিচালক যাঁরা জীবনে ভাগ্যক্রমে যশ ও সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছেন, শুধু তাঁরাই নির্বিঘ্নে তাঁদের প্রতিভা এবং শিল্প-মনের পরিচয় লোক সমক্ষে প্রকাশ করবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে থাকেন। আর বাকী অন্য সমস্ত সংগীত পরিচালকেরা কাজ করেন শত অসুবিধা, অভাব ও অভিযোগের মধ্যে। যে রকম ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে তাঁদের কাজ করে যেতে হয়, তা স্বাধীনভাবে নিজের দক্ষতা কিংবা বিশেষত্ব প্রকাশের পক্ষে অনুকূল নয় একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না।

বাঙলা ছবির গানে যে টাকা খরচ করা হয় তার পরিমাণ অত্যন্ত কম। গান এবং আবহ-সংগীত ছবির প্রাণ, কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তাকে আমাদের বাঙলা দেশের অধিকাংশ প্রযোজকই অনুভব করতে পারেন না। তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা খরচ করে যান—যে সব ক্ষেত্রে কম খরচ হলেও ক্ষতি হয় না, কি· সংগীতের ক্ষেত্রে টাকার খরচ একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও সে ব্যাপারে উপযুক্ত টাকা খরচ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত ও অসম্মত। এই খরচ কষাকষির ফলে ছায়াচিত্রের অনুষ্ঠানে তার সংগীতের অংশ (music) তার গুণ, বিশেষত্ব ও চমৎকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। সংগীত পরিচালকেরা পূর্ণ স্বাধীন নন। তাঁদেরও ওপরে
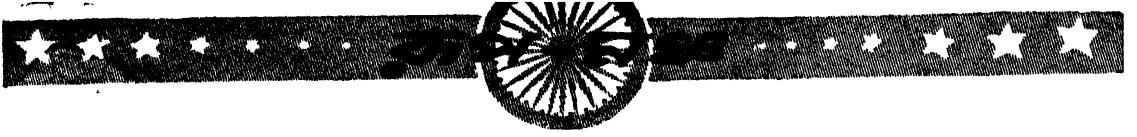
পরিচালক আছেন—তাঁরা হচ্ছেন ছায়াচিত্রের চিত্রপরিচালক এবং প্রযোজক! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকের নির্দেশমতে চলার জন্য সংগীত পরিচালকরা স্বাধীনভাবে কোন কিছু experiment অর্থাৎ গানের আবহসংগীতের কোন বিষয়কে পরীক্ষা করতে পারেন না। সংগীত পরিচালক হ'তে হলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক সে সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল জাগে।

চিত্রনাট্য, মঞ্চনাট্য বা বেতারনাট্য সমস্ত ক্ষেত্রেই সংগীত-পরিচালকের যদি সংগীতশাস্ত্রে অর্থাৎ উচ্চাংগের সংগীতে (classical music) গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকে তাহলে কোন মৌলিক সুরের সৃষ্টি করতে তিনি কখনই সক্ষম হবেন না। সংগীতের সুর রচনার কারবারে যাঁরা এই মূলধনটি সম্বলহীন হয়ে হাত দিয়েছেন, তাঁদের সব চেষ্টাই হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ কিংবা কতকগুলি হীন অনুকরণের সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। বিশেষ করে আবহ-সংগীতের ক্ষেত্রে এঁদের কাঁচা হাতের ছাপ বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ, আবহ-সংগীতের পূর্ণ এবং বিশেষরূপ শুধু তিনিই দিতে পারেন, যাঁর অন্তরে সংগীতছন্দের অন্তর্নিহিত ভাবাজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু তা একমাত্র উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা এবং তার অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই হওয়া সম্ভব, অন্য উপায়ে তার চেষ্টা করতে যাওয়া নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

প্রত্যেক দৃশ্যের একটি বিশেষ গতিছন্দ এবং ভাবধারা থাকে, যার নিগূঢ় রূপ এবং রসটিকে দর্শকমনের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে এবং নিকটে এনে দেওয়াই আবহসংগীতের কাজ। সংগে সংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, আবহ-সংগীতের ক্ষেত্রে কোনরকম কেরামতির স্থান নেই—যে কেরামতি দৃশ্যকে ছাপিয়ে নিজের অনাবশ্যক উপস্থিতিকে প্রকট করতে চায়। আবহসংগীতের দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে সেই ছবিই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হবে, যে ছবি দেখতে দেখতে ছবির গতির সংগে যে একটি সংগীতধারাও অচ্ছেদ্যভাবে বয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে দর্শকমন যেন কখনও সচেতন হয়ে ওঠে না। আখ্যানবস্তুর ধারাবাহিকতা ও তার অন্তর্গত গানগুলির মধ্যে গতির ঐক্য না থাকলে তার অভিনয় রসজ্ঞ দ্রষ্টার মনকে ক্লান্ত ও পীড়িত করে তুলবে। দেখা গেছে যে, উচ্চসংগীতে দখল থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সংগীত পরিচালক চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। এই বিফলতার কারণ কি? আমার মনে হয় যে, এসবের কারণ প্রধানতঃ দুটি। (১) সাধারণ দর্শকমন উচ্চাংগ সংগীতের যতটুকু নাগাল পান তাঁরা তার অতি বেশী উর্ধ্বে বিচরণ করেন। (২) দ্বিতীয়তঃ শিল্পীর গলার বৈশিষ্ট্য ও গায়কীর দিকে লক্ষ্য না রেখে সুর সৃজন ও গানের পর্দার (scale) ব্যবহার এবং বিশেষ শ্রেণীর গান বা দৃশ্যের আবশ্যকমত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রযোজন বোধের অভাব।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম কারণটি দায়ী ব'লে মনে হয়। দ্বিতীয়টি আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। মনে করুন, দেখা গেলো যে, একটি শিল্পীর গলায় চার পর্দার একটি মীড় বা সাত পর্দার একটি তানের মধ্য থেকে কোন একটি পর্দাকে উঠিয়ে দিলে শিল্পীর পক্ষে সুবিধা হয় এবং তাঁর কণ্ঠ মাধুর্য বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, কিংবা মুদারায় যেমন সহজে গলা খেলে, তারায় তেমন নয়, সে ক্ষেত্রে গোঁড়ামী বর্জন করে শিল্পীর কণ্ঠের বৈশিষ্ট্যকে মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তারপর ধরুন, ঝুমুর গান। সেখানে যদি গানের সংগত হিসাবে আপনি দশরকম বিভিন্ন যন্ত্রের সমাবেশ করেন, তাহলে ঝুমুর গানের প্রাণকে খাবি খাওয়ানো হয় না কি? বাকী রইলো বিশেষ দৃশ্যানুযায়ী বাদ্যযন্ত্রের সংযোগ। প্রত্যেক দৃশ্যেরই একটি মূল অর্থ থাকে আর তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে দৃশ্য পরিবর্তনের সংগে সংগেই আবহসংগীতের ঝোঁকেরও পরিবর্তন করা উচিত। সেই অনুসারে সময়ে সময়ে, বেহালা, বাঁশী, সারংগী প্রভৃতির প্রাধান্য, কখনও বা ক্লারিওনেট, স্যাক্সোফোন, পিয়ানো প্রভৃতিকে পুরোভাগে রেখে, আবার কখনও কখনও গিটার, সেতার, বীণ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকে কেন্দ্র ক'রে music রচনা করা অর্থাৎ সংগীতের সুরময় পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত।

গানের কথার মাঝে মাঝে music বা সুরপ্রবাহ রচনা করা হয় অর্থাৎ প্রারম্ভিক (Prelude) ও
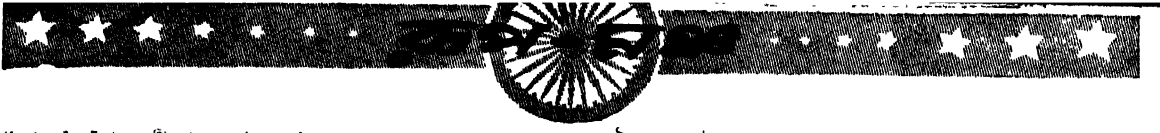
(interlude) সংগীতাংশ (music) রচনার সময়েও দৃশ্য ও গানের ভাব অনুযায়ী যান্ত্রিক সংগীতের পরিচালনা হওয়া উচিত।

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপে দেশে দেশে সামাজিক নীতি এবং আদর্শের যে বিকৃতি পরিবর্তন কিংবা সংস্কার ঘটে তার প্রভাব থেকে ভারতবর্ষের চিত্রজগৎ রেহাই পায়নি। কালো-বাজারে অসৎভাবে টাকা রোজগার করে সব সময়ে ঘরে রাখা নিরাপদ নয় বলেই হোক অথবা কালোবাজারের কাঁচা পয়সা চোখে যে ঘোর লাগায় তার উপর আরো কড়া রঙ চড়াবার জন্য এবং চিত্রনির্মাণ ব্যবসার দুর্নিবার আকর্ষণে—হঠাৎ একদল মহাজন ফিল্মব্যবসায়ের বাজারে দেখা দিলেন। সংগে সংগে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হল। চাহিদার অনুপাতে কাঁচা মালের সরবরাহ এবং ষ্টুডিওর সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং যে অমোঘ মন্ত্রের গুণে আজ তাঁরা মহাজনে (creditor) বা পুঁজিদার (capitalist) হয়ে বসেছেন, সেই মহামন্ত্রেরই প্রয়োগ এখানেও নির্বিচারে প্রচলিত হতে লাগল। সুরু হলো এক জঘন্য এবং নির্লজ্জ ঘুষের ব্যাপার এবং তাড়াহুড়োর পালা। চিত্রজগতের সকলে ভুলে গেলেন, চিত্রনির্মাণ কার্য কলাশিল্প সৃষ্টিপ্রতিভার অবদান। বাজারের মাল জোগান দেওয়ার মতন এই কাজ দোকানদারী কিংবা ব্যবসাদারীর ব্যাপার নয়। তাতে সরস্বতীর অর্চনা হয় না, বরং তাঁর মন্দিরের পথে ও প্রাংগনে জঞ্জালের স্তূপ জমা হয়ে বাণীমন্দিরের পূজারী ও তীর্থযাত্রীদের মনকে নিরাশ ও ব্যথিত করে তোলে।

প্রযোজকরূপে ভীড় করে আসলেন এই যে মহাজনগোষ্ঠি, তাঁদের বেশীর ভাগেরই শিক্ষা এবং সংস্কৃতি যে স্তরের তা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, "কলাশিল্প" কথাটির অস্তিত্বকেই তাঁরা স্বীকার করেন না। তার ওপর আবার এঁদের সংগে পরিচালকরূপে যাঁরা এলেন, তাঁদের অধিকাংশের নাম যদিও চিত্রজগতের কেউই আগে কখনও শোনেন নি, তাহলেও পরিচালকের আসন দাবী করবার জন্য তাঁদের যে পরিচয়পত্র তার অপূর্ব অভিনবত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাঁদের এই পরিচয়ে সাহিত্যিক কিংবা সাংগীতিক রসসৃষ্টি ও রসজ্ঞানের কোনই বালাই নেই। কেউ বা কোন প্রখ্যাত পরিচালকের বন্ধু হিসাবে কিছুদিন শুটিং দেখেছেন; কেউ বা কোন বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সংগে বহুদিন সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন; কেউবা ষ্টুডিওতে অনেকরকম মালের অর্ডার সাপ্লাই করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন; আবার কেউবা কাগজে বায়োস্কোপ সম্বন্ধে দু'একটি প্রবন্ধ লিখেছেন কিম্বা কোন মুরুব্বীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ ধরণের সাহিত্যিক হিসেবে নাম কিনেছেন।

আবশ্যক জ্ঞানের যেখানে সাধনার অভাব, সেখানেই সম্ভব হয় এইরকম মিথ্যাজ্ঞান এবং বাক্যাড়ম্বরের ছড়াছড়ি। এ সম্ভব হয় শুধু এ দেশেই, যেখানে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি কোন বিষয়েই কোন রকম চর্চা, অনুশীলন ও অধ্যয়ন না করেই হাজার হাজার বিশেষজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ গজিয়ে উঠছে। দু'চারজনকে বাদ দিয়ে এই যে তথাকথিত পরিচালকবৃন্দ, এঁরা যা বোঝেন না সেই বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে বিষয়টিকে করে তুল্লেন জটিল ও বিকৃত। কারণ, তাঁদের নিজস্ব অজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁরা একে-বারেই অচেতন। আলোক চিত্রকর, সম্পাদক, সংগীত পরি-চালক প্রভৃতি সবাইকে ব্যাপারটি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে—যা তঁদের ধারণার বাইরে—অথচ নিজেদের অজ্ঞতা সত্বেও তাঁরা ঐ বিষয়গুলিকে অসঙ্কোচে বোঝাতে চান রীতিমত সবজান্তার ভংগী দিয়ে। কারণ, নইলে তাঁদের সম্মান বজায় থাকেনা।

এ পর্যন্ত এসেও যদি তাঁরা একটু বুদ্ধি খরচ করে থেমে যেতেন, তাহলে হয়তো মন্দের ভাল হত; কিন্তু একটি মিথ্যা ঢাকতে যেমন আরো দশটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় তেমনি তাঁদের মিথ্যা বিজ্ঞতার জের শেষ পর্যন্ত টেনে চলা ছাড়া আর উপায় থাকেনা।

সংগীত পরিচালকের কথাই প্রথমে ধরা যাক। পরিচালক যা বোঝালেন তাতে সংগীতের দিক থেকে বিচারের ভুলটুকু বাদ দিয়ে এবং অভাবটুকু পূরণ ক'রে যখন গানটি শোনানো হল, তখন আপনার কি ধারণা যে পরিচালক মহাশয় একবারেই তাকে মেনে নিতে পারেন? তাকে টিকা-টীপ্পনী কেটে বুঝিয়ে দিতে হবেনা যে তিনি
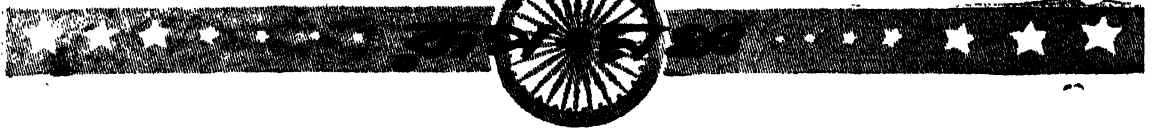
সংগীতের একজন অথরিটি কিম্বা যথার্থ সমঝদার? যা হোক তাঁর মন্তব্য (remarks) অনুসারে গানটিকে অদল বদল ক'রে আনা হল এবং এইবার তিনি তাঁর মনের কথাটি বলে ফেল্লেন—বল্লেন, "দেখুন! অমুক ছবিতে যে অমুক গানটি, ঠিক সেই রকম একটা করুন"। প্রথম বারেই নকল করতে বল্লে লোক তাঁর জ্ঞান এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে তো! অথচ তাঁর মস্তিষ্কে এই সামান্য কথাটুকু প্রবেশ করলো না যে, অনুকরণ যাঁরা করেন আর যাঁরা তা করতে উৎসাহ দেন, তাঁদের কাছ থেকে কেউই কোনদিন কোন সত্যিকারের সৃষ্টির আশা করেনা।

এ হেন পরিচালকবৃন্দের হাতে পড়ে ছায়াচিত্রশিল্পের যে সর্বাংগীন অবনতি ঘটবে তা আর বিচিত্র কি। কারণ, এঁরা মনে করেন, দর্জির কাছে সার্ট, পাঞ্জাবী কিম্বা ক্যাবিনেট মেকারের কাছে চেয়ার টেবিলের মতন সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞদের কাছ থেকেও কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক এ সমস্তই ফরমাস মতন তৈয়ারী করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ফরমাস অনুযায়ী তৈরী করা জিনিষে শিল্প (art) বলে কিছুই থাকেনা—ফরমাস পাওয়া গান, কবিতা, নাটক এ সমস্ত শিল্প-কলার বাজারে আবর্জনা মাত্র।

কালোবাজারের রোজগার করা অর্থরাশির দৌলতে যে, ছবির বন্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঘাত টান ধরিয়েছিল, তা আবার উচ্ছল হয়ে ওঠবার উপক্রম করছে ব'লে মনে হয়। কবে এ সব অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারের শেষ হবে তা কিছুই বলা যায় না। তবে যতশীঘ্র তা শেষ হয় ততই ছায়াচিত্রশিল্প, সমাজ ও দেশের পক্ষে ভাল।

প্রকৃত নৈপুণ্যশালী ছায়াচিত্র পরিচালকগণের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, তাঁরা যেন সংগীত পরিচালককে কাজে হাত দেবার পূর্বে নাটকের আখ্যানবস্তু বা কাহিনীটি আগাগোড়া একবার পড়ে দেন এবং সংগীত পরিচালকদের যা বক্তব্য তা যেন আরেকটু তাঁদের (সংগীত পরিচালকদের) দৃষ্টিভংগী থেকে বোঝবার কিম্বা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন।

তাঁদের প্রতি আমার দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, শুধু দু'তিন জন প্রসিদ্ধ সংগীত পরিচালকেরই ওপর আর নির্ভর না ক'রে নবীন কর্মীদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত গুণী তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হতে যেন সাহায্য করেন। ছায়াচিত্রশিল্পের সব দিকেই লাভ। প্রথমত 'ফিল্মীগানে' যে একঘেয়েমী ও প্রাণহীনতা এসে পড়েছে তা দূর হবে; এবং দ্বিতীয়ত তা থেকে টাকা খরচেরও অনেক লাঘব হবে।

যুদ্ধের কল্যাণে ছায়াচিত্র জগতে কয়েকটি নবীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংগে সংগে কয়েকটি নবীন সংগীত পরিচালকের আগমন হয়েছে। যুদ্ধের চাপে পড়ে যা হলো তা যদি স্বাভাবিকভাবে হতো অর্থাৎ যুদ্ধকালীন চাহিদা যখন নামকরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, সংগীত পরিচালকগণের দাবীকে এতই গগনস্পর্শী ক'রে তুলেছিল যে, তাতে অনেক কালোবাজারধর্মী পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন। কেবল তখনি নবীনের আবির্ভাব না হয়ে, যদি আগে থেকেই একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা অনুসারে নবীনের সন্ধান এবং নিয়োগ করানো হতো, তা হলে বাঙলা ছবি নির্মাণের অংকটি যে মারাত্মকরূপে স্ফীত হয়ে উঠেছে তার কোন সুযোগই ঘটতো না।

আমার তৃতীয় নিবেদন শব্দযন্ত্রীদের সম্পর্কে। যথার্থ শব্দযন্ত্রী যিনি, তাঁর সুরের গভীর অনুভূতি থাকবেই। কিন্তু যেখানে সেই অনুভূতি অনুপস্থিত, সেখানে যেন সংগীত পরিচালককে আর একটু স্বাধীনতা দেওয়া হয়। জটিলতার সৃষ্টি হয় সেখানেই, যেখানে একটি নবীন সংগীত পরিচালকের সংগে একটি প্রবীণ শব্দযন্ত্রীর সংযোগ ঘটে। গোড়া থেকেই আমাদের শব্দযন্ত্রী মহাশয় এমন সমস্ত বৈজ্ঞানিক এবং সাঙ্কেতিক পরিভাষার অবতারণা করেন যে, বেচারা নবীন সংগীত পরিচালক রীতিমত ভীত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং ফলে তাঁর কাজের প্রতি পদক্ষেপে সংকোচ ও দ্বিধা এসে উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থার উদ্ভব যাতে কোনমতে না হয়, সে বিষয়ে পরিচালকগণের সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। শব্দযন্ত্রীরা যদি সহানুভূতির সংগে তাঁদের পরামর্শ এবং সহযোগিতার দ্বারা সংগীত পরিচালককে সাহায্য করেন, তা হলে কাজ ভাল হবেই।

আর একটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করবো। বাঙলা দেশের যে তিনটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীত পরিচালকের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে—রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক ও কমল দাশগুপ্ত—এঁদের সকলেরই প্রসিদ্ধির একটি প্রধান কারণ এই যে, এঁদের তিনজনের প্রত্যেকেরই একটি ক'রে ভাল যন্ত্রীসংঘকে নিজের ইচ্ছা এবং আবশ্যক মত ব্যবহার করবার পূর্ণসুযোগ আছে। নব নব কল্পনার উদয়ের সংগে সংগেই সেই সমস্ত কল্পনার বহুবিধ গবেষণা-মূলক পরীক্ষার উপায়ও তাঁদের হাতের কাছে বর্তমান।

প্রায় দু'বছর থেকে কয়েকটি স্বাধীন যন্ত্রীসংঘ গড়ে ওঠায় বাদ্যযন্ত্রকারেব অভাব-সমস্যার আংশিক সমাধান হয়েছে। কিন্তু তাও যা হয়েছে, মাত্র যেটুকু একান্ত না হলে নয় সেই অংশটুকুরই সমাধান এবং তার একটুও বেশী নয়। মূল কথাটি হলো, যতক্ষণ মনের মতন না হয় ততক্ষণ মহলা (rehearsal) দেওয়ানো এই দুইটি স্বাধীন যন্ত্রীসংঘের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা একই সময়ে বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থাকায়, মহলা দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট অবসর তাঁদের হয় না। এই জন্য ষ্টুডিও স্বত্বাধিকারীদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ যে, তাঁরা যদি নিউ থিয়েটার্সের মত নাও পারেন, যে যন্ত্রগুলি অত্যাবশ্যক, সেই কয়টির বাদ্যকারদের নিয়ে অন্ততঃ যেন তার একটা কাঠামো খাড়া করেন। এই চেষ্টার ফলে ছবির সংগীতাংশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি তো হবেই, উপরন্তু পরিশেষে দেখা যাবে যে, সংগীতের দরুণ যে খরচ, তারও পরিমাণ কিছু কমে এসে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় সংগ্রামে জাতীয় সংগীত ও নাট্যের অবদান

সুকৃতি সেন

নতুন জাগরণ, নতুন উদ্দীপনা, নতুন রঙ ছড়িয়ে গেল এ-যুগের মানুষের মনে মনে। বিদ্রোহ জাগাল হৃদয়ে হৃদয়ে বহ্নিশিখা—সাহিত্যিকের ভাষায়, চিত্রকরের বর্ণলীলায়, গায়কের কণ্ঠে, সংগীতের ঝঙ্কারে জাগল নতুন দোলা, নতুন উদ্দীপনা। সুরস্রষ্টা সুকৃতি সেন নবযুগের নবজাগরণের সুরে বাঙলার আকাশ-বাতাসে সাড়া এনে দিয়েছেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রথম যখন শুরু হয় তখন জাতি তার রূপকে প্রথম দেখেছিল নাটকের মধ্য দিয়ে; আর উপলব্ধি করেছিলো সংগীতের ভেতর দিয়ে। রংগমঞ্চ, নাট্যশালা অথবা নাটকীয়-সংসর্গের কথা মনে হ'লে আজ দেশের অনেকেই হয়ত নাক সিট্‌কাবেন, কিন্তু একথা সত্য যে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত যে যুগ, তা' সাহিত্যিকের যুগ বলে সুপরিচিত; রাজনীতি এবং জাতীয়তার উদ্যোগ পর্বে যে তিনজন গ্রন্থকারের অবদানে বাঙলা দেশের জনশক্তি গ'ড়ে ওঠে, তার মধ্যে 'নীলদর্পণে'র নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র আর হেমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রমুখও তাঁদের সমকক্ষতা ক'রেছেন। ১৮৫৯ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী' কাব্যে ভীম সিংহের মুখে নিম্নলিখিত বাণী আরোপিত ক'রে দেশবাসীকে উদ্দীপিত করেন—

> "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
> কে বাঁচিতে চায়,
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
> কে পরিবে পায়।"

ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' নাটক রচনা ক'রে তৎকালীন সমস্যাগুলো সকলের সামনে এনে ধ'রেছিলেন। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাটকখানি প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু তখন ঢাকায় সরকারী কার্যোপলক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে ঢাকার একাধিক স্থানে এই নাটকখানি অভিনীত হয়। নীলকরের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলা দেশে এই ধরণের নাটক যে লোককে কী পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা' সহজেই অনুমেয়। দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বে প্রকাশ্যভাবে যে সহৃদয় দেশ সেবক কৃষককুলের দুর্দশায় কাতর হ'য়ে সর্বদা স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট ও লর্ড ক্যানিংকে উদ্বুদ্ধ ক'রে জাতির আশীর্বাদ ভাজন হন—সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম হরিশ মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে আর্চিবল্ড হিল্‌স্ নামক জনৈক নীলকর—'হরমণি' নামে কোন এক কৃষক রমণীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে জল আনবার সময় জোর করে হরমণিকে তার নিজের কুঠিতে নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ ক'রে রাখে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রে পাল্কী ক'রে বিদায় দেয়। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই খবর বে'র হবার পরই হিল্‌স্ হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামে নালিশ করে। এই হিল্‌স্ ও হরমণি 'নীল দর্পণ' নাটকের—'রোগ' ও 'ক্ষেত্রমণি।' ওদিকে রেঃ জেম্‌স্ লঙ্ নামে একজন মহানুভব পাদরী 'নীলদর্পণে'র ভূমিকা লিখে দিয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। হরিশ মুখোপাধ্যায় অকালে মারা যান। তখন দেশবাসী আক্ষেপ করে গান গাইত—

> "হায়রে ভাই প্রজার এবার প্রাণ বাঁচান ভার
> অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হ'ল কারাগার
> নীল বাঁদরে সোনার বাঙলা
> করলে এবার ছারে খার।"

এই 'নীল দর্পণ' নাটকের প্রভাবেই নীলকরদের অত্যাচার
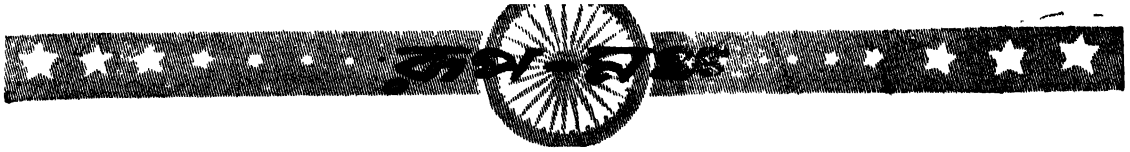
সম্বন্ধে দেশবাসী সচেতন হ'য়ে ওঠে আর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি কথাই তৎকালীন অবস্থার একটী উজ্জল চিত্র। তিনি লিখেছেন—"যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ 'নীল দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হ'ল। নাটকখানি বঙ্গসমাজে কী মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে অভিনয়, ভূমিকম্পের ন্যায় এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলেই নীলকরের অত্যাচার বঙ্গদেশ হইতে জন্মের মত বিদায় নিল।"

বস্তুতঃ এই নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অভিযানই বৃটীশ শাসন কায়েম হ'বার পর প্রথম জাতীয় আন্দোলন। এবং তা' এসেছিলো 'নীল-দর্পণ' নাটকের ভেতর দিয়েই এবং সে আন্দোলন হ'য়েছিল সার্থক। যথাযোগ্য কারণ ও আন্দোলন হ'লে বাংলার শক্তি যে অতঃপর কিরূপ অসাধ্য সাধন ক'রেছে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং ১৯২১ সালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় বাহিনীর সাফল্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জাতীয় নাট্যশালা'র (National Theatre) পরিকল্পনা ও নামকরণ প্রথম করেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের জাতীয়তা দীনবন্ধুরও অগ্রগামী এবং তাঁর 'ভীমসিংহ' ও 'মেঘনাদ' যেমন প্রকৃষ্ট জাতীয় চরিত্র তেমনি "একেই কি বলে সভ্যতা" নামক প্রহসনেও জাতীয়তা যেন ভেসে উঠেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র। জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,—"তত্ত্ববোধিনীর আমল হইতেই প্রকৃত পক্ষে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় উহাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্ব্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দু মেলার পরিকল্পনা করিয়া এবং এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয় উহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া এই স্বদেশী ভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বল সঞ্চার করিয়াছিলেন।"

১৮৬৭ সালে এই হিন্দু মেলার প্রথম সূচনা হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে'ও একটী স্বদেশী সমিতি ছিল। এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে আর এর সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় মাঝে মাঝে আসতেন। রাজনারায়ণ বাবুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সংগে হাত নাড়িয়া তিনি আমাদের সংগে গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না, গাহিতেন—

এক সুত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

(গানটি জ্যোতিরীন্দ্রনাথের রচনা)

এই 'হিন্দু মেলা' থেকে বাংলা দেশে জাতীয়তার বন্যা আসে। এই মেলায় প্রবন্ধ পাঠ হ'ত, জাতীয়ভাবে উদ্দীপক কবিতা ও গান হ'ত। প্রথম মেলার উদ্বোধনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গানটী গীত হয়—

"মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনোপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান ?
হোক ভারতের জয়

জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়।"

পরের বারের মেলাতে জ্যোতিরীন্দ্রনাথ আঠারো বছর বয়সে নিম্নলিখিত গানটী রচনা করেন,—

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ
র'বে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন।
দেখ দেখি জননীর দশা একবার
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর অস্থি চর্ম্মসার।
অধীনতা অজ্ঞানতা রাক্ষস দুর্জ্জয়
শুষিছে শোণিত তার বিদরি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
ঐ দেখ কাঁদিছেন জননী বিহ্বলা;
গুমরিয়া কতকাল থাকিবে অবলা?"

'হিন্দু মেলা'র সম্পাদক গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা ও আত্মনির্ভর শিক্ষা দেওয়াই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কারও মুখে 'স্বাধীনতা' কথাটারও অস্ফুট ধ্বনি হ'য়েছিল। এই হিন্দু মেলা উপলক্ষ্য করেই মনোমোহন বসুর জাতীয় সংগীত রচিত হয়—

"দীনের দীন সবার দীন
ভারত হোল পরাধীন
তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা জাতি ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

যে বছরে 'হিন্দু মেলা'র শুভ উদ্বোধন হয়, সে বছরেই কয়েক মাস পরে গিরিশচন্দ্র কলিকাতা বাগবাজার পল্লী অঞ্চলে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় ক'রে সেখানকার অধিবাসীদের মুগ্ধ করেন। এরই দুই অথবা তিন বছরের মধ্যেই গিরিশ সম্প্রদায় "ন্যাশনাল থিয়েটার" নাম পরিগ্রহ করে ১৮৭১ সালে। থিয়েটারের 'ন্যাশনাল' নামটীও ন্যাশনাল নবগোপালের দেওয়া নাম। এর আগে তিনি 'ন্যাশনাল পেপার' প্রচলন করেন এবং দেশীয় অনুষ্ঠানাদিকে 'ন্যাশনাল' নামে অভিহিত করতে ভাল বাসতেন। তাই লোকে তাঁকে 'ন্যাশনাল নবগোপাল' আখ্যা দিয়েছিল। জাতীয় নাট্যশালা ক্রমে 'পাবলিক' হ'য়ে সাধারণের কাছে পয়সা নিয়ে থিয়েটার দেখাবার ব্যবস্থা করে। সেখানেও 'নীল-দর্পণ' নাটকই প্রথম আরম্ভ হয়। নীলকরের অত্যাচার এর আগেই বন্ধ হ'য়েছিল তাই ঢাকায় অভিনীত হ'বার বার বছর পরে ক'লকাতার অভিনয়ে খুব বেশী একটা সাড়া জাগেনি। সেই সময় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত-সংগীত" বজ্র নির্ঘোষে নিনাদিত হোত। বেশীর ভাগ ছাত্র, শিক্ষক ও যুবকের মুখে মুখে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে বেজে উঠ্‌ত—

"বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে—
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মনের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥"

সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল থিয়েটার'ও প্রচারের বিশেষ সহায়ক অস্ত্র হ'য়ে উঠল। এই সময়ে 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় 'ভারতমাতা' নামে একখণ্ড কাব্য রচনা করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' সেই নাটিকা অভিনীত হয়। 'ভারত-মাতা' সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু বলেন—

"এই সময়ে শহরে একটা বিষয়ের অল্পে অল্পে আদর হচ্ছিল, সেটা স্বদেশহিতৈষিতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। ন্যাশন্যাল নবগোপালের হিন্দুমেলা-টেলা উপলক্ষে নবগোপাল মনোমোহন বসুর বক্তৃতাদিতেই ঐ সকল কথার আলোচনা হ'ত, তখন হেমবাবুর ভারত-সংগীত নূতন রচিত হ'য়েছে। তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমার' গানটি নূতন রচিত হ'য়েছে। এই সময়ে আমরা ন্যাশনাল থিয়েটারে 'ভারত-মাতা' বলে ছোট খাট একটা দৃশ্য দিলাম। এই 'ভারত মাতার' অভিনয়

— সুনন্দা দেবী —

— শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার —

আভিজাত্য—শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও উচ্চাদর্শ নিয়ে বাংলার চিত্রজগতে শীঘ্রই এই প্রিয়দর্শন যুবক প্রযোজক, অভিনেতা, এবং পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। স্বকীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য বর্তমানে একটী সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।
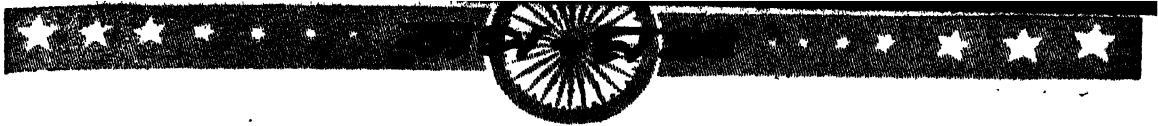
বড় শুভক্ষণে আরম্ভ হ'য়েছিল। সাধারণে বিষয়টী appreciate করলে। 'ভারত মাতার' ক'খানা প্রচলিত গান ছিল, সেগুলোর আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের যেদিন 'ভারত মাতার' অভিনয় না হোত সেদিন দর্শকের তুষ্টির জন্য পরিশেষে 'ভারত সংগীত' বলে বিজ্ঞাপন দিতে হোত।"

'ভারত মাতার' পরে ন্যাশনাল থিয়েটারে জাতীয়তা মূলক একাধিক নাটকের অভিনয় হয়। তার মধ্যে ১৮৭৪ সালের জ্যোতিরীন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' ও হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' ১৮৭৫ সালে 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক (উভয় নাটকই উপেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক রচিত) এবং অমৃতলাল বসু মহাশয়ের 'হীরক চুর্ণ নাটক'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রনাথ দাস 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' উভয় নাটকেই তিনি দর্শকবৃন্দকে নানারূপে জাতীয়তামূলক উক্তিতে উদ্দীপিত ক'রেছিলেন। নাটকটীর কোন কোন জায়গায় ফোর্ট উইলিয়ামের প্রতি কটাক্ষও ছিল। এই সমস্ত নাটক ও অভিনয় তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের আদৌ পছন্দ ছিল না।

এইভাবে গত যুগের দেশসেবকেরা নাটক ও সংগীতের ভিতর দিয়ে জাতীয় আন্দোলন সুরু ক'রে তাঁদের পরবর্তী কালের সেবকদের পথ দেখিয়ে গেছেন। বরিশালের অশ্বিনী দত্ত কত জাতীয় সংগীত রচনা করে যে প্রচার করেছেন তার তুলনা নেই। সেই সব গানের সুরে সুরে জাতীয়তার বীজ লোকের মনে বপণ ক'রে দিত। সেই সময়ের দেশের একনিষ্ঠ সেবক মুকুন্দ দাস-এর কথা আজও মনে পড়ে। তাঁর 'মাতৃপূজা' প্রভৃতি নাটকও প্রচুর জাতীয় সংগীত লোকের চিন্তাধারাকে বিপ্লবী করে তুলত' —কাজে উৎসাহ জাগাত—

"সাবধান সাবধান
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান"

'বিচারকে' নবাগত দেবীপ্রসাদ

গানটী অত্যাচারিত ভারতবাসীর মনে অপূর্ব বল ও ভরসা জাগাত।

"করমেরি যুগ এসেছে
সবাই কাজে লেগেছে
মোরা শুধু রব কি শয়নে?"

উপরোক্ত মুকুন্দদাসের এই গানটী গাইতে গাইতে দেশ-সেবকেরা সানন্দে কাজ ক'রে যেতেন। কান্তকবি রজনী-কান্ত সেনের—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

অথবা—

"আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট"

গানগুলি লোককে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ক'রেছে। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' দেশের বুকে যে সাড়া জাগিয়ে ছিল বিশ্বকবির—

কারণ, দৃশ্যপট প্রভৃতিতে চিত্রকলার ব্যবহারকে সমগ্র অনুষ্ঠানের সহিত যোগ রক্ষা করতে হয়। চিত্রকলার সাহায্যে পৃষ্ঠপটে যে বর্ণ ব্যবহার করা হয় সমস্ত অনুষ্ঠানের সহিত উহার সামঞ্জস্য না থাকলে ব্যাপারটি অসংলগ্ন ও বিরোধমূলক হয়ে পড়ে। অপরদিকে ভাস্কর্য সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের শরীর সঞ্চালনের ও সমাবেশের কারুতা ফলিত করা যায় না। কোন অবস্থায় বা কি'ভাবে দেহ বা অংগপ্রত্যংগের বিন্যাস দরকার সে সম্বন্ধে শিল্পীদের প্রচুর সাবধান হ'তে হয়। ইউরোপীয় মঞ্চে প্রতি পদক্ষেপের ভংগী প্রতি হস্তবিক্ষেপের কায়দা গোড়াতেই সুষ্ঠুভাবে চিন্তিত হয়—এলোমেলো বা যা খুসী তা কোন রকমে যখন তখন কিছু করা হয় না।

অপরদিকে স্থাপত্য সম্বন্ধে ধারণাও সুষ্ঠু না হলে মঞ্চের গঠন, সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনের শ্রীকে অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমগ্র মঞ্চ ও তদুপরি বিন্যস্ত দৃশ্য-সমাবেশকে সংহত ও ছন্দবৃত্ত করতে হ'লে নিপুণ সৌন্দর্য-জ্ঞান প্রয়োজন। এসব ছাড়া বাক্যপ্রয়োগে কবিতা বা কাব্যকলার আশ্রয় ত' নিতেই হবে। ধ্বন্যাত্মক ও বাদ্যাত্মক সংগীতকলা ইদানীং কোন কোন শ্রেণীর নাট্যাভিনয়েত' মুখ্য ব্যাপার হয়েছে। কাজেই সমস্ত কলাগুলির একটা বিরাট সংগম হয় নাট্যকলায়। এক্ষেত্রে যাদের এ সমস্ত কলা সম্বন্ধে নিবিড় জ্ঞান না থাকে তাদের পক্ষে নকল করা সম্ভব হ'লেও মৌলিক কিছু দান করা চলে না। আবার নকল করার বিপদও প্রচুর—না বুঝে কিছু প্রয়োগ করলে তা' অনেক সময় আত্মবিরোধী ও হাস্যজনক হয়ে পড়ে। নাট্যকলায় যোজন বা প্রয়োগ করার জ্ঞান শুধু সকল কলায় পারদর্শির পক্ষেই সম্ভব।

নাট্যের ভিতরকার ঘটনাগুলির মুখ্য 'যা' প্রতিপাদ্য 'তা' হিসেব করেই সব কিছু রচনা সংহত করতে হয়। 'বীর' রসের দ্যোতক কোন ব্যাপার মঞ্চে উপস্থিত করতে হলে সে রসের অনুকূল বর্ণাদি ব্যবহার করতে হয়। তখন লাল রঙের বিচিত্র সমাবেশে রসশ্রীকে একছন্দে উদ্ঘাটন করতে হয়। হলদে রঙ এই অবস্থার অনুকূল নয়। ইউরোপের সংস্কৃত (Reform) থিয়েটারে এবং জাপানের থিয়েটারে এইভাবে Symbolic (সাংকেতিক) বর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। আবার করুণ রসাত্মক কোন দৃশ্যে যে সংগীত বা বাদ্য হবে তাও কণ্ঠরসাত্মক হওয়া প্রয়োজন। দৃশ্যাদির বর্ণ-সমাবেশ এই ভাবেরই অনুকূল হওয়া দরকার—না হয় সব কিছু হয়ে পড়্‌বে আত্মবিরোধী, অসুন্দর ও হাস্যজনক।

এসব কথা বলতে হচ্ছে এজন্য যে, এদেশের বিলিতী অনুকরণে রচিত নাট্যমঞ্চে রসগত কোন হিসেব নেই বল্‌লেই চলে। যখন তখন যা' তা' একযোগে প্রয়োগ করা হয় যাতে aesthetic synthesis বা সৌন্দর্যের সমন্বয় একেবারে নষ্ট হয়। এক বিবাহভোজে ভারতীয় গৃহস্বামী ব্যাণ্ড বাজনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে ইউরোপীয় অনেক ভদ্রলোকও আমন্ত্রিত হয়। হঠাৎ ব্যাণ্ডের বাজনা শুনে তাঁরা শিহরিত ও আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েন। কারণ ব্যাণ্ড-ওয়ালারা হঠাৎ এমন তান তুলেছিল যা বিবাহের উৎসবে এরকম বাদ্যঝঙ্কার যারা বোঝে, তাদের নিকট একেবারে বীভৎস মনে হতে বাধ্য। এসব বিষয়ে এদেশের হুঁস নেই বললেই চলে। একটা কিছু বাজনা হলেই হ'ল—এই হচ্ছে মনোভাব। রঙ্গমঞ্চেও একটা কিছু হৈ চৈ হলেই এদের মতে যথেষ্ট। ফলে পরধর্ম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ভারতীয় নাট্যমঞ্চে। এদেশে কোন reform theatre নেইও—হয়নি বল্‌লেই চলে। সকলেই মামুলি পথে অগ্রসর হতে অভ্যস্ত হয়েছে।

রুশিয়ার Kerensky রঙ্গমঞ্চের একটি প্রসংগ এখানে না তুললে ব্যাপারটির আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়। বস্তুতঃ ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের হেরফেরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সেগুলির গঠন প্রণালীর সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান না থাকলে প্রচলিত নাট্যমঞ্চের যথার্থ রসকৃতিত্বের মূল সূত্রই ধরা যায় না। যে দেশে পৃষ্ঠপটের (background) ব্যবস্থা আছে কোন বিশিষ্ট আবেষ্টন সম্বন্ধে একটা প্রাকৃতিক illusion সৃষ্টি করতে, সে দেশ এরূপ বঞ্চনাকে নাট্যকলার অপরিহার্য অংগ বলে মনে করে। যারা এরকম কৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপস্থিত করা বাতুলতা মনে করে, তাদের এই backgroundকে অন্য উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে হয়।

কারণ সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে পেছন দিকটা একেবারে ফাঁকা রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। রুশিয়ার Kerensky থিয়েটারে তাই এ পেছনকার পট কতগুলি নানাভংগীর রেখাজালে রচিত হয়। কতকগুলি বিরাট দীর্ঘ অসংখ্য সরল রেখা এক জায়গায়—অন্যজায়গায় চাকার মত পৌনঃপুনিক অসংখ্য বংকিম রেখা—আবার অন্যত্র কোণের (angle) আকারে সজ্জিত আরও কতকগুলি রেখার একটা ধূমকেতু রচনা করা হয় অতি নিপুণ ভাবে। যখন অভিনেতারা সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে, তখন তাদের দেহের ও অংগপ্রত্যংগের রেখাগুলি যাতে পেছনকার এই আলংকারিক রেখাসমূহের সহিত খাপ খায় তবেই অতি সুনিপুণ ব্যবস্থা হয়। না হ'লে পেছনকার চিত্রিত দৃশ্যের মুখ্য ছন্দের বর্ণ ও রেখার লীলায়িত সুষমার সহিত অভিনেতাদের প্রক্ষিপ্ত দেহসীমার খাপছাড়া বিরোধ (discord) সৃষ্টি করতে বাধ্য। এ সমস্ত কারণে পেছনকার দৃশ্যপট "aesthetic synthesis" বা সৌন্দর্যের সুসংগতি নষ্ট করে। এজন্য এ পৃষ্ঠ পটকে হয়ত একেবারে বর্জন করতে হয়—না হয় তাকে "abstract বা symbolic" করতে হয়। বস্তুতন্ত্র যাথার্থ্য (realism) এসব জায়গায় নানা কারণে খাপ খায় না।

এই যে মান্ধাতার আমলের 'Early Italian' ষ্টেজ এদেশে এখানকার সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত মঞ্চের অনুকরণে করে তৈরী হয় তা' আর কেউ বদলায় নি এই একশ বছরে। ইউরোপে আরও জটিল যান্ত্রিক মঞ্চ হয়েছে কিন্তু এদেশে সে সব প্রবর্তিত হয় নি বললেও চলে। কাজেই ইউরোপে উত্তরোত্তর যে সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে, শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীর পরবর্তী আমল পর্যন্ত সে সব কেউ খোঁজ ও রাখেনি কিম্বা কোন প্রকারে খবর পৌঁছলেও এদেশে প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তাও কেউ অনুভব করেনি। কাজেই এদেশের নাট্য মঞ্চের দান না স্বর্গে না মর্তে! এখানকার মঞ্চ হয়েছে ইউরোপের বর্জিত একটা আবর্জনা স্তূপ। সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ও সংস্কার হয়েছে—কিন্তু রঙ্গমঞ্চকে এতকাল পতিতদের ক্ষেত্র মনে করেছে সাধারণ সামাজিক বুদ্ধি এবং এখানে যারা ঢুকেছে তাদের নিজেদের শিক্ষা বা ধীশক্তির গৌরব কোন কালেই কেউ করে নি।

ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, এদেশে প্রতীচ্য মঞ্চের পরবর্তী পরিবর্তনগুলি কেউ গ্রহণ করতে পারে নি। ইউরোপের ক্যাবেরেট মঞ্চে (cabaret) কোন রকম মূল্যবান আসবাবও কেউ রাখেনা। একখানা টেবিলের চারিদিকে কয়েকখানা চেয়ার রেখেও নাটক করা হয় সকলের মাঝখানে। আবার কখন ও বা অভিনেতাদের বাদ দিয়ে শুধু পুতুলের সাহায্যেও নাটক অভিনীত হয়েছে। কারণ, নাটকের মুখ্য লক্ষ্য যা, তাকে সমস্ত বাহুল্য ছেড়েও সফল ভাবে সম্পন্ন করা যায়। "হ্যামলেট" নাটক ইউরোপে পুতুলের সাহায্যেও অভিনয় করা হয়েছে। অভিনেতার অভিনয়কে শাসন করা মুস্কিল, সে সহজেই অত্যুক্তি বা অলৌকিক করে থাকে—তাই অভিনয়ের অংগহানি হয়। অথচ পুতুলের পক্ষে কোন রকম বাড়াবাড়ি বা লম্ফঝম্ফ সম্ভব হয় না। এজন্য পুতুলের দ্বারা অভিনয় বিপদ সঙ্কুল নয়। কাজেই এর মূল্য যথেষ্ট।

এদেশে প্রচলিত বিলিতী রঙ্গমঞ্চের পক্ককেশ সংস্করণকে বর্জন করতে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউই সাহস করেনি। কতকগুলি কাঠের কাঠামো রাশিরাশি ক্যানভাসে আঁকা বাজে দৃশ্য, কাপড়চোপরের অস্বাভাবিক আড়ম্বর এবং ছেলেমানুষি সাজগোজ এ না হলে থিয়েটার হয় না এ ছিল সকলের বিশ্বাস। আজ পর্যন্ত সখের থিয়টার গুলিও এ রকম উদ্ভট পথে চলে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত মঞ্চে এসব কৃত্রিম আড়ম্বর একেবারে দূর করা হয়েছে। একেবারে ভারতীয়, চৈনিক বা জাপানী অংকনের অনুকরণও ঠাকুরমঞ্চে নেই। বিসর্জনের গোড়াকার অভিনয়ের Setting এর সারল্য লক্ষ্য করার বিষয়। সিন্দবাদের দ্বন্দ্বে বোঝা তাতে অনেক কমান হয়েছিল এমন সময়, যখন দেশের ব্যবসায়ী থিয়েটারগুলো বিলিতী মঞ্চের আবর্জনা মাথায় নিয়ে নৃত্য করতে লজ্জিত হয় নি।

তা'ছাড়া বিসর্জনের প্রাথমিক উপস্থাপনে ব্যক্তিগত অভিনয় কৃত্যের রসকৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। রঘুপতির অংশ প্রতিফলনে রবীন্দ্রনাথের কায়দা ছিল অনুকরণীয়।

ব্যবসায়ী অভিনেতাদের কৃত্রিম বাগাড়ম্বর বা উদ্ভট আস্ফালন মোটেই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সংযমের ভিতর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে মূর্তিমান করেন অবলীলাক্রমে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের রঘুপতি অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, শুধু রঘুপতির চেহারা দেখেই তাঁদের ভয় হ'ত—এমনি আলঙ্কারিক ঐশ্বর্যে নিজেকে তিনি রূপান্তরিত করতেন। শুধু চিৎকারে বা ভীষণ দাপটে যাত্রাগারে যেমন ভীমের অভিনয় এদেশে হত বা সেক্সপীয়রের আমলে ইউরোপে Hercules এর চরিত্র অভিনীত হত—তাতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য রচিত হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্রটির দৃঢ় পটভূমি এবং জটিল মনের গোলোক ধাঁধাঁকে উপস্থিত করান কখনও সহজ হয়নি। রবীন্দ্রনাথই এই দেশের মঞ্চে গভীর প্রাণ বৈচিত্র্য ও চরিত্রের কুটিল কুঞ্চন এবং ব্যবহারের অকুণ্ঠ ও উদ্দাম ঐশ্বর্যকে প্রকাশের পথে বাধামুক্ত করেন।

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বাল্মীকিরূপে কবির আবির্ভাব বাংলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। এ রকমের চরিত্র এদেশের আধুনিক অর্থাৎ ইংরাজ আমলের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় নি। এযুগে কবির ভূমিকায় দৃশ্যপটের সামনে অবতরণের ও অনিয়মের কোন ঘটনা চক্ষুগোচর হয় নি—যদিও রাজারাণী, প্রেমিক ও ভণ্ডের, বীর ও তপস্বীর চরিত্র খুবই অভিনীত হয়েছে। বাল্মীকি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ অংগভংগী, মুগ্ধকর মুখরাগ, সজ্জার সৌম্যলীলা স্মরণীয় ব্যাপার। যাত্রাগানের আলঙ্কারিক চপলতা বা ব্যবসায়ী থিয়েটারের স্থূল বোধশক্তি এ রকম চরিত্রকে প্রাণদান করতে পারে নি। কবিতার মতই কবির এ অভিনয় হয়েছিল লিরিক লোকাতীত রসমূর্চ্ছানায় ভরপুর এবং নিবিড় করুণায় রূপোজ্জ্বল! রবীন্দ্রনাথের সংগে ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য যাঁরা এ অভিনয়ে যোগদান করেন, তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের বেগবান সৌন্দর্য স্রোতের লীলায়িত ছন্দে আত্মসমর্পণ করেন।

রবীন্দ্র রঙ্গমঞ্চেও অন্যান্য রূপাধ্যায়গুলিরও আলোচনা প্রয়োজন এবং অন্ততঃ মুখ্য কয়েকটি সৃষ্টির বিষয়ও বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়ার যোগ্য। কবিবরের নাট্যরচনা ও প্রাক্তন প্রত্নতত্ত্ব ছেড়ে উত্তরোত্তর স্বাধীন স্বাতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। ইউরোপের মনোভংগী যেমন সমগ্র নাট্য-সাহিত্যকে প্রাচীন ভিত্তি হ'তে উৎখাত করে' নবনব রসতীর্থে নিয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথও আন্তর্জাতিক ভাব বিপ্লবে সে সব দিগন্ত উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁকেও রচনায় যেমন এগিয়ে যেতে হয়েছে—অনুষ্ঠানেও তেমনি সাহসী হতে হয়েছে। ফলে বাংলা দেশ একদিক হ'তে সারা দুনিয়ার সমান তালেই চলেছে পুরোভাগে, রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায়। বিস্ময়ের বিষয় যে, কাহিনীর ঐশ্বর্য ও সার্থকতার কথা কেউ এপর্যন্তও কল্পনা করেনি এবং তুলনা-মূলক দিক দিয়ে কেউ অনুধাবন করতে পারে নি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পৌষ উৎসবের পর কলিকাতায় ভালরকমে একটা ঠাকুর-মঞ্চের অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটে। পূর্ববর্তী অভিনয় অপেক্ষা এ অভিনয় ছিল জটিল ও বহুমুখী। ইউরোপীয় সংস্কারপন্থী মঞ্চের সহিত এর তুলনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এ আন্দোলনের সহিত পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এবং একে পশ্চিমাঞ্চলের সমস্যার সহিত জড়িত দেখাও সমিচীন হবে না। ইউরোপের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সহিত রবীন্দ্র রঙ্গমঞ্চকে জুড়ে দেওয়া একটা অতিরিক্ত রকমের ভুল হবে। এ শ্রেণীর মঞ্চকে এ দেশের পরিস্থিতি আবেষ্টনের ভিতরই দেখতে হবে।

বস্তুতঃ এতে যাত্রাগানের সারীকৃত (abstract) সারল্য ছিল না কিম্বা সভূষণ ছন্দের প্রাচ্যসুলভ অনাবিল শৈথিল্যেও এই অভিনয় আত্মসমর্পণ করে নি। এর কাঠামো ছিল প্রতীচ্য রচনার মতই কঠিন ও সীমাবদ্ধ—অথচ এর পুষ্পিত প্রাচুর্য সকল বন্ধনের মায়াপাশ ছিন্ন করেই সকলকে পুলকিত করে। জটিল নাটকের পুঞ্জীভূত ও সংজ্ঞা উপকরণের ভিতর যেন এক্ষেত্রের সহজ বিগলিত অফুরন্ত রসদিগন্ত সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়! রবীন্দ্র-নাথ এ নাটকে কবিশেখরের চরিত্র ও অপূবাউলের চরিত্র অভিনয় করে সকলকে পুলকিত করেন। এ অভিনয়ের মধ্যে কোন রকম জটিলতা ছিল না—কোন অন্ধ গুহা, গভীর রহস্য রন্ধ্র বা দুষ্প্রবেশ্য মায়ালোক রচনা করে কেউ এ মঞ্চপ্রতিষ্ঠাকে একটা তাজ্জব ব্যাপারে পরিণত করতে চায় নি।

রবীন্দ্রমঞ্চের এই অভূষণ রূপই মঞ্চোপরি অভিনয়-কৃত্যকে অসীমভূষণের আলোয়ায় আচ্ছন্ন করেছিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সমগ্র সম্ভাবনা দূর হ'লেই দর্শক মুখ্য রস প্রবাহের দিকে সজাগ হয়। কলালীলার এই অজ্ঞাত রহস্য এই অভিনয়কে এক অসামান্য মর্যাদা দেয়।

এ মঞ্চে দ্রষ্টব্য ছিল শুধু একটা অশ্রান্ত রূপের ঝড়—আর কিছু নয়। কতকগুলি চরিত্র, ধারাবাহী সুকল্পিত আখ্যায়িকা, নৃত্যগীতের অনাবিল পুষ্পবৃষ্টি এই অনুষ্ঠানকে এক অপার্থিব রসমঞ্চে পরিণত করে। রবীন্দ্রনাথ কবি-শেখর রূপে উপস্থিত হয়ে' অভিনয়ের জাগ্রত কারুতায় এবং জীবন্ত শাসনে সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁকে অনেকটা বাল্মীকি প্রতিভার তরুণ বাল্মীকির মতই সজ্জিত হ'তে হয়। বৃদ্ধ বয়সে তরুণ সাজলেও এই তারুণ্য মোটেই কৃত্রিম হয়নি—সকলেই পুলকিত ও মোহগ্রস্ত হয়েছিল। অপু-বাউল রবীন্দ্রনাথের বয়সের উপযোগীই হয়েছিল। ফলে যৌবন ও বার্দ্ধক্যের বিপরীত রসের গঙ্গা-যমুনা সংগম দেখে' কবির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সকলেই কৃতার্থ হয়। এ নাটকে গগনেন্দ্র ঠাকুর ও শ্রীঅবনীন্দ্র ঠাকুর সার্থকভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এদেশের ইতিহাসে এরকম অভিনয়ের বিশুদ্ধ রূপ-প্রহেলিকার কথা তখনই ভাল করে' লোকের মনে মুদ্রিত হয়, যখন দেখা যায় দেশের ব্যবসায়ী মঞ্চগুলি ঘুরপ্যাঁচে পরে গেছে—পরধর্ম গ্রহণ করে এবং পাশ্চাত্য গোলোক-ধাঁধাঁর ভিতরে গিয়ে বন্দীর মত আর কিছুতেই বাইরে আসতে পারছে না! এদেশে সংস্কৃত (reformed) মঞ্চের কথা কোথাও কল্পিত হয়নি এমন কি কলেজের ছেলেরাও এই গলিত, ক্ষত সামঞ্জস্যহীনতার পংকে পড়ে আশাহীনভাবে সজ্জিত হয়েছে। তাদেরও আদর্শ নেই বা উদ্ভাবনী প্রতিভা নেই। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অন্যান্য দেশের শতবর্ষ পেছনে পড়ে আছে—যুবকেরা এগিয়ে যাবে কি করে? পরাধীন দেশের অভিশাপত' বহন করতেই হবে। শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এদেশের সৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্তভাবে সাধনা করে বারবার রুদ্ধ দ্বারকে উন্মোচন করেছেন।

ইউরোপে গোড়াতেই জার্মানীরা মঞ্চ সংস্কার ও বিপ্লবের

'বিসর্জ্জন' নাটকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

প্রতি যত্নবান হয় এবং জার্মানীতেই সৌন্দর্যের একটা শৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব বিচারের প্রশ্ন উঠে। গর্ডন ক্রেগকে (Gordon Craig) একবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর করেন; "If you ask me where the Theatre is most active, I reply it is in Germany."। প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চের কলা প্রয়োগে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। এরপ্রধান নেতৃত্বের অধিকার হচ্ছে মালিকের (proprietor)। তারপর ব্যবসায়ী-ম্যানেজার, মঞ্চচালক (Stage Director) 'প্রধান অভিনেতা', দৃশ্যরচনাকারী,
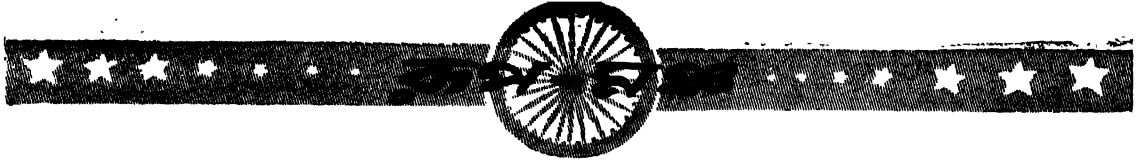
শিল্পী, সাজ তৈরীর প্রধান-শিল্পী, আলো-পরিচালক, যন্ত্রপাতির ম্যানেজার, সংগীতপরিচালক প্রভৃতি এদের সকলের হাতেই নেতৃত্ব নিহিত হয়। এতগুলি পরিচালক জড় হলে, তাদের রচনার ভিতরকার একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়। যার হাতে সকল ভার দেওয়া যেতে পারে এমন লোক পাওয়া দুষ্কর। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ একাধারে এ ব্যাপারের সর্বনিয়ন্তা হতে পেরেছেন। তাই তাঁর মঞ্চচালিত এই নাট্যকলাকে একটা মধুর তিলোত্তমার মতই তিল তিল করে' তিনি একটা সংহত ও সম্পূর্ণ রূপ দিতে পেরেছেন। একটা অখণ্ডতা দান করতে না পারলে কোন কলাই রূপলক্ষ্মী যুক্ত পূর্ণসুষমা লাভ করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের অফুরন্ত লালিত্য বিধানের আর একটি অধ্যায় উন্মুক্ত হয়েছিল Empire Theatre-এ বিসর্জ্জন নাটকের পুনরাভিনয়ে। রবীন্দ্রনাথের এবারকার অভিনয় কয়েকটা নূতন পরিবেশনে মণ্ডিত হয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল এবারকার পৃষ্ঠপট (background)। কবি লঘু নীলবর্ণে সমগ্র পৃষ্ঠপটখানি অংকিত করেন। নীলবর্ণ হচ্ছে আকাশের রঙ। তাতে সীমার সবল কারাকে বাষ্পীভূত করার চেষ্টাই মুখ্য ব্যাপার হয়। এ দেশের কোন মঞ্চে এর আগে এরকম কোন পট-ভূমি কল্পিত হয় নি। মনে হয়, অনন্ত আকাশের নীচে কোন বিরাট প্রান্তরে যেন এই অভিনয় চলছে। অন্যান্য আসবাব ও ছিল—কিন্তু সবই ছিল সাঙ্কেতিক বা রূপকাত্মিক। অর্থাৎ সামান্য কয়েকটি লক্ষণ বা চিহ্নিত দ্বারা অসামান্য আবেষ্টনকে উদ্দীপ্ত করা। এই কৌশলকে পূবামাত্রায় তিনি এ নাটকে প্রয়োগ করেন।

এই রূপকধর্ম মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দুনিয়ার অধিকাংশ ব্যবহারই রূপকের সাহায্যে সম্পূর্ণ করা হয়। আমাদের 'অক্ষর', বা 'সংখ্যা' প্রভৃতিও ইংগিত স্থানীয়। রাজার 'মুকুট', 'মুদ্রা', 'আসন', 'দণ্ড'—সবই রূপকাত্মক। প্রাচীন সংখ্যাগুলি প্রতি সন্ধিস্থলে রূপকের ব্যবহার করেছে। আমাদের কোন সম্পর্ক ও পরিচয় যে রূপকমূলক নয় তা বলা কঠিন।

রূপকের সাহায্যে বিরাটকে ও অসীমকে উপস্থাপিত করার কৌশল প্রাচ্য শিল্পে আছে। ইদানীং প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চে এর বহুমুখী প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। বর্ণ সজ্জা, মুদ্রা, ও গতি প্রভৃতিকে উপরিস্থভাবে রূপকপূর্ণ করতে Reinherd অথবা Gordain Craig ইতস্ততঃ করে নি।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চে ঠিক রূপকহিসেবে না হলেও Suggestion হিসেবে বহু অংগ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু সুনীল পৃষ্ঠপটটি নিয়ে এসেছিল এক অপূর্ব মাদকতা। এদেশে এরকমের একটা উপঢৌকন এ পর্যন্ত কেউ উপস্থিত করেনি। Empire Theatre এর বিরাট মঞ্চে এ কম একটা বিরাট নীলবর্ণাক্ত মহাশূন্যতা কেউ কখনও উপস্থিত করেনি।

আর একটি নূতন ব্যাপার ছিল যে, সেই অভিনয়ে অঙ্কের পরেও কোন বিরাম ছিল না। অবিচ্ছিন্নক্রমে পর পর সব ঘটনাগুলিকে বিবৃত ও উদ্ঘাটিত করা ছিল একটা নূতন লক্ষ্য। অবশ্য যাত্রাগানে অঙ্কভাগের উপলক্ষ্য করে' কোন দীর্ঘ বিরতি এদেশে কখনও কল্পিত হয় নি। এর বিশিষ্ট কোন হেতুও নেই। ব্যবসায়ী থিয়েটারে এক একটি অঙ্কের পর দর্শকদের মজলিসই ভেঙ্গে যায়। তখন যেন পান-তামাক, বরফ, সোডা, লেমনেড বিক্রী ও পানাদির একটা হট্টগোল সুরু হয়। এভাবে নাট্যরস উদ্ঘাটনে বাধা পড়ে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের অখণ্ডতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিসর্জ্জন নাটকখানিকে nonstop বা অভঙ্গ-ভাবেই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। তাতেও নাট্যমঞ্চের রসশ্রী উদ্ঘাটনের পরম্পরা একটা অক্ষত শ্রী নিয়ে আবির্ভূত হয়। এদেশে এরকম চেষ্টাও নূতন, কোন ব্যবসায়ী বা আদর্শবাদী রঙ্গমঞ্চই এই নক্সাটি এখনও উপস্থিত করতে পারে নি। সবই চল্‌ছে মামুলীভাবে। অথচ করতালির অভাবও নেই। এদেশের বিচার ও রসপান খামখেয়ালিকেও মাথায় করে নৃত্য করতে প্রস্তুত।

বর্তমান লেখক এই নূতন ব্যবস্থা বিষয়ে কবিবরকে প্রশ্ন করেন—নীল background তিনি কি উদ্দেশ্যে করলেন তাও প্রশ্ন করা হ'ল। তিনি বললেন, নীল রঙটা একটা অসীমতার জ্ঞাপক—পেছন দিকে একটা দূরগামী অফুরন্ত অসীমতা

উদ্ঘাটিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য! আমি তাঁকে বললুম বিলাতের সকল reform Theatre-এ blue background" এবং grey proscenium ব্যবহৃত হয়—তিনি কি সেজন্যই এর প্রয়োগ করেছেন? তিনি গোড়াকার উত্তরই আবার দিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, দৃশ্যপটগুলি বর্জন এবং একটা abstract ও absolute প্রভাততোরণ নির্মাণ।

আমার মনে হয় নিজের সৌন্দর্য সংস্কারেই তিনি নাট্যমঞ্চটির কারাগারের ভংগীকেই অর্থাৎ "Bore form" কেই এমনি করে ভাঙ্গেন। এছাড়া আর এক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায় ছিল না বললেই হয়। "nonstop" অভিনয় সম্বন্ধে আমি বললুম, জার্মানীতে Herr Savits, non stop Shakespeare অভিনয় করে রঙ্গমঞ্চের একটা দুঃসহ অবস্থা ঘুচিয়েছেন। কাজেই আপনিও এক্ষেত্রে ভাল ব্যবস্থাই করেছেন।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণ তাঁকে এ বিষয়ে সজাগ রেখেছিল। তিনি যা সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক তাই গ্রহণ করেছিলেন বিনা দ্বিধায়। একশত বছরের পুরাতন একটা অসংযত ও অপ্রচুর মঞ্চ নিয়ে নিজকে তৃপ্ত করতে পারেন নি। শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এই সাহসিক কাজ সম্ভব হয়েছিল।

"নটির পূজোর" অভিনয়ের ভিতর দিয়ে তিনি এমন এক অঘটন ঘটনপটু প্রতিভা দেখিয়েছেন, যা চিরকাল এদেশে সকলেই স্মরণ রাখতে বাধ্য হবে। নাট্যমঞ্চে নৃত্যকলাকে বর্জন অসম্ভব। অথচ মোগলাই আমলের পর সমগ্র সংগীত ও নৃত্যকলার পীঠ উক্ত অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়ে নিম্নের নটীসম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে গড়ে। তাইত নৈতিক বিধির সহিত নৃত্যকলাকে সংযত রাখা হয়ে পড়েছিল কঠিন। এদেশের উনবিংশ শতাব্দীর puritan নীতিবাদ ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবাদের অনুসরণ করে' একটা কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করে। মোগলাই আমলের অপরাহ্নের আত্মঘাতী দুর্নীতির প্রতিবাদরূপেই এদেশে একটি কঠিন নীতির মণ্ডলি সৃষ্ট হয়। অথচ তাতে করে মানুষের চিরন্তন রসধর্মচর্চাই ব্যাহত হয়। ইংলণ্ডের

'বাল্মীকি' নাটকে কবির ভূমিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

কঠিন নীতিবাদ থাকা সত্বেও সামাজিক গোলক-নৃত্যে (ball dance) কেউ কোন পাপের ছায়া কল্পনা করত না। সেটা সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে প্রাচীন পরম্পরার দোহাই দিয়েই চলে এসেছে। এদেশে ওরকম কিন্তু ছিলনা। ভক্তেরা নৃত্য করেছে—কীর্তনে নৃত্য হয়েছে—বাউলেরা নৃত্যগীত করেছে—এমন কি গ্রাম্যনৃত্যের প্রভাবও লুপ্ত হয়নি এদেশে। তবু ভদ্রসমাজে নৃত্য ও লাস্য হয়ে পড়েছিল দুঃসহ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। একে পাংক্তেয় করা হয়েছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ একাকী রবীন্দ্রনাথ একাজ সম্পন্ন করে গেছেন। বহুকালের আড়ষ্ট, দারুভূত, মানসিক ও দেহগত জড়তা ও পক্ষাঘাতকে তিনি সুস্থ করেছেন মায়াদণ্ডে। শুধু এজন্য তিনি এদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। একটা জাতির ভিতর এরকমের একটা নূতন অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত
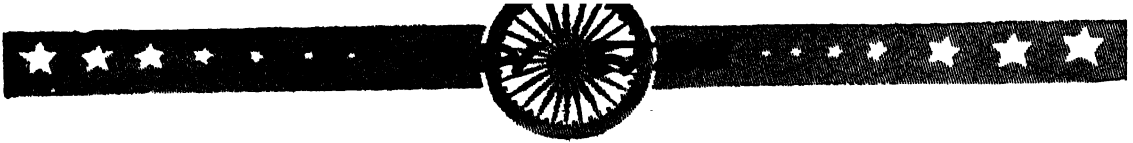
দুরূহ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ এমনি করে বাঙালীজাতিকে মুক্ত করেছেন বহু দুর্বলতা হতে। বাঙালী জাতিকেও ধন্যবাদ যে, শতবাধা সত্বে তাঁর এই মহার্ঘ্য দান তাঁরা গ্রহণ করেছে। নৃত্যকলাকে সমগ্র গ্লানি ও ইতরতা হ'তে মুক্ত করে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর মঞ্চে স্থান দিয়েছেন। এতে অনেক চেষ্টা করে' বিস্তর পরিবর্তন সাধন করতে হয়। মোগলাই আবহাওয়ার—ভোগধর্মী অংগভংগগুলি বর্জন করে' সমগ্র কলাকে মহত্তরভাবে প্রকালধর্মী করতে হয়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে আছে নৃত্যদ্বারাও পুজো করা সম্ভব। স্বয়ং মহাদেবই নটরাজ। বিষ্ণু মধুকৈটব নিধন কালে যেরূপভাবে চালনা করেন তা নৃত্যেরই ছন্দ। এরূপ তুরীয় সম্পর্ক ভারতের নৃত্যকলায় বর্তমান আছে। সকল রসই নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ করার কথাও নর্তন নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। গ্রন্থে থাকলেও প্রয়োগ করা এদেশে অসম্ভবই হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ "নটীর পূজোয়" নৃত্যকেই তাঁর রঙ্গমঞ্চে করে তুলেছিলেন মুখ্য ব্যাপার। অনেক দুঃসমালোচনার ভিতর দিয়ে তিনি এ বিষয়ে জয়ী হন। নাটকখানি গভীর রসসমাবেশ ও পরমনিষ্ঠার ছায়ায় হিল্লোলিত এবং উচ্ছসিত হয়ে উঠে, তাতে ভ্রূকুটি করার কোন রন্ধ্রই ছিল না। এর পরেও রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আর পশ্চাৎপদ হননি। পরবর্তী "ঋতুরঙ্গ" নৃত্যগীতানুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে একটা নূতন প্রেরণা যেন দেখা দেয়। ধারাবাহী নৃত্যকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের "সাপমোচন" নাটক এদেশে একটা নূতন যুগের অবতারণা করে। অসম্ভব সম্ভব হল—অপ্রত্যাশিত যুগ আশার দীপশিখা হাতে করে, সমগ্র বাংলা দেশকে সম্বর্ধনা করলে। চিত্রাঙ্গদাকেও নৃত্যনাট্যরূপ দেওয়া হল। মণিপুরী ও দাক্ষিণাত্যের নৃত্য অধীত ও পরীক্ষিত হল। এসবের ভিতরকার যতটুকু গ্রহণীয় তা এর আলঙ্কারিক ঐশ্বর্যগঠনে প্রযুক্ত হল।

এর ফলে যা হ'ল, তা বিলাতী নাচও নয় এবং এখানকার কৌল (classical) প্রথার নাচও নয়। এদেশও খাঁটি কালিদাসের বা চাণক্যের পদাঙ্কে ইদানীং চলছে না। জগতের অনেক সত্যকে বরণ করতে হয়েছে নূতনভাবে—সমাজের অনেক অবস্থাকে মোড় ফিরতে হয়েছে। এক্ষেত্রে মোগলাই বিলাস ও ইউরোপীয় শৃঙ্খলা যুক্ত হয়েছে বাংলার সূক্ষ্মতা ও রসবোধের বৈচিত্রের সংগে। দিল্লীর হিন্দীভাষাকে বাঙালী গ্রহণ করেনি—মাথায় নিয়েছে বৌদ্ধকবির রহস্য ও বৈষ্ণব কবির স্বপ্নে-মাখা বাংলা ভাষার অমলিনকে। কাজেই বৈচিত্রকে ক্ষুরধার সৌন্দর্যের অফুরন্ত ছায়াপথে আহ্বান করা বাঙ্গালীর পক্ষে সহজই হ'য়েছে।

এই সহজ পথের বর্ণধারকে সমগ্র জাতির প্রেমে অভিসিক্ত করেই আজ স্মরণ করতে হয়। নাট্যমঞ্চের বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের দান অকল্পিত ও অফুরন্ত। ভবিষ্যের সংস্কৃত নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের বহু দান গ্রহণ করেই অগ্রসর হ'তে হবে। ইদানীং বাংলার নাট্যমঞ্চ আরণ্য আবহাওয়া পূর্ণ। তাতে শৃঙ্খলার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। কোন সভ্য দেশের জনগণের ভিতর সৌন্দর্য সম্বন্ধে এরূপ অন্ধতা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এদেশের রঙ্গমঞ্চের কোন

গতিশীল ধর্মই নেই। রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চ কোন স্থায়ী অট্টালিকা নির্মাণে অগ্রসর হয় নি। কাজেই, যে সমস্ত সাময়িক মঞ্চ তৈরী করে তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভা দেখান তার ভিতরও বহু উপাদানের প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ বা অস্বাভাবিক প্রখর আলোছায়া যে অমানুষিক বৈপরীত্য ও ইতর ব্যঞ্জনা উপস্থিত করে তা নটনটীদের রস প্রতিপাদনের অনুকূল নয়। ইউরোপ মঞ্চের উপর, দিবার আলো মত welldiffused বা সহজভাবে প্রক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত আলোর ব্যবস্থা করেছে Fortuny প্রভৃতির কৌশল। এদেশের মঞ্চ একটা অতি কদর্য আলোর ব্যবস্থার ভিতর অভিনেতৃদের উপস্থিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এদেশেও যথাসম্ভব সংযম আনয়ন করেছেন।

আর একটি গুরুতর সমস্যাকে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা দ্বারা তিনি সহজে কোন প্রকারে পূরণ করেছেন। নাট্যাভিনয়ে দু'রকমের প্রথায় সমগ্র শিল্প কৃতিত্বকে উপস্থিত করতে হয়। প্রথম প্রথায় নায়কই হল সবচেয়ে প্রধান ও প্রয়োজনীয় চরিত্র। সর্বশ্রেষ্ঠ নট নায়কের অংশ অভিনয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সকলে তাঁর চারিদিকে নক্ষত্রের মত তাকেই বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করে। সবচেয়ে মুখ্য অভিনয় হল নায়কের। অন্যান্য সব অভিনেতারা গৌণ ব্যাপার, শুধু নায়কের গৌরবকে দীপ্ত করার কাজ তাদের। এরকম ব্যবস্থাকে বলা হয় 'pyramidal system'—যাতে সমগ্র অংশগুলির উপর একটি মাত্র বিন্দু, পিরামিডের শীর্ষস্থানীয় বিন্দুর মতই স্থাপিত হয়। এর অন্য নাম হল 'star system'। এর ফলে অসামান্য অভিনেতাদের ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ে আপেক্ষিক ও তুচ্ছ। star অভিনেতার রঙ্গমঞ্চে এলেই করতালি। star অভিনয়েই সকলের বাহবা দান প্রভৃতি চলে। রঙ্গমঞ্চে star অভিনেতার নানা অবস্থা এরূপ করতালির দ্বারা সম্বর্ধিত হয়।

অন্যটি হল চক্রের প্রথা (circle system)। এ ব্যবস্থায় ছোট বড় সকল অভিনেতার মূল্যই রঙ্গমঞ্চের উপর একেবারে সমান। অভিনয়ের প্রতি অংশ অন্য যে কোন অংশের সমান—সবই সমান মূল্যবান। একটি দরোয়ানের অভিনয় ও নায়কের অভিনয়ের মূল্য সমান মনে করা হয়। সকলে মিলেই নাট্যলক্ষ্মীকে উদ্বুদ্ধ করে একের চেষ্টায় বস্তুতঃ তা সম্ভব হয় না। সকলকেই চক্রাকারে একই সুরে নাট্যশ্রীকে রূপদান করতে হয়। এজন্য এ প্রথায় কাকেও ব্যক্তিগত ভাবে করতালি দেওয়া হয় না। ইউরোপের continent-এ এজন্য অভিনয়ের সময় করতালি দেওয়া নিষিদ্ধ। সমগ্র অভিনয় বাক্য সম্পূর্ণ হলেই করতালি দেওয়া হয়। এই প্রথার ফলে প্রত্যেকটী চরিত্রকে অতি সাবধানে নিজের অংশকে সুসম্পূর্ণ করতে হয় কোন ত্রুটি অমার্জনীয় হয়।

এদেশে star system বা তারকাপ্রথাই প্রচলিত। যাত্রাগানের অধিকারী সমগ্র দলকেই নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি বেশী এদেশে—সমগ্র অভিনয় ব্যাপার নিয়ে নয়। এজন্য প্রধান অভিনেতাকে করতালি দেওয়া হয় বারবার। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চেও রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে করে asthetic balance বা সৌন্দর্যের ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হ'তে বাধ্য। এসব অসুবিধা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রতিভা এর একটা সহজ প্রতিকারের দিকেও এগিয়ে গেছে। এদেশের সহজ সংস্কারকে নূতন পথে চালিত করা কঠিন হলেও রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি অবস্থা সৃষ্টি করে' সৌন্দর্যের তরঙ্গ ভঙ্গে সমতান পুষ্টি করেছেন। নটির পুজাতে রবীন্দ্রনাথ প্রধান নন—নটীই প্রধান চরিত্র। কাজেই রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় ব্যক্তিত্ব ও অভিনয় সমগ্র অনুষ্ঠানের ভারকেন্দ্রের যথাস্থানে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এমনি করে মুখ্য রস-কৃত্যের উদ্‌ঘাটনকে একটা সুতিগ্ম ছন্দের ক্রমে ফেলে তারকা রীতির স্থূলতা ও অত্যুক্তিকে তিনি সংযত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অভিনীত নাটকগুলির অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পরিচ্ছদ কলাও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এ সব পরিচ্ছদে বর্ণের বিচিত্র কলাপকে নানাছন্দে ফেলবার সুকুমার চেষ্টা সফল হয়েছে। প্রত্যেক সজ্জার নিপুণ সম্ভাবকে নানা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করার চেষ্টা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের পরিচ্ছদের আলংকারিক শ্রী বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভা সকলেরই চিত্তবিনোদন করেছে।

বাংলার নাট্য-সাহিত্যে যে অল্প কয়েকজন কথাশিল্পী সাফল্য ও জনপ্রিয়তার জয়টিকা লাভ করেছেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁদের মধ্যে একজন। শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তিনি বাংলা রংগমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন। সম্প্রতি চিত্রজগতে রচয়িতা-পরিচালকরূপে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি। শক্তিমানের গতি সর্বত্রই অবারিত সুতরাং চিত্রজগতেও তার প্রতিভা পূর্ণ-বিকশিত হ'য়ে উঠবে বলেই আমাদের ধারণা।

অভিযোগ ও উত্তর

দেবনারায়ণ গুপ্ত

চিত্রশিল্প ব্যবসায়ের দিকে আজকে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। এমন এক-দিন ছিল, যেদিন এ ব্যবসাকে সাধারণে খুব ভাল চোখে দেখতেন না। বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা ছিল—ব্যবসার নামে এটা বিলাসী মানুষের আড্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে এ ধারণা বদলে গেছে। এখন অনেকেই এ শিল্প-ব্যবসায়ের ওপর আস্থাবান ও এ ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতার ওপর আশান্বিত। এখন অগণিত দর্শক এর পৃষ্ঠপোষক, অসংখ্য চিত্র গৃহ নতুন ছায়াছবির মুক্তি-কেন্দ্র। কাজেই এ ব্যবসায়ের পরিধি যে ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়ে উঠছে—সেবিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উন্নতশীল ব্যবসায়ের বিপক্ষে এর পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ দর্শকসমাজের কাছ থেকে যে সকল অভিযোগ শোনা যাচ্ছে তা নিয়ে অবশ্যই আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। অভিযোগের মধ্যে এই কয়টী প্রধান।

১। গল্প, ২। টেক্‌নিক, ৩। পুরাতন পরিচিত শিল্পী সমন্বয়। পাঠকগণের কাছে অভিযোগগুলির অনুকূলে যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। একনম্বর অভিযোগের মূলে এই কথা বলা যেতে পারে যে, গল্প নির্বাচন ব্যাপারে পরিচালক সম্পূর্ণ দায়ী হলেও—প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এর ব্যাতিক্রম বিশেষভাবে দেখা যায়। যিনি অথবা যাঁরা ছবির পেছনে অর্থব্যয় করেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরাই গল্প নির্বাচন, গল্পের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকেন। অবশ্য পরিচালকের যে এ ক্ষেত্রে মতামত দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, তা নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যা দাঁড়ায় তাতে শেষ পর্যন্ত পরিচালকের মত থাকে চার আনা, বাকী বার আনা থাকে কর্মকর্তাদের। এখন অনেক বল্‌তে পারেন, কেন এমন হয়? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, পারস্পরিক আস্থার অভাব। যাঁরা অর্থব্যয় করেন, তাঁরা যে জমির ওপর অর্থব্যয় করতে যাচ্ছেন, তা বেশ ভালভাবেই দেখে শুনে নিতে চান। এই দেখেশুনে নেওয়াটা ভাল। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, অমুক বাড়ীতে দুখান দোকান ঘর আছে, তার বেশ একটা মোটা আয় হয়। সুতরাং আমিও আমার জমির ওপর দুটো দোকান ঘর করব। কিন্তু এই দেখাদেখি একটা কিছু করার আগে ভাবার দরকার যে, সে জমিটা কোন্ রাস্তার ওপর? পল্লীর মূল্যের ওপর জমির বিশেষত্ব বাড়ে। বিশেষত্ব হীন পল্লীতে জমি কিনে সহরের সমান ভাড়া পাওয়ার আশা নিরর্থক। কেবল ব্যর্থ অনুকরণে হতাশাকেই অনর্থক টেনে আনা হবে।

কাজে কাজেই গল্প-নির্বাচন ব্যাপারে সংযমের প্রয়োজন। কেবলমাত্র ব্যবসায়বুদ্ধির দ্বারা গল্পের সম্ভাব্যতা বিচার করা নিরর্থক। মানুষের শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রেখে, যা সত্য, যা শাশ্বত, যা উত্তরকালে দেখা দিতে পারে, এমনতর বাস্তবের উপর ভিত্তি করেই চলচ্চিত্রের গল্প নির্বাচন করা উচিত। তাতে যদি কঠোর সত্য কিছু আসে আসুক, স্বাদেশিকতা কিছু আসে আসুক, ব্যথা-বেদনা কিছু আসে আসুক। মোটকথা, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনের মত এর দুফোঁটা, ওর এক ড্রাম, কিংবা ওষুধটা খেতে বিস্বাদ হবে, সুতরাং দাও খানিকটা সিরাপ—এমনতর মনোভাব গল্প-নির্বাচনে, কি প্রযোজকের, কি পরিচালকের কারুরই থাকা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত—গল্প জলস্রোতের মতই স্বচ্ছ ও সাবলীল। সে রোগের প্রতিষেধক বা অযুধ নয়।—

দু'নম্বর অভিযোগ অর্থাৎ টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে সর্বপ্রথম ভাড়া করা ষ্টুডিওর কথা মনে পড়ে। কলকাতার আটটি স্থায়ী ষ্টুডিওতে অন্ততঃ আশীটি কি তদূর্ধ্ব সংখ্যক চিত্র-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিত্র-গ্রহণের কাজ করে থাকেন। এঁরা মাসে আটদিন থেকে দশদিন সুটিং করার সুযোগ পান। চার মাসে মোট চল্লিশদিন সুটিং-এর ব্যবস্থা থাকে। এর মধ্যে চিত্র-গ্রহণের কাজ শেষ করতে না পারলে আরো বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। যে সব শিল্পীদের নিয়ে কাজ করা হয়, তাঁদের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। যথাসময়ে ও নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে তাঁদের 'প্রোরেটা' দিতে হয়। এই প্রোরেটার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে প্রযোজক তথা পরিচালক তাড়াতাড়ি কাজ সারার চেষ্টা করেন। ফলে, টেক্‌নিকের দিকে কড়া নজর দেওয়া পরিচালকের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিউ থিয়েটার্স-এর পরিচালকেরা এ বিষয়ে কতকটা সুযোগ ও সুবিধা পান। কারণ, তাঁরা নিজস্ব ষ্টুডিওতে ধীর স্থিরভাবে কাজ করতে পারেন। সাধারণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের সংগে নিউ থিয়েটার্স-এর ছবিগুলির তুলনা করলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। কিন্তু ভাড়াটে ষ্টুডিও বা প্রোরেটার কথা বাদ দিলেও—উন্নত ধরণের টেক্‌নিকের অভাব ঘটে, অন্যান্য কারণে। যেমন বড় রাস্তা দিয়ে গন্তব্যস্থানে যেতে গেলে বেশী সময় লাগবে বলে, অলি-গলির খুঁজিয়া পথ ধরি। তেমনি সর্ট-কাটে বহুকাজ সারা হয়—অর্থব্যয় বাহুল্য বাঁচানর জন্যে। তাছাড়া সত্যিকারের শিক্ষিত, টেক্‌নিশায়ন-এর যে অভাব নেই, তাও নয়। এই সব কারণেই উন্নত টেক্‌নিকের অভাব চোখে পড়ে।

তিন নম্বর অভিযোগের উত্তরে বলা যায়, একাধারে নতুন শিল্পীর অভাব, অপর দিকে পুরাণ শিল্পীদের চাহিদা। অনেকে এই অভিযোগ করে থাকেন যে, নতুন শিল্পীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। কিন্তু বর্তমানে একথা সত্য নয়—এখন নতুন শিল্পীর প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট এবং সুযোগ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্যিকারের অভিনয় প্রতিভা ও দক্ষতা-সম্পন্ন নতুন অভিনেতার একান্ত অভাব। সৌখীন সম্প্রদায় থেকেই সাধারণতঃ অভিনেতা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে সেরকম সৌখীন সম্প্রদায়েরও অভাব ঘটেছে—যেখানে প্রকৃত অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গত বৎসরে যেসমস্ত ছায়াছবি মুক্তি-লাভ করেছে—তার মধ্যে আমরা অনেক নতুন শিল্পীকে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কয়জন শিল্পী এঁদের মধ্যে মনের কোনে রেখাপাত করতে পেরেছেন? অনেকে বল্‌তে পারেন—তার জন্যে কেবলমাত্র নতুন শিল্পীই দায়ী নন্। ভাল না হওয়ার আনুষংগিক আরও কারণ আছে। যাঁরা একথা বল্‌বেন—তাঁদের সংগে আমিও অবশ্য সে কথা স্বীকার করব যে, ভাল না হওয়ার জন্যে কেবলমাত্র শিল্পীই দায়ী নন্। কিন্তু এইখানে আমাদের একটি কঠিন ব্যবসা বুদ্ধির সম্মুখীন হতে হয়। সেটী হচ্ছে এই যে, পুরাতন জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে গৃহীত চিত্র দোষত্রুটী থাকা সত্বেও তবু কিছুদিন দর্শকদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু নতুন শিল্পীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। এই কারণে প্রযোজকেরা পূর্ব হতে সাবধানতা অবলম্বন করেন। ফলে, অধিকাংশ চিত্রেই পুরাতন শিল্পীদেরই দেখা যায়।

কিছুদিন পূর্বে জনৈক সাহিত্যরসিক বন্ধুর সংগে বালীগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার-এ আসছিলাম। গাড়ীতে আসার সময় বন্ধুটি ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত কয়েকটী চিত্রগৃহের ফ্রেস্‌কোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে, প্রায়

সব কয়টি চিত্রগৃহের সম্মুখেই একটি পুরাতন শিল্পীর ছবি। বন্ধুটি শ্যামবাজারের নিকট এসে অভিমত দিলেন—এই ত তোমাদের বায়োস্কোপ। কান্নু ছাড়া গীত নেই-এ ব্যবসা কদিন চলবে বলতে পার? বন্ধুটিকে যথাযথ উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু বল্‌লাম—এ শিল্প শৈশব থেকে সবে মাত্র কৈশোরে পা দিয়েছে। যৌবনের জল তরঙ্গ যখন দেখা দেবে, তখন কোন প্রতিবন্ধকই তাকে রোধ করতে পারবে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা ও বাংগালীর যে মান ও স্থান; অদূর-ভবিষ্যতে চিত্র ও নাট্য-শিল্পেও বাংগালী সেই স্থান ও মর্যাদা লাভ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। বন্ধুটি শ্লেষাত্মক সুরে বল্‌লেন —'ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাকো।' এর পরে বন্ধুটিকে আর কোন জবাবই দিইনি। কিন্তু শত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ শিল্পের অবশ্যম্ভাবী উন্নতির প্রতি আমি আস্থাবান। এবং আমি আশাকরি, চিত্রশিল্প-সাধনার উত্তর সাধকদের দ্বারাই তা সম্ভব হবে।

বাংলার ছায়াচিত্রশিল্পে নতুনদের বাধা বিপত্তি

বনানী চৌধুরী

গত দু' বছরে যেসকল নূতন শিল্পী বাংলা চিত্র-জগতে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছেন, আমি তাঁদেরই একজন। নূতন শিল্পী হিসাবে আমরা (অর্থাৎ আমি নিজে এবং আরো অনেকে) যে সকল চরিত্রে আবির্ভূত হ'য়েছি, অভিনয়ের উৎকর্ষতায় সে সকল চরিত্র আশানুরূপ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠেনি। আমার অভিনীত তিনখানি ছবি এ পর্যন্ত মুক্তি-প্রাপ্ত হ'য়েছে—তপোভঙ্গ, পূর্বরাগ এবং অভিযোগ। যদিও চিত্র তিনখানি একটির পর একটি বিভিন্ন সময়ে মুক্তিলাভ ক'রেছে, কিন্তু চিত্র গ্রহণের কাজ তিনখানি ছবিতেই একযোগে চ'লেছিল। এই তিনখানি ছবির তিনটি চরিত্র আমার দ্বারা অভিনীত হ'য়েছে। অভিনয়ের পূর্বে বা অভিনয়ের সময়ে প্রথমোক্ত দু'খানি ছবির দু'টি চরিত্রের যে-রূপ আমার মনে

সিনেমা শুধুই ছায়াছবি—সেই ছায়াছবির স্রোতে ভেসে এসেছে কত মনোহারিণীর মনোরমা মূর্তি। এসেছে কত রূপের অগ্নিশিখা, এসেছে কত সঞ্চারিণী লাবণ্যলতা—দেখেছি তন্বী দেহের তটরেখায় যৌবনের উচ্ছলতা, তাদের ভালবেসেছি আবার ভুলে গেছি। নতুন মুখ, নতুন মোহ জাগিয়েছে। ছায়া-রাজ্যের এই দীর্ঘ মিছিলের মাঝখানে অনুশীলপ্রিয় মনের অভিব্যক্তি ও মার্জিত রসবোধ আভিজাত্য যাঁদের অভিনয়কে দীপ্ত করে তুলেছে তাঁদের চক্ষু মন হতে কখনও মোছেনি। শ্রীমতী বনানী আমাদের কাছে নূতন এসেছেন, তাঁর অভিনয় হয়তো জড়তা ও ত্রুটি-বিমুক্ত নয়—তবু তাঁকে সহজে ভুলতে না পারার অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ বলতে চেয়েছি।

অংকিত হ'য়েছিল—ছবি মুক্তিপ্রাপ্তির পর আমি দেখেছি সে চরিত্র সে-রূপে পূর্ণতা লাভ করেনি। আমার মনে যাকে যে-রূপে পেলুম, বাইরে তাকে আমি সে-রূপে কেন প্রকাশ ক'রতে পারলুম না—এ নিয়ে আমি গভীরভাবে অনুশীলন ক'রেছি। এই অক্ষমতার গ্লানি আমি অনুভব ক'রেছি এবং বারে বারে এই প্রশ্নই আমার মনে ধ্বনিত হ'য়েছে—আমার এই অক্ষমতার জন্যে কী একমাত্র আমিই দায়ী—এর দায়িত্ব কী অন্য কোথাও এতটুকু নেই? —অন্য কারো ত্রুটিবিচ্যুতি বা অন্য কোন অবস্থা সমষ্টি? পারি-পার্শ্বিক অবস্থাগুলি যদি আরো অনুকূল হত, তাহ'লে আমার চরিত্রাভিনয় কী সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারতো না? এই প্রশ্নেরই জবাব আমি এই নিবন্ধে লিপিবদ্ধ ক'রতে চাই।
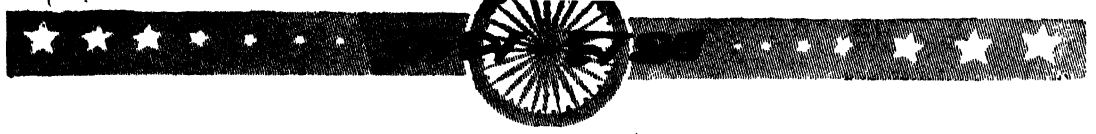
অভিনয় একটি শ্রেষ্ঠ আর্ট। কোন আর্টকে আমাদের জীবনে গ্রহণ ক'রে তাকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে একদিকে প্রয়োজন হয় ব্যক্তিগত সাধনা, অন্যদিকে প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষা। সংগীত একটি আর্ট। এই আর্টকে যদি কেউ করায়ত্ত ক'রতে চান, তাহ'লে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যেমন সুরের সাধনা ক'রতে হয়, সেইরূপ বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের নিকট শিক্ষাগ্রহণও ক'রতে হয়। ওস্তাদ না ধ'রে কেউ সংগীতজ্ঞ হ'য়েছেন ব'লে শুনিনি। যে ভাব আমার মনের মন্দিরে এসে ভিড় ক'রলো, তাকে সুরের মধ্যে রূপায়িত ক'রতে হ'লে, চাই সুললিত শিক্ষিত কণ্ঠ এবং ভাব ও সুরের সম্বন্ধবোধ। কোন্ ভাব প্রকাশ ক'রতে কোন্ সুর আমার কণ্ঠে ধ্বনিত ক'রতে হবে—এ ওস্তাদের কাছেই শিক্ষণীয়। এই কথা অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ ক'রতে, সংলাপের গতিকে কি বিশেষরূপে সংকোচন বা সম্প্রসারণ ক'রতে হবে এবং সেই সংগে দৈহিক অংগপ্রত্যংগের গতিকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হবে, এসবই বিশেষজ্ঞদের নিকট শিখবার বিষয়। কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ ক'রতে শিক্ষার্থী কতখানি সক্ষম হ'চ্ছেন, তাঁর কি কি ত্রুটি হ'চ্ছে এ সকল নির্দেশ ক'রে ঠিকপথে চালিত ক'রবার ভারও বিশেষজ্ঞের উপর। কিন্তু দুঃখের কথা, বাংলা দেশে বৈজ্ঞানিকভাবে অভিনয় শিখবার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে, ছায়াচিত্র রূপ একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক শিল্পে অভিনেতা বা অভিনেত্রীরূপে যখন আমরা যোগদান করি, তখন অভিনয় সম্বন্ধে কোন শিক্ষার বালাই আমাদের থাকে না। কোন পরিচালক কোন যুবক বা যুবতীর মাঝে শিল্প-সুলভ কিছু স্বাভাবিক সম্ভাবনা হয়ত দেখলেন, তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল ষ্টুডিওতে—মাইক টেষ্ট হ'লো এবং ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে একটা ফটো নেওয়া হ'ল। দেখা গেল, গলার স্বর মিষ্টি এবং ছবিও ভালো। তাঁকে শিল্পীরূপে বহাল করা হ'ল। পরে যেদিন তাঁর কাজ পড়লো, তাঁকে দু'চার বার সংলাপটি পড়িয়ে 'সেটে' দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। দু'একবার রিহার্সে'ল হ'লো—একবার মনিটর হ'ল—তারপরেই 'টেক'। কাজ এগিয়ে চ'ল্লো—ছ'য়সাত মাস পরে ছবি শেষ হ'য়ে গেল এবং এক সুন্দর প্রাতঃকালে (অবশ্য প্রাতঃকালে নয়, বিকেলে) ছবি মুক্তি লাভ ক'রলো। বেচারী নূতন শিল্পী স্পন্দিত বুকে গেল সে ছবি দেখতে। কিন্তু দেখে বুক স্পন্দিত হ'লনা, হ'ল কম্পিত। তাঁর অভিনয় আশানুরূপ ভালো হয়নি। এর সংগে পাশ্চাত্য দেশের তুলনা করুন। সেখানে র'য়েছে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র। যে সব যুবক যুবতী অভিনয় শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করেন, তাঁরা একটি শিক্ষাকেন্দ্রের সংগে নিজেকে সংযুক্ত ক'রে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অভিনয় এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা গ্রহণ ক'রে নিজেকে প্রস্তুত ক'রতে থাকেন। কোন ছবিতে নূতন শিল্পীর প্রয়োজন হ'লে প্রধানতঃ এই সকল শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই শিল্পী বাছাই করা হয়। ফলে সেই শিল্পী যখন 'সেটে' গিয়ে দাঁড়ান, তখন তিনি কেবল নূতন নন, তিনি শিক্ষিত নূতন। তাঁর অভিনয় প্রথম ছবিতেই সাফল্য-মণ্ডিত হয়। বাংলা দেশে এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু নূতন শিল্পীর দুঃখের কারণ কেবলমাত্র এইটাই নয়। একখানি ছবি আরম্ভ হবার মাসতিনেক আগে নূতন শিল্পীকে নিয়ে যদি যথারীতি রিহার্সে'ল দেওয়া হয়—পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে যদি তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি শুধরে দেবার চেষ্টা করা হয়, তাহ'লে অন্ততঃ যে সকল নূতন শিল্পী কিছু সাধারণ শিক্ষা নিয়ে এসেছেন এবং যাঁদের মনে কিছুটা শিল্পসুলভতা আছে—তাঁদের অভিনয়ে এবং চরিত্র রূপায়ণে ব্যর্থতার পরিমাণ বহুল অংশে হ্রাস পায় ব'লেই আমার ধারণা।

দ্বিতীয়তঃ বাঙালা চিত্রক্ষেত্রে আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, যে গল্প ছবিতে রূপগ্রহণ ক'রবে, সে গল্প বিস্তারিত ভাবে পড়বার জন্য শিল্পীরা সুযোগ পান না। যিনি যে অংশটুকুর সংগে সাক্ষাৎভাবে জড়িত—সেই অংশটুকুর কাঠামোটুকু মাত্র তাঁকে শুনিয়ে দেওয়া হয়। তাও সংলাপ দেওয়া হয় না। কোন বিশেষ একখানি সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ছবি সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, আমি যে ছবির গল্প জানিনি, 'সেটে' যাবার আগে পর্যন্ত সংলাপ পাইনি, এমনকি আমাকে

মাটি ও মানুষ-এ শ্রীমতী গীতশ্রী

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী প্রযোজিত চলন্তিকার এই
নির্মীয়মান চিত্রখানি পরিচালনা করছেন সুধীরবন্ধু

—শ্রী মতী মিনতি বসু—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্‌স্‌চেঞ্জের মুক্তি প্রতীক্ষিত ধাত্রী দেবতা চিত্রে।

যে চরিত্রে অভিনয় ক'রতে হ'য়েছিল সে চরিত্র কিরূপ দাঁড়াবে—এও আমি জানবার সুযোগ পাইনি—অথচ আমাকে অভিনয় ক'রতে হ'য়েছে। ফলে যা আশা করা গিয়েছিল, তাই হ'য়েছে। যাঁরা পুরোন শিল্পী—যাঁরা অভিনয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন—তাঁদের হয়ত এতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সংলাপ পড়লেই হ'য়ত তাঁরা চরিত্রের গতি কিছুটা উপলব্ধি ক'রতে পারেন। কিন্তু যাঁরা নূতন শিল্পী, তাঁদের পক্ষে সমস্ত চরিত্রটী সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা রূপ দান ক'রতে সক্ষম হ'তে পারেন না। এরপর যদি তাঁরা সংলাপ আগে না পান, 'সেটে' গিয়ে সংলাপ পেয়ে যদি তাঁদের অভিনয় ক'রতে হয়—তাহ'লে তাঁদেরকে সংলাপ বলার প্রতি বেশী সজাগ থাকতে হয়—চরিত্রের রূপদানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ রাখা সম্ভব হয় না। একটা চরিত্রকে আমাকে এমনভাবে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে, যাতে ক'রে আমি নিজেকে সেই চরিত্রে ফেলে অনুভব ক'রতে পারি যে, আমি 'আমি' নই—আমি পরিচালকের দেওয়া সেই চরিত্র। কিন্তু আমাকে যদি গল্পটী সম্বন্ধেই অন্ধকারে রাখা হয় এবং চিত্র গ্রহণের সময় সংলাপ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়, তাহ'লে আমার রূপায়ন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। এর পরিবর্তে, ছবির জন্য কোন বিশেষ গল্প নির্ধারিত হবার পর, যদি সকল শিল্পী মিলে একসংগে গল্পটী আগাগোড়া পড়েন এবং প্রত্যেকের নির্দিষ্ট চরিত্র প্রত্যেকে বুঝে নেন—কোন বিষয়ে কোন মতভেদ থাকলে পরিচালক এবং লেখকের সংগে আলোচনা ক'রে মিটিয়ে নেন—তাহ'লে নিজের নিজের চরিত্রকে মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করার সুযোগ পান। এতে ক'রে নূতন শিল্পীর বিশেষ সাহায্য হয়। সংলাপের ব্যাপারেও, কোন বই আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে যদি নূতন শিল্পীকে তাঁর সংলাপের একটি কপি দিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে তিনি বাড়ীতে সংলাপটী নিজেই তৈরী ক'রে রাখতে পারেন। দু'-একজন পরিচালকের কাছে শুনেছি যে, শিল্পীরা wrong reading নিয়ে আসবেন ব'লে আগে থেকে তাঁদেরকে সংলাপ দেওয়া হয় না। এর উত্তরে আমার ব'লবার আছে এই যে, সে ক্ষেত্রে সংলাপ দেবার আগে পরিচালক নিজে যদি দু'একবার রিহার্সেল দিয়ে দেন তাহ'লে 'wrong reading'য়ের কোন ভয়ই থাকে না। এমনকি পুরোন শিল্পীকেও গল্পটী নিয়ে আলোচনা ক'রবার পর সংলাপটী আগে পেলে বাড়ীতে একটু চিন্তা করার সুযোগ পান এবং তাঁদের অভিনয়ে আরও কৃতিত্ব দেখাতে পারেন ব'লে আমার ধারণা।

তৃতীয়তঃ চরিত্র বণ্টনের ব্যাপারেও নূতন শিল্পীকে অনেক সময় অসুবিধায় প'ড়তে হয়। পুরোন শিল্পীদের বেলায় কে কোন্ চরিত্রে ভালো ক'রবেন, তা প্রায়ই জানা থাকে—এবং সেই হিসেবে পরিচালক তাঁদের ভেতর চরিত্র বণ্টন ক'রে থাকেন। কিন্তু নূতন শিল্পীর বেলায় পরিচালক প্রায়ই তাঁর ইচ্ছামত চরিত্র বণ্টন ক'রে থাকেন—শিল্পীর রুচি, মানসিকতা এবং মেজাজের প্রতি লক্ষ্য না রেখে। যে শিল্পী স্বভাবতঃ শান্ত, ধীর প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি-শীল, তাঁকে হয়ত দেওয়া হ'ল চঞ্চল, রূঢ় কোন চরিত্রের রূপদানে। ফলে অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার অভাবে তিনি ব্যর্থ হ'লেন। এরূপ স্থলে শিল্পীর দোষের চাইতে চরিত্র বণ্টনের দোষই বেশী ব'লতে হবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, যিনি যে কোন চরিত্রে রূপদান ক'রতে সক্ষম তিনিই সত্যিকারের শিল্পী। যে কোন চরিত্রের রূপদান নূতন শিল্পীর পক্ষে একটু কঠিন। যে চরিত্রের সংগে তাঁর নিজস্ব চরিত্রের মিল বেশী, প্রথম প্রথম সেইরূপ চরিত্রে রূপদানই তাঁর পক্ষে সহজ হয়। কিছুদিন অভিনয় ক'রে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নানারূপ চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের পর, তাঁকে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধ স্বভাবের চরিত্র পরীক্ষা করান চ'লতে পারে।

যে 'সেটে' শিল্পীরা অভিনয় করেন সেই 'সেটের' প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাও প্রায়ই নূতন শিল্পীর পক্ষে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। যে সব দৃশ্যে অভিনয় ক'রতে মনে গভীর ইমোশনের সৃষ্টি ক'রতে হয় এবং তাকে চিত্রগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রক্ষা ক'রতে হয়—সেই সব দৃশ্যের অভিনয়ের সময় 'সেট' থাকবে নীরব, নিস্তব্ধ। কিন্তু তার পরিবর্তে সেটের এক অংশে যদি উচ্চ হাসি চ'লতে থাকে এবং
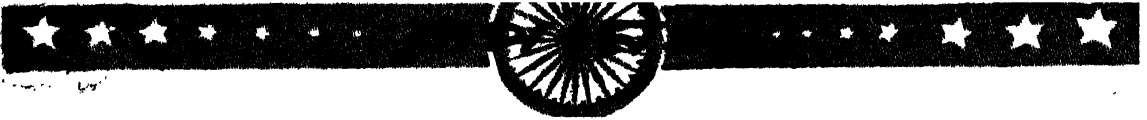
সেটের বাইরে ফ্লোরের অপর অংশে অন্য কোন কোম্পানীর সেট তৈরীর কাজ চ'লতে থাকায় মিস্ত্রীর হাতুড়ির বিকট খটাখট শব্দ শ্রবনেন্দ্রিয়কে পীড়িত করে—মনে হয় যেন ফ্যাক্টরীতে কাজ করছি—তাহ'লে নূতন শিল্পীর পক্ষে ইমোশন রক্ষা ক'রে প্রাণবন্ত অভিনয় করা সবসময়ে সম্ভব হয় না। অথচ, উপরোক্ত অবস্থা প্রায়ই আমাদের ভাগ্যে ঘটে থাকে।

এ পর্যন্ত আমি নূতন শিল্পীর প্রত্যক্ষ অসুবিধাগুলির কয়েকটী সম্বন্ধেই ব'লেছি। এঁদের সাফল্যের পথে কিছু পরোক্ষ বাধাও আছে। সে হ'চ্ছে—গল্পের দুর্বলতা এবং অনিপুণ পরিচালনা ছবির সাফল্যের পক্ষে বহুল পরিমাণে দায়ী থাকে। গল্প যদি ভালো হয়, দর্শকের মনকে অভিভূত করার মত সম্পদ যদি গল্পে থাকে—তাহ'লে দু'এক ক্ষেত্রে অভিনয় ভালো না হ'লেও—দর্শক তাকে গ্রহণ করেন এবং যে সকল নূতন শিল্পী সেই বইয়ে অভিনয় করেন, গল্পের নিজস্বতার জোরে, তাঁরা দর্শকমনের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে থাকেন। কিন্তু গল্পের কাঠামো যদি দুর্বল হয়, অসামঞ্জস্য-তায় ভরা থাকে এবং সংলাপ যদি জোরালো না হয়—তা হ'লে সে গল্প দর্শকমনে রেখাপাত ক'রতে পারে না। ফলে বই মার খায় এবং যে সকল নূতন শিল্পী সে বইয়ে কাজ করেন—অভিনয় ভালো করলেও—তাঁদেরও মার খেতে হয়।

সর্বোপরি আসে পরিচালনার কথা। পরিচালনা ছবির প্রাণ ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। ধরুণ হাওড়ার ব্রিজ তৈরী হ'চ্ছে। ব্রিজ তৈরীর মালমসলা সব ভালো—ভালো লোহা, ভালো কলকব্জা, এমন কি ভালো কারিকর। কিন্তু চীফ ইঞ্জিনীয়ার—যাঁর পরিচালনায় ব্রিজ তৈরী হচ্ছে তিনি হুকুম করলেন ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ব্রিজের মধ্যস্থলে খুব পাতলা লোহা, বল্টু দিতে হবে। ব্রিজ তৈরী হ'লো—কিন্তু একখানি মালবোঝাই মোটরলরী পার হ'তে যেয়ে ব্রিজ মাঝখান থেকে ভেংগে পড়লো। ছবির পরিচালনা ব্যাপারেও ঠিক একই সত্য কাজ করতে দেখা যায়। ভালো গল্প; শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অভিনয় ক'রলেন কিন্তু ছবি দাঁড়ালো না। পরিচালনার দোষে, যে চরিত্র যেভাবে ফুটে উঠে সার্থক হবে এবং দর্শকমনকে অভিভূত ক'রবে, সে চরিত্র সে-রূপ পেল না—অভিনেতার সুন্দর অভিনয় ব্যর্থ হ'ল এবং সে চরিত্র দর্শকের সহানুভূতি পেল না। পুরোন শিল্পীর পক্ষে দু'একখানা ছবির ব্যর্থতা কিছু যায় আসে না। কেন না অভিনয় শিল্পে তাঁর স্থান ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে। কিন্তু নূতন শিল্পী যিনি ঐ ছবিকে ভিত্তি ক'রে দাঁড়াবেন—সে ছবির ব্যর্থতা তাঁর শিল্প-জীবনের উন্নতির পথে রূঢ় আঘাতের মত বেজে ওঠে। অথচ সে ব্যর্থতার দায়িত্ব তাঁর ছিল না—সে দায়িত্ব ছিল পরিচালনার। যে সকল নূতন শিল্পী তাঁদের শিল্প-জীবনের প্রারম্ভে সহানুভূতি-শীল দক্ষ পরিচালকের হাতে প্রস্তুত হবার সৌভাগ্য পেয়েছেন—তাঁদের উজ্জল ভবিষ্যতের শঙ্খধ্বনি অল্পদিনেই শোনা গেছে। কিন্তু যে সকল দুর্ভাগ্য শিল্পী তা পাননি, শিল্পজগতে তাঁদের স্থান ক'রে নিতে অশেষ সাধনা এবং নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রগতির দুর্গম পথে চলতে হ'য়েছে।

গতমাসের রূপ-মঞ্চে শ্রীপার্থিব পূর্বরাগের সমালোচনা প্রসংগে আমাকে তথা সমস্ত নূতন শিল্পীকে যে কতকগুলি কথা বলেছেন, তার জন্য নূতন শিল্পীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাবো। তিনি বলেছেন—"অভিনয় শিক্ষাদেবার কোন ব্যবস্থাই নেই, কর্তৃপক্ষও কোন দৃষ্টি দেন না—কিন্তু এই বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে আজকে যাঁরা অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁদেরও এগিয়ে আসতে হ'য়েছে। যা নেই, তার জন্যে হাহুতাশ করলে চলবেনা—তার আশায় বসে থাকলেও চলবেনা।......প্রত্যেক শিল্পীকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজস্ব অধ্যবসায় দ্বারা নিজের দুর্বলতা শুধরে নিতে হবে, ইত্যাদি।" তাঁর এই শুভেচ্ছার বাণী আমি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছি।

পরিচালকের কি কি গুণ থাকা দরকার

খগেন রায়

শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা দরকার, সিনেমা সাংবাদিকের কি কি বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, এসব বিষয়ে খগেন রায়ের বলবার যেমন অধিকার ও যোগ্যতা আছে, তেমনি পরিচালকের অভিজ্ঞতা তাঁকে এই প্রবন্ধ-রচনার অধিকার দিয়েছে। শিক্ষকের অন্তরে বাস করে এক চিরন্তন ছাত্র, সমালোচকের মনে আত্মসমালোচনার একটি সজাগ দৃষ্টি সর্বদা চেয়ে থাকে, রসবোধের প্রখরতা তার মনে রসসৃষ্টির প্রেরণা জাগায়। চিত্রপরিচালক খগেন রায় জীবনে অনেক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন—পরিচালকরূপেও তিনি গভীর সাধনার মধ্য দিয়ে জয়যুক্ত হ'য়েছেন।

গত বছর শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের অনুরোধে "পরিচালকের বাধা-বিপত্তি"-র কথা নিয়ে শারদীয়া সংখ্যার রূপ-মঞ্চে আলোচনা করেছিলুম। এবারকার ফরমায়েসী 'Subject-matter'টিও গত বছরের লেখা বিষয়ের সংগে পরোক্ষভাবে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। কেমন করে—সেইটে বোঝাতে পারলেই আমার বক্তব্য অনেকটা পরিষ্কার হবে। পরিচালকের গুণ যে কি কি বা কতগুলি হলে ভাল হয় সেটা প্রথম চেষ্টায় হিসেব করা কষ্টকর। পরিচালনার ক্ষেত্রে, ইংরাজীতে যাকে বলে Paper qualifications, তার ওপর আস্থা স্থাপন করে' অনেক ক্ষেত্রেই আশাহত হয়ে আমরা ঠকেছি। উচ্চশিক্ষিত, কৃষ্টিসম্পন্ন মন নিয়ে যে ব্যক্তিটি হয়তো এলেন, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাঁর মনটা হয়তো সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রেই নিজের প্রকৃষ্টতর পরিচয় দিতে পারতো, সিনেমার ব্যবহারিক প্রয়োজনে (Applied-needs) তিনি নেহাতই নগণ্য। এরকম দৃষ্টান্ত কারো পক্ষেই সুখকর নয়, অন্ততঃ যে ব্যক্তি গভীর অধীত বিদ্যা নিয়ে সিনেমার পিচ্ছিল পথে পা বাড়িয়েছেন কিন্তু ঠিক হাঁটতে পারছেন না, তাঁর পক্ষে তো নয়ই। আবার এর ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ বিদ্যাস্থানে যাঁর শূণ্য, নামটা সই করবার চেয়ে বেশী কিছু করতে গেলে দামী (লোকদেখানো ?) পার্কার কলমটি যাঁর আপত্তি করে কিন্তু যিনি Out and out a technical man, যান্ত্রিক অনুসন্ধিৎসা ও কিঞ্চিত কুশলতাকে যিনি মনে করেন পরিচালকের পক্ষে একমাত্র ও অপরিহর্তব্য গুণ,—সেটাও দৃষ্টান্ত হিসেবে অস্বস্তিকর নয়। আবার এতদুভয়ের মধ্যে যদি একটা মাঝামাঝি অবস্থা কল্পনা করে নেওয়া যায়, তাহলে আপাত বিচারে প্রয়োজন সিদ্ধহয় বলে' মনে হলেও ঠিক হয় না। আসল কথা, আনুমানিক গুণাবলীর একটা তালিকাই তৈরী করা যায়, ফললাভের কোন Guarantee দেওয়া যায়না।

চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেটা বিশেষ করেই এবং বার বার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিচালকের যে গুণটি সর্বোপরি থাকা চাই, সেটা হচ্ছে সিনেমা-মন (Cinematic mind)। সিনেমার একটা প্রচ্ছন্ন নিজস্ব সুর ও ছন্দ আছে, যেটা সাহিত্যমনার পক্ষেই আয়ত্ত করা সব চেয়ে সোজা, আবার যেটা একান্ত সাহিত্যিক মন নিয়ে যাঁরা সিনেমারাজ্যে বিচরণ করতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজও আয়ত্ত করতে পারেননি। এটাকে এক কথায় Technique বললেও আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। অথচ সিনেমা ছবির নিতান্ত মামুলি ও গতানুগতিক নির্মাণপদ্ধতি, যেটাকে 'টেক্‌নিক্' বলে আমরা কাজ সারি, আমার উপরোক্ত সুর ও ছন্দ সেই টেক্‌নিকের অন্তর্গত নিশ্চয়ই নয়। এটা হচ্ছে ললিতকলার ক্ষেত্রে যাকে বিদেশীরা বলেন That additional somthing—যেটার অবিসম্বাদী অধিকারী বলে পলমুনি দর্শকমনকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিতে পারেন অথবা উদয়শঙ্কর শতসহস্র সত্বাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে' বিজয়ীর গর্বে নৃত্যমঞ্চ থেকে Exit

করে থাকেন। এটা নিশ্চয়ই বলে' দিতে হয়না যে, এই গুণটি বর্ণিতব্য নয়, একান্তই অনুভূতিগ্রাহ্য।

এই সিনেমামননতার অভাব আমাদের রাজ্যে পথ চলতে গেলেই নিজের ও প্রতিবাসীদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা করতে একটা দুর্বার ইচ্ছা জাগে—তবে কেন? অভিজ্ঞতা দ্বারা এই অভাবটা পূরণ করে নেবার ইচ্ছে হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু প্রশ্ন উঠবে শ্রমশীলতা ও চেষ্টা এই অভাবের পরিপূরক হ'তে পারে কি? আমার মনে হয়, সিনেমা-মন যাঁর নয় বা নেই তাঁর দুঃখীত না হয়েই এই রাজ্য থেকে বিদায় নেওয়া উচিত। "রূপমঞ্চ" কাগজখানাকে সৌহার্দ্যের জোরে নিজের চিন্তাধারার বাহক বলেই ভেবে থাকি। তাই, রূপ-মঞ্চের মারফত একথা জানাতে দ্বিধা বোধ করছিনা যে, সিনেমার সেই additional something আমার আয়ত্তের বাইরে যদি দেখি ও বুঝি, তবে নিশ্চিত ধরে নেব পরিচালকের নির্দিষ্ট পথে আমার জন্য no thoroughfare নোটিশ টাঙানো রয়েছে। আমার সহকর্মীও সহধর্মীদের যাঁরা অনুরূপ বোধ করে' আমার প্রত্যাবর্তনের পথে সংগী হবেন, তাঁদের কাছে আমি অনুগৃহীত থাকবো।

কেন যে পরিচালকের গুণাবলীর লিষ্ট না খাড়া করে' উল্টো গাইলুম, তা' ঠিক বোঝাতে পারব না। বোধ হয় negative দিয়ে positive প্রমাণিত করবার চেষ্টা করে থাকবো। তবে একথা সত্যি যে, সিনেমা-মনকেই আমি পরিচালকের গুণাবলীর মধ্যে প্রথম স্থান দিতে চাই। এই সিনেমা-মন নামক বস্তুটাকেই একটু বিশ্লেষণ করলে অন্যান্য গুণগুলিও বর্ণিত হয়ে থাকে।

গত শারদীয়া সংখ্যার এই কাগজে আমি লিখেছিলুম—"পরিচালনা করতে এসে 'পরিচালনা' কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থটার, বিশেষ করে 'পরি' এই উৎসর্গটির মধ্যে ব্যাপ্তির যে ইংগীত রয়েছে, সেইটেই পরিচালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাকে একটু বেশী রকমের সচেতন করে দিয়েছে। দুরূহ পাঠসমস্যা ছাত্রকে যেমন ভাবিয়ে তোলে, পরিচালনার multi-sided বা বহুমুখী দায়িত্ব আমাকে তেমনই চিন্তান্বিত করে তোলে। এটা শুধু উপমা নয়—কঠোর অবিমিশ্র সত্য।" পরিচালকের overall দায়িত্বটা শুধু গুরু নয়, মারাত্মক। এই দায়িত্ববোধ থেকেই বোধ হয় তাঁর পক্ষে অপরিহর্তব্য গুণাবলীর জন্ম। এই গুণাবলীর মধ্যে circumspection বা দৃষ্টিপরিধির অখণ্ডত্ব অত্যন্ত মূল্যবান। পরিচালকের দৃষ্টি নির্মীয়মাণ ছবির গণ্ডী অতিক্রম করে বহুদূরে চলে যায়, অন্ততঃ যাওয়া উচিত। তাঁকে ছবি তুলতে তুলতে নিজেকে দর্শকরূপে কল্পনা করে নিয়ে নিজের কাজের বিচার করতে পারলেই বোধ হয় ভাল হয়। গৃহ্যমান shot-টি নাটকীয়তার দিক থেকে খাটো হচ্ছে না আতিশয্য-দোষ দুষ্ট হচ্ছে, সেটি তাঁকে বিচার করে নিতে হবে তখন তখনই। এক কথায়, তাঁর ভাগ্য নিণীত হচ্ছে ওই সট্‌গুলির মধ্যে দিয়েই। নাটকীয়তা ও কাহিনীগত যথার্থ্য রক্ষিত হচ্ছে কিনা, এটা যখন তাঁকে সংগে সংগেই বিচার করে' নিতে হয়, তখন বিচারক্ষমতাও তাঁর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিচারক্ষমতা দর্শকের বিচারসহ হওয়া দরকার, এটা বোধ হয় বলে দেবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ নাট্যরীতি ও অভিনয়কলা সম্বন্ধে তাঁর কানটা একটু বেশী থাকাই দরকার। আমাদের দেশের অনেক পরিচালক মনে করেন, সিনেমা ভাল shot-taking এর সমষ্টি। 'সট্' বস্তুটি যে গল্পের বাহন মাত্র, চক্ষুকে পীড়া না দিলেই এর কাজ ফুরিয়ে গেল না, অদৃশ্য নাটকীয়তার সংগে এর সমসুরতা থাকা চাই, এটা ভুললেও চলবে না। অনেকে আবার অভিনয়ের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেন, যেন ক্যামেরার উপস্থিতিটা একেবারে গৌণ। ক্যামেরা যে আসলে দর্শকের চোখ, এটা Primary বা elementary সত্য বলেই বোধ করি আমরা

এত বেশী করে ভুলে যাই। ক্যামেরা বস্তুটি auditorial vision plus, অর্থাৎ দর্শক যেমনটি করে' দেখতে অভ্যস্ত নয়, তেমন বিস্ময়করভাবে কিছু দেখানোও ক্যামেরার কাজ। অতএব নূতনতর ভাবে সাধারণ জিনিষকে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করাও পরিচালকের কাজ। অতি-অভ্যস্ত আপনার বা আমার গৃহকোণটি যেমন পড়ন্ত সূর্যালোকে এক এক সময় অপরূপ দেখায়, একটি বার বার দেখা মুখকেও পরিচালক ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে নবতর করে দেখাতে পারেন।

সুতরাং সুপরিচিতকে অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত মাধুর্য দিয়ে পরিবেশন করতে পারলে সেটা পরিচালকের পক্ষে বিশিষ্ট গুণ বলেই পরিচিত হবে।

আর একটা গুণের উল্লেখ করেই এই নিবন্ধটি শেষ করবো। এটি হচ্ছে চরিত্র বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা। লেখক অনেক সময় দু'চারটি সংলাপ দিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেন। সেই সংলাপের ভিতর দিয়ে পূর্ণাবয়ব চরিত্রটিকে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করার কার্যটা পরিচালকের। অনেক সময় লেখকের রচনায় চরিত্রটার রূপ সম্পূর্ণ ফুটে উঠতে পায় না। এখানেই পরিচালকের কৃতিত্বের পরিচয় হয় সব চেয়ে বেশী। পরিচালক ফ্রাংক ক্যাপরার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁর চরিত্রচিত্রণের ক্ষমতা অনন্যসাধারণ! You Cannot Take It With You অথবা Mr. Deeds Goes to Washington চিত্রগুলি তার সাক্ষ্য। আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য পরিচালক শৈলজানন্দ আমার মতে এদিক দিয়ে অতুলনীয়। দর্শক মন নিয়ে কারবার করতে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সহজে স্বীকার না করলেও নিশ্চয়ই বুঝবেন, চরিত্র সৃষ্টি করে দর্শকমনকে পরিতুষ্ট করা কত কঠিন। সুতরাং সার্থকভাবে চরিত্রসৃষ্টি করতে গেলে অভিনেতা ও অভিনেত্রী বাছাই করাটাও সার্থকভাবে করতে হবে। রামের পার্ট শ্যামকে দিলে রাম নিয়তির সাহায্যে প্রতিশোধ গ্রহণ
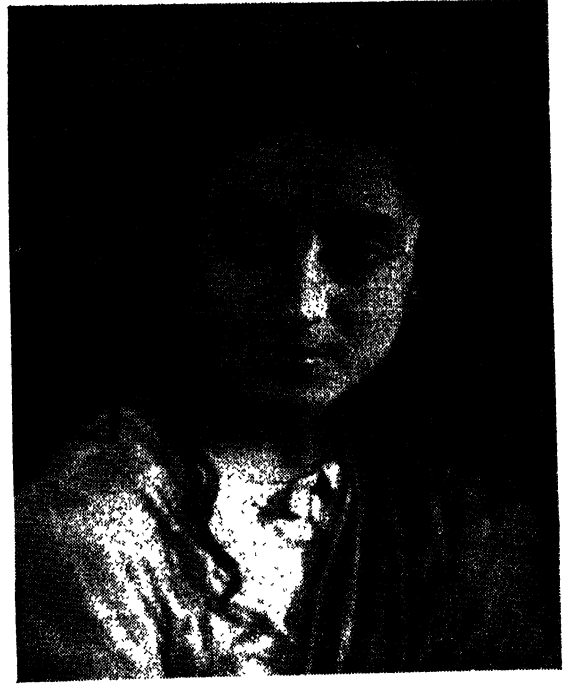
নবাগতা সুধা রায় বি-এ 'বিচারক'-এ দেখা যাবে

করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না। অতএব এই casting ব্যাপারটির সমাধা করতে হবে বেশ একটু বিচক্ষণতার সংগে। সংগে সংগে পরিচালকের মনটীকেও হতে হবে একান্ত সজীব, যাকে ইংরাজীতে বলে "live wire mind।" একজন বিশিষ্ট বিদেশী সমালোচক বলেছেন,........."the Director's must necessarily be a live wire mind through whose focal strength and precision he will visualise things and situations in their dramatically proper correctitude and portray them accordingly."

পরিচালকের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সংহিত, সারীভূত অবস্থার এর চেয়ে প্রকৃষ্টতর বর্ণনা হয় কি ?

চিত্তপটের চলচ্চিত্র

নরেন্দ্র দেব

পীঠ ও পটের উপর যাঁদের আবির্ভাব একদা আমাদের মুগ্ধ করেছিল, আনন্দ দিয়েছিল, যাঁদের দেখবার জন্য আমরা 'কিউ' দিয়ে একদিন বুকিং অফিসের সামনে সময়ের মূল্যকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে দাঁড়িয়েছি, ডবলদাম দিয়েও গুণ্ডাদের কাছে প্রসন্ন মনে টিকিট কিনেছি—চিত্র-জগৎ থেকে তাঁদের নিঃশব্দে তিরোভাব আমাদের কিছুমাত্র বিচলিত করেনা দেখি! এতটা অকৃতজ্ঞতা কিন্তু সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। কোথায় গেল সেই প্রথম চলচ্চিত্র তারকা মনোরমা? চণ্ডীদাসের উমাদেবীর খবর কি? রাজনটীর বীণা কোথা? মেনকা নিরুদ্দেশ কেন? এইরকম ছোটবড় কত তারকাই আজ যবনিকার অন্তরালে বিলীন হয়ে গেছে।

কবি নরেন্দ্র দেব কাব্য জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেও কোনদিন আত্ম-তৃপ্তিতে মশগুল থাকেন নি। তাঁর সৃজনি প্রতিভা সাহিত্য ও শিল্প-কলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। ছায়াচিত্র বহু পূর্বেই তাঁর স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়—ছায়াচিত্রের সত্যিকার রূপারোপে আজও তাঁর চিন্তাধারা অব্যাহত গতিপথ বেয়ে ছুটে চলে। ছায়াচিত্রের দীনতা ও মালিন্য অপসারণে তাঁর দরদী মনের ব্যাকুলতা সর্বজন বিদিত।

গৌরব বাহিনী নায়ক-নায়িকা ও চিত্র-তারকাদের, যাঁরা আজ চিত্রগগন থেকে অস্তমিত হলেও আমাদের চিত্তগগনে এখনও সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হ'য়ে যান নি?

* * *

আর যাঁরা জীবনের মধ্যাহ্নে এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেছে, সেই অকালে চলে যাওয়া নায়ক-নায়িকাদের স্মৃতিবাসরের অনুষ্ঠান করা কি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য নয়? শীলা হালদারকে কি আমরা এর মধ্যেই ভুলে যাব? হিমাংশু রায়ের কথা কি আর কেউ মনে রাখবে না? দুর্গাদাসকে কি আমরা বিস্মৃত হবো? প্রতিবছর একটাদিনে কি এই সব হারামণিদের স্মরণ-সভার আয়োজন করা যায় না? চলচ্চিত্র-চঞ্চরীকেরা কথাটা

এঁদের স্মরণ রাখবার কোনও ব্যবস্থা করা যায় না কি? খেলার মাঠে যেমন মাঝে মাছে 'ওল্ড ভেটারেনস্‌দের' টেনে আনা হয়, কোনও চিত্র-প্রতিষ্ঠান কি বার্ষিক একখানা অন্ততঃ একশ' ফুটের ছবি করেও 'অ্যানিমেটেড গেজেটের' মতো দেখাতে পারেন না সেই সব অতীত

একটু ভেবে দেখবেন।

* * *

অনেকের মুখেই শুনি, অমুক নাটকখানির রঙ্গমঞ্চে যে অপূর্ব অভিনয় দেখেছি—চিত্রপটে তা ব্যর্থ মনে হ'ল। কিন্তু এর কারণ কি? বরং উচিত ছিল ত' ঠিক এর
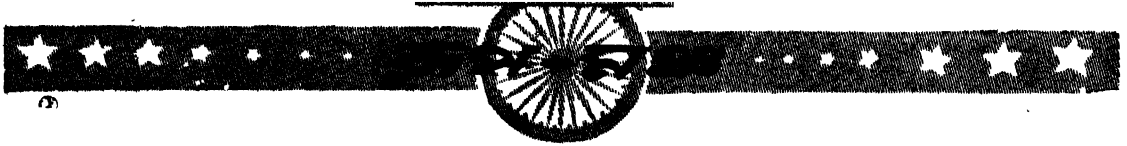
বিপরীত হওয়া। অর্থাৎ, রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয় চিত্রপটে দেখাবার সময় সেটা তো বহুগুণে ভাল হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট একান্ত কৃত্রিম এবং তার প্রকাশও সীমাবদ্ধ। বিচিত্র প্রকৃতির রমণীয় পটভূমিকা থেকে রঙ্গমঞ্চ একেবারেই বঞ্চিত। শহরের ঘর বাড়ীও যেন তাসের প্রসাধ বলে মনে হয়। যেটুকু বহুব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে তাঁরা করবার চেষ্টা করেন, শেষপর্যন্ত সেটা ছেলে খেলা বলেই মনে হয়! চাঁদ ওঠা, সূর্য ডোবা, ঝর্ণাধারা, ঝড়বৃষ্টি, নৌকাডুবি—অতি হাস্যকর প্রচেষ্টা! কারুকলার দক্ষতা ও যন্ত্রশিল্পের কৌশলের দিক দিয়ে তার একটা দাম আছে অবশ্য, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ যে রঙ্গমঞ্চই—একথা তাঁরা আমাদের ভোলাতে পারেন না।

*　　*　　*

এদিক দিয়ে চলচ্চিত্রের সুযোগ অপরিমিত। রাজপথের দৃশ্য, মোটর, ট্রেণ, জাহাজ, এয়ারোপ্লেন, সমুদ্র, নদী, ঝরণা, অরণ্য, পর্বত কুসুমিত উদ্যান, গৃহসজ্জা আসবাব কিছুরই তার অভাব নেই। অভিনয়ের সময় সামনে তার অসংখ্য দর্শকের কালো মাথা আর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না। তবু ষ্টেজে যে সব নাটক সগৌরবে শতরাত্রি উত্তীর্ণ হয়, চলচ্চিত্রে তা' সাত সপ্তাহে হোঁচট খায় কেন?

*　　*　　*

কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, ঐসব মঞ্চগৌরব নাটকগুলি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে এসে এমন সব পরিচালকদের হাতে পড়ে, যাদের না আছে সিনেমা সেন্স, না আছে উচ্চাংগের নাট্য-বোধ। ধনীর মোসাহেবী করে যে সব অযোগ্য ব্যক্তি পরিচালকের পদ পেয়েছে—সেই সব মূর্খই নাটকগুলিকে হত্যা করে। এই সব ঘাতকের অপটু হাতে অনেক ভাল ভাল গল্পও জবাই হ'তে দেখে ক্ষুব্ধ হ'তে হয়েছে।

*　　*　　*

আবার এমনও একাধিক অশিক্ষিত পটু দুঃসাহসী পরিচালকও দেখতে পাওয়া যায়, যারা বাল্মীকি বেদব্যাসের চেয়েও নিজেদের বড় কবি বলে মনে করেন। কালিদাসের মুখে চুন কালি মাখাতে তাঁরা লজ্জা বোধ করেন না। এঁদের হাতে বঙ্কিমচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হন, রবীন্দ্রনাথের ললাটে ফুটে ওঠে কলংকরেখা, শরৎচন্দ্রের শুধু চরিত্রহীনতাই প্রকাশ পায়! এসব পরিচালককে 'ক্রিমিন্যাল' বলেই গণ্য করা উচিত। এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির হত্যাকার্যে এঁদের যাঁরা প্রশ্রয় দেন, তাঁদের 'এডিং এণ্ড এ্যাবেটিং' চার্জে শাস্তি হওয়া দরকার। নইলে এ অরাজক উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হবার কোনো উপায় নেই।

*　　*　　*

একটা দুঃসংবাদ কানে এল। চলচ্চিত্র রাজ্য নাকি ক্রমশ চিত্র-তারকাদের শাসনাধীনে গিয়ে পড়েছে। তবে, আশার কথা এই যে, এখনও তাঁরা এটাকে চিত্রাংগদার নারী রাজ্যে রূপান্তরিত করতে পারেন নি। মেয়ে প্রডিউসার, ডাইরেকটার একাধিক আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু মেয়ে ক্যামেরা্যা-ম্যান (excuse me 'ক্যামেরা উয়োম্যান') এখনও কোনও স্টুডিয়োতে দেখা দেন নি। তবে, অদূর ভবিষ্যতে এঁদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। কারণ, এক হিসাবে স্বভাবতই মেয়েদের প্রডিউসার বলা চলে, এবং বর্তমানের অনেক গৃহস্থালীতে তাঁরাই প্রকৃত ডাইরেক্টার! আর সৃষ্টির আদি থেকে in-camera তাঁরা যে অনেক কিছু করেন, এত অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং 'ক্যামেরা-উয়োম্যান' আসন্ন বলেই মনে হয়।

*　　*　　*

এদেশে চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিবাহ এখনও হলিউডের অনেক পিছনে পড়ে আছে। যা দু'চারটে অপ্রত্যাশিত প্রজাপতির নির্বন্ধের খবর বাংলায় ও বোম্বাইয়ে পাওয়া গেছে, তা সুখের হয়নি। নিখিল-ভারত-প্রখ্যাতা দুটি অভিনেত্রী শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের সীমান্তের বহির্ভূত মানুষের কণ্ঠেই তাঁদের বরমাল্য দিয়েছেন! একজন ছায়া ছবির সংসার ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে গেছেন। ইনি বড় ঘরের মেয়ে বলে জানি। অন্যজন স্টুডিয়োর অপরিহার্য মোহে স্বামীর ঘরকে বড় বলে মনে করতে পারেন নি। ইনি তাই ছায়ার মায়ায় আজও আবদ্ধ হয়ে আছেন। অথচ এঁরই সমগোষ্ঠীর মেয়ে বীণাদেবী শুনছি সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর করছেন! একেই বলে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম—!

বোম্বাইয়ের একখানি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পত্রিকার নামকরা সম্পাদক কিছুদিন আগে অকস্মাৎ একটি চিত্রতারকার পাণিপীড়ন ক'রে আমাদের বিস্মিত করেছিলেন। কিন্তু সেদিন যখন শোনা গেল যে, তিনি পত্রিকা সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলচ্চিত্র পরিচালকের পদে সমারূঢ় হয়েছেন, তখন তাঁর ক্রমিক রূপান্তরের ধাপগুলির একটা অর্থ ও সংগতি খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু, বাংলাদেশে হঠাৎ সেদিন একজন তরুণ চিত্র-নাট্যকার একটি নবীনা চিত্র-তারকাকে পত্নীপদে বরণ করেছেন শুনে এবার আর বিস্মিত না হ'য়ে পুলকিত হ'য়েই ভাবছি—ততঃ কিম্?

*   *   *

ছবির দিক দিয়ে বাংলাদেশ যে বোম্বাইয়ের চেয়ে অনেক নেমে গেছে, তার মর্মন্তুদ প্রমাণ হ'ল, বাংলার রাম-শ্যাম-যদু জাতীয় ভাগ্যান্বেষী পরিচালকেরা আজকাল বোম্বাইয়ের নিম্নশ্রেণীর ছবিগুলোরও নির্লজ্জ অনুকরণ করছে! বিশেষ করে আবার গানগুলো! গানের ভাষা—গানের সুর—গান গাওয়ার ভংগী সমস্তই বোম্বাই প্যাটার্নের। গানের সুরের ভিতর দিয়েও যে দর্শকের মনে যৌন আবেদনের সঞ্চার করা যায় বোম্বাইয়ের ছবির লাছাড়ি ছন্দের হিন্দি গানই বাঙালীকে প্রথম সে শিক্ষা দেয়। হ্যাংলার মতো আমরা তার অনুকরণ সুরু করেছি। আরও একটা চিত্তজয়ের সহজসূত্র বোম্বাই আমাদের শিখিয়েছে যে, —গান যে করবে, সে সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত পরিবারের ভদ্র কুমারী মেয়ে হ'লেও তাকে ছবিতে পেশাদার বাঈজীর ঢঙে চোখ ঘুরিয়ে, ভ্রূ নাচিয়ে, ঘাড় দুলিয়ে শ্রীঅংগের অনংগানুগ সঞ্চালনে উঠে হেঁটে ঘুরে-ফিরে, এগিয়ে-পেছিয়ে, হেলে-দুলে গানটি গাইতে হবে! বাংলা গান বাংলা সুর যে রিরংসাদ্যোতক নয় একথা স্বীকার করি কিন্তু চিত্তজয়ের শক্তি তারও আছে। যৌন আবেদনের যদি জরুরী কোনো প্রয়োজন থাকে ছবির বিশেষ কোনও দৃশ্যে আপত্তি করব না। কিন্তু নির্বিচারে ভদ্র অভদ্র সকল সমাজে; ক্ষেত্র ও পরিবেষ্টন নিরপেক্ষ হ'য়ে যদি ছবির গানে এই মদনোৎসব অভিনীত হয় তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু নেই! এ আপদ কি বন্ধ করা যায় না!

*   *   *   *

রংগমঞ্চ ছিল এতদিন বাঙালী জাতির শিক্ষার বাহন। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকাভিনয় দেখে আমারা অনেকেই এমন সব দৈনন্দিন, সামাজিক ও সাংসারিক নীতি শিক্ষা পেয়েছি, যা স্কুলের পাঠ্য পুস্তক পড়ে পাইনি। তবে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বত ধারণের চেয়ে গোপীনীদের বস্ত্র হরণেই অধিকতর আকৃষ্ট হন, তারা কেউ কেউ যে দুর্নীতি শিখেছেন এটা অস্বীকার করব না। কিন্তু এটা আমাদের মানতেই হবে যে, রংগমঞ্চ আমাদের অপকার অপেক্ষা কল্যাণই করেছে বেশী। জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের জন্য রংগমঞ্চের কাছে আমরা প্রকৃত ঋণী। চলচ্চিত্র আজ রংগমঞ্চের সংগে প্রতিযোগিতায় সেই আসনই অধিকার করেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ পরিচালকেরই এ গুরু দায়িত্বের কথা মনে থাকে না। তাঁরা ছবির entertaining qualities এর দিকেই দৃষ্টি রাখেন এত বেশী, যার ফলে ছবির educative value টুকু হারিয়ে যায়। এদিকে আমরা পরিচালকদের একটু অবহিত হ'তে বলি। জাতকে গড়ে তোলা, তার দৃষ্টি-ভংগীকে প্রসারিত ও মনকে উদার করে তোলা—জাতকে বড় করে তোলার দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের উপর। সে সুযোগ রয়েছে তাঁদের হাতের মুঠোয়; তাঁরা যেন সুযোগ অবহেলা করে তাঁদের কর্তব্যের ত্রুটি না করেন এই অনুরোধ। দেশপ্রেম, সমাজ-সংস্কার ও শ্রেণী-বিরোধী কয়েকখানি ছবি সম্প্রতি পর্দার উপর দেখা দিয়েছে, সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, পেট্রিয়টিজমকে commercially exploit করা ছাড়াও এর পিছনে পরিচালকদের সৎ-উদ্দেশ্যও আছে।

বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়ার কথা

নিতাইচরণ সেন

বৈদেশিক চলচ্চিত্র সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক পাঠক সাধারণের চাহিদা মেটাবার জন্য বর্তমান প্রবন্ধটী প্রকাশ করা হ'লো। ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের প্রায় পঁচিশ বছরের কর্মতৎপরতাকে যথাযোগ্য ভাবে বর্তমান প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে।

ব্রিটিশ সবাক ছায়াচিত্রের গোড়ার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের সংগ্রাম মুখর ইতিহাসের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই ব্রিটেনের চলচ্চিত্র জগতে আমেরিকার একাধিপত্য ছিল বল্লেই হয়। অনেকের অভিমত, যুদ্ধটাই আমেরিকার চিত্র ব্যবসায়ীদের বৃটিশ চলচ্চিত্র জগতে এই একাধিপত্যের সুযোগ এনে দিয়েছিল। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও, অর্ধ সত্য। একথা স্বীকার করতেই হবে, প্রথম মহাযুদ্ধ ব্রিটেনের চলচ্চিত্র জগতে আমেরিকার চিত্রব্যবসায়ের অগ্রগতির পথে সাহায্য করেছিল অনেকখানি। ডি, গ্রিফিথ প্রভৃতিদের মত প্রয়োগ শিল্পী—আমেরিকার স্বাভাবিক আবহাওয়া—দৃশ্যাবলী—অধিকন্তু আমেরিকার জাতীয় সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব—পৃথিবীর চলচ্চিত্র বাজারে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মতই ব্রিটেন তার চলচ্চিত্র শিল্পের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কিন্তু আমেরিকার সংগে যেন কোন মতেই এঁটে উঠতে পারে না। আমেরিকার চিত্রশিল্প ব্রিটেনে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পেরও যেন বিরাট প্রতিবন্ধক রূপে দেখা দিল। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প ব্রিটেনেও তখন ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। এবং এমন কী চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ, শিল্পী ও কর্মী গঠনেও ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প তখন অবধিও সক্ষম হয়ে ওঠেনি। কারণ, এঁদের জীবিকার সংস্থান করা তখন অবধিও চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে সব ইংরেজী চিত্র গড়ে উঠছিল, আমেরিকান ছবির কাছে তার মান ছিল অনেক নীচু। মার্কিন চিত্রশিল্পের সংগে সম্মুখ প্রতিযোগিতায় বহুবার ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পকে দাঁড়াতে হ'য়েছে—কিন্তু বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মার্কিন চিত্রের গণ্ডি ভেদ করে পথ করে নিতে পারে নি। ১৯২৩ খৃঃ এ ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্ম লীগ (British National Film League) গড়ে ওঠে। এবং এদের উদ্যোগে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি দর্শক সাধারণকে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কেবল মাত্র ব্রিটিশ চিত্রের প্রদর্শনী-সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। কিন্তু তাও ব্যর্থতায় পর্যবশিত হ'লো। হলিউড থেকে অসংখ্য ছবি এসে ব্রিটেনের বাজার ছেয়ে ফেললো। প্রদর্শকেরা অদূর ভবিষ্যতের জন্য এই চিত্রগুলি প্রদর্শনার জন্য চুক্তি করে রাখলেন। আমেরিকার চিত্র শিল্পের পক্ষে এতে কোন অসুবিধাই হ'লো না। কারণ, একখানি ছবি থেকে টাকা সংগ্রহ করবার যে প্রাথমিক প্রয়োজন, তাত তাঁরা নিজেদের দেশ থেকেই সংগ্রহ করেছে। বৈদেশিক বাজার থেকে টাকা সংগ্রহের জন্য বেশ কিছুদিন তাঁরা অপেক্ষা করতে পারবে। অথচ ব্রিটিশ চিত্র-শিল্পের কাছে এই অগ্রিম চুক্তি একটা মস্ত সমস্যারূপে দেখা দিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হিসাব কসে দেখা যায়, ব্রিটেনে যে সব চিত্র প্রদর্শিত হ'য়েছে, তার শতকরা ৯৫ ভাগই মার্কিন চিত্র। মার্কিন চিত্র ব্যবসায়ীরা ব্রিটেনের বাজারে প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য এতই উঠে পড়ে লাগলেন যে, অন্ধের মত চিত্র প্রদর্শকদের সংগে চুক্তি করে যেতে লাগলেন। একে চিত্র ব্যবসায়ীদের সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে 'ব্লাইণ্ড বুকিং' (Blind-Booking) বা আন্দাজে চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা মার্কিন চিত্র ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের সামনে এক অবরোধের সৃষ্টি করলো। যেমন মনে করুন,

মার্কিন পরিবেশক ৪১৫৬, থেকে দশখানা ছবি উপস্থিত করলেন ব্রিটিশ প্রদর্শকদের কাছে। এর হয়ত একখানা বা দু'খানা কেবলমাত্র মুক্তি পেয়েছে—বাকীগুলো নায়ক-নায়িকা, কাহিনীকার বা পরিচালকের নাম দেখেই ব্রিটিশ প্রদর্শকদের চুক্তি করতে হ'লো। তাছাড়া দু'একখানা ভাল ছবি অর্থাৎ যার নিশ্চিত আর্থিক সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে—সেই চিত্রগুলির লোভ দেখিয়ে অন্য বাজে ছবি গুলিও প্রদর্শনার জন্য চুক্তি করে রাখলো। মার্কিন চিত্র ব্যবসায়ীদের এই চাতুরীতে অনেকেই বিষিয়ে উঠলেন। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পের জন্য সংরক্ষণ আইনের আন্দোলন দেখা যেতে লাগলো ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেই। এবং এ বিষয়টিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীতে বিচার করবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হ'লো। এই আন্দোলনের ফলে 'Blind-Booking' বন্ধ করবার জন্য 'সিনেমেটোগ্রাফ ফিল্ম এ্যাক্ট ইন ১৯২৭' (Cinematograph Film Act in 1927) পাশ হ'লো। এই আইনটীর মূল উদ্দেশ্য হ'লো—"an act to restrict blind booking and advance booking of Cinematograph Films, and to secure the renting and exhibition of a certain proportion of British films and for purposes connected therewith." অর্থাৎ অন্ধের মত ছবি না দেখে ও অগ্রিম চুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্রিটিশ চিত্রের বাধ্যতামূলক প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করা। প্রথমতঃ 'ব্লাইণ্ড বুকিং' নিষিদ্ধ করে ছবির মালিক ও প্রদর্শকদের হাত বেঁধে দিয়ে ব্যবসায়ের গতি সাধারণ ভাবে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করলো। দ্বিতীয়তঃ যে পরিমাণে বৈদেশিক চিত্র দেখানো হবে সেই পরিমানে ব্রিটিশ চিত্রের বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'লো। এই আইনটী 'প্রথম কোটা আইন' (First Quata Act) রূপে পরিচিতি পেল। পরিবেশকদের কোটা ১৯২৮-২৯খৃঃ-এ ৭½% থেকে ১৯৩৪-৩৫ খৃঃ ২০% এবং প্রদর্শকদের কোটা ১৯২৮-২৯ খৃঃ এ ৫% থেকে ১৯৩৪-৩৫ খৃঃ-এ ২০%-তে বৃদ্ধি পেল। ১৯২৮ খৃঃ-এর ১লা জানুয়ারী থেকে বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু তার পূর্বেই সমস্ত চিত্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক ওলোট পালট পরিলক্ষিত হয়। নির্বাক ছবি তখন সবে মাত্র কথা বলতে শুরু করেছে। চিত্র জগতে এক অভাবনীয় তৎপরতা দেখা দিল। যে সব ছবি তখন অবধিও শেষ হয়নি—সে গুলিকে বাণীমুখর করে তুলবার জন্য প্রযোজক ও পরিচালকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। সে কী উত্তেজনা! ব্রিটিশ প্রযোজকদের মাঝেও এই উত্তেজনা দেখা দিল। কোটা আইনের সাহায্যে শব্দমুখর চিত্রজগতে মার্কিন চিত্রের সংগে প্রতি-যোগিতার জন্য তাঁরা তৈরী হ'য়ে নিতে লাগলেন। ১৯২৬ খৃঃ-এর পূর্ণাংগ ব্রিটিশ চিত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬খানা। ১৯২৯ খৃঃ-এ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৮খানায়। আইনের বাধ্যতামূলক সর্ব নিম্ন সংখ্যা ছিল ৫০ খানা। ১৯৩০ খৃঃ-এ ব্রিটিশ চিত্রের সংখ্যা একটু হ্রাস পেলেও ১৯৩১ খৃঃ-এ ১২২ খানায় যেয়ে দাঁড়ায়। এবং ১৯৩২ খৃঃ-এ ১৫৩, ১৯৩৩ খৃঃ-এ ১৫১ ও ১৯৩৪ খৃঃ-এ ১৯০—এই সময় অন্ততঃ দু'বার করে প্রতি প্রেক্ষাগৃহে একখানা ব্রিটিশ চিত্রের প্রদর্শন আইন দ্বারা বেধে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ চিত্রের এই ক্রমিক বৃদ্ধি এমন একটা সুসময়েই দেখা গিয়েছিল, যখন অর্থনৈতিক কারণে বৈদেশিক ছবি, বিশেষ করে মার্কিন ছবির আমদানীতে মন্দা দেখা যায়। ১৯২৯ খৃঃ ও ১৯৩১ খৃঃ-এ ব্রিটিশ বাজারে বৈদিশিক চলচ্চিত্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫০ ও ৫৫৬। ১৯৩৪ খৃঃ-এ এই সংখ্যা কমে গিয়ে ৪৮৪-তে দাঁড়ায়।

সর্বপ্রথম ব্রিটিশ মুখর চিত্রে আলফ্রেড হিচককের (Alfred Hitchcock) 'ব্লাক মেইল' (Black Mail)। প্রথম প্রকাশেই চিত্রখানি ব্রিটিশ মুখর চিত্রের প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয় দেয় এবং পরিচালকের নৈপুণ্যের আভাষ পাওয়া যায় চিত্রখানির ভিতর। ইতিপূর্বে মুখর চিত্রের কোন অভিজ্ঞতা না থাকাতেও হিচকক যে দক্ষতার পরিচয় দেন—তাতে অনেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাছাড়া চিত্রখানি মূলত ছিল নির্বাক এবং এর নির্বাক সংস্করণও আত্ম-প্রকাশ করেছিল।

১৯৩০ খৃঃ-এ এ্যানথোনী এ্যাসকুইথ-এর (Anthony As-

quith) 'এ কটেজ অন ডার্টমুর' (A Cottage on Dartmoor) দেখা দিল। কিন্তু এই চিত্রখানিকে ঠিক মুখর চিত্র বলা চলে না। মুখর চিত্রের ধর্ম থেকে 'এ কটেজ অন ডার্টমুর' অনেকাংশেই বিচ্যুত ছিল। এই বছরের উল্লেখযোগ্য চিত্র—'ক্রুকেড বিলেট' (Crooked Billet —অভিনয়াংশে ছিলেন কারলাইল ব্লাকওয়েল, মাইলস ম্যানডার, ম্যাডেলীন ক্যারোল প্রভৃতি); 'জার্নি'স এণ্ড' (Journey's End—প্রধানাংশে কলীন ক্লাইভ) - 'অন এ্যাপ্রুভ্যাল' (On Approval—অভিনয়াংশে টম ওয়ালস, ইভোনী আরনড প্রভৃতি) ও 'ইয়ং উডলি' (Young Woodly—অভিনয়াংশে ফ্রাঙ্ক লটোন, ম্যাডেলীন ক্যারোল প্রভৃতি)। এগুলি সবই মঞ্চ-সাফল্য নাটকের চিত্ররূপ।

১৯৩১ খৃঃ-এও বহু মঞ্চ-সাফল্য নাটকের চিত্ররূপ দেখতে পাই। জ্যাক হালবার্ট, সিসেলী ফোর্টনেইজ অভিনীত 'দি ঘোষ্ট ট্রেইন' (The Ghost Train)—স্যার জন মারটিন হারভে অভিনীত' দি লিয়নস মেইল' (The Lyons Mail), নোরা সুইনবার্ণ, লরেন্স অলিভার, নরম্যান ম্যাকীনেল অভিনীত 'পটিফার'স ওয়াইফ' (Potiphar's Wife) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বার্ণাড শ'এতদিন তাঁর নাটক বা কাহিনীকে পর্দায় রূপদানের অনুমতি দেননি—এবার তিনি 'হাউ হি লাইড টু হার হাসব্যাণ্ড' (How he Lied to her Husband)-কে চিত্ররূপ দেবার অনুমতি দিলেন। চিত্রখানি পরিচালনা করেন সেসিল লুইস এবং অভিনয়াংশে ছিলেন রবার্ট হ্যারিস, ডেরা লেনোক্স, এডমণ্ড গোয়েন প্রভৃতি। এই কাহিনীটি চিত্ররূপ দিতে নানান অসুবিধা ছিল। আলোচ্য বৎসরের ব্রিটিশ চলচ্চিত্র জগতে হিচকক এবং এ্যাসকুইথই প্রশংসনীয় চিত্রোপহার দেন। হিচকক গলস্‌ওয়ার্দির 'দি স্কিন গেম' (The Skin Game) নাটকের চিত্ররূপ দেন। 'দি স্কিন গেম'-এ অভিনয়াংশে ছিলেন এডমণ্ড গোয়েন, ফাইলীস কন্সট্যাম প্রভৃতি। মঞ্চ-দৃশ্যপটের প্রভাব মুক্ত হ'য়ে গ্রামের স্বাভাবিক পটভূমিকায় এই চিত্রখানিকে রূপায়িত করে তুলে হিচকক সকলের প্রশংসাভাজন হন। এবং এই শ্রেণীর প্রশংসনীয় চিত্রগুলির ভিতর 'দি গুড কমপ্যানিয়নস' (The Good Companions), 'সাউথ রাইডিং' (South Riding), পয়জন পেন (Poison pen) প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ্যান্থোনী এ্যাসকুইথের 'টেল ইংল্যাণ্ড' (Tell England) এই বছরে নানা দিক দিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। প্রথম যুদ্ধের পটভূমিকায় চিত্র নির্মাণে একজন পরিচালকের আন্তরিকতা ও নৈপুণ্যের নিদর্শনরূপে চিত্রখানি আত্মপ্রকাশ করে। টেল ইংল্যাণ্ড এর অভিনয়াংশে ছিলেন কার্ল হারবোর্ড, টনি ব্রুস, কে কম্পটন প্রভৃতি। এবং এ্যাসকুইথ তাঁর সহকারী রূপে পেয়েছিলেন জিওফ্রে বারকাস্‌কে (Geoffrey Barkas)। প্রথম যুদ্ধের সময় ইনি একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন তাছাড়া 'ব্যাটল অফ দি সোমী' (Battle of the Somme) চিত্রখানি পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নির্মিত যুদ্ধ চিত্রগুলি ছাড়া ইতিপূর্বেকার কোন যুদ্ধ চিত্র 'টেল ইংল্যাণ্ড'কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

১৯৩২ খৃঃ-এ এ্যানক্যাসন ও কার্ল হারবোর্ড অভিনীত এ্যাসকুইথের 'ডান্স প্রেটি লেডী' (Dance Prety Lady) দেখা দিল। এবং হিচকক উপহার দিলেন আইভর নোভেলো ও এলিজাবেথ এ্যালান অভিনীত 'দি লজার' (The Lodger)। কিন্তু এ বছরের সাফল্যমণ্ডিত চিত্ররূপে উল্লেখ করতে হয় এসথার র‍্যালসটোন, কনার্ড ভিড, গর্ডন হারকার অভিনীত 'রোম এক্সপ্রেস' (Rome Express)। চিত্রখানি পরিচালনা করেন ওয়ালটার ফরডে (Walter Forde)। শেফার্ড-এর গমণ্ট-ব্রিটিশ ষ্টুডিওর এই খানি সর্বপ্রথম চিত্র। চিত্রখানি তখন জনসাধারণকে এতই মুগ্ধ করে যে, তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাংগ চিত্ররূপে 'রোম এক্সপ্রেস'কে অভিহিত করা হয়। এই বছরে 'জ্যাক'স দি বয়' (Jack's the Boy) 'লাভ অন হুইলস' (Love on Wheels) কৌতুক চিত্ররূপেও খ্যাতি অর্জন করে। তাছাড়া 'কমেট কংকার্ড' (Komet Conquired), 'উইথ কোবহাম টু খিভু' (With Cobham to Khivu) ও উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৩-১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ভিতর ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প নিজের
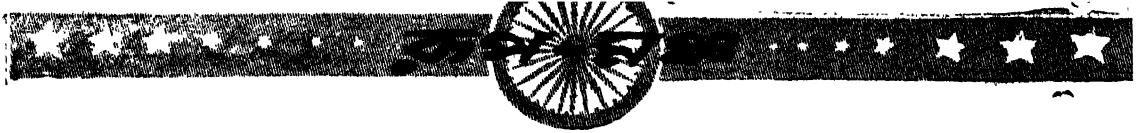
পায়ে দাঁড়াবার মত বেশ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে। ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক ব্রিটিশ চিত্র নির্মিত হয়—অবশ্য মানের দিক দিয়ে সে খুবই উন্নতি লাভ করে তা ঠিক বলা চলে না। ব্রিটিশ চিত্র জগতে যে কোন উন্নত চিত্র দেখতে পাওয়া গেছে, তা এসেছে হিচকক ও এ্যাসকুইথের কাছ থেকে। তাই ব্রিটিশ সবাক ছায়া চিত্রের ইতিহাসে হিচকক ও এ্যাসকুইথের নাম সব সময়ই কৃতজ্ঞ চিত্তে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ব্রিটিশ চিত্রজগতে বেশ উল্লেখযোগ্য উদ্দীপনার ভাব পরিদৃষ্ট হয়। সেই সংগে দর্শক সাধারণের উন্নত রুচিরও পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কিন চিত্র এই সময় যেন অন্ধকারে হাতরিয়ে বেড়ায়।

এর মূলে যে শুধু অর্থনৈতিক মন্দা, তাই নয়। ব্রিটিশ দর্শক সাধারণের জাগ্রত রুচি বোধকে মার্কিন চিত্রগুলির পক্ষে খুশী করা খুবই কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়ে। তাই ব্রিটিশ সবাক চিত্রের এই সাফল্য বা দৃঢ়তা অর্জনের মূলে ব্রিটিশ দর্শকসাধারণের অভিমত অনেকখানি সাহায্য করে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হিসাবে উল্লেখ করতে হয় আলেকজাণ্ডার কোর্ডার 'দি প্রাইভেট লাইফ অফ হেনরী দি এইট্থ' (The Private Life of Henry VIII) এই চিত্রখানি তার আংগিক মানের দিক দিয়ে যে নিখুঁত ছিল তা বলা চলে না তবে হলিউড চিত্রের সামনে এতখানি জাকজমকতা নিয়ে ইতিপূর্বে আর কোন ব্রিটিশ চিত্র দাড়ায়নি। এই চিত্রখানি আমেরিকাতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

সোনাহেল, জেসীম্যাথুজ, গর্ডন হারকার প্রভৃতি অভিনীত ভিক্টর স্যাভাইল-এর (Victor Saville) 'ফ্রাইডে দি থারটিন্থ' (Friday the Thirteenth) ছবিখানি তার কাহিনী মাধুর্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এডমণ্ড গোয়েন, জেসী ম্যাথুজ, জনগীলগাড অভিনীত স্যাভাইলের 'দি গুড কমপেনিয়ানস' (The Good Companions) ও বেশ সাফল্য অর্জন করে এই সময়। এই চিত্রখানি কীরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করে তা ওদেশীয় সাংবাদিকের ভাষায়ই বলছি,—'the first real example of the British picaresque on the Screen." এই বৎসরই স্যাভাইলের তৃতীয় চিত্র 'আই ওয়াজ এ স্পাই' (I was a Spy) দাগ কাটবার মত না হলেও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। এবং কনার্ড ভিড এর অভিনয় নৈপুণ্য অনেককেই মুগ্ধ করে। হারবার্ট মার্শাল ও ম্যাডেলীন ক্যারোলের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। কনার্ড ভিড মউরিস এলভির 'ওয়ানডারিং জিউ'তে (The Wandering Jew) অভিনয় করেন। এই বৎসরের দু'খানি কাযকরী চিত্র (Actuality film) 'নাইনটি ডিগ্রি সাউথ' (90° South 'দি ট্রাজেডি অফ এভারেষ্ট' (The Tragedy of Everest) এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। 'নাইট অফ দি গারটার' (Night of The Garter) এবং 'টু ব্রাইটন উইথ গ্লাডিস' ('To Brighton with Gladys) এর নাম না করলেও অবিচার করা হবে।

টম ওয়ালস এবং র‍্যালফ লীনকে তাদের মঞ্চ-সাফল্য কৌতুক নাটক গুলিকেও পর্দায় রূপ দিতে দেখি। 'এ কাকু ইন দি নেষ্ট' (A Cuckoo in the Nest),'সোলজারজ অফ দি কিং' (Soldiers Of The King) এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৪ খৃঃ-এ এলিজাবেথ বার্গনার, ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস (জুনিয়র) অভিনীত পল সিজীনারের (Paul Czinner) 'ক্যাথারীণ দি গ্রেট' (Catherine the Great)—কনার্ড ভিড, ফ্রাঙ্ক ভোসপার, বেনিটা হিউম অভিনীত লোথার মেনডিস এর 'জিউ সাচ' (Jew Suss)—ডগলাস ফেয়ার ব্যাংকস, মার্লে ওবেরণ, বেনিটা হিউম অভিনীত আলেকজাণ্ডার কোর্ডার 'দি প্রাইভেট লাইফ অফ ডন জুয়ান' (The Private Life of Don Juan)—প্রভৃতি চিত্রগুলি তাদের দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের জাকজমকতা নিয়ে, দেখা দেয়। এ্যানা নিগল, সেড্রিক হাডউইক, জীনি ডি ক্যাসালীস অভিনীত হারবার্ট উইলকক্স-এর 'নেল গোইন' (Nell Gwynn) ও এই প্রসংগে উল্লেখ করতে হয়। এই বছরে কতকগুলি সংগীত মুখর চিত্রও দেখা দেয়। যেমন, রিচার্ড টিউবার, জেনি ব্যাক্সটার অভিনীত পল ষ্টেইনের 'ব্লসম টাইম' (Blossom Time)—জেসী ম্যাথুজ, সোনী হেল, বেটি বলফোর অভিনীত ভিক্টর স্যাভাইলের এভারগ্রীন (Evergreen)—গ্রেসী ফিল্ডস অভিনীত 'লাভ, লাইফ
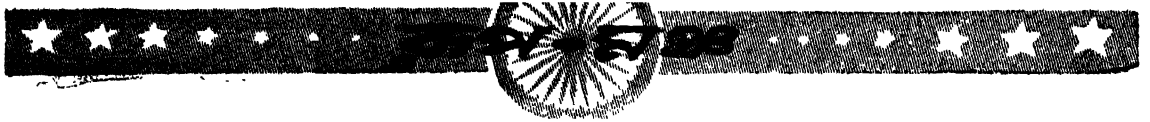
এ্যাণ্ড লাফটার' (Love, Life and Laughter) ও 'সিং এ্যাজ উই গো' (Sing as We go)। এই বৎসরে নোভা পিলবীম নামে একজন নবাগতা শিল্পীকে ব্যার্থ হোল্ড ভারটেল এর 'লিটল ফ্রেইণ্ড' (Littie Friend) এ দেখা যায়। এবং এই নবাগতা শিল্পীটিকে বহুভাবে দর্শক সাধারণের কাছে প্রচার কার্যের ভিতর দিয়ে তুলে ধরা হয়। ঐ বৎসরই জর্জ ফরমার নামক একজন নবাগতকে দেখা যায় 'বুটস, বুটস'(Boots,Boots) চিত্রে। তাঁর কোন প্রচার কার্য না করা হলেও, পরবর্তী কালে জর্জ ব্রিটেনের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করে। এই বৎসরের রবার্ট ফ্লাহারটির 'ম্যান অফ আরণ' (Man of Aran) চিত্রখানির কথাও উল্লেখ করতে হয়।

১৯৩৫ খৃঃ-এ ভিকটর স্যাভাইল ক্লাইভ ব্রুক ও ম্যাডেলীন ক্যারোল অভিনীত 'দি লাভ এ্যাফেয়ার অফ দি ডিকটেটর' (The Love Affair of the Dictator) এবং জর্জ আরলিস, গ্লাডিস কুপার, এডমণ্ড উইলার্ড অভিনীত 'দি আয়রণ ডিউক' (The Iron Duke) এই দু'খানি জাকজমকময় চিত্র উপহার দেন। হ্যারোল্ড ইয়ং পরিচালিত কোডা প্রডাকসনের 'দি স্কারলেট পিমপারলেন' (The Scarlet Pimpernel) চিত্রখানিও তার জাকজমকতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া লেসলী হাওয়ার্ডের অদ্ভুত অভিনয় নৈপুণ্য সকলকেই মুগ্ধ করে।

লেসলী ব্যাঙ্কস, এডনা বেষ্ট, নোভা পিলবীম অভিনীত 'দি ম্যান হু নিউ টু মাচ' (The Man Who Knew Too Much) এবং রবার্ট ডোনাট, ম্যাডেলীন ক্যারোল, গডফ্রে টিয়ারলী অভিনীত 'দি থারটি নাইন ষ্টেপস' (The Thirty nine Steps) হিচককের এই দু'খানি চিত্রই উত্তেজনার সৃষ্টি করে। লেসলী ব্যাঙ্কস, পল রবসন, নিনা ম্যাকানি অভিনীত জোলটান কোর্ডার 'স্যানডার্স অফ দি রিভার' (Sanders of the River) তার মাধুর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই চিত্রের মনোরম চিত্র গ্রহণ দর্শকসাধারণের চোখকে প্রভূত অংশে তৃপ্তি দেয়। পল রবসনের সংগীত ও অভিনয়ও চিত্রখানির অন্যতম আকর্ষণ রূপে দেখা দেয়। পল সিজিনার-এর 'এস্কেপ মি নেভার' (Escape Me Never) চিত্রে এলিজাবেথ বার্গনার আত্মপ্রকাশ করে। মিলটন রোজমার পরিচালিত 'এমিল এ্যাণ্ড দি ডিটেকটিভস' (Emil and the Detectives)-ও এই বার মুক্তি পায়। মারচেল ভারনেল-এর কৌতুক চিত্র 'বয়েজ উইল বি বয়েজ' (Boys will be Boys)-এ উইল হের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। জন গ্যাবিক, জির‍্যালডাইন ফিটজজারাল্ড অভিনীত নরম্যান ওয়াকার-এর 'টার্ণ অফ দি টাইড' (Trun of the Tide) এই বছরে আশাতীত সম্মান লাভ করে। ১৯৩৬ খৃঃ-এ ব্রিটিশ মুখরচিত্র সংখ্যা এবং মান সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করে। এই বছরে প্রায় ২১২ খানা মুখর চিত্র নির্মিত হয়। এর বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভংগী অভিনবত্বের ছাপ নিয়ে দেখা দেয়। পল সিজিনার সেক্সপীয়ারের 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর (As You Like It) চিত্ররূপ দিয়ে প্রশংসাভাজন হন। 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর অভিনয়াংশে ছিলেন এলিজাবেথ বার্গনার, লরেন্স অলিভার, সোফী ষ্টুয়াট প্রভৃতি। এডমণ্ড গোয়েন, সেড্রিক হার্ডউইক, ভিক্টোরিয়া হোপার অভিনীত 'লেবারনাম গ্রোভ' (Laburnum Grove) চিত্রখানি পরিচালনা করেন নবাগত ক্যারোল রীড। আলেকজাণ্ডার কোর্ডার 'রেমব্রাণ্ডট' (Rembrandt), রবার্ট ষ্টিভেনসনের 'টিউডর রোজ' (Tudor Rose) কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। ওয়ালটার হাসটন, অসকার হোমোলকা, পেগী এ্যাসক্রোফ্‌ট অভিনীত বার্থ হোল্ড ভারটেলের 'রোহ্‌ডস অফ এ্যাফ্রিকায়' (Rhodes Of Arfica) পরিচালকের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৩৬ খৃঃ-এ ব্রিটিশ চলচ্চিত্র জগত সর্বপ্রথম এইচ, জি, ওয়েলসকে আবিষ্কার করে। রোনাল্ড ইয়ং, র‍্যালফ রিচার্ডসন, জোয়ান গাডনার অভিনীত 'দি ম্যান হু কুড ওয়ার্ক মিরাকেলস' (The Man Who Could Work Miracles) চিত্রখানি লোথার ম্যানডীস পরিচালনা করেন। তবে কোডা ফিল্ম প্রযোজিত ওয়েলস-এর 'থিংস টু কাম' (Things to Come) নানাদিক দিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রখানি পরিচালনা করেন উইলিয়ম
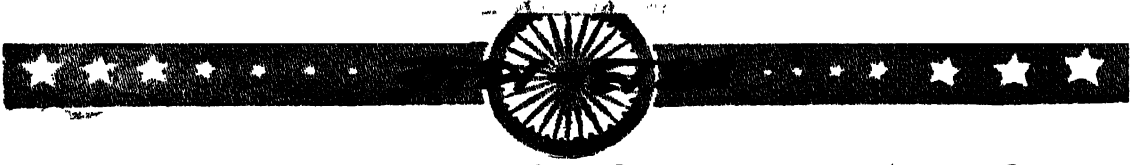
ক্যামেরোন মেনজিস এবং অভিনয়ে ছিলেন রেমাণ্ড ম্যাসী, র‍্যালফ রিচার্ডসন, মারগারেটা স্কট।

১৯৩৭ খৃঃ-এর শেষের দিকে ব্রিটেনে মাত্র ২৩টি ষ্টুডিও ছিল। এর প্রত্যেকটিই লণ্ডন অথবা তার আশেপাশে গড়ে উঠেছিল। এদের ৭৫টি চিত্র নির্মাণ প্রাংগন ছিল এবং সমস্ত প্রাংগনের (floor) আয়তন ছিল ৭৮১,২০২ বর্গ ফিট। সবচেয়ে বৃহৎ ষ্টুডিও তিনটির ভিতর 'এলস্‌ট্রির এ্যামাল গ্যামেটেড ষ্টুডিও' (১৩০,০০০ বর্গ ফিট)—ডেনহামের 'দি লণ্ডন ফিল্ম ষ্টুডিও (১২০,০০০ বর্গ ফিট) এবং আইভার হিতের 'পাইন উড ষ্টুডিও' (৭২,৭১০ বর্গ ফিট)-এর নাম করা যেতে পারে। ১৯৩৮ খৃঃ-এ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, আমেরিকান চিত্রব্যবসায়ীরা ব্রিটেনের চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে অবতরণ করলেন। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম দেখতে পাই আমেরিকার M. G. M. কোম্পানীকে মেট্রো-ব্রিটীশ (Metro-British) এই নাম নিয়ে ব্রিটেনের চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে। এবং এঁরা ভিক্টর স্যাভাইল ও মাইকেল বেলকনকে গ্রহণ করলেন। ব্রিটেনে সর্বপ্রথম মেট্রো-ব্রিটিশ প্রযোজিত চিত্র হচ্ছে ভিভিয়ান লি, ববার্ট টেলর, লায়নেল ব্যারিমুর অভিনীত 'এ ইয়াংক এ্যাট অকসফোর্ড' (A Yank at Oxford)। চিত্রখানি পরিচালনা করেন জ্যাক কনওয়ে। ১৯৩৯খৃঃ এ কিং ভিডোরের দি 'সিটাডেল' (The Citadel) আত্মপ্রকাশ করে। অভিনয়াংশে ছিলেন রবার্ট ডোনাট, রোজাল্যাণ্ড রাসেল এবং র‍্যালফ রিচার্ডসন। রবার্ট ডোনাট, গিয়ার গারসন, টেরি কিলবার্ণ অভিনীত স্যাম উডের 'গুডবাই মিঃ চিপস' (Goodbye Mr. Chips) দেখা দিল এই বৎসরেই। উল্লেখযোগ্য জাতীয় ছবির ভিতর জন লজ, মার্গারেট লকউড, হাস উইলিয়াম অভিনীত 'ব্যাংক হলিডের' (Bank Holiday) কথা উল্লেখ করতে হয়। পরিচালক ক্যারল রীড এই চিত্রের ভিতর ছুটির দিনে ব্রিটেনের মজুরদের জীবন যাপনের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলেন। আর একজন উদীয়মান পরিচালক রবার্ট ষ্টিভেনসন উপহার দিলেন 'আউড বব' (Owd Bab)। এই চিত্রে উইল ফাইফীর চরিত্রাভিনয় সকলকেই মুগ্ধ করে। অন্যান্য ভূমিকায় জন লজার ও মারগারেট লক উডও ছিলেন।

ব্রিটিশ গ্রাম্যজীবন নিয়ে তৃতীয় চিত্র দেখা দিল স্যাভাইলের 'সাউথ রাইডিং' (South Riding)। অভিনয়াংশে ছিল এডনা বেষ্ট, র‍্যালফ রিচার্ডসন, এডমণ্ড গোয়েন। মার্গারেট লকউড ব্রিটেনের প্রধান অভিনেত্রীরূপে সমাদর পেতে লাগলেন। পললুকার্স 'মাইকেল রেডগ্রেভের সংগে আত্মপ্রকাশ করলেন হিচককের 'দি লেডি ভ্যানিসেস' (The Lady Vanishes) চিত্রে। সমারসেট মমের কাহিনীকে ভিত্তি করে এরিক পমার পরিচালিত 'ভ্যাসেল অফ র‍্যাথ' (Vessel of Warth) দেখা দিল। অভিনয়াংশে ছিলেন চার্লস লাউটন, এলসা ল্যানচেষ্টার, রবার্ট নিউটন প্রভৃতি। 'উইংগস অফ দি মর্ণিং' (Wings of the Morning) রংগিন চিত্রখানি মুক্তি পেল। সংগে সংগে এল আর দু'খানি বিরাট রংগিন চিত্র টিম হেলানের 'ডি ডাইভোরস অফ লেডি এক্স' (The Divorce of Lady X)। অভিনয়াংশে রইলেন মার্লি ওবেরণ, লরেন্স অলিভার, র‍্যালফ রিচার্ডসন প্রভৃতি। সাবু, রেমাণ্ড ম্যাসী, ভেলেরাই হবসন অভিনীত জোলটান কোর্ডার 'দি ড্রাম' (The Drum) আত্মপ্রকাশ করলো।

১৯৩৮ খৃঃ-এ যে চিত্রখানি সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো, তা হচ্ছে বার্ণার্ডশ'র 'পিগমিলিয়ান' (Pygmalion)। বহুজনে এই নাটকটির চিত্ররূপের জন্য শ'কে বহুবার ধরেছেন কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হননি। একজন কপর্দকহীন অপরিচিত হাঙ্গেরীয় যুবক তাঁর অনুমতি লাভে সমর্থ হন। এ্যানথোনী এ্যাসকুইথ এবং লেসলী হাওয়ার্ড যুক্তভাবে চিত্রখানি পরিচালনা করেন। লেসলী হাওয়ার্ড, ওয়েণ্ডী হিলার, উইলফ্রেড লসন অভিনয়াংশে ছিলেন। উয়েণ্ডী হিলারের এই চিত্রের অভিনয়ে প্রচুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৮খৃঃ-এ ডেভিড ম্যাকডোনাল্ডের 'দিস ম্যান ইজ নিউজ' (This Man is News), 'দিস ম্যান ইন প্যারিসও' (This Man in Paris) জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৩৯। যুদ্ধের আভাষ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থার ভিতর এ্যানথোনী এ্যাসকুইথ উপহার
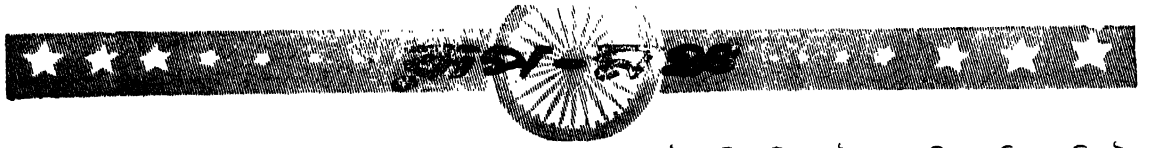
দিলেন 'ফ্রেন্স উইদাউট টিয়াস' (French Without Tears)। অভিনয়াংশে ছিলেন রে মিলাণ্ড, এলেন ড্রু, রোনাল্ড কালভার। মার্গারেট লকউড, রেণা হাউসটন, লিলি পামার অভিনীত ক্যারল রীডের কৌতুকচিত্র 'এ গার্ল মাষ্ট লিভ' (A Girl Must Live) দেখা দিল।

হিচককের 'জ্যামাইকা ইন' ('Jamaica Inn)-এ অভিনয় করলেন চার্লস লাউটন, লেসলি ব্যাঙ্কস, মৌরীন ও' হারা। মাইকেল পাওয়েল সুচতুর ভাবে পরিচালনা করলেন 'দি স্পাই ইন ব্লাক' (The Spy in Black) অভিনয়াংশে রইলেন কনার্ড ভিড, ভেলেরাই হবসন, সেবাসটেইন শ'; ফ্লোরা রবসন, রেজিন্যাল্ড টাটে, বার্ট নিউটন অভিনীত পল ষ্টেইনের 'পয়জেন পেন' (Poison Pen) এর কথাও উল্লেখ করতে হয়।

১৯৩৯ খৃঃ, ৩রা সেপ্টেম্বর। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। ব্রিটিশ চলচ্চিত্রশিল্প আবার নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে লাগলো। যুদ্ধের ডাকে একে একে অনেককেই ষ্টুডিও ছেড়ে চলে যেতে হ'লো। ষ্টুডিও প্রাংগনগুলি সরকার দখল করে নিলেন। ১৯৩৯ খৃঃ-এ ২২স্টুডিওর ৬৫টী সাউণ্ড-স্টেজ ছিল। ১৯৪২খৃঃ-এ এই সংখ্যা যেয়ে দাড়ালো ৯টী ষ্টুডিও ও ৩০টী সাউণ্ড-ষ্টেজে। কোটা আইন অবশ্য বলবত রইল। ব্রিটিশ প্রদর্শকদের প্রদর্শনীর একসপ্তমাংশ ব্রিটিশচিত্রের জন্য রাখতে হ'লো। বাকীটা বেশীর ভাগ হলিউড চিত্র দখল করে নিল। কোটা বলবত থাকায় একটা অসুবিধা দেখা দিল—ছবির সংখ্যা কমে যাওয়াতে পুরোন ছবি প্রদর্শন ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ব্রিটিশ ছবির সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগলো এবং হ্রাস প্রাপ্ত হ'য়ে ব্রিটিশচিত্রের সংখ্যা যেয়ে দাঁড়ালো—১৯৩৭-২২৫ ; ১৯৩৮-১১৬, ১৯৪০-৫৬, ১৯৪১-৫৬, ১৯৪২-৬০।

কাঠ নেই—কাপড় নেই—দৃশ্যপট তৈরী করবার মাল মসলইবা কোথায়।

ষ্টুডিও প্রাংগণ বোমা বিধ্বস্ত। পোষাক পরিচ্ছদের জন্য বোর্ড অফ ট্রেডের অনুমতি লাভ করতে হবে। মজুর নেই—মিস্ত্রী নেই—ইলেকট্রিশিয়ান নেই—বিশেষজ্ঞ নেই। না থাক, ব্রিটিশ চিত্র শিল্প এই বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হবে। জাতির সেবায় তার দায়িত্বের কথা ভুলে যাবেনা। এবং যায়ওনি কোন সময়। এই সময় চিত্র শিল্পের অর্থনৈতিক কাঠামোরও কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রায় অর্ধেক ষ্টুডিও গুলির ওপর র‍্যাঙ্ক অরগানাইজেশন (Rank Organisation) কর্তৃত্ব পান। এবং ওডেওন ও গমণ্ট ব্রিটিশের অধীনের প্রায় ৬০০ খানি সিনেমার কর্তৃত্ব লাভ করেন।

বেশীর ভাগ প্রথম শ্রেণীর পরিচালক ও শিল্পী এদের আওতায় এসে পড়েন। র‍্যাঙ্ক অরগানাইজেসনের এই একাধিপত্য শুধু বিদেশেই নয়, স্বদেশেও সমালোচিত হতে লাগলো। এই সময় যুদ্ধ চিত্র গুলি ব্রিটিশ চলচ্চিত্র জগতে বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। 'নিউট্রাল পোর্ট' (Neutral Port), নোয়েল কাওয়ার্ডের 'ইন হুইচ উই সার্ভ' (In which We Serve) তার পর 'মিলিয়ানস লাইক আস্' (Millions Like Us) 'স্যান ডেমিট্রিও লণ্ডন' (San Demetro London) 'নাইন মেন' (Nine men), 'দি ওয়ে এ্যাহেড' (The Way Ahead),'ওয়াটার লু রোড' (Waterloo Road), 'দি ওয়ে টু দি স্টারস' (The Way to the Stars) যুদ্ধ চিত্রগুলির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ নাম করা যেতে পারে।

চিত্রগুলি বাস্তবতার দিক থেকেও বিচ্যুত নয়। 'দি ফোরম্যান ওয়েণ্ট টু ফ্রান্স'—একজন ব্রিটিশ অগ্রগামী সৈনিকের ফ্রান্সে বন্দী হবার কাহিনী নিয়েই গড়ে ওঠে। 'মিলিয়ানস লাইক আস্', 'দি জেণ্টল সেক্স', 'উই ডাইভ এ্যাট ডন', 'দি ওয়ে টু দি ষ্টারস' যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়েই গড়ে ওঠে। 'নেকষ্ট অফ্ কিন' (Next of Kin), 'দি ওয়ে এ্যাহেড', (The Way Ahead), 'জার্ণি টুগেদার' (Journey Together)-ও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধকালীন চিত্রশিল্পকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাথমিক কাল (১৯৪০-৪১)—মধ্যকাল (১৯৪২-৪) এবং শেষকাল (১৯৪৪-৪৫)। প্রাথমিক কালে কোন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন পরিচালকের একক প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ যুদ্ধচিত্র
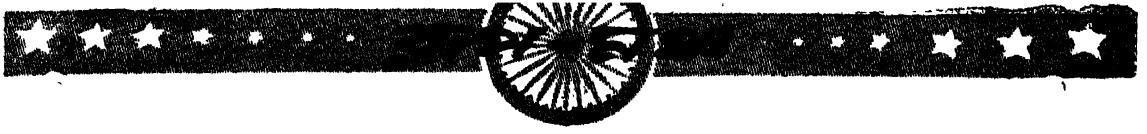
গুলির মূলে নিহিত রয়েছে। মাইকেল পাওয়াল-এর 'কনট্রাব্যাণ্ড' (Contraband) 'ফরটিনাইনথ প্যারালেল' (49th Parallel)—ক্যারোল রীডের 'গেষ্টাপো' (Gestapo), এ্যাসকুইথের 'ফ্রিডম রেডিও' (Freedom Radio), লেসলি হাওয়ার্ডের 'পিমপারনেল স্মিথ' (Pimpernel Smith), পেনটেনিসনের 'কনভয়' (Convoy), মরিচ এলভির 'ফর ফ্রিডম' (For Freedom) এই সময়ের উল্লেখযোগ্য চিত্ররূপে নাম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ার্ধে (১৯৪২-৪৩) যুদ্ধ চিত্র নির্মাণের তোড়জোড় বেশ একটু নজরে পড়ে। চার্লস ফ্রেণ্ডের দি 'বিগ ব্লকেড' মাইকেল পাওয়েল এর 'ওয়ান অফ আওয়ার এয়ার ক্র্যাফট মিসিং', নোয়েল কাওয়ার্ড ও ডেভিড নীনের, 'ইন হুইচ উই সার্ভ', প্রভৃতি আরো বহু চিত্রের নাম করা যেতে পারে। শেষার্ধে 'দি ওয়ে উই এ্যাহেড', জার্নি টুগেদার, আই লিভ ইন গ্রসভেনর স্কয়ার','পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ চিত্র ছাড়া সাধারণ পূর্ণ চিত্র নির্মাণে এই সময় ব্রিটিশ চলচ্চিত্র জগত বেশ তৎপরতার পরিচয় দেয়। ১৯৪৪খৃঃ-এ 'হেনরী দি ফিপথ' (Henry V) 'সিজার এ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' (Caeser and Cleopatra) আত্মপ্রকাশ করে। এক এক খানা চিত্র নির্মাণে দুই মিলিয়ান পাউণ্ডেরও বেশী খরচা হয় এবং প্রায় দুবৎসর সময় লাগে। ১৯৪১খৃঃ-এ জন ব্যাংকসটার 'লাভ অন দি ডোল' এবং 'কমন টাচ' এই সামাজিক চিত্র নির্মাণ করেন। প্যাচক্যাল শ'-এর 'মেজর বারবারা' উপহার দিলেন। ১৯৪২খৃঃ-এ 'পাওয়ার রক' ও বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ক্যারোল রীডের 'কিপস' (Kipps), ডিকিনসনের 'গ্যাসলাইট' (Gaslight), এ্যাস কুইথের 'কটেজ টু লেট' (Cottage to Let) ও কম প্রশংসা অর্জন করে না। ১৯৪৩খৃঃ-এর উল্লেখযোগ্য ছবির নাম করা যেতে পারে ডিকিনসনের 'দি প্রাইম মিনিস্টার' এবং ক্যারোল রীডের 'দি ইয়ং মিঃ পিট'। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভংগীর অভিনবত্বের দিক থেকে এ্যাসকুইথের 'ডেমি প্যারাডাইচ', পাওয়েল এর 'দি লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ অফ কর্ণেল ব্লিম্প' উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৫খৃঃ-এ মরিচ এলভির 'ষ্ট্রবেরী রোন', চার্লস ফ্রেণ্ডের 'জনী ফ্রেঞ্চ ম্যান', 'আই নো হয়্যার আই এ্যাম গোয়িং', চার্লস ক্রাইটনের 'পেইনটেড বোটস'—রবার্ট হামারের 'পিংক ষ্ট্রীং এ্যাণ্ড সিলিং ওয়াকস' বার্নার্ড নোয়েলস এর 'এ প্লেস অফ ওয়ানস ওউন' ব্রিটিশ চিত্রের উৎকর্ষেরই পরিচয় দেয়। নোয়েল কাওয়ার্ড ও ডেভিড নীনের 'ব্লিথি স্পিরিট' তার রং-এর খেলায় অনেককেই মুগ্ধ করে।

ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের মূলে বর্তমানে যাঁরা রয়েছেন—তাঁরা মার্কিন ও বৈদেশিক চিত্রের প্রতিযোগিতার সামনে সবল ভাবে দেশীয় শিল্পকে দাঁড় করাবার পরিকল্পনায় সব সময়ই বিভোর। এজন্য চিত্রের সংখ্যা ও মানবৃদ্ধির জন্য তাঁরা বিন্দু মাত্রও গাফিলতির পরিচয় দেন না। চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগ বিশেষজ্ঞ, শিল্পী ও কর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে—এবং যদি নূতন বিশেষজ্ঞ, শিল্পী ও কর্মী গড়ে তোলা না যায় চিত্রের নির্মাণ খরচা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাবে। তাই নূতন প্রতিভা আবিষ্কার করে চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠা করাবার আগ্রহও ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পপতিদের কোন অংশে কম নেই। বহু খ্যাতনামা ব্রিটিশ শিল্পী ও বিশেষজ্ঞরা আমেরিকায় যেতে বাধ্য হয়েছেন। ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে এঁদের ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনাও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করলে ও ব্রিটিশ চিত্রের মানের কথা কোন সময়ই প্রযোজকরা ভুলে যেতে রাজী নন। জাতির কৃষ্টিও বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা রূপায়িত করে তুলতে চান চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়ে। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পপতিরা—বিশেষজ্ঞ শিল্পী সংবাদিক ও দর্শক সমাজ চলচ্চিত্রকে বিংশশতাব্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রগতিশীল শিল্প বলেই মনে করেন।

খ্যাতনামা সাংবাদিক রোজার ম্যানভেল বলেন, "We must continue to make pictures which justify the claim that the film is the most progressive popular art of the twentieth century."

এই অভিব্যক্তির ভিতরই ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের মর্মকথা নিহিত রয়েছে। আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পপতিদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করছি।

শ্রীমতী দীপ্তি রায়

আই, এন, এ, পিকচার্সের

'স্বয়ংসিদ্ধা' চিত্রে নায়িকার

যাভা দ্বীপের নৃত্যাভিনয়ের দৃশ্য

উপরে : বেদাজা নাজেণ্টজেঙ্গ টাউং (Bedaja Nagentjeng tawing)
নীচে : বেদাজা মানা (Bedaja Manah)

বেতার বিভাগ সংস্কার

অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কটিশচার্চ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে শ্রীযুক্ত নির্মল ভট্টাচার্য সুবিদিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির ভিতরই শুধু নির্মলবাবু নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, আমাদের সামাজিক, কৃষ্টি ও রাজনৈতিক জীবনের সংগেও তাঁর চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। বেতারে তাঁর সুচিন্তিত বক্তৃতার সংগে বেতার শ্রোতারা সুপরিচিত। বর্তমান প্রবন্ধে বেতার সংস্কার সম্পর্কে তিনি যে পরিকল্পনার আভাষ দিয়েছেন, তা যেমনি সময়োপযোগী, তেমনি মৌলিকত্বের দাবী রাখে।

অগ্রগামী সভ্য দেশে বেতার জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্তবিনোদন বা আনন্দে অবসর যাপনে বেতারের দান অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া জনশিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান-বিস্তার ও সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও বেতারের কাছে আধুনিক জগৎ বিশেষ ভাবে ঋণী। বিভিন্ন দেশে গঠনমূলক কাজেও বেতার বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছে। রাশিয়াতে ১৯১৭ সাল থেকে যে নূতন সভ্যতা গড়ে তুলবার প্রয়াস চলেছে, সেই প্রচেষ্টায় বেতারের ব্যাপক প্রয়োগ খুবই কার্যকরী হয়েছে সন্দেহ নেই। রাশিয়াতে জনশিক্ষা, লোকমত গঠন, সমাজ-তান্ত্রিক মতবাদ প্রচার, অর্থনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেতারের অবদান অতুলনীয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়াতে বেতারের সাহায্যে জনসাধারণের মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চারের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। ব্যাংকক্, সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুণ হ'তে প্রচারিত নেতাজীর তেজোদীপ্ত বাণী বেতার মারফতই আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতেও বেতার জাতীয় জীবন-গঠনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। ইটালী ও জার্মানীতে ফাসিষ্ট ও নাৎসীদল কর্তৃক বেতারের অপপ্রয়োগ সর্বজন-বিদিত।

স্বাধীনতার আগমনে বিরাট সংগঠনের কাজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। শিক্ষা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সমাজ-সংস্কার, গণতান্ত্রিক জনমত গঠন, সংস্কৃতির বিস্তার—এক কথায় নূতন রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতা গঠনে আজ আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। এই গঠনমূলক কাজে আমরা বেতারকে উপযুক্ত ভাবে নিয়োজিত করতে পারলে জাতি গঠনে সহজ হয়ে উঠবে ভারতবর্ষে অল্প সময়ের মধ্যে বেতার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু দেশবাসীর দারিদ্র্যের জন্য বেতারের বহুল প্রচার হতে পারেনি। বৃটিশ-শাসনাধীনে বেতার প্রধানত সরকারী মতবাদ প্রচারেই প্রযুক্ত হয়েছে। জাতি গঠনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বেতারের প্রয়োগ হয়েছে খুব কম। কিন্তু জাতীয় সরকার গঠনের অত্যল্প কালের ভিতর বেতার জাতীয় জীবনে একটি প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করেছে। বেতার বিভাগের পরিচালনায় জাতীয় কেন্দ্রীয়

অবিলম্বে মুক্তি প্রতীক্ষায়--

চিত্র-গ্রহণ : অশোক সেন :: শব্দ-গ্রহণ : নৃপেন পাল, এম, এস সি

শিল্প নির্দেশনা : শুভো মুখোপাধ্যায় :: সম্পাদনা : রবীন দাস

রসায়নাগারিক : ধীরেন দে (কে, বি,)

লীলাময়ী পিকচার্স লিমিটেড : ২১৪, ক্রস ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১
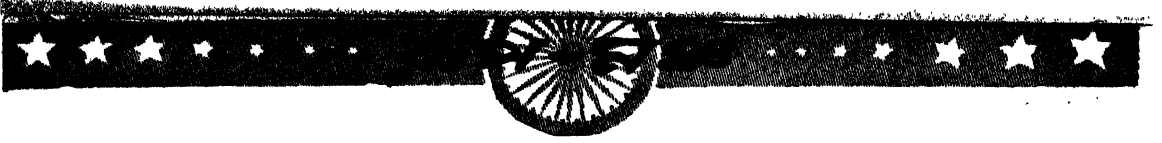
সরকার উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবুও নানা দিকে সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নূতন যুগের প্রারম্ভে বেতার বিভাগের সংস্কার ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে আলোচনা সময়োপযোগী হবে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বেতার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। দিল্লীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারই বেতার পরিচালনা ও ঐ বিষয়ে আইন কানুন প্রস্তুত করার অধিকারী। এই সম্বন্ধে মতান্তর নাই। বেতারকে প্রাদেশিক বিষয়ে পবিণত করা যেতে পারে না। সংবাদ পরিবেশন, কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনমূলক পরিকল্পনা, বিদেশের সংগে সর্বপ্রকার সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সংগে সংগে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, ভাবতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের সমস্যা এক নয়। শিক্ষা, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ সংস্কাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতি প্রদেশের বিশেষ সমস্যা রয়েছে। প্রদেশগুলির ভিতর মূলগত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য অগ্রাহ্য করা যায় না। সেই জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে স্থানীয় বেতার কেন্দ্র সম্বন্ধে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ বেতার সম্বন্ধে ভারত সরকারের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বিকেন্দ্রীকরণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নানা সংগঠনের প্রস্তাব প্রস্তুত করেছেন। লোকমত গঠনের জন্য তাঁরা বেতারের সাহায্য প্রার্থী। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করা সমীচীন। সেজন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় বা পর্যবেক্ষণের অধীনে প্রদেশস্থিত বেতার কেন্দ্রের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ প্রতি প্রদেশের বেতার কেন্দ্রকে সাহায্য করবার জন্য আজকাল একটি করে বেসরকারী ও অবৈতনিক উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়ে থাকে। এই উপদেষ্টা সমিতির ক্ষমতা অত্যন্ত অল্প। প্রাদেশিক বেতার-কেন্দ্রের উন্নতি সাধন করতে হলে, এই উপদেষ্টা সমিতির পরিবর্তে প্রতি প্রদেশে একটি ক'রে অবৈতনিক ও বেসরকারী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা আবশ্যক।

'দেবদূত'-এ অজন্তা কর

এই সমিতিকে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন। প্রদেশস্থিত বেতার কেন্দ্রগুলির উপর যে বর্ধিত কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকার উপরোক্ত প্রস্তাবানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে লাভ করবেন, তার অধিকাংশই প্রাদেশিক সরকার উপরোক্ত কার্যনির্বাহক সমিতির উপর ন্যস্ত করবেন। যদি প্রাদেশিক বেতার কার্যনির্বাহক সমিতি উপযুক্তভাবে গঠিত হয় এবং প্রাদেশিক বেতার কেন্দ্রগুলির কর্তৃত্ব এই সমিতির উপর ন্যস্ত করা হয়, তাহ'লে আশা করা যেতে পারে যে, বেতারের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। বেতারের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারেরই থাকবে। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশস্থিত বেতার প্রতিষ্ঠান গুলির কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে প্রাদেশিক সরকারকে দান করবেন। আবার প্রাদেশিক সরকাব তাঁদেব ক্ষমতা অনেক পরিমাণে একটি বেসরকারী অবৈতনিক কার্যনির্বাহক সমিতির হাতে ছেড়ে দেবেন। বলা বাহুল্য এই সমিতির উপর প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকবে। কিন্তু আশা করা যেতে

লক্ষ্মীবিলাস
বিজয়ের
সাধনা ...
শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ
করেছিলেন মহামায়ার পাদপদ্মে হৃদয়ের
পূজা নিবেদন করবার পর...... সেই
প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত স্মরণে রেখে আমরা আজ
মাতৃচরণে উপহার দেব ভক্তিনীলোৎপল
...যেন অকল্যাণের বিরুদ্ধে অভিযান
বিজয়মণ্ডিত হয়!
A FAMOUS TRADE MARK
লক্ষ্মীবিলাসের ট্রেড
মার্ক এক গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মারক
যেমন শ্রীরামচন্দ্র শারদীয়া উৎসবের......
লক্ষ্মীবিলাস
এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ • কলিকাতা

অমিতা দেবী ও অভি ভট্টাচার্য
লীলাময়ী পিকচার্সের 'দেবদূত' চিত্রে

নবাগত প্রিয়দর্শন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
'স্বয়ংসিদ্ধা' চিত্রে নায়কের ভূমিকায়
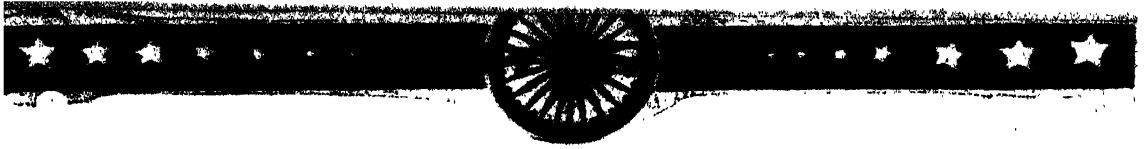
পারে যে, সমিতি উপযুক্ত ভাবে গঠিত হলে প্রাদেশিক সরকারকে সেই ক্ষমতা কখনোই ব্যবহার করতে হবে না।

তৃতীয়তঃ কেবলমাত্র প্রাদেশিক সংস্কৃতি ও জীবন ধারা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণকেই প্রাদেশিক বেতার কেন্দ্রের পরিচালক বা ডিরেক্টর নিয়োগ করা উচিত। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে এমন একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন, যিনি রবীন্দ্র সংগীতকে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্মসূচী থেকে বাতিল করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রয়াস তাঁর বাংলার সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কোন প্রদেশেই যাতে এই প্রকার হাস্যকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কর্তব্য

চতুর্থতঃ বেতারের কর্মসূচী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। প্রতি শাখার কর্মসূচী বিভাগীয় কর্মচারিগণ প্রস্তুত করে থাকেন। প্রতি প্রদেশেই প্রোগ্রাম এ্যাসিস্টেন্ট বা কর্মসূচী পরিকল্পনাকারিদের কার্যাবলী সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, কর্মসূচী প্রস্তুতকারকদের কাজ মোটেই সহজ নয়। মাসের পর মাস মনোজ্ঞ, সর্বজনপ্রিয় ও জনশিক্ষামূলক কথিকা বা নটিকা অথবা সর্বজনপ্রিয় সংগীত বা অন্যান্য উপভোগ্য বস্তু পরিবেশন করা যে কী সুকঠিন কাজ, তা সকলে ধারণা করতে পারবেন না। কোনও শ্রোতা হয় তো বিষয়বস্তু পছন্দ করেন না, কেউ বা নির্বাচিত শিল্পী বা বক্তাকে সহ্য করতে পারেন না। নির্বাচিত শিল্পী বা কথক হয় তো কোনো সাহিত্যিক-গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলভুক্ত। অমনি দলীয় সঙ্কীর্ণ ঈর্ষা ও ব্যক্তিগত আক্রোশ উদ্ধত হয়ে উঠলো! তীব্র সমালোচনা সুরু হলো' বেতার কেন্দ্রের এবং বিশেষ করে কর্মসূচী প্রস্তুতকারকদের। তবুও স্বীকার করতে হবে যে, প্রোগ্রাম এ্যাসিস্টেন্ট বা বেতার-কেন্দ্রের পরিচালকগণ অনেক সময় অজ্ঞতা বশতঃ বা যোগাযোগের অভাবে বিষয় ও শিল্পী-নির্বাচনে ভুল করে থাকেন। এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। যদি বেতার কেন্দ্রের প্রতি বিভাগের সংগে একটি করে বেসরকারী ও অবৈতনিক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা মণ্ডলী সংযুক্ত থাকে, তাহলে কর্মতালিকা প্রস্তুত বিষয়ে যে সকল আপত্তি শোনা যায়—তার অনেকটা সুরাহা হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

পঞ্চমতঃ দেশের দ্রুত উন্নতি বিধান করতে হলে প্রতি ইউনিউন বোর্ডে ও প্রতি উচ্চ-বিদ্যালয়ে একটি করে বেতার-যন্ত্র স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র, অবহেলিত জনসাধারণকে এবং আগামী কালের নাগরিকদের দেশের সমস্যা ও তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা আবশ্যক। এই কাজে বেতার একটি অপরিহার্য যন্ত্র। প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি এই দিকে মনোনিবেশ করেন তাহলে জনগণের সাধারণ শিক্ষা এবং গঠনমূলক কাজ সহজ হয়ে উঠবে।

দেশবাসী আশা করে যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার জাতীয় ইতিহাসের এই পরম সন্ধিক্ষণে গঠনমূলক সকল উপায় অবলম্বন করে ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়ে দেবেন। সাম্যমূলক গণতন্ত্রগঠন, সমাজসংস্কার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বয়স্ক-শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে বেতারের ব্যাপক প্রয়োগ সংগঠনের কাজ সহজ করে তুলবে সন্দেহ নাই। তাই বেতার বিভাগের সুচিন্তিত ও সর্বাংগীন সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা আছে।

নৃত্যে জাভা ও বালী

প্রহ্লাদ দাস

নৃত্যশিল্পী প্রহ্লাদ দাসের রচনার সংগে রূপ-মঞ্চ পাঠক-পাঠিকারা সুপরিচিত। নৃত্যশিল্পী রূপে এঁর খ্যাতিও সীমাবদ্ধ নয় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ প্রযোজিত 'অভ্যুদয়' গীতি-নাট্যটির নৃত্যপরিকল্পনা-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

আজ যে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—সেই ইন্দোনেশিয়ার "জাভা ও বালি" দ্বীপ জগতের কাছে পরিচিত শিল্পকলার জন্য। দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালি দ্বীপকে ভূস্বর্গ বলে আখ্যা দেন কবিরা। জাভা ও বালি দ্বীপ নৃত্যকলার জন্য বিখ্যাত। প্রথমে জাভার নাচ সম্বন্ধে মোটামুটি দুই এক কথা বলছি—জাভার অধিবাসীরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী—কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সেখানে এখনও বর্তমান। বদরের বুদ্ধমন্দির তার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু জাভানিজ নাচের সমস্ত গল্প হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অংশ বিশেষ—যেমন সুভদ্রা হরণ, অর্জুন উত্তরা, কীচক, ভীম ইত্যাদি। কৃষ্ণ, রাম, হনুমান—রাবন ইত্যাদি রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র নিয়ে এদের নাচ। এর দ্বারাই বোঝা যায়—কোন এক সময় হিন্দু ধর্মেরও প্রভাব ওখানে ছিল। জাভার নাচের মধ্যে "স্রিম্পি" নাচ খুবই বিখ্যাত। এই নাচে [illegible] ধীরে ধীরে হস্ত, অংগুলি এবং পদসঞ্চালন করতে হয় যে—এক একটী নাচ প্রায় আধ-ঘণ্টা অবধি চলে। "বেডজা" নামে একপ্রকার মিউজিক্যাল ড্রামা হয় তাতে নাচও থাকে, তবে এই নাচ একটু কমিক ধরণের হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরাই এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে, তবে ছেলেরাও করে "লিগং" এবং "কেবেয়ার" নামে নাচ—প্রজাপতি ও বানরের মত অংগভংগী নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। জাভার কক্ ফাইট অর্থাৎ মুরগীর লড়াই নৃত্য খুবই প্রসিদ্ধ। বালিতেও এই নাচ আছে—তবে একটু অন্য ধরণের। জাভা বালির নাচের পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় একই ধরণের, কেবল মাথার মুকুট অন্য রকম। বালি দ্বীপের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের নৃত্যোৎসব সাধারণতঃ মন্দিরের সামনেই হয়ে থাকে। "বারং" নামে এদের বিখ্যাত নৃত্য-নাট্য আছে। গ্রামে কোন রকম অমঙ্গল হলে নৃত্য-নাট্য অনুষ্ঠিত হয়—এই নাচে ভগবান ও রাক্ষসের মধ্যে যুদ্ধ হয়। রাক্ষস যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং ভগবানের জয়
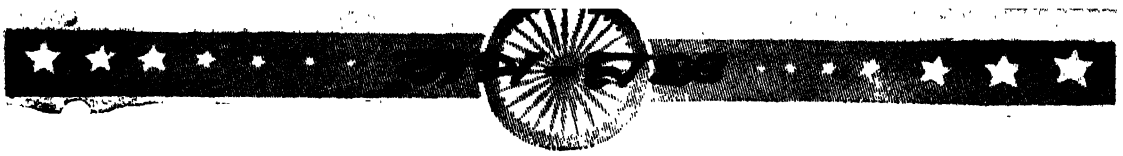
হয়—অর্থাৎ গ্রাম হতে যত অমঙ্গল দূর হয় ভগবানের আশীর্বাদে। প্রায় সমস্ত বালি দ্বীপে রাসি-রাসি অর্থাৎ উৎসব লেগেই থাকে এবং প্রত্যেক উৎসবেই নাচের আয়োজন থাকে। বালিদ্বীপে মেয়েরা যখন ৭।৮ বৎসরের তখন হতেই নাচতে আরম্ভ করে। কুমারীদের নাচেই নাকি দেবতার আশীর্বাদ বেশী মেলে—এই রকম ধারণা বালিবাসীদের। বিয়ের পরও এরা নাচে তবে খুব কম। জাভা ও বালির স্যাডো প্লে অর্থাৎ ছায়া নৃত্য খুবই বিখ্যাত। পেষ্টবোর্ড অথবা মোটা চামরার রংগিন নানা রকম মূর্তি ছোট লাঠির সংগে বাঁধা হয়। সাদা পরদার পেছনে খুব জোর আলো দেওয়া হয় এবং সেই পেষ্টবোর্ডের কাটা ছবিগুলি হাত পা নেড়ে পর্দার গা ঘেসে একদিক থেকে অন্যদিকে নিয়ে যায়—দুই জন, বা তার বেশী লোক নিচে থাকে—তারা ইচ্ছামত ছবিগুলির সুতো ধরে টেনে হাত পা মাথা নাড়িয়ে দেয়—যেমন আমাদের দেশে পুতুল নাচ হয়ে থাকে।

জাভা ও বালির নাচে পরিধানে ছারং অর্থাৎ লুংগি থাকে। কম্‌রন্ অর্থাৎ বুকবন্দ, জংগের অর্থাৎ মুকুট—জাভার নাচের মুকুট পাখীর ডানার মত কাণের দুই দিকে এবং লেজের মত পেছনে থাকে। কিন্তু বালিতে অন্য রকম। জাভায় যারা প্রধান চরিত্র অভিনয় করে তারা দুই হাতের সংগে লাগিয়ে পিঠের দিকে দুইটী পাখা ব্যবহার করে। পুরুষ চরিত্র গুলির প্রায় প্রত্যেকের হাতেই কাষ্ঠ নির্মিত ছোরা থাকে। মেয়েদের পাখা থাকে। কোমরে ইকাৎ পিংগান অর্থাৎ বেল্ট থাকে। জাভা ও বালির নাচের যন্ত্র সংগীতের মধ্যে গামেলং অর্থাৎ জাইলোফোন, ছোলিং অর্থাৎ বাঁশের বাঁশী রেবাক অর্থাৎ একতারা, গেন্‌ডাং অর্থাৎ ঢোল, খীপাচী অর্থাৎ এক প্রকার তারের যন্ত্র এবং ছোট বড় নানারকম গং। এদের পোষাক পরিচ্ছদ খুবই রংগীন, কালো এবং নানারকম হাতের সূক্ষ্ম কাজ করে—চামরার ওপর নানা-রকম রংগীন কাজ এবং কাপড়ে এক রকম মোম দিয়ে—ছাপ দেয় যেমন এ দেশের ছাপার. সাড়ী—তাকে ও দেশে বলে বাটিক্। তবে বাটিকের ছাপা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য এবং অতি সুন্দর। জাভা বালিতে মেয়েরা স্বাধীনভাবে বাজার হাট এবং বেচা কেনা করে। এরা ছিল অত্যন্ত সরল কিন্তু বিদেশীর সংস্পর্শে এসে এদের মধ্যে নানারকম দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। বিলাসীতার ইন্ধন জোগাবার জন্য—এরা আশ্রয় করে দুর্নীতির।

আপনাকে সর্ব্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করিবে

মানুষের ভাগ্য তার জন্মকালীন গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থানের উপরই নির্ভর করে। তাই কোন লোকের পক্ষে ভাগ্য বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে সুখশান্তি পাওয়া একমাত্র দুষ্টগ্রহের অশুভ প্রভাব কাটিয়েই সম্ভব। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক, হস্ত রেখাবিদ ও জ্যোতির্বিদ্ জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, জ্যোতিষ শিরোমণি, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন) মহোদয়ের গণনা ও উপদেশের সাহায্যে পৃথিবীর নানা দেশের অগণিত নরনারী তাঁদের দুঃখ দৈন্য ও জরাগ্রস্ত জীবনে অভাব, দুঃশ্চিন্তা, কঠিন ব্যাধি এমন কি অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। আপনিও পণ্ডিতজীর সহায়তায় আপনার সকল দুঃশ্চিন্তা ও অমঙ্গল কাটিয়ে অচিরে সুখ, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি ফিরে পাবেন। আজই তাঁর সাথে দেখা করে বা পত্র বিনিময়ে আপনার ও আপনার পরিবারের ভবিষ্যত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'ন।

পৃথিবীর সর্বত্র ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত সহস্র সহস্র ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েক জন:—

হার হাইনেস্ রাজমাতা মহারাণী সাহেবা, ত্রিপুরা; হার হাইনেস্ মহারাণী সাহেবা, কুচবিহার; হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়; সন্তোষের মাননীয় মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে, টি; মাননীয় স্যার সি, মাধবন নায়ার, কে, টি, প্রিভি কাউন্সিলার; কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জী কে, টি; পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় বি, কে, রায়; মিঃ কে, রুচপল, সাংহাই, চীন: মিঃ কে, এম, সুব্রহ্মণীয়াম, বাহবেরা, ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড, আফ্রিকা; মিঃ জে, এ, লয়েন্স, ওসাকা, জাপান; মিঃ এফ্রি টেম্পেল, ২১২৩ পপুলার এভেনিউ, সিকাগো, ইলিনয়স, আমেরিকা।

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কবচ-সমূহ
গ্যারাণ্টি পত্র থাকে, বিফলে মূল্য ফেরৎ

ধনদা কবচ—ধারণে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা থাকিয়া প্রভূত অর্থ, মনোমত পত্নী, যশ, সুখ, সম্মান ও সন্তান দান করেন। মূল্য ৭॥৵০। বিশেষ গুণ-সম্পন্ন মূল্য ২৯॥৶০। সত্বর ফলদায়ক ও আজীবন ফলপ্রদ মূল্য ১২৯।৶০।

মোহিনী কবচ—ধারণে অভীষ্ট পুরুষ বা নারী বশীভূত হয়। মূল্য ১১।০ বিশেষ গুণ-সম্পন্ন মূল্য ৩৪৵০ সত্বর ফলপ্রদ ও দীর্ঘদিন স্থায়ী। মূল্য ৩৮৭৸৵০।

বগলামুখী কবচ—শত্রু নাশ, উপরিস্থকে সন্তুষ্ট ও অভিলষিত পদোন্নতি, মোকদ্দমায় জয়, সর্ব্ববিধ বিপদে রক্ষার অপার্থ। মূল্য ৯৵০ বিশেষ গুণ-সম্পন্ন মূল্য ৩৪৵০ (ভাওয়াল কুমারএই কবচে জয়ী হইয়াছিলেন)। সত্বর ফলপ্রদ ও দীর্ঘ দিন স্থায়ী। মূল্য ১৮৪।০।

সরস্বতী কবচ—পরীক্ষায় নিশ্চিত সুফললাভ মূল্য ৯॥/০। বিশেষ গুণ-সম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তি প্রদানে প্রত্যক্ষ মূল্য ৩৮॥/০। সত্বর ফলদায়ী মহাশক্তি সম্পন্ন মূল্য ৪২৭৸/০

এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কবচ আছে। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য লিখুন বা সাক্ষাৎ করুন।

জ্যোতিষসম্রাট
পণ্ডিত শ্রীরমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
জ্যোতিষার্ণব, এম্, আর্, এ, এস (লণ্ডন), প্রেসিডেন্ট

অল-ইণ্ডিয়া এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল এ্যাণ্ড এ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

হেড অফিস: ১০৫ গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস" কলিকাতা। (শ্রীশ্রী নবগ্রহ ও কালীমন্দির)
সাক্ষাতের সময়—সকাল ৮॥ হইতে ১১॥ পর্য্যন্ত। ফোন: বি বি ৩৬৮৫
ব্রাঞ্চ অফিস: ৪৭নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট (ওয়েলেসলী জংশন) কলিকাতা
সাক্ষাতের সময়-বৈকাল ৫॥ হইতে ৭॥ পর্য্যন্ত। ফোন কলিকাতা ৫৭৪২।

— শ্রীমতী রেণুকা —
সপ্তর্ষি চিত্র মণ্ডলী লিঃ-এর
প্রথমচিত্র নিবেদন শুভ্রছাব··তে
রূপ-মঞ্চ শারদীয়া, ১৩৫৪

শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদার পরিচালিত
মজুমদার-স্বামী প্রডাকসন্সের সর্বহারা
(দুঃখীর ইমান) চিত্রে সুশীল
মজুমদার, কানু বন্দ্যোঃ,
মমতা রায় ও লালা দাশগুপ্তা।

শ্রীপার্থিবের দপ্তর

প্রখ্যাত শিল্পী ছবি বিশ্বাস

ছবির রাজ্যেও যেমনি ছবির সমকক্ষ মেলা দায়—মঞ্চরাজ্যেও তেমনি তাঁর জুড়ি নেই। একথা স্বীকার করবেন সকলেই—ছবির প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁরা তাঁরাও—শ্রীপার্থিবেরত এই অভিমত। ছবি আপনাদের সবটুকু প্রশংসা কেড়ে নিতে চায়না—তাঁর ন্যায় অন্যায় বিচার করে—তাঁর উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা তৌলদণ্ডে ওজন করে, যতটুকু প্রশংসা—আপনাদের অন্তরের যতটুকু প্রীতি তাঁকে দিতে চাইবেন—পরম শ্রদ্ধার সংগে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া বলে সেইটুকুই তিনি গ্রহণ করবে।

পাঠক সাধারণের কাছ থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসা ধরেছে—সম্পাদকও উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন—ছবি বিশ্বাসকে শ্রীপার্থিবের দপ্তরে চাই। ছবি যে ছবিই—ধরা ছোঁয়ার বাইরে, একথা এঁরা কেউই শুনতে রাজী নন। বিপদ আমার। গত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পার্ক-সার্কাস থেকে ছবিবাবুর বিপর্যয়ের সংবাদ আপনাদের সকলের কাছে যেয়েই পৌছেছিল। তারপর কলকাতায় বাসস্থান সংগ্রহের যে বিভ্রাট, তাও ত কারোর অবিদিত নেই। আজ এ বন্ধুর বাড়ী, কাল সে বন্ধুর বাড়ী এমনিভাবে ছবিবাবুর দিন কাটাতে হ'য়েছে। অর্থাৎ 'ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা!' তাঁর নাগাল পাবো কী করে। হানা দিলাম মিনার্ভা থিয়েটারে। 'দুই-পুরুষের' অভিনয় চলছিল—নুটবিহারী কোর্ট থেকে এলেন। চাপকান খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্রীপার্থিব, কী মনে করে? তোমাকে দেখলেইত ভয় করে?" আমিও কথার জের টেনে নিয়ে উত্তর দিলাম, "মতলব একটা আছে তাত বুঝতেই পাচ্ছেন। এখন বলুন, আপনার সময় কবে এবং কখন হবে? অন্তত: ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য আপনাকে একা পেতে চাই।"

কৌতুক প্রিয় ছবিবাবু আমায় বাধা দিয়ে একটু বক্রভাবে বল্লেন, "যে প্রস্তাব আমার কাছে করলে, কোন অভিনেত্রীর কাছে আবার করে বসো না। সম্পাদকের কানে গেলে চাকরিটি হারাতে হবে।" আমিও ছবিবাবুর তালে তাল রেখে উত্তর দিলাম, "তাও মাঝে মাঝে করতে হয় বৈকী? তবে স্থান বিশেষে আবার মণিদীপাকে পাঠান হ'য়ে থাকে।"

ছবিবাবু উত্তর দিলেন, "তোমার ভাগ্য তা'হলে নিতান্তই খারাপ! তা আমাকে নিয়ে দু'ঘণ্টা কাটাতে পারবে তো? আমি অবশ্য সারা রাতটাই তোমায় দিতে পারি। তবে কথা হচ্ছে—এমন সময় তোমায় আমি দিতে চাই—।" ছবিবাবু একটু থামলেন। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা নিমেষে আত্মগোপন করলো। কথায় ও কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল। তিনি বল্লেন, "আমি এমন সময় তোমায় দিতে চাই—যে সময় অন্যকে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দেইনি। কেনাবেচার দর-কষাকষির মাঝে তোমায় টেনে এনে ছোট করতে চাই না।" আবার একটু থেমে বল্লেন, "শ্রীপার্থিব, সারা জীবন ভরে এত অন্যায় করেছি যে, তোমাদের কাছে বলবার মত আমার কিছু নেই। আমার জীবনের এই অন্যায়গুলি
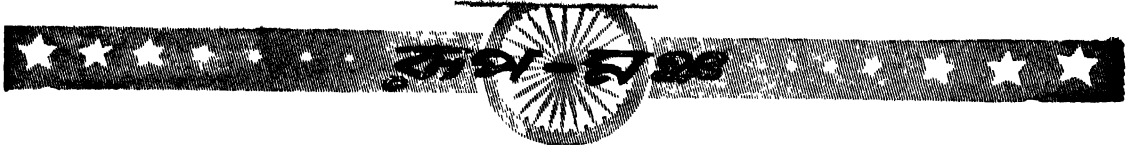
থেকে আমি মুক্ত হতে চাই না। আমি আমার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় তোমায় বলবো। তুমি তোমার পাঠক সমাজের কাছে—আমার শ্রদ্ধেয় গুণগ্রাহীদের কাছে সেগুলি তুলে ধরবে। ন্যায় ও অন্যায়কে তৌলদণ্ডে মেপে যেটুকু প্রীতি আন্তরিকতার সংগে তাঁরা আমায় দিতে চাইবেন—পরম শ্রদ্ধার সংগেই তাকে মাথা পেতে নেবো। কিন্তু অসত্যের মায়াজালে তাঁদের বিচারশক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করে, তাঁদের প্রীতি ও ভালোবাসার ফাঁকিটুকু আমি নিতে পারবো না।"

ছবিবাবুর এই সহজ সরল অকপট উক্তি এবং আত্ম-বিচার-এ আমি মুগ্ধ না হ'য়ে পারলুম না। আমি জানি, আমার পাঠকসম্প্রদায়কেও তা আমারই মত মুগ্ধ করবে। নুটবিহারীর তলপ পড়লো। আমিও সাক্ষাতের দিন ও সময় ঠিক করে চলে এলাম।

২০শে আগষ্ট, আমাদের সক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হ'য়েছিল। রূপ-মঞ্চ কার্যালয় থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সম্পাদক ও নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত আগে আগে চলেছেন। পিছে আমি—চামড়ার ব্যাগটায় প্রয়োজনীয় খাতাপত্র। ক্যামেরাম্যান ধীরেন সরকার তাঁর ক্যামেরা ঝুলিয়ে চলেছে। শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ফ্লাট-ফাইল। রীতিমত একটা প্রেস-কনভয় বলতে পারেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট ছিল। মিনার্ভা থিয়েটারে যখন আমরা পৌছলাম—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি—কাটা একটুও এদিক ওদিকে যায়নি। কিন্তু ছবিবাবু কোথায়? তাঁর ত পাত্তাই নেই! তিনি তখন অবধিও এসে পৌছোন নি। মিনার্ভার লবীতে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। না—ছবি বাবু এলেন না হয়ত! মিনার্ভার কয়েকজন বন্ধু বল্লেন—'ছুটির দিন, আজ আর আসবেন না।' কথাটা আমরাও অবিশ্বাস করতে পারলুম না। শ্রীসু অর্থাৎ সুশীল বন্দ্যোঃ দক্ষিণ দুয়ারের যাত্রী, তিনি একটু উসখুস কচ্ছিলেন। আমরাও অগত্যা গৃহাভিমুখে পা বাড়ালাম। আমরাও পা বাড়িয়েছি—একটা গাড়ী এসে থামলো। ছবিবাবুর গাড়ী। ছবিবাবু বেরিয়ে এলেন। তাঁর অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য বার বার ক্ষমা চাইলেন। স্যুটিং ছিল। 're-taking'-এর জন্য দেরী হ'য়ে যায়। টেলিফোন করতে চেষ্টা করেন কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে মিনার্ভার টেলিফোনটিও সেদিন ছিল খারাপ। ছবিবাবুর সংগে সংগে আমরা সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। কৌতুক রস পরিবেশন করে তিনি আমাদের আপ্যায়িত করলেন কিছুক্ষণ। তারপর নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতা ভেদ করে ছবিবাবুই প্রথম কথা বল্লেন। ঘরের ভিতর আমাদের 'কনভয়' ছাড়া বাইরের যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বাইরে যাবার অনুরোধ জানিয়ে ছবিবাবু বল্লেন, "বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে দাদা বলে ডাকো। আমি এঁদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—আমার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি এঁদের কাছে ব্যক্ত করবো। তোমরা আমাকে ভালবাস,—শ্রদ্ধা করো—সেকথাগুলি তোমাদের পক্ষে শোনা কী উচিত হবে! তাই, তোমাদের একটু অন্তরালে যেতে অনুরোধ করবো। অবশ্য, যাবার আগে একথাও জেনে যাও, আমার দিক থেকে তোমাদের কাছে আমার জীবনের কোন কথা বলতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমাদের দিক থেকেই শোনা উচিত হবে না।" এক এক করে সকলে চলে গেলেন। শ্রীসু ছবিবাবুর স্কেচ আঁকতে বসে গেলেন। ক্যামেরাম্যান ধীরেন সরকার ক্যামেরা বাগিয়ে বসলো। নাট্যকার দেব-নারায়ণ গুপ্ত ও সম্পাদক এক পার্শ্বে বসে—ছবিবাবু সদ্য প্রকাশিত রূপমঞ্চের পাতা উলটিয়ে যাচ্ছেন তাঁর রূপ সজ্জার টেবিলের সামনে বসে। আমি ছবিবাবুর একটু পাশ ঘেসে বসলাম।

শিশির নির্মলেন্দ অহীন্দ্র-নরেশ-মনোরঞ্জন এঁদের অযথা টেনে আনতে চাই না। প্রবীণেরা একটা কোঠারীর ভিতর পড়ে গেছেন। সেখানেই তাঁদের তালা বন্ধ করে রাখা যাক। এঁদের পরবর্তী দলের মঞ্চ ও চিত্রজগতের শিল্পীগোষ্ঠীর ভিতর সর্বপ্রথমে যার নাম করতে হয়, অথবা প্রবীণ কোঠারীর ভিতর শিশির কুমারকে যেমন সর্বাধিনায়ক বলে সকলে মেনে নেবেন, তেমনি পরবর্তী কোঠারীর ভিতর ছবি বিশ্বাসকেও ঐ সম্মান যদি দিতে চাই তাতে আশা করি কেউই অমত প্রকাশ করবেন না।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ, ১৩ই জুলাই (সম্ভবতঃ ৭ই শ্রাবণ) ছবি বিশ্বাস কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার সম্পদশালী ও বণিয়াদ পরিবার বলে যে-কয়টি পরিবার তখন পরিচিত ছিল—ছবি বিশ্বাসদের পরিবারটিকে তাদের মাঝ থেকে কেউ তখন বাদ দিতে পারতেন না। ছবি বিশ্বাসের পিতামহ স্বর্গতঃ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের নাম এখন অবধিও অনেকেই ভুলে যেতে পারেননি।

বিডন ষ্ট্রীটের এই বিশ্বাস-পরিবারটি শুধু তার অর্থের জাকজমকেই সকলের কাছে পরিচিতি পায় না—পারিবারিক ঐতিহ্য ও অনুষ্ঠান এবং দানশীলতার ভিতর দিয়েই খ্যাতি অর্জন করে। ছবি বিশ্বাসের পিতা স্বর্গতঃ ভূপতি নাথ বিশ্বাস পারিবারের সুনামকে অব্যাহত রাখতে বিন্দুমাত্রও চেষ্টার ত্রুটি করেন না। চার ভাইয়ের ভিতর ছবি কনিষ্ঠ। ছবির মধ্যম ভ্রাতা মারা গেছেন।

ছবি—আজ যে ছবিকে না জানেন, ছবি-প্রিয়দের ভিতর এমন লোক নেই বল্লেই চলে, সেই ছবির প্রকৃত নাম শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস। টুকটুকে ছবির মত শিশু—রূপোর চামচে মুখে দিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছিল—আঙ্গুর ফলের মত ছোট্ট গাল ত্'টোয় কে না তখন আদর করতে চাইতো! মা আদর করে নাম রাখলেন ছবি। পারিবারিক পোষাকী নামটা পোষাকী পোষাকের মতই হ'য়ে রইলো—মায়ের দেওয়া ছবি'ই পরিচিতি পেল পারিবারিক আবেষ্টনীর মাঝে—পেল বন্ধু মহলে—পেল কর্মক্ষেত্রে—ধীরে ধীরে ছবির ব্যাপ্তি গেল বেড়ে—ছবি প্রতিষ্ঠিত হ'লো ছবির রাজ্যে—মায়ের দেওয়া ছবি নামটা মায়ের আশীর্বাদের মত ছবির রাজ্যে আজ ছবিকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু ছবির জীবনে কত বড় অভিশাপ—নির্মম নিয়তির রূঢ় আঘাত—মাত্র দশ মাস বয়সের সময় ছবি তাঁর মাকে হারায়। ছবির জীবনের এই বেদনা—আজও মুছে যায়নি। দশমাসের মাতৃহারা শিশুর জীবনে মায়ের কোন প্রভাবই সাধারণত থাকে না। কিন্তু ছবির ধাতই আলাদা—মায়ের প্রভাব থেকে কোনদিন সে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চায়নি—পারেনি। মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্ত প্রতিভায় আজ ছবি ছায়াজগতে দীপ্তিমান—কিন্তু আজও মায়ের কথা মনে জাগলে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে—মাতৃস্নেহ তাঁর কাছে অনাস্বাদিত—জীবনের এই পরম বঞ্চনার বেদনা আজও ছবিকে শিশুর মত বিচলিত করে তোলে। মায়ের একখানা ফটো ছিল বাড়ীতে—লাল পেড়ে শাড়ী পরা। লাল পাড়ের শাড়ী ছবির মা খুব ভালবাসতেন—বাপের কাছ থেকেই ছবি মায়ের সম্পর্কে এসব কথা শুনতো। মনে মনে মায়ের রূপ কল্পনা করে নিয়েছিল—ছোট বেলায় একবার খুব অসুখ করে ছবির। ঘুমের ঘোরে দেখতে পায়, ছবি অনুভব করে—তার মা অমনি লাল পেড়ে শাড়ী পরে তার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন—পুত্রের রোগ পাণ্ডুর মুখখানা আদর করে কোলে তুলে নিয়েছেন—ছবির সমস্ত রোগ যন্ত্রণা মুহূর্তে দূর হ'য়ে যায়। পরম আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ে—কিন্তু তার পরই চেয়ে দেখে, তার মা কাছে নেই। রোগের বিকারে সে বিছানা থেকে উঠে পড়ে মায়ের সন্ধানে—মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। লোকজন ধরাধরি করে আবার তাকে শুইয়ে দেয়। ছবির মায়ের অভাব খানিকটা পূরণ করেছিলেন তার মেজ জ্যেঠাইমা। তাঁর অপরিসীম স্নেহের ঋণ কোনদিন ছবি ভুলতে পারেনি। কিন্তু কারোর কোন স্নেহই তার মায়ের ব্যথা ভুলিয়ে দিতে পারেনি। ছোটবেলায় ছবি শিক্ষালাভ ক'রে নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের একটী কিনডার গার্টেন স্কুলে। এখানকার ভারপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর স্নেহের প্রভাবও ছবির জীবনে কম নয়। তাঁকে সকলে ডাকতো মাসীমা বলে। মায়ের স্নেহের বিনিময়েই তিনি সকলের কাছ থেকে এই অধিকার লাভ করেছিলেন। এরপর ক্ষুদিরাম বসু লেনস্থিত সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ছবি পড়তে আরম্ভ করে। 6th class অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী থেকে হিন্দু স্কুলে পড়তে আরম্ভ করে। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ছবির কলেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হ'লে ছবি প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করে বিদ্যাসাগর কলেজে এসে তাদের সংগে যোগ দেয়। ছবিদের পরিবারটি ছিল বিরাট। জ্যেঠতাত-খুড়তাত ভাই-বোন মিলিয়ে সংখ্যায় তারা এতই ছিল যে, নিজেরাই একটা

সেনাদল গড়ে তুলতে পারতো। নিজেদের বাড়ীতেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আবৃত্তি, গান, অভিনয় প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠান হতো এবং তাতে পরিবারের ছেলেমেয়েরাই কেবল মাত্র অংশ গ্রহণ করতো। পিতামহের ছিল অগাধ ঐশ্বর্য কিন্তু পরিবারের কোন ছেলেমেয়ের গায়ে বিলাসিতার কোন ছোঁয়াচই লাগতে পারেনি। এমন কি হিন্দুস্কুলে পড়বার সময় বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে ছবিকে হেটেই যেতে হ'তো—গাড়ী-ঘোড়ার প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও। ছবিদের বাড়ীতে প্রকাণ্ড একটা হলঘর ছিল, সেখানে চলতো তাদের অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠান। পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই অভিনয়-স্পৃহা ছবির ভিতর অঙ্কুরিত হ'তে থাকে। কিন্তু অভিনয়কে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করবার ইচ্ছা তেমন কোনদিন ছবির ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি।

বড় হবার সংগে সংগে ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটের সংগে জড়িত হ'য়ে পড়েন। সেখানে বিভিন্ন সুধী ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। ছবির সংগে আলাপ না হ'লেও স্বর্গতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন ইনস্টিটিউটে যাতায়াত করতেন। এবং শিশির কুমারের সংগে এখানেই প্রথম অভিনয় করবার ছবির সুযোগ ঘটে। এখানে আরো যাঁদের সংস্পর্শে ছবি বাবু আসেন, তাঁদের ভিতর জিতেনবাবু (ইনকামট্যাক্স), জ্ঞানপ্রিয় মিত্র (ইনি 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি গাইতেন)—নরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইনস্টিটিউটের সংস্পর্শে এসে শিশির কুমারের ব্যক্তিত্ব ও অভিনয়-নৈপুণ্য ছবি বাবুর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিশির বাবুর একলব্য শিষ্যরূপে নিজেকে পরিচয় দিতে আজও ছবিবাবু গৌরব বোধ করেন।

স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত কাঁকুড়গাছি নাট্য-সমাজ, হাওড়া নাট্য-সমাজ এবং ললিতচন্দ্র বসু (বোকা) প্রযোজিত সিকদার বাগানস্থিত বান্ধব সমাজের সংস্পর্শে ছবি বাবু জড়িত হ'য়ে পড়েন। এবং নদীয়া-বিনোদ-এ তাঁর নিমাই-র ভূমিকাভিনয় যাঁরাই দেখেছেন, সেকথা তাঁরা আজও ভুলে যেতে পারেন নি।

ছবিবাবুর পিতা স্বর্গতঃ ভূপতিনাথ বিশ্বাস—মর‍্যান এণ্ড কোং-র সংগে ব্যবসায় সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী মিঃ জি, এস, আলেকজাণ্ডার প্রায়ই ছবিবাবুদের বাড়ীতে আসতেন এবং বেশ আড্ডা বা মজলিস জমিয়ে তুলতেন। সে মজলিসে বাড়ীর কোন ছেলে বা মেয়ের উঁকি মারবারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ছবিবাবুর প্রবেশ পত্রের অভাব হ'তো না। মজলিসে উপস্থিত থাকবার জন্য নয়, যাঁরা মজলিসে আসতেন, ছবি ছিল তাঁদের সকলেরই প্রিয়—তাঁদের স্নেহের ডাককে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা পারিবারিক কোন নিয়মকানুনের গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ করে রাখা যেত না। মিঃ আলেকজাণ্ডার এবং মিসেস আলেকজাণ্ডার প্রায়ই আসতেন ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে। এঁরা দু'জনেই ছবিকে ছেলের মত স্নেহ করতেন। এঁদের কোন সন্তানাদি ছিল না। মিসেস আলেকজাণ্ডার ছবিকে তাই দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়েই শুধু তাঁরা ছবিকে পেতে চাননি, তাঁরা ছবিকে পেতে চেয়েছিলেন তাঁদের হৃদয়ের বিনিময়ে। ছবির প্রতি তাঁদের অপরিসীম স্নেহই ছবি এবং ছবির পিতাকেও বিচলিত করে তোলে। মিসেস আলেকজাণ্ডার আদর করে ছবিকে 'ছাবি' বলে ডাকতেন। সমস্ত ঠিক ঠিক ঠাক—মিসেস আলেকজাণ্ডার ছবিকে নিয়ে দেশে ফিরবেন, তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকে ভেংগে দিতে এসে দাঁড়ালেন ছবির মাতামহী। এই ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীর সামনে বিরুদ্ধ মত নিয়ে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা পরিবারের কারোরই ছিলনা। হ'লোও না। ভগবানকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদ সেই মহীয়সী ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছবির মাতামহীকে—নইলে আজকে হয়ত ছবি বিশ্বাসকে আমরা পেতাম না। তাঁরই জন্য ছবি রয়ে গেল বাংলায়। বাংলার মাটি ও আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতে লাগলো।

ছবির জীবনে তাঁর পিতার প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট। পিতা এবং পুত্রের সম্পর্কের মাঝে কোন প্রকার সংকোচ এসে বাসা বাঁধেনি। ঠিক যেন বন্ধুর মত সহজ সরল। অথচ পিতার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করবার
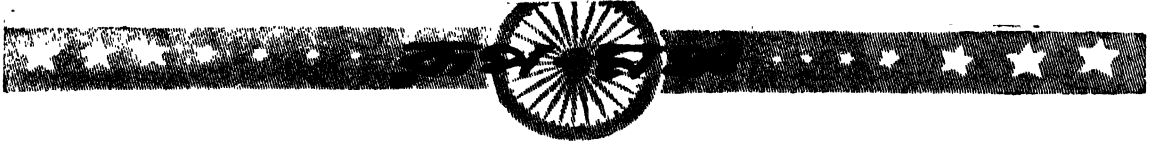
ধৃষ্টতা কোনদিন ছবির মাঝে মাথা উচিয়ে উঠেনি। ছবিবাবুর পিতা সাধারণতঃ পুত্রদের 'আপনি' বলে ডাকতেন—যখন তাঁর স্নেহের অভিব্যক্তি বাইরে রূপ গ্রহণ করতো, তখনই আদর করে কেবল 'তুই' বা 'তুমি' বলে ফেলতেন। পিতৃহৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহের সন্ধান কোনদিন পুত্রদের জানতে দিতে চাইতেন না। ব্যবসায়ে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। অল্প দিনের ভিতর ছবিবাবুর পিতা এমনি একটা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন যে, সে বিপর্যয় থেকে কোনমতেই আত্মরক্ষা করতে পারেন না। বিডন স্ট্রীটের পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ করে ৭, মোহনবাগান লেনে এসে বাস করতে থাকেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হবে। এরপর থেকে পারিবারিক আর্থিক অবস্থা দিন দিনই অবনতির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। বহু চেষ্টা করেও ভূপতিবাবু এতদিন দুর্গোৎসব বন্ধ হ'য়ে যেতে দেননি। কিন্তু এমন সময় এলো —কোনমতেই এতদিনের অনুষ্ঠানকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। পূজা বন্ধ করে দিতে হ'লো। ছবিবাবুর পিতাও যেন সংগে সংগে ভেংগে পড়লেন। তাঁকে শয্যা নিতে হ'লো। ডাক্তার এলো। কিন্তু ডাক্তাররা কী করবে? এ রোগের ওষুধ ডাক্তারদের হাতে ছিলো না; ভূপতিবাবু নিজেও তা জানতেন—ওপারের শংখধ্বনি তাঁর কানে বার বার আঘাত করতে লাগলো। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে পুত্রকে কাছে ডেকে বসালেন। শুধু একটি কথা বল্লেন, "শত চেষ্টা করেও পুজোটাকে রক্ষা করতে পারলাম না— তুমি যদি পারো কোনদিন, কোরো।" আর কোন কথা নেই—আর কোন অনুরোধ নেই। সেদিনই ছবির চোখে জল দেখা গেল। মৃত্যুপথ-যাত্রী পিতার অনুরোধের-দু'ফোটা তপ্ত চোখের জলে ভিজিয়ে ছবি উত্তর দিল, "যাবার আগে আশীর্বাদ করে যাও—আশীর্বাদ করে যাও—আমি যেন তোমার শেষ কথার মর্যাদা রক্ষা করতে পারি।" ১০ই মার্চ, ১৯৩০, ছবিবাবুর পিতার মৃত্যু হয়।

বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। পিতার শেষ অনুরোধ প্রতিপালনের কোন সুযোগই ছবিবাবুর সামনে আসে না। তাঁকেও নানান বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে পথ চলতে হয়। জীবনের এই সংগ্রামমুখর তেরোটি বছরের ইতিহাস— ছবিবাবুই জানেন আর জানেন তাঁর স্ত্রী—১৯২৯ খৃঃ-এ পারিবারিক বিপর্যয়ের দিনে পথচলার সংগিনীরূপে যিনি এসে পাশে দাঁড়ান। আত্মীয়স্বজনের কত শ্লেষ—কত কী ছবিবাবুকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হ'য়েছে। সমস্ত তুচ্ছ করে নির্ভয় যাত্রীর মত তিনি ছুটে চলেন। একটু আশার আলোকে যখন উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন—পিতার শেষ অনুরোধ—অন্তরের গোপন ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য এবার তিনি তাঁর একমাত্র পরামর্শদাতা স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু দু'জনেই পরামর্শ করে আরো কিছুদিন চুপ করে থাকাই উচিত বলে মনে করলেন। কারণ, তখনও তাঁদের আর্থিক অবস্থা সুনিশ্চিতরূপ গ্রহণ করেনি। যখন আর্থিক অবস্থা সুনিশ্চিতরূপ ধরে দেখা দিল, তখনই পিতার অন্তিম অনুরোধকে পূর্ণ-মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। শুধু দুর্গোৎসবের আয়োজন করেই ক্ষান্ত হ'লেন না। পৈতৃক বাস্তুভিটের জীর্ণ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করলেন। ছবিবাবুদের এই পৈতৃক বাস্তুভিটে ২৪পরগণা জেলার, বারাসত মহকুমার ভিতর ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। মহানগরীর বুকে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ-ক্ষমতা ছবিবাবুর হ'লেও, তিনি সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না। তিনি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা পৈতৃক বাস্তুভিটের জীর্ণ সংস্কারে নিয়োজিত করলেন। এমন কী, তাঁর যেসব বন্ধুবান্ধব এখানে আসবেন – তাঁদের জন্য তৈরী করলেন একটা 'গেষ্ট হাউস'।

যেদিন থেকে ছবিবাবু দুর্গোৎসব আরম্ভ করেছেন—সেদিন থেকে আজ অবধি কোনদিন এই উৎসবের কয়দিন কোন অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন না এবং ভবিষ্যতেও করবেন না। এ ক'দিন তিনি তাঁর দেশের বাড়ীতে—গ্রামবাসীদের মাঝে তাঁদেরই একজন হয়ে কাটিয়ে দেন। তিনি ভুলে যান যে, তিনি একজন অভিনেতা—তাঁরাও তাঁকে অভিনেতা ছবি বিশ্বাসরূপে নিজেদের বুকে টেনে নেয় না—নেয়, তাঁদেরই দশজনের একজন ভেবে। এই প্রসংগে একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় যখন ছবিবাবু বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েন এবং যেদিন দেশের বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করেন—সেদিন

খবর পেয়ে যারা ষ্টেশনে তাঁর জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন—তাঁরা সবাই ছবির গ্রামবাসী—হিন্দু-মুসলমান সবাই ছিলেন এঁদের ভিতর। সাম্প্রদায়িক কোন অন্ধতা তাঁদের বিচার বুদ্ধিকে, তাঁদের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দিতে পারেনি—প্রীতি ও প্রেমের আদর্শ সেদিনও যেমন তাঁদের কাছে অম্লান - চির ভাস্বর ছিল, আজও তেমনি আছে। এজন্য অভিনেতা ছবি বিশ্বাস তাঁর অভিনয়-খ্যাতির চেয়েও কম গৌরবান্বিত নন।

ছবির চেহারা বরাবরই ছিল লোভনীয়। বাংলার চিত্র ও নাট্য-জগতের দৃষ্টিও যে কিছুটা তাঁর ওপর না পড়েছিল তা নয়। 'বিদ্রোহী'র সময় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছবিবাবুর পিতাকে এসে অনুরোধ করেন, যাতে ছবিকে পর্দায় অভিনয় করবার জন্য তিনি অনুমতি দেন। ছবিবাবুর পিতা পুত্রকে ডেকে বল্লেন, "তোমাকে এঁরা ছবিতে অভিনয় করতে বলছেন। তোমার অমত না হলে আমার কোন আপত্তি নেই।" ছবিবাবু অমত করলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে আর আন্তরিকতার আভাষ পাওয়া যায় না।

রীতেন এণ্ড কোংর সর্বজন প্রিয় হারুদা (খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়) তখন ছবিবাবুকে অনুরোধ করেন, ছবিতে অভিনয় করবার জন্য। ছবি সর্বপ্রথম হারুদার মধ্যস্থতায় ও আগ্রহে বাংলার চিত্র ও নাট্যামোদীদের অভিবাদন জানান 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'।

মঞ্চাভিনয়ের বেলাতেও ঠিক এমনি একটু গোলমেলে ভাব দেখা দেয়। প্রয়োগশিল্পী সতু সেন এসে ছবিবাবুকে 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকে অভিনয় করবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু সে অনুরোধের তিনি শেষ পর্যন্ত কোন মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন না। ছবিবাবু নাট্যামোদীদের সর্বপ্রথম অভিবাদন জানান 'সমাজ' নাটকে। চিত্র জীবনে সে সব পরিচালক ছবিবাবুর প্রথম জীবনে সাহায্য করেছেন বা যাঁরা তাঁকে কোন বিশেষ চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ দিয়েছেন —তাঁদের মাঝে দেবকী বসুর নাম সর্বাগ্রে বলতে হয়।

আমাদের অন্যান্য প্রতিভাবান অভিনেতাদের মতই বহু বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে ছবি বিশ্বাসকে পথ করে নিতে হ'য়েছে। যে সব খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের মতই মঞ্চের ওপর ছবি বিশ্বাসের বিশ্বাস রয়েছে অপরিসীম। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা প্রসংগে তিনি বলেন, "মঞ্চে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে আমি নিত্য নূতন রূপ দিয়ে আমার পৃষ্ঠপোষকদের অভিভূত করতে পারি। আমার অভিনীত চরিত্রকে নানাভাবে তাঁদের সামনে তুলে ধরতে পারি—কিন্তু পর্দায় সে সম্ভাবনা কোথায়? তাঁরা যে রূপকে আগ্রহভরে গ্রহণ করবেন, আমি সেই রূপকেই তুলে ধরতে পারবো। কিন্তু পর্দা সে সুযোগ কী করে আমায় দিবে। 'Cinema is dead art. ও মৃত—ওর প্রাণ নেই। প্রাণহীন পুতুল নিয়ে আমরা খেলা করি। মঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। ওর প্রাণের স্পন্দন আমাদের স্পন্দিত করে তোলে। উৎসাহ দেয়। নূতন নূতন দৃষ্টির উন্মাদনায় আমাদের মাতিয়ে তোলে।"

আধুনিক মঞ্চের রূপ কী হয়া উচিত, সে সম্পর্কে ছবিবাবু দৃঢ়তার সংগে উত্তর দেন, "Modern stage should be the medium of education of the nation। মঞ্চকে জ্ঞানের আলোক শিখা জ্বালাতে হবে জাতির মনে। জাতিকে নূতনভাবে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে হবে মঞ্চের।" আধুনিক মঞ্চের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ছবিবাবু প্রথমেই বলেন, "আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, আমি মঞ্চের সংস্কার করতে যেয়ে প্রথমেই প্রমটিং বন্ধ করে দিতাম।" ধীরে ধীরে রাত বেড়ে চলছিল। আমাদের খেয়ালই ছিল না। মন্ত্র-মুগ্ধের মত ছবিবাবুর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলাম। তিনি মাঝে মাঝে উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিলেন—অভিভূত হ'য়ে কথা বলবার শক্তিও হারিয়ে ফেলছিলেন—জাতীয় মঞ্চকে এমনি ভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর মাঝে, যে-পরিকল্পনা যথাযথ রূপ পেলে, সেদিন নাট্যমঞ্চের সামনে যেয়ে দাঁড়ালে বিশ্বলিঙ্গালয়ের মতই আমাদের মাথা নত হ'য়ে আসবে। এবং এই নাট্য-মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বেদী-মূলে যে শিল্পী ও কর্মীরা আত্মনিয়োগ করেছেন—তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে একে দিন দিন সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন,

তাঁদের আর্থিক দীনতার প্রতি ছবিবাবুর যে মমত্ববোধের পরিচয় পেলাম, তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। এই প্রসংগে তিনি বলেন, "এঁদের এমন একটা আর্থিক সংগতির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সৃষ্টির কার্যে নিয়োগ থাকবার সময় দারিদ্রের হাহাকার তাঁদের বিচলিত করে না তুলতে পারে। তা'হলে যে শিল্প-প্রতিমার মূর্তি নির্মাণে এঁরা উৎসর্গীকৃত, সে প্রতিমার রূপ ব্যর্থরূপেই দেখা দেবে। আর্থিক বৈষম্যকে দূর করতে হবে।"

নাট্য-বিদ্যালয় এবং শিশু আমোদ প্রমোদের প্রয়োজনীতাও ছবিবাবু যথেষ্ট উপলব্ধি করেন। কার্যকালে তাঁর শক্তি ও সামর্থের দ্বারা এই পরিকল্পনাকে মূর্ত করে তুলতে সাহায্য করবেন—সে প্রতিশ্রুতিও দেন। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি যাতে শিল্পসমাজের ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে, এজন্য ছবিবাবু রূপমঞ্চ মারফৎ শিল্পী সমাজের কাছে বিনীত অনুরোধ জানান।

ছবিবাবু রূপ-সজ্জা মোটেই সহ্য করতে পারেন না—তাঁর গালের চামড়া এতই নরম যে, রূপ-সজ্জার কোন প্রকার উত্তেজক প্রলেপ মাখলেই গালে ঘায়ের মত হ'য়ে ওঠে, তাই ভবিষ্যতে এক চুলের রূপ-সজ্জা ছাড়া মুখের কোন প্রকার রূপ-সজ্জা নিয়ে ছবিবাবুকে দেখা যাবে না।

চিত্রে ও মঞ্চে বহু চরিত্রে ছবিবাবু নিজের নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে দর্শকসাধারণের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়েছেন। জনমতের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। এই প্রসংগে তিনি বলেন, "যদি কোনদিন জনসাধারণ আজ আমার জন্য যে স্থান করে দিয়েছেন, সেদিন অন্য কোন উপযুক্তের জন্য সে স্থান আমায় পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন, তাতেও আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবোনা।" এই জনমত গঠনে এবং বাহনে সংবাদপত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সাংবাদিকদের অবহিত থাকতে অনুরোধ জানান। সুযোগ বুঝে আমিও ছবিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই উক্তির ভিতর রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে কোন ইংগিত আছে কি? এবং এবিষয়ে রূপমঞ্চ সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট অভিমত চাই।" এই কথা বলেই খাতাটি এগিয়ে দিয়ে বল্লাম, "দিন, লিখে দিন।" ছবিবাবু খাতাটি সরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "রূপ-মঞ্চ এবং তোমার রূপমঞ্চ সম্পাদক সম্পর্কে আমি Blank Cheque দিচ্ছি এই সকলের সামনে।" তারপর আস্তে আস্তে তাঁর টেবিলের সামনে ঝুকে বল্লেন, I love and like Roopa-Mancha and its Editor both. পথ চলতে ভুল যে দু'একবার না হয়েছে তা নয়—কিন্তু সে ভুল রূপ-মঞ্চ অজান্তে করেছে এবং সময়মত তা শুধরে নিতেও সে ত্রুটি করেনি।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দু'টো। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ও চিত্রশিল্পী কখন সরে পড়েছেন-বুঝতে পারিনি। ঘরে তখন মাত্র আমরা চার পাঁচটী প্রাণী। শিল্পী সুশীল বন্দ্যো খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, নইলে সারারাত এভাবে ছবিবাবুকে নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম। নাট্যাচার্য শিশির কুমারের কাছে যারা যেয়ে হাজির হয়েছেন, তাঁর অনর্গল বক্তৃতার মাঝ থেকে তাঁরা সহজে উঠে আসতে পারেননি। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিরাট প্রতিভার মাঝে ডুবে থাকতে চেয়েছেন। নাট্য-গুরুর সংগে ছবিবাবুর তুলনা প্রসংগে আমি কিছু বলছিনা—সে ধৃষ্টতা ছবিবাবু নিজেও ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আর এমন কোন অভিনেতার সংস্পর্শে আসতে পারেনি—যিনি বা যাঁরা এমনি উন্মাদনার ভিতর আমাদের আটকে রাখতে পেরেছেন। আমরা উঠে পড়লাম। ছবিবাবু আমাদের পৌঁছে দিয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলেন। অভিনেতা ছবিবিশ্বাসের পরিচয় আমার মত আপনারা সকলেই পেয়েছেন, তাই সেসম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। সামান্য কয়েকঘণ্টায় সহজ সরল মানুষটীর হৃদয়ের যে পরশ পেলাম—তা ভাষায় রূপ দেওয়া যায়না—হৃদয় নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন, একমাত্র তাঁরাই তা অনুভব করতে পারবেন। শুধু একটী কথায় বলতে পারি, ছবি—নিপুণ শিল্পীর আঁকা ছবির মতই মুগ্ধ করেছে।

— শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস —

নাট্যগুরুর পরবর্তী দলের মঞ্চ ও চিত্র শিল্পীদের ভিতর পুরোভাগে দাঁড়াবার—যাঁর যোগ্যতাকে অস্বীকার করবো না।

মঞ্চ-সম্রাজ্ঞী সরযূবালা

মঞ্চ-সম্রাজ্ঞী সরযূবালা

পাদপ্রদীপের আলোকমালার সামনে সরযূবালাকে আপনারা দেখেছেন, রূপালী পর্দায়ও কয়েকবার তাঁর সংগে আপনাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছে। সরযূর অভিনয় প্রতিভায় আপনারা মুগ্ধ না হ'য়ে পারেন নি। আধুনিক কালের মঞ্চসম্রাজ্ঞী বলতে তাঁর নামই আপনাদের মনে সর্বাগ্রে ভেসে উঠবে। কিন্তু সরযূর যে রূপ আপনাদের অনেকের কাছে অপরিজ্ঞাত, যে-রূপ অভিনেত্রী-সরযূবালার চেয়েও গরিয়সী—সেই মহিমময়ী রূপের সংগে শ্রীপার্থিব আজ আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।

কৃষ্ণভামিনী — তারাসুন্দরী—কুসুমকুমারী—বাংলা নাট্যমঞ্চে সে যুগে যে সব প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীরা তাঁদের অভিনয় প্রতিভায় পাদপ্রদীপের আলোকমালা প্রজ্বোল রেখেছিলেন, আজকের নাট্যামোদীদের অনেকের বিস্মৃতির মাঝে তাঁরা স্থান দখল করেছেন। তাঁদের অভিনয় প্রতিভা ক্ষণিক-স্মৃতি রেখার মত আজও যাঁদের মনে এঁকে রয়েছে, অতীতের পাতা যখন তাঁরা উলটিয়ে যান, তখনও সে প্রতিভার ঔজ্বল্য তাঁদের চোখ ঝলসে দেয়। কিন্তু যাঁদের এই বিগতদিনের প্রতিভার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয় নি—তাঁদের অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কী উপায় আছে? এমন কোন্ নিদর্শন আছে যা নাড়াচাড়া করলে সে প্রতিভার আমরা আভাষ পেতে পারি—তাঁদের ব্যাপ্তি সুস্পষ্ট রূপ ধরে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে? আছে কী এমন নিদর্শন? নেই বল্লেই চলে। তাই থাক। অতীতের পাতায় যাঁরা বিশ্রাম করেছেন—কাহিনীর মত যাঁদের প্রতিভার কথা আমাদের চোখে তন্ময়তার সৃষ্টি করে, তাঁদের সেখানেই আবদ্ধ করে রাখি। বর্তমানের গণ্ডির মাঝে টেনে এনে অস্পষ্ট ব্যর্থ রূপ দিয়ে তাঁদের ছোট করতে চাই না। তাঁদের বিয়োগ ব্যথায় হা-হুতাশ করে লাভ নেই। করা উচিতও নয়। আমাদের প্রয়োজন—আমাদের কর্তব্য বর্তমানকে নিয়ে। বর্তমান যুগের মানুষ আমরা। এই বর্তমান আগামীকাল অতীত হয়ে দেখা দেবে। তাই আজকে যদি বর্তমানের কথা বর্তমানের খাতায় আমরা লিপিবদ্ধ করে না যাই, ভবিষ্যৎ সমাজের কাছে আমরা মস্তবড় অপরাধী হয়ে থাকবো। আজকের কথা যদি আজকে না বলে যাই—ভবিষ্যত সমাজ আমাদের মতই অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াবে। তাই আজ এমন একজন অভিনেত্রীর সংগে আপনাদের অন্তরংগতা স্থাপন করে—সে অন্তরংগতার কথা লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই, বর্তমান বাংলার নাট্য-জগতে যাঁর অভিনয়-প্রতিভা সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনাদের সকলের স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলার নাট্য-মঞ্চে যার সমকক্ষ অভিনেত্রী আর দ্বিতীয়জন নেই বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। আমি বলছি আধুনিক বাংলার মঞ্চসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সরযূবালার কথা। বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সরযূবালা আপনাদের অভিনন্দনের ডালি কুড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁর অভিনয়ে আপনারা কখনও হেসেছেন, কেঁদেছেন, অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মঞ্চ মায়ার স্বপ্ন-জালের ভিতর দিয়ে তাঁর

অভিনীত প্রত্যেকটী চরিত্রই বাস্তবের রূপ ধরে আপনাদের কাছে ধরা দিয়েছে। নাট্যকারের মানসীপ্রতিমা মানুষের রূপ নিয়ে আপনাদের সাথে অন্তরংগতা জমিয়ে তুলেছে। পারবেন কী একথা অস্বীকার করতে? নিশ্চয়ই নয়। অন্ততঃ যাঁরা একাধিকবার সরযূবালার অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা কোন মতেই অস্বীকার করতে পারবেন না।

১৯১৪খৃষ্টাব্দ—কী তার কাছাকাছি একটা বছর—দক্ষিণেশ্বরে এক দরিদ্র পরিবারে সরযূবালা জন্মগ্রহণ করেন। ছোট-বেলায়ই সরযূর অপূর্ব কণ্ঠ মাধুর্য অনেককেই মুগ্ধ করে। শুনে শুনে গান শেখার চাতুর্য অনেককেই বিস্মিত করে তোলে। উত্তরকালে এই বালিকা যে উন্নতিলাভ করবে সে আশাও অনেকে তখন করেছিলেন। লেখাপড়া শিখবার আগ্রহও ছিল সরযূর প্রবল। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক কৃচ্ছতা সে আগ্রহকে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে দেয় না। শুধু সরযূরই নয়, আমাদের কতজনের কত আগ্রহ ও সদিচ্ছা যে এমনি ভাবে দারিদ্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত—আমাদের এমনি কতজনের ব্যাকুল হৃদয়ের হাহাকার—আমার মত প্রতিদিন আপনাদের কানে যেয়েও যে না পৌঁছোয় তা নয়। তাই সে কথা থাক। তবু বাঙালী ঘরের মেয়েরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ঘরে বসে যতখানি লেখাপড়া শিখতে পারেন, সরযূ তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি। দু'পাতা ইংরেজী গড় গড় করে না পড়তে পারুন, কী হ'য়েছে? তাঁর শিক্ষা যে ব্যর্থ হয়নি, যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই সেকথা স্বীকার করবেন। বাঙালী মেয়ের স্বভাবজাত গুণাবলী পূর্ণ-মাত্রায় সরযূর মাঝে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। একী কম গৌরবের!

গলাটি ছিল মিষ্টি। অনুকরণপ্রিয়তাও ছিল অসাধারণ। নয় বৎসর বয়ক্রমকালে সরযূ 'এমিনেণ্ট-থিয়েটার' নামে এক সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের এক অভিনয়ে ভিক্ষুক বালকরূ[illegible]ট্যোৎসাহীদের অভিবাদন জানায়। মাত্র একটী গান ছিল এই ভিক্ষুক বালকের। শুধু গানটীই যে উপস্থিত সুধীজনদের মুগ্ধ করেছিল তা নয়—বালিকা সরযূ গানের মর্মকথাগুলি তাঁর অভিব্যক্তিতে এমনি ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল যে, উপস্থিত নাট্যামোদীরা বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে পড়েন এবং তাঁদের একজনের কাছ থেকে সরযূ পুরস্কার স্বরূপ একটী পদক লাভ করে। এরপর সাজাহানে সিপার—কালপরিণয়ে মিনু—এমনি আরো অনেক ছোট ছোট ভূমিকাভিনয় করে ছোট বয়সেই সরযূ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভিনয় সম্পর্কে তখন অবধি নিজের কোন জ্ঞান না থাকলেও, সরযূর মনে হ'তো, তাঁর ভিতর এমন একটা অদৃশ্যশক্তি লুকিয়ে আছে—যা অভিনয়ের সময় তাঁকে সাহায্য করে। এই শক্তির আভাষ বালিকা বয়স থেকেই সরযূ পেয়েছিল। সুপ্ত প্রতিভার ঘুম ভাঙাতে বেশী বিলম্ব হল না—আত্মোপলব্ধির দ্বারা সরযূ সে প্রতিভার ঘুম ভাঙিয়ে তোলে—নিজের অভিনয় ও সংগীত শত শত অজানা লোককে আনন্দ দিচ্ছে, এই অনুভূতিও সরযূকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। উপযুক্ত শিক্ষালাভের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হ'লেও অভিনয়ের বিষয়বস্তু হৃদয়ংগম করতে সরযূর বেগ পেতে হয়নি। অভিনয়ের কোন অংশের কী বক্তব্য—এই বক্তব্যের ভিতর দিয়ে দেশ ও সমাজের যে প্রভূত উন্নতি সাধন করা যেতে পারে—অভিনয়ের এই মূল ধর্মের স্বরূপ ছোট বয়সেও সরযূর কাছে অপ্রকাশিত রয়নি।

সরযূর তখন বারো তেরো বছর বয়স হবে—মনিমোহনবাবু বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কাছে নিয়ে তাঁকে হাজির করলেন। বাণীবিনোদের দূরদৃষ্টি সরযূকে আকৃষ্ট করলো। বাণীবিনোদ নিজের ভ্রাম্যমান নাট্যসম্প্রদায়ে সরযূকে গ্রহণ করলেন। মফঃস্বলে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করে সরযূ উক্ত সম্প্রদায়ের সংগে কলকাতায় ফিরে এলো। অরোরা ফিল্ম করপোরেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ অনাদি বসু মহাশয় তখন কিছু কালের জন্য মনমোহন থিয়েটারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। সরযূ মনমোহন থিয়েটারে যোগদান করে। এবং একরাত্রের জন্য 'মীরাবাঈ' নাটকে কৃষ্ণের একটী ছোট ভূমিকায় সর্বপ্রথম স্থায়ী পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে নাট্যামোদীদের অভিবাদন জানায়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সরযূবালা সর্বপ্রথম একটী দায়িত্বপূর্ণ চরিত্রে আত্ম-প্রকাশ করে 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায়। এই
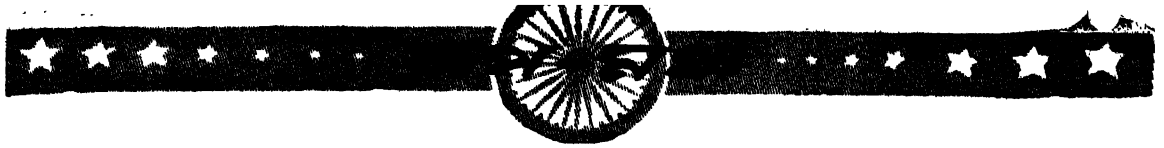
অভিনয়ের অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন—৺দানীবাবু—নগেন্দ্র, নির্মলেন্দু-গিরিশ, তিনকড়ি চক্রবর্তী—দেবেন দত্ত, ৺তারাসুন্দরী—সূর্যমুখী, ৺কুসুমকুমারী—কমলমণি, ৺সুবাসিনী—হীরা।

এই সময় ভারি একটা মজার ব্যাপার হ'য়েছিল। এইসব বড় বড় শিল্পীদের সংগে অভিনয় করতে যেয়ে সরযূ একটু ঘাবড়ে যায়। বিশেষ করে হীরারূপী সুবাসিনী যখন কুন্দরূপী সরযূকে বকা সুরু করেন—তখন সত্য সত্যই সরযূ ভয়বিহ্বলা হ'য়ে পড়ে। সরযূর মনের এই স্বাভাবিক ভয়বিহ্বলতা তাকে কুন্দ চরিত্র রূপদানে যথেষ্ট সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী কুন্দকে সরযূ এমনি নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলে যে, স্বয়ং দানীবাবুও সরযূর উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেন, "এতদিন বাদে কুন্দ যথাযথ রূপ পেল।" এবং সরযূর ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী জীবনের শুভ কামনা করে তিনি বলেছিলেন, "আমি আশা করি, উত্তর কালে তুমি একজন খ্যাতিসম্পন্না শিল্পীর গৌরব লাভ করবে।" প্রতিভার কাছে প্রতিভা লুক্কায়িত থাকে না। দানীবাবুর সেই ভবিষ্বাণী যে ব্যর্থ হয়নি---সরযূর আজকের অভিনয় দেখে প্রত্যেক নাট্যানুরাগীরাই যে সেকথা স্বীকার করবেন —তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

এখানে পর পর কয়েকখানা পুরোন নাটকে সরযূ অভিনয় করে। তার ভিতর দক্ষযজ্ঞে—সতী, সাজাহানে—জাহানারা, চন্দ্রশেখরে—শৈবলিনী, পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসে—দ্রৌপদী, গৃহলক্ষ্মীতে—ফুলি, শাস্তি ও শাস্তিতে—হরমণি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নতুন নাটকের ভিতর পথের শেষে—পারুল, রক্ত কমল—মমতা, জাহাঙ্গীর—মনিজা, মহুয়া—মহুয়া, গৈরিকপতাকা—শ্যামলী, কারাগার—কঙ্কা প্রভৃতির নাম করতে হয়। পর্দার যুগ সুরু হয়েছে। তার হাতছানি থেকে সরযূ নিজেকে দূরে রাখতে পারলো না—যখন সে মহুয়া নাটকে অভিনয় করে, তার আগেই খণ্ড চিত্রে সূর্যমুখীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। কৃষ্ণকান্তের উইলএর কয়েক দৃশ্যও পর্দায় রূপায়িত করা হয়, সরযূ রোহিনীর ভূমিকাভিনয় করে। এবং এই দৃশ্যাভিনয়ে গোবিন্দলাল ও নিশির চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রাম ৺দুর্গাদাস ও ইন্দুমুখোপাধ্যায়। পূর্ণাংগ চিত্রে সরযূ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ঋষির প্রেম চিত্রে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় সরযূকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রতি কোনদিই সরযূর সেরূপ আগ্রহ ছিলনা। তারপর মঞ্চেরমায়া পরিত্যাগ করে চলচ্চিত্রে যোগদানে সরযূ ছিলেন ঘোর বিরোধী। মঞ্চের সংগে তাঁর যে আত্মীয়তা ইতিমধ্যেই জন্মে উঠেছিল, তাকে কোনমতেই তিনি অস্বীকার করতে চাননি। তাছাড়া নিজের বেহারা যে চলচ্চিত্রের উপযোগী নয়, নিজের এই দুর্বলতা সম্পর্কে প্রথম থেকেই সরযূ সচেতন ছিলেন। অনেক দিন বাদে 'পায়ের-ধূলা' চিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু পায়ের ধূলার শোচনীয় চিত্র গ্রহণ সরযূকে আরো হতাশ করে তোলে। নিজে একরকম প্রতিজ্ঞা করেই বসলেন, না আর কখনও চিত্রে অভিনয় করবেন না। শিশির কুমার ভাদুড়ী আমেরিকা থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করে রংমহলে বিষ্ণুপ্রিয়া নাটক মঞ্চস্থ করেন, সরযূবালা বিষ্ণুপ্রিয়ার নারায়ণীর ভূমিকাভিনয় করেন। শিশির কুমারের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য এই প্রথম তিনি লাভ করেন।

এর পরে নাট্য-নিকেতনে 'সাজাহান' নাটকের মিলিত অভিনয়ে শিশির কুমারের সংগে সরযূবালা অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে সাজাহানের ভূমিকায় শিশির কুমার, ঔরংজেব দানী বাবু ও জাহানারার ভূমিকায় সরযূবালা অংশ গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ায় সরযূর নারায়ণী নাট্যামোদী ও শিল্পী সমাজে যথেষ্ট প্রশংসা পায়। স্বয়ং নাট্যগুরুও সরযূবালার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রঙমহল পরিত্যাগ করে সরযূবালা নাট্যনিকেতনে যোগদান করেন। এবং মা নাটকে অজিতার ভূমিকায় নাট্যামোদীদের অভিবাদন জানান। এখানে সরযূবালা খনা অভিনয়ের সময় অপরেশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। এবং এখানকার উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়ের ভিতর চক্রব্যূহ—উত্তরা, স্বর্ণলঙ্কা—সরমা, বভ্রুবাহন—বন্যা, সিরাজদ্দৌল্লা—লুৎফা প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। উপেন্দ্র মিত্র মহাশয় মিনার্ভার যখন কতৃত্ব ভার গ্রহণ করেছেন, সরযূ তখন মিনার্ভায় যোগদান
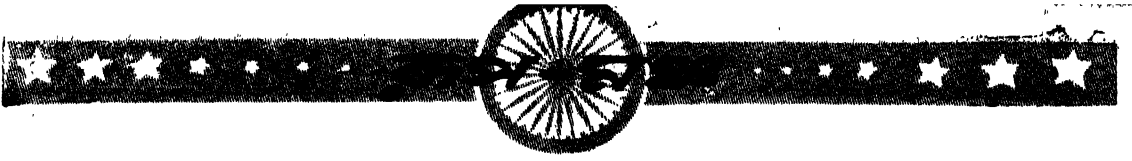
করে বন্দিনী, অর্জুন বিজয় প্রভৃতি নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। এর পর স্টারে সতীতুলসীতে—তুলসী, সোনার বাংলায়—কুমকুম প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেন। নাট্যভারতীতে সরযূর দেবদাসে—পার্বতী ও ধাত্রীপান্নায় —পান্না নূতন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। বর্তমানে মিনার্ভার সংগে শ্রীমতী সরযূ জড়িত। এখানে ধাত্রীপান্নায়—পান্না, দুই পুরুষে—কল্যাণী (এবং কখন কখন বিমলা) সীতারামে—শ্রী, কাশীনাথে—কমলা, বাষ্টবিপ্লবে—রৌশেনারা, মিশরকুমারীতে—নাহরিণ, এবং আরো বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রকে রূপায়িত করে তোলেন। বর্তমানে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের সংগেই সরযূবালা চুক্তিবদ্ধা। পায়ের ধূলার পরে চলচ্চিত্রে আর অভিনয় করবেন না বলে সরযূ একরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন। কিন্তু ষ্টারে অভিনয়কালে খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া শ্রীমতী নিভাননীর মারফৎ সরযূকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্য অনুরোধ জানান। সরযূ প্রথমে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু নিভাননী পর পর অনুরোধ করাতে এবং বড়ুয়ার মত খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক ও চিত্রশিল্পীর হাতে পর্দায় সরযূকে বিকৃত ভাবে দেখা যাবেনা বলে আশ্বাস দেওয়াতেই, সরযূবালা বড়ুয়ার 'শাপমুক্তি'তে অভিনয় করতে স্বীকৃতা হন। এর পর বড়ুয়ার 'মায়েরপ্রাণ'-এ অভিনয় করেন। শৈলজানন্দের শ্রীদুর্গা, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরভৃতিকাতে সরযূ দর্শকসাধারকে অভিবাদন জানান। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমাপ্তপ্রাপ্ত চিত্র 'শেষ নিবেদনে'ও সরযূবালা অভিনয় করেছেন। বর্তমানে 'জীবন ও যুদ্ধ' ও 'বিপ্লবী'তে অভিনয় করছেন।

মঞ্চ ও চিত্রাভিনয়ের তুলনামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করলে সরযূবালা উত্তর দেন, "দুইয়েরই সুবিধা অসুবিধা আছে। সূক্ষ্ম অভিনয়ে চলচ্চিত্রের জুড়ি নেই—ভ্রূর প্রতিটি কুঞ্চন, চোখ ও মুখের খেলা যেভাবে খেলা যাবে চিত্রে, তাই ফুটে উঠবে। কিন্তু মঞ্চের বেলায় তা সম্ভব নয়। সেখানে স্থূলতাকেই ফুটিয়ে তোলা চলে। এমন কি সামান্য ফিস ফিসেনিও মাইক গ্রহণ করে দর্শকদের কানে কানে বলে দিতে পারবে কিন্তু মঞ্চে তা সম্ভব নয়। সেখানে গোপন কথাটীও এমনি চীৎকার করে বলতে হয়, যাতে পেছনকার শ্রোতার কানে যেয়েও পৌঁছোয়। তবু মঞ্চকে আমি ভালবাসি—মঞ্চের সংগে আমার রয়েছে প্রাণের যোগ। অগণিত শ্রোতা উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় থাকেন। এখানে সরাসরি শ্রোতা ও শিল্পীর মাঝে রসবিনিময় হয়। এথেকেই যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে—পর্দা তা গড়ে তুলতে মোটেই সক্ষম হবেনা। দিনের পর দিন এখানে চরিত্রটী ভাববার আমি অবকাশ পাই—চরিত্রটী জন্ম থেকে পরিণতি অবধি আমাদের কাছে স্বচ্ছভাবে ধরা দেয়। তা থেকেই আমরা তাকে অভিনয়ে মূর্ত করে তুলতে পারি। কিন্তু পর্দায় তা সম্ভব নয়। অনেক সময় আমরা নিজেরাও জানিনা—জানতেও দেওয়া হয় না, কী চরিত্রে আমরা অভিনয় কচ্ছি—পরিচালকেরা যেভাবে যতটুকু বলেন, কলের পুতুলের মত আমাদের তাই করে যেতে হয়। চিত্রে আমরা ক্রীড়নক—মঞ্চে আমরা চরিত্র-স্রষ্টা। আমাদের অভিনয় দিয়ে চরিত্রকে মূর্ত করে তুলতে পারি।"

যতগুলি নাটকে শ্রীমতী সরযূ অভিনয় করেছেন, তার কোন কোনটি তাঁকে মুগ্ধ করেছে, একথা জিজ্ঞাসা করলে সরযূ বলেন, "অনেক চরিত্রই আমার ভাল লেগেছে তবে যদি বিশেষ করে কোনটার নামোল্লেখ করতে যাই, তাহলে দেবদাসের 'পার্বতীর' কথাই আমি সর্বাগ্রে বলবো। তারপর ধাত্রীপান্না।" পার্বতীর কথা বলতে যেয়ে সরযূ বলেন, এই চরিত্রটীর বয়সের বিভিন্নতায় বিভিন্ন পরিবর্তন আমায় মুগ্ধ করেছিল। এই একটী চরিত্রে নারী চরিত্রের যে বিভিন্ন রূপ শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন—আমি তাতেই চরিত্রটীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। পার্বতীর কাছে আমি নিজেকে যতটা সপে দিয়েছিলাম, আর কোন চরিত্রাভিনয়ে অতখানি নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। আমার বিছানার কাছে মূলউপন্যাস ও নাট্যের চরিত্রটী সব সময়ই থাকতো। পার্বতীকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম—এমন কি অভিনয়ের পরও প্রায় একমাস অবধি পার্বতী এমনি ভাবে আমায় পেয়ে বসেছিল।"

খ্যাতনামা শিল্পী থেকে সামান্য একজন কর্মীর কাছ থেকে
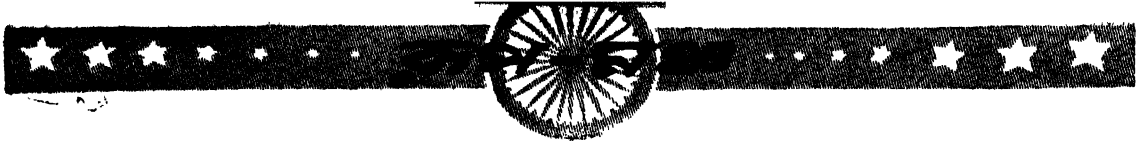
সরযূ যে স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছেন, তাকে নিজের পরম সৌভাগ্য বলেই তিনি মনে করেন। দানীবাবুর অফুরন্ত স্নেহ সরযূ পেয়েছিলেন—দানীবাবুর কাছ থেকে অভিনয় শিক্ষা করবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। নাট্যগুরু শিশিরকুমারের কাছ থেকে শিক্ষা করবার সেরকম সুযোগ না হলেও, ভারতনারী নাট্যাভিনয় ও অন্যান্য সময়ে শিশির কুমারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আশবার যতটুকু সুযোগ সরযূর হয়েছিল—সেকথাও পরমশ্রদ্ধার সংগেই তিনি উল্লেখ করেন। এবং নাট্যগুরুর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধার আভাষ নাট্যগুরুর প্রসংগ উত্থাপনেই আমি জানতে পারি। অসীম পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় যে লোকটী সরযূকে অভিনয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তিনি বাংলা নাট্যমঞ্চের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী। বাণীবিনোদের শিক্ষকতার কথা বলতে যেয়ে সরযূ বলেন, "তাঁর শিক্ষার সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে—তিনি প্রথম আমাকে চরিত্রটী ভাববার অবকাশ দিতেন—চরিত্রটী বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দিয়েছেন—কোন চরিত্রকে কোন সময় কি ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে নিজে তার নির্দেশ না দিয়ে, আমার ভিতর দিয়েই তার উত্তর পেতে চেয়েছেন। এমনিভাবে বাণীবিনোদ আমার চরিত্রোপলব্ধি ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করেছেন। আমার অভিনেত্রী জীবনে তাঁর এই দান কোন দিন ভুলবো না।" নূতন শিল্পীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য যখন সরযূকে অনুরোধ করি—তখন অতি বিনয়ের সংগে বলেন, "দেখুন এব্যাপারে আমায় মাপ করবেন। অতখানি ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে নিজে যে পথ ধরে আপনাদের স্নেহাশীষলাভে সমর্থ হয়েছি, শুধু তাই বলতে পারি। এবং এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে চরিত্রোপলব্ধি। চরিত্রটীকে প্রথম ভাবতে হবে—তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেগুলি যথাযথ রূপায়িত করে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের দেশে নূতনদের সামনে নানান বাধাবিপত্তি রয়েছে। তাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। তাই এ বিষয়ে নূতনরা নিজেরাই যদি যথেষ্ট আগ্রহশীল ও অধ্যবসায়ী না হন, তবে কৃতকার্য হ'তে পারবেন না। যতদিন কোন নাট্যবিদ্যালয় গড়ে না ওঠে—নিজেদেরই অবহিত হয়ে উঠতে হবে। আপনারা ত নাট্যবিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন—এই প্রশংসনীয় উদ্যম একদিন জয়যুক্ত হবেই এবং নূতনদের পথ যে সুগম করে দেবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

আমার পরবর্তী প্রশ্ন হলো, আপনি যে একজন খ্যাতি-সম্পন্না অভিনেত্রী-এতে কি আপনি গর্বিত নন? সরযূবালা আমার প্রশ্ন শেষ হবার সংগে সংগে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই গর্বিত—আমি সবচেয়ে গর্বিত—আমি বাংলার মেয়ে। এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, বাঙ্গালী মেয়ে বলে পরিচয় দিতে আমি সবচেয়ে গর্বিত।" আশাতীত উৎফুল্লে আমি সরযূর দিকে চেয়ে রইলাম। বাংলার চিত্র ও নাট্যজগতের একজন নগণ্য জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকের পক্ষে—একজন অভিনেত্রীর কাছ থেকে এই উত্তর পাওয়া যে, কতখানি আনন্দের হতে পারে আশা করি আমার মত যাঁরা চিত্র ও নাটকের ভিতর দিয়ে দেশের কল্যাণের বাণীপ্রচারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাঁরাই তা স্বীকার করবেন। বৈদেশিক সাংবাদিক হলে নাটকীয়ভাবে মাথার টুপিটা খুলে নীচে নামিয়ে তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তির পরিচয় দিতেন। কিন্তু আমি বাঙ্গালী সাংবাদিক যে বাঙ্গালী অন্তর মাধুর্যে যে কোন দেশের অধিবাসী থেকে সম্পদশালী। তাই—অন্তরে অন্তরে এই আনন্দকে অনুভব করলাম। নীরব মুহূর্ত দিয়ে বরণ করে নিলাম তাকে। আমার বিহ্বলতা সরযূর দৃষ্টি এড়িয়ে গেলনা। কিছুক্ষণ তিনিও চুপ করে থেকে আবার বল্লেন, "প্রথম আমি বাঙ্গালী মেয়ে—তারপর বাঙ্গালী অভিনেত্রী। আমি আমার অভিনয়ের ভিতর দিয়েই দেশসেবার গৌরব অনুভব করি। রাখুক, যাঁরা আমাদের অপাংক্তেয় করে রাখতে চান। তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন নালিশ নেই—আমাদের নিষ্ঠায় যদি কোন ফাঁক না থাকে—দেশ একদিন আমাদের মেনে নেবেই। মুষ্টিমেয় জনকয়েকের গোঁড়ামীর জন্য দেশের ওপর আমরা অভিমান করতে পারি না।"

সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে শিল্পীদের দূরে
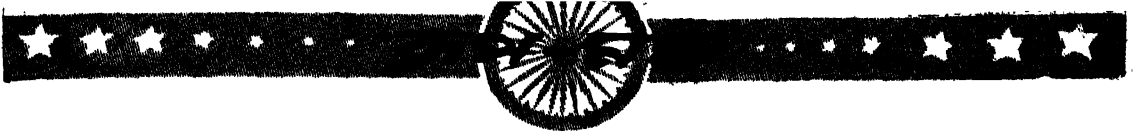
থাকতেই শ্রীমতী সরযূ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, "আমরা শিল্পী—শিল্পের পূজারী। এছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। আমাদের চোখে হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টানের কোন ভেদাভেদ নেই।

মহাত্মাগান্ধীর অহিংসা নীতিতে সরযূর অপরিসীম বিশ্বাস। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা প্রসংগে তিনি বলেন, যেদিন শুনলাম সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিবারণের জন্য মহাত্মাগান্ধী অনশনব্রত অবলম্বন করেছেন—আমাদের এই লজ্জা থেকে আমি নিজেকেও মুক্ত করতে পারলাম না। সারারাত সেদিন ঘুম হলোনা, আমি ছট ফট করতে লাগলাম। ইচ্ছা হ'লো, বেরিয়ে যাই আমরা সব মেয়েরা। দলে দলে বেরিয়ে যেয়ে প্রেম ও প্রীতির বাণী দোরে দোরে বয়ে নিয়ে যাই।" শ্রীমতী সরযূ এই কথাগুলি গভীর অনুভূতি থেকে বলছিলেন, এবং তা অতিসহজেই আমায় অভিভূত করে ফেলে। গান্ধীজীর প্রতি অটল বিশ্বস বলে আমার পাঠকবর্গ কেউ যেন মনে না করেন, দেশগৌরবের প্রতি সরযূর কম শ্রদ্ধা রয়েছে। সামান্য একটি কথায়ই সুভাষচন্দ্রের প্রতি সরযূর আনুগত্যের পরিচয় পাই। তিনি বলেন, "বাঙ্গালী বোন যে শুভকামনা নিয়ে ভাইয়ের যাত্রা পথে চেয়ে থাকে- আমিও তেমনি ভাবে আমার আন্তরিকতা দিয়ে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করি।" শুধু—সুভাষচন্দ্রই নন-দেশের মুক্তিযুদ্ধে যে বীর সৈনিকরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি সরযূর অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা কিছু করতে পারিনা কিন্তুঅকালে যাঁরা দেশের জন্যে প্রাণবিসর্জন দিয়ে থাকেন, ভাবি, আমাদের জীবনের বিনিময়ে যদি এঁদের মহামূল্য জীবন রক্ষিত হ'তো!"

বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব কোনদিন আমি ভুলব না। কিন্তু দেশের জন্য এতখানি আকুলতা আমাদের অনেক শিল্পীর মাঝেই দেখতে পাইনি। তাই, শ্রীমতী সরযূর পরিচয় যে বিশেষ ছাপ নিয়ে আমার অন্তরে জাগরুক থাকবে—আমার এই সহজ সরল স্বীকৃতিতে আশাকরি আমার অন্যান্য শিল্পী বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হবেন না। তাঁদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কম নেই।

দৈনিক খবরের কগজ না পড়লে সরযূর চলেনা। প্রতিটি খবরা খবর সম্পর্কে তিনি নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখতে চান। অবসর সময় কাটান বাংলা বই পড়ে। সরযূ ইংরেজী জানেন না, সেজন্য তাঁর ক্ষোভ যথেষ্ট। কিন্তু যে কোন বাংলা বই তাঁর পড়া চাই। কবিগুরুর কথা বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের মত প্রিয় সাহিত্যিক সরযূর আর কেউ নন। নাটকের ভিতর শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দেশাত্মবোধক নাটকগুলি সরযূর প্রিয়—মন্মথরায়ের 'সাবিত্রী' নাটকটাও তাঁর ভাল লেগেছিল।

সুযোগ পেলেই ছবি দেখা সরযূর চাই। বিশেষ করে কোন ইংরেজী ছবিই তাঁর অদেখা থাকেনা। কোন অভিনেত্রী কোন চরিত্রটীকে কি ভাবে ফুটিয়ে তুললেন এবং তা থেকে তিনি কতটা গ্রহণ করতে পারবেন, ছবি দেখবার মূলে এই উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। ইংরেজী না জানলেও, ওদের কথা না বুঝতে পারলেও—মর্মোদ্ধারে সরযূব বেগ পেতে হয়না।

সমসাময়িক বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ভিতর ছবি জহর, কমল ও মলিনাকে সরযূর ভাল লাগে। মঞ্চাভিনয়ের সময় নিজের কেশবিন্যাস নিজে করতেই সরযূ ভালবাসেন এবং নিজেই সাধারণতঃ করে থাকেন।

সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মত রান্নাবারা ও ঘরকন্নার সরযূর উৎসাহ যথেষ্ট। বাঙ্গালী মায়ের মতই মাতৃত্বের গর্বে সরযূ গরিয়সী। সরযূবালার চারিটি সন্তানের ভিতর বড় মেয়ে ও ছেলের বয়স যথাক্রমে ষোল ও চোদ্দ। তারা সবাই পড়াশুনা করে। নিজে ছোটবেলা পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলে সে বঞ্চনার কথা সরযূ ভুলতে চান।

প্রতিমাসে রূপমঞ্চ সরযূর পড়া চাই। রূপমঞ্চের নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভংগীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, "এমনি কাগজই আজ দরকার, যাঁরা একদিকে আমাদের দুর্বলতা শুধরে দিতে সজোরে চাবুক মারবেন—অন্যদিকে আমাদের আন্তরিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। রূপমঞ্চের সমস্ত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক, তাই আমি সর্বান্তকরণে কামনা করি।"
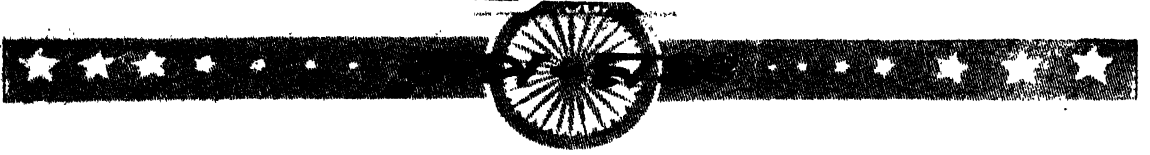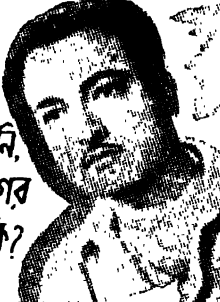
আমাদের আলোচনা আরম্ভ হয় বেলা আড়াইটায়। আর শেষ হতে হতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায়। এই কয়েক ঘণ্টার ভিতর সরযূর হৃদয়ের যে অজ্ঞাত দিকটার পরিচয় পেলাম, তা তাঁর অভিনেত্রী জীবন থেকেও মহিমময়। অভিনয় সম্পর্কে যখন কথা উঠেছে—তখন সরযূর এক রূপ দেখেছি। কিন্তু তাঁর যে রূপটী আমায় মুগ্ধ করেছে যা এতদিন আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেটি হচ্ছে সত্যকারের বাঙ্গালী মেয়ের রূপ। আপনার আমার মা বোনের চেয়েও একটুকুও ম্লান হয়ে সে-রূপ আমর কাছে দেখা দেয়নি। আর পেলাম তাঁর অনুভূতিশীল মনের পরিচয়। সরযূর এই দিকটার প্রতি আমাদের অভিনেত্রীদের দৃষ্টিআকর্ষণ করে আমি অনুরোধ জানাতে চাই—এমনি ভাবে তাঁরা নিজেদের জানতে শিখুন, দেশ ও জাতিকে ভালবাসতে শিখুন। তাঁরা যেন ভুলে না যান, তাঁরা বাংলার মেয়ে—বাংলার সুখ দুঃখের সংগে তাঁরা জড়িত—তাঁরা তাঁদের শিল্প সাধনার ভিতর দিয়ে বাংলা ও বাঙ্গালীর সমস্ত কলঙ্ক ও দুর্বলতা শুধরে নিয়ে বাংলা ও বাঙ্গালীকে উজ্জল, পবিত্র ও মহিমময় করে গড়ে তুলবেন। অন্ধকারের মাঝে এতদিন যাঁরা নিমজ্জিত ছিল—তাঁদের ওপর অভিমান করে যেন ভুলে না যান—স্বাধীনতার সূর্য আজ চির ভাস্বর হয়ে দেখ দিয়েছে—বর্তমান ও ভবিষ্যতের মোহমুক্ত বাঙ্গালী যে তাঁদের আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধাভরে মেনে নেবেন—সেজন্ত কোন দ্বিধা যেন তাঁদের মনে না জাগে।

কমল মিত্র
ভিন্ন রূপ-সজ্জায়
প-মঞ্চ : শারদীয়া, '৫৪

শ্রীযুক্ত কমল মিত্র

রূপ-সজ্জার বাইরে রূপ-মঞ্চ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিশেষ ভংগীমায়। অভিনয়-প্রতিভায় অতি অল্প দিনের ভিতর বাঙ্গালী দর্শক সমাজের অন্তর জয় করেছেন।

উদীয়মান অভিনেতা কমল মিত্র

আধুনিক চিত্র ও নাট্য-জগতে যে কয়জন শিল্পী তাঁদের অভিনয় প্রতিভায় সাধারণের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়েছেন, কমল মিত্রের নাম তাঁদের সর্বাগ্রে বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। বহু বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে পথ করে নিলেও অতি অল্প দিনের ভিতর কমল মিত্রের মত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে অনেকেই পারেন নি। দীর্ঘাবয়ব -- বলিষ্ঠ দেহ - উদাত্ত কণ্ঠস্বর অভিনয় জগতে প্রবেশ পথে কমল মিত্রকে আরো সাহায্য করেছে। আত্মবিশ্বাস ও অভিনয়-নৈপুণ্যে যে শিল্পী দর্শক সাধারণের অন্তরে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁর অভিনেতা জীবনের বাইরে যে জীবন, তারই সংগে দর্শক সাধারণকে পরিচিত করে দিতে চেয়েছেন আপনাদের শ্রীপার্থিব।

১৫ই জুন, রবিবার ১৯৪৭। সকাল সাতটায় আমার দরজার সামনে একটা মটর অনবরত কিছুক্ষণ 'প-প' শব্দে শুধু সদ্য-জাগ্রত আমাকেই নয়—পাড়ার আরো অনেকেরই মন বিষিয়ে তুলেছে। বিত্তশালীরা গাড়ী হাকিয়ে ছুটবেন আর আমাদের হয় ধুলো নয় চাপা খেতে হবে তাঁদের গাড়ীর। সেত জানি। এই জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু এর দিন যে ফুরিয়ে এসেছে তাও কী তাঁরা বুঝতে পাচ্ছেন না! করপোরেশনকে - সরকারকে তাঁরা কর দেন বেশী—মেনে নিলাম। সেই জোরে রাস্তার পর আমাদের মত চুনোপুঁটিদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলুন - যত খুশী অত্যাচার করুন—যতদিন না আমরা এর প্রত্যোত্তর দিতে পারবো—নীরবে এমনিভাবে ধুলো আর চাপা খেয়েই যাবো। কিন্তু আমার ঘরের সামনে—যে ঘরের ভাড়া প্রতিমাসে অগ্রিম দি এবং বর্ধিত হারে—সেখানে কেউ শান্তি ভংগ করতে আসবেন, এই জবরদস্তি মেনে নেবো কেন? তারপর সারাদিন ত কাটতো তখন ছোরাছুরির ভয়ে। রাত্রেও ঘুমের ঘোরে তার প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই ছিল না। আগের দিন সহরের এক সীমান্তের পাশ ঘেসে ফিরছি (সীমান্ত বলতে এক একটী সম্প্রদায়ের বসতির শেষ সীমানা) -রাস্তার ধারে একটী ছয় সাত বছরের শিশুর রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। ঘাতকের নির্মম আঘাতে ওর সোনালী মুখখানা বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। ও কোন সম্প্রদায়ের কে জানে—যে মেরেছিল সেও জানতো না হয়ত। যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন—ওযে ভবিষ্যতের কত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল—ঘাতক নিশ্চয়ই তা জানতো না। জন্মের প্রথম দিনেই ওর পবিত্র হাসিতে একটী পরিবারের সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। মা-বাপের কত বেদনার ভার লাঘব করেইনা ও জন্মগ্রহণ করেছিল! ভবিষ্যতে ওর এই হাসি ছড়িয়ে পড়তো সমস্ত দেশে—ভবিষ্যৎ নাগরিকের অধিকারে ও শুধু ওর মা-বাপের—ওর পরিবারবর্গেরই নয়—কত শত পরিবারের ব্যথার ভারই না লাঘব করতো! কিন্তু ঘাতকের মনে সে কথা জাগেনি—জাগতে পারে না। জাগলে সে তার তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ছুড়ে ফেলে দিত। আদর করে ওকে বুকে টেনে নিত। শুভেচ্ছার চুম্বন দিয়ে ওর ভয় বিহ্বলতাকে দূর করে টুকটুকে গাল দু'টি রাঙ্গিয়ে দিত। আমি যখন ওর সামনে দিয়ে আসছিলাম—ওর মৃতদেহ আমায় আকর্ষণ করলো। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওর সোনালী মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছিল সত্য, কিন্তু তার পবিত্রতা নষ্ট হয়নি। ঠোটের কোনে তখনও যেন এক ঝলক হাসি খেলা কচ্ছিল। ওর মৃতদেহটা প্রাণবন্ত হ'যে বারবার আমায় বলতে চাইছিলো - "সভ্যতা—সভ্যতা বলে তোমরা চীৎকার করো—কিন্তু এই কী তোমাদের সভ্যতার নিদর্শন! কত নীচ—কত বীভৎস তোমাদের জগত—সাবধান হও। আমি আমার মৃত্যু দিযে তোমাদের অনুরোধ করে যাচ্ছি -- সাবধান হও! নইলে এই হাস্যোজ্জ্বলা ধরণী দানবের রাজ্যে পরিণত হবে।" আমি বিচলিত হ'য়ে পড়লাম! ওর প্রাণহীন দেহটার সামনে হাটু গেড়ে বসলাম। একটু আদর করে কোলে তুলে নিতে চাইলাম। পাশ থেকে একখানি শক্ত হাত আমায় হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল।
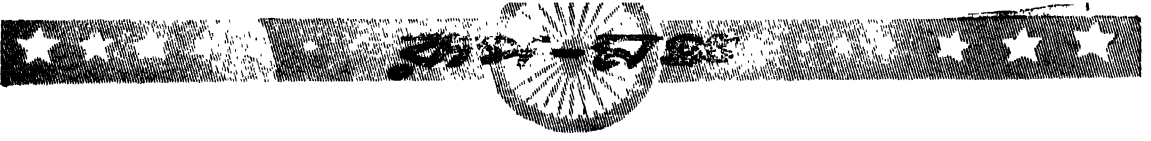
সংগে সংগে দু'তিনটী হুঁসিয়ারী কণ্ঠ বলে উঠলো, 'ও মশায় করেন কী? মাথা খারাপ নাকি। আসুন! ঐ যে পুলিশের গাড়ী আসছে। ধরে নিয়ে যাবে যে!' আমার চৈতন্য হ'লো। কথাটা মিথ্যা নয়। ওরা অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে না। বরং প্রশ্রয় দেয়। নিরপরাধীর পরই যে চলে ওদের জুলুম! বাড়ী ফিরে এলাম। সারাক্ষণ ঐ শিশুর রক্তাক্ত দেহ আমার মনে এঁকে রইল। ওযে আমারও পরমাত্মীয় ছিল, তাই বা ভুলে যাবো কেমন করে? ও যে আমার দেশের ভবিষ্যত সন্তানদেরই একজন—ওর মৃত্যুর ব্যথা আমার মনেও কী কম বেজেছে! রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখছি। দেখছি—চতুর্দিকে অকূল সমুদ্র! তার উত্তাল তরঙ্গমালা পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। আর তার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে আমার দেশ—আমার সোনার ভারত। আমাদের সভ্যতা—যে সভ্যতা যুগ যুগ ধরে সমস্ত পৃথিবীতে আলোক বিকীরণে সমস্ত অন্ধকার দূর করেছে। ঠিক মনে হ'লো যেন, সৃষ্টির আদিম যুগে ভগবান বিষ্ণু অশ্বত্থ পাতার ওপর অগাধ জলরাশির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছেন। হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী ভগবান বিষ্ণু মধু ও কৈটবের মেদ দিয়ে মেদিনী তৈরী করলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন মানুষ। পূর্বগগনে মেদিনীর তমসা নাশ করে আবির্ভূত হলেন তেজোময় সূর্যদেব। আমিও স্বপ্ন দেখছি, ঐ অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে মানব সভ্যতা সত্য ও সাম্যের কূলে ভিড়তে পেরেছে। মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। আরো কিছু দেখবার জন্য আগ্রহে রইলাম। আমার স্বপ্নের আগ্রহকে ভেংগে বেজে উঠলো আমার ঘরের সামনে অপেক্ষমান মটরের 'প-প' শব্দ। এতে মেজাজটা ঠিক থাকে কি করে বলুন ত? তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। খুলে-পড়া কাঁচাটাকে শক্ত করে এঁটেসেঁটে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। না, ঐ গাড়ীটাকেই চুরমার করে ফেলবো, নয়ত ওর ভেঁপুটা নিয়ে আসবো ছিনিয়ে।

কিন্তু এত তোড়জোড় করে বেরিয়ে আসা বিফলেই গেল। পাড়ার দু'টি ভায়াস্থানীয় ছেলে পরম উৎসাহে ছুটে এসে বল্লো, "শ্রী'দা, আসুন, আসুন। দেখবেন কার গাড়ী এসেছে! আপনাকে ডাকছে।" চোখ চলতে চলতে দরজায় যেয়ে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ, আমাকেই ডাকছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আজ চায়ের নিমন্ত্রণ কমল মিত্রের বাড়ী। গাড়ী থেকে নেমে এলেন আমাদের পরিচিত ভায়াস্থানীয় শ্রীমান কমল চট্টোপাধ্যায়। যাঁকে আপনারা 'শৃঙ্খল' চিত্রে দেখেছেন, 'শেষ নিবেদন' এবং আরো বহু চিত্রে দেখতে পাবেন। রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের আবিষ্কার। আমরা তাঁকে কমল চা' বলে ডাকি অর্থাৎ চাটুজ্জের অপভ্রংশ। চায়ের মত অনেক সময় তার 'ভেনটুলুকইজম' আমাদের ক্লান্তি দূর করে। কমলভায়া সেলাম ঠুকে হাজির। 'দাদা যেতে হবে।' মেজাজটা কখন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে বলতে পারি না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার পড়শী বটু বাবুকে খুঁজছি। বটুবাবু সাম্প্রদায়িক হাংগামার জন্য দিন কতক ট্যাকে চড়ে অফিসে যাতায়াত করতে করতে আমাদের মত পদ-যান যাত্রীদের একটু নেক নজরে দেখছেন আজকাল। তাই আমিই বা আজ তাঁকে ছাড়বো কেন? প্রৌঢ় বয়সে যুবতী স্ত্রী বিয়ে করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেচারীকে সিনেমার টিকিট কাটতে ছুটতে হয়, কমল মিত্র অপরিচিত নন তাঁর কাছে। কিন্তু বটু বাবুর সংগে সাক্ষাৎ হ'লো না। মনটা একটু দমে গেল। যাই হউক, তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জল দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবী এঁটেত যেয়ে গাড়ীতে বসলাম। গাড়ীতে উঠে এবাড়ীর ওবাড়ীর জানালাগুলির দিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। মিষ্টি মুখ করে যাত্রাটাকে শুভ করে নিতে চাই। যাত্রা শুভই হ'লো। গাড়ী স্টার্ট দিয়েছে। বটুবাবুর স্ত্রীও দেখলাম মুখ বাড়িয়েছেন, তাড়াতাড়ি পাড়ার ছেলেদের হাক দিয়ে বল্লাম, "ওহে যদি কেউ আসেন, বলো আমি কমল মিত্রের বাড়ীতে গেছি। আসতে দেরী হবে।" কারো অবশ্য আসবার কথা ছিল না। বটু বাবুর স্ত্রীর কানে কথা গুলি পৌছাবার উদ্দেশ্যেই ওকথা বল্লাম।

গাড়ী ছুটে চললো। সহজ পথে এই সময় কোন গাড়ীই ছুটতো না। সুযোগ পেয়ে চালককে আমার পরিচিত অলিগলির পরিচিত লোকজনের পাশ কাটিয়ে চালিয়ে নিয়ে চল্লাম। কলেজ ষ্ট্রীট—সেনট্রাল এ্যাভিনিউ—এসপ্লানেড পেরিয়ে চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলগিন রোড হয়ে রায় ষ্ট্রীটে

ঢুকলাম। ২৩।৭ নম্বর বাড়ীটার সামনে গাড়ী থেমে পড়লো। আমাদের নামতে হলো। হলুদ রং-এর তিনতলা বাড়ী। কমলচা' পথ প্রদর্শক। আমি তাঁকে অনুসরণ করে চলেছি। গৃহস্বামী আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। ভিতরে যেতেই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বল্লেন। ঘরটায় দেয়াল ঘেসে শোফা রয়েছে। একখানা মাত্র চেয়ার। ছাত্র জীবনে বহুদিন বই মাথায় দিয়ে—খবরের কাগজ বিছিয়ে কাটাতে হয়েছে, আজও নরম কিছুর স্পর্শে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। সোফা ছেড়ে চেয়ারেই বসলাম। কমল বাবু প্রথমেই রূপ-মঞ্চের নিরপেক্ষ মতবাদের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বল্লেন, "আপনাদের নিরপেক্ষ অভিমত আমায় মুগ্ধ করেছে। সামান্য ত্রুটিও যে আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না একথা আপনাদের পরম শত্রুরাও আশা করি অস্বীকার করবেন না। যদি কেউ অস্বীকার করতে চান, আমাকে আপনাদের পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড় করাতে পাবেন। আমাকে অনেকে বলেছিলেন, টাকা না দিলে কাগজওয়ালারা কোন প্রচার কায করেন না। এজন্য মনে মনে বেশ খানিকটা অভিমান পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার প্রতিভা থাকেত প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করবোই কিন্তু অর্থ ব্যয় করে নয়। অপরিচিত এবং নবাগত হয়েও যেটুকু প্রশংসা আমি পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে, আমার কৃতিত্বের মাপ-কাঠিতেই পেয়েছি। অপ্রশংসার সে বোঝা যখন আপনারা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তা আমার অকৃতিত্বের জন্যই। তাই, আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে অপরিসীম।" এই প্রসংগে 'পথের দাবী'র সমালোচনার কথা কমল বাবু উল্লেখ করেন। কমল বাবুকে ধন্যবাদ জানিযে উত্তর দিলাম, "আপনার এই উদার মনোভাবের জন্য সত্যই প্রীত হলাম। এবং আপনার অভিনন্দন পরম শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করলাম। প্রথম পরিচয়েই প্রশংসা এবং নিন্দা সহ্য করবার সে সবলতার পরিচয় পেলাম আপনার মাঝে, তাতে আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই বৃদ্ধি পেল। আপনার ভবিষ্যৎ অভিনেতা জীবন এমনি জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করুক—তাই কামনা করি।" আমার কথা শেষ হতে না হতেই প্লেটে প্লেটে অনেক বিষয় বস্তু এসে হাজির হ'লো। কমল বাবু এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "নিন—একটু—।"

আমি জের টেনে নিয়ে উত্তর দিলাম, "মিষ্টিমুখ করবো! কিন্তু এযে একটু নয় প্রচুর। সপ্তাহে এক রবিবার দুপুর বেলা ভাত খাই—আপনি দেখছি আজ তাও বন্ধ করবেন!" কমলবাবু বিনয়ের সংগে উত্তর দিলেন, "এ আর এমন কী?" এমন কী যে নয়- কমলবাবুও তা জানতেন। ভোজনে আপত্তি করাও উচিত নয়—তারপর যদি পরের ঘাড় ভেংগে তার আবির্ভাব হয়। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে চালিয়ে যেতে লাগলাম। প্রথমটায় 'না-না-না' করলেও বড় বেশী কিছু আর পড়ে রইল না। সবই যখন শেষ করে এনেছি, তখনই মনে হ'লো—তাইতো লোকটা মনে কী ভাবছে—। হাত গুটিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতেই কমলবাবু বলে উঠলেন, "এগুলি যে রয়ে গেল।" আমি উত্তর দিলাম, "আর পারিনা—গলায় গলায়"। হাতমুখের কাজে এতক্ষণ এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, খেয়ালই ছিল না কমলবাবু কিছুই খাননি। কেবল গল্প করছেন আর তদারক করছেন। এমন কী তাঁর জন্য এক কাপ চা অবধি এলো না। ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করলাম, "একী! আপনি যে কিছুই খেলেন না!" কমলবাবু মুচকী হেসে উত্তর দিলেন, "ধূমপান ছাড়া আর কোন পান দোষ নেই—চাও খাই না।"

আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। লোকটা চা'ও খায় না, বাঁচে কী করে! আমার আশ্চর্যভাব লক্ষ্য করে কমল বাবু বল্লেন, "সবই বলছি আপনাকে। এর পিছনে অনেক ইতিহাস আছে। "আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম, "তাহলে ঐ ইতিহাসটুকুই বা কেন—আপনার জীবনের সবটুকু ইতিহাসই বলুন—আমাদের কৌতূহলী পাঠকগোষ্ঠী তথা আপনার গুণমুগ্ধদের কাছে পৌঁছে দেবো।" কমলবাবু যেন গররাজী হ'লেন না মনে হ'লো। আমি আমার সংগিনীকেও প্রস্তুত করে নিলাম। যেখানেই যখন যাই—সংগিনী আমার সংগ ছাড়েন না। তার সংগে আমার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ওর কাছে চিত্র ও নাট্য জগতের না

পাওয়া যাবে এমন খবর নেই। কত কথাই না ওর বুকে এঁকে আছে। নাট্যগুরু ওকে দেখেছেন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের শুভেচ্ছা থেকে ও বঞ্চিত হয়নি। আমার সংগিনীকে হয়ত অনেকে হিংসা করছেন। আমার আর তার সম্পর্ককে একটু বিকৃত করে টিপ্পনি কাটতে আপনাদের জিব হয়ত লকলকিয়ে উঠছে। কিন্তু তাকে একটু সংযত করতেই অনুরোধ করবো। ভয় নেই, কোন চিত্র তারকাকে টেক্কা দিয়ে অথবা তিলোত্তমার রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আমার সংগিনী আমার মন হরণ করেনি। তবু ওকে ভালবাসি—নিবিড়ভাবে ভালবাসি। ওকে ছাড়া এক পাও কোথাও বাড়াতে পারি না। আমার সাংবাদিক জীবনের নিত্য সহচরী। আমার এই সংগিনী আপনাদের কাছে প্রাণহীন জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি পাই ওর প্রাণের স্পন্দন শুনতে। আপনাদের কাছে ও কয়েক দিস্তা মিলের কাগজ দিয়ে চামড়ায় বাঁধাই একখানা মোটা খাতা।

আমার এই সংগিনীটি কোনদিন আমার সংগ ছাড়েন না। আজও ছাড়েন নি। ওর বুকের পাতায় আমি আচর কেটে যেতে লাগলাম।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ৯ই ডিসেম্বর বর্ধমান সহরে শ্রীযুক্ত কমল মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষের বাসস্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত বলাগড়ের নিকটবর্তী চাঁদরা'য়। তাঁর পিতামহ স্বর্গতঃ ডাঃ জগবন্ধু মিত্র বর্ধমানে চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য গমন করেন এবং সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। কমল বাবুর পিতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও অঞ্চলের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন (বর্তমানে তিনি অন্ধ হ'য়ে আছেন)। বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও তিনি নির্বাচিত হ'য়েছিলেন একবার। নরেশবাবু চারিটি সন্তানের পিতা। দু'টি পুত্র সন্তানের ভিতর বড়টি মারা যায়। কমল মিত্রই অন্ধ পিতার একমাত্র জীবিত পুত্র সন্তান। বাকী দুটি কন্যা সন্তান – একজন কমলবাবুর বড় আর একজন ছোট। কমল মিত্র বর্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বর্ধমান রাজ কলেজেই তাঁর উচ্চ শিক্ষারম্ভ হয়। পারিবারিক কারণে কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত হবার পূর্বেই কমলকে জীবিকার্জনের জন্য পথ দেখতে হয়। বাল্যবয়স থেকেই অভিনয়ের প্রতি কমলের আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বালক কমলের অভিনয় নৈপুণ্য বাল্যবয়সেও কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তাঁর ছোটবেলার কবিতা আবৃত্তি অনেককেই মুগ্ধ করে। কমল মিত্র যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র—স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগে 'মহারাষ্ট্র গৌরব' মঞ্চস্থ হয়। কমলের শিবাজীর ভূমিকাভিনয় সকলকেই মুগ্ধ করে। এর দু'তিন বছর পরে বর্ধমান সিনেমা হাউসে 'আলমগীর' অভিনীত হয়। রাজসিংহের ভূমিকাভিনয়ে কমল মিত্রের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ধমান আসানসোল ও অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সৌখীন অভিনেতারূপে কমল মিত্রের নাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিভিন্ন নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। অভিনয়কলার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনা ছোটবেলা থেকেই ছিল উদগ্র। কিন্তু তাঁর পিতা সব সময়ই ছিলেন এর বিরুদ্ধে। যখনই কমল মিত্র অধৈর্য হ'য়ে উঠেছেন, পিতার তীব্র প্রতিবাদ তাঁকে নিরুৎসাহীত করে তুলেছে। পরিবারের খ্যাতি ছিল ও অঞ্চলে যথেষ্ট—অর্থশালী বলেও সকলের ধারণা হ'য়ে উঠেছিল বদ্ধমূল। অথচ ভিতরে ভিতরে এই অর্থের বনিয়াদ যে বহুদিন থেকেই শিথিল হ'য়ে আসছিল—তা কেউ জানতো না। কেউ খবরও রাখতো না। এমনকী পরিবারবর্গেরও কেউ নয়।

কমলবাবুও জানতেন না। ঠাকুর-চাকর—চতুর্দিকের বিলাসের উপকরণের অন্তরালে গৃহলক্ষ্মীর দীর্ঘ-শ্বাস কোনদিনই তাঁর কাছে পৌছোয়নি। কিছুদিন বাদে কিছুটা আভাষ যখন পেলেন আর মুহূর্তের জন্য বিলম্ব না করে অর্থোপার্জনে আত্মনিয়োগ করলেন। এবং বহু কষ্টে বর্ধমান কালেকটারীতে মাসিক ৩৫৲ বেতনের একটি কাজ সংগ্রহ করেন। এজন্য তাঁকে একটী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষারও সম্মুখীন হ'তে হয়। দু'বছর অতি ভাল ছেলের মত চাকরিতে কাটালেন। কিন্তু কেরাণী জীবনের একঘেয়েমি দিন দিনই তাঁর কাছে দুঃসহ হ'য়ে উঠতে লাগলো। সারাদিন কলমপেশার সংগে সংগে তাঁর মনের সুকুমার

প্রবৃত্তিও নিষ্পেষিত হ'তে লাগলো। এই নিষ্পেষণের সংগে সংগে তাঁর শিল্প-মনের হাহাকারও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কিন্তু সে ব্যাকুলতা কোনমতেই মুক্তি পেল না। পুরো দশ বছর চলে গেল। এই দশ বছরের ভিতর একাধারে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে যে বসেছিলেন তা নয়। বহু প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করেছেন—বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে অনুনয় বিনয়ে বিরক্ত করে তুলেছেন। মাইনের সমস্ত টাকাই তুলে দিতেন বাপের হাতে। ভাল খাবার বা হাত খরচা বাবদ সামান্য যা নিজের কাছে থাকতো, সেই সঞ্চিত অর্থ আবেদন-নিবেদনের টিকিট খরচা বাবদে ব্যয়িত হ'তো। বেশী করে টিকিট দিতেন চিঠির ওপরে—চিঠিটা তাড়াতাড়ি যাবে বলে। উত্তরটাও হয়ত আসবে তাড়াতাড়ি! উত্তরের আশায় অপেক্ষায়ই শুধু করেছেন—উত্তর আর আসেনি কোন দিন। বার বার এই ব্যর্থতা কমল মিত্রকে যেন পাগলা করে তুললো—মনের দুর্দমনীয় আকাঙ্খা দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এবার আর শুধু আবেদন নিবেদন নয়—ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলেন। হাজির হলেন নটগুরু শিশিরকুমারের কাছে। শ্রীরঙ্গম তখন কেবলমাত্র দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। শিশিরকুমারের সংগে অদম্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেখা করলেন। কিন্তু ফলবতী হ'লো না। তবে নাট্যগুরু তাঁকে নিরুৎসাহীত করলেন না। উৎসাহ দিলেন নূতনকে এবং নিজের উপায়হীনতার কথা উল্লেখ করে বল্লেন, "ছয় মাস অবধি কোন মাইনে আমি দিতে পারবো না।" সংগে সংগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঝুকি নিতেও তিনি নিষেধ করলেন। মিনার্ভা রঙ্গ-মঞ্চে তখন 'ব্লাকআউট' নাটকের তোড়জোড় চলছে। কমল মিত্র উপস্থিত হলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষের কাছে। তিনি আশ্বাস দিলেন কিন্তু সে আশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারলেন না। কালী-প্রসাদ বাবুর কাছ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে শ্রীযুক্ত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হ'লেন। তিনি 'নীলাঙ্গুরীয়'তে একটী ছোট ভূমিকায় গ্রহণ করলেন বিনা পারিশ্রমিকে। এবং এজন্য তাঁকে সাত আট দিন ট্যাকের পয়সা খরচা করে বর্ধমান থেকে ছুটোছুটি করতে হয়। কোনদিন রূপ-সজ্জা করেও স্যুটিং না হওয়ার দরুন ফিরে যেতে হয়েছে। জাপানী বোমারুবিমানের আক্রমণে কলকাতা সহর যখন আতঙ্কিত, শ্রীযুক্ত দেবকী বসু তাঁর পরিবার-বর্গের সংগে তখন কালনায় বাস করছেন। এই সংবাদ কমল পেলেন যেন কার কাছ থেকে। ছুটলেন দেবকী বসুর কাছে। দেবকী বাবুর বোধ হয় কিছুটা মনে ধরেছিল—ওর চারখানা ফটো চাইলেন। কালক্ষেপ না করে কমল মিত্র নিজের চারখানা ফটো পাঠিয়ে দিলেন। দেবকী বাবু তাঁর 'রামানুজ' হিন্দি চিত্রে কমল মিত্রকে 'সুপার' হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং কমলবাবু কুড়ি টাকা পারিশ্রমিক পেলেন এ জন্য। এর পর দেবকীবাবুর 'স্বরগছে সুন্দর দেশ হামারা' চিত্রে একটী বড় ভূমিকা পেলেন। এই চিত্রে কুড়ি দিনের কাজ ছিল এবং পূর্ণ চিত্রের চুক্তি হিসাবে কমলবাবু পেলেন দু'শ টাকা। এই সময় তিনি বিপিন গুপ্তের সংস্পর্শে আসেন। বিপিন বাবু কমল মিত্রকে নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক মহেন্দ্র গুপ্তের সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সময় কমল বাবুদের পারিবারিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হ'য়ে পড়ে। তিনি 'King's Commission'-এ আবেদন করেন। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিতও হ'য়েছিলেন কিন্তু মায়ের চোখের জল তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কমলবাবুর এক দাদা মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। নিজেও চাকরি করে যা পেতেন, বাপ-মায়ের হাতে তুলে দিতেন। সংসারের আর্থিক ভিত্তি যে খুবই নড়বড়ে হ'য়ে উঠেছিল সে আভাষ কমলবাবু পেয়েছিলেন ইতিপূর্বেই—তাই সংসারের চিন্তাও তাঁকে কম ভাবিয়ে তুলতো না। এই সময় তাঁর পিতা অন্ধ হ'য়ে যান। অন্ধ পিতার একমাত্র অবলম্বন কমল—পুত্রকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। পুত্রও নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলোনা। সেদিনই সংসারের সমস্ত বিষয় কমলবাবু পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন। সামান্য কিছু টাকা যা তখনও তাঁর পিতার কাছে সঞ্চিত ছিল, তাই দিয়েই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কোন ফল হ'লো না। তারপর বর্ধমানের চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে মাত্র পনেরোটী টাকা
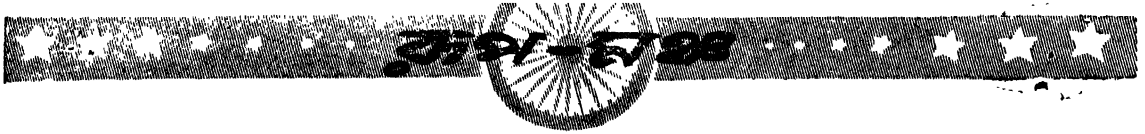
সংগে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। যেমন করে হউক মানুষ হ'তে হবে। অর্থোপার্জন দ্বারা সংসারের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করে বৃদ্ধ পিতাকে চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে। কমলবাবু প্রতিজ্ঞা করলেন, যতদিন বেশী উপার্জন করতে না পারবেন- চা খাবেন না--জল খাবার খাবেন না—চেয়ারে বসবেন না—খাটে শোবেন না। বিলাসের সমস্ত উপকরণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবেন। আসবার সময় বাবা ও মাকে প্রণাম করে বলে এলেন, "তোমরা এবার আমায় বাধা দিও না—আশীর্বাদ কারো, জীবনের যে ক্ষেত্রেই পা বাড়াই-না কেন—আমি যেন উন্নতি লাভ করতে পারি।" সন্তানের শুভ কামনায় বাপ মায়ের চোখ দিয়ে আশীর্বাদের বারিধারা ঝরে পড়লো। তাঁরা সন্তানের গৌরবদীপ্ত ভবিষ্যত জীবনের জন্য উন্মুখ হ'য়ে রইলেন।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ। সেপ্টেম্বর মাস। কমলবাবু মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাহিনাতে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'কেদার রায়'-এ সর্বপ্রথম মুকুট রায়ের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এই সর্বপ্রথম তাঁর আত্মপ্রকাশ। এর পর বিভিন্ন নাটকে ছোট ছোট চরিত্রাভিনয় করে বিপিন বাবু বম্বে চলে যাবার পর কমলবাবু 'টিপু সুলতানে' নাম ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পান। এই সময় তাঁর বেতন পনেরো টাকা বৃদ্ধি পায়। যতদিন ষ্টারের সংগে জড়িত ছিলেন, ঐ ৬৫৲ টাকা মাইনেই পেয়ে এসেছেন। কলকাতায় এসে কমলবাবু তাঁর এক পরিচিত বন্ধুর বাড়ীতে অল্প টাকায় একখানা ঘর ভাড়া করে রইলেন এবং স্টারের নিকটবর্তী কোন হোটেলে খেতেন। পর পর কয়েকখানা নাটকে অভিনয় করতে করতে যেই তাঁর একটু নাম ছড়িয়ে পড়লো—হোটেলে খেতে যাওয়ায় তাঁর বাধা দেখা দিল। অনেকেই আড় চোখে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। অনেকে আবার আলাপ পরিচয়ও জমিয়ে তুলতে চাইলেন। কমলবাবু একটু অশোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন। তখন কুকারে নিজে হাতে রান্না করে খেতে লাগলেন। নিজেই বাজার করেন—কয়লা ভাঙেন—বাসন মাজেন। কোনদিন হয়তো রান্না চড়িয়ে গেছেন, দেখলেন আগুন অভাবে খাদ্যদ্রব্যগুলি ভাল করে সিদ্ধও হয়নি। সেদিন অভুক্ত অবস্থাতেই কাটিয়ে দিতে হলো। এমনি ভাবে বহুদিন কেটেছে কমল বাবুর। স্টারে 'কঙ্কাবতীর ঘাটে' কমল মিত্রের নন্দগুণ্ডা নাট্যামোদিদের কাছে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ষ্টারে অভিনয় কালে পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর হিন্দি চিত্র 'বনফুলে' অভিনয় করবার জন্য দৈনিক তিরিশ টাকা হারে চুক্তিবদ্ধ হন। এরপর 'সাত নম্বর' বাড়ীতে দৈনিক চল্লিশ টাকা হিসাবে চুক্তি পান এবং 'সংগ্রামে' পান পঞ্চাশ টাকা হারে। এক বৎসর ষ্টার রঙ্গমঞ্চের সংগে জড়িত থাকবার পর কমল মিত্র মাসিক ১২৫৲ টাকা বেতনে মিনার্ভা রঙ্গ-মঞ্চে যোগদান করেন। মিনার্ভা রঙ্গ-মঞ্চে 'গৈরিক পতাকা' নাটকে শিবাজীর ভূমিকায় কমল মিত্র সর্বপ্রথম নাট্যা-মোদিদের অভিবাদন জানান। পর্দায় 'সাত নম্বর বাড়ী'র পর এম, পি প্রডাকসন্সের 'তুমি আর আমি'র হিন্দি এবং বাংলা উভয় সংস্করণেই অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই সময় তাঁর পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত হয়, দৈনিক ষাট টাকা হিসাবে। চিত্র ভারতীর 'নিবেদিতায়' চিত্র হিসাবে ১৬০০৲ টাকা এবং মাতৃহারায় ২০০০৲ টাকা গ্রহণ করেন। মঞ্চে মিনার্ভায় 'মেবার পতন'-এ রাণা অমরসিংহ, 'দুই পুরুষে'-শিবনারায়ণ,'রাষ্ট্রবিপ্লবে'-ঔরংজেব, 'সীতারাম'-এ সীতারাম কমল মিত্রকে স্থায়ী যশ এনে দেয়। তাছাড়া 'মিশর কুমারী' এবং বিভিন্ন নাটকের মিলিত অভিনয়োপ-লক্ষ্যেও এখানে অংশ গ্রহণ করেন। সীতারামের অভিনয়ের সময় কমল মিত্র মাসিক ৪০০৲ টাকা করে মাইনে পেতেন। এবং এই 'সীতারাম' নাটকের অভিনয় সময়েই কর্তৃপক্ষের সংগে মতদ্বৈধতার জন্য তিনি মিনার্ভা পরিত্যাগ করেন।

পর্দায় 'মাতৃহারার' পর 'অভিযাত্রী', 'রাত্রি', 'পথের দাবী', 'পূর্বরাগ', 'রায়চৌধুরী', প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন। এবং প্রত্যেকখানিতে চিত্র হিসাবে ৩০০০৲ টাকা গ্রহণ করেন। বর্তমানে 'ললিতা সখী', 'জীবন ও যুদ্ধ', 'এই দেশেরই মেয়ে', 'মৃত্তিকা' প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করছেন। এবং তাঁর বর্তমান পারিশ্রমিকের হার বাংলা ও হিন্দি চিত্রের জন্য যথাক্রমে আনুমানিক তিন হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা।

দৈনিক হার বাংলা ৩০০৲ শত ও হিন্দি ৪০০৲ শত টাকা। অনেক সময় অনেক পাঠক-পাঠিকাদের মনে শিল্পীদের উপার্জন সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। সে জন্যই কমল মিত্রের শিল্প-জীবনের প্রথম থেকে আজ অবধি পারিশ্রমিকের ক্রমিক হার আমি পীড়াপীড়ি করে জেনে নিলাম। তাছাড়া কমল মিত্রের শিল্প-জীবনের বিভিন্ন বাধা বিপত্তি আগ্রহ-শীল নূতনদের কাছে এক নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। দু'একবার চিত্রজগতের আনাচি কানাচি ঘুরে ব্যর্থ হলেই বহু নূতন নিরুৎসাহীত হয়ে পড়েন। কিন্তু মনের ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় যদি থাকে, বার বার ব্যর্থতার আঘাত খেয়ে ফিরে এলেও, কোন নূতন যদি নিরুৎসাহীত না হয়ে আবার নূতন উদ্দীপনা নিয়ে—নিজেকে চিত্র ও নাট্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংগ্রাম করে যান—আমার মনে হয় একদিন তাঁদের সে সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। কমল মিত্রের জীবনের সংগ্রাম-মুখর দিনগুলি সেই সাক্ষ্যই দেবে। শুধু কমল মিত্রেরই নয়—এমনি ভাবে আমাদের প্রত্যেকটী শিল্পীকে আসন বেছে নিতে সংগ্রাম করতে হ'য়েছে। এই সংগ্রামের ভিতব দিয়ে যাঁরা অগ্রসর হ'য়েছেন—দর্শক সাধারণের অন্তরে কেবলমাত্র তাঁবাই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পেবেছেন।

কমলমিত্র পূর্বে একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন এবং রীতিমত ব্যায়াম করতেন। বর্তমানে ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস কবছেন। ইংরেজী, বাংলা এবং হিন্দি ছবি কমল মিত্র রীতিমত দেখে থাকেন। বাংলা অভিনয় জগতে ছবি বিশ্বাস ও চন্দ্রাবতীর অভিনয় দক্ষতা কমল মিত্রকে মুগ্ধ করে। সংগীতে কমল বাবুর ততটা আগ্রহ নেই। মঞ্চে যতগুলি ভূমিকায় কমল বাবু অভিনয় করেছেন তার ভিতর 'শিবাজী' ভূমিকাভিনয়ে নিজে বেশী তৃপ্ত হ'য়েছেন। তাছাড়া চিত্রে বা মঞ্চে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চরিত্র কমল বাবু খুব কমই পেয়েছেন বলে দুঃখ করেন। ছোটবেলা থেকেই মঞ্চ সম্পর্কে বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় জানবার আগ্রহ কমল বাবুর যথেষ্ট ছিল। মঞ্চ সম্পর্কিত বহু বই তিনি সংগ্রহ করে পড়তে থাকেন। দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন নাট্য-মঞ্চের ইতিহাস পড়তে পড়তে পড়াশুনার প্রতি তাঁর আগ্রহ যায় বেড়ে। বর্তমানেও তাঁর আয়ের এক মোটা অংশ ব্যয় করেন এই সংক্রান্ত পুস্তকের পেছনে। অন্তরংগ বন্ধু বলতে কমল বাবুর খুব কম বন্ধুই আছেন। সব সময়ই সকলের মাঝখান থেকে নিজেকে দূরে দূরে রাখতে ভালবাসেন। অপরের প্রতি অবজ্ঞা করে নয়—অপরে নিজেকে কীভাবে গ্রহণ করবেন না কববেন এই আশংকা করেই। শিল্পীদের ভিতর তাঁর অন্তরংগতা একমাত্র জীবেন বসুর সংগেই। তাছাড়া নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তকে ঘিরে ছিটগ্রস্তদের যে আড্ডা বসে, তাতেও কমল বাবু যোগদান করে থাকেন। সর্বজনপ্রিয় নাট্যকার শচীনদা'র প্রতি কমল মিত্রের শ্রদ্ধা রয়েছে অপরিসীম। নাট্যকার হিসাবেত বটেই—মানুষ শচীনদাও কমল মিত্রকে কম মুগ্ধ করেনি। আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের ভিতর তারাশঙ্করের রচনা কমল বাবু ভালবাসেন। রাজনীতি নিয়ে কোনদিনই কমল বাবু মাথা ঘামাননি—তবু ছোট বেলা থেকেই সুভাষচন্দ্রের অনুরোক্ত ছিলেন।

চিত্র পরিচালনা করবার ইচ্ছা কমল বাবুর আদৌ নেই, তবে মঞ্চ পরিচালক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে সব সময়ই রয়েছে। চিত্র ও নাট্য জগতে নূতন দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন প্রতিভাকে কমল বাবু সব সময়ই স্বাগত অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত কিন্তু প্রতিভার আস্ফালন তিনি মেনে নিতে রাজী নন। শিশু চিত্র ও নাটকের প্রযোজনীয়তার কথাও তিনি স্বীকার করেন। রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের নাট্য-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে তারিফ করেন। নিজের শক্তি ও সামর্থানুযায়ী এই পরিকল্পনাকে মূর্ত করে তুলতে তিনি সব সময়ই প্রস্তুত আছেন।

কমল বাবু সদালাপী। তাঁর সংগে আলাপ করতে করতে তাঁর একগুয়েমী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রয়েছে অসম্ভব। এই আত্ম-বিশ্বাসের জোরেই তিনি যেকোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত আছেন। বহু বাধা বিঘ্ন ডিঙ্গিয়ে তাঁকে পথ করে নিতে হ'য়েছে বলেই তাঁর আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
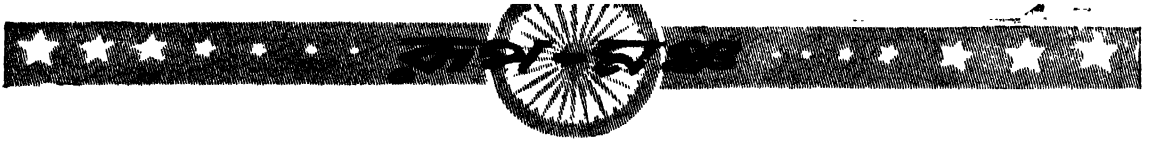
আমার সংগিনীকে বগলে নিয়ে কমলবাবুকে নমস্কার ঠুকে যখন তাঁরই গাড়ীতে উঠলাম, বেলা একটা বেজে গেছে। কমলবাবু আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে স্মিতমুখে বল্লেন, "আপনাকে 'রূপ-মঞ্চে'র মতই ভুলবো না কোনদিন।" আমিও প্রত্যুত্তরে বল্লাম—"আমিও না।" অর্থাৎ ছেলাম আলাকুম—আলাকুম ছেলাম।"

আমাদের সাক্ষাতের দিন অবধি কমলবাবু অবিবাহিত ছিলেন। কিছুদিন বাদে সম্পাদকের কাছে লিখিত এক পত্র থেকে জানতে পারি—কমল বাবু তাঁর নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বর্ধমানে মধুযামিনী যাপন করছেন। আমার মিষ্টি-খাবারের বহর দেখেই হয়ত মিষ্টিমুখ করাবার ভয়ে খবরটা আমাকে জানাননি—টেক্কা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁকেও টেক্কা দেবার লোক এসে গেছে। বাঙ্গালী মেয়ে, পেটুকদের সন্ধান পেলেই পেট পুড়িয়ে খাওয়াতে ভালবাসেন, তাই কমল বাবুকে না জানিয়েই তাঁর বাড়ী থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, আর একদিন হানা দেবার—সেদিনকার কথাটা আপাতত চাপা দিয়ে - কমলবাবুর দাম্পত্যজীবনের শুভ কামনা করে আজকের মত আমার আলোচনায় যবনিকা টানছি—আশা করি আপনারাও আমার সংগে এই শুভ কামনায় যোগ দেবেন।

—শ্রীপার্থিব।

— শ্রীমতী অলকা দেবী —

শিক্ষা, আভিজাত্য ও সৌন্দর্য নিয়ে সর্ব প্রথম নায়িকার ভূমিকায় দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানাবেন

উপরে

—

সন্তোষ হাজরা

পরিচালিত

কৃষ্ণফিল্মস

এ্যাণ্ড

ষ্টুডিও লিঃ-

এর

"আনন্দমঠ"

চিত্রে

গীতা দেবী

নীচে

—

যাত্রা নৃত্যের

একটী দৃশ্য

—

শারদীয়া

রূপ-মঞ্চ

১৩৫৪

ফিরে পেতে হবে—

শক্তিপদ রাজগুরু

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে নতুন রচনাভংগী, নতুন দৃষ্টিভংগীর অভাব একান্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতি কোনও নতুন পথ খুঁজে নেয়নি। প্রতিভা পেয়েছি সামান্য, শক্তিমানের সংখ্যাও বেশী দেখিনি। এরই মধ্যে নূতন সম্ভাবনা নিয়ে যে কয়েকজনতরুণ কথাশিল্পীর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে শক্তিপদ রাজগুরুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে বলে আমরা মনে করি।

লোচন ঠাকুর কলকাতায় তাঁর যজমান নিবারণ বাবুর মেয়ের বিয়েতে যাবার আয়োজন করতে ব্যস্ত। একা বীণা পেরে ওঠেনা, সময় নাই ঃ লোচন ঠাকুর নিজেও করতে থাকেন গোছগাছ ঃ

তাঁর কলকাতা যাবার সংগী হল পাড়াবই কালীচরণ! বিধবা সারদা ঠাকরুণের একমাত্র সন্তান, মায়ের জেদা-জেদিতেই তাকে কলকাতা যেতে হচ্ছে, যদি তেমন সুবিধামত একটা চাকরি জুটে যায়। আশ্বাস দেন লোচন ঠাকুর, তাঁর যজমানরা অনেকেই বড় চাকুরে—সুতরাং গ্রাম সুবাদে ভাইপো কালীচরণের চাকরি অব্যর্থ!

হাসে বীণা—কালীদা করবে চাকরি?

কালীদা গাঁ' হতে চলে যাচ্ছে—সত্যিই কথাটা বীণার মনে মনে বাজে! তার সংগী কালীদা, কালীরও ভাল লাগে না গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে! এখানে তার কত কাজ! আশ্রম—সে,া সমিতি—নাইট স্কুল ঃ এসব ফেলে সে যাবে কোথায়? যাবার দিন সকালে বীণা বাবার আহ্নিকের ফুল তুলতে গিয়ে পথে দেখতে পায় কালীদা'কে!

"সত্যি নাকি কালীদা কলকাতা যাবে, হবে বড় চাকরে, চাই কি বিয়ে করে আনবে কলকাতার কোন এক সহুরে বৌ—জুতো চশমা পরা মেয়ে!···"

চটে ওঠে কালী বীণার কথায়! তবুও মনে পড়ে যায়—এত কাজ ফেলে গাঁ হতে সে যাবে কোথায়ঃ বলে সে—"সত্যিই রে বীণা, যেতে কি আমার এতটুকু ইচ্ছা আছে ছাই! মায়ের জন্য কেবল যেতে হচ্ছে! দেখি ঘুরেই আসি একবার!"

বেশী কথা তাদের এগোল না!···ওপাশ হতে জগৎ ভট্টাচার্যকে আসতে দেখে সরে গেল কালী, বীণাও ফুল তোলায় মন দেয়! দুজনেই তারা সহ্য করতে পারে না লোকটাকে!

গায়ের মধ্যে জমিদার গোছের! মানুষ ত নয় কুমীর,—গ্রাস করতে পারে সর্বস্ব।

তাজ্জব সহর এই কলকাতা!

এখানের সবকিছুই কালীর চোখে ঠেকে বিচিত্র ভাবে। ষ্টেশন হতে বার হয়ে গিয়েই দেখে কালী··একটা কুলি পড়ে গেছে বোঝা নিয়ে, কপালের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে! বাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই,··তাঁর ন্যাংড়া আমের ঝুড়িটা পড়ে গেছে। দামত দিলেনই না, উপরি মিলল তার জুতোর ঠোকর।

এমনিতর কত অনাচার। এসব দেখেনি কালী। দেখছে সহরে এসে।·এগিয়ে চলে লোচন ঠাকুরের সংগে বিয়ে বাড়ীর দিকে।

মেয়ের বাবা নিবারণ বাবু বরপণের সব টাকা-গহনা তখনও যোগাড় করে উঠতে পারেননি। মহাসমস্যা। সান্ত্বনা দেয় বড় মেয়ে কমলা—টাকার জন্য ভাবতে হবে না তাঁকে। দুদিন পর দিলেও চলবে! ভাবী জামাই সমীরণ আর চপলা একই স্কুল কলেজে পড়েছে! দুজনার আলাপ বহুদিনের! সমীরণ তার বাবাকে বলে কয়ে থামাতে পারবে!

কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল ঠিক বিপরীত! বিয়ের
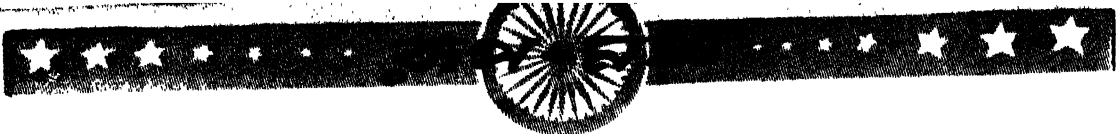
আসরেই গোল বাঁধল টাকা গহনা নিয়েই। সমীরণের বাবা বলে বসেন অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায়, নিবারণ বাবুকে নানা কথা! সমীরণ চুপ করে মজাই দেখল! অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তার দিকে নিবারণবাবু, চপলাও! কিন্তু সমীরণ কোন কথাই বলে না! বাবার ডাকে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল!

মহা গোলমাল! পাত্র চলে গেল, বাড়ীতে পড়েছে কান্নার রোল! মেয়ে অরক্ষণীয়া থাকবে? নিবারণবাবু যেন পাগল হয়ে গেছেন! লোচন ঠাকুরের পায়েই মাথা খুঁড়তে থাকেন! কোন উপায়ই কি নাই—?

আছে!!

লোচন ঠাকুর অবাক হয়ে যান কালীর কথায়। একি বলছে সে! যদি নিবারণবাবুর অমত না থাকে রাজী আছে কালী এ বিয়ে করতে! এ অন্যায়ের প্রতিবাদ সে করতে পারে! সকলেই অবাক হয়ে যায়। ভাববার সময় নাই—বিয়ে হয়ে গেল সেই রাত্রেই।

রেহাই পেলেন নিবারণবাবু! কালী সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই করল এ বিয়ে! আর চপলা?

শিক্ষিতা মেয়ে—নীরবে মেনে নিল এই অপমান! সমাজের অন্যায় অবিচারের যূপকাষ্ঠে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করল; কলেজের শিক্ষিতা পাশ করা মেয়ে—তার স্বামী কিনা গ্রাম্য কোন অর্ধশিক্ষিত যুবক, সভ্য জগতের কোন ছাপই যার নাই! এতবড় নিষ্ঠুর সত্য ঘটে গেল তার জীবনে—কোন রুদ্র দেবতার পরিহাসে—জানেনা সে!

পাড়া গাঁ—সবকিছুই এর বিচিত্র ঠেকে চপলার কাছে। তারা আসছে কালীর বাড়ীর দিকে—দূরে দূরে ছোট ছায়া ঘেরা গ্রাম—বিলের জলরাশি—সবকিছুর মধ্যে সে যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে—কালী কথা কইবার সাহস পায় না!

গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা জমা হয়েছে কালীর বাড়ীর দরজায়! সকলেই অবাক! সহুরে জুতো-চশমা পরা নোতুন বৌ! দেখে বীণাও! একি ঘটে গেল? যা একদিন সে বলেছিল কালীদাকে ঠাট্টা করে আজ কি তাই সত্যি হয়ে গেল! বেশ—কোথায় যেন একটা আঘাত বাজে বীণার মনে—, কিন্তু এ কেন? ওকে নিয়েই যদি কালীদা সুখী হয়—তার মনে করবার কি থাকতে পারে?

বীণার মনের এ দৈন্য হাহাকার সকলের চোখ এড়িয়ে যায়,কিন্তু এড়ায় না একজনের। সে যমুনা,বীণার বাল্যসখী! সেত জানত বীণার অন্তরে কার আসন পাতা রয়েছে! আজ সত্যিই দুঃখ হয় বীণার জন্য!

জগৎ ভট্চাযের সম্বন্ধে অপবাদ এক আধটু আছে! তা গ্রামে ঘরে দুপয়সা বেশ কিছুরই সাশ্রয় থাকলে—দু' পাঁচ হাজার মন ধান ঘরে বাঁধা থাকলে এসব বদখেয়াল একটু থাকে! সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে জগৎ মাঝে মাঝে বাগ্দী পাড়া যায়—এ তার বহুকালের অভ্যাস! সৌরভী কিন্তু আর এসব সহ্য করে না! সে চায়না এভাবে নোঙরা জীবন যাপন করতে! তার একমাত্র সন্তান বর্তমান!

সে যে মা! আর এসব নোংরামি ভাল লাগে না। রোজকার মত অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে জগৎ তার বাড়ীতে ঢুকতেই বাধা দেয় সৌরভী।

"ঢেক বলেছি তোমায় ঠাকুর, আর এসোনা! দুটি পায়ে পড়ি তোমার—"

আজ হতে সৌরভী মানুষের মত বাঁচতে চায়।

চটে ওঠে জগৎ তার কথায়! এতদিন জগতের খেয়ে আজ সে নাকি সতী হয়েছে! বেশ দেখিয়ে দেবে এইবার সে—চালে যেদিন একগাছি খড় থাকবে না, বাতাসে হাড়ি নড়বে, সে দিন কার দরজায় ধন্না দেয় সৌরভী!

না খেয়ে মরবে সেও ভাল—তবু আর ওদের দরজায় যাবে না সৌরভী! তার ছেলে বেঁচে থাক,—সেই সব! এ কলঙ্কময় জীবন সে আর চায় না।

গজরাতে গজরাতে বার হয়ে আসে জগৎ! পাড়ার পথ দিয়ে আসছে—হঠাৎ কালীচরণের বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়! গ্রামের বাগ্দী—লোহার—কাওড়া যত নীচু জাতের ছেলে বুড়ো মরদদের নিয়ে পড়িয়ে চলেছে কালী! লোচনঠাকুরের মেয়ে বীণাও ওপাশে ছেলেদের

নামতা মুখস্থ করাচ্ছে! কালীর বৌ চপলা—কি যেন দেখছে কৌতূহল ভরে! জগৎ এসব দেখেই কি যেন ভাবতে ভাবতে পা বাড়ায়—! কি সব শেখাচ্ছে কালী ওদিকে—! এ যেন বেশ একটা ভাল লক্ষণ নয়। নজর পড়েছে লোচনের মেয়ে বীণার উপর। এত রাত্রে তাকে ছেড়ে দিয়েছে লোচন!

গ্রামের নিতাই মুখুয্যের কিছু ধানের দরকার, না হলে হাড়িই চাপবে না! মনে মনে কি চাল চালতে চালতে বার হয়ে এগিয়ে চলে জগতের বাড়ীর পানে - কাশির শব্দে সারা পাড়া মুখরিত করে।

জগতের বৈঠকখানায় রোজ সকালেই সমবেত হয় তাঁর হিতাকাঙ্খীর দল! প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর হতে আড্ডাটা বেড়ে চলেছে অবাধে! যদিও ছেলে পুলে বর্তমান। তারা বড় একটা এদিকে কেউ আসে না! মাঝে মাঝে আড্ডার দু' একজনের গাঁজাও চলে, সেজে দেবার ভারটা আছে লবকেষ্টর উপর--কর্ত্তার খাস চাকর, তাঁরও চলে দু'একটান!

জগৎ অবশ্য হিসেবী লোক! এদিকে খেয়াল তার নাই! সেদিনের সকালের আড্ডায় নিতাই খুড়োও অবতীর্ণ হ'ন! একথা সে কথার পর বলে বসেন তিনি মহা হিতাকাঙ্খীর মত—এত অল্প বয়সেই জগৎ সংসার ছেড়ে দিলে তাঁরা থাকবেন কি করে! এই বয়সেইত কতলোক প্রথম সংসার করে—আর জগৎ করবে না—? এটা কি হয়। তাছাড়া লোচন ঠাকুরও বলছিল তাকে পাত্রের জন্য, তার মেয়ে বীণাও বড় সড় হয়েছেত!

কথাটা শুনে কেমন যেন হয়ে যায় জগৎ! তার অন্তরের গোপনতম বাসনা--যদি হয়—? কথাটা তখনকার মত চাপবার চেষ্টা করে নিতাই খুড়োকে বৈকালে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে জগৎ!

অবশ্য নিতাইএর ত্রিশমণ ধানও মিলে গেল হাতে হাতে! কিস্তীমাৎ করে কাশতে কাশতে বার হয়ে আসে নিতাই! জগতের মনে রংগীন আশার জাল বোনা সুরু হয়!

কলকাতায় থাকবার সময় চপলার গান গাইবার অভ্যাসটা ছিল, সেদিন বাড়ীতে গাইতে গিয়ে শ্বাশুড়ীর কাছে বেশ একটু বকুনিই খায় সে!—"গানের সময় আছে বৌমা, যখন তখন এখানে গান গাওয়া চলে না—!"

বকুনিটা নীরবে হজম করে চপলা! খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে সে অনুভব করছে—এখানের সংগে তার এতদিনের জীবন যাত্রার পার্থক্য!

সেইদিন একটা ভিখেরী মেয়ের সামনে কি বকুনীটাই না দিলেন শ্বাশুড়ী। বইটা মন দিয়ে পড়ে চলেছে চপলা, দরজায় কখন যে ভিখেরীটা চীৎকার করছিল জানেনা চপলা, হঠাৎ সারদা ঠাকরুণের নজরে যেতেই ঝাঁঝিয়ে ওঠেন—"বৌমা, ভিখেরীকে একমুঠো চাল না দিয়ে দরজা হতে ফিরিয়ে দিলে গেরস্তের অকল্যাণ হয়! আর যে বই-এ ওটুকু না-শেখান হয় সে বই বাড়ীর বৌকে পড়তে নাই, উনুনের আঁচে পুড়িয়ে দিতে হয়!"

তাকে চালগুলো নিজেই দিয়ে আসেন।

চটে ওঠে চপলা, কেন শ্বাশুড়ী তাকে বাইরের লোকের সামনে অপমান করবে—? হাসে কালী।

মায়ের কথা অমনিই! ভালও কম বাসেনা, কিন্তু অন্যায় সহ্য করবে না! মায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে গেলে শুনবে না, হাসে কেবল কালী! মনে মনে চটে ওঠে চপলা--মায়ের প্রতি কালীর অচলাভক্তি দেখে।

কালীর শিক্ষা পদ্ধতি—তার আশ্রমের পরিকল্পনা দেখে হাসে চপলা, কালী অবাক হয়ে যায়! চপলার কাছে এসব বোধ হয় ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলে, ওদের কেউই বি-এ, এম-এ, পাশ করবে না, উকিল ব্যারিষ্টারও হবে না। এই ব্যাগার খাটার চেয়ে চলুক কালীচরণ পাড়াগাঁ ছেড়ে সহরে—তারা যেমন করে হোক সংসার চালাবে, চপলার বাবাও সাহায্য করবেন—কালী ভালভাবে বাঁচতে পারবে!

অবাক হয়ে যায় কালী! শুনিয়ে দেয় কঠিনভাবে

—"গাঁয়ের মাটিই তার সব, গাঁয়ের লোকই তার কাছে বড়, দরকার নাই এদের বি-এ, এম-এ পাশ করে, ওরা জানতে শিখুক, দেশের মাটিতে ফলে-ফসলে তাদের সমান অধিকার—পাশ করবার দরকার ওদের ত নাই!"
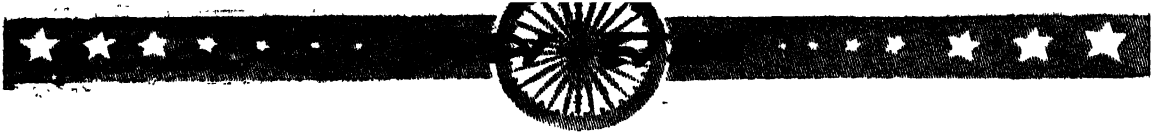
বলে চপলা—"পাশের মর্ম তুমি কি বুঝবে? পাশ দিয়েছ কখনও?"

—"পাশ দিইনি বলে দুঃখিত নই, সেদিন তোমাদের বাড়ীতেই তোমার পাশ করা ভাবী স্বামীর স্বরূপ যা দেখলাম তারপর আজও শ্রদ্ধা আছে তোমার—? সে রাত্রের চুণ কালির দাগ আজও যে মোছেনি?"

চমকে ওঠে চপলা, প্রতিবাদ করে তীব্র স্বরে!

থেমে গেল কালীচরণ, সত্যিই তাকে অহেতুক আঘাত দিয়েছে সে, এটা তারই অন্যায়!

নিতাই খুড়ো ওদিকে লোচনকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হাজির করে জগতের কাছারিতে।...জগৎ তখন রীতিমত প্রজাখাতকের পাই পয়সা হিসেব নিয়ে ব্যস্ত।...তার সমস্ত প্রজাদের মধ্যে এসেছে অভাব অভিযোগের সাড়া। ধান চাই—, না হলে কি খেয়ে তারা চাষ করবে। সব ধানই যদি জগৎ টেনে নেয়—তারা কি খেয়েই বা থাকবে, কি দিয়ে বা ছেলেপুলের সংসার চালাবে, বাধ্য হয়েই তাদিকে চাষ বাস ছেড়ে দিয়ে জনমজুরী করতে যেতে হবে।

তাদের কান্নায় কানদেবার মত বদভ্যাস জগতের নাই! দরকসে তারা, তার নিজের পাওনা ঠিক পেলেই হ'ল, সে যেমন করেই হোক! এহেন সময় লোচনকে নিয়ে প্রবেশ করে নিতাই!

লোচনকে আসতে দেখেই সাদর আমন্ত্রণ জানায় জগৎ! লোচনও একটু ঘাবড়ে যায়। কবে কোন কালে তার বিয়ের সময় লোচনের বাবা জগতের বাবার কাছে কিছু টাকা ধার করেছিল, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ শুদ্ধ সে টাকা শোধ করবার সামর্থ্য আজ লোচনের নাই!

তাই কোন নোতুন চাল বোধ হয় জগতের! ঘাবড়ে যায় লোচন!

কিন্তু একথা সেকথার পর আসল কথাটা নিতাই পাড়তেই কেমন যেন অবাক হয়ে যায় লোচন! বিয়ে করবে আবার জগৎ, আর বীণাকে যদি বিয়ে দেয় তার সংগে, বুড়োর মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে। তাই কি হয়—?...

বুড়ো জগতের সংগে তার মেয়ে বীণার বিয়ে—? না—না কিছুতেই ভাবতে পারে না সে। কোন কথা বলতে পারে না লোচন—চিন্তিত মনে বার হয়ে আসে!

আশা ভরা নয়নে চেয়ে থাকে জগৎ! সান্ত্বনা দেয় নিতাই, খুড়ো— "কিছু ভেবোনা বাবাজী, যেখানে সুচ চলে না— নিতাই খুড়ো সেখানে ফাল চালিয়ে দেবে! দুটো দিন সবুর কর বাবাজী।"

চিন্তিত মনে বাড়ী ঢুকে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে একটু রেগেই যায় লোচন। উনুন জ্বলছে। কোন রকমে ভাতের হাড়িটা চাপিয়ে দিয়ে গামছা কাঁধে করে পুকুরের দিকে রওনা হয়—! মনে পড়ে নিতাইএর কথাটা—মেয়ের বিয়ের বয়সটা পার হয়ে গেল - গাঁয়ে ঘরে এত বড় মেয়ে রাখা ভাল নয়---।

বিয়ে এবার দিতেই হবে! কিন্তু টাকা কোথায়—?

হঠাৎ পুকুরের ঘাটে বীণার গানের সুর শুনেই এগিয়ে যায় রেগেমেগে—, যেখানে সেখানে গান গাইবে ধিঙীমেয়ে—! আজ দেখাব একবার।

চপলা কলসী ভর্তি করে জল হতে উঠতে গিয়েই হাত থেকে পড়ে যায় সেটা,—কোথায় যে চলে গেল, জলের মধ্যে খুঁজে পায় না। বেশী জলে যেতে ভয় হয়—সাঁতার জানে না! ঠাট্টা করে বীণা।

"কলসী ডুবিয়ে বাপের বাড়ী পালাবার মতলব নাকি বৌদি—?"

"না, যমের বাড়ী।"

—"সর। ওপথটা আমারই খোঁজা দরকার, এতবয়স অবধি বিয়ের ফুলত ফুটল না, কি বল—?"

বারকয়েক ডুব দিয়ে কলসীটা তুলে নিয়ে বাড়ীর পথ ধরে! আসতে আসতে বীণার কথায় ফিরে চায় চপলা—"তুমি সুখী হওনি বৌদি,—শহরের মেয়ে পাড়াগাঁয়ে এসে! কিন্তু এও বলে দিচ্ছি, কালীদাকে ভুল বুঝোনা! কোনদিন কোন অভিযোগ ও করবে না। যাকে ভালবাসে—তার জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, কালীদা তাদেরই একজন!"

সারদা ঠাকরুণ রান্না চাপিয়ে ঘরবার করছেন, জল নিয়ে আসেনি চপলা তখনও! হঠাৎ চপলাকে আসতে দেখে বলে

ওঠেন—"পুকুর খুঁড়ে কি জল আনতে গিইছিলে বাছা— ?" উত্তর দেয় চপলা—"না, ডুবে মরতে গিইছিলাম !"
চটে ওঠেন মা—"এমন কি বলেছি বাছা—এতবড় কথাটা বল্লে ?"
হঠাৎ কলসীটা সমেত উঁচু সিড়ি হতে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়তেই ফিরে চান সারদা ঠাকরুণ ! তাঁর সাধের কলসীটা তালতেবড়া হয়ে গেছে। আর যায় কোথা ! ঝাঁপিয়ে ওঠেন তিনি ! লক্ষ্মীছাড়া বৌ ! একেবারে হাতে পায়ে অলক্ষ্মী ! গেলত এতদিনের কলসীটা, বেশ একচোট হয়ে গেল চপলার সংগে, চপলাও নীরব থাকতে পারে না আজ ! এতদিনের সঞ্চিত অভিযোগ—আজ তার কথায় ফুটে বার হয় ! তাকে বিয়ে করে শান্তিই দিয়েছে—তার বাবাকে সমাজের অত্যাচার হতে বাঁচাবার নাম করে ! এ সর্বনাশ না করলে এমনি হয়ে তার জীবন বিষিয়ে যেতো না !
ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে নিতাই খুড়োর প্রবেশে ! কালী নাকি সর্বনাশ করেছে। সারা গ্রামের —সমাজের মুখ ডুবাল সে ! এত নীচ কাজের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।
আক্রোশটা গিয়ে পড়ে সারদা ঠাকরুণের চপলার উপরই। সে-ই আপন করতে পারে নি বলেইত তার ছেলে বাইরে বাইরে দিন কাটায়। আর ছেলেও তেমনি ! যেমন ছেলে তেমনি বৌ ! কেউই তাকে দিল না একটু শান্তি ! দরকার নাই এমন সংসারে ! চপলা আজকের এ অভিযোগ নীরবে সহ্য করে না ! স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—
দরকার হয় তিনি এমন আর কাউকে আনতে পারেন—যে তাঁর ছেলেকে আপন করে দেখবে। চপলার চাই না এ সংসার, চাই না এ জীবন !···সে সরে গিয়ে বাঁচতে চায় !
চুপি চুপি সরে গেল নিতাই !
বাগ্দী পাড়ায় বেশ একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেছে ! দু'একজন মত্ত অবস্থায় বলাবলি করছে—মেয়ে পুরুষ সকলেই।
—"ওর ছেলে মরবেক নাই তবে মরবেক কে ? পাপের ওর আছে উর ? ধরম যাবেক কুথাকে !
এমন সময় কালীচরণকে ডাক্তার নিয়ে সৌরভীর বাড়ীর দিকে যেতে দেখেই সকলেই সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল ! কেউ বা মদের হাড়িটা লুকোতে যাবে—এক লাথি মেরে চৌচির করে দেয় সেটাকে কালী ! বলে ওঠে, "বিষ খাগে যা— !" সৌরভী আজ বদলে গেছে ! তার ছেলে কি বাঁচবে না ! বিগত জীবনের পাপের জন্যই কি শেষ হয়ে যাবে তার সব কিছু !—না—না !
তাকে নিক ভগবান, তবু তার ওটুকু বেঁচে থাকুক ! কালীর পায়ে মাথা ঠুকতে থাকে—"উকে বাঁচিয়ে দাও দা'ঠাউর ! উত কোন পাপ করে নি !"
কিন্তু বাঁচে না ! মারা গেল ছেলেটা ! বলে কয়ে কোন রকমে টাকার যোগাড় করেও হল না, শ্মশানেও যেতে হল কালীকে!
এই খবরটাই বাড়ীতে পৌছেচে নিতাই-এর মারফৎ ! বামুনের ছেলে গেল কি না জারজ এক বাগ্দীর ছেলের সৎকার করতে ! এই নিয়ে গোলমাল গ্রামে !
বেলা প্রায় চারটা ! সৎকার করে স্নান সেরে বাড়ী ফিরেই ডাক দেয় কালী—"ভাত দাও মা— ?"
"ভাত না ছাই দোব— !"
চারিদিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেয় কালী ! বেশ একটা পর্ব বয়ে গেছে ! উনুনে একরাশ জল ঢালা—তরকারী কোটা পড়ে আছে, চারিদিকে ছড়ান রয়েছে চালগুলো ! একটা থমথমে ভাব বাড়ীতে !
মায়ের কথায় প্রতিবাদ করে না কালী ! এতদিন সহ্য করে মা আর পারে না ! বৌ ও যেমন ছেলেও তেমনি ! শান্তির ছায়া মাত্র নাই সংসারে ! দুবেলা হাড়ি ঠেলতে পারবেন না তিনি ! যাদের কাজ তারা বুঝে নিক—না পারে, ছাই থাক ! মায়ের এ মূর্তির সংগে পরিচিত কালী !
সামনে চপলাকে দেখেই বলে ওঠে কালী, "কি হয়েছে ? কি বলেছ মাকে ?"
আজ যেন তৈরীই হয়ে ছিল চপলা ! সে অন্যায় সহ্য করবে না ! সহ্য করবে না এ অপবাদ যে, কালী তাকে—তার বাবাকে অপমানের হাত হতে বাঁচিয়েছে ! চাই না—চাই না এ ভুয়ো সংসার ! চাই না ভালবাসা—ঘর বাঁধবার মিথ্যা পরিহাস ! সে আজ বাঁচতে চায় ! বাইরের জগতে মানুষের মাঝে মানুষের পরিচয়ে সে বাঁচতে চায় ! পাড়াগাঁয়ের
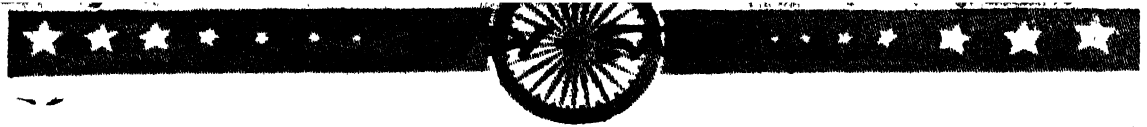
এই পশুর মত জীবনকে সে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে এই নীচ মানুষদিকে।

সারাটা দিন বাইরে বাইরেই কাটিয়েছে কালীচরণ! বাড়ীতে ঝঞ্ঝাট সহ্য হয় না! গানের আড্ডায়—না হয় বাগ্দী পাড়ায় বালক সংগীতের আসরে বসে দাঁড়িয়ে মনটাকে একটু শান্ত করে বাড়ী ফিরছে। সত্যিইত চপলাকে সে বিয়ে করেই এনেছে! কি তাকে দিয়েছে? তার শিক্ষা দীক্ষার কি দাম সে দিয়েছে! আজ তার এ অভিমান অহেতুক নয়!

পূর্ণিমার রাত্রি। একরাশ চামেলি রজনীগন্ধা ফুল নিয়ে কালী বাড়ী ঢোকে! মা শুয়ে পড়েছে! আলো জ্বলছে তাদের ঘরে! নীরবে এগিয়ে যায়! আজ তাদের বিয়ের রাত্রি!

হঠাৎ ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যায়—থমকে দাঁড়াল সে! চপলা সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছে! যাবার আয়োজনও হয়ে গেছে—সে আর থাকতে পারে না এখানে, এ সংসারে।

সব ফুল গুলোই পায়ে দলে পিষে ফেলে কালীচরণ, তার ভালোবাসার এই প্রতিদান! যাক চপলা—আজ কালী তাকে বাধা দেবে না! এক বৎসর আগে যাকে পেয়েছিল আজ তাকে হারাতে হল! কালীর কথায় ফিরে চায় চপলা—

"যদি কোনদিন কোথাও ঠাই না পাও আমার দরজা চিরদিন তোমার জন্য খোলা থাকবে, আসতে সঙ্কোচ করো না! যাবার আগে এই কথাটাই জেনে যাও—অন্যায় করেছি অনেক, কিন্তু আমরা বোকা মানুষ—পাশও করিনি, তাই বলে ভুল বুঝে যেও না।"

কালীর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে! চপলার সময় নাই! রাত্রি শেষেই ট্রেন! সে চলে যাচ্ছে সহরে!

সেখানে বড়দির বাড়ীতেই আশ্রয় নেয় চপলা! দিদি একটু আশ্চর্য হন! কিন্তু বুঝতে পারেন চপলার কথায়, আজ বাইরের জগতে পা বাড়িয়েছে চপলা! বলে সে—"সেখানে থাকতে গেলে এতদিনের শিক্ষা, সংস্কার সব ভুলে তাদের মতই পশুজীবন যাপন করতে পারলাম না বলেই আবার ফিরে এলাম মানুষের জগতে!"

যেমন করে হোক,—চাই কি মিসট্রেস হয়েও জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে সে! হাসেন জামাইবাবু—"বিরহ দুদিন পর মিলন মধুর হ'য়ে যাবে ছোটগিন্নী। লিখে দিই কালীকে আসুক!"

"না না! জামাইবাবু!"

"—না! ছোটগিন্নী—উকিল মানুষ এত বোকা নই! যে'কদিন কাছে পাই লুটে নি—তারপর ত হাতছাড়া হয়ে যাবে—আমরা যে তৃতীয় পুরুষ সেই রয়ে যাব!"

সবহারান জীবনে চপলার একমাত্র সান্ত্বনা দিদির ছোট ছেলে খোকন! তাকে নিয়েই চপলার দিন কাটে, খোকনেরও নোতুন মা না হলে চলেনা একদণ্ড! গানগেয়ে ঘুম পাড়াতে হবে—চপলাকেই!

দিদি, জামাইবাবুর অমতেই সে চাকরি নিল! একটি বিবাহিত মেয়েকে লেখাপড়া—গান শেখাতে হবে! তাঁর স্বামী নাকি প্রফেসর! তিনি চান তার স্ত্রীকে শিক্ষিতা করে তুলতে! প্রথমদিন সাক্ষাতেই ছাত্রী নীলিমা বলে বসে চপলাকে—

"আপনার স্বামী খুব সুখী, নয়—? শিক্ষিতা স্ত্রী পেয়েছেন? আমার স্বামীত বলেন, যার সংগে ঘর করতে হবে সে শিক্ষিতা নাহলে—সংসার বিষিয়ে ওঠে!"

তার কথায় হাসে মলিন ভাবে চপলা!

এত লেখাপড়ার তোড়জোড় কিন্তু কিছুতেই কিছু এগোয়না পড়াশোনার! বাধ্য হয়ে একদিন বলে চপলা,

"কি করছ নীলিমা, পড়বার ইচ্ছা তোমার নাই! তোমার স্বামীইবা কি মনে করবেন?"

"যা করে করুক! তার খেয়াল মেটাতে আমি পারবনা!"

হঠাৎ তার কথায় চমকে ওঠে চপলা! নীলিমাও সারা গা পিঠের কাপড় তুলে দেয়—সর্বাংগ মারের দাগ! মদমত্ত অবস্থায় এঁকে দিয়েছে স্বামী দেবতা তার সারাদেহে প্রীতির চিহ্ন! অবাক হয়ে যায় চপলা।

"তোমার স্বামী কোথাকার প্রফেসর না—?"

"হ্যাঁ; কিন্তু মদ খেলে তাঁর জ্ঞান থাকে না!"

আজ বলে চপলা—"যে শিক্ষা তাঁকে শিক্ষিত পশু করে তুলেছে—সেই শিক্ষায় তোমার দরকার নাই! এই শিক্ষার রীতি-ধারা বদলে ফেলে আমাদের এমনি শিক্ষা চাই, যা
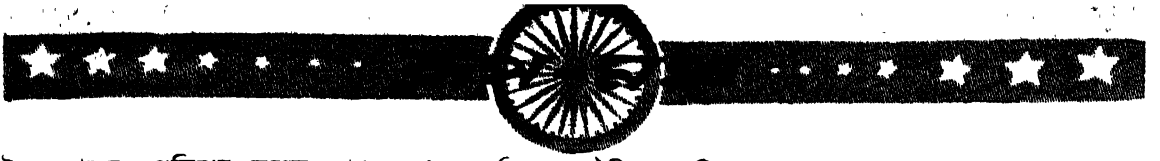
এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখাবে—! এ বিদ্যা নয়—সরস্বতীর অভিশাপ !"

চপলা চলে গেছে ! বাইরের আশ্রমের চত্বরে বাঁধান গাছ ! নীচে বসে রয়েছে কালী ! কি যেন ভাবছে সে ! আজ সে একা। বাইরের ডাক পেয়েছে চপলা। বৃহত্তর জীবনের ইংগিত চলে গেল সে ! তার জীবন কি এই অন্ধকূপেই কাটবে, আসবে নাকি এখানের আলো বাতাসে সেই মহামুক্তির সংকেত ! সারা আশ্রমের কাজ আজ তার কাছে প্রাণহীন বলে বোধ হয়' দূরে দাঁড়িয়ে থাকে বীণা—সে অনুভব করে যেন কোথায় আজ ব্যথা বেজেছে কালীদার।

হঠাৎ বাইরে কাদের কোলাহল শুনে এগিয়ে যায় কালী, ইউনিয়ান বোর্ডের ট্যাক্স আদায় করতে সুরু হয়েছে ! গাঁয়ের চত্বরে জমা করেছে বাগ্দী--কাওরাদের অনেকের রঙচটা-ভাংগা বাক্স—ছেঁড়া কাঁথা—ফাটা কাঁসার থালা—কালো কলসী—এঁড়ে বাছুর ইত্যাদি ! বেচারাদের ওইমাত্র সম্বল। কান্নাকাটি সুরু করেছে তারা, এগিয়ে যায় কালী চরণ ! কালীকে দেখে তারা যেন ভরসা পায় ! একরকম জোর করেই কালী জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া বন্ধ করায় বাগ্দীদের। শাসানি দেয় গদাধর ইউনিয়ান বোর্ডের ট্যাক্স আদায়কারী কেরাণী। রাগের চোটেই তার বিশাল বপু কাঁপতে থাকে—! হাসে কালী,

"ট্যাক্স আদায় করতে হয় যাও বিষ্টু কবরেজ, জগৎ ভটচার্য ওদের ধানের গোলায় ক্রোক করগে, আর রাত বিরোতে যদি দু'এক ঢোকের দরকার হয়—এসো এদের পাড়ায়-তাজা চোরাভাটির মাল পাবে ! ওই, তোরা হাঁ করে কি গাজনের সং দেখছিস নাকি—নিয়ে যা, যার যা আছে !" দেখতে দেখতে সব অস্থাবর ক্রোকের মাল লোপাট হয়ে যায়। শাসাতে শাসাতে বার হয়ে আসে গদাধর,

"সরকারী টাক্স, ছেলেখেলা নয় ! জেলে যেতে হবে জানিস ?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ যাও, খেতে পারেনা এরা দেবে চৌকিদারী ট্যাক্স ! চৌকিদার কি এদের পাহারা দেবে—ছেড়া কাঁথা আর ভাতের হাঁড়ি—?"

"যাও যাও যা পার করগে—!"—কালীর মনে ভয় নাই !

লোচন ঠাকুর আহ্নিক সেরে বাইরে এসেই দেখে ওপাড়ার মুখুয্যে গিন্নী ! একথা সেকথার পর বলে বসেন তিনি—"মেয়েকে একটু নজরে রেখ ঠাকুরপো—মা নাই ওর, সেদিন দেখলাম কালীর সংগে বাগ্দীপাড়ায় ! সোমত্ত মেয়ে—"

কথাটা সমর্থন করে লোচন ! ঠিক কথা ! ওমেয়ের বিয়ে তিনি আসছে অগ্রহায়ণেই দেবেন ! আর কটা মাস ! আসল ভাবনাটা কিন্তু লোচনের—টাকা কোথায় ! আজকাল বীণার সম্বন্ধে শুনছে বটে দু'একটা কথা ! কালীর সংগে মেশা তার বন্ধ করতেই হবে ! সেদিন কমলের দোকানেও কারা যেন বলাবলি করছিল তাকে শুনিয়েই বীণার সম্বন্ধে ! চিন্তার ভারে নুইয়ে পড়ে বুড়ো ! কিষেন ভাবতে ভাবতে বার হয়ে যায়--! জগতের কাছে যদি কিছু টাকার যোগাড় করতে পারে,—তাহলে মেয়েটার বিয়ে যেখানে সেখানে হোক দিতে পারে !

জগৎ টাকা চাওয়া শুনেই অবাক হয়ে যায়—! আমতা আমতা করে লোচন—ঘর দোর সারাতে হবে কিনা টাকার দরকার তাই !

বলে ওঠে নিতাই—"মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেল—তারপর ওখানে তোমার জামাই-ই দালান তুলে দেবে !"

এমনি সময় প্রবেশ করে গদাধর—প্রেসিডেন্টের কাছে কালীর ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে বাধা দেওয়ার কথাটা ! জগৎই প্রেসিডেন্ট। কালী বেআইনী ক্রোকী মাল লুট করিয়েছে !

নিতাই—জগৎ যেন একটা ফাঁক পায় ! দিন দিন কালী যেমন ভাবে ছোট লোক গুলোকে আস্কারা দিয়ে তুলেছে—ভবিষ্যতে, তারাই শত্রু হয়ে দাঁড়াবে ! তার জমিদারী থাকবে না ! খাজনাও পাবেনা ! এর একটা প্রতিবিধান করা দরকার, আজ খানিকটা হাতে পেয়েছে কালীকে, নিতাই যোগন দেয়—"স্বভাব চরিত্তিরও ভাল নয় ছোঁড়ার
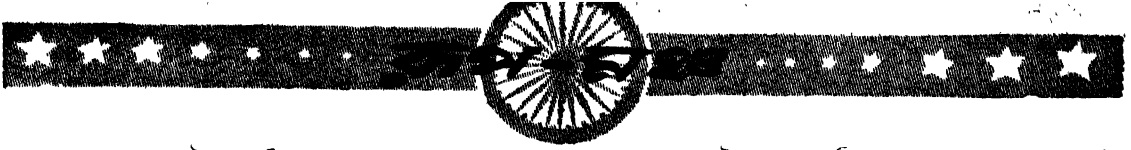
—নাহলে অমন বৌকে তাড়িয়ে দেয়—! লোচন দা তোমার মেয়েকে—"

ভালমানুষ সাজবার ভান করে জগৎ—

—"ওসব বাজে কথা থাক খুড়ো! চোখেত কিছু দেখিনি! ওসব আমি বিশ্বাস করিনা! ছেলেবেলার সংগী—তাই একটু মেলামেশা করে—"

লোচনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে! সর্বত্রই এক কথা! বীণা জাহান্নামে গেছে! আজ লোচন যেন মরিয়া, জানিয়ে দেয় যেমন মেয়ে তেমনি হোক—, যা থাকে তার বরাতে —এই খানেই বিয়ে দেবে লোচন! জগতের সংগে, দেখবে একবার হতভাগা মেয়েকে!

লোচন রেগে বার হয় মেয়ের সন্ধানে বাড়ীর দিকে!

খুসিমনে জগৎও থানায় চৌকিদার পাঠিয়ে কেসটা রিপোর্ট করে দিলে কালীর নামে! বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে কালী।

গ্রীষ্মের খররোদ! চারিদিকে হাহাকার। আকাশের নীলিমায় শকুনের আনাগোনা। চারিদিকে মড়ক সুরু হয়েছে, অভাব-অজন্মা!

বাড়ী ফিরেই বীণাকে না দেখতে পেয়ে আরও চটে যায় লোচন! রান্নাও করেনি আজ! কোথায় যে গেছে! খানিকটা জল খেয়ে গুমহয়ে দাওয়ায় বসে থাকে—আসুক হতভাগা মেয়ে, আজ একটা বোঝাপড়া করবে সে!

রোদের মধ্যে আসছে বাগ্দীপাড়া হতে কালী আর বীণা! দু' একটা কলেরা হতে সুরু হয়েছে—! রতন বাগ্দী মারা গেল আজ।

বীণা বাড়ীতে পা দিতেই বাবার মূর্তি দেখে অবাক হয়ে যায়! সত্যিই তার অন্যায় হয়েছে, বাবার জন্য রান্না না করা! রতনের মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে সরে আসতে পারেনি! কিন্তু লোচন আজ এসব কথা জানতে চায় না! নিজের চোখে আজ দেখেছে কালীর সংগে তার অবাধ মেলামেশা। সে সহ্য করবে না এসব।

বাবার সব বকুনিই নীরবে হজম করে যায় বীণা।

একটু পরেই বীণাকে একথালা ভাত-তরকারী নিয়ে বাড়ী ঢুকতে দেখেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় বুড়ো। জ্যামুক্ত ধনুকের মত বীর বিক্রমে গিয়ে লাথি মেরে থালাটা ফেলে দেয় দূরে। যার জন্য এত বকুনি সেই কালীদের বাড়ী হতে ভাত এনেছে তারই জন্য। ওবাড়ীর ভাত সে মুখে দেবেনা। আর ভুলেও বীণা যদি কোনদিন ও বাড়ীমুখো হয়েছেত কেটেই ফেলবে মেয়েকে। পাশেই বাড়ী, কালীর মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে লোচন—মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ সে করেছে—জগতের সংগেই বিয়ে দেবে মেয়ের।

কথাটা শোনে বীণা। বাবার রুদ্রমূর্তির সামনে বার হতে ভয় হয়। নীরবে বকুনি সহ্য করে চোখের জল মোছে!

কালী কথাটা মায়ের মুখ হতে শুনে আজ অবিশ্বাস করতে পারেনা। লোচন নাকি বীণার বিয়ের ঠিক করেছে জগতের সংগে। খাওয়া দাওয়ার পরই এসে হাজির হয় কালীচরণ—লোচনের বাড়ীতে। মেয়ের সংগে ঝগড়া করে—সবে রাগটা একটু পড়বার মুখে এসেছে এমন সময় আবার কালীর কথাশুনে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে লোচন, হঁ্যা, তার যেখানে খুসি মেয়ের বিয়ে দেবে। লোকের কি?

—"এবিয়ে হবেনা—" বলে কালী।

"জোর?" লোচন রেগে যায়।

—"হঁ্যা—তাইই!"

সামলাতে পারে না লোচন, এতদিন এত অপবাদ কালী আর বীণার নামে শুনেছে সে, কাণ দেয় নি! আজ আর নয়, সমাজে বাস করতে গেলে এ সব সহ্য করা উচিত নয়। নিজের স্ত্রীকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিয়ে কালী পরের মেয়ের পিছনে -

গর্জে ওঠে কালী—"লোচন খুড়ো সামলে কথা বল—!"

"না—না আমি থামব না! বলে দিচ্ছি তোর মত ছেলে যেন আমার বাড়ীর চৌকাঠ না মাড়ায়। কোনদিন যদি আমার বাড়ী আসিস—তুই—তুই বামুনের ছেলে নস!"

গোঁয়ার কালীও থামবার পাত্র নয়। জানিয়ে দিয়ে আসে, তার এখানে না এলেও চলবে! এত নীচ যার মন তার বাড়ীতে পা দিতে কালীর ঘেন্না করে!

বার হয়ে চলে গেল কালী। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা বাবাকে

বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউই থামবার পাত্র নয় রাগে কাঁপছে লোচন ঠাকুর!

সারা গ্রামে—আশ পাশের গ্রামান্তরে লেগেছে মন্বন্তরের ছোঁয়া! চলিষ্ণু রণকঙ্কালে ছেয়ে গেল পথ, অনেকেই চলে গেছে বাইরে, অন্নের আশায়। বাগ্দী পাড়া, ভল্লা পাড়া সবই খালি! সৌরভী আজকাল পাগল হয়ে গেছে। পথে পথে ঘুরে বেড়ায় সে! জগৎ ভটচায়ের উপর কেমন যেন ওর একটা বিজাতীয় আক্রোশ!

সারা গ্রামের ছোট লোকেরা জমা হয়েছে, হয় তাদের কায চাই, না হলে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে 'এরোড্রোমে' জনমজুরী খাটতে! বাঁচতে হবে তাদিকে! কালীচরণ পারে না আর! শেষ চেষ্টা! তাদিকে নিয়ে এগিয়ে চলে জগৎ ভটচার্যের কাছারী বাড়ীর দিকে। সে ইচ্ছা করলে এদিকে কাজ করতে পারে, খেতে দিতে পারে। আশার বুক বেঁধে চলে তারা।

কাছারীর প্রাংগনে লোকের ভিড় দেখে জগৎ একটু ভয় পেয়ে যায়। যা দিনকাল, এতলোক লুটপাট করে নিয়ে যাবে নাকি। ঘরের মধ্যে বসেছিলেন দারোগাবাবু। তিনিও বার হয়ে আসেন! সেইদিন চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের ক্রোক করা মাল লুট করিয়ে দেবার জন্য কালীর কাছে তদন্তে এসেছেন! তিনিও তাড়াবার চেষ্টা করেন ক্ষুধিত জনতাকে—ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে কালীচরণ। তাকেই খুঁজছিলেন দারোগাবাবু।

সেদিনকার ব্যাপারটার সংগে আজকের এই হাংগামাটা যোগ করে বেশ একটু শাসানি দেবার চেষ্টা করে দারোগা বাবু। এসব বেআইনী কাজ—লোক খ্যাপান! শেষকালে কি জেলে যাবে কালীচরণ!

আজ কালীচরণ তাও পারে। এত লোকের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দেবার অপরাধে যদি কালীকে জেলেই যেতে হয় —তাও সে পারে। এরা খেতে পাক—বাঁচুক! তারাই প্রতিশোধ নেবে কালীর প্রতি অবিচারের! জগৎ দেবে না কিছুই! ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বার হয়ে আসে কালী। তবুও সে থামবে না,—কাগজে কাগজে বার হয়েছে দুর্ভিক্ষের সংবাদ! সদর কংগ্রেস অপিসে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করবে—যদি রিলিফের কোন ব্যবস্থা হয়!

বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে নীলিমার ব্যবহারে! আর সে নীরবে সহ্য করে না সব অপমান অত্যাচার। স্বামী-দেবতা বিস্মিত হয়ে যান—'শিক্ষার গুণ ধরেছে দেখছি —মাষ্টারণীকে তোমার একবার দেখতে হবে—"

দেখা হয়ে যায়—। সেদিন একটা রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে! সহরের উকিল-প্রফেসার মহলের উদ্যোগে মহাসমারোহেই সম্পন্ন হল সে উৎসব! গান গাইতে হ'ল চপলাকেও! হঠাৎ নীলিমার স্বামীর সংগে পরিচিত হতে গিয়েই বিস্মিত হয়ে যায় চপলা—এযে সমীরণ! তার বহু পুরানো বন্ধু। একদিন ওর সংগেই তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—বিয়ের আসরেই তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ তার উপর কোন মোহ নাই চপলার! অন্তর দিয়ে ঘৃণাই করে সমীরণের প্রকৃত স্বরূপকে! চোখের সামনে ভেসে আসে নীলিমার উপর অত্যাচারের কাহিনী। ঘৃণায় মন ভরে ওঠে। এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে সমীরণকে!

কিন্তু সমীরণ ছাড়বার পাত্র নয়। আজ সে আবার যেন পেতে চায় চপলাকে ফিরে। এই নির্লজ্জ পশুর মত ব্যবহারটা আজ নীলিমার চোখে বিষদৃশ ঠেকে!

আগেই বার হয়ে চলে গেছে চপলা! সমীরণের বেহায়াপণা দেখে উপস্থিত দু'একজনও ব্যাপারটা অনুভব করে। মুখ টিপে হাসি চাপবার চেষ্টা করে। সহরের কংগ্রেস অপিস হতে বার হয়ে রোদের মধ্যে চলেছে কালীচরণ। মনে তার আশার আলো। রিলিফ ক্যাম্প খোলা হচ্ছে! ওরা ঘরছাড়া হয়ে অনাহারে শুকিয়ে মরবে না—বাঁচতে পারবে!

হঠাৎ পথে কাকে দেখেই থমকে দাঁড়ায়—চপলাও চিনতে পারে নি কালীকে! খদ্দরের পোষাকে দীর্ঘ ঋজু দেহ মানিয়েছে বেশ, মাথায় একটা ক্যাপ! "তুমি"—থমকে দাঁড়ায় চপলা! কি যেন বলতে গিয়ে পারে না। কালীও কেমন তৈরী ছিলনা এর জন্য! সেও কোন রকমে পার হয়ে যেতে চায়!
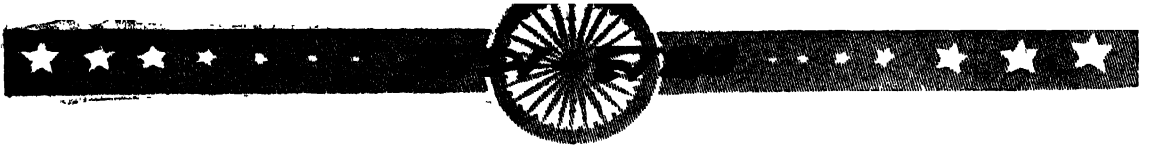
"একটু কাজ ছিল সহরে—তাই এসেছিলাম! নানা হাংগামা একা আর পেরে উঠছি না!—আচ্ছা—চলি।"

দ্রুতপদে চলে গেল কালী! স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে চপলা!…হঠাৎ সামনেই একজন পুলিশ অফিসার কে আসতে দেখে ফিরে চায়—। সেই দারোগা! আজকাল কালীর গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে।—"এদিকে খদ্দরের পোষাক পরা গান্ধী ক্যাপ মাথায় কাউকে যেতে দেখেছেন?—"

"কাকে?"

"আবার কাকে—? দেশের লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন যারা! স্বাধীনতা আসবে তৈরী হও—তাদের পাণ্ডাদের!" কথাটা শোনে চপলা! দেখিয়ে দেয়, হ্যাঁ সে অমনি পোষাকে যেতে দেখেছে একজনকে! তবে ওই দিকে—এদিকে নয়! কালীর গতিপথের বিপরীত দিকটাই দেখিয়ে দেয় তাকে!

সে রাত্রে মিটিং হতে বাড়ী গিয়ে সমীরণ নীলিমার কথায় ধৈর্যহারা হয়ে যায়। স্ত্রীর কোন কথাই সে সহ্য করবে না! কোন কৈফিয়ৎ সে দেবে না! এ অপমান নীলিমা ও নীরবে সহ্য করে না, —তার যদি কোন দাবীই না থাকে স্বামীর উপর, কি দরকার স্বামীস্ত্রীর ভূমিকায় মূক অভিনয় করে! কথাকাটাকাটির পর আজ শেষ পন্থাই গ্রহণ করে নীলিমা! এই অপমানের মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে সে বাবার ওখানেই চলে যাবে!

যাক। সমীরণ আজ জীবন হ'তে নীলিমাকে সরিয়েই দিতে চায়! হারাণ চপলাকে ফিরে পেতে চায় সে আপনার করে। নীলিমা তার জীবনে কোথাও ঠাঁই পাই নি!… কি দরকার তাকে?

গ্রামের মন্বন্তর আজ বাড়তির পথে! বেশ ছড়িয়ে পড়েছে কলেরা! কালীর সময় নাই। ধানের মাঠে সবুজের দোলা—ওরা আর কটা মাস কি বাঁচবে না। দেখবে না সোনার ফসলের অমলিন হাসি! দিনরাত গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরছে কালী রিলিফের ডাক্তারকে নিয়ে!

সেদিন সৌরভী মারা গেল—! জগতের দরজার কাছে পড়ে আছে পাগলের মৃতদেহ! তবুও একমুঠো ভাত সে চায়নি কারুর কাছে।

বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে শোনে কালী, লোচনেরও নাকি কলেরা হয়েছে। তাকে দেখবার জন্য ছটফট করছে! যদি যায় কালী।…কিন্তু কালী যাবে না!—না। সেদিন বাবা হয়ে নিজের মেয়ের নামে যে অপবাদ দিয়েছিল তার পর তার বাড়ী যাবার প্রবৃত্তি কালীর নাই। তবু মনে পড়ে একজনের কথা—সে বীণা! সে ত কোন দোষই করেনি! যাবে না যাবে তাই ভাবতে ভাবতে লোচনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে—!

বাড়ীর মধ্যে জগৎ ভটচায, বিষ্টু কবরেজ সকলেই মাতব্বরী করছে! কালী জগতের চাকর লবকেষ্টকে কুড়ুল কাঁধে বার হয়ে আসতে দেখেই প্রশ্ন করে—কেমন আছে রে বুড়ো?

বলে লবা—"আর কেমন? ভটচায কর্ত্তা বললেন, লবা বেশ পোক্ত দেখে ঝাড় থেকে দুটো কাঁচা বাঁশ কেটে আন! বুঝে নাও কেমন আছেন! আহা মেয়েটা কাঁদছে গো! কর্ত্তা কত বলছেন কেঁদনি, কেঁদনি, কাঁদতে নাই! ওরে, বাবা কেঁদে ভাসিয়ে দিলে গো!"

এরপর আর দাড়াল না কালী। জগতের হাতে নীরবে বুড়োকে মরতে দিতে রাজী নয় সে! নিজেই ডাক্তার নিয়ে হাজির হয় লোচনের বাড়ীতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। জগৎও তার অধিকারে কালীকে হাত দিতে দেখে চটে ওঠে! কালী থামবার পাত্র নয়! শুনিয়ে দেয়, "বিয়ে করবার জন্য মানুষ খুনও করতে পার দেখছি।… ভয় আমাকে দেখিয়ো না! নিতাইকে দেখিয়ো!"

"আচ্ছা—"শাসিয়ে গেল জগৎ! লোচন মারা গেছে! একা বাড়ীতে বীণা!

জগতের কাছারিতে গ্রামের লোকের সামনে এই কথাটাই সকলকে বুঝিয়ে দিতে চায় জগৎ যে,মৃত্যুকালে সে লোচনকে কথা দিয়ে বসেছে তার মেয়ের সব ভার সে নেবে! তাই ঝঞ্ঝাট! না হলে কে যেত শুকনো দায়ে। তাই সে বীণাকে এখন বাড়ীতে রাখতে চায়।

কিন্তু তা হয় না। লবকেষ্ট খবর দেয় হাঁফাতে হাঁফাতে
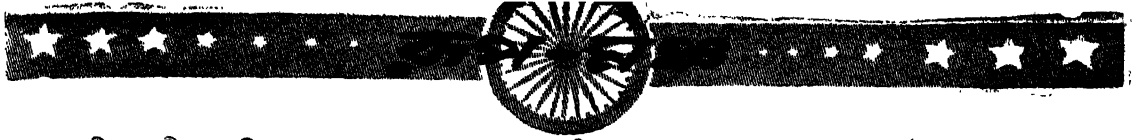
এসে—কালীর মা বীণাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকে বড্ড ভয় করে লব—তাই খবরটা দিতে এসেছে কত্তাকে। জগৎ বার হয়ে গেল নিতাই এর সংগে!

কিন্তু কালীর মাকে থামান যায় না। তিনি গ্রামের লোকের সব অপবাদ সহ্য করেও নিয়ে যেতে চান বীণাকে। এতটুকু হতে ওর মা মারা যাবার পর হতে মানুষ করছেন বীণাকে! আজ এই বিপদের দিনে ফেলে যেতে পারবেন না। জগৎ বাধা দিতেই শুনিয়ে দেন কালীর মা তাকে।

"—ছেলের আবার বিয়ে দোব আমি! তাই বীণাকে নিয়ে যাচ্ছি!"

মনের রাগ চেপে জ্বলতে জ্বলতে ব্যর্থ আক্রোশে ফিরে আসে জগৎ! গ্রামের সকলের মধ্যেই কথাটা রটে যায়। কালীর আবার বিয়ে হচ্ছে—ওই লোচনের মেয়ে বীণার সংগে—!

কথাটা মায়ের মুখ হতে শুনেই কালী প্রতিবাদ করে ওঠে! এবিয়ে কিছুতেই হবে না, বিয়ে আর সে করবে না। সংসার তার জন্য নয়! সে বাইরের কাজেই ফিরে পেয়েছে আপনার সত্বাকে। একজনকে ভালবেসে থামতে সে পারেনি-তাইত ভালবেসেছে গ্রামকে—দেশকে! গ্রামের মাটি আর তার সর্বহারা জনগণকে! আজ সে ঘর বাঁধতে চায় না!

মাকে শুনিয়ে দেয়—বেশ থাক বীণা বাড়ীতে বোনের মত। কালীই তাকে ভাল জায়গায় ভাল বরে বিয়ে দেবে! মা এ প্রস্তাবে জ্বলে ওঠেন! এখানে বিয়ে না হলে কোথাও বিয়ে হবে না বীণার!···সারা গ্রামের লোককে বড় মুখ করে শুনিয়ে এসেছেন তিনি কালীর সংগেই বীণার বিয়ে দেবেন, জগৎও জেনেছে কথাটা—আর আজ কালী মাকে এত বড় অপমান করতে পারবে—মা তা ভাবেননি! আর 'না' বলবার উপায় নাই! এবিয়ে হতেই হবে!

মায়ে ছেলেতে বেশ একচোট মনোমালিন্য সুরু হয়! মা গুম হয়ে বসে থাকেন! কালীও একতাল ঝগড়া করে বার হয়ে যায় তার আশ্রমের কাজে!

বীণা লক্ষ্য করে মায়ে ছেলের এই গোলমাল! তাকে কেন্দ্র করেই তাদের সংসারে এ অশান্তি!···আজ সে ভাবে কালীদার কথা। সারা গ্রাম গ্রামান্তরের কথা। সর্বহারা জনগণের মুক্তি আন্দোলনে সে আজ নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই মহাব্রতে এগিয়ে দিয়ে গেছে চপলা—তার পথ ছেড়ে দিয়ে। আবার তাকে কেন ঘরের মায়ায় বাধবে বীণা, নিজের সামান্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য! কালীদা তার ব্রত নিয়েই থাকুক। নিজের জীবনে তার যে দুর্ভোগ আসে আসুক সর্বহারাদের ভালবাসে এমন একটি লোককে সে ওদের হাত হতে ছিনিয়ে একমাত্র আপনার করে নিতে পারবে না! এত স্বার্থপর সে নয়।

বরং অন্য পথে গেলে সে অর্থ, ধান, টাকাকড়ি দিয়েও সাহায্য করতে পারবে কালীদার সম্ভ্রমকে—তার প্রচেষ্টাকে। জগতেরও টাকা-পয়সা-ধান অনেক!···

কালী রাত্রে ঘুমুতে পারে না। হঠাৎ ভোরের দিকে কাকে বার হয়ে যেতে দেখেই উঠে পড়ে। বীণা চলে যাচ্ছে। কিছুতেই তাকে থামাতে পারল না কালী!

ব্যর্থমনোরথ হয়ে থেমে গেল সে। কালীর মনে জাগে কথাটা—কালী তাকে প্রত্যাখান করেছে—সেই অভিমানেই চ'লে গেল বীণা। আজ অনুভব করে কালী—ওরা যেন নিজের স্বার্থটাই দেখল—কালীর অন্তরের কথা কি কেউই বুঝল না। ভালবাসতে গিয়েছিল একজনকে—সে চপলা। কিন্তু রুঢ় আঘাত পেয়েই ফিরে এসেছিল কালী—তার ভালবাসা বিলিয়ে দিয়েছে তাই সর্বহারাদের মাঝে—,আর কখনও একজনকে ঘিরে নীড় রচনা করতে সে পারবে না!—সেই না পাওয়ার অভিমানেই চলে গেল আজ বীণা। যাক—সবাই যাক! তার এ কঠিন পথে সে একাই চলবে—কাউকে পাশে চায় না।

লবা বাড়ী পাহারা দিচ্ছিল রাত্রে! একটা সাদা শাড়ীপরা মূর্ত্তিকে রাতের আঁধারে আসতে দেখে ভুত মনে করে বুকে থুথু লেপে 'বু বু'করে কাঁপতে থাকে। জগৎ বার হয়ে এসে বীণাকে আসতে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায়। লবকেষ্ট জিব বের করে লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে
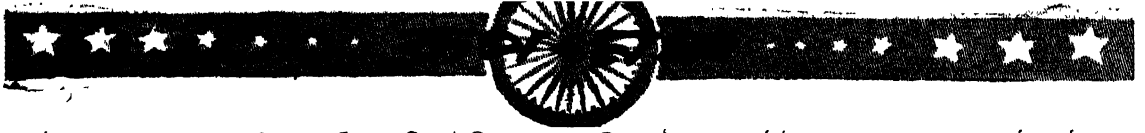
ওঠে—"আপনি—। ভেবেছিলাম বুঝি পেত্নী টেত্নী হবে!" ধমকে ওঠে জগৎ।

পাড়ার নবীন প্রবীণ সকলেই জেনে যায় কথাটা। কালীর মায়ের মুরোদ কতখানি তা তারা জানে। এইবার মানে মানে বিয়েটা হয়ে গেলেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে অধিষ্ঠান হয়। কথাগুলো শোনে মাত্র বীণা। তার মুখের হাসি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেকি কালীদাকে ফেলে এসে অন্যায়ই ক'রেছে। বোনের দাবীতে কি থাকতে পারত না সেখানে তার কাজের মধ্যে।

কেউ কেউ পরামর্শ দেয় জগৎকে—, কালীকে ভুলতে পারেনি বাবা। ওটাকে বেশ একটু শিখিয়ে দাও। যদি পাকে প্রকারন্তে গাঁ ছাড়া করতে পার—। হাসে জগৎ —"কি বলেন খুড়ো—গ্রামের লোককে গ্রামছাড়া করব আমি! অন্যায় আমার দ্বারা কোনকালে হবে না।"

কালী যেন আবার একটা আঘাত পেয়েছে কোথায়। নীরবে বসে আছে। রিলিফ ক্যাম্পের অপিস—তার আশ্রম পুলিশ সার্চ করছে। অদূরে দাঁড়িয়ে মা। কালী কোন কথা কয় না। নীরবে দেখে মাত্র। আশ্রমের খাতাপত্র-জিনিষগুলো নাড়াচাড়া করে পুলিশ। দু'একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বার হয়ে যাবার সময় কালীকে সাবধান করে যায়— "ভবিষ্যৎএর জন্য সাবধান থাকবেন—।"

"না হলে?"

জানিয়ে দেন দারোগাবাবু—"দেশময় শান্তি নষ্ট করার অপরাধে আমরা শাস্তি দিতে বাধ্য হব।"

বলে ওঠে কালী—"যারা দেশের শ্রী সম্পদ লুটে পুটে নিয়ে গেল, অস্থাবর ক্রোক করে মুখের গ্রাস, জমির ধান যারা ছিনিয়ে নিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেল শত শত গরীব চাষীকে—তাদের কি শাস্তি দিয়েছেন আপনারা —?"

—"কালীবাবু।"—

কালীচরণ থামেনা—"আপনাদের কাজ সারা হয়েছে, এখন আসতে পারেন।"

চিন্তিতভাবে পায়চারী করে কালী। সে থামবে না কিছুতেই,—ধান উঠবার সময় হয়েছে। মাঠে মাঠে পাকা ধান। এই সময়ে এই কথাটাই জানিয়ে দিতে হবে সবাইকে—আর যেন মন্বন্তর না হয়। নিজের খাবার ধান আগে রাখবে তারপর জমিদারের খাজনা—, না থাকলে দেবে না। তবু শুকিয়ে যেন তারা না মরে।

এই কথাটাই গ্রাম গ্রামান্তরে তার কর্মীদের প্রচার করতে হবে। নিজেই বার হয়ে যাবে—দিন দুপুরে গ্রাম গ্রামান্তরের জনতা চাষীর সামনে এই সত্যই জানিয়ে দেবে তাদের, জমি যারা চাষ করে জমি তাদেরই। গোলায় ধান তুলে দিয়ে শুকিয়ে যেন আর তারা না মরে। মন্বন্তর যেন আর না হয়। দেশের শ্রী সম্পদ ফিরে আসুক।

সেই অপরাধে যদি কালীর কোন শাস্তি হয়, কালী মাথা পেতে তাই বরণ করে নেবে।

কালীর অবসর নাই। দিনরাত সে বাইরে বাইরেই ঘোরে। মা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বীণা চেষ্টা করেও দেখা করতে পারে না কালীদার। কালীই তাকে এড়িয়ে পথ চলে। একি শাস্তি কালীদা তাকে দিচ্ছে। নীরবে চোখের জল মোছে বীণা।...

জগৎও বিয়ের সব আয়োজন করে বসেছে। স্বর্ণকার গহনা এনে ফেলেছে। কিন্তু চারিদিকে বেশ একটা বিদ্রোহের সুর জেগে উঠেছে। প্রায়ই কোন না কোন পাইক পেয়াদা খাজনা আদায় করতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছে। সেদিন লবকেষ্ট খাজনার তাগাদা দিতে গিয়ে কি তম্বি হাম্বি করেছে—গ্রামের লোক তাকে ধরে ডোবার জলে চুবিয়ে কালো করে ছেড়ে দিয়েছে। কেউ খাজনা দেবে না, আগে নিজেদের বৎসরের খোরাক রাখবে তারপর থাকে—দেবে খাজনা! সমস্তই কালীর চক্রান্ত: সেই ক্ষেপিয়ে তুলেছে ওদের!...থানায় আনাগোনা বেড়ে গেছে জগতের। দারোগাবাবুও অভয় দেন—"স্বদেশীগিরি আর চলবে না জগৎবাবু, দুটো দিন সবুর করুন। সব ঠিক করে দিচ্ছি।—"

জগতের পুকুরের বড় মাছটার দিকে চেয়ে মনে মনে কত ওজন হবে ঠিক করতে থাকেন দারোগাবাবু।

চপলার সহরের জীবন বিষিয়ে উঠেছে। গ্রহ জুটেছে সমীরণ। বেশী করে অবাধ মেলামেশা করবার জন্যই সে তার স্ত্রী নীলিমাকে বাবার ওখানে যেতে বাধ্য করিয়েছে। কিন্তু চপলা তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টাই করে। সমীরণও পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। তাদের সম্বন্ধেও অনেক কথা চপলার দিদি কমলার কানে আসে— সন্তোষবাবুও বার লাইব্রেরীতে বসে দু'একটা কথা শোনেন।

কমলা বেশ একটু চটে উঠেছে চপলার উপর! স্বামীর ঘর ছেড়ে বাইরে এসে এসব নোংরামি কেন? তাকেও সমাজে বাস করতে হয়—এসব সহ্য করা চলে না।

চপলাও অনুভব করে বাড়ীতে একটা পরিবর্তন। চারিদিক হতে আসে তার প্রতি অবজ্ঞা। দিদি বেশ একটু বদলে গেছে। তাকে কথায় কথায় এই কথাটাই জানিয়ে দেয় দিদি—স্বামীর ঘর ছেড়ে এমন কলঙ্কময় জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুই ভাল।

খোকনকেও আর কাছে আসতে দেয় না দিদি। খোকন আসবার জন্য কাদলেই সুরু হয় তার উপরই প্রহার— "হতভাগা ছেলে, মা পেয়েছে। নোতুন মা?"

খোকনের কান্না শুনে এগিয়ে যাবে তার মুখের উপর গেল দরজাটা বন্ধ হয়ে। সন্তোষবাবুও কথাবার্তা গল্পসল্প করেন না।

নদীর ধারে চুপ করে বসে ভাবে চপলা। যাবে সে কোথায়? আজকের জীবন ত সে চায়নি। সামনে সমীরণকে দেখেই উঠে আসবার চেষ্টা করে।...বাধা দেয় সমীর— জানিয়ে দিতে চায় সে—

তারা আবার ঘর বাঁধবে—বিবাহিত জীবনে তাদের কেউই সুখী নয়।

ঘৃণা করে এ প্রস্তাবে চপলা। অন্তর বিষিয়ে উঠেছে সমীরের নীচতায়। তাব জীবনত ব্যর্থ করেই দিয়েছে— আর একটি নারীর জীবন বিষিয়ে দিয়ে এসেছে আবার চপলাকে প্রেম জানাতে। আর যেন কোনদিন এমনি করে চপলার পথে না আসে সমীরণ। সে ঘৃণা করে তাকে। রাস্তার কুকুরের মত ঘৃণা করে।

...সন্ধ্যার পর চপলাকে বাড়ী ঢুকতে দেখে দিদি বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলে—"সারা রাত টা বাইরে কাটালেই পারতে। বাকীত রইল না কিছু।"

সন্তোষবাবু স্ত্রীকে থামাতে আসেন। বাধা দেয় কমলা— বাইরে কান পাতা দায়, তার বাড়ীতে থেকে এসব কেলেঙ্কারী চলবে না। হয় এ বাড়ী থেকে চলে যাক চপলা।

নীরবে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে চপলা। দু'চোখে আসে জল। মিথ্যা অপবাদে তার জীবন বিষিয়ে দিল এরা। ঘৃণা ধরে গেছে এই সভ্য জীবনের উপর।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠে ফিরে চাইল চপলা। মদমত্ত অবস্থায় প্রবেশ করছে সমীরণ। চপলার হাতখানা সে ধরে ফেলতেই এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে সবশক্তি একত্রিত করে সজোরে বসিয়ে দেয় চপলা সমীরণের গালে এক চড়।... বলে ওঠে

—"বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বলছি।"

কোন রকমে টলতে টলতে বার হয়ে গেল সমীরণ। কান্নায় ভেংগে পড়ে চপলা!

মদমত্ত অবস্থায় তারই বাড়ী হতে বার হয়ে যাচ্ছে সমীরণ, এ দৃশ্যটা উপর হতে কমলা ও সন্তোষবাবুর নজর এড়ায় না।

আজ কমলা কোন বাধাই মানে না। বোনকে শুনিয়ে দেয়, এসব এখানে চলবে না। ঢের হয়েছে, চপলা যেন আজই তার বাড়ী হতে চলে যায়।

বাইরেই বার হয়ে আসে চপলা, অন্ধকার রাত্রে বাড়ী ছেড়ে আবার বার হ'ল পথে। কোথায় যাবে জানে না। ষ্টেশনে এসে প্রথম গাড়ীতেই বার হয়ে যায় সহর হতে। চলেছে সে—গন্তব্যস্থল তার জানে না—। জানে না—এ পথের শেষ কোথায়?

হকারের হাত হ'তে কাগজখানা নিয়েই চমকে ওঠে। মস্ত বড করে ছাপা হয়েছে গোপালপুর অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের কথা। তাদের জননেতা কালীচরণের ছবিটা ছাপা হয়েছে। আজ তিনিই সম্মেলনের প্রধান বক্তা।

মনে পড়ে যায়, চপলার সেদিন সহরের রাস্তায় তাকে

দেখেছিল এমনি বেশেই। তার স্বামী আজ দেশবরেণ্য—একজনকে ভালবাসতে সে এসেছিল…কিন্তু সেদিন চপলাই তাকে ত্যাগ করে এসেছে। আজ যেন তার কাছে ক্ষমা পেতে চায় সারা মন।…

গাড়ীতে উঠেছে দূর দূরান্তরের চাষীরা। সকলের মুখে একই কথা। কালীচরণের মিটিং শুনতে চলেছে তারা। আজ সকলেই তাঁকে চেনে, শ্রদ্ধা করে।…ভালবাসে। ওদের কথার মাঝে নীরবে এককোণে বসে থাকে চপলা।…

জগতের বাড়ীতে নহবৎ বসেছে। বিয়ের দিন, মহাসমারোহ। রুদ্ধ দ্বার কক্ষে দারোগাবাবুর সংগে কি বলাবলি করছে জগৎ। অনেক কনেষ্টবল—পুলিশ—লাঠি—বন্দুক এসেছে। বাইরের উঠানে লাঠি খেলছে লবকেষ্ট খুব কসরৎ করে। সাজসাজ রব পড়ে গেছে।

বীণা লবার কাছে ব্যাপারটা টের পায়। আজকের কালীদাদের মিটিং বন্ধ করার এসব আয়োজন। জগতের গোলায় এবার ধান আসেনি। খাজনা বন্ধ করেছে প্রজারা, বিদ্রোহের আয়োজন। কালী তারই নেতা—তাই তাকে সম্বর্ধনার এ বিশেষ আয়োজন। তারই নামে ওয়ারেন্ট—বেআইনী সভা করার অপরাধ। কথাটা শুনেই বার হয়ে যায় বীণা।—কালীদাকে থামাতে হবে।

গ্রাম গ্রামান্তরের চাষীরা সকলেরই মুখে মিটিংএর কথা। যে যার কাজ ফেলে রেখে এসেছে— আজ তারাও চায়, যেন সে ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না হয়। এক ছটাক ধানও তারা দেবে না।

মাঠটা ভরে গেছে লোকে। ষ্টেশন হতে লোক বার হয়ে আসছে মিটিংএর মাঠের দিকে। জনতার সংগে মন্ত্রমুগ্ধেরই মত বার হয়ে আসছে চপলাও। সেও যে এইখানেই নেমেছে।

বীণা আজ কালীদাকে থামাতে পারে না—। এগিয়ে চলে তারা। মিটিং বন্ধ করবে না সে। যে শাস্তি হয় হোক। এই সান্ত্বনা থাকবে তার, ওদের মাঝে জ্বেলেছে প্রাণের আগুণ। ওরা আর বিনা প্রতিবাদে না খেয়ে মরবে না, ওদের ঘুম সে ভাঙ্গিয়েছে। মানুষের দাবীতে তারাও বাঁচবে। কারা প্রাচীরের অন্তরাল হতে এই কথাটা ভেবেও সান্ত্বনা পাবে কালী।

মিটিং শুরু হয়েছে। সকলেই শুনে যায় কালীর কথাগুলো। জমি তাদেরই, যারা জমির মাটিতে সুখ দুঃখের মাঝে দিন কাটায়—যারা তার বুকে ফসল ফলায়—জমি তাদেরই।

মিটিং বন্ধ করতে হবে। পুলিশ লাঠি চালাবার উপক্রম করে—। জনতা যেন উন্মত্ত হয়ে গেছে। তারা থামবে না। মঞ্চ হতে কালীকে জোর করে নামিয়ে তাকে এ্যারেষ্ট করা হ'ল। যাবার আগেও কালী জনতাকে এই কথাটাই জানিয়ে দিতে চায়।

"তাদের দাবী যেন তারা জানাতে না থামে। তাদিকেও বাঁচতে হবে। দুবেলা পেট পুরে খেয়ে পড়ে—বাঁচতে হবে।"

চলে যাচ্ছে কালী, হঠাৎ মঞ্চের উপর হতে কার তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে যায় কালী। চপলা উঠে আসে মঞ্চের ওপর। সমবেত জনতা তেজদৃপ্ত নারীর দিকে চেয়ে থাকে।

"—আমার স্বামীকে তোমরা কিছুদিনের জন্য তোমাদের মধ্যে পাবে না, তবুও নেতা তৈরী হবে তোমাদেরই মাঝে, বাঁচবার জন্য যারা সংগ্রাম করে তাদেরই মধ্যে। তোমাদের মুখের গ্রাস যারা ছিনিয়ে নিয়ে মরণের মুখে ঠেলে দিল, তাদিকে কোনদিনই ক্ষমা করো না—তাদের সংগে কোন দিনই কোন আপোস সম্ভব হবে না।"

জনতার মাঝে দেখা দেয় উন্মাদনার সাড়া। পুলিশ লাঠি চার্জ করছে। তবু তারা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যাবে গ্রামের মধ্যে।

দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালীচরণ। আজ সে বন্দী। হোক বন্দী। তবু সে আজ জিতেছে। পুলিশ জনতাকে পথ দিতে বাধ্য হয়েছে।

হঠাৎ কাকে প্রণাম করতে দেখেই চমকে সরে যায়। চপলা। সে আবার আজ ফিরে এসেছে।

"যে শিক্ষা আমাদিকে বাঁচবার সাধনা করতে শেখাবে সেই শিক্ষার জন্যই আবার ফিরে এলাম তোমার কাছে - তোমার কাজে।"

বীণা আজ বৌদিকে পেয়ে সেও যেন মহা আশ্রয় পেয়ে গেল। আজ সে কাজের মধ্যেই জীবন কাটাতে পারবে।

জনতা এগিয়ে গেল—পুরোভাগে চলেছে চপলা—বীণা···। ওদের চলার সুর বাজে—কালীর হাতে বাজে শিকলের ঝনঝনা।···মায়ের চোখে জল। মলিনভাবে হাসে কালীচরণ।—

"—কেঁদোনা মা, কত মায়ের চোখের জল মোছাতে যদি তোমার চোখের জল নিঃশেষ হয়ে যায়—তবুও সার্থক হবে সে। যারা সামনে তোমার—তাদেরই মধ্যেই রইলাম আমি—, সেইখানেই খুঁজো আমাকে—পাবে।"

"চলুন ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব"—যাত্রা করে কালী।

কারাগারের প্রসার বেড়ে গেল। কালীর হ'ল ঠাই। তবু বদ্ধ দেওয়ালের মাঝে—শিকলের ঝনঝনায় শোনে কালী জনতার সাড়া—এগিয়ে চলার সুর।

দুঃখের অমানিশা শেষ হতে আর কত দেরী—। কবে আসবে রাত্রির তোরণ দ্বারে সূর্যসারথির বিজয় রথের চক্রনির্ঘোষ।

লীলাময়ী পিকচার্সের 'দেবদূত' চিত্রের একটী দৃশ্যে অজন্তা কর, অভি ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

গল্প হলেও মিথ্যে নয়

প্রদ্যোত মিত্র

"রূপ-মঞ্চে"র প্রথম দিন থেকেই রূপ-মঞ্চর সংগে জড়িত। বর্তমানে 'যুগান্তর' পত্রিকার সংবাদ-বিভাগে কাজ করছেন এবং সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও গল্প সাহিত্যে এঁর ভাষার স্বচ্ছতা বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়েই দেখা দিয়েছে। চলচ্চিত্র জগতের সংগেও এঁর নিবিড় যোগ রয়েছে। একাধিক চিত্রে সহকারী পরিচালক রূপে কাজ করেছেন। 'শান্তি সাধনায় মহাত্মা গান্ধী' এই খণ্ড চিত্রখানি এঁরই অবদান।

গিয়েছিলাম বৌদির বাপের-বাড়ী। চমৎকার জায়গা সুখচর গংগার ধার ঘেঁষা পরিচ্ছন্ন বাড়ীটি বড় বেশী আকর্ষণ করে আমাকে। অবশ্য, তার চেয়েও কড়া আকর্ষণের বস্তু সেখানে আছে; কিন্তু সে কথা থাক।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরছিলাম সহজ পথে, আম-বাগানের ভেতর দিয়ে। বাগানটা অবশ্য নিছক আমের নয়,—অনেক রকম গাছই সেখানে আছে,—তবু তার নাম আমবাগান। ভাবলাম, গেঁয়ো মিউনিসিপ্যালিটির আধপাকা সড়কের চেয়ে ওই দুপুর রোদে ছায়ায় ছায়ায় যাওয়াই ভাল। আসলে, মন তখন চাচ্ছিল, একাকীত্ব। মনের ওই অবস্থায় দরকারও ছিল খানিক নিঃসংগতার; নিজের সংগে বোঝা-পড়ার।

নিজের মনে এগিয়ে গিয়েছি কতক দূর। হঠাৎ চমক ভাংগল বামাকণ্ঠের আহ্বানে।

"শুনুন—"

প্রথমটা অবশ্য খেয়ালই করিনি। তারপর, আর একটা ডাকে চারিদিক তাকাতে লাগলাম, কে ডাকছে এই ভর-দুপুরে আমবাগানের ভেতর? অকারণ পুলকে বুকটাও দুরু দুরু ক'রে উঠ্‌ল একটু। মেয়েটি আবার ডাকল—

"শুনুন—তাকান এদিকে—"

এইবার ওপর দিকে তাকিয়েই কিন্তু বিস্ময়ে পাথর হ'য়ে গেলাম। অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপারইত' জীবনে প্রত্যক্ষ ক'রেছি কিন্তু জামরুল গাছের আগডালে একটি ফ্যাসান-দুরস্ত আধুনিক তরুণীকে দেখতে পাব, এমন কথা জীবনে কল্পনাও কারান।

মেয়েটি ব'লল, "দেখুন, নামতে পারছিনা ওপর থেকে, একটু নামিয়ে দেবেন?"

আগে যে-ভাবে বুঁদ হ'য়েছিলাম, হঠাৎ সেটা কেটে গিয়ে কেমন যেন মজা দেখার বাসনা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। বললাম, "উঠলেন কেমন ক'রে?"

"ডালের ওপর ডালে পা দিয়ে আস্তে আস্তে বেয়ে বেয়ে—"

"তবে নেমে আসুন না সেইভাবে?"

মেয়েটি এইবার একটু চ'টে উঠল। ব'লল, "আপনার মাথা খারাপ নাকি? তাই যদি পারব, তবে আর ডাকব কেন আপনাকে?"

তার কথাটা খুব ভাল লাগল না। চ'টতে আমিও পারি; বিশেষতঃ সুবিধাটা যখন হাতের মুঠোয়। তবু হেসে ফেললাম। ব'ললাম, "তবে কিছুক্ষণ ওখানে ব'সে থাকুন; আমি আস্‌ছি।"

আঁৎকে উঠ্‌ল মেয়েটি। "কোথায়? কোথায় যাবেন?"

হাসিমুখেই ব'ললাম, "কেন, গাঁয়ের ভেতর?"

"কি হবে সেখানে গিয়ে?"

"লোকজন ডেকে আনি—নামাতে হবে ত' আপনাকে?"

মেয়েটি যেন মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ল এবার। ব'লল, "কেন, আপনি পারবেন না? চেহারাটাত বেশ নাদুস-নদুস—"

নাঃ, রাগ ক'রব না মেয়েটির ওপর। রাগ ক'রলেই মজা ক'মে যায়। চলে যাওয়ার অভিনয় ক'রে নির্বিকারভাবে ব'ললাম, "তবে অন্ততঃ মই নিয়ে আসি একটা?"

"মই?" মেয়েটি যেন উৎসাহিত হ'ল। ব'লল, "কত সময় লাগবে?"

"—এই ঘণ্টাখানেক—"

"এ-ক-ঘ-ণ্টা!" এইবার মুষড়ে প'ড়ল মেয়েটি। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার ডাকল, "শুনুন—"

ফিরে এলাম। "বলুন-"

আর একটু ভেবে নিয়ে মেয়েটি ব'লল, "এক কাজ করুণ না তার চেয়ে—"

"কি কাজ, বলুন—"

"মাটি থেকে খুবত' উঁচু নয় এখানটা? আমি বরং লাফিয়ে পড়ি। ধরতে পারবেন না আপনি আমাকে?"

ঘটনার কল্পনাতেই মনটা কেমন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কি ব'লব তাকে? কি উত্তর দেব? হঠাৎ সংস্কারবশেই মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে পড়'ল, "কিন্তু লোকে দেখলে বলবে কি?"

ও এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল সে কথা। ব'লল, "কে দেখতে আসছে এই বনের ভেতর?"

কথাটার ইংগিত যেন গূঢ়। এবার আর নিরস্ত করতে পারলাম না নিজেকে। বোধ হয় একটু ব্যস্তভাবেই ব'ললাম, "বেশ, তবে আসুন"

কাপড়-চোপড় একটু সামলে নিতে লাগল মেয়েটা। আমিও পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে তৈরী হ'য়ে নিলাম নীচে।

লাফ দেবার আগে শরীরটা একটু দুলিয়ে নিয়েই কিন্তু মেয়েটি থেমে গেল। ব'লল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান। জামরুল ছিঁড়ে নি' ক'টা।"

এইবার চোখে প'ড়ল, কোন ফাঁদে পা' দিয়ে বিপদে পড়েছে ও। দেখলাম, থোলো থোলো রসে বোঝাই জামরুল যেন আলো ক'রে রেখেছে গাছটা। মেয়েটা সেগুলো ছেড়ে আর টপাটপ জামার বুকে রাখে। এমন সুপক্ক জামরুল রসের লোভে আমার রসনাও কেমন চুল বুলিয়ে উঠ্‌ল। ব'ললাম, "নীচে ফেলুন না দু'-একটা।"

মেয়েটি ব'লল, "দাঁড়ান, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সবই কি আর আমি খাব?"

ব'ললাম, "দেরী সইছেনা আমার।"

ও ব'লল, "দাঁড়ান। এই হয়ে গিয়েছে আমার।"

মাথার কাছের শেষ থলেটি বুকে রেখে ও এইবার সত্যিই তৈরী হ'য়ে নিল। ব'লল, "রেডি—ঠিক হ'য়ে দাঁড়ান—হাত দু'টো এগিয়ে দিন সামনের দিকে—হ্যাঁ—ওয়ান-টু-থ্রি—"

ও সত্যিই লাফ দিল। ওর দেহের ভার আমি সইতে পারলাম না—দু'জনেই লুটিয়ে প'ড়লাম মাটিতে,—ও আমার বুকের ওপর।

স্বীকার করছি, এই সময়টা আমার জ্ঞান ছিল না। যৌবনোন্মেষের পর থেকে নারী স্পর্শের শুধু কল্পনাই ক'রে এসেছি; আজ এতকাল পরে এমন আচম্বিতে পরিপূর্ণ-যৌবনা রমণীর নিষ্ঠুর পেষণে সম্বিত যদি হারিয়ে থাকি সেই অনাস্বাদিত সুখ আর অপার্থিব উত্তেজনায় যদি কিছুক্ষণের জন্যে মর্তের মাটির সংশ্রবহীন হ'য়েই থাকি,—সে-কথা অস্বীকার ক'রব না।

প্রথমে ও উঠ্‌ল। গায়ের ধুলো ঝেড়ে, কাপড় ঠিক করে নিয়ে আমাকে টেনে তুলল মাটি থেকে। ব'লল, "খুব লেগেছে?"

কথা ব'লতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল না একেবারে। ঘাড় নেড়ে জানালাম, "না।"

"দেখুন ত' কি করেছেন আপনি—"

আমি আবার কি ক'রলাম! তাকিয়ে দেখলাম, ওর ব্লাউজের সামনের দিকটা ভিজে গিয়েছে একেবারে।

ও ব'লল, "এমন জোরে চেপে ধরেছিলেন আপনি, সব জামরুলগুলো চটকে দিয়েছেন একেবারে।"—ব'লে, বুকের ভেতর হাত পুরে জামরুলগুলো বের ক'রতে লাগল ও!

দু'টো চ'টকানো জামরুল আমার হাতে দিয়ে ব'লল, "নিন খান। বড় যে লোভ হচ্ছিল তখন?"

খাওয়া আর কথা দুইই আমার তখন বন্ধ। কস্তুরী-হরিণের মত মন আমার কিসের সৌরভে যেন আকুল হ'য়ে উঠেছে। স্বর্গের ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছি আমি; পার্থিব ভাষা আর খাওয়া দুইই তখন মনে হচ্ছে অতিশয় স্থূল।

ও জিজ্ঞাসা ক'রল, "কোথায় যাবেন?"

"ষ্টেশন—সোদপুর। সেখানথেকে ক'লকাতা।"

"সোদপুর ষ্টেশনে যাবেন? যাক্‌। বাঁচা গেল।"

ওর দিকে তাকালাম। চোখ দিয়ে জানতে চাইলাম,
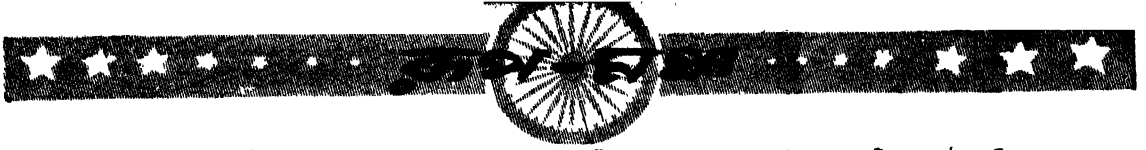
সোদপুর যাওয়ার ভেতর কি এমন ব্যাপার আছে, যা'তে কিনা ও বেঁচে যেতে পারে?

উত্তরও ও দিল। চুপ ক'রে মুখ বুঁজে থাকবার মেয়ে ও নয়। শুধু আমার জিজ্ঞাসার উত্তরই নয়; আগাগোড়া গোটা ইতিহাসটাই বলে গেল।

ও ব'লল: দল বেঁধে আউটিং-এ এসেছিল ওরা। মাঝে মাঝে প্রায়ই এমনি যখন যেখানে খুসী যায়। গ্রামের ধুলো-বাতাস লাগায় গায়ে। আজ সকালেই ওরা এসেছিল সোদপুর, সেখান থেকে সোজা পশ্চিমে সুখচর। সুখচরে গঙ্গায় গিয়ে ওরা নৌকো ক'রে ঘুরল অনেকক্ষণ, টিফিন কেরিয়ারের খাবার শেষ ক'রল দশটায়, তারপর নৌকাতেই ষ্টোভ জ্বালিয়ে বার চারেক চা খেল। কিন্তু গঙ্গার জ'লো হাওয়ায় খিদেটা বোধ হয় বেশী হয়,—তাই শেষ পর্যন্ত ভরা দুপুরেই ওরা নেমে পড়েছে নৌকা থেকে।

পথ দিয়ে ওরা লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলছিল। ও পেছিয়ে পড়েছিল অনেকটা তারপর পাকা জামরুলের ফাঁদে পা—আর তারও পরের ব্যাপার? সেত আমিই ভাল জানি। ওর সংগীরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা ক'রছে এতক্ষণ,—দেরী ক'রে ক'বে হয়ত' হতাশ হ'য়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত—

ওর একতরফা কথার স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা পার হ'য়ে এলাম খাদি আশ্রম। একখানা লোক্যাল ট্রেণের ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। ওকে দূর থেকে দেখেই একদল ছেলে মেয়ে ছুটতে লাগল ওর দিকে। এরই ফাঁকে ও ব'লল, "যাক, এত আলাপ হ'ল আপনার সংগে অথচ, নামটাই জানা হ'লো না এতক্ষণ। কি নাম আপনার?

"প্রশান্ত।"

"প্রশান্ত? আমার নাম মালবিকা।"

ওর সংগীরা এসে প্রায় জড়িয়ে ধ'রল ওকে। তাকিয়ে দেখলাম, আমার চেয়ে ওদের পার্থক্য অনেক সুদূর;—একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সম্পদ আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য যেন উপচিয়ে প'ড়ছে ওদের হাসি আর কথা বেয়ে। মেয়েদের বহুমূল্য শাড়ীর প্রান্তদেশ লুটাচ্ছে মাটিতে, ছেলেদের কোঁচার খুঁট ঝাট দিয়ে চলেছে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। ওরা বুঝি পরীর দেশের সেই স্বপ্নে দেখা ছেলে-মেয়ে।

আমাকে ওরা লক্ষ্যই করেনি'—দরকারও হয়নি' কিছু। মালবিকাকে নিয়েই ওরা ব্যস্ত; ও যেন ওদের কাছে হারিয়ে-যাওয়া মাণিক।

মালবিকাকে ওরা জিজ্ঞাসা ক'রল, "কোথায় গিয়েছিলে মালি?...উবে গিয়েছিলে নাকি?...আমরাও খুঁজে খুঁজে হয়রাণ...শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, হয়ত' সারপ্রাইজ দেবে একটা..."

মালবিকা ব'লল, "না ভাই, বহুদিন পরে এই এক পুরণো বন্ধুর সংগে দেখা কিনা—"

আমার দিকে ইংগিত ক'রল সে। সংগে সংগে সকলেরই দৃষ্টি প'ড়ল আমার দিকে আর, সকলের কথা কেমন যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আমি নেহাৎই বে-মানান ওদের ভেতর।

একটি প্রিয়দর্শন ছেলে মালবিকাকে জিজ্ঞাসা ক'রল, "কে ইনি?"

মালবিকা ব'লল, "এঁর নাম প্রশান্ত হালদার; আর প্রশান্তবাবু, ইনি হচ্ছেন—"

"যাক, পরিচয়টা ট্রেণেই হবে"—মাঝপথে থামিয়ে দিল আর একটি মেয়ে। ব'লল, "ক'লকাতায় যাবেন ত' আপনি? তবে পরেই আলাপ করা যাবে; ট্রেণ এসে প'ড়ল এদিকে—"

ষ্টেশনে পৌছবার প্রায় পরমুহূর্তেই ট্রেণখানা প্লাটফর্মে লাগল। ওরা দলবেঁধে উঠ্‌ল একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায়। ইতস্ততঃ ক'রতে লাগলাম ঢুকব কিনা ওই গাড়ীতে। আমার কাছে যে-রিটার্ণ টিকিট, সেত থার্ড ক্লাসের—।

কিন্তু ভাববার ফুরসুৎ ওরা দিল না। একরকম জোর করেই টেনে নিল তাদের গাড়ীতে। ঘণ্টা দিয়ে গাড়ী ছাড়ল। যে-মেয়েটি মালবিকাকে থামিয়ে দিয়েছিল, সেই এবার ব'লল, "হ্যাঁ, কি ব'লছিলে মালী? এইবার আলাপ করিয়ে দাও সবার সাথে।"

মালবিকা হাসল। ব'লল, "নিজের পরিচয়টা দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছিস বুঝি?"

মেয়েটি কিন্তু লজ্জিত হ'লনা। ব'লল, "জানিসত' চির-দিনই এক্সিবিশনিষ্ঠ আমি। তাইত' বারে বারে দর্শকের সামনে ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়াই।"

মালবিকা ব'লল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনুন প্রশান্তবাবু ইনি হ'চ্ছেন বিখ্যাত প্রাচ্য নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী বন্দনা সেন। আর বন্দনা, ইনি হ'চ্ছেন সেই বহু-নিন্দিত বিপ্লবী কবি প্রশান্ত হালদার।"

আশ্চর্য! কে সেই বহুনিন্দিত বিপ্লবী কবি আর কে প্রশান্ত হালদার তাই আমার জানা নাই আর, আমার নামের সংগে বে-মালুম একটা হালদার জুটিয়ে মালবিকা আমাকে চালিয়ে দিল সেই লোক ব'লে?

আমায় নিয়ে এ কি নিষ্ঠুর খেলা আরম্ভ ক'রেছে মালবিকা? আগের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায় নাকি ও?

ওরা কিন্তু উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল বিশেষ রকম। সকলে সমস্বরে সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ইনি? ইনিই প্রশান্ত হালদার?"

বন্দনা ব'লল, "কিন্তু আপনার লেখার সংগে আপনার চেহারার কোন মিলই নাই প্রশান্তবাবু।"

"তাতে কি। লেখাটা চেহারা থেকে আসে না—আসে মন থেকে।"—ব'লল একটি ছেলে।

হাজার গ্রেণ কুইনাইন খাওয়ার ক্রিয়া দেখা দিল আমার সর্বশরীরে। কান ভোঁ ভোঁ ক'রতে লাগল, চোখে যেন স'রষের ফুল দেখতে লাগলাম। সামান্য বিদ্যে-বুদ্ধির অতি সাধারণ মানুষ আমি কি দরকার ছিল ওই উচ্চস্তরের মেয়ের সংগে ইয়ার্কি দেওয়ার? কি ক'রব ভাবছি। ভাবতে ভাবতেও কিছুটা সময় কেটে গেল। ওরা সবাই মিলে নানা এলো-পাথাড়ি কথা ব'লে যাচ্ছে আর আমি নিজের অজ্ঞাতেই হুঁ হাঁ ক'রে যাচ্ছি।

যখন খেয়াল হ'ল, নিজেই চ'মকে উঠ্‌লাম। এ কোন ফাঁদে পা দিয়েছি আমি। দুর্বলতার বশে মিথ্যা পরিচয়ের যে গুরু বোঝা কাঁধে নিয়েছি, তার হাত থেকে যে এখন নিষ্কৃতি পাওয়ারও কোন উপায় নাই। মোহে পড়ে কেন পা দিয়েছি এই ফাঁদে, সুরুতেই কেন ওদের ধরিয়ে দি' নাই মালবিকার মিথ্যাচারিতা। অন্ততঃ এই দুর্লভ মানুষগুলোর সঙ্গলাভের মোহও যদি দমন ক'রতাম তখন। কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নাই। ভাবলাম, এই দুঃসহ মিথ্যার হাত থেকে কিছুক্ষণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেও বাথরুমে খানিকটা সময় নষ্ট করে আসি।

মালতিকার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে দিব্বি নির্লিপ্তভাবে মৃদু মৃদু হাসছে।

হঠাৎ মনটাকে শক্ত ক'রে ফেললাম। যাই থাক কপালে প্রকাশ ক'রে দেই কথাটা।

কি দিয়ে সুরু ক'রব ভাবছি, দেখি গাড়ীর গতি ধীরে ধীরে মন্থর হ'য়ে এল। দমদম ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল গাড়ী।

গাড়ীর গতির সংগে সংগে সঙ্কল্পের দৃঢ়তাও শ্লথ হ'য়ে এল অনেকটা। ভাবলাম, কি দরকার। মিথ্যা হ'লেও কয়েক মিনিটের জন্যে যে সম্মান পেয়েছি তা' নষ্ট করে কি লাভ? তার চেয়ে নেমে যাই এই দমদম ষ্টেশনেই। এখান থেকে বাসে ক'রে ফিরব ক'লকাতা।

কিন্তু অবাক হ'লাম যখন দেখলাম, গাড়ী আবার চ'লতে সুরু করেছে। মালবিকার মোহময় আকর্ষণী শক্তির কাছে আমি সম্পূর্ণ পরাস্ত। তার একটু নিকট সান্নিধ্যের জন্যে পৃথিবীর সব অপমান সব গ্লানিই বুঝি আমি তুচ্ছ ক'রতে পারি।

এতক্ষণ হুঁ হাঁ ক'রেই কেটেছে কিন্তু এইবার একটা শক্ত প্রশ্ন ক'রল একটি ছেলে। ব'লল, "দেখুন, দুনিয়ার কাগজ আপনাকে গালাগালি দেয়; তা দিক। তারা মানব মনের বাসনা-কামনার কথা স্পষ্ট ক'রে শুনতে ভয় পায় তাই নানাভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিকৃত ক'রে সে-সব শুনতে চায়। তাদের কথা আমরা বুঝি কিন্তু আপনিওত' সাহিত্যে অশ্লীলবাদ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কখনও স্পষ্ট ক'রে বলেন নি'। আমরা চাই, আপনার দর্শন আপনি এই সব মূর্খদের ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিন।"

উত্তর দেব কি? প্রায় হাঁপিয়ে উঠ্‌লাম এতসব বড় বড় কথা শুনে। এসব কথা যে শুনিওনি' কখনও।

কিন্তু বড় লক্ষ্মী মেয়ে বন্দনা। ছোকরাটির উৎসাহ থামিয়ে দিল সে। ব'লল, "সে-সব একদিন আমাদের পূর্ণিমা সম্মেলনে আলোচনা হবে অমিত। কিন্তু মিঃ হালদার, একটা কথা বলি। কিছু মনে করবেন না ত'?"

বুকটার মধ্যে ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল। কি ব'লতে চায় ও? ধরে ফেলেনিত' সব?

ও কিন্তু অনুমতির অপেক্ষা ক'রল না। ব'লল, "আচ্ছা, আপনি নিশ্চয় খুব বোহেমিয়ন। না?"

যাক্। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ব'ললাম, "কেন বলুন ত'?"

"না, এমনি। আপনার সুখচর বেড়াতে আসা—কাপড়-চোপড়ে একটা কেয়ারলেস ভাব এইসব দেখে কথাটা মনে হ'ল আর কি। ভাবের ঘোরে কখন কোথাও নিশ্চয় মাটিতে শুয়ে ছিলেন, টেরও পাননি' পিঠের দিকের অবস্থা কি। লেখক বা শিল্পীদের বোধহয় এই রকমই হয়।"

এতক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি। মালবিকাকে নিয়ে সেই যে মাটির ওপর পড়ে গিয়েছিলাম, তারপর পৃষ্ঠদেশের চেহারা হয়েছে বিচিত্র। মালবিকা আমার বুকের ওপর ছিল, তাই তার কোন ক্ষতি হয়নি' আর ব্লাউসের ভিজে জামরুলের দাগ ত' সে কাপড় দিয়েই ঢেকে রেখেছে। তবু ব্যাপারটা উপলক্ষে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আবার দুষ্টুবুদ্ধি খেলল মাথায়। মালবিকাকে আবার জব্দ ক'রবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

মালবিকার দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে ব'ললাম, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা বড়ই মজার"—তাকিয়ে দেখলাম, এবার মালবিকা চুপসে যাচ্ছে। আর একটু রসিয়ে ব'ললাম, "সত্যি, যে অবস্থায় মাটিতে শুতে হ'য়েছিল, সে-অবস্থায় মানুষের কিছু মনে থাকে না; অন্ততঃ থাকবার কথা নয়—"

আশ্চর্য। এবার কিন্তু মালবিকা হাসল। মনে মনে নিজেই একটু ঘাবড়ে গেলাম। মেয়েটা আবার কি দুষ্টুবুদ্ধি খেলচ্ছে মাথায়, কে জানে!

সুতরাং, আর বেশী খেলাবার চেষ্টা না ক'রে এবার সোজা-সুজিই অস্ত্র প্রয়োগ ক'রলাম। মালবিকার দিকেই তাকিয়ে ব'ললাম, "বলুন না; আপনিই বলুন না তখন অবস্থাটা কি।"

ব'লেই কিন্তু রুদ্ধ ক'রলাম সর্ব ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি। এবার কি উত্তর দেয় মালবিকা, কে জানে!

মালবিকা কিন্তু তেমনি স্থির। অকম্প্র গলায় সে ব'লল, "সে-সব কাহিনী একদিন সবিস্তারে বলা যাবে বন্দনার পূর্ণিমা সম্মেলনে। কিন্তু বহু জন্ম পরে আপনার সংগে দেখা; এতক্ষণ কোন খবরই যে নেওয়া হয় নাই আপনার। কি রকম চ'লছে আপনার ব্যবসা?"

যেন বোমা ফাটল হৃৎপিণ্ডের ভিতর। মেয়েটা জানে নাকি সব? আগে থাকতেই ও চিনত নাকি আমাকে! তাই কি ওর এত সাহস, এত দম্ভ? কিংবা কে জানে, হয়ত' এ'ও ওর আর এক নতুন খেলা। সর্বশান্ত জুয়াড়ীর মত আন্দাজে চাল দিয়েছে আর একটা। ও জানে, সাহিত্যিক আর ব্যবসাদারের স্বাভাবগত পার্থক্য কত দূর। তাই, এক খেয়ালে যেমন ও আমাকে বসিয়েছিল সম্মানের সিংহাসনে, তেমনি আর এক চালে সে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে চায় সেই তাসের ঘর।

কিন্তু আমার অপরিসীম মায়া সেই ক্ষণভংগুর তাসের ঘরের ওপর তাই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চাইলাম তাকে। চোখ-কান বুঁজে ব'লেই ফেললাম, "ব্যবসাটাত' আমাদের নয়; আমাদের এক আত্মীয়ের।"

তার চোখের দিকে তাকাবার আর সাহস হ'ল না। বাইরের দিকে চাইলাম। আঃ! ট্রেণখানা শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। অন্ততঃ তখনকার মত ভাবলাম, এবার প্রথম সুযোগেই বেঁচে দেব দোকানটা।

গাড়ী থামবার পর ওরা চাকরের মাথায় মোট-ঘাট চাপিয়ে রওনা হ'ল গেটের দিকে। গেটের বাইরে গিয়ে বন্দনা ব'লল, "কোথায় যাবেন? কোথায় থাকেন আপনি?"

ভাবলাম, নাঃ। আর সত্যি কথা ব'লব না। শেষ মুহূর্তেও মিথ্যা ধাপ্পা দিয়ে যেমন ক'রে জিতে গেল মালবিকা, তাতে সত্য বস্তুটার ওপরই বিতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছে সারা মন। যদি যাই পশ্চিমে ব'লব, উত্তর। ব'লেও ফেললাম, "থাকি শ্যামবাজার। এখানে এক বন্ধুর মেস হ'য়ে তারপর ফিরব বাড়ীতে।"

মনে মনে ভয়ও ছিল। যেমন গায়ে-পড়া মেয়ে বন্দনা হয়ত
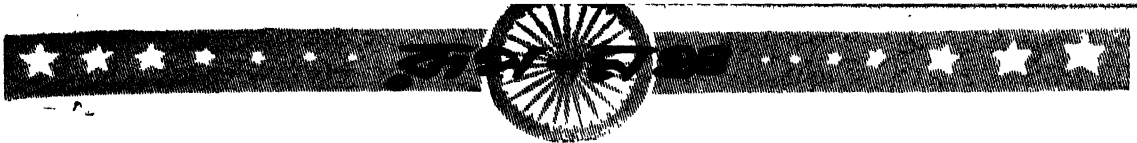
আবার পৌঁছেই দিতে চাইবে আমাকে। সত্যি কথা ব'লতে কি, ক'লকাতার এই বিখ্যাত বাজারের ওপর আমার বাসস্থানের পাশাপাশি ওদের কল্পনা ক'রতেও বাধে।

"আচ্ছা, তবে আসি। মনে রাখবেন কিন্তু আমাদের।" ব'লে হাততুলে বিদায় অভিনন্দন জানাল বন্দনা।

ওরা ট্যাক্সিতে ওঠ্‌বার আগে মালবিকা একটু পাশে টেনে নিল আমাকে। অনুতপ্ত ভংগীতে ব'লল, "কিছু মনে ক'রবেন না প্রশান্তবাবু। আজকের দিনের সুরুটা যাই হোক, সমাপনটা কিন্তু ঠিক মধুরেণ হ'ল না। যাবেন একদিন আমাদের ওখানে।"

ছেলেমেয়েরা দুইদলে ভাগ হ'য়ে ট্যাক্সিতে উঠেছে ততক্ষণে; মালবিকাও সেদিকে চ'লল। তারপর, কি ভেবে যেন হঠাৎ ফিরে এসে ব'লল, "আপনি ঠিকানা জানেন নাত' আমাদের? লিখে নিন—টু-বি, লাভলক্ প্লেস্। বাড়ীর নাম "আলেয়া।"

ও গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠ্‌ল।

* * *

বলা বাহুল্য, কোনদিন খুঁজে পাই নাই মালবিকার ঠিকানা। আজও কোলে বিল্ডিং-এর ভাংগা খাটে শুয়ে তার কথা ভাবতে ভাবতে মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের ভেতরটা। অবসর সময় কড়িকাঠ গুণতে গুণতে রোমন্থন করি সেই সুখস্মৃতি।

শহীদ ক্ষুদিরাম

(নাটক)

নরেশ চক্রবর্তী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাট্য-প্রতিভা নিয়ে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন, অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। বেতার ও রেখা-নাট্যে এঁর বহু নাটক রূপায়িত হ'য়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রূপ-মঞ্চের সম্পাদকীয় বিভাগের ইনি অন্যতম সভ্য। 'শহীদ ক্ষুদিরাম' "রূপ-মঞ্চে"র পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিশেষভাবে রচনা করেছেন। আশা করি 'শহীদ ক্ষুদিরাম' পাঠকসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করবে। মেগাফোন প্রতিষ্ঠান শহীদ ক্ষুদিরামকে রেখা-নাট্যে রূপায়িত করে তুলছেন।

সূত্রধার :—মেদিনীপুর জেলার মৌবনি গ্রাম—১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর—জন্ম নিল ক্ষুদিরাম। বয়স যখন তার ছ' বছর পিতা ত্রৈলক্যবাবু, মাতা লক্ষ্মীদেবী গেলেন মারা। বড়দিদি অপরূপা দেবী নিয়ে এলেন তাকে মেদিনীপুর শহরে—মাণিকপুরের বাসায়—। জজ-কোর্টের বড়বাবু ভগ্নিপতি অমৃতবাবুর বাসায় থেকে টাউন স্কুলে পড়তে লাগল ক্ষুদিরাম—কিন্তু পড়াতে কি তার মন ছিল? দেশে ইংরাজ শাসন সে সহ্য করতে পারল না—! ১৯০৫ সাল হ'তে বাঙ্গালায় আরম্ভ হ'লো বঙ্গভংগ আন্দোলন—নগরে নগরে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হলো—মৃত্যুকে ভয় করেনা এমন ছেলেরা এগিয়ে এল—বিপ্লবীদের দলে—সারা বাংলায় সুরু হলো ইংরাজের দমন নীতি—দাবানল জ্বলে উঠল বাংলাদেশে ব্রিটিশ বয়কটের। মেদিনীপুরে লাগল' এর হাওয়া। ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিল—বিলিতি জিনিষের বয়কট অভিযান করল সুরু। সরকারী চাকুরে ভগ্নিপতি অমৃতবাবু—চাকরির ভয়ে হয়ে উঠলেন অস্থির—স্বদেশী ক্ষুদিরাম বুঝি তার চাকরির মাথাটি খায়—স্ত্রী অপরূপা দেবীকে—তিনি রেগে জিজ্ঞাসা ক'রেন—কি জিজ্ঞাসা করেন—?

অমৃতবাবু? বলি হ্যাঁগো—কোথায় গেলে—বলি শুনছ!

অপরূপা। কি হয়েছে, চেঁচাচ্ছ কেন?

অমৃতবাবু। চেঁচাচ্ছ কেন মানে?

অপরূপা। তা কি হয়েছে বলবে না, কি?

অমৃতবাবু। কি হয়নি তাই বলো? তোমরা দু' ভাই-বোনে আমাকে পাগল না ক'রে কি ছাড়বে না?

অপরূপা। আমিত' তোমার কোন কথাই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

অমৃতবাবু। তা পারবে কেন? গুণধর ভাইটি দিন দিন যা হয়েছেন, তাতে আর আমার চাকরি করে খেতে হবেনা। ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে, না হয় যেতে হবে জেলে।

অপরূপা। কেন ক্ষুদিরাম তোমার কি ক'রেছে।

অমৃতবাবু। যেমন স্বদেশী তোমার ভায়ারাম হয়ে উঠেছেন, তাতে আর সরকারী চাকরি আমায় করতে হবে না। জজ সাহেবের কেরাণী আমি, আমার একটা মান, পজিসান আছেত?

অপরূপা। তা মান পজিসান তোমার গেল কিসে?

অমৃতবাবু। অত স্বদেশী ক্ষুদিরামকে যদি করতেই হয়, তাহলে এ বাড়ীতে তার আর থাকা চলবে না। এর একটা ব্যবস্থা ক'রে তবে আমার অন্য কাজ। দেশ উদ্ধার করবেন, বিলিতি জিনিষ বয়কট করবেন—আরে মশাই, লোকের নালিশের পর নালিশ। তারপর বড় সাহেব স্পষ্ট-ই বলে দিলেন—'স্থাখ' অমৃত, তোমার শ্যালকটিকে সায়েস্তা কর, নচেৎ তোমার চাকরি নিয়ে টান্ পাড়া পাড়ি হবে। বাবু গেলেন কোথায়? এতটুকু একটা পুচকে ছোড়া, তিনি করবেন দেশ উদ্ধার—হ্যাঁ— যত্তসব।
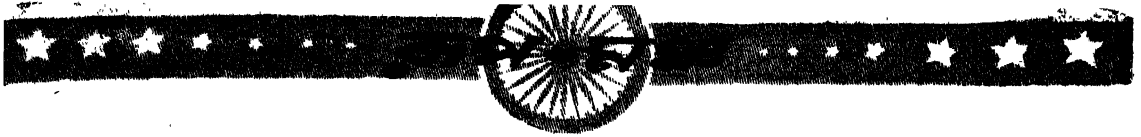
অপরূপা। সে স্নান করতে গেছে—খেয়েদেয়ে নিক—তারপর যা হয় বুঝিয়ে বলো।

অমৃতবাবু। বলি, কত আর বোঝাব ঠাকরুণ। এমন ক'রে বিপদগ্রস্ত না করলেই কি তার চলে না। আর এই যদি তার করতে হয়—তাহ'লে এ বাড়ীতে আর তাকে থাকতে আমি দেব' না।

অপরূপা। আচ্ছা সে যা হয় পরে হবে, এখনি সে ভাত খেতে আস্‌বে।

অমৃতবাবু। আসুক না—স্পষ্ট, সত্য কথা বলব', তার আবার ভয় কি? দস্যি গিরি ক'রে বেড়াবেন—আর তার রসদ যোগাব আমি? শেষ পর্যন্ত চাকরিটার পর্যন্ত গায়ে হাত পড়তে বসেছে!

অপরূপা। আচ্ছা, আমি তাকে বুঝিয়ে বলে দেব'। এ বাড়ীতে তুমি তাকে থাকতে দেবে না, এমন কথা তুমি বল্‌লে কি ক'রে? আমি তার মা নই বটে, তবে সেই ছোট ক্ষুদিরাম, মা-হারা ক্ষুদিরাম—যাকে ক্ষুদ দিয়ে আমিই নিজের ছেলের মত কিনে নিয়েছিলাম—মার কাছ থেকে।

অমৃতবাবু। খুব হয়েছে ঠাকরুণ, খুব হয়েছে। নিজের যদি ভাল চাও তবে ও পাপ এখান থেকে বিদেয় কর—বুঝেছ পাপ বিদেয় কর। তারপর বলি, কিশোরীর বাড়ীতে ওর যাতায়াত কেন? দশজনে তের কথা বলে—তাও কি তুমি শোন নি?

অপরূপা। ছি ছি ছি, তোমরা কি মানুষ? কিশোরীকে ও দিদি বলে। কিশোরী ওকে ছোটভাই এর মতই ভালবাসে। তোমরা না জান—আমিত' জানি।

অমৃতবাবু। ছাই জান—. নিজের চক্ষে লোকে দেখেছে—কিশোরীর সংগে ও ফষ্টিনষ্টি ক'রে।

অপরূপা। তুমি চুপ কর—বাজে কথা বলোনা। লোকের কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে ঘাটিও না। কে কি রকম লোক আমার জানা আছে।

নেপথ্যে—কে যেন ডাকিল } অমৃতবাবু বাড়ীতে আছেন?

অমৃতবাবু। কে? যাচ্ছি—(প্রস্থান)

নেপথ্যে—ক্ষুদিরাম } বড়দি, আমি স্নান ক'রে এসেছি ভাত দাও।

অপরূপা। তুই আয়, আমি আসন ক'রেছি, ভাত আনছি।

(অপরূপা ঘরের মধ্যে প্রস্থান করিল)

ক্ষুদিরাম। (প্রবেশ) কই কোথায় আসন করলে—? এখানে? দাও। (বসিল)

[এমন সময়ে অমৃতবাবু হন্তদন্ত হয়ে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং আসিয়া ক্ষুদিরামের কান ধরিলেন]

অমৃতবাবু। আর ভাত খেতে হবে না, পাজি হতভাগা, আমাকে অপদস্ত না করলে তোমার কি চলেই না? মহাদেবের নুনের বস্তা কেন ছড়িয়ে দিয়েছিস পথে?

ক্ষুদিরাম। (রাগে ফুলিয়া, হাত দিয়া অমৃতবাবুর হাত সরাইয়া দিয়া) বেশ করেছি—ও বিলিতি নুন বেচ্‌বে?

অমৃতবাবু। হ্যাঁ, একশ'বার বেচ্‌বে। তুমি তার বাধা দেবার কেহে ছোকরা!

ক্ষুদিরাম। আপনি আমার ভগ্নীপতি, তা যেন আপনার মনে থাকে।

অমৃতবাবু। সেটা তোমার মনে রাখাই উচিৎ।

অপরূপা। (ভাত লইয়া প্রবেশ) আচ্ছা, বলছি, ভাত খেয়ে নিক তারপরে যা হয় হবে এখন।

অমৃতবসু। কেন পরে হবে। মহাদেব কত কথা শুনিয়ে গেল, কেন—কিসের জন্যে লোকের কথা শুনতে যাব। আমায় চাকরি করে খাওয়াবেন কিনা। আমার বাড়ীতে ওর স্থান নেই—চলে যাক যেখানে ইচ্ছে ওর—যা ইচ্ছে করুক, কেউ কথা বল্‌তে যাবে না।

ক্ষুদিরাম। রায়মশাই, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আমার উপকারই করেছেন। বিলিতি সরকারের চাকর আর বিলিতি নুন, আমার কাছে সমভাবেই ত্যাজ্য—আপনার বাড়ীতে আজ থেকে আমার ভাত বন্ধ হয়ে গেল—এ আমার সৌভাগ্য রায়মশাই।

অপরূপা। ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম। কোন' কথা বলোনা বড়দি। ছোট বেলায় মা, বাবা হারিয়েছিলাম, তোমাকেই জেনেছিলাম

আমার মা, বাবা, সব। তুমি আর আমাকে ধরে রেখ' না দিদি। এখানে থাকলে রায়মশাইর অসুবিধা হবে, তোমার হবে অনেক কষ্ট। পোড়ারমুখী, হতভাগিনী বাংলা দেশ আমাকে ঘরে থাকতে দেয় না—আমি কি করব' বলো?

[অপরূপাকে প্রণাম করিয়া ক্ষুদিরাম দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল—অমৃতবাবু তাহাকে ধরিলেন]

অমৃতবাবু। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, মুখের ভাত ফেলে—

অপরূপা। ওকে ছেড়ে দাও (দৃঢকণ্ঠে)

অমৃতবাবু তাকাইলেন অপরূপার দিকে—দেখিলেন তাহার দৃঢ মুখমণ্ডল বাহিয়া জল গড়াইয়া আসিয়াছে—তাকাইলেন ক্ষুদিরামের দিকে—দেখিলেন তাহার চোখেও জল। নির্বাক বিস্ময়ে তিনি ক্ষুদিরামকে ছাড়িয়া দিলেন—ক্ষুদিরাম দিদির দিকে তাকাইয়া নিমেষে প্রস্থান করিল।

অপরূপা। (কঠিন মুখমণ্ডল) আমার এতটুকু হাত কাঁপেনি, তোমার একটা ভাত নষ্ট হয়নি।

[অমৃতবাবু—নীরবে প্রস্থান করিলেন]

সূত্রধার। বাইরের মায়ায় যার বাঁধন পড়েছে ঘরের মায়া তাকে বাঁধবে কি ক'রে? ঘর যার কাছে পর হয়ে গেল, বাইরে তাকে নিল আপন করে—। তাইত দেখতে পাই ক্ষুদিরামকে—দেশের সেবায়, আর্তের অশ্রু মোচনে, বিপ্লবীদলের গুপ্ত সমিতিতে কঠোর অনুশীলনে। সত্যেন্দ্র বসু পরিচালিত মেদিনীপুর শাখায় গুপ্ত সমিতিতে সে পূর্বেই দিয়েছে যোগ—, এবার নব চেতনায় দেশের কাজে সে পাগল হয়ে উঠল। তাইত দেখি মারাঠা কেল্লার শিল্প-প্রদর্শনীতে সোণারবাংলা পুস্তিকা বিলি করতে—। পুলিশের হাবিলদার এল তাকে গ্রেপ্তার করতে—পুলিশ কি সত্যি তাকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল?

গোপাল। কিশোরী মাসি, কিশোরী মাসি—

কিশোরী। কি রে গোপাল?

গোপাল। গ্রেপ্তার হয়ে গেল?

কিশোরী। গ্রেপ্তার হয়ে গেল? কে?

গোপাল। আর কে, ক্ষুদিরাম গো।

কিশোরী। কোথায় গ্রেপ্তার হলো?

গোপাল। মারাঠা কেল্লায়—শিল্প প্রদর্শনীতে।

কিশোরী। তা পুলিশ তাকে ধরল কেন?

গোপাল। তা বলতে পারব' না—সকলে বলছে—

কিশোরী। আচ্ছা তুই যা। আমি ঘরে ধূপ ধুনা দেই

(গোপালের প্রস্থান)

[কিশোরী প্রদীপ জ্বালাইল ঘরে ধূপ প্রদান করিল। ঠাকুরকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল]

কিশোরী। ঠাকুর, ক্ষুদিরামকে রক্ষা কর। ক্ষুদিরাম ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই—সে আমায় দিদি বলে ডাকে, আমি তাকে ছোট ভাইএর মত ভালবাসি। আমি তার কে? গরীবের ঘরের বিধবা আমি—আমাকে কেন সে দিল তার দিদির অধিকার। কত লোকে কত কথা বলে, তা বলুক। ক্ষুদিরাম দেশের কাজ করে—সে বড় হবে—কত লোকে তাকে ভালবাসবে—আমি কেন ভালবাসব না তাকে? আমি তার দিদি, সে আমার ছোট ভাই—তুমি তাকে রক্ষা করো।

(আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল)

অমৃতবাবু। (প্রবেশ) কিশোরী আছিস, কিশোরী, কিশোরীর বাড়ীখানা দেখতে বেশ। হ্যাঁরে শুনলাম নাকি ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে।

কিশোরী। গোপাল ত' তাই গেল।

অমৃতবাবু। আমার হয়েছে যত জ্বালা। আমার বাড়ীতে যায় না বটে তবে একটা কর্তব্য ত' আছে আমার? যাই আবার থানায় যদি বেলের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

কিশোরী। তাই না হয় যান রায় মশাই।

অমৃতবাবু। এখন বুঝি তোর এখানেই থাকে।

কিশোরী। মাঝে', কালে ভদ্রে আসে—এসে বড়দির সংবাদ নিয়ে যায়।

অমৃতবাবু। কিন্তু আমাদের কানে যে সংবাদ অন্য রকমের আসেরে!

কিশোরী। রায়মশাই ?

অমৃতবাবু। লোকের মুখ, কি দিয়ে চাপা দেব' বল্।

কিশোরী। চাপা দিতে হবে না—করুন যত পারেন আপনারা—আমিত' জানি, আমি কি ?

(ঘরের মধ্যে প্রস্থান করিল)

অমৃতবাবু। হঁ্যা, সে আমরাও জানি—জানে সকলেই। যাই দেখি থানার দিকে। (প্রস্থান)

[ভিন্ন পথে দুইজন পুলিশ প্রবেশ করিল]

১ম পুঃ। আরে কিশোরী আছে,—কিশোরী ?

২য় পুঃ। কিশোরী কোন আছে ?

কিশোরী। (প্রবেশ) কেন, কিশোরীকে দিয়ে কি কাজ তোমাদের ?

১ম পুঃ। ক্ষুদিরাম তোমার কে আছে ?

কিশোরী ক্ষুদিরাম আমার কেউ নয়—

১ম পুঃ। তোমার বাড়ীতে সে আনাগোনা কোরে।

কিশোরী। কে বল্লে তোমাদের ?

২য় পুঃ। লোকে বোলাবুলি কোরে।

কিশোরী। লোকে বোলাবুলি করলেত' হবে না - আমার এখানে সে কেন আসবে ? কেন, ক্ষুদিরাম তোমাদের কি ক'রেছে—শুন্‌লাম সে নাকি আজ গ্রেপ্তার হয়েছে।

১ম পুঃ। আরে, হাঁ, হাঁ, মারহাঠ্ঠা কেল্লা মে হাবিলদার ত' তাকে গ্রেপ্তার করল'—লেকিন এক বাবু লোক কইল—"আরে—এত ডেপটীবাবুকা লেড়কা আছে, তোম কাহে পাকড়া" ? এহিসে - হাবিলদার তাকে ছাড়িয়ে দিল।

কিশোরী। ডেপুটিবাবুদের ছেলেরা অন্যায় করলে, তোমরা ধরনা বলেই ছেড়ে দিয়েছে।

২য় পুঃ। আরে নেহি, নেহি, সেত ডেপটিবাবুকা লেড়কা নেহি আছে—ওত' ক্ষুদিরাম আছে।

কিশোরী। তা—হ'লে ত' খুব ফাঁকি দিয়েছে তোমাদের ক্ষুদিরাম। তোমরা তাকে ধরতে পারনি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

১ম পুঃ। আরে তোম্ এইসা হাস্‌তাহায় কেঁউ—।

কিশোরী। বারে হাসব' না। ডেপুটিবাবুকা লেড়কা—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ—

২য় পুঃ। আরে চলিয়ে এ কেয়া হুয়া হায়—। চলিয়ে ক্ষুদিরামকো জরুর পাকড়ানে হোগা—

কিশোরী। তাই যাও, এখানে তোমাদের ক্ষুদিরাম আসে না। গ্রেপ্তার যদি করতে চাও—

(এমন সময়ে পুলিশের বেশে একটি লোক প্রবেশ করিল)

পুলিস অফিসার। এ ! তোমলোক এধার কোন কাম করতা হায় থানামে চলিয়ে, ক্ষুদিরাম 'গ্রেপ্তার' হোগিয়া।

১ম পুঃ ও ২য় পুঃ } ছোটাবাবু ? সেলাম হুজুর।

পুঃ অফিসার। আও—

(অফিসার আগে চলিলেন—পুলিশ দুইটি পিছনে চলিল—১ম পুলিশটি একটু ফিরিয়া—ছোট গলায় কহিল)

১ম পুঃ। কি রে কিশোরী, হাসি যে থামিয়ে গেল'—এ, হে হে হে—

[উহারা বাইরে চলিয়া গেল]

কিশোরী। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গেল, সত্যি কি ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে ?

[পুলিশ অফিসারটি পুনরায় প্রবেশ করিল]

পুঃ অঃ। ক্ষুদিরামকে ধরা অত সোজা কিনা !

কিশোরী। কে—? ছোটবাবু ?

পুঃ অঃ। ছোটবাবু নয়—তোমার ছোট ভাই।

(টুপী ও গোঁফ খুলিয়া ফেলিল)

কিশোরী। ক্ষু-দি-রা-ম !

(কিশোরীর মুখমণ্ডল আনন্দে ভরিয়া উঠিল)

ক্ষুদিরাম। আমাকে শিগ্গির কিছু খেতে দাও দিদি, আবার এখনি পালাতে হবে।

সূত্রধার। পালিয়ে পালিয়ে ক্ষুদিরাম—থাকল' কি বেশী-দিন—? এক তাঁতশালায় - সে ইচ্ছে ক'রে ধরা

ঝড় আর ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর দুর্গম পথে একটী ভাই আর একটী বোনের যাত্রা—। তাদের সেই যাত্রার শেষ কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরই——

——ভূমিকায়——

অহীন্দ্র চৌধুরী, ফণী রায়, প্রমীলা ত্রিবেদী, বিমান ব্যানার্জি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, আশু বসু, রাজলক্ষ্মী, সুহাসিনী, হাজুবাবু, ধ্রুব, অরুণ, উমা, অলকা, বিপিন, দেবু, মতিলাল, কমলা, রাধা, মণিকা, মাস্টার সুকু, সাধনা প্রভৃতি।

ঃ একমাত্র পরিবেশক ঃ

—ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ঃ কলিকাতা—
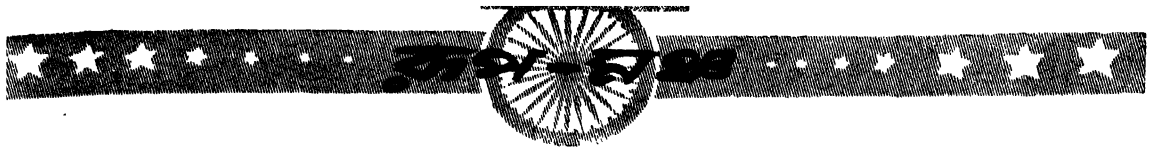
দেয়। লোকে লোকারণ্য—কোর্ট—, ক্ষুদিরামের বিচার হবে। বিচারে ক্ষুদিরামের শাস্তি হ'লো না। কিন্তু—শাস্তির বন্যা-প্রবাহে কলকাতা বুঝি ভেসে যায়। স্বদেশী যুগের নেতারা এক এক ক'রে কারাবরণ করেন—সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম প্রভৃতি সংবাদ পত্রগুলি ইংরাজ শাসনের লৌহচক্রে নিষ্পেষিত—। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি প্রজ্বলিত করলেন বিদ্রোহের আগুন। গুপ্ত সমিতির কেন্দ্রে কেন্দ্রে—গেল সংবাদ—অগ্নিমন্ত্রের পূজারীদের ধমনীতে নেচে উঠল রক্ত—ঐযে অত্যাচারী ইংরাজের প্রতিনিধি—Chief Presidency Magistrate Mr. Kingsford—ওর—রক্ত চাই—। Kingsford বদলী হ'লো মজঃফরপুরে—কিন্তু ওর রক্ত? কে পাবে? কে আনবে—কে পরবে সেই রক্ত তিলক? মেদিনীপুর থেকে এল ক্ষুদিরাম,—রংপুর থেকে এসেছিল প্রফুল্ল চাকী। যুগান্তর অফিসের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা ওদের হ'লো সুরু। মজঃফরপুরে Kingsford এর বাংলোর পাশে—দেখুনতে ওরা কারা?

ক্ষুদিরাম। কিংসফোর্ডের ফিট্‌ন তোর ঠিক মনে আছে ত' দীনেশ।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ,—ওরে সেই পাহারওয়ালা বেটা দুটো এদিকেই আসছে—আয় সরে থাকি।

(তশিলদার খাঁ ও ফয়জুদ্দিন প্রবেশ করিল)

তশিলদার। আরে ফয়জুদ্দিন খাঁ, কিংসফোর্ড সাহেব কা কুঠীকা ক্যা হুয়া?

ফয়জুদ্দিন। আরে ভাই, তশিলদার খাঁ, ম্যায় ক্যাসে জানেগা। বাংলা মুলুকসে কই দুষমন আয়েগা, ন' কেয়্যা হোগা, এহিত শুনতা হায়।

তশিলদার। বাংগালী আদমী বহুৎ সাহেব মারতা হায়।

ফয়জুদ্দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও লোক বহুৎ বোমা বানাতা হায়। আংরেজ লোককা মারকে ভাগায়গা—হো, হো, হো—

তশিলদার। হে, হে, হে, এহিত' বহুৎহাসিকা বাত হায়। চলিয়ে—, ওধার ঘুমকে আনে পড়েগা—

ফয়জুদ্দিন। চলিয়ে— (উভয়ের প্রস্থান)

[দ্রুত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর প্রবেশ]

ক্ষুদিরাম। দীনেশ, প্রস্তুত ত', ঐযে কিংসফোর্ডের ফিট্‌ন ক্লাব থেকে বেরুচ্ছে ভাল করে দ্যাখ ঐ কিংসফোর্ডের গাড়ীত?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, এস, আর দেরী নয়।

ক্ষুদিরাম। রিভলবার ঠিক আছে?

প্রফুল্ল। ঠিক আছে, তুই দেখেনে। (উভয়ে দেখিল)

ক্ষুদিরাম। বোমা?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, বোমাও ঠিক আছে।

ক্ষুদিরাম। ঐ গাড়ী এসে গেছে—আয়, আর দেরী নয়—জয় মা ভবানী।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান]

একটু পরেই বোমা ফাটার শব্দ হইল। চক্ষের নিমেষে; ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দৌড়াইয়া প্রবেশ করিয়া পালাইল। গোলমাল বাড়িল। লোকের হুড়াহুড়ি—তশিলদার খাঁ ও ফয়জুদ্দিন চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল "খুন—খুন-কিয়া—খুন কি য়া—" একটু পরেই S. P. প্রবেশ করিলেন সংগে আরও কয়েকজন পুলিশ।

S. P. ইহারা Kingsford'কে হট্যা করিটে চাহিয়াছিল, লেকেন Kingsford মরিল না। মিসেস কেনেডী মরিল—মিসেস কেনেডী হয়টো বাচিবেনা। এ চৌকিদার, তোমলোক হিয়াসে কোন কাম করতা হায়।

ফয়জুদ্দিন। হুজুর হামলোক পাহারা দেতা হ্যায়।

S. P. ঠৈক লোক তোম দেখা।

ফয়জুদ্দিন। দোঠো বাংগালী লেড়কা দৌড়কে ভাগনে দেখা।

S. P. তব তোমলোক কিয়া—কিয়া? Worthless. O. C.

O. C. Yes Sir.
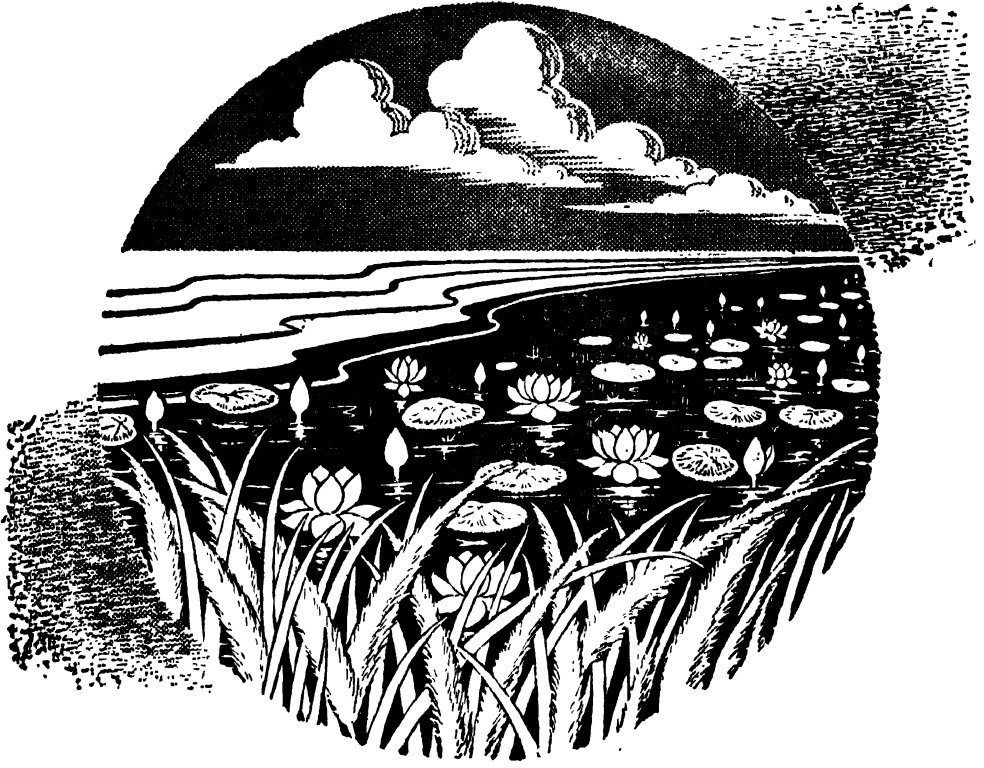
S. P. Wire immediately to every Rail Station and advice to arrest every suspicious Benglee youth, and at this moment I declare a reward of Rs 5000 - who will be able to arrest the murderer of Mrs Kenedey & Miss Kenedey.

সূত্রধর। বাতাসের মুখে সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। দিকে—দিকে ছুটল হন্যে কুকুরের দল—গোয়েন্দা আর পুলিশ। মোকমাঘাট ষ্টেশনে নন্দলাল বাবু বাংগালী পুলিশ কর্মচারী ধরে ফেল্লেন প্রফুল্লকে। প্রফুল্ল ধরা দিল না। নিজের বুকে রিভলবার লাগিয়ে চীৎকার করে উঠল, মুখে তার বন্দেমাতরম—একটি গুলির শব্দ—প্রফুল্লর পবিত্র দেহ মোকমাঘাটের মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু চলেছে বীর ক্ষুদিরাম—ইংরাজকে মেরেছে এই তার আনন্দ—ক্লান্ত দেহে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে ওয়াইনি ষ্টেশনে একটা মুদির দোকানে জল খেতে এল ক্ষুদিরাম—কিন্তু জল খাওয়া কি তার হয়েছিল? পুলিশ ধরল তাকে। পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পেল না। ক্ষুদিরাম হাসিমুখে দিল ধরা। পুলিশ তাকে নিয়ে এল মজঃফরপুর। সারা ভারতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—। রংপুর থেকে সতীশবাবু প্রমুখ উকিলরা এসেছেন—১১ই জুন ১৯০৮ সাল বাঁকীপুরের জজ্ কারনডফ্—বিচার সুরু করলেন ক্ষুদিরামের। বিচারের ফল কি হবে? শুনুন বিচার।

কারনডফ। I believe that the statments made by you before the S. P. Mr Bertoad and, Woodmen are true?

ক্ষুদিরাম। Yes true.

কারনডফ্। Interpreter, Please readout the deposition made by him before Woodmen.

ইণ্টারপ্রেটার। আমি ও দীনেশ কিংসফোর্ডকে হত্যা ক'রতে ক'লকাতা থেকে মজঃফরপুরে আসি। কিশোরী বাবুর ধর্মশালায় আমরা ছদ্মবেশে থাকি। আমাদের সংগে বোমা ও পিস্তল ছিল। কিংসফোর্ড সাহেবের ফিটন লক্ষ্য করে ঘটনার দিন—সন্ধ্যা আটটা নাগাত আমরা বোমা ছুড়ি এবং পালিয়ে যাই। আমি ও দীনেশ ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হই কলকাতার দিকে। দীনেশ মোকামাঘাটে ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছে—তার মৃতদেহ দেখেছি—। কিংসফোর্ড মরেনি একথা পরে জানতে পেরেছি। মিসেস কেনেডী ও মিস্ কেনেডীকে আমাদের মারবার ইচ্ছা ছিলনা।"

একথা—তুমি বলেছ?

ক্ষুদিরাম। হ্যাঁ আমি একথা—বলেছি।

কারনডফ। You should remember, you have been being tried under 302.I.P.c. and, your confession amounts only to death.

ইণ্টারপ্রেটার। ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারা-অনুযায়ী তোমর বিচার হচ্ছে—এই ধারা হচ্ছে জ্ঞানকৃত মানুষ হত্যার ধারা। তোমার স্বীকার উক্তি শুধু মৃত্যুকেই ডেকে আনবে এ তোমার স্মরণ রাখা—উচিত।

ক্ষুদিরাম। আমি জানি।

ইণ্টারপ্রেটার। He knows it Mylord!

কারনডফ। Do you plead guilty of this crime?

ইণ্টারপ্রেটার। তুমি কি অপরাধ স্বীকার কর!

ক্ষুদিরাম। হ্যাঁ।

ইণ্টারপ্রেটার। Yes Mylord, he pleads guilty.

সতীশবসু। Being Khudiram's counsel Mylord, may I be permitted to ask him a few words?

করনডফ। Yes.

সতীশবসু। তোমার বাড়ী কোথায়?

ক্ষুদিরাম। মেদিনীপুর শহরে আমার বাড়ী।

সতীশবসু। তোমার কে কে আছে?

ক্ষুদিরাম। মা, বাবা, কেউ নেই, বড়দি আছে, তার ছেলে মেয়ে আছে, ভগ্নীপতি—অমৃত বাবু মেদিনীপুর জজকোর্টের হেড ক্লার্ক।

সতীশবসু। তুমি অমৃতবাবুর বাড়ীতেই থাকতে?

ক্ষুদিরাম। স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দেবার পর তিনি আমায় ত্যাগ করেন।

সতীশবসু। তোমার কাউকে দেখতে ইচ্ছে হয়।

ক্ষুদিরাম। হ্যাঁ শেষবার আমার জন্মভূমি মেদিনীপুরকে দেখতে ইচ্ছে হয়। দিদিকে তার ছেলে মেয়ে—তাদেরও দেখতে ইচ্ছে করে।

সূত্রধর। বিচারপতি কারনডফ—ক্ষুদিরামের দিলেন ফাঁসির হুকুম—১১ই আগষ্ট ধার্য হ'লো তার দিন—যখন আপীলে কোন ফল হলোনা।

কিন্তু তার শেষ ইচ্ছা—মেদিনীপুর সে দেখবে, দেখবে তার দিদিকে—দিদির ছেলে মেয়েকে—

পুলিশ প্রহরায় ফাঁসির সাতদিন আগে-এল ক্ষুদিরাম—জন্মভূমিকে শেষ প্রণাম জানাতে। উৎসুক নর-নারী অমৃতবাবুর বাড়ীতে—হাজার হাজার মানুষ—কারো মুখে হাসি নেই। বিষাদের কালো ছায়া ম্রিয়মান করে তুলেছে শুধু কি মেদিনীপুর—সারা—বাংলা। চুপকরে দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপাদেবী—অমৃতবাবুর চোখে জল—এমন সময় বন্দেমাতরম ধ্বনি শোনা—গেল – ঐ অস্‌ছে বাংলার ক্ষুদিরাম। জনতা আরও-কাছে এল।

কুল-নারীরা উলুধ্বনি দিল—শঙ্খধ্বনিতে সবদিক মুখরিত হয়ে গেল – ক্ষুদিরাম গৃহের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ডাকল'—"বড়দি—বড়দি"। পাথরের মূর্তি-অপরূপাদেবী। সামনে এসে দাঁড়াল ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরাম। দিদি—আমার বড়দি।

অপরূপা। (কাঁদিয়া জড়াইয়া ধরিলেন) ক্ষুদিরাম-ওরে, এতুই কি করেছিস্ ক্ষুদিরাম!

ক্ষুদিরাম। ভয় কি দিদি, মরতে ত একদিন হবেই। সেই মৃত্যু না হয় দেশের জন্য মরলাম। আমার মৃত্যুতে যদি দেশ থেকে কোনদিন—ইংরেজ চলে যায়, তাহলেই আমি ধন্য হবো। কেঁদনা—দিদি।

অপরূপা। ওরে আমি যে ভাবতে পারিনি—ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরাম। রায়মশাই-কই, রায়মশাই।

অমৃতবসু। ক্ষুদিরাম-এ তুই কি করলি ক্ষুদিরাম! আমি যে তোকে বাড়ী থেকে দূর-করে দিয়েছিলাম। আমার জন্যেই তুই-ফাঁসির দড়ি গলায়—ওহো হোঃ—ওরে, না না, তোরা আমাকে ফাঁসি দে, আমাকে ফাঁসি দে—ক্ষুদিরাম বাঁচুক। চলে যেতে বলেছিলাম তাই গেলি—আমি কি তোকে ভালবাসিনি—আমি কি—তোকে মানুষ করিনি?

ক্ষুদিরাম। রায়মশাই, অপনি কাঁদবেন না। আজ অতীতের কোন কথা নেই, ভবিষ্যতের কোন কথা নেই। আজ আপনাদের কাছে আমি ফিরে এসেছি—ফিরে এসেছি আপনাদের ছোট ভায়ের অধিকারে। যে ক'দিন সরকার আমাকে থাক্‌তে দেয়, সে কদিন আপনারা আনন্দে আমাকে ঘরে তুলে নিন্, সেই হবে আমার সব চেয়ে বড় সুখ—পরমতৃপ্তি, আমার স্বর্গ। কিশোরীদি কোথায়।

অমৃত। তোর ফাঁসির কথা শুনে কোথায় যে চলে গেল কেউ তার সন্ধান বল্‌তে পারল না।

অপরূপা। অনেকে বলে—সে নাকি মরে গেছে।

ক্ষুদিরাম। কিশোরীদি মৃত্যুকে ভয় করতোনা। তাই সত্য কথা সে বলতে পারত? আমার প্রণাম রইল তার জন্যে। বড়দি তুমি এখনও কাঁদছ? রায় মশাই, ছি কাঁদবেন না ললিত, আমার কাছে আয়, ছিঃ কাঁদতে নেই। দেশের জন্যে মরা—তাতে ভয় কি? আমি ত তবু তোমাদের সংগে দেখা করতে পেলাম, আর প্রফুল্ল—আত্মহত্যা করে মরল। ও কিছু নয়, দেশকে ইংরাজের হাত থেকে উদ্ধার করতে হলে, মরতে হবে বৈকি। আজ আমরা মরলাম ভবিষ্যতে আরও কতজনকে মরতে হবে। ইংরেজ শাসনের জগদ্দল-পাথর এমন মৃত্যু দিয়েই ক্ষয় করে করে ফেল্‌তে হবে—তবে ইংরেজ যাবে—যেতেও তার হবে। "বন্দেমাতরম—"

জনতা। "—বন্দেমাতরম—„

সূত্রধর। ফাঁসির তিন দিন পূর্বে—সব সম্পত্তি যথাযথ বণ্টন করে দিয়ে ক্ষুদিরাম আবার ফিরে এল মজঃফরপুরে। সংগে—এলেন জ্যেঠতুত ভাই অবিনাশ বাবু। ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট—সকাল ৬টায়—বাংলার তরুণ বীর— বীর ক্ষুদিরাম—দেশের কল্যাণে হাস্‌তে হাস্‌তে বন্দেমাতরম বলে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ আহুতি দিল। পরদিন ক্ষুদিরামের পবিত্র দেহ গণ্ডকের তীরে সমাহিত করা হলো। সহস্র শবানুগামীদের চোখে জল। চিতায় জ্বলে উঠল আগুন। সারা আকাশ লাল হয়ে গেল সেই চিতার আগুনে। বাংলার বুকের আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতের বুকে। সে—আগুন—আজও নেভেনি। শত শহীদের নির্ভীক—আত্মাহুতি ভারতের জনগণের মনে রূপময় হয়ে রইল ক্ষুদিরামের স্মৃতি-গাথায়—পল্লী কবির কণ্ঠ-সংগীতে—

"আমায় একবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি।
ওমা হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী॥

নাট্যকার ও'নীল

গোপাল ভৌমিক

কবি গোপাল ভৌমিক কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈদেশিক সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুশীলন স্পৃহা সুধীজনের স্বীকৃতি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি। বৈদেশিক নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে তাঁর বলবার অধিকারকে অস্বীকার করতে পারিনি বলেই ও'নীল সম্পর্কে তাঁকেই লিখতে বলা হয়। লেখকের মুন্সিয়ানা পাঠক সাধারণের কাছে আশাকরি ধরা পড়বে।

আধুনিক বিশ্বের নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে দু'জন শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার কথা। তাঁদের একজন হলেন বার্ণার্ড্ শ এবং অপরজন হলেন ইউজিন ও'নীল। জনপ্রিয়তা, মৌলিকত্ব এবং প্রতিভায় এঁদের মধ্যে কে কাকে ছাড়িয়ে যান, সে কথা সঠিকভাবে বলা শক্ত। আমার নিজের ধারণা, আধুনিক বিশ্বনাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতার আলোচনাপ্রসংগে এই দুজন নাট্যকারের নামই একসংগে করতে হয়। অবশ্য আমি জানি এ সম্বন্ধে সবাই আমার সংগে একমত হবেন না। তবে অধিকাংশ নাট্যসমালোচকেরই যে এই অভিমত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

অথচ নাট্যকার ও'নীল ও বার্ণার্ড্ শ'র প্রতিভা ও নাট্যরচনার রীতি অনেকটা বিপরীতমুখী। কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহ নেই—এঁরা উভয়েই সমান প্রতিভাশালী এবং সেই দিগন্তপ্রসারী প্রতিভার সূর্যালোকে এঁদের নাট্যসাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জীবন সম্বন্ধে এঁদের দু'জনেরই আছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং নিজেদের নাটকে এঁরা জীবনের সেই বহুবিস্তৃত গভীরতাই তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু দু'জনের প্রকাশভংগীতে কত বিভিন্নতা—কত বৈষম্য! নাটকের গভীর বিষয়বস্তুকে শ' তাঁর সুনিপুণ ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছদ্মাবরণে তুলে ধরেন আমাদের সামনে। তার কারণ, আধুনিক পল্লবগ্রাহী মানবমনকে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন যে, সহজ স্বাভাবিক ভাব ও ভাষায় রচিত গভীর সত্যোপলব্ধি করার মত মানসিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক সংগঠন আমরা হারিয়ে ফেলেছি—অন্তত এই বার্ণার্ড্ শ'র বিশ্বাস। তাই তিনি লঘুচিত্ত মানবদের কাছে ছদ্মবেশে আধুনিক যুগের বাণীদূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এ যুগের মেসায়া (Messiah) কিন্তু মেসায়াসুলভ গুরুগাম্ভীর্য বার্ণার্ড্ শ'র রচনাভংগীতে নেই। লঘু হাস্যপরিহাস ও রঙ্গব্যঙ্গের পথে জীবন সম্বন্ধীয় সুগভীর সত্যকে আমাদের মর্মমূলে পৌঁছিয়ে দেবার স্বারোপিত দায়িত্ব শ' তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে।

অপরদিকে নাট্যকার ইউজিন ও'নীলের নাট্যরচনা-শৈলী সম্পূর্ণ পৃথক্ বললেও অত্যুক্তি হয় না। গাম্ভীর্য তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ'র মত তিনিও উপলব্ধ জীবনের গভীর সত্যকে নাটকের মারফৎ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন আমাদের সম্মুখে—কিন্তু রঙ্গব্যঙ্গের পথে নয়—সুগভীর গাম্ভীর্যের পথেই। তাঁর হৃদয় ও অনুভূতির যে অকৃত্রিমতা ও নিষ্ঠা, নাটকের প্রতিছত্রে তা ফুটে ওঠে। তাঁর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ নাটক তার কোনটির মধ্যেই কৃত্রিমতা বা সাধারণ ঐতিহ্য-বিলাসিতার আভাস পাওয়া যায়না। তাঁর নাটকের মুল সুর হল ট্রাজিক। ট্রাজেডির গম্ভীর করুণ রসের ছোঁয়াচ থেকে মাঝে মাঝে পাঠকের ভারাক্রান্ত মনকে লঘু করার জন্যে হাস্যরসের দৃশ্যাবতরণের যে নির্দেশ আছে আমাদের নাট্যশাস্ত্রগুলোতে তা নির্বিকারে অবহেলা করে গেছেন ও' নীল। সুগম্ভীর অর্থপূর্ণ বার্ণার্ড্ শ'র নাটকগুলো পড়ার সময় আমাদের চোখেমুখে হাসি ফুটবার অবকাশ

আছে সুকৌশলী শ'র সুনিপুণ ভাষাবিন্যাস ও চরিত্র-বিন্যাসের জন্যে। কিন্তু ও'নীলের নাটকে কোথাও গাম্ভীর্যরস ক্ষুণ্ণ হয় না—একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলে। একটানা ঘটনাস্রোতের বেগে তিনি আমাদের টেনে নিয়ে চলেন চরম পরিণতির দিকে। কিন্তু তার জন্যে কোথাও ক্লান্তি-বোধ হয় না কিংবা একঘেয়েমির তিক্ততাবোধ জাগে না। নাট্যকারের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। জীবনের চরম সত্য সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ ও ও'নীল আমাদের প্রায় একই কথা বলতে চেয়েছেন। অথচ উভয়ের রচনা-শৈলী এবং প্রকাশ ভংগীতে কত বিভিন্নতা! কিন্তু সে জন্যে এই দু'জন প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীর কারও নাটকের রসগ্রহণেই পাঠকরা কিংবা দর্শকরা বাধা পান না। এক-জনের রংগ ব্যংগ মিশ্রিত গভীর সত্যের নাট্যরূপ আমরা যেমন আগ্রহ নিয়ে পড়ি, তেমনই অপরজনের গভীর সুরে বলা গভীর কথাও আমরা সমান আগ্রহ নিয়েই পড়ি। বড় শিল্পী হলে তাঁরা যে ভাবে ও যে ভংগীতেই সাহিত্য রচনা করুন না কেন তা যে আমাদের মুগ্ধ না না করে পারে না—এ যুগের বিপরীত-ধর্মী নাট্যশিল্পী শ' ও ও'নীলের নাট্য-সাহিত্য তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আধুনিক যুগের বামপন্থী মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিচারের মাপ-কাঠিতে বার্ণার্ড্ শ কিংবা ও'নীল—এঁদের কাউকেই আমরা খাঁটি বিপ্লবী শিল্পী বলতে পারি না। এঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিল্পী—ব্যক্তির চেয়ে সমাজবোধকে কিংবা সামাজিক পটভূমিকাকে এঁরা এঁদের নাট্যসাহিত্যে বড় স্থান দিতে পারেননি। শ'কে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সর্বপ্রকার ঐতিহ্য-বিরোধী। কথার তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তিনি আমাদের মনের অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেন—একথা সত্যি। কিন্তু সেই সেই সংগে একথাও সত্য যে, তিনি নিজের সৃষ্ট একটা জগতের ঐতিহ্যের শিকলে বাঁধা। তার গোলকধাঁধা থেকে বার্ণার্ড্ শ মুক্তি পাননি বরং সেই পথে ও সেই মতেই তিনি তাঁর জীবন-বেদকে দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করেছেন। তাঁর সে জগতে অলৌকিক ঈশ্বরের স্থান দখল করেছে তাঁর নিজস্ব প্রাণ শক্তি (যাকে বার্ণার্ড শ বলেছেন Life Force)। ফরাসী দার্শনিকরা এই শক্তিরই নামকরণ করেছেন Elan vital. বার্ণার্ডশর মতে এই অলৌকিক শক্তির সাহায্যেই মানুষ বিবর্তিত হয়ে চলেছে অতি-মানুষের দিকে। তাই প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানলেও শ' নিজেও একটি বিশ্বাসের ঐতিহ্যই গড়ে তুলেছেন। অপরদিকে ও'নীল গভীরভাবে ভগবদ্বিশ্বাসী। এ সম্বন্ধে ও'নীলের নিজের মন্তব্যই উধৃত করে দিচ্ছি। একটি বন্ধুর সংগে আধুনিক নাটক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে তিনি একবার বলেছিলেন: "Most modern plays are concerned with the relation between man and man, but that does not interest me at all. I am interested only in the relation between man and God." নিজের নাটক সম্বন্ধে ও'নীলের এই উক্তি সর্বাংশে সত্য না হলেও বহুলাংশে সত্য। মানুষই তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য কিন্তু মানুষই তাঁর নাটকের একমাত্র বা চরম সত্য নয়। মানুষের বহিরংগের ঊর্ধ্বে যে একটা বিরাট মনোজগৎ আছে তার অলিতে গলিতে বিচরণ করে সৃষ্টির শেষ রহস্য আবিষ্কার করার সাধনা ও'নীলের। তাই তাঁর নাটক এত গভীর—তার নাটকের সুর এত গম্ভীর। শ' কিংবা ও'নীল—এঁরা কেউ নিছক 'বিশুদ্ধ' রসশিল্পী নন—উভয়েই প্রচারধর্মী। তার কারণ উভয়েই জীবনশিল্পী। জীবনের সংগে সম্পর্ক বিচ্যুত হয়ে যে বড় সাহিত্য কিংবা শিল্প গড়ে উঠতে পারে না—এই সুমহান বোধই তাঁদের করে তুলেছে মহাশিল্পী।

যুগের পটভূমিকায় স্থাপন করে সাহিত্য বিচার করাই আধুনিক রসশাস্ত্রের রীতি। এদিক থেকে বিচার করলে ও'নীল ও বার্ণার্ড শ উভয়কেই আমাদের বিপ্লবী নাট্যশিল্পী বলে অভিনন্দিত করতে হয়। রচনা-শৈলী, টেক্‌নিক্ এবং জীবনবোধের দিক থেকে এঁরা কেউই প্রচলিত ধারার সমর্থক নন। একজন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সূর্যালোকে বিশৃংখল ভাবের কুয়াসা ছিন্ন ভিন্ন করে দেখতে চেয়েছেন জীবনের মহাসত্য, অপরজন বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের পথেই মানবজীবনের পরম সত্য আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু উভয়েই বিশ্বমানবতার বড় পূজারী। নাট্য-শিল্পের বহু

বিষয়ে এঁদের পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও এইখানে উভয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য। আর আমার মতে এই জিনিসটিই বার্ণার্ড শ ও ও'নীলকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সমপর্যায়ভুক্ত করেছে।

একটি সাময়িক পত্রিকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ও'নীলের বহু-বিচিত্র নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দানের চেষ্টা বৃথা। এক দিক থেকে বিচার করতে গেলে ও'নীলের কৃতিত্ব বার্ণার্ড শ'র চেয়েও বেশী। তিনি একটা জাতির নাট্যসাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক। বার্ণার্ড শ'র পিছনে ছিল সেক্‌সপীয়ার থেকে সুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের গৌরবময় নাট্যসাহিত্যের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। কিন্তু মার্কিণ নাট্যকার ও'নীল তাঁর পিছনে কোন ঐতিহ্যের ভিত্তিই পাননি বলা চলে। বরং একক প্রচেষ্টায় গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে মার্কিন নাট্যসাহিত্যের একটা ঐতিহ্য। আমেরিকায় তাঁর মত বড় নাট্য-প্রতিভার জন্ম তো কোনদিন হয়ইনি—বিশ্বের দরবারেও তাঁর মত প্রতিভাবান নাট্যকারের সংখ্যা আঙ্গুলে গুণে শেষ করা যায়। ইউজিন ও'নীলের পূর্বে ও মার্কিণ নাটক ছিল কিন্তু নাট্যসাহিত্য ছিল না। এইখানে আমি ইচ্ছা করেই নাটক ও নাট্যসাহিত্যের মধ্যে একটা অর্থগত বিভিন্নতার সৃষ্টি করেছি। রংগমঞ্চে নাটকাকারে যা কিছু অভিনীত হয়—তাকেই আমরা নাটক আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব নাটকই সাহিত্যের পর্যায়ে উঠতে পারে না। নাট্যসাহিত্য আমি তাকেই বলি, যে-নাটকের আয়ু পাদপ্রদীপের আলোকে মঞ্চের উপরেই শেষ হয়ে যায় না—মৃত ছাপার হরফে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েও যে-নাটক আমাদের মনে প্রেরণা জাগাতে পারে। এই যে কালের প্রভাবকে অস্বীকার করেও টিকে থাকার ক্ষমতা এবং মঞ্চের বাইরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েও মানব-মনে প্রেরণা জাগানোর ক্ষমতা—এই হল বড় নাটকের বৈশিষ্ট্য। আমরা চোখের উপর হরদম দেখছি প্রতিনিয়ত বাংলা রংগমঞ্চে নতুন নতুন নাট্যাভিনয় হচ্ছে। এর কয়টি নাটক আমাদের জাতীয় নাট্যসাহিত্যে স্থায়ী আসন পায়? ও'নীলের পূর্বেও আমেরিকায় নাট্যকার ছিলেন কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন মঞ্চনাট্যকার—তাঁদের কেউ জীবনশিল্পী ছিলেন না। তাই তাঁরা মার্কিণ নাট্যসাহিত্যকে কণামাত্রও পুষ্ট করে যেতে পারেননি। বিদেশী নাটকের প্রেরণা ও অনুকরণেই তাঁরা নাটক রচনা করে মার্কিণ মঞ্চামোদীদের আনন্দ বিতরণের চেষ্টা করতেন। তাঁদের নাটকে না থাকত কোন উচ্চাদর্শ-না থাকত মার্কিণ সমাজ জীবনের কোন প্রতিচ্ছবি বা চিত্র। কৃত্রিম এই সব নাটক দর্শকদের সাময়িক ভাবে তৃপ্তি দিলেও এদের সাহায্যে মার্কিণ নাটকের কোন ঐতিহ্যই গড়ে উঠতে পারেনি। মার্কিণ সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ যেমন, ধরুন কবিতা, উপন্যাস ছোটগল্প বা প্রবন্ধ সাহিত্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেও মার্কিণ নাটক এগুতে পারেনি। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে না হলেও বুদ্ধিবাদী মার্কিণ জনসমাজের মনে নাটক সম্বন্ধে ক্রমশ অভাববোধ, অভিযোগ ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। বিশেষত মার্কিণ যুবসমাজ হয়ে উঠেছিল নাটকের ক্ষেত্রে রীতিমত বিপ্লবকামী এবং বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে কিছু কিছু প্রয়াসও তারা আরম্ভ করেছিল। এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে মার্কিণ নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব হল ও'নীলের। তিনি নিজের যুগান্তকারী বৈপ্লবিক প্রতিভার গুণে কয়েক বছরের মধ্যে মার্কিণ নাট্যসাহিত্যে রীতিমত বিপ্লব এনে দিলেন।

ও'নীলের বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি প্রথম মার্কিণ নাটকের সংগে মার্কিণ জীবনের যোগাযোগ ঘটালেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে আজ মার্কিণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে বহু প্রতিভা-বান্ নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁদের সম্মিলিত দানে একাধারে মার্কিণ নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য হয়ে উঠেছে সুসমৃদ্ধ। ও'নীল আজও সকলের উর্ধ্বে সমান গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তার কারণ ও'নীল পুরোপুরি মার্কিণ জাতীয় নাট্যকার হয়েও সমস্ত ভৌগো-লিক সীমা ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন। সমস্ত বড় সাহিত্য ও শিল্পের ধর্মই এই—তারা কোন সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখার বাঁধন মানে না। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো নামধামে, হাবভাবে, পোষাক-পরিচ্ছদে এবং কথাবার্তায় পুরোপুরি মার্কিণ সমাজের জীব হয়েও দেশান্তরাশ্রিত

আমাদের মনে প্রেরণা জাগাতে পারে এবং আমাদের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। তার কারণ সবার উপরে তারা প্রধানত মানুষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও সংস্কারের যত বিভিন্নতাই থাক না, কেন তারা মূলত এক। সাহিত্যের গায়ে একই সংগে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিকতার ছাপ এঁকে দিতে পারা বড় সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ও'নীলের নাট্য-সাহিত্যে সে বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বিদ্যমান।

ও'নীল শুধু মার্কিণ নাট্য-সাহিত্যেই বিপ্লব আনেন নি—তিনি মার্কিণ রংগমঞ্চের প্রয়োগ শিল্পেও এনেছেন বিপ্লব। তার কারণ, রংগমঞ্চের কলাকৌশলের সংগে ও'নীলের আছে সুগভীর পরিচয়। তাঁর সংগে এসে যোগ দিয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা। ১৮৮৮ সালের ১৬ই অক্টোবর নিউইয়র্কের একটি হোটেলে ও'নীলের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জেমস্ ও'নীল ছিলেন সে যুগের মার্কিণ রংগমঞ্চের একজন বড় রোমান্টিক অভিনেতা। তিনি সেকস্পীয়ারের নাট্যাভিনয়ে একজন নামজাদা শিল্পী ছিলেন। পরে তিনি অধিকতর পরিমাণে অর্থোপার্জনের জন্যে সেকস্পীয়ার অভিনয় বাতিল করে দিয়ে 'মন্টেক্রিস্টো' নামক একটি তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রাম্যমান নাট্যাভিনয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। পিতার এই ভ্রামামাণ নাট্যজীবনের কল্যাণে প্রথম জীবনে ও'নীল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু সহর পরিভ্রমণ করেছিলেন। প্রথম থেকে থিয়েটারের সংগে তাঁর এই সংযোগ দুদিক থেকে তাঁর নাট্য-জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত তিনি জীবনের গোড়া থেকেই থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ কলাকৌশলের সংগে পরিচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত 'মন্টেক্রিস্টোর' মত একটি তৃতীয় শ্রেণীর নাটক প্রথম থেকেই তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। আমেরিকার মঞ্চে সে সময় জীবনের সংগে সম্পর্কচ্যুত যে ধরণের কৃত্রিম নাটকের অভিনয় প্রচলিত ছিল, 'মন্টেক্রিস্টো' ছিল তার প্রতীক বিশেষ। জীবনের গোড়া থেকে এই ধরণের কৃত্রিম নাটক দেখে এই জাতীয় কৃত্রিম ঐতিহ্যকে সবল হাতে ভেঙে ফেলার ইচ্ছা হয়তো বাসা বেঁধেছিলো ও'নীলের নির্জ্জন মনে। কিন্তু সাত বৎসর বয়সের পূর্বে তিনি নাটক লেখায় হাত দেবার অবকাশ পান নি।

তাঁর ছাত্র জীবনের দশটি বছর কেটেছিল একটি ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে এবং কনেক্টিকাটের বেট্স্ একাডেমীতে। কিন্তু কিশোর বয়স থেকেই একটা বৈশিষ্ট, তাঁর চরিত্রে প্রবল হয়ে দেখা দেয়—সে হল তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা এবং মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের স্পৃহা। প্রবল হৃদয়াবেগ তাঁকে যে দিকে পরিচালিত করত তিনি এগিয়ে যেতেন সেই দিকে—তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কারও ছিল না। তাঁর চারিত্রিক সংগঠনে এই সুগভীর হৃদয়াবেগ একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে। এরই প্রেরণায় একসময় তরুণ বয়সে তিনি সন্দেহজনক চরিত্রের ব্যক্তিদের সংগে মিশে উন্মত্ত মাদকতার মধ্যে সময় কাটিয়ে দিতেন—এরই প্রেরণায় একদিন তিনি বিচরণ করে ফিরেছিলেন সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত। আবার এই বুদ্ধি বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের প্রেরণাই আজ তাঁকে করে তুলেছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। প্রথম জীবনে তিনি করেন নি—এমন কাজ নেই। কিছুকালের জন্যে তিনি নিউইয়র্কের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী হয়েছিলেন এবং একটি ভ্রাম্যমান থিয়েটারের সহকারী ম্যানেজারও তিনি হয়েছিলেন। এর পরেই সুরু হয় তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের পালা। ১৯০৯ সালে একটি স্বর্ণসন্ধানী দলের সংগে তিনি গিয়েছিলেন মধ্য-আমেরিকায়। কিন্তু ছয়মাস যেতে না যেতেই তিনি গ্রীষ্ম-প্রধান অঞ্চলে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। পরে তিনি একটি নরওয়ের জাহাজে বুয়েনস্ এয়ার্সে যান এবং সেখানে পর পর বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হন। আর্জেন্টি-নায় কিছুকাল কাটানোর পর তিনি একটি জাহাজে পশু-পালকের কাজ নিয়ে চলে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখান থেকে তিনি আর্জেন্টিনায় ফিরে আসেন সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে। তার পরেই তাঁর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন। সর্বশেষে তিনি আবার একবার সাধারণ নাবিকরূপে সমুদ্রভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং পরে কিছুকাল একটি সংবাদপত্রের সংবাদদাতারূপেও

কাজ করেছিলেন। এর পরেই ধরা পড়ে যে, তাঁর দেহে সামান্য ক্ষয়রোগ দেখা দিয়েছে। তার ফলে তাঁকে ছয়মাস কাল একটি স্যানিটারিয়ামে থাকতে হয়েছিল।

এই ক্ষয়রোগের আক্রমণ ও'নীলের জীবনের একটি গুরুতর পরিবর্তনসূচক ঘটনা। এইখানে তাঁর জীবনের একটি অধ্যায়ের শেষ এবং অপর একটি অধ্যায়ের আরম্ভ। পরিপূর্ণ বিশ্রামের অবকাশে তিনি নিজের মনকে ভালভাবে জানবার অবকাশ পান এবং বুঝতে পারেন যে, উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্র তত্র ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করার জন্যে তার জন্ম হয় নি—তাঁর জীবনের একটা মহান্ উদ্দেশ্য আছে। সেই মহান্ উদ্দেশ্য হল নাটকের মারফৎ তাঁর শিল্পী সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করা এবং জাতীয় নাট্যসাহিত্যের একটা বহু-অনুভূত অভাব পূরণ করা। এই সময় ১৯১৪-১৫ সালে তিনি প্রসিদ্ধ নাট্য-সমালোচক অধ্যাপক বেকারের কাছে নাট্যশিল্প সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় ও'নীল তাঁর সামুদ্রিক জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত প্রসিদ্ধ একাঙ্কিকাগুলি রচনায় হাত দেন। এই সময় ম্যাসাচুসেটসের প্রসিদ্ধ প্রোভিন্সটাউন্ প্লেয়ার্স নামক সখের নাট্যসম্প্রদায়ের সংগে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। মার্কিণ নাট্যমঞ্চে বিপ্লবসাধনকামী কতিপয় উৎসাহী যুবক এই নাট্যসম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। এঁদের পরিকল্পনা ছিল প্রচলিত ঐতিহ্যবিরোধী বিপ্লবী নাটক মঞ্চস্থ করে মার্কিণ পেশাদার নাট্যমঞ্চগুলির মোহনিদ্রা ভাঙানো। প্রথম সাক্ষাতেই ও' নীলের সংগে এঁদের আদর্শ ও নীতির মিল হ'ল। ও' নীলও ছিলেন মার্কিণ নাট্যসাহিত্যে বিপ্লবকামী—যা-কিছু ঐতিহ্যানুগ মরানীতির পরিপোষক, তিনি ছিলেন তারই বিরোধী। তাই নগ্ন বাস্তবের ভিত্তিতেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর প্রথম জীবনের একাঙ্কিকাগুলি। প্রোভিন্স্‌টাউন্ প্লেয়ার্স খুঁজছিলেন একজন তরুণ বিপ্লবী নাট্যকার আর ও'নীল খুঁজছিলেন একটি বিপ্লবকামী নাট্য-সম্প্রদায় যারা তাঁর প্রচলিত বিধিবহির্ভূত নাটকগুলি মঞ্চস্থ করবে। অতএব প্রথম সাক্ষাতের পরে পরেই ও' নীলের সংগে এই নাট্য-সম্প্রদায়ের গভীরযোগাযোগ স্থাপিত হল। ওয়াশিংটন্ স্কোয়ার প্লেয়ার্স নামক অপর একটি সখের নাট্য-সম্প্রদায়ের সংগে যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই নাট্য সম্প্রদায়ই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্কিণ রংগমঞ্চে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। আর সে পরিবর্তনে ও'নীলের ব্যক্তিগত দানের পরিমাণই সর্বাধিক। প্রথম দর্শনেই মার্কিণ দর্শকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মার্কিণ নাট্যসাহিত্যে প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে। মার্কিণ রঙ্গমঞ্চে যে ধরণের নাটক দেখে দেখে তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, ও'নীলের নাটক যে তার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম একথাটা বুঝতে মার্কিণ দর্শকদের বিলম্ব হয়নি। অবশ্য তার প্রথম যুগের একাঙ্কিকাগুলিতে ভাবের গভীরতা বা উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ছিল না। তবু জীবনের সংগে নাটকের যোগসূত্র সংস্থাপনে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাতেই মার্কিণ দর্শকদের হয়েছিল বিস্ময়ের সঞ্চার। এর পরেই ও' নীলের জীবনের প্রকৃত নাট্য সাফল্যের যুগ।

আজ ও' নীলের বয়েস ৫৯ বৎসর। পরিণত বয়েসে তাঁকে দেখে বোঝা যায় না যে, দুঃসাহসিক অভিযানের ত্বরাশায় এই ও' নীলই একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত—সুগভীর সমুদ্রের বুকে এবং সুউচ্চ পর্বত শিখরে। আজকের ও'নীল শান্ত, স্থির এবং স্থিতবুদ্ধি—নির্জনতা, নিঃসংগতা এবং চিন্তার অবকাশই আজ তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী তিনি—তাঁর নাটকগুলোও এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার রঙে রাঙানো। বিবাহিত জীবনেও তাঁর অভিজ্ঞতা কম বিচিত্র নয়। তিনি বিয়ে করেছেন তিন তিনবার—প্রথম দুটি বিয়ে তাঁর ব্যর্থ হলেও অভিনেত্রী কার্লোটা মন্টেরির সংগে তাঁর তৃতীয় বিবাহ হয়েছে অত্যন্ত সুখের। আজকের ও'নীল হচ্ছেন মূলত নাট্যকার ও কবি যাঁর কাছে অন্তরতম জীবনই হল চরম সত্য। নাট্যকাররূপে ও'নীল জীবনে প্রচুর যশ ও অর্থ উপার্জন করেছেন। তিনি তিনবার মার্কিণ জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাৎসরিক পুরস্কার পুলউইজার প্রাইজ্ পেয়েছেন—একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন এবং ১৯৩৬ সালে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার
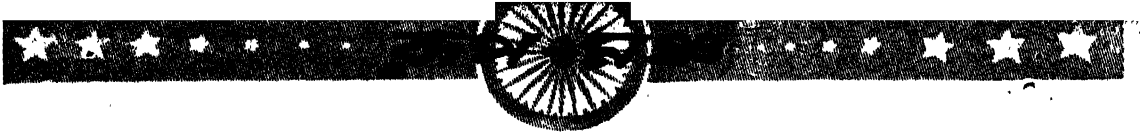
নোবেল প্রাইজ্ পেয়েছেন। কিন্তু এত কৃতিত্বও তাঁকে নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে দাম্ভিক করে তোলেনি। তাই তিনি আজও নাটক নিয়ে নিত্য নতুন গবেষণা করে চলেছেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত ও লাজুক প্রকৃতির। অতি মৃদু কণ্ঠে তিনি কথা বলেন এবং দুজনের অধিক লোকের সংগে আলাপ আলোচনা করতে হলে তিনি বিব্রত বোধ করেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ পান একাগ্রচিত্তে বসে তাঁর নাটক রচনায়। নাটক রচনা তাঁর জীবনের ব্রত বললেও সবখানি বলা হল না। ধার্মিক ব্যক্তির মনে ধর্মাচরণ যে অলৌকিক প্রেরণা জাগায়, নাট্য রচনার সময় ও'নীলও ঠিক তেমনি প্রেরণা অনুভব করেন বলে মনে হয়। এই আন্তরিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ছাপ তাঁর নাটকের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়।

ও' নীলের নাটক সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তার কারণ, তাঁর প্রত্যেকটি নাটক ভিন্ন ভিন্ন টেকনিকে লেখা এবং বিভিন্ন বিষয় তার উপজীব্য। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন বহুমুখী বিচিত্র, তাঁর নাট্যরূপও তেমনিই বিচিত্র। নগ্ন বাস্তবতা থেকে সুরু করে উচ্চতম কল্পনা বিলাস পর্যন্ত আমরা তাঁর নাটকে পেতে পারি। তবে তিনি যা নিয়ে কিংবা যে ধরণেই নাটক লিখুন, প্রত্যেকটি নাটকের গায়েই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছায়া সুস্পষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি যেমন প্রচলিত রীতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন, তেমনই আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি অতি পুরাতন রীতি গ্রহণ করে তাকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন। দুএকটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অঙ্কবিভাগ ও দৃশ্যসংস্থানাদি সম্বন্ধে যে সব বিধি নিষেধ আছে, ও'নীলের তুলনাবিহীন সৃষ্টিমূলক প্রতিভা তার কোন কিছুই মানে নি। তাঁর 'স্ট্রেঞ্জ্ ইণ্টারল্যুডের (Strange Interlude) মত নাটকে তিনি প্রচলিত বিধি নিষেধ ভেঙে একযোগে নয়টি অংকের সমাবেশ করেছেন। আবার 'দি এম্পেরার জোনস্'-এর (The Emperor Jones) মত নাটকে আমরা দেখি আদৌ অংক নেই—চলচ্চিত্রের মত পর পর দ্রুত গতিতে সমাপ্ত আটটি দৃশ্যে গড়ে উঠেছে—এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি। এর গঠনও প্রচলিত বিধি নিষেধ বহির্ভূত। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আমরা দেখতে পাই—অর্থাৎ ও'নীলের ঐতিহ্যানুগামী রূপ। এর উদাহরণ দেখি তাঁর 'মোর্নিং বিকামস্ ইলেক্ট্রা (Mourning Becomes Electra) নামক প্রসিদ্ধ তিন খণ্ডে সমাপ্ত নাটকে। এই তিন খণ্ডে সমাপ্ত নাটক বা ট্রিলজি রচনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে। আধুনিক পটভূমিকায় এবং আধুনিক জীবন নিয়ে রচিত ইউজিন ও'নীলের এই ট্রিলজি বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রদের মুখে জনান্তিকে ভাষণ দেওয়াটা ছিল প্রাচীন নাটকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। সেক্স্পীয়ারের নাটকে আমরা এর বহুল প্রচলন দেখি। আধুনিক নাট্যকাররা এই জিনিসটিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। কিন্তু ও'নীল এই পরিত্যক্ত নাট্যকৌশলটিকে সুনিপুণ শক্তির সংগে প্রয়োগ করেছেন তাঁর নাটকে। বিশেষ করে নাট্যোল্লিখিত চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটানোর ব্যাপারে এই জনান্তিকের প্রয়োগ করেছেন অদ্ভুত দক্ষতার সংগে। যেভাবে, যে টেক্নিকে খুসী বড় নাটক সৃষ্টির এই যে ক্ষমতা আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে এটা সুদুর্লভ। তিনি কোথাও টেক্নিকের দাস হন নি—বিচিত্র টেক্নিক তাঁর বহু-বিচিত্র মনের প্রকাশে সহায়তা করেছে মাত্র। তাঁর নাটকাভিনয় সূত্রে মার্কিণ রংগমঞ্চেও এসেছে যুগান্তকারী বিপ্লব। তাঁর বহু-বিচিত্র নাটককে মঞ্চে উপস্থিত করতে গিয়ে মঞ্চকে প্রচলিত ঐতিহ্যের মোহ কাটিয়ে বিপ্লবমুখী হতে হয়েছে।

ও'নীলের নাটক বিচারে আর একটি অসুবিধাও আছে। এখানে তার উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর কয়েকখানি বাস্তববাদী নাটিকা ও নাটক বাদ দিলে, তাঁর অন্যান্য সব নাটকই দ্ব্যর্থবোধক। সাধারণভাবে একটা অর্থ তার স্পষ্ট বোঝা যায়। সংগে সংগে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় যে তার পিছনে একটা গভীরতর সূক্ষ্ম অর্থ আছে। তার কারণ ও'নীল প্রায়ই রূপক, এক্সপ্রেসনিজম্ প্রভৃতি বিভিন্ন নাট্যরচনা রীতি তাঁর নাটকে প্রয়োগ করেছেন। তা না করে তাঁর উপায়ও নেই। তার কারণ মানব-মনের গভীর রহস্য, অনুভূতি

অশোককুমার ও অজিত সেন (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও)
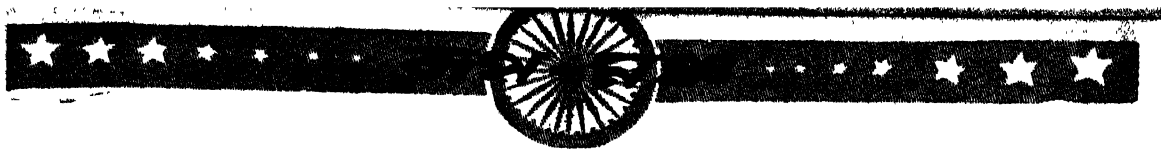
এবং মানবজীবনের চরম ট্রাজেডিকেই তিনি তাঁর নাটকে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যে মানুষকে আমরা বাইরে থেকে চিনি, তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করলে হয়ত দেখা যায় তিনি সে মানুষ নন— বহিরাংগের সংগে তাঁর অন্তরের কোন মিলই হয়ত নেই। তাই ও'নীলের নাটক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থবোধক। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের অনেক নীতিকেই তিনি তাঁর নাটকের মারফৎ রূপায়িত করে তুলেছেন। ফ্রয়েড্, য়ুং প্রমুখ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের বিপুল প্রভাব আছে ও'নীলের নাটকের উপর। তাই বলে তাঁর নাটক নিছক মনো-বিজ্ঞান মূলক নীতির সমষ্টি মাত্র এরূপ মনে করলে ভুল হবে। তিনি শক্তিমান নাট্যকার বলে নিজস্ব অভিজ্ঞতার জারক রসে এই সব মতবাদকে সংশোধিত করে নিতে পেরেছেন। শুধু তাই নয় শিল্পীর যাদুদণ্ড স্পর্শে তারা হয়ে উঠেছে নাটকেরই অংগীভূত। ও'নীলের কৃতিত্ব এইখানে।

মোটামুটি ও'নীলের নাটকের সাধারণ ভাবধারার ও গঠন পদ্ধতির একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁর এক একটি নাটক নিয়ে আলোচনা করার দুষ্প্রয়াস করব না। তার কারণ প্রতিটি নাটক সম্বন্ধে এক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখলেও তার অন্তর্নিহিত ভাবধারার সংগে পাঠক পাঠিকাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই এবার তাঁর বিশ্বপ্রসিদ্ধ নাটকগুলোর নাম দিয়েই এ প্রবন্ধ শেষ করব। ১৯২০ সাল থেকেই পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ও'নীলের সাফল্যের আরম্ভ। তারপর এ পর্যন্ত তাঁর সেই সাফল্যের গতি আছে অব্যাহত। সর্ব প্রথম তাঁর যে পূর্ণাংগ নাটকটি নিউ ইয়র্কে মঞ্চস্থ হয়েছিল তার নাম হল 'বিয়ণ্ড্ দি হরাইজন্' (Beyond the Horizon)। এটি ১৯২০ সালে রচিত ও প্রযোজিত হয়েছিল। প্রায় সেই সংগেই তাঁর 'দি এম্পেরর জোন্স্' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের আবির্ভাব। ১৯২১ সালে তিনি লিখেছিলেন 'দি হেয়ারী এপ্' (The Hairy Ape)। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'অল্ গডস্ চিলান গট উইংস্' (All gods chillun got wings)। 'ডিজায়ার আণ্ডার দি এল্ম্স' (Desire under the elms) হল ১৯২৪ সালের লেখা। 'মার্কো মিলিয়ন্সে'র (Marco milions) রচনাকাল হল ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত। ও'নীল তাঁর 'গ্রেট গড্ ব্রাউন্' (Great God Brown) ও 'ল্যাজারস্ লাফ্ড্ (Lazarus Laughed) রচনা করেছিলেন যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৫-২৬ সালে। তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি নাটক হল 'স্ট্রেঞ্জ ইণ্টারল্যুড্' ও 'মোর্ণিং বিকাম্স্ ইলেকট্রা'। এ নাটক দুটির রচনাকাল যথাক্রমে ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৯-৩১। এই হল মোটামুটি ও'নীলের শ্রেষ্ঠ নাটক। কিন্তু তাই বলে এই বয়সেও তাঁর নাটক রচনার উৎসাহ বা শক্তিতে আদৌ ভাঁটা পড়ে নি। তবে তিনি অত্যধিক বিবেকবান্ শিল্পী বলে নাটক রচনায় যথেষ্ট সময় নেন। বর্তমানে তিনি একটি নতুন নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। সমস্ত বিশ্ব উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে তাঁর এই নবতম নাটকের জন্যে। মার্কিন সুধীসমাজে ও'নীলের নাটকাভিনয়ের প্রচুর সমাদর। সাহিত্য হিসেবে বিশ্বের সাহিত্য-রসিকদের কাছেও তাঁর নাটক ভালো সমাদৃত। রঙ্গমঞ্চে পরম সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়ে তাঁর নাটকগুলো যেমন মার্কিণ জন-সমাজে প্রভূত সমাদর পেয়েছে, তেমনই তাঁর একাধিক নাটক চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

গতি...

ছন্দহীন কবিতা যেমন, গতিহীন ছবিও তেমনি। ছবির প্রথম রীল থেকে শেষ রীলটি পর্য্যন্ত কাহিনীটি অগ্রসর হবে স্বচ্ছন্দ গতির ভেতর দিয়ে। মাঝপথে ছবি যদি একবার তাব গতিবেগ হারিয়ে ফেলে, দর্শকের মনের আগ্রহও সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসে। গতির অভাবে ভালো গল্প ও দর্শকচিত্তে রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয না।

জটাশঙ্কর ঠক্করেব প্রযোজনায় এমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে একটি আধুনিক বলিষ্ঠ কাহিনী নিয়েই আওয়ার ফিল্মসের প্রথম চিত্র নতুন খবর তৈরী হচ্ছে। এবং এর বিভিন্ন অংশে অভিনয় করছেন ভারতী দেবী, ধীরাজ, পরেশ ব্যানার্জ্জি, অমর মল্লিক, নবদ্বীপ, এবং আরও অনেকে।

নতুন খবর

কাহিনী ও
পরিচালনা:—প্রেমেন্দ্র মিত্র
সঙ্গীত পবিচালনা:—কে, পি, সেন

পরিবেশক-প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

NO.5

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে যাঁরা দেখা দিয়েছেন, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মাঝে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন। তাঁর ভাষার তীক্ষ্ণতা—ঘটনার বাস্তবতা, প্রকাশ ভংগীর মুন্সিয়ানা যে কোন বাঙ্গালী পাঠকসাধারণকে মুগ্ধ না করে পারে না।

দোহাই সম্পাদক মশাই, আমার দোষ নেই। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি লোকটা খুব খারাপ নই। অবশ্য অজাতশত্রু বলে নিজেকে ঘোষণা করব না এবং আপনি এও জানেন যে, পৃথিবীতে এমন একদল মানুষ আছে যারা আমাদের মতো ভালো মানুষের নিন্দে করেই খুশি হয়। সুতরাং ও তরফ থেকে যদি কিছু শুনে থাকেন বিশ্বাস করবেন না।

আপনি হাতের কাছে নেই, নইলে আপনাকে ছুঁয়ে বলতুম যে, সত্যিই আমি আপনার জন্যে গল্প লিখতে বসেছিলুম। কাহিনীটাও মন্দ শুরু করিনি—সবে জ্যোৎস্নারাত্রে তমালের ডালে নায়িকাকে আত্মহত্যা করাতে যাচ্ছি, এমন সময়—

এমন সময় কী বলুন তো? নায়ক এসে নায়িকাকে রক্ষা করল? মোটেই নয়। একজন এল বটে, কিন্তু সে গল্পের নায়ক নয়, যত ভালো ভালো গল্পের নায়ক নায়িকার হত্যাকারী। হত্যাকারী কে? কেন, চিনলেন না? আপনাদের সেই ফিলিম-ডাইরেক্টার – সেই যে, সেই কানাই হাজরা?

আমি বললুম, এখন সরে পড়ো কানাই, বিরক্ত কোরোনা। আমি গল্প লিখছি। কানাই বললে, ধ্যাৎ—রাখো তোমার কচুপোড়ার গল্প। এক্ষুণি ষ্টুডিয়ো থেকে আঠারোটা শট নিয়ে ফিরছি। যদি অন্তত এক কাপ কড়া চা না খাওয়াও তবে এখানেই হার্টফেল করব।

আমি সভয়ে বললুম, থাখো বাপু, আর যা করো তাই করো—মরে টরে যেয়োনা। পুলিশের হাংগামা আমি বড় ভয় করি। কিন্তু ষ্টুডিয়োতে তো প্রচুর খেয়ে এসেছ, এককাপ চায়ের জন্যে এমন করছ কেন?

কানাই বললে, তুমি বুঝবে না। আগে চা আনাও।

বললুম, গুড়ের চা।

—চিটেগুড়ের হলেও আপত্তি নেই। এমন কি মিষ্টি না হলেও খেতে পারি।

ভূমিকায়ঃ
নরেশ মিত্র • বিমান
হরিধন • তুলসী চক্র
এস কুমার • অমর
চৌধুরী • হেম গুপ্ত
বানীব্রত • গীতশ্রী
মনিকা ঘোষ • রেবা
বসু • শ্রীমতী মুখার্জি
চলন্তিকা
চিত্র প্রতিষ্ঠানের
মাটি ও মানুষ
গল্প • চিত্রনাট্য • পরিচালনা • সুধীরবন্ধু
সঙ্গীত পরিচালনা — খগেন দাশগুপ্ত
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী — বিভূতি দাস
আলোক চিত্রশিল্পী — দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দ-যন্ত্র-শিল্পী — পরিতোষ বসু
শিল্প-নির্দ্দেশক — শুভ মুখার্জি
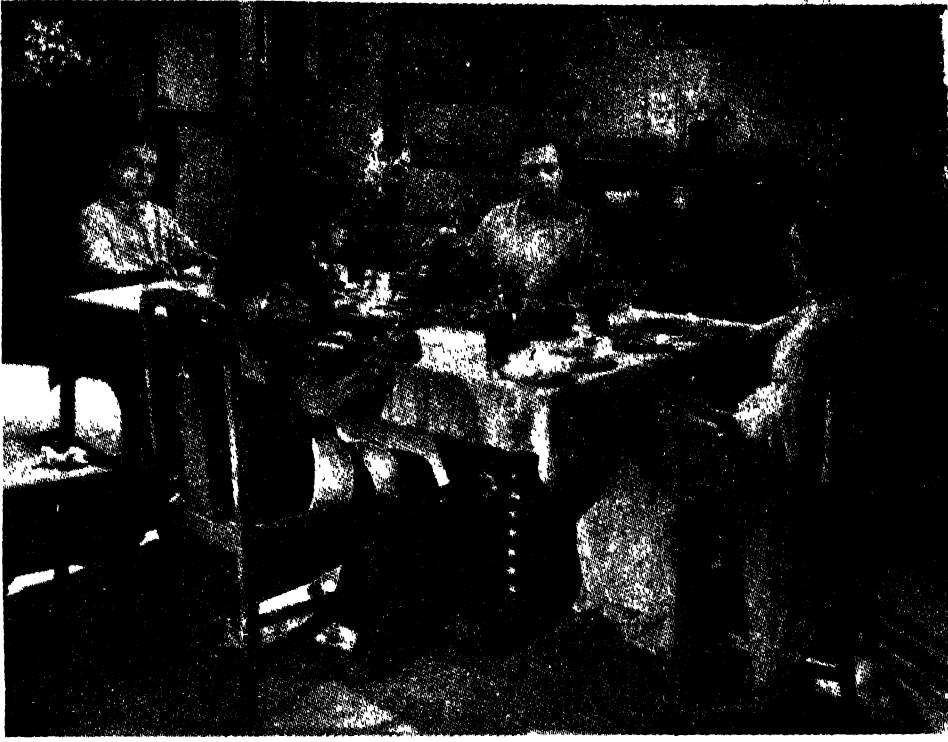
'প্রিয়তমা'য় পাহাড়ী, ইন্দু, আরতি ও ইন্দিরাকে দেখা যাচ্ছে।

বুঝলুম অবস্থা সংগীন। চায়ের ব্যবস্থা করতেই হল। চা খেয়ে একটু ধাতস্থ হল কানাই। তারপর কোটপ্যান্ট্ শুদ্ধই খাটটার ওপরে লম্বা হয়ে পড়ল। আমি বললুম, অমন শুয়ে পড়লে যে?

—কারণ বলবার মতো অবস্থা নয়।

—হঠাৎ হল কী?

কানাই বুক ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: আমার নতুন বইটা সেরেফ মার খেয়ে গেল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, সেই 'প্রাণের ডাক'? তুমি তো খুব বলছিলে একটা হিট্ বই হবে—ক্লাস পিকচার হবে—গেল কোথায় সে সব?

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে আধ-শোয়া ভংগীতে উঠে বসল কানাই হাজরা: আরে ভাই, জন-গণেশের মতিগতি বোঝা ব্রহ্মা বিষ্ণুরও অসাধ্য। ছুনিয়ার সব চাইতে রদ্দি মার্কা বইও দশ লাখ টাকা লুটে নিয়ে গেল। আর এত খেটে খুটে বই তুলেও নীট চল্লিশ হাজার টাকা লস! প্রোডি- উসার খ্যাপা কুকুরের মতো দাঁত বের করে আছে, ওর ভয়ে বড়বাজারের রাস্তায় হাঁটাই বন্ধ করে দিয়েছি।

আমি বললুম, দোষ তো তোমাদেরও আছে। তুমিই বলো—যে সব জিনিস আজকাল তোমরা ছবির আকারে পরিবেশন শুরু করেছ, তা কি ভদ্রলোকের পাতে দেবার মতো? কতগুলো বাঁধা সিচুয়েশন, কিছু ষ্টাণ্ট, গোটাকয়েক দ্বৈত বা দৈত্য সংগীত। লোকের ধৈর্যের একটা সীমা আছে নিশ্চয়ই। দিনের পর দিন তোমরা তাদের পকেট কাটবে আর তারা চুপচাপ বরদাস্ত করে যাবে—এটা আশা করছ কেন?

কানাই হাজরা গম্ভীর হয়ে রইল খানিক্ষণ। বললে, হুঁ। তোমাদের দোষ দেবনা। তোমরা টিকিট কেটে ছবি দেখতে যাও, ভালো না লাগলে গাল দিয়ে বেরিয়ে এসো। কিন্তু কখনো কি একবার ভেবেছ আমাদের কথা?

প্রতাপ ও শৈবলিনী—

"আমরা দু'জনা ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে !
আমরা দু'জনা করিয়াছি খেলা কোটী প্রেমিকের মাঝে
বিরহ বিধুর নয়ন-সলিলে মিলন মধুর লাজে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই শাশ্বত প্রেমের কাহিনী—

বাণীচিত্রে নবতর মাধুর্য্যে

অশোক, কানন, ভারতী
সুবিখ্যাত তারকাত্রয়ের প্রথম সমাবেশে
রূপায়িত :
বঙ্কিমচন্দ্রের

চন্দ্রশেখর

নাম-ভূমিকায়—ছবি বিশ্বাস
বিশিষ্ট চরিত্রে—অমর মল্লিক
পরিচালনায়—দেবকী বসু
সুর সংযোজনায়—কমল দাশগুপ্ত

—মুক্তি আসন্ন প্রায়—

পাইওনিয়ার পিকচার্স—এসোসিয়েটেড হাউস
২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

কথনো কি একবার চিন্তা করেছ তাদের কথা—যারা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গায়ের রক্ত জল করে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলল সেলুলয়েডের ফিতেয় ? 'বাজে হয়েছে'—এই কথা বলেই তোমরা নিশ্চিন্ত কিন্তু তোমাদের একটি কথা যে আমাদের ভবিষ্যৎকে চুরমার করে দেয়—কোনোদিন কি সে কথা একবারও ভাববার অবসর পাও তোমরা ?

আমি বললুম, তোমার কথায় ইমোশন্যাল অ্যাপীল আছে, কিন্তু যুক্তি নেই। চোরওতো বলতে পারে, আমরা কত কষ্ট করে অন্ধকারে বোনে জংগলে লুকিয়ে থাকি, মশার কামড় খাই, গায়ের রক্ত জল করে সিঁধ কাটি –

কানাই হাজরা করুণ কণ্ঠে বললে, দোহাই, ওভাবে তুলনা দিয়োনা। আমাদের মধ্যে সিঁধ কাটা লোক নেই তা বলছিনা, কিন্তু আমরা সবাই অত খারাপ নই। শুধু পয়সার লোভেই কি আমরা ছবি তুলি ? শিল্পীর শিল্প-সাধনার অর্থমূল্য থাকতে পারে। কিন্তু তারও একটা সৃষ্টির আনন্দ আছে—যেখানে অর্থকরী দিকটাই একমাত্র সত্য নয়। আমাদের সম্পর্কেও একথা মেনে নিতে পারো।

—কিন্তু তোমার তুলনাই কি ঠিক হল ? শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির রূপ তো আলাদা।

—নিশ্চয় আলাদা।—কানাই হাজরা কথাটা কেড়ে নিলে : আমিও তাই বলতে চাইছিলুম। শিল্পীর নিজের রচনার ওপরে একটা কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু আমরা যারা ছোট ফিলিম কোম্পানির ছোট ডাইরেক্টার—সে সুযোগ আমাদের কোথায় ? যা করতে চাই, আমরা কি তা করতে পারি ? প্রতিপদে আমাদের বাধা, প্রতিটি জিনিসে আমাদের ব্যক্তিত্বের অপমান। শিব গড়তে আমরা চাই, গড়তে একেবারে না জানি তাও নয়। তবু সে শিব যেন বাদর হয়, জানতে চাও ?

কানাই হাজরার উত্তেজনায় আমি বিচলিত বোধ করলুম। বললুম, বেশ বলো।

—তা হলে শোন। ছোট ফিলিম-কোম্পানির ছোট ডাইরেকটারের একটা অকপট জবানবন্দী। তোমরা যারা আমাদের শুধু সমালোচনাই করো—বিচার করোনা, এ কথাগুলো তোমাদের শোনার দরকার আছে। শুধু শুনলেই হবেনা, তোমার মতো যারা উন্নাসিক দর্শক, পারো তো তাদেরও শুনিয়ে দিয়ো।

আচ্ছা বলো। পারি তো তোমার অনুরোধ রক্ষা করব।

কানাই হাজরা শুরু করেন :

প্রথমেই বলবে গল্পের দৈন্য। ঠিক কথা। যার ওপর নির্ভর করে ছবিটা প্রাণ পাবে তার যদি মেরুদণ্ড না থাকে তাহলে বই দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ভালো লেখকের ভালো গল্প কিনতে গেলেই প্রচুর টাকা চাই। অবশ্য এত প্রচুর নয় যে, দেড়লাখ টাকার একটা মোটামুটি প্রোডাক-সনের পক্ষে তা মারাত্মক। তবুও একদল প্রোডিউসার আছেন যে, পেনিওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ হতে তাঁদের আপত্তি নেই। সুতরাং তাঁরা হয় এমন গল্প জোগাড় করেন যার জন্যে পয়সা দিতে লাগেনা, কিংবা নামমাত্র দিলেই চলে। কেউ কেউ আবার নিজেরাই গল্প লিখতে চেষ্টা করেন। দশখানা বই থেকে দশটা জিনিস ধার করে যে বস্তু তারা খাড়া করেন, তাতেই বইয়ের নাভিশ্বাস দেখা দেয়। ভেবে দেখো, সাহিত্য বোধ যার কণামাত্র নেই, শিল্প চেতনাও না—যার মোটা মগজ পাটের দালালী আর কালোবাজার করেছে বরাবর, সে লিখছে গল্প! টাকা থাকলেই যে গল্প লেখার স্পর্ধা করে তার কাছ থেকে কতটুকু তোমরা আশা করতে পারো ? আর এই অতি সহজ গল্পকেই চালু করবার জন্যে ডাক পড়ে আমাদের। আর প্রথমেই কি ফরমায়েস হয় জানো ?

আমি বললুম, বলো শুনি।

—তাঁদের হুকুম হয়, 'বেশি আউটডোর চলবেনা মশাই। যত কম খরচে সম্ভব সেট তৈরী করতে পারা যায় সেই চেষ্টা করুন।' কাজেই ষ্টুডিয়োর ভেতরেই আমরা তৈরী করি সুন্দরবন,—বাঁশের খুটির গায়ে শুকনো পাতা ঝুলতে থাকে, পাতার সংগে ফুল মেলেনা। এমন প্রাসাদ তৈরী হয় যে, একটু জোরে হাঁটা চলা করলেই তার পাঁচীল কাঁপতে শুরু করে।

আমি বললুম, প্রতিবাদ করোনা কেন ?

—করলে চাকরি যাবে। সস্তার ডাইরেক্টার এগিয়ে আসবে আরো সস্তায় কাজ করে দেবার জন্তে। অথচ চাকরি গেলে আমি খাই কি?

বললুম, তা বটে।

তারপরে প্রোডিউসারের পার্সোন্যাল ফ্যান্সিও থাকে অনেক সময়। একে চাই, ওকে চাই। অমুক দেবীর বয়েস যদি চল্লিশও পেরিয়ে গিয়ে থাকে এবং অ্যাল্কহলিক্ ফ্যাটে তার পেট ঝুলে নামে মারবার-সুন্দরীর মতো। তবু তাকে ষোলো বছরের নায়িকার ভূমিকায় নামাতে হবে। উদ্দেশ্য বক্স অফিস। আবার উলটো দিকও আছে। বিনি পয়সায় বা নামমাত্র পয়সায় তাঁরা খাতিরের নিউ ফেস্ নামাবেন—ফলে দুদিক থেকে আমাদের প্রাণান্ত।

— কী রকম?

—যিনি নামকরা আর্টিষ্ট তাঁর মেজাজই আলাদা। কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার টাকার খাঁই তাঁদের, অথচ আমাদের মতো ক্ষীণ-প্রাণীদের ওপরে তাঁদের অনেকের জুলুমের অন্ত নেই। আমাদের যেন তাঁরা কৃপার পাত্র মনে করেন। ঠিক যেটি করতে বলব সেটি ছাড়া আর সব কিছু তারা করবেন। ডান দিক দিয়ে এণ্ট্রান্স নিতে বললে নেবেন বাঁ দিক থেকে। সেখানে স্বাভাবিক কথা বলার দরকার করবেন মেলোড্রামা। বুড়োর মেক আফ্ নিতে বললে সাজবেন ফিনফিনে ছোকরা। নায়িকা বস্তির মেয়ের ভূমিকায় নামতে চান কানে হীরের দুল পরে। বুড়ি সাজতে বললে তো তাদের হিষ্টিরিয়া। কুড়ি বছরের lapse of times দেখাও মুলে একটা wrinkle তাঁরা ফোটাতে দেবেন না। তাদের বিউটি অ্যাপিল নাকি নষ্ট হ'য়ে যাবে। আর আমরা প্রতিবাদ করলে বলবেন, রাখুন মশাই, আমার কী দরকার সেটা আমিই ভাল বুঝি। প্রডিউসারকে নালিস করলে জবাব আসবে, আরে রেখে দিন, ওরা ক্লাস আর্টিষ্ট স্টেজে মেরে দেবেন।

শুধু কি এই? দশটায় সময় দিলে অনেকে আসবেন বারোটায়। ফলে লাইট ফাইট ঠিক করে হাঁ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। যদি 'মুড্' না থাকে, পরপর এন্-জি করে যাবেন—আমাদের দুর্ভোগের চূড়ান্ত। তা ছাড়া প্রোডিউসারের সংগে যদি কোন অভিনেত্রীর একটু অব্যবসায়িক যোগাযোগ থাকে, তাহলে দুঃখের পাত্র পূর্ণ হতে কিছু আর বাকী থাকে না।

—আর যারা নিউ ফেস?

—আরো চমৎকার। মুখ দিয়ে যাঁর কথা ফোটে না, তিনি 'হিরো'। হাঁটতে বললে যিনি খামোখা নেচে উঠলেন তিনিই হিরোইন। ওদিকে জঘন্য উচ্চারণ, এক লাইন পার্ট মুখস্থ করবার মত মেমরি নেই, বিদ্যেও নেই বোধ হয়। কাহাতক এন্-জি করা যায় এসমস্ত ইম্পসিবল্ এলিমেন্ট নিয়ে? প্রোডিউসার বলবেন, "র ষ্টক" অত নষ্ট করা চলবে না মশাই, বিশ হাজারের ভেতরে সব ম্যানেজ করতে হবে। আমরাও তাই ম্যানেজ করে যাই—ফলে যা হওয়ার তাই হয়।

—নতুন আর্টিষ্টকে ধমক দিতে পারো না?

—ধমক দিলে আরো ঘাবড়ে যায়। তা ছাড়া সকলকেই কি ধমক দেওয়া সম্ভব? প্রোডিউসারের শালা অথবা

তাঁর পার্টনারের ছেলে যেখানে নায়ক আমাদের করজোড়ে থাকতে হয়। কী করব বলো, চাকরী তো রাখা চাই।

—হুঁ, তারপর?

—বেশির ভাগেরই ভাড়া করা ষ্টুডিয়ো। এক একটা ফ্লোরে চার পাঁচটা কোম্পানির শুটিং চলছে, উইকে দরকার মতো ডেট পাওয়াই শক্ত। যেদিন ডেট পাওয়া যাবে সেদিন হয়ত অমুক আর্টিষ্টকে পাওয়া যাবে না, আবার যেদিন আর্টিষ্টকে পাওয়া যাবে সেদিন ফ্লোর মিলবে না। এক সংগে ষোলোখানা বইয়ে হয়তো তাঁরা অভিনয় করছেন, তাঁদের সময় বুঝে আমাদের ডেট নিতে হবে। আবার সেট্ নিয়ে বিপদ—বড় একটা সেট্ দু'তিন দিনের বেশি রাখা যাবে না, যেমন করে হোক সাত দিনের কাজ তিন দিনে সেরে দিতে হবে। যদি খারাপ হয় রি-টেক করবার উপায় নেই। প্রোডিউসার সাব জবাব দেবেন: আমাকে কি আপনারা পথে বসাতে চান মশাই?

—সেট কেন রাখা যাবে না?

—আরে, কী করে রাখব? আজ আমরা যা দিয়ে দেব-মন্দির তৈরী করেছি, কাল তাই ভেংগে অমুক কোম-পানির দুর্গ তৈরী হবে। তাদেরও ডেট নেওয়া হয়ে গেছে, সেট তৈরী চাই। কাজেই—বুঝতেই পারছ।

—বুঝলাম।

—এই শেষ নয়। বিকৃত মুখে কানাই হাজরা বলতে লাগল: ভাড়াটে ফ্লোরের টেক্‌নিসিয়ান্, তাদের মর্জি মেজাজ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মতো। জুৎসই টিপস দিতে না পারলে কো-অপারেশন অসম্ভব। বললাম হয়ত সফ্ট টোনিং করতে, সাউণ্ড্ রেকর্ডার এমন হার্ড রেকর্ডিং করলেন যে, প্রোজেক্‌সনে পড়তে জিনিষটার চেহারাই পালটে গেল। নায়ক হয়ত মিহিসুরে নায়িকাকে প্রেমের কথা শোনাচ্ছে কিন্তু শুনলে মনে হবে যেন হুংকার ছাড়ছে। কিছু যদি জিজ্ঞেস করি, উপদেশ দেবেন—ওটা মফঃস্বল হাউসের জন্যে করেছি মশাই, সেখানে হার্ড রেকর্ডিং না করলে চলে না। ক্যামেরাম্যান তো হিমালয়ের মতো উঁচু—তিনি জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের এমন একটা এভারেষ্টে বাস করছেন যে, তাঁকে স্পর্শ করা অসম্ভব। কিছু বলবার উপায় নেই, কারণ তাঁরা আমাদের ধার ধারেন না বড় ষ্টুডিয়োর তাঁরা বড় বড় কর্মচারী।

—তারপর?

—তারপর?—কানাই হাজরা এবার উঠে বসল: কত শুনবে চালের ধান বাছতে গেলে কুলোয় একটা চালও থাকবে না। স্টুডিয়োর বন্দোবস্ত বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এত খারাপ যে, সে বলবার মতো নয়। সাউণ্ড-প্রুফ স্টুডিয়ো নেই, এক পশলা বৃষ্টি নামলেই টিনের চালে ঝমর ঝমর করে শব্দ—শুটিংয়ের দফা রফা। ক্রেন্ তো সপ্নের চেয়ে অবাস্তব—একটা ভালো আধুনিক ট্রলি পর্যন্ত নেই যে, ভালো করে একটা ট্রাক ব্যাক করা চলে। যদি বা থাকে সে সব ইকুইপ্‌মেণ্টস্ আমরা পাই না—নিজেদের ছবির জন্যে ষ্টুডিয়োর মালিকরা তা রিজার্ভ রাখেন। ক্যামেরা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের—লেন্সের অবস্থাও সেইরকম। আর আলোর সম্পর্কে তো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যেখানে তিরিশটা আলো হ'লে ফুল লাইটিং হয়, সেখানে সাতটা দিয়ে কাজ চালাতে হয় আমাদের—পঞ্চাশ হাজারের জায়গায় আমাদের ছবি ওঠে দশ হাজারে। যত রকমে বই খারাপ করা যায়—তারই ব্যাপক বন্দোবস্ত চারদিকে। ভালো ছবি! ছোট কোমপানির ছোট ডাইরেকটারের ভালো বই তুলতে যাওয়া আকাশ কুসুমের চাইতে অসম্ভব।

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, কানাই হাজরা বাধা দিলে। তীব্র স্বরে বলে চলল, তবু এর মধ্যে আমরা লড়াই করি। এর মধ্যেই আহার নিদ্রা বন্ধ করে আমরা করি শিল্পের সাধনা। যে বই গড়ে তুলতে একবছর লাগা উচিত, তিরিশটা শুটিং ডেটে আমরা তাকে তুলে ফেলি। হাসলে যে নায়িকার পোকা লাগা দাঁত মাড়ি-শুদ্ধ বেরিয়ে পড়ে, তাকে আমরা গড়ি অপ্সরী। কাপড়ের উপর ছবি এঁকে দেখাই অসীম আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়। এ অসাধ্য সাধন শুধু আমাদের মতো বাঙ্গালী ফিলিম-ডাইরেকটারের পক্ষেই সম্ভব। আর টলিউড্ ছাড়া এমন বুকের পাটাও কারুর নেই।
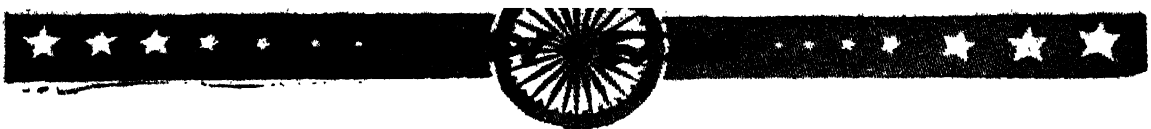
আমি নীরবে তাকিয়ে রইলুম।

কানাই হাজরা বলে চলল: তারপরে রূপালি পর্দায় তোমরা যা দেখতে পাও সে আমাদের এই দুঃসাধ্য তপস্যার রূপমূর্তি। কারো যদি পূণ্যফল থাকে উত্‌রে যায়, কিন্তু সেটা নিতান্তই অ্যাকসিডেন্ট। আর বেশীর ভাগই যা হওয়ার তাই হয়—বিশুদ্ধ 'ফ্লপ্'। আমরা তবু চেষ্টা করি। শুধু নামের জন্য নয়, অর্থের জন্যেও নয়। আমরা বাঙ্গালী, শিল্পবোধ আমাদের রক্তে রক্তে, সুন্দরের তপস্যা আমাদের স্বভাবজাত। তারই মোহে এ পথ ছাড়তে পারি না—অসম্ভব তপস্যার মধ্যেও দেখি শিল্পের পূর্ণতার স্বপ্ন—'সুপারহিটের' মরীচিকা। তবু এক কথায় তোমরা আমাদের উড়িয়ে দাও। আমরা যারা ছোট কোম্পানির ছোট ডাইরেকটার—একবার ভাবোনা আমাদের দুবিসহ যন্ত্রণার কথা। একবারও চিন্তা করোনা আমাদের মর্মান্তিক বেদনার কথা। "বাজে বই—ফোর্থ ক্লাশ।" ঠিক কথা। কিন্তু আমরা সবাই ফোর্থ ক্লাশ নই। সুযোগ দাও আমাদের, উপায় দাও, অধিকার দাও আত্মপ্রতিষ্ঠার। আর তা যদি না পারো, তোমরা উন্নাসিকের দল—অন্তত আমাদের গাল দিয়োনা, অন্তত সত্যিকারের সহানুভূতি নিয়ে আমাদের বুঝতে চেষ্টা কোরো। তোমাদের পকেট সত্যি সত্যিই কে মারে, কে তোমাদের দুধের নামে পিটুলি গেলাতে চায় সেই লোকগুলোকে চেনবার চেষ্টা করো, আমাদের মতো আধপেটা খাওয়া এই শিল্প-সাধকদের ওপরে অকারণে বজ্রাঘাত কোরোনা।

বলতে বলতে প্রায় ক্ষেপে উঠল কানাই হাজরা। তারপর তড়াক করে উঠে চলে গেল ঘর থেকে—আমি বোকার মতো শুধু তাকিয়েই রইলুম সেই দিকে। পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা?

তাই বলছিলুম সম্পাদক মশাই, আমার দোষ নেই। কানাই হাজরা আমার গল্পটাকে হত্যা করে দিয়ে গেল। কিন্তু আমিতো আনাড়ী লোক—আপনাদের ফিলিম সম্পর্কে একেবারে ডোমকানা, তাই লোকটা আমাকে চাল মেরে গেল কিনা বুঝতে পারলুম না। গল্পটা যখন লেখাই হোলো না, তখন কানাই হাজরার জবানবন্দীটা যেমন শুনেছিলুম, তেমনি আপনাদের পাঠিয়ে দিলুম। আপনারা জহুরী লোক—এর সত্যি মিথ্যে আপনারাই বিচার করবেন।

বাসনা

প্রবোধকুমার সান্যাল

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালের স্থান সুধীজনই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বহু স্থান পরিভ্রমণ করে, বহু চরিত্রের সংস্পর্শে এসে—জীবনকে নানানভাবে দেখবার ও বুঝবার সুযোগ প্রবোধকুমারের যতখানি হ'য়েছে, বহু সাহিত্যিকই তা' থেকে বঞ্চিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রখরতর তাদের সাহায্যে প্রবোধকুমার যখনই যা সৃষ্টি করেছেন, তা হ'য়েছে অনবদ্য—অতুলনীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখরতা আজও প্রবোধকুমারের ভিতর থেকে স্তিমিত হয়ে যায়নি—তাই তাঁর নূতন নূতন সৃষ্টি—একদিকে যেমনি বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করছে তেমনি সমৃদ্ধতর করে তুলছে বাংলা-সাহিত্যকে।

শীতের রাত কিনা, প্লাট্‌ফরমে লোকজন ছিল কম। আরে ভাই শোনো, প্লাট্‌ফরমে নেমেই আমি গন্ধ পেয়েছি, দু'জন গোয়েন্দা আমার পিছু নিয়েছে। সব চেয়ে ছুঁচো গোয়েন্দা হোলো বাঙ্গালী—সব চেয়ে সাংঘাতিক। মহীশূরে যাও বাঙ্গালী গোয়েন্দা, কাশ্মীরে যাও গোয়েন্দার কর্তা হোলো বাঙ্গালী। সব চেয়ে নোংরা কাজে বাঙ্গালীর খ্যাতিও সব চেয়ে বেশী।

তারপর?—রঞ্জিত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলো।

হেমন্ত চলতে চলতে বললে, শোনো। রাত তখন প্রায় ন'টা হবে—এখন সাড়ে বারোটা। আমি আর কি করি, পরের ট্রেনের দেরী তখন প্রায় দুঘণ্টা। ওয়েটিং রুমের অন্ধকারে এক বেঞ্চে গিয়ে শুলুম, অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রায় দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি। তিনশো মাইলের মধ্যে অন্ততঃ বার-দশেক গাড়ী বদল করেছি। ঘুম এসেছে এবার, কিন্তু কী মশা ভাই, চোখ বুজবার জো নেই। রিভলভারটা সংগে রয়েছে, ডাকাতির টাকাও কিছু ছিল। ভাবছিলুম শোন্-ঈষ্ট-ব্যাঙ্কের খোট্টা পুলিশ দারোগাটা আমার গুলী খেয়ে এতক্ষণ হয়ত মারাই গিয়ে থাকবে! এই নিয়ে গোটা পাঁচেক হোলো!

বাজারের রাস্তাটা পেরিয়ে দু'জনে সরু একটা গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। নোংরা দুর্গন্ধময় নালী একদিকে, অন্যদিকে খোলার খাপরাঘর সারি বেঁধে চলেছে। রঞ্জিত পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

শোনো, শুয়ে আছি চুপচাপ গাড়ীর অপেক্ষায়—গাড়ীর
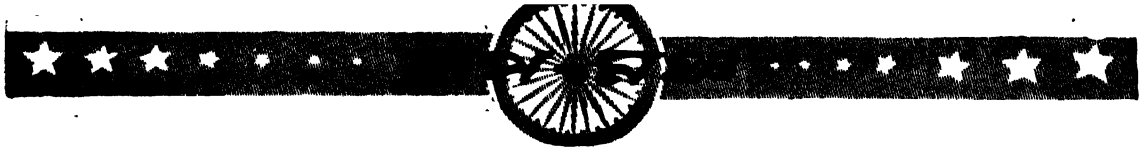
অনেক দেরী, এমন সময়ে দু'জনের এক বেটা রুমের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। রিভল্‌ভারটা একবার ছুঁয়ে ভাবলুম, দিই বেটাকে ঝেড়ে একহাত। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে মিষ্টি গলায় বললে, আপনি কোথায় যাবেন, স্যর?—বললুম, শ্বশুরবাড়ী। অর্থাৎ কলকাতায়। আপনি কে? বললে, আমি টিকিট চেকার। আপনার টিকিটখানা একটু দেখান্। কোত্থেকে আসছেন স্যর আপনি? বললুম, টিকিট পরে দেখাচ্ছি,—আচ্ছা আমাকে পুরি-মেঠাই খাওয়াতে পারেন?

কী উৎসাহ লোকটার আমাকে ফাঁদে ধরাতে পারলেই ত' চাকরির উন্নতি! বললে, পারি বৈ কি—না না, আপনি ভদ্রলোক, খেতে চেয়েছেন, - বিলক্ষণ, পয়সা দেবেন কেন? আমিই এনে দিচ্ছি!—লোকটা ছুটলো।

রঞ্জিত চাপা গলায় অধীর প্রশ্ন করলো, তারপর?

দুঘণ্টা আর কতটুকু? খাবার এনে দিয়েছে,—খাচ্ছি মজা করে, এমন সময় ট্রেন এসে পড়লো। আমার মতলব ঠিকই ছিল। গাড়ীখানা কলকাতা যাবে, দাঁড়ালো অনেকক্ষণ। ওরা ভেবে নিয়েছে আমি গাড়ী ধরবো না। সুতরাং পরিপাটি ক'রে খেয়ে হাত ধুয়ে পান চিবিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছি,—এমন সময় গাড়ী ছাড়লো। গাড়ীতে স্পীড্ দিচ্ছে—দিচ্ছে—দিচ্ছে—প্রায় ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যায়, এমন সময় হঠাৎ উঠে আমি ছুটতে ছুটতে একখানা থার্ডক্লাস কামরার হাতল্ ধ'রে বাগিয়ে উঠে পড়েছি। আমি জানি ওরা পরের ষ্টেশনে টেলিফোন্ করবে, সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ,—প্রাণের দায়ে কিছুদূর গিয়ে চলন্ত ট্রেণ থেকে আবার আমাকে লাফিয়ে পড়তে হোলো। মাইল তিনেক হাঁটতে হাঁটতে তোমার বাড়ীতে গিয়ে পৌছলুম। একটা সুবিধে এই পেলুম, থার্ড ক্লাস যাত্রীরা তখন মুড়ি দিয়ে অগাধে ঘুমোচ্ছে।

রঞ্জিত এক জায়গায় এসে থামলো। সামনে মেটে চালা ঘরের ছোট্ট দরজা। রঞ্জিত অতি সন্তর্পণে খুটখুট ক'রে দরজায় তিনবার টোকা দিল, তারপর বললে, এ ছাড়া তোমাকে আর কোথাও জায়গা দিতে পারবোনা হে,—অবিশ্যি এটা ভালো জায়গা নয়। তবু এখানে দিন দুই চার ভালোই বিশ্রাম নিতে পারবে। পুলিশের চোখ এখনো এখানে পড়েনি।

রঞ্জিত আর একবার দরজায় শব্দ করলো। পরে বললে, আমার কাছে তোমার বিপদ ঘটলে সমস্ত বাঙলা দেশে আমি মুখ দেখাতে পারবো না,—দেশশুদ্ধ আমাকে ছি ছি করবে। তুমি যে আবার দলের পাণ্ডা কিনা!

যথারীতি ধীরে ধীরেই দরজাটা এবার খুললো। ভিতরের কেরোসিনের ডিবের স্তিমিত আলোয় একটি স্ত্রীলোককে দেখে রঞ্জিত বললে, কেউ আছে?

মেয়েটি চাপা গলায় বললে, আছে দু'জন।

যাবে এক্ষুণি?

হাসিমুখে মেয়েটি বললে, কাঁচা বয়েস, সহজে যাবেনা!

হেমন্তকে দেখিয়ে রঞ্জিত বললে, এ আমার বন্ধু,—থাকবে তোমার এখানে। একে পশ্চিমের ঘরটায় রেখো। সাবধান।

রঞ্জিতের পিছু পিছু হেমন্ত ভিতরে এসে দাঁড়ালো। ভিতরটা সম্পূর্ণ বুকচাপা। দারিদ্র্যের বীভৎসতা চারিদিক থেকে যেন এরই মধ্যে তার গলা টিপে ধরেছে কিন্তু তা'র বিপ্লবী জীবনের একটি রাত্রির এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তা'কে যেন কেমন এক প্রকার অভিভূত করে দিয়েছে। কথা বলবার বা প্রতিবাদ জানাবার শক্তি তা'র ছিলনা।

রঞ্জিতের কথায় রাজি হয়ে মেয়েটি চ'লে যাচ্ছিল, পিছন থেকে রঞ্জিত পুনরায় ডাকলো, শোনো, শিবানী—

মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো। কপালে তার কাঁচপোকার টিপ,

মুখখানা পাউডার ঘষা, পরণে চকচকে চেক্ শাড়ী, গায়ের জামাটা ব্যবসায়ের উপযোগী, দুই ঠোঁটে পানের দাগ। মুখের শ্রী যেমনই হোক, মাংসল স্বাস্থ্যটা প্রথমেই চোখে পড়ে। রঞ্জিত বললে, শোনো, আমার বন্ধু কিছু খাবেনা, ও খেয়ে এসেছে।

শিবানী বললে, ও কি কথা, ঠাকুরের ভোগ দেবো না? আমার ভাত আছে, ভাগ ক'রে খাবো।

না, আজ থাক্। কাল ওকে রেঁধে দিয়ো।

তোমরা কি দুজনেই থাকবে?

রঞ্জিত বললে, না আমি এক্ষুণি পালাবো।

কিন্তু তোমার সংগে কথা আছে যে? দাঁড়াও আমি ছেলে দুটোকে তাড়িয়ে আসছি এক্ষুণি—তোমরা ওঘরে গিয়ে ব'সো।

আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে। প্রায় একটা বাজে।

শিবানী হাসিমুখে বললে, বেশ যা হোক, পোড়ারমুখীকে না হয় পায়ের তলায় রাখলেই একদিন।—এই ব'লে সে ছুট্টে চ'লে গেল।

পশ্চিমের ঘরে ঢুকে রঞ্জিত নিজেই আলোটা জাললো। সামনেই একখানা ভাঙ্গা তক্তা। তার ওপর একখানা ছেঁড়া চাটাই ছাড়া আর যা কিছু শয্যাদ্রব্য আছে, তা শ্মশানের পরিত্যক্ত সামগ্রীর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। মেটে দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট দুটি কাঠের জানালা। ঘরের একদিকে একরাশি জ্বালানি কাঠ, এপাশে গোটা দুই কলাইয়ের বাসন। চৌকির নীচে এত জঞ্জাল যে, সাপের আড্ডা বললে ভুল হয়না।

হেমন্ত বললে, জায়গাটা অদ্ভুত বটে। কিন্তু মেয়েটি কে বলোত?

রঞ্জিত বললে, পৃথিবীর সব চেয়ে পুরণো ব্যবসা যারা চালায়, মেয়েটা তাদেরই একজন।

হেমন্ত একটু থতিয়ে বললে, তোমার সংগে ভাব হোলো কেমন ক'রে?

ওর স্বামী এককালে আমার বিশেষ পরিচিত ছিল। লোকটা ওকে ত্যাগ ক'রে আবার বিয়ে করেছে।

ত্যাগ করলো কেন?

রঞ্জিত হাসিমুখে বললে, তুমি কি একরাত্রেই সবটা শুনে নিতে চাও?

হেমন্ত মুখ ফিরিয়ে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। পরে বললে, তুমি তা'হলে স্বীকার করো, একজনের পারিবারিক জীবনের সর্বনাশ করেছ? একটা জীবনকে তুমি অধঃপতনে নামিয়েছ।

রঞ্জিত বললে, ওরে ভাই, জীবন বড় জটিল। তুমি পাঁচটা লোককে খুন ক'রে কতগুলো নিরীহ মানুষকে পথে বসিয়েছ, তা জানো?

সেখানে যে একটা আদর্শ আছে!—হেমন্ত প্রতিবাদ জানালো।

আদর্শের জন্যে আরো অনেক রকমের আত্মবলি আছে, হেমন্ত।

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। শিবানী দ্রুতপদে ঘরে এসে দাঁড়ালো। বললে, ওরা গেছে,—বাঁচলুম। গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওদের উৎপাতে।

রঞ্জিত বললে, দিয়ে গেল কিছু?

শিবানী বললে, ওদের মধ্যে একটা ছেলে খুব বড়লোক। টাকার পরোয়া করেনা। প্রায়ই এখানে আসে।

হেমন্ত বললে, এইভাবে লোকের কাছে টাকা নিতে ভালো লাগে?

হ্যাঁ—শিবানীও তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

ঘেন্না করেনা?

একটুও না।

ঘেন্না করেনা কেন?—হেমন্ত জানতে চাইলো।

শিবানী বললে, ডাকাতি ক'রে কেউ বা টাকা নেয়, কেউ বা টাকা নেয় ভালবেসে! মেয়েদের পক্ষে শেষেরটাই সুবিধে!

হেমন্ত প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, কিন্তু এটাকা ত' দেহ বিক্রির টাকা।

শিবানী একবার রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে বললে, মেয়ে মানুষের জন্মই ত' সেইজন্যে! এ আর নতুন কি? কি বলুন দাদা?

দাদা! হেমন্ত যেন আঘাত পেয়ে চমকে উঠলো। এ আবার কি প্রকার সম্ভাষণ! রঞ্জিত শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়ে বললে, অনেকে তোমার কথা বুঝতে চাইবেনা, শিবানী! আচ্ছা, আমি ভাই এবার পালাবো। শিবানী বললে, এরই মধ্যে?

হ্যাঁ—তা'র আগে আমার বন্ধু জয়ন্তর সংগে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। আজকে ও ঘুমোক—বড় ক্লান্ত। কাল থেকে জয়ন্তর সংগে তুমি খুব ঝগড়া করো!

রঞ্জিত পলকের মধ্যেই হেমন্তর নামটা বদলে দিতে পারলো। পরে সে বললে, আর শোনো একটা কথা,—এটা কিন্তু একটু লুকিয়ে রাখতে হবে।

এই ব'লে রঞ্জিত হেমন্তর কাছ থেকে রিভলভার এবং টাকা ও গহনা সমেত একটা পুঁটলী বা'র ক'রে শিবানীর সামনে ধরলো। শিবানী হাসি মুখে বললে, আবার বুঝি সেই সব উৎপাত! ওটায় গুলী ভরা আছে?

হেমন্ত বললে, হ্যাঁ পুরোপুরি ভরা।

রিভলভারটা নিয়ে শিবানী অত্যন্ত অভিজ্ঞ হাতে এক প্রকার মোচড় দিয়ে বোতামটা আটকে দিল যাতে গুলি না
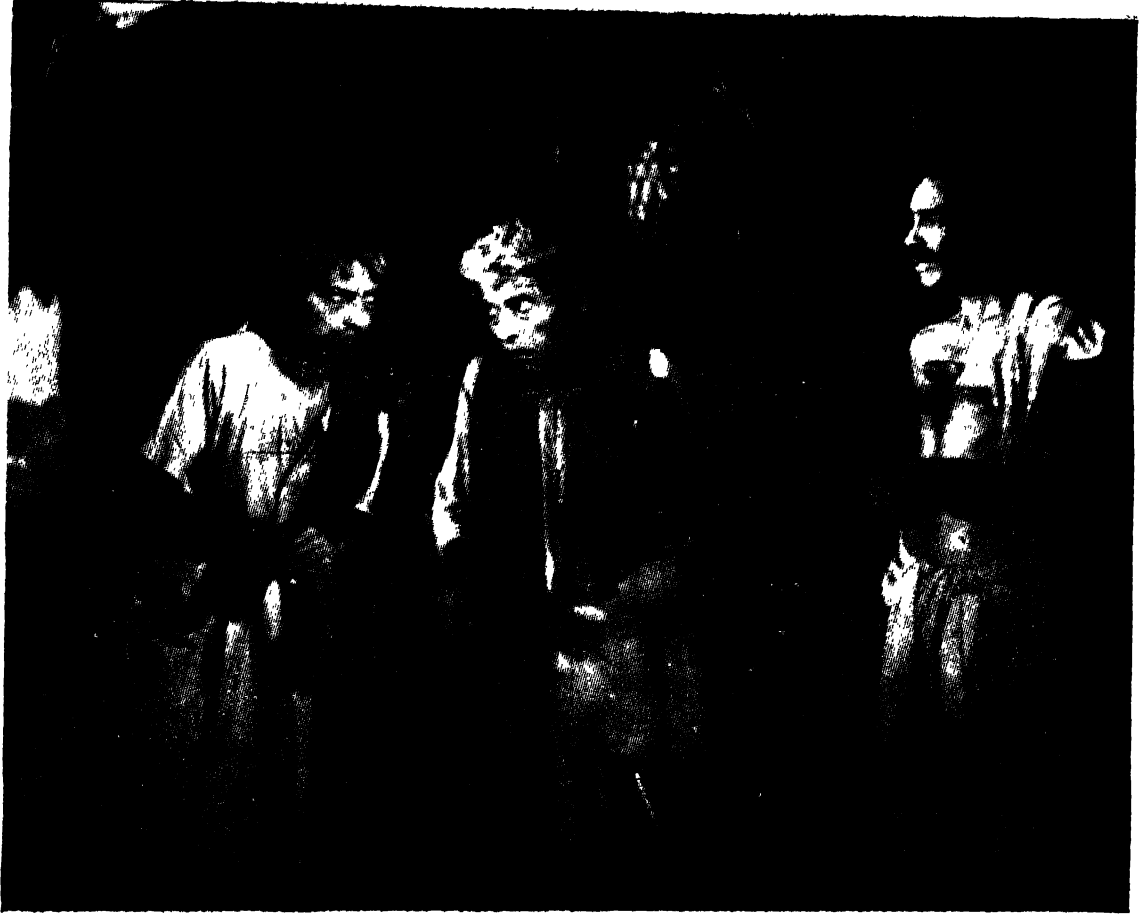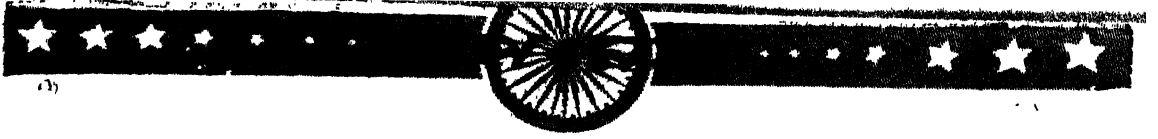
সিনে প্রডিউসার্সের 'মায়ের ডাক'-এর একটী দৃশ্যে কেস্ট দাস, ফণী রায় ও কানু বন্দ্যো।

ছিটকে বেরোয়। হেমন্ত তা'র নিপুণ হাতের কাজ দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল। রঞ্জিত বললে, আমি চললুম, আবার ঠিক সময়ে আসবো। শিবানী, এসো, দরজাটা দিয়ে যাও।

শিবানী গেল রঞ্জিতের পিছু পিছু। মেয়েটাকে এত বিচিত্র মনে হচ্ছে যে, খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। কেমন একটা সাবলীল অন্তরঙ্গতা,—তা'র চেহারা অনেকটা যেন পারিবারিক। হেমন্তর মনে পড়ছে তা'র এক সম্পর্কের বৌদিদিকে। স্বামীগতপ্রাণা সচ্চরিত্রা বধূ, কিন্তু আপন দেহের আব্রু সম্বন্ধে সে এতই উদাসীন যে, বিসদৃশ্য লাগে। এ স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ বিপরীতস্বভাবা, কিন্তু এর দেহতরঙ্গে কোন ভংগী নেই, চোখে কোনো মাদকতার কলাকুশলতা নেই,—যেটি এদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। হেমন্ত অবাক হয়ে থাকে

বাইরের দরজা সযত্নে বন্ধ ক'রে শিবানী আবার এসে ঘরে ঢুকলো। তারপর হাসিমুখে বললে, আপনার বন্ধুকে আমি দাদা বলি, উনি আমার সহোদরের চেয়েও বড়।

হেমন্ত বললে, এ কি আমি বিশ্বাস করবো?

শান্ত নম্র হাস্যে শিবানী জবাব দিল, দরকার হ'লে আপনার এ বিশ্বাস ভেঙ্গেও দেবো, জয়ন্তবাবু।

হেমন্ত সবিস্ময়ে বললে, এমন দরকার কি হয়, যার জন্যে নৈতিক পবিত্রতাকে নষ্ট করা চলে? কি বলছ তুমি?

শিবানী তাকালো হেমন্তর মুখের দিকে, তাকিয়ে এমন হাসিই হাসলো যে, বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক অজ্ঞান শিশুর দিকে চেয়ে যেমন ক'রে হাসে। তারপর বললে, আপনি বিপ্লবী না?

হেমন্ত বললে, লোকে বলে বটে!

আপনার দাড়ি গোঁফ নেই, বয়স অত কম, কিন্তু আপনাকে মুসলমান সেজে ঘুরতে হচ্ছে, দাড়ি-গোঁফ মুখে পরতে হয়েছে, এর কারণ কি? উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আপনি সবই ছাড়তে পারেন, এই না?

হেমন্ত বললে, অনেকটা—

শিবানী বললে, আমারও ধর্ম আছে একটা, তা'র জন্য আমি যে কোনো পাপ আর নোংরা কাজ করতে পারি। আপনার কাছে যেটা অন্যায়, আমার কাছে সেটা নয়।

কিন্তু নারীধর্ম?

আছে বৈ কি!

মেয়েদের সতীত্ব? —হেমন্ত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললে।

শিবানী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, একটা মহৎ কাজের জন্য যদি দু'চারটে চামড়ার সতীত্ব যায়, কোনো ক্ষতি নেই।

মহৎকাজের দাম সতীত্বের চেয়ে কি বড় ?

নিশ্চয় ! একশোবার ।—শিবানী জবাব দিল।

ঘরের পাশের গলিতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। রাত হয়ত দুটো বেজে গেছে। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সহসা শিবানী ফুঁ দিয়ে দপ ক'রে আলোটা নিবিয়ে দিল, তারপর অবলীলাক্রমে হেমন্তর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, চুপ।

কে ? আমার রিভলভার ?

চুপ, ভয় পেয়োনা, ওরা হয়ত রাত্তিরের খদ্দের! হয়ত অন্য কেউ।

দু'জনে নিঃসাড় হয়ে রইলো। পায়ের শব্দ জানালার নীচে এসে থেমে গেল। তারপর জানালার গায়ে সেই একার তিনবার টক টক শব্দ। পরিচিত আঙুলের আওয়াজটি পলকের মধ্যে অনুভব ক'রে শিবানী তক্তার উপর উঠে চাপা গলায় সাড়া দিল, কে বিনু ?

জানালার বাইরে মৃদু চাপা গলা শোনা গেল, হ্যাঁ, ছোড়দি।

শিবানী আঁচল খুলে এক গোছা টাকার নোট নিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, নিয়ে যাও। আবার এসো শনিবার রাত্তিরে।

এরপর দুজনে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পায়ের শব্দটা আবার ধীরে ধীরে একসময় মিলিয়ে গেল। হেমন্ত অন্ধকারে বুঝতে পারলো, তা'র মুখের কাছে মুখ নিয়ে শিবানী হাসছে। একসময় শিবানী বললে, তুমি বললুম তখন তোমাকে, কিছু মনে করেছ ? তোমার আমার বোধ হয় একইবয়স হবে।

হেমন্ত চুপ ক'রে রইলো। শিবানী পুনরায় বললে, তোমার বন্ধু তোমাকে বোধ হয় নরকে ডুবিয়ে গেছে, কি বলো ?

হেমন্ত বললে, অন্তত এটা স্বর্গলাভ নয় !

অন্ধকারে শিবানী আবার হাসলো। তারপর বললে, এবার তুমি ঘুমোও। একলা থাকতে ভয় করবে ?

ভয় !

ভয় যদি করে, তোমার কাছে শু'তে পারি। কতদিন ধ'রে ঘুম পাড়িয়েছি কত ছেলেকে !

শিবানীর গলার আওয়াজটা এবার যেন অদ্ভুত শোনালো। যেন অনেক দূরের, অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাসের সুরের। হেমন্ত বললে, না না, আমি বেশ থাকবো।

শিবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা অসাধারণ সহজ, এত সহজ যে গা ছম ছম করে। প্রকাশ পেয়েছে শিবানী হোলো রঞ্জিতের বন্ধু স্ত্রী, অর্থাৎ কথাটা এই, সে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। অনেক মেয়ে গৃহত্যাগ করে, অনেক মেয়ের বনাবনি হয়না গার্হস্থ্যজীবনের সংগে অথবা স্বামীর সংগে,—কিন্তু সেজন্যে তাদের নিচে নেমে আসতে হবে, অথবা পথের পতিতাবৃত্তি তুলে নিতে হবে এ কোন্ যুক্তি ? পুরুষরা মেয়েদেরকে নষ্ট করে, লোকের এই হাস্যকর বিশ্বাস কেন ? মেয়েরা পুরুষের লালসার খোরাক যোগায়। কেন জোগায় ? কামিনীর লালসা মেটাতে হয় কা'দের ? পুরুষকে নিচে নামায় কা'রা ? এযুগে মেয়েদের তুলে ধ'রেছে যারা—তা'রা আর যেই হোক মেয়ে নয় !

সবচেয়ে আনন্দের কথা এই, শিবানী আশ্চর্য রকম তেজস্বিনী, তা'র কথায় আর আচরণে শিক্ষা ঠিকরে বেরোয়। তা'র পতিতাবৃত্তি নেওয়াটা অনেকটা যেন সুচিন্তিত, অনেকটা যেন অঙ্কের নিভুল ফলাফলের মতো। মেয়েটা অবাক করেছে হেমন্তকে। হেমন্তর ঘুম আসে।

রঞ্জিত এগিয়ে গিয়ে বললে, এই ঘরে এসো—এইটে হলো শিবানীর—যাকে বলে শয়ন মন্দির। এখানেই আছে তোমার রিভলভার তোমার টাকার পুঁটলী। পুলিশ আজ
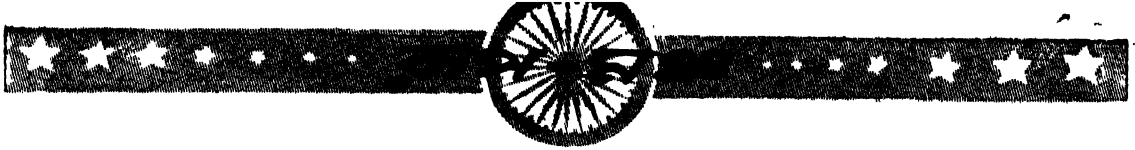
ভোরে এখানে হুলিয়া জারী করেছে তোমার নামে মনে রেখো। তোমাকে ধরাতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা। ছবি লটুকে দিয়েছে থানায় থানায়। হেমন্ত বললে, তাই নাকি? শিবানী কোথায়?

রঞ্জিত বললে, শিবানী, শিবানী! দিনের বেলা এখানে থাকেনা।

কোথায় যায়?

তার ছোট ছেলে আছে কাছেই গাঁয়ে— সেখানে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে।

হেমন্ত বললে, স্বামীকে ছেড়ে শিবানী কি এইভাবেই এখানে পেট চালায়?

পাগল! তাহ'লে ত' সমস্যা মিটেই যেতো। নিজের জন্যে নয় গো, তাকে খাওয়াতে হয় অনেক লোককে। তুমি যে এখানে থেকে খাচ্ছ, তোমাকে খাওয়াচ্ছে কে? এর জন্যে তাকে ধর্ম খোয়াতে হবে? ধর্ম! শিবানীর ধর্ম শিবানী:! ওর পিঠের চামড়া খুলে দেখো, কতদিনের কত অপমানের দাগ। সুখী মানুষ দুর্গমের দিকে পা বাড়ায় কেন? কিসের লোভে? কী পাবার আশায়?

রঞ্জিত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

ঘরের মধ্যে ঠাসা বই-কাগজ। কতকালের পুরানো বই, কত অসংখ্য কাগজের টুকরো। মাটির দেওয়ালে ঝোলানো দেশনেতাদের কাঁচিকাটা ছবি।

সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসেম, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ,—এবং একালের সুভাষবসু, সূর্যসেন—সকলের। দেওয়ালের গায়ে ইতিহাস, কত তাদের ভাষা আর স্বপ্ন, কত অনাচারের কাহিনী, কত মর্মন্তুদ আত্মোৎসর্গের ইতিকথা। কত কী যেন হেমন্ত খোঁজে, কত বিস্ময়ের চিহ্ন সে আবিষ্কার করে। আশ্চর্য, এই তীর্থপথ তার এতদিন জানা ছিলনা—এযেন

সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদের হৃদয়মন্দির। হেমন্ত অভিভূত হয়ে থাকে।
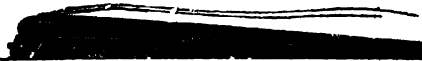
এই দ্যাখো তোমার ছবি কত যত্নে আল্‌বামের মধ্যে রাখা। এটা তোমার পাঁচবছর আগের ছবি, তুমি তখন প্রথম কাজে নেমেছ।

হেমন্ত আল্‌বাম নিয়ে নিরীক্ষণ করে। ছবির নিচে শিবানীর হাতে লেখা, ঠাকুর, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। শিবানী বিপ্লবীদের পূজা করে, বিপ্লবীদের কল্যাণের জন্য আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দেয়। অনেক নীচে থাকে সে, থাকে সকলের পিছে। গত রাত্রির কাহিনী হেমন্তর মনে পড়ে। জানালার নীচে থেকে চাপা কণ্ঠে ডাক আসে, ছোড়দি। শিবানী টাকা দেয় তাদের হাতে। তা'রা বিপ্লবী, তা'রা অন্ধকারের চর, তা'রা নিশাচর। তা'র ঘরে আসে মাতাল, আসে লম্পট, আসে অনাচারী। শিবানী টাকার পরোয়া করেনা, দেহদানের সংকোচ করেনা, সতীত্ব-নারীত্ব কোনোটাই গ্রাহ্য করেনা।

কাল রাত্রে একসময় শিবানী বলেছিল, দেহ ছাই, নোংরা হোক, পাঁকে ডুবুক, দেহ জ্বলে পুড়ে যাক্ কিন্তু ভেতরের আলোটা না নিভলেই খুশি থাকবো। ময়লা জঞ্জাল পুড়ে খাক্ হোক সেই আলোর শিখায়।

বাইরে কয়েকজন ফেরীওলা আসে—কেউ মাছ-আনাজ আনে, কেউ আনে দই-মিষ্টি, কেউ আনে চাল ডাল। ওদের মধ্যে একজন এসে অলক্ষ্যে একখানা চিঠি আর একখানা খবরের কাগজ দিয়ে যায়। অবাক হয় হেমন্ত। কে ও লোকটা? রঞ্জিত বলে, ওরা কেউ ফেরীওলা নয়, ওরা সবাই দলের লোক। পার্টিমেম্বাররা এখানে আছে ছড়িয়ে, ওরা তারাই—ওরা খাবার জিনিষ সাপ্লাই ক'রে যায়।

চিঠি কার?

আমার নামের। একটা ফিকিরের আয়োজন আছে।

কি?

কাল হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। ছোট হাকিম তোড়জোড় করছে কাল একটা মারামারি বাধাবার। আমরা ফ্ল্যাগ্ তুলবো ঠিকই। সভাও করবো। ছোট হাকিম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, আমরা আইন ভাঙবো।

হেমন্ত প্রশ্ন করলো, সভাপতি কে?

রঞ্জিত বললে, এখাকার যিনি লক্ষ্মীবাঈ—তিনি।

মেয়ে?

হ্যাঁ মেয়ে। বাসনা গড়াই। নাম শোনোনি?

হেমন্ত উদ্দীপ্ত চক্ষে বললে, বাসনা গড়াই? এখানকারই মেয়ে নাকি? কাগজে দেখেছি আশ্চর্য তা'র কীর্তি! আচ্ছা, বাসনা গড়াই না এদিককার তেভাগা আন্দোলন চালাচ্ছে?

রঞ্জিত বললে, তুমি কিছু জানো মনে হচ্ছে। আসলে ক্লিফটন্ সাহেবকে খুন করেছিল বাসনা গড়াই ওর বাঙ্গলোয় ঢুকে। এই নিয়ে বাসনা গড়াই চারটে ইংরেজকে মারলো।

হেমন্ত হেসে বললে, সত্যি, মহিলাটি ভয়ানক ইংরেজ বিদ্বেষী! রঞ্জিত বললে, ইংরেজকে ও কৃমিকীটের চেয়েও ঘেন্না করে!

হেমন্ত বললে, কাল তোমাদের সভা কখন্?

সকাল দশটায়। রেলের মাঠে সভা—বহু গ্রাম থেকে লোক আসবে। ফ্ল্যাগ তুলতে না দিলেই দাঙ্গা।

আমিও যাবো সভায় —সামন্ত প্রস্তাব জানালো।

রঞ্জিত বললে, দূর পাগল!

হেমন্ত বললে, ভয় কি। দাড়িগোঁফ পাকরে লাগাবো। নতুন একখানা লুঙ্গি শুধু দিয়ো। গায়ে চাদর দিয়ে দেখে আসবো তোমাদের সভা।

ধরা পড়লে ফাঁসী মনে রেখো।

সে ত' একদিন হবেই। তার আগে পর্যন্ত বেঁচে আছি, এটাও ঠিক।

খবরের কাগজটি খুলে দেখা গেল আগামী কালকার সভার বিবরণ। ভোরে প্রভাত ফেরী, জাতীয় সংগীতের শোভাযাত্রা, স্বদেশী চিত্রপ্রদর্শনী এবং আরো কত কি। বেলা দশটায় এই জেলার অগ্নিকন্যা-নেত্রী বাসনা গড়াইয়ের সভানেত্রীত্বে রেলময়দানে পতাকা উত্তোলন। বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এসে পৌঁছেছেন এখানে। আহারাদির পর বিশ্রাম ক'রে বিকালের দিকে রঞ্জিত চলে গেল। বলা বাহুল্য, সোজা গেল সে মদের দোকানের দিকে। সেখানে গিয়ে দেশীমদ কিনে গেলাস নিয়ে দোকানেই ব'সে গেল। পান করে সে প্রচুর। গোয়েন্দারা তা'র সম্বন্ধে কোনো
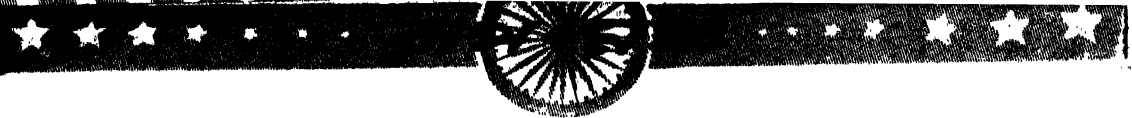
দুশ্চিন্তা পোষণ করেনা। রঞ্জিত মাতলামি করতে করতে সন্ধ্যার পরে বস্তির দিকে অভিযান করে। গোয়েন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যায়।

সন্ধ্যার পরে শিবানী ফিরে এলো। হেমন্ত অপেক্ষা করছিল তা'র জন্য। কী ভালো লেগেছিল শিবানীকে সারাদিন। পলকের জন্য হেমন্তর ইচ্ছা জাগলো, ছুটে গিয়ে শিবানীর দুই হাত ধ'রে বলে, আমি তোমার সেই ঠাকুর, সেই হেমন্ত মিস্ত্রির—যার ছবির নীচে তুমি প্রণাম জানিয়ে রেখেছ। শিবানী, তোমার ওই উৎপীড়িত পশুপদদলিত দেহের নীচে দুখানি পায়ের তলায় আমিও যাবার সময় আমার প্রণাম রেখে যেতে চাই। কিন্তু হেমন্ত আত্মসম্বরণ ক'রে তা'র মুখের পরচুলাটা ঠিক ক'রে নিল। বিপ্লবীর মনে দুর্বলতা না আসে। আত্মপরিচয় প্রকাশ করলে হেমন্তর কিছুতেই চলবেনা। যেমন সে এসেছে, তেমনি নির্বিঘ্নেই সে যেন চ'লে যেতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল শিবানীর বাইরের ঘরে। সম্ভবত জন দুই মাতাল এসেছে আজ সন্ধ্যায়, তাদেরই জড়িত কণ্ঠের কলরব। মাঝে মাঝে কাঁচের আওয়াজ, মাঝে মাঝে সোডার বোতল খোলা। ওরই সংগে চূর্ণ আক্রোশের ছিটে, গানের টুকরো, বক্তৃতার ভগ্নাংশ, উচ্চহাস্যের তাল,—অর্থাৎ ওই জীবনেরই আনুসংগিক। মাঝখানে সহসা শিবানীর কাতরোক্তি শুনে হেমন্ত বেরিয়ে এলো। অনুমান মিথ্যা নয়। মৃদু করুণ কণ্ঠে শিবানী প্রতিবাদ জানাচ্ছে,—কিন্তু মারধোর চলছে তা'র ওপর। সংযম রক্ষা করা কঠিন। হেমন্ত এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়ালো। ভিতরে শিবানীর চাপাকণ্ঠের কী কাতরোক্তি—কী ফুঁপিয়ে কান্না। হেমন্ত লাফিয়ে পড়তে পারে পশুর ওপর এখনি,—কিন্তু হট্টগোলে যদি পুলিশ আসে তবে আর রক্ষা নেই। শিবানীর জীবন ছারখার হবে। ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা গেল, কে বাইরে?

হেমন্ত পলকের মধ্যে নিজের ঘরের দিকে চ'লে এলো। সংগে সংগে দরজা খুলে শিবানী এলো বেরিয়ে। পশ্চিমের
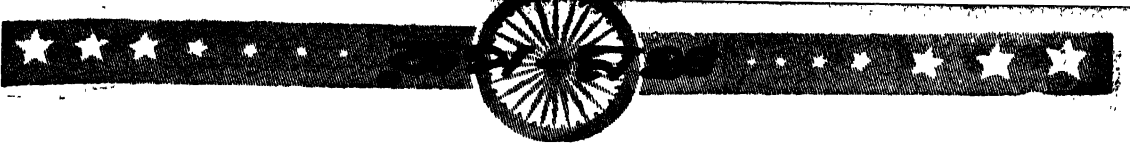
ঘরে ঢুকে দেখলো, অন্ধকারে চৌকির ওপর ব'সে রয়েছে হেমন্ত। কাছে এসে শিবানী বললে, সারাদিন দেখোনি তাই রাগ করেছ, না?

হেমন্ত মুখ তুললো। শিবানীর মুখে ও নিশ্বাসে কড়া দেশীমদের গন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হেমন্ত বললে, ছি, আমি কেন রাগ করবো? আচ্ছা, ওরা কি তোমাকে মারছিল?

শিবানী বললে, হ্যাঁ,—তুমি তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলে, না?

মারছিল কেন তোমাকে?

আগে বলো তুমি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

পশুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।

তোমার এ রাগ কেন, জয়ন্ত?

হেমন্ত আবার শিবানীর মুখের দিকে তাকালো। শিবানী কতকটা জড়িত কণ্ঠে বললে, কেউ ছোট নয়, জয়ন্ত। স্বামী, সন্তান, লম্পট, অনাচারী, পশু, দেবতা, বিপ্লবী—সব-মিলিয়ে পুরুষ। কেউ ছোট নয়।

হেমন্ত বললে, তাই ব'লে তোমাকে মেরে খুন করবে? আমি তোমাকে কাঁদতে দেখলুম শিবানী?

শিবানী হেসে বললে, হ্যাঁ মারলে লাগে, কান্নাও আসে। কিন্তু কী করবো, এক একটা লোকের অভ্যেস অমনি। মেয়ে মানুষকে পায়ের তলায় ফেলে না থেঁৎলালে হয়না। মারবার সময় জানে, মার আমি সইতে পারি।

কিন্তু এ-জীবন তুমি কত দিন সইবে শিবানী?

তোমরা যতদিন না আগুন জ্বালাবে! বড় গরীবের দেশ জয়ন্ত, নিজের দেহ না বেচলে টাকা পাইনে। অনেক ছেলে লুকিয়ে রয়েছে, অনেক ছেলে পালিয়ে বেড়ায়—আমি তাদের ফেলতে পারিনে। বড় লোক আছে, তা'রা ঘেন্না করে তোমাদের, তা'রা ছেলেদের ধরিয়ে দেয়—তা'রা জমিজায়গা কেড়ে নেয়, সেপাইদের ডেকে এনে ধান চাল বের ক'রে নিয়ে যায়। আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় রাখেনা।

বাইরে থেকে কর্কশ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল। শিবানী বললে, এবার আমি যাই, তুমি শান্ত হয়ে থাকো। রাত্তিরে আসবো।

হেমন্ত বললে, আবার যাবে কেন? ওদের তাড়াও!

হ্যাঁ তাড়াবো। কিন্তু ওরা খুশী না হয়ে যাবেনা। ওদের ছটফটানি শান্ত হলে ওরা নিজেই চলে যায়, আর একটুও দাঁড়ায়না।

হেমন্ত বললে, আমার সংগে অনেক টাকা আছে শিবানী, সব টাকা তুমি নাও। আমি সব দিয়ে যাচ্ছি।

শিবানী বললে, বেশ ত' দিয়ো। যতদিন তোমার টাকা ফুরোবেনা ততদিন আমি বিশ্রাম নেবো। কুকুররা এলে তাড়িয়ে দেবো দরজা থেকে। এবার আমি যাই!

হেমন্ত খপ ক'রে শিবানীর হাত ধরলো। বললে, একটা কথা দাও?

শিবানী বললে, কি ব'লো?

কথা দাও আর কোনোদিন মদ খাবেনা?

শিবানী বললে, মদ না খেলে ওদের কাছে যেতে ঘেন্না
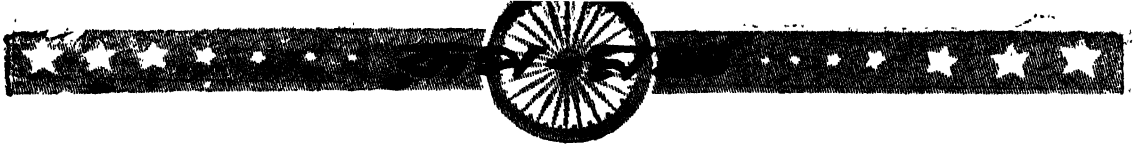
করে! ওরা জন্তু হয়ে আসে জন্তুর সংগে লড়াই করার জন্যে,—আমাকে জন্তুর অভিনয় করতে হয়, জয়ন্ত!

শিবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেমন্তর মন সংস্কারাচ্ছন্ন। এটা তা'র কাছে একেবারে নতুন। এটা যেন জীবনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার বিপক্ষে বিদ্রোহ। এটা নীতির বাইরে, এটা সমাজের বাইরে। সে বিপ্লবী, তা'র লক্ষ্য হোলো দেশের মুক্তি, আদর্শের সার্থকতা। একদিন তা'কে গীতা স্পর্শ ক'রে শপথ নিতে হয়েছে, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন! সে হবে সন্ন্যাসী—কায়মনোবাক্যে। লোভ, মোহ, খ্যাতি, সম্পদ্—সমস্ত তার কাছে তুচ্ছ। নারী তা'র কাছে দেবী, দেবী কখনও লালসার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে বিশ্বাসকে কিছু বদলাতে হচ্ছে। সব চেয়ে পবিত্র ব'লে যে-নারী-দেহের প্রতি লোভ প্রকাশ করা তাদের নীতিবিরুদ্ধ, নারী নিজেই সেই দেহকে সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ ব'লে খণ্ডে খণ্ডে বিকিয়ে দিচ্ছে পশুদলের ক্ষুধার্ত মুখের কাছে! পুরুষ দেখছে মেয়েদের স্থান কত উঁচুতে, মেয়েরা দেখছে তাদের আশ্রয় পুরুষের পায়ের তলায়। শিবানী নিজের দেহ থেকে নিজের প্রাণসত্তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছে। কী নিরাসক্ত আত্মদান তা'র! নির্মোহ নির্লোভ দেহখানাকে উৎপীড়িত হ'তে দেখে তা'র বেদনাবোধ নেই। মুক্তি যজ্ঞের যে বিরাট হোমাগ্নি জ্বলেছে সমস্ত দেশে,—শিবানী নিজের দেহকে উৎসর্গ করেছে সেই আগুনে। যে কোন পথ দিয়ে যেমন ক'রে হোক নিজেকে তা'র উৎসর্গ করা চাই। দুপুরবেলা রঞ্জিতের কাছে সে শুনেছে, দু'বছর আগে ইংরেজ গোরা বহুলোকের মাঝখানে শিবানীর মায়ের উপর পাশবিক অনাচার করেছে, ঘরে আগুন লাগিয়ে তা'র এক ভাইকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে—তা'র সহোদর ভগ্নীকে নিয়ে গেছে পল্টনের তাঁবুতে। সংবাদপত্রে এসব অনাচারের কাহিনী প্রকাশিত হওয়া আইন বিরুদ্ধ ছিল সেদিন। রঞ্জিত বললে, এখানে চরিত্রের নীতিরক্ষার কথা ওঠে না, হেমন্ত। প্রতিবাদের সভা আমরা ডাকিনি, ভাই —আমরা প্রতিকার খুঁজেছি। অহিংসা, চরকা, শান্তিপূর্ণ হরতাল, আইন অমান্য অসহযোগ—এতে আমরা ভুলিনি। আমরা মারখাওয়া গ্রাম আর পরিবার থেকে ছেলে মেয়ে এনেছি, আমরা এনেছি চাষীদের ডেকে। যাদের ভাত কাপড় জোটেনা তারাই আমাদের অস্ত্র, পেটের ক্ষিধেই আমাদের মূলধন, যারা নিঃস্ব তারাই সহজে দয়াহীন হ'তে পারে। যে-মেয়েরা সম্ভ্রম খুইয়েছে, দেহ বিকিয়েছে, লজ্জা ছেড়েছে, তা'রা নিষ্ঠুর আর ভীষণ হ'তে জানে। তারা পরোয়া করেনা জীবনের, ভয় পায়না মরণের! তোমাকে শিবানীর মতন আরো অনেক মেয়েকে দেখাতে পারতুম।

শিবানী ঘরে এলো অনেক রাত্রে। সে স্নান ক'রে শুচিশুদ্ধ হয়ে এসেছে, এলো চুল থেকে তা'র ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছিল। কপালে টিপ নেই, মুখে পাউডার নেই, পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে সে। লণ্ঠনটা সে এক জায়গায় রাখলো। হেমন্ত বললে, এর মধ্যে এলে যে?

শিবানী বললে, এবার আর কেউ নয়, কেবল তুমি। তোমাকে নিয়ে থাকবো। গরম জল করেছি, হাত পা ধোও।

বাইরে মৃদু মৃদু বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ শীত পড়েছে খুব। বস্তির গলিপথ আজ সন্ধ্যা থেকেই প্রায় জনহীন। তা'ছাড়া গতকাল গিয়েছে সরস্বতী পূজা,—আজ বিসর্জনের সন্ধ্যা। শিবানী কাছে এসে হেমন্তর দুই হাত ধরে নামালো। গরম জলে তা'কে পরিপাটি করে ধুইয়ে নতুন তোয়ালে দিয়ে তা'র পা মুছিয়ে দিল। শিবানীর ঘন নেশা তখনও কাটেনি। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে গরম গরম লুচি আর তরকারি এনে হেমন্তকে সে নিজের হাতে সযত্নে খাওয়াতে ব'সে গেল।
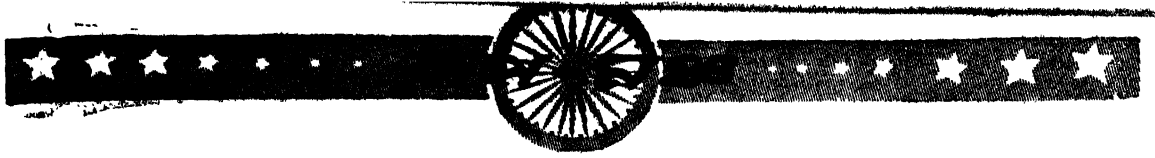
এর মানে কি, শিবানী?

যদি কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয়! হাসিমুখে শিবানী জবাব দিল।

তুমি ত' আজো পাপ করোনি!—হেমন্ত বললে।

কেমন ক'রে জানলে?

হেমন্ত বললে, যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলেছিল যুদ্ধ জয়ের জন্যে। পুরাণের গল্পে আছে, সতীত্বের আদর্শের জন্য অনেক মেয়ে আত্মবলি দিয়েছে; কিন্তু মহৎ আদর্শের জন্য অনেক মেয়ে সতীত্ব আর নারীধর্মকে বলি দিয়েছে; এও অনেক পাওয়া যায়। রোজ প্রভাতে পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করি, তাঁদের সতীত্বের আদর্শের জন্যে নয়, শিবানী।

তুমি কাঁদছ কেন, বলোত?

আঁচলে চোখ মুছে শিবানী বললে, আমার ভালোবাসায় কি তুমি বিশ্বাস করবে?

না।—হেমন্ত জবাব দিল।

খাওয়া শেষ হ'লে শিবানী আঁচল দিয়ে হেমন্তর হাত মুখ মুছিয়ে দিল। পরে ভগ্ন কণ্ঠে বললে, তোমাকে হয়ত আর কোনোদিন দেখতে পাবো না। আমার ভালোবাসা নিয়ে যাও তুমি।

ছি—বিপ্লবী জবাব দিল, যাবার আগে মিথ্যে জিনিস আমার হাতে তুলে দিয়োনা, শিবানী।

মিথ্যে!

মিথ্যে বৈ কি। তুমি শুধু ভালোবাসো ইংরেজের হৃৎপিণ্ডের রক্ত! আর যা কিছু ভালোবাসা, সেটা তোমার ঐ মদের নেশা—নেশা কাটলে আর কিছুই থাকবেনা।

শিবানী বললে, কিন্তু আমার ছোট্ট ছেলেটি?

ওটাও তোমার ভুল—হেমন্ত বললে, ভয়ানক ভুল। মৃত্যু আর অপমৃত্যু দুটোই তোমার জানা। নিজেকে যে সব চেয়ে ভালোবাসে, তারই কাছে দাম হোলো স্বামীর, সন্তানের, সম্পদের, খ্যাতির, প্রতিষ্ঠার। তোমার কিছু নেই, তাই ভালোবাসাও নেই। নিজের দেহের ওপর তোমার অনুরাগ নেই, তাই তুমি সর্বস্বান্ত। তোমার ধর্ম তোমার দেহের ওপর দাঁড়িয়ে নেই ব'লেই তুমি এত বড়।

হাত কাঁপছে শিবানীর, তবু আলোটা বাড়িয়ে সে কাছে এনে রাখলো। শিয়রের জানালাটা সে হাত বাড়িয়ে বন্ধ ক'রে দিল। অতি যত্নে মাথার বালিশটা গুছিয়ে সে হেমন্তকে শোয়ালো। তারপর একখানা হাতে হেমন্তর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে সাদরে বললে, তুমি কে?

আমাকে লোভ দেখিয়োনা শিবানী।

ছি, ও কি কথা? চন্দন কাঠ পু'ড়ে গেলেও তা'র সুগন্ধ ঢাকা পড়েনা, জয়ন্ত। লোভ তোমা'কে ছুঁতে পারেনা, তাই ত' ছুঁয়েছি তোমাকে! তুমি বিপ্লবী, তোমার ভয় কি?

হেমন্ত বললে, আমার সংস্কার আছে, চেতনা আছে!

রাঙ্গা দুটো আয়ত চোখ হেমন্তর মুখের ওপর রেখে শিবানী বললে, থাক্ ওসব ছাইভস্ম! তুমি মুখোস খোলো। কপালে কাটার দাগ টেনেছ, চোখের কোলে দিয়েছ কালি, মুখে মিথ্যে দাড়ি গোঁফ।—তুমি এবার সত্যি হয়ে ওঠো।

আমাকে জেনে তোমার কী লাভ?

আঁচল দিয়ে শিবানী হেমন্তর কপালের দাগ মুছিয়ে দিল। চোখের কোলের কালি দিল ঘুচিয়ে। তারপর অতি সন্তর্পণে হেমন্তর মুখের উপর থেকে আঠা মাখানো দাড়ি গোঁফ খুলে সরিয়ে দিল। প্রকাশ পেলো একজন তরুণের সুকুমার সুন্দর নধর মুখচ্ছবি। গোঁফের রেখা তাম্রাভ কচি, ঠোঁট দুটি পাতলা টসটসে—দাঁতগুলি পরিচ্ছন্ন। শিবানীর মাদক জরোজরো দুই মুগ্ধ চক্ষু দেখতে দেখতে যেন ঝাপসা হয়ে এলো। ললিত জড়িত কণ্ঠে সে শুধু বললে, এই তুমি? এতক্ষণ পণ্ডিতের মতন কথা বলছিলে? তুমি যে আমার চেয়ে অনেক ছোট!

পায়ের শব্দ হোলো। পা টলতে টলতে রঞ্জিত এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে শিবানী একটুও নড়লো না, এতটুকু সরলো না। হেমন্তের গলা জড়িয়ে বুকের ওপর মুখ রেখে গদগদ কণ্ঠে বললে, কতকালের পুণ্য আমার!

রঞ্জিত দূরে দাঁড়িয়ে বললে, কেন?

এই আমি প্রথম দেখলুম!

কা'কে?

পুরুষকে! শিশুর মতন পবিত্র পুরুষ। বলো, কে তুমি?

রঞ্জিত কাছে এসে বললে, মুখোস খুলে দিয়েও চিনতে পারোনি? তোমার আল্‌বাম নিয়ে এসো, ওরই পায়ে তুমি প্রণাম রেখেছ, শিবানী।

হেমন্ত বললে, তোমার কাছে আমার গৌরব অনেক ছোট, একথা আমি কোনোদিন ভুলবো না, শিবানী।

আকণ্ঠ আবেগে শিবানীর গলা বুজে গেছে। চোখে জল গড়িয়ে এসেছে তা'র। ধরা চাপা গলায় ফিসফিস ক'রে সে বললে, তুমি-তুমি হেমন্ত মিত্র!

রঞ্জিত সেখানেই ব'সে নেশার ঘোরে ঢুলতে লাগলো। হেমন্ত এবার একটু উঠে বসবার চেষ্টা করলো। বললে, কাল তোমাদের সভায় আমাকে যেতে দিয়ো, রঞ্জিত।

শিবানী বললে, সেটা কাল, আজ নয়। আজ তুমি আমাদের দুজনের।

রঞ্জিত জড়িত কণ্ঠে বললে, শিবানীর অনেক দিনের সাধ ছিল তোমাকে দেখবার।

শিবানী বললে, কাল থেকে তুমি আবার রক্তের পথ মাড়িয়ে যেয়ো, আজ থাক আমার কোলের কাছে, থাকো আমার বুকের পাশে। তোমাকে আলো জ্বেলে আমি দেখবো সারারাত।—এই ব'লে সে সত্যিই হেমন্তকে আরো কাছে টেনে নিল। কাঙ্গালিনী যেন খুঁজে পেয়েছে হারানো রত্ন! দাদা?

রঞ্জিত মুখ তুললো। শিবানী বললে, কালকের সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

আর কোনো খবর আছে?

না।

শিবানী আলোটা এবার নিভিয়ে দিয়ে বললে, তবে বাকি
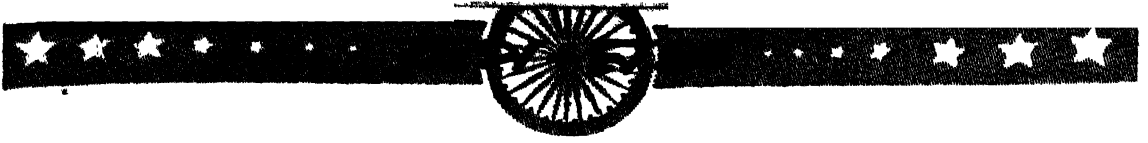
রাতটুকু আমার প্রাণের ঠাকুরকে নিয়ে আজ থাকতে দাও, শেষরাত্রে উঠে যাবো।

হেমন্তকে কাছে নিয়ে শিবানী চৌকির ওপর শুয়ে পড়লো। ঢুলতে ঢুলতে এক সময় রঞ্জিত নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেল। কী যেন অসীম পরিতৃপ্তি তা'র মুখে চোখে।

হেমন্ত অন্ধকারে এক সময় বললে, শিবানী, আবার কাঁদছ কেন?

শিবানী ফুঁপিয়ে বললে, বড় সাধের কান্না—একটু কাঁদতে দাও!

কেন?

তুমি যে থাকবে না কাল থেকে?

হেমন্ত বললে, সকালের শিউলী ঝ'রে পড়ে—তা'র জন্যে দুঃখ কি?

শিবানী বললে সমস্ত রাত ধ'রে মৃত্যুর কান্না কাঁদা, সকালে ঝ'রে পড়া!

হেমন্ত চুপ ক'রে রইলো। শিবানী বললে, কি পেলে তুমি খুশী হও?

কিছু না পেলে বেশী খুশী হই।

—হেমন্ত স্পষ্টকণ্ঠে জবাব দিল।

কেন?

রাখার কোন জায়গা নেই। যা পাবো ফেলে যেতে হবে কাল ভোরে। ভালো কিছু পেলে ফেলে যেতে দুঃখ পাবো। কিছু চাইনে, শিবানী।

শিবানী বললে, আমাকে যদি নাও? আমার সব, আমার যা কিছু?

হেমন্ত সহাস্যে বললে, মাংসপিণ্ড?

শিবানী চুপ ক'রে রইলো। তা'র চোখের জল ঝ'রে চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। তা'র বিরাম নেই। বিপ্লবীরা ডাক শোনে না, কাছে টানলেও থাকে অনেক দূরে। শিবানী আস্তে আস্তে হাতখানা বাড়িয়ে হেমন্তর মুখের উপর বুলিয়ে অনুভব করলো তা'র জীবনের সর্বোত্তম দীক্ষাদাতাকে।

হেমন্ত শুধু বললে, কেঁদোনা, শিবানী?

শিবানী বললে, তোমাকে বাঁচানো যায় না কোনমতে?

ফাঁসীর আসামীকে বাঁচতে বলো কেন? আমি খুনে। কাল তোমাকে যেতেই হবে?

শিবানী?

শিবানী চুপ ক'রে গেল। কিন্তু আবার গলা জড়িয়ে বললে, তোমাকে বাঁচানো যাবে না ব'লেই চোখের জল ফুরোতে চাইছে না।

এবারে শান্ত হয়ে ঘুমোও দেখি?—হেমন্ত অনুরোধ জানালো।

শিবানীর নেশা এবার কেটেছে। সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

জনরোল উঠেছে রেলের ময়দানে সকালের দিকে। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে পথে পথে। বহু গ্রাম থেকে অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু নরনারী এসেছে কাতারে কাতারে। শৃঙ্খলাভংগের ভয় ছিল কর্তৃপক্ষের মনে। স্বয়ং বড় হাকিম সাহেব পুলিশ ফৌজ সংগে নিয়ে রেল ময়দানের ঘাঁটি আগলে রয়েছেন। এখন যুদ্ধ প্রচেষ্টা চলেছে চারিদিকে, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা একান্ত দরকার।

কিন্তু এটি স্বাধীনতা দিবস। কংগ্রেস নির্দিষ্ট স্বাধীনতার শপথ আজ গ্রহণ করাই চাই। আগে পতাকা উত্তোলন, পরে সবাই দণ্ডায়মান হয়ে শপথ গ্রহণ,—এ দুটি কাজ স্বয়ং সভানেত্রী সম্পন্ন করবেন। জনরোল উঠেছে বটে, কিন্তু জনসাধারণ শান্তিভংগের জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়।

এক সময় হাজার হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে জানা গেল সভানেত্রী বাসনা গড়াই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। ভিড়ের ভিতরে একসময় হেমন্ত চোখে চোখে দেখে নিল রঞ্জিতকে: রঞ্জিত একটু হাসলো। হেমন্তর পরণে লুঙ্গি, পায়ে নরম ক্যাম্বিশের জুতো, গায়ে ঢাকা চাদর, মুখে দাড়ি-গোঁফ, কপালে কাটার দাগ, চোখের কোনে কালি।

সভানেত্রী বাসনা গড়াই পতাকা উত্তোলনের জন্য এগিয়ে এলেন। দূরের থেকে তাঁকে দেখে হেমন্ত স্তম্ভিত। সে শিবানী। ভোর রাত্রে সে বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে,—এবার এসেছে সদ্যস্নাতা, কপালে সিন্দুর, পরণে রাঙ্গাপাড় খদ্দরের শাড়ী, চোখ দুটি শান্ত, অহিংসভাবে কেমন প্রসন্ন,

আত্মস্থ। বিস্ময়াহত হেমন্তর চক্ষে আর পলক পড়েনা। সকালের স্নিগ্ধ কোমল রৌদ্রের আলোয় শিবানীকে মহীয়সী মনে হচ্ছে। চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো, বন্দেমাতরম্! হাকিম হুকুম দিলেন, পতাকা নামিয়ে ভেংগে ফেলো। পুলিশ ফৌজ সেই অপমানজনক আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করলো। জনসমুদ্রে তুফান দেখা দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাত।

কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি পাঠের জন্য বাসনা গড়াই একখানি বড় কাগজ বা'র করলেন। সে কাগজের নকল ছিল বহু লোকের হাতে। শিবানী পড়তে আরম্ভ করেছে এমন সময় হাকিম হুকুম করলেন, বন্ধ করো। কিন্তু বন্ধ হোলোনা, শিবানী প'ড়ে চললো। পুলিশ লাঠি চালনা আরম্ভ ক'রে দিল,—জনতা ছত্রভঙ্গ হচ্ছে। একসময় লাঠি পড়লো গিয়ে স্বয়ং সভানেত্রীর পিঠে। শপথ পাঠ তখনও শেষ হয়নি, সুতরাং লাঠি পড়লো তা'র মাথায়। মার খাচ্ছে সাধারণ অসাধারণ সব লোকেই। শপথ গ্রহণ করতে দেওয়া হবেনা, ওতে ইংরেজ রসাতলে যাবে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, পুলিশ সাহেব তা'র চেয়েও ক্ষিপ্ত। বাসনা গড়াইয়ের কপাল বেয়ে গড়িয়ে এসেছে রক্তের ধারা,—কিন্তু শপথ পাঠ তখনও শেষ হয়নি। শেষ অংশটার কাছাকাছি আসতেই হাকিম সাহেব হুকুম করলেন, গুলী চালাও।

হেমন্ত এইটির অপেক্ষা করছিল। ক্ষিপ্তোন্মত্ত জনসাধারণের মাঝখানে গুলী চালাবার ফলে গুলী গিয়ে লাগল সভানেত্রীর গায়ে। বাসনা গড়াই প্রতিশ্রুতিপাঠের শেষ ছত্রে কোনো মতে পৌঁছে অচেতন হয়ে রক্ত মাখা দেহে মাটিতে প'ড়ে গেলেন। হেমন্ত পাঁকাল মাছের মতো পিছলে ভিড়ের ভিতর থেকে রবার্ট্‌স সাহেবের দিকে এগিয়ে এলো, তারপর পলকের মধ্যে চাদরের ভিতর থেকে রিভলভার বা'র ক'রে পিছন দিক থেকে—এক-দুই-তিন-চার—একটির পর একটি গুলী সাহেবের পিঠের সর্বাংগে গিঁথে দিয়ে চাদরের মধ্যে হাত লুকিয়ে নিল।

কয়েকজন এদৃশ্য দেখেছে, তাদের মধ্যে রঞ্জিত একজন।

তারপর আর না বলাই ভালো। দূরের থেকে একসময় হেমন্ত লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, বাসনা গড়াইকে নিয়ে যাওয় হোলো হাসপাতালে। রঞ্জিত দূরের থেকে চোখ টিপে কেবল জানালো, বেঁচে যাবে, ভয় নেই।

* * *

দুপুর বেলায় এক হাটতলায় তামাক খেয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথার পাগড়ীটা ঠিক ক'রে নিয়ে হেমন্ত ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে চললো। এখনো তা'র নমাজ পড়া হয়নি। এত হুজ্জৎ জানলে সে কি শহরে আসতো? চারিদিকে তখন ধরপাকড় চলছে। রবার্ট্‌স মারা গেছেন।

পুনর্জন্ম

মন্মথ রায়

রঙ্গজগতে তখন স্বপ্না থিয়েটারের উদীয়মান সূর্য···সূর্য চৌধুরীর যুগ চলছে, মানে, বিরুদ্ধদলীয় থিয়েটারের পেটোয়া কাগজগুলোও তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পচ্ছে না, আর্ত-কণ্ঠে বলছে, 'সূর্য চৌধুরীকে যতটা বাড়ানো হচ্ছে, তাকে বাড়াবাড়িই বলব। তবে হ্যাঁ, তাঁর প্রতিভা আছে, সর্বোপরি রয়েছে নায়কোচিত সুঠাম রূপ এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব, একদা দুর্গাদাসে যা ছিল —এবং একথা বলতেও কুণ্ঠা নাই যে, তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।' এহেন সূর্য চৌধুরী··· সর্বজন প্রশংসাধন্য' সূর্য চৌধুরী যখন স্বপ্না থিয়েটারের নতুনতম অর্ঘ্য 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' নাটকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশবাসীকে অভিবাদন করলেন—যেদিন রঙ্গজগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা। থিয়েটারের বুকিং আপিস থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত টিকিট ক্রেতাদের 'কিউ' হয়ে গেল। ট্রাফিক জমে গেল। ফুল হাউস' বোর্ড টাঙাতে গিয়ে বুকিং ক্লার্ক প্রহৃত হ'ল। ম্যানেজার প্রমাদ গণলেন। অপেক্ষামান জনতার কাছে হাত জোড় করে বললেন, শুধু শনি—রবি নয়, বুধ—বেস্পতিবারও এ নাটক অভিনয়ের তিনি ব্যবস্থা করবেন, আজ ক্ষমা করুন।'
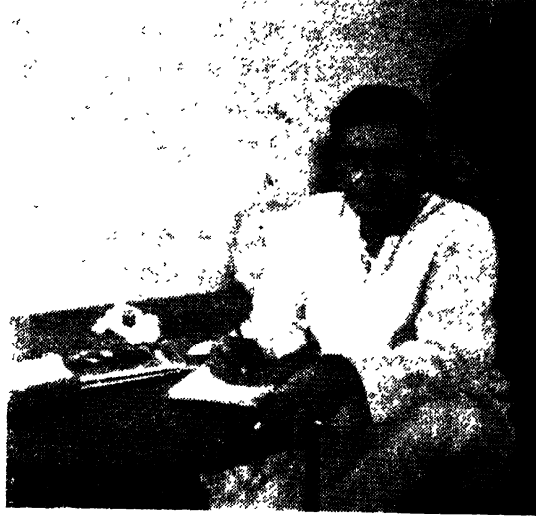
নাট্যকার মন্মথ রায়ের প্রতিভা শুধু কথা-সাহিত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর সাহিত্যিক দানে আমাদের চিত্র ও নাট্য-জগতও সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠেছে। রজনীগন্ধার স্নিগ্ধতা ও সন্ধ্যার আবিলতা মিশিয়ে যে মাধুর্যের সৃষ্টি হয়, মন্মথ রায়ের ভাষায় সেই মাধুর্যেরই সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই, অনুভূতিশীল পাঠকসাধারণকে অতি সহজেই অভিভূত করবার ক্ষমতা এঁর রয়েছে যথেষ্ট। এই প্রসংগে আর একটী কথা বলতে চাই—রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে চলচ্চিত্র সাংবাদিক জগতে আত্মনিয়োগ করবার জন্য যাঁরা প্ররোচিত করেন, শ্রীযুক্ত রায় তাঁদের অগ্রগণ্য। রূপ-মঞ্চের সংগে তাঁর যে যোগ তা হৃদয়ের, এবং আজও তা অচ্ছেদ্য রয়েছে।

কৃষ্ণা রায় আর তার ছোট ভাই কিশোর এ্যাডভান্স বুকিং-এ টিকিট কিনে রেখেছিল। সূর্য চৌধুরীর অভিনয় দেখতে হলে কৃষ্ণা কোন 'চান্স' নেয় না—আগের সপ্তাহেই টিকিট কাটে। অভিনয় সুরু হল। সূর্য চৌধুরী নায়ক হিমাদ্রির ভূমিকায় নেমেছেন। হিমাদ্রি নির্যাতিত নিপীড়িত ভারতবর্ষের মর্ত প্রতীক। বেঁচে থাকার দাবী নিয়ে সে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে। ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের পট ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সে বলছে, এমন অসহায় ভাবে মরা চলবে না। কপালের লিখন বলে এ দুর্ভিক্ষকে স্বীকার করা চলবে না। মানুষের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষকে অস্বীকার কর। মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান কর। সরকার যদি দুর্ভিক্ষ দমন করতে না পারে, শাসন করবার অধিকার সে হারিয়েছে। তার আইন কানুন
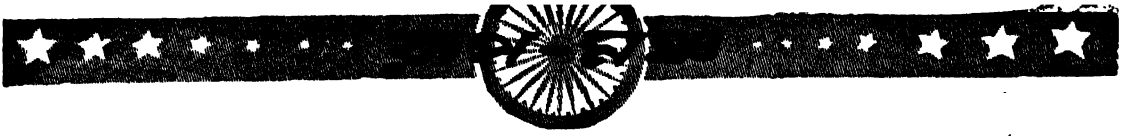
মানার কোন অর্থ হয় না।' দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টের দল হিমাদ্রির কথায় ভরসা পায় না। হিমাদ্রি তার সহকর্মীদের নিয়ে মজুতদারের মাল লুট করে উপবাসীদের বিলিয়ে দিচ্ছে; তাদের সেবাশুশ্রূষার ভার দিয়েছে কল্যাণীর ওপর; এমনি করে গড়ে উঠেছে হিমাদ্রির এক সংসার। তাতে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, অচেনা অজানা নরনারীর ভিড়; যাদের উপবাসী মুখে অন্ন দেবার জন্য হিমাদ্রি প্রাণ তুচ্ছ করে খাদ্য আহরণ কচ্ছে, যাদের শুশ্রূষার জন্য কল্যাণী আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। সেই হিমাদ্রি যখন মজুতদারের বাড়ীতে হানা দিতে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল, কল্যাণী মূর্ছিত হয়ে পড়ল—, আর, আর ··কৃষ্ণা রায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অভিনয় তার জীবনে এতখানি সত্য হয়ে উঠেছে!

কৃষ্ণার পক্ষে এটা অস্বাভাবিক হয়নি। একেবারেই হয়নি। কারণ, এমনি তার মন। ছোট বেলা থেকেই সে বিবেকানন্দের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত। কলেজে সোসাল সার্ভিস লীগ কৃষ্ণাই গড়ে তুলেছে। দেশে বন্যা হোক, দুর্ভিক্ষ হোক, কৃষ্ণা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে টাকা তুলে পাঠাবে। দুস্থ আর দরিদ্রের সেবাই তার জীবনেব সবচেয়ে বড় ব্রত' কৃষ্ণা বলে, পরাধীনতা দূর করবার সাধনাও তার আছে। সে বিশ্বাস করে, দেশ স্বাধীন নয় বলেই দেশে এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত লাঞ্ছনা।

তাই, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ" তার মনে এতখানি সাড়া দেয়। তাই, সূর্য চৌধুরীর দৃপ্ত আত্মবলিদান তাকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে।

সে রাত্রে বাড়ী ফিরে কৃষ্ণা ঘুমুতে পারে না। তার মনের পটে কেবলি ভেসে ওঠে হিমাদ্রির ঐ আত্মবলিদান। সূর্য চৌধুরী শুধু অভিনয় না করে যদি বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নেমে
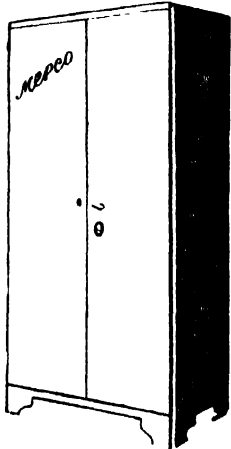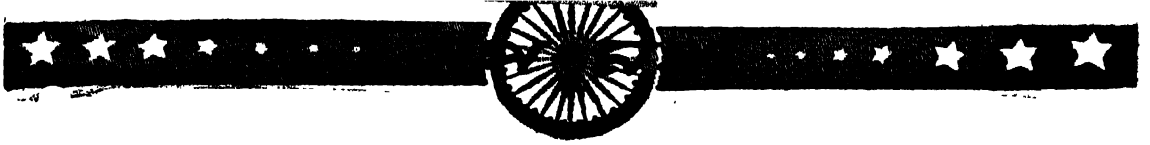
আসতো—কল্যাণীর মতো সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতো, তার হাত ধরে—সে নিজেকে বিলিয়ে দিত দেশের সেবায় —দেশের মুক্তি সাধনায়! কৃষ্ণা ঘুমিয়েও এই স্বপ্ন দেখেই জেগে ওঠে। কলম হাতে নিয়ে বসে! সে লেখে। চিঠি।...সূর্য চৌধুরীকে। তার মনের সকল আবেগ—তার বাসনা, কামনা, স্বপ্ন--সব সেই চিঠিতে লুটিয়ে পড়ে। চিঠির শেষে সে নাম লেখে 'সূর্যমুখী'।

সূর্য চৌধুরী সেই চিঠি মুগ্ধচিত্তে পড়ে 'হে মোর দুর্ভাগা দেশে'র নাট্যকার, প্রিয়বন্ধু শ্রীযুত প্রিয়বন্ধু বোসকে দেখতে দিয়ে বলে, 'দেখ বন্ধু, কী নাটক তুমি লেখ! জীবনের নাটক কেমন গড়ে উঠছে, তিলে তিলে, লোক চক্ষুর আড়ালে! কিন্তু, কে এই সূর্যমুখী!'

সিনে ডাক পড়ে। সূর্য চৌধুরী এক অনির্বচনীয় সুধার আস্বাদে পরিপ্লুত হয়ে অভিনয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে যায়, কে এই সূর্যমুখী!

দৃশ্যে গিয়ে, এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতার মাঝে সূর্য চৌধুরী দেখতে পায়, কে সেই সূর্যমুখী। প্রেক্ষাগারে সামনের সিটে অপরূপা সুন্দরী একটি তরুণী, তারই হাতে এক গুচ্ছ সূর্যমুখী ফুল!

দৃষ্টি বিনিময় হতেই কৃষ্ণা চোখ নামিয়ে নেয়। ইনটারভ্যাল হয়।

কিশোর সেই পুষ্পগুচ্ছ আর দিদির অটোগ্রাফের খাতাটা নিয়ে সূর্য চৌধুরীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত। 'দিদি দিয়েছে এই ফুল, আর চেয়েছে আপনার অটোগ্রাফ!'

এমনি করে মন জানা-জানি হয়। এমনি করে মন দেয়া-দেয়ি চলে।

বাড়ীতে কৃষ্ণার বিয়ের কথা উঠতেই কৃষ্ণা বলে, 'বিয়ে করবো না একথা বলি না। নিজের প্রেরণা আর সাধনা যার সংগে হাত মেলালে সার্থক হতে পারবে, সেই-ই হবে আমার বর।'

কিশোর চুপিচুপি মাকে বলে—সে কে। মা শুনে চমকে ওঠেন। বলেন, 'সে কি করে হয়!'

কিশোর দিদিকে মার আপত্তি জানায়। কৃষ্ণা মাকে বলে, 'অভিনেতা বলে এ আপত্তির কোন মানে হয় না মা। ধনে, কুলে, শীলে, এর চেয়ে ভালো বর কোথায় পাবে শুনি? এত নাম, এত যশ—কার আছে?'

কোন আপত্তি এই একরোখা মেয়েটির কাছে টেকে না। সূর্য চৌধুরীর কাছে প্রস্তাব যেতে সে বলল, 'এ তো ভাগ্যের কথা।' এ কথা অবশ্য বলল না যে, এ প্রস্তাব সে-ই দিয়েছে আগে, কৃষ্ণাকে, পত্রে।

এক গোধূলি লগ্নে এদের বিয়ে হয়ে গেল বটে, কিন্তু বিধাতা পুরুষ আপন মনে বোধ করি হাসলেন। কারণ, শুভদৃষ্টির সময় কৃষ্ণা চমকে উঠল! এ কাকে দেখছে! কোথায় সেই গৌরবরণ কান্তি? কোথায় সেই টানা চোখ?

এ কে? কে এ! এই কি সেই সূর্য চৌধুরী?

কৃষ্ণার তখন মনে হল, সূর্য চৌধুরীকে সে যে কদিন দেখেছে, রূপ সজ্জায় সজ্জিত মূর্তি দেখেছে। আজ যা দেখল, এই তার সত্যিকার মূর্তি।

কৃষ্ণা নিজের মনকে প্রবোধ দিল, 'তা এই বা মন্দ কি!'

কিন্তু বিয়ের পর কৃষ্ণা স্বামীর ঘর করতে গিয়ে দেখে, 'সকলি গরল ভেল!'

সূর্য চৌধুরী হিমাদ্রি নয়, সম্রাট অশোক নয়, শ্রীগৌরাঙ্গ নয়, দাতাকর্ণ নয়, সব্যসাচী নয়, কোন মহৎ চরিত্রই সে নয়। ভিখিরিকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া সে পছন্দ করে না, পাই পয়সার হিসাব সে রাখে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা সে অনধিকার চর্চা মনে করে—হিটলারকে quote করে সে বলে, 'মেয়েদের কাজ মা হওয়া আর রান্না করা। মেয়েরা সমাজ সেবা করবে সে তা ভাবতেই পারে না। মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, কর্তব্য—সংসারধর্ম, ধর্ম—পতিসেবা, কর্ম—রন্ধন এবং সন্তান পালন। আর্য ঋষিগণ মূর্খ ছিলেন না—', বলে সূর্য 'এবং বলে, 'আমার এই মতবাদ সেই আর্য ঋষিগণেরই মতবাদ। পুরাতনকে বরণ করাই হল আধুনিক সভ্যতা—পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণই হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ঢং—এ যুগে তা একেবারে অচল।'

কৃষ্ণা যদি বলে, 'বেশ তো, সেই বৈদিক যুগেও তো স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল—স্ত্রীর সম্মান ছিল, নারীর বৃহত্তর জীবন ছিল।' সূর্য বলবে, 'তা ছিল, কিন্তু স্ত্রীজাতি তার
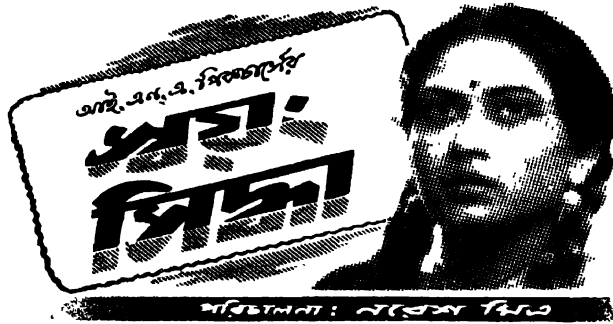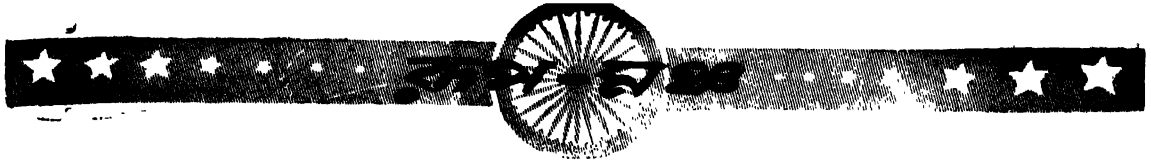
অমর্যাদা করাতেই পরবর্তী যুগে ওসব অধিকার সমাজ কেড়ে নিয়ে তাদের অন্তঃপুরে, সংসারে, রন্ধনশালায় বন্দী করেছে।' বলেই আবার বলে, 'আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। প্রেমের এই অনন্ত সমুদ্রে আমরা সারাজীবন ডুবে থাকবো। তাতেই শান্তি—তাতেই কল্যাণ, কৃষ্ণা। বাইবে না তাকিয়ে অন্তরে তাকাও। কোন ক্ষোভই থাকবে না কৃষ্ণা।'

কিন্তু, কৃষ্ণার মন তাতে তৃপ্ত হয় না। যাকে মনে ভেবেছিল এত উদার, সে যে এমন সঙ্কীর্ণমনা, এতটা রক্ষণশীল হতে পারে ভাবতেও কৃষ্ণার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কৃষ্ণা ভাবে, 'কি চেয়েছিলাম, কি পেলাম! কি ভেবেছিলাম, কি হ'ল!'

কৃষ্ণা বললো, সে কলেজ ছাড়বে না, পড়বে।

সূর্য বললো, 'কিঞ্চিৎ লিখনং পড়নং বিবাহস্য কারণম!' আর কেন?'

কৃষ্ণা বলে, 'তা হবে না, আমি পড়ব।'

সূর্য বলে, 'আমাদের বাড়ির বৌ স্কুল কলেজে পড়ে নি, পড়বে না। ওসব চলবেনা কৃষ্ণা।'

সূর্যের জন্মদিন এল! কৃষ্ণা তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের নেমন্তন্ন করতে চাইল। সূর্য বলল, 'সে কি! সামনে এতবড় খাদ্যসঙ্কট—স্বয়ং সরকার হুসিয়ারী করে দিয়েছেন। এখন এই সব বাজে খরচ—! এ দেখচি জন্মদিন তো নয়, শ্রাদ্ধ।'

ক্রমে, এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরাট এক ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল!

কিন্তু সূর্যও তাতে কম আহত হল না। সূর্য সত্যি সত্যিই কৃষ্ণাকে ভালোবেসেছিল, ভালোবাসে। দু'জনের দৃষ্টিভংগী বিভিন্ন মুখী হওয়ায়—এই যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, সূর্য সেটা ধরতে পারে না। সূর্য দেখতে পায়, কৃষ্ণা ক্রমশঃ যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিয়ের আগের সেই চিঠিগুলো সে গোপনে পড়ে—আর ভাবে—'তাইতো একি হ'ল! কোথায় গেল এই আবেগ—এই মুগ্ধ প্রেম—এই নিবিড় অনুরাগ!' নিজের বিরাট ব্যক্তিত্বে সে কৃষ্ণার ব্যক্তিত্ব যে অস্বীকার করে চলেছে—এটা সে অনুভব করতে পারে না।

কৃষ্ণার আত্মীয়া এবং সখীরা বেড়াতে এসে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কি—সুখী হয়েছিস তো?' কৃষ্ণা জানে, এরা সব এ-বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল। তাই জোর করে বলে, 'সুখী হব না!' এবং সে যে কতখানি সুখী তা প্রমাণ করতে গিয়ে সূর্যের সংগে এমন সপ্রেম ব্যবহার করে যে, সূর্যও অবাক হয়! সূর্য আস্বাদ পায়, প্রেমময় সেই জীবনের—জীবনের সেই স্বপ্নের—স্বপ্নের সেই জীবনের। কিন্তু জীবনের এই ক্ষণবসন্ত উড়ে যায়, যেই আত্মীয় ও সখী চলে যায়। আবার সুরু হয় সেই দ্বন্দ্ব। সুরু হয় সেই ব্যক্তিত্বের লড়াই, আদর্শের সংঘাত।

দুজনেই হাঁপিয়ে ওঠে।

সূর্য তার প্রিয় বন্ধু, নাট্যকার প্রিয়বন্ধু বোসের শরণাপন্ন হয়। বলে, 'বন্ধু এ কি হ'ল! কেন ওর মন পাই না! একদিন তুমি ওর সব চিঠি দেখে বলেছিলে, এ শুধু প্রেম নয়, hero worship-ও বটে। কিন্তু আজ সে আমার পানে ফিরেও চায় না। কোথায় গেল তার প্রেম—কেন এমন হ'ল!'

নাট্যকার বলল, 'এ তো সোজা কথা। সে যদি তোমায় না ভালোবাসে, আর কাউকে ভালবাসে।'

চকিতে সূর্যের মনে হয়—'ঠিক। তাই-ই তবে। হ্যাঁ, তাই-ই হবে।'

নাট্যকার বলে, 'মানুষের মন নিরাসক্ত থাকতে পারে না, কখনো না। তুমিই কি তোমার জীবনে কাউকে না ভালোবেসে থাকতে পেরেছ?'

সূর্য ভাবে, ঠিক! ঠিক! ভাবে কে সে—যাকে আজ কৃষ্ণা ভালোবাসে! ভাবতে ভাবতে সূর্যের মাথায় আগুণ জ্বলে ওঠে।

সেই মুহূর্ত থেকে সূর্যের মনে শুধু এই এক প্রশ্ন জাগে, কে সে? সে কে?

সুরু হয় গোয়েন্দাগিরি। কে আসে—কে চিঠি লেখে—কোথায় যায়—ও জানালাটা খোলা কেন—পাশের বাড়ির জানালায় ও লোকটি কে?—প্রশ্ন—প্রশ্নের পর প্রশ্ন—

গোপনে চিঠিপত্র পড়া—কৃষ্ণার এটাচি কেস—ভ্যানিটি ব্যাগ খানাতল্লাস করা—

কৃষ্ণা সূর্যের এই নীচতায় আরো দূরে সরে যায়। সে ক্ষেপে ওঠে—ঝগড়া করে—কাঁদে—'ছি-ছি, একি হ'ল! এত নীচ!'

এ ফটো কার?···এ বইটা তরুণদা উপহার দিয়েচে··· কে এই তরুণদা, কেন এত দামী বই সে-লোকটা তোমায় দিয়েছে?···সেই বুড়ো গয়লাটা ছাড়িয়ে এই ছোকরা গয়লা ঠিক করা কেন?···ছোকরা চাকর এ বাড়িতে থাকবে না।···এদিককার এ জানলাগুলো বন্ধ থাকবে। হ্যাঁ থাকবে। ও বাড়ি থেকে সব দেখা যায়।···

দু'জনেই হাঁপিয়ে ওঠে, দু'জনের জীবনই হয়ে ওঠে তিক্ত—বিষাক্ত।

হতাশ হয়ে সূর্য নাট্যকারকে বলে, 'বন্ধু, হাতে নাতে ধরতে পারছি না,—পাচ্ছি না এমন কোন প্রমাণ—যাতে—'

প্রিয়বন্ধু বলে, 'ভায়া, ওদের চরিত্র···দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ! তা সব প্রমাণের সেরা প্রমাণ নিজের প্রমাণ··· প্রত্যক্ষ প্রমাণ। করবে একটা পরীক্ষা?'

সূর্য বলে, 'বল, ভাই বল।'

প্রিয়বন্ধু বলে, 'বাঙলার আজ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তুমি। তুমি যখন ষ্টেজে প্রেম নিবেদন কর, নায়িকা তো পায়ে লুটিয়ে পড়েই, কিন্তু ঐ আবেগ নিয়ে যদি ষ্টেজের বাইরেও প্রেম নিবেদন করতে, সেখানেও তোমার জয় অনিবার্য। খুব কম মেয়েই তোমাকে রুখতে পারবে।'

সূর্য বলে, 'তাতে আমার প্রশ্নের, আমার সমস্যার কী সমাধান হচ্ছে?'

প্রিয়বন্ধু বলে, 'হচ্ছে বৈ কি। তুমি পরীক্ষা কর, তোমার নিজের স্ত্রীকে, পরপুরুষ সেজে।'

সূর্যের মাথায় বুদ্ধিটা খোলে।

প্রিয়বন্ধু বলে, 'পরপুরুষ সেজে যদি তুমি তাকে তোমার প্রেম নিবেদন কর—আর সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, সে তোমাতে- মানে স্বামীতে আর আসক্ত নয়।'

সূর্য একথার যৌক্তিকতা স্বীকার না করে পারে না।

'কি সাজব' ভাবে সূর্য। দেশকর্মী, সমাজসেবী, বিপ্লবী—এদের প্রতি ওর স্বাভাবিক প্রীতি লক্ষ্য করেছি। ঠিক। আচ্ছা।...

সেই রাতে ষ্টেজ থেকে বাড়ি ফেরবার সময় সূর্য একটা still ফটো নিয়ে যায়—ফটোটা তারই, এক বিপ্লবী নায়কের পার্ট করেছিল, মাথায় গান্ধীটুপি, পরণে খদ্দরের জামা। গোঁফ আছে।

অনেক রাত তখন। আগে কৃষ্ণা জেগে বসে থাকতো, এখন থাকে না। সূর্য ধীর পদসঞ্চারে ঘরে ঢুকে ফটোটা টেবিলের ওপর অযত্নে ফেলে রাখল।

তারপর কৃষ্ণাকে ডেকে খেতে চাইল।

আহারের পর সিগারেট ধরাতে ম্যাচ বাক্স খুঁজতে গিয়েই যেন তার চোখে পড়ল সেই still ফটোটা। সাপ বা ভূত দেখলে লোকে যেমন চমকে ওঠে, সূর্য সেই অভিনয় করল।

'এ ফটো কোত্থেকে কে এখানে এনেছে?' কঠিন কঠোর মূর্তিতে সূর্য জিজ্ঞাসা করে।

কৃষ্ণা ফটোটা দেখল।......বলল, সে এটা এই প্রথম দেখল।

'এ লোকটা নিশ্চয়ই এসেছিল, নিশ্চয়ই তোমাকে এই ফটো দিয়ে গেছে। নইলে আমার বাড়িতে যে কয়েকটা ফটো ছিল, সে তো আমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি।'

কৃষ্ণা বলে, 'কে এ লোক তাও জানিনা। ফটো কোত্থেকে এল তাও বলতে পারব না।' সে শুতে চলল।

সূর্য চীৎকার করে উঠল 'শোন। তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি—এই সয়তান যেন এ বাড়িতে কখনো ঢুকতে না পায়। ঢুকলে আমি ওকে পুলিসে ধরিয়ে দেব। ওকে ফাঁসিতে না ঝোলানো পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না, কেন জান? ও আমার জীবনের কুগ্রহ। আমার আপন মাসতুতো ভাই। ঠিক যমজ ভাই হলে যেমন এক চেহারা হয়, ওরও তাই। তারি সুযোগ নিয়ে আমার 'রেঁস্তোরা'তে গিয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে খেয়ে আমার হিসাবে লিখিয়ে দিত—যেখানে আমার credit ছিল সেখান থেকেই, আমিই যেন টাকা নিচ্ছি—নিয়ে সরে পড়তো, শুধু কি তাই, প্রথম বয়সে একটি মেয়ে আমায় ভালোবাসতো, ও লুকিয়ে আমি হয়ে তার সংগে প্রেম করে তাকে নিয়ে উধাও হ'ল। সে মেয়ে ভাবল, সে আমার সংগে গেল। তারপর—থাক সে কেলেঙ্কারি—আমি ওকে জুতো পেটা করেছি। এখন হয়েছে বিপ্লবী। ১৯৪২ সালে টেলিগ্রাফের তার কেটেছে, ষ্টেশন পুড়িয়েছে, ব্রীজ উড়িয়েছে, পুলিস ওর খোঁজে আমার বাড়ি এসে আমায় জ্বালাতন করেছে, এখন পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে গা' ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আসেনি সে এ বাড়ীতে আজ?' বজ্রনির্ঘোষে সূর্য জিজ্ঞাসা করে।

'না।'

'তবে কি করে আসে তার ফটো—কে আনলো এই ফটো—' ব'লেই সূর্য ফটোটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিড়লো—মাটিতে ফেলে দিয়ে লাথি মারল—তার চোখমুখ, তার ক্রোধ দেখে কৃষ্ণা সত্যি সত্যিই ভয় পেল; যদি না পেত, সূর্য চৌধুরী আজ বাংলা দেশের সেরা অভিনেতা হতে পারত না।

তার পরের রাত্রি। সূর্য স্বপ্না থিয়েটারে। কৃষ্ণা একটা বই পড়চে। হঠাৎ বাড়ির সামনের রাস্তায় তীব্র হুইসিল বেজে উঠল। তার খানিকটা পরেই কৃষ্ণার ঘরের সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে একটা ভারী জিনিষ পতনের শব্দ হ'ল। কৃষ্ণা বই রেখে উঠে বসল। সংগে সংগে বাগানের দিকের দরজায় মৃদু করাঘাত হতে লাগল এবং আর্ত অথচ চাপা গলায় কে বলছে 'দোর খোল, বাঁচাও—আমায় বাঁচাও।'

কৃষ্ণা জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে একজন লোক—দরজার বাইরের সোপানে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে।

কৃষ্ণার কি মনে হল। দোর খুলল।

সকাতরে লোকটি প্রার্থনা করল, 'পুলিশ আমায় তাড়া করেছে। বহুকষ্টে তাদের এড়িয়ে তোমাদের পায়ে এসে পড়েছি। ইচ্ছা করলেই আমায় পুলিশে দিতে পার—ইচ্ছা করলেই আমায় বাঁচাতে পার। বাঁচাও—আমায় বাঁচাও।"

কৃষ্ণা তাকে ঘরে উঠে আসতে বলল।

লোকটি ঘরে এসেই বলল, 'তুমিই তবে বৌদি। দাদা কই?'

'থিয়েটারে।'

'তাঁকে বলো, আমি—আমি তাঁর অনুতপ্ত ভাই, আমি ক্ষমা চাই। আমায় কিছু খেতে দিতে পার? অন্ততঃ এক গ্লাস জল?'

কৃষ্ণা তার স্বামীর জন্য রক্ষিত আহার্য এনে দেয়।

খেতে খেতে কথা হয়।

তার নাম রাহুল। কতকাল ভালো খেতে পায় না। পরতে পায় না। জামাটা ছেড়া। পায়ে জুতো নেই। গত আগষ্ট বিপ্লবে একটা বিশেষ অংশ নেওয়ায় পুলিশ তার পিছে লেগেই আছে। সে এখন একটা বস্তিতে পালিয়ে রয়েছে। বস্তিতে সে কি শোচনীয় অবস্থা। দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ, ব্যারাম-পীড়া—সব সেখানে। দেশের এতবড় একটা অংশ শ্রমিক। জাতির মেরুদণ্ডই বলা যায়। কিন্তু তাদের প্রাণশক্তির কী বিরাট অপচয়ই না হচ্ছে। তাদের পেছনে দাঁড়াবার লোক নেই। ক্ষয়িষ্ণু এই লোক-শক্তিকে রক্ষা করতে তো কেউ এগিয়ে আসছে না। একটু সহানুভূতি—একটু সমবেদনা—তাও এরা পায় না। এতটুকু সেবা—এতটুকু শুশ্রূষা তোমাদের কাছে কি এরা দাবী করতে পারে না বৌদি!'

...কৃষ্ণা অভিভূত হয়। জীবনে সে এই-ই চেয়ে ছিল। এই সেবা, এই শুশ্রূষা, দেশের জন্য এই কাজ—এই-ই ছিল তার স্বপ্ন, তার সাধনা।

...কৃষ্ণা অভিভূত হয়।

রাহুল বলে, 'ভেবে দেখো বৌদি। এই হতভাগাদের কথা দিনান্তে একটিবারও অন্তত: স্মরণ ক'রো। আর কিছু না পারো, এদের জন্য অন্ততঃ প্রার্থনা ক'রো। তোমায় দেখে বড় আনন্দ হ'ল। তোমায় দেখে মনে হ'ল, ঐ কল্যাণী মূর্তি যদি একটিবার সেই পতিতদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে বরাভয় দেয়—অনেক আশা, অনেক সাহস—ওরা পেত। অবিচার, নির্যাতন, শোষণের বিরুদ্ধে ওরা নির্ভয়ে দাঁড়াবার সাহস পেত। আসি বৌদি। আজ তোমার সংগে আমার প্রথম দেখা। বিধাতা তা জানতেন। তাই যখন দেওয়াল টপকে তোমার গোলাপ বাগানে পড়লাম, হাতের কাছে পেলাম এই রক্ত গোলাপ। নিজের অগোচরেই তুলে নিয়েচি। এখন বুঝচি, বিধাতার ইচ্ছা, শোষিতের—নির্যাতিতের রক্ত-রাঙা এই গোলাপই হবে তোমার চরণে আমার—আমাদের প্রথম অর্ঘ্য।'

চকিতে গোলাপটি তার পায়ে রেখে রাহুল ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

'তুমি এসো, আবার তুমি এসো ঠাকুরপো।'—কৃষ্ণা ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বসলো। হ্যাঁ, না বলে কৃষ্ণা পারল না।

"আসব।" রাহুল দেওয়াল টপকে অন্ধকারে মিশে গেল।

* * *

গভীর রাত্রে, থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরল সূর্য চৌধুরী। আজ অবশ্য কৃষ্ণা জেগে বসে ছিল।

সূর্য চৌধুরী কৃষ্ণার পানে ভালো করে তাকিয়ে দেখল।

'তুমি আজ জেগে রয়েছ দেখচি কৃষ্ণা।'

'অপরাধ করেচি কি?' কৃষ্ণা না তাকিয়েই বলে।

'না তা কেন! খেতে দাও।'

কৃষ্ণা খাবার সাজিয়ে দিল।

'সব গরম দেখচি। এখনি বুঝি করলে। এত ভাগ্য আমার কেন বলত! একি। খোঁপায় দেখচি রক্তগোলাপ! আজ হ'ল কি! রজনী হ'ল উতলা! ব্যাপার কি?' সূর্য এক একটি তীর ক্ষেপণ করচে আর কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করচে।

'কেউ এসেছিল নাকি?' তাঁর এই শেষ বাণে কৃষ্ণা গর্জে ওঠে।

'তুমি ভদ্রভাবে কথা কইতেও জান না!' কৃষ্ণা ঘর থেকে ছুটে চলে যায়—মানে, পালিয়ে বাঁচে।

সূর্য একাকী শয়তানের হাসি হাসে।

পরদিন থিয়েটারে সূর্য প্রিয়বন্ধুকে খুশী হয়েই বলে, 'অবুধ ধরেচে। "রাহুল" এসেছিল বলেনি। গোপন করেছে।'

'এই সুরু হল। খুব বেশী স্বামীত্ব ফলিয়ো না—যদি বোঝে স্বামী টের পেয়েছে—সব ভেস্তে যাবে। বরং স্বামী টের পাচ্ছে না বুঝতে পারলেই, খেলা জমবে। রাহুল রূপে মনের সব গোপন কথা টেনে বের করতে পারবে।' প্রিয়বন্ধু পরামর্শ দেয়।

'কিন্তু আজকে রাতের অভিসারে কি বলব? বুদ্ধি দাও বন্ধু।'

'তার জন্য ভাবনা কি? বস্তীতে বসে বস্তীর যে বাস্তব নাটক লিখচি তার হিরো তুমি। ঠিক ঐ প্লট—দেশকর্মী—রাজরোষে পড়েচ—বস্তীতে পালিয়ে আছ—'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই হচ্ছে স্পিরিট। নায়িকা তোমার প্রভাবে—মানে তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিলাসের জীবন ত্যাগ করে—এই বস্তীতে এসেই তোমার পাশে দাঁড়ালো, তোমার হাত ধরলো, এই হ'ল প্লট।...সেই সব কথা, কথাতো নয়,...আগুন' ভালো করে মুখস্থ করে নাও। কথার ভাবনা কি?'

'তারপর যদি বস্তিতেই আসতে চায়?' সশঙ্ক চিত্তে সূর্য প্রশ্ন করে।

'তারই বা ভাবনা কি! বস্তীতে বসে আমি নাটক লিখচি। আমার ওখানেই তুলবে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কি হে। তুমি নিজেইতো সংগে থাকচ!'

'ও!'

—সেই রাত্রি। রাত তখন দশটা।

কৃষ্ণা গোলাপ বাগানের জানলায় বসে রয়েচে। কেন, কৃষ্ণাও ঠিক বলতে পারবে না। হয়ত জানে না, হয়তো জানে।
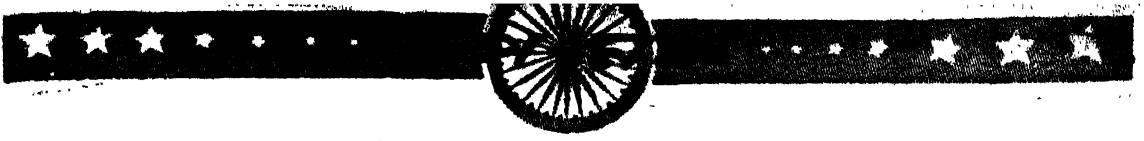
বলা বাহুল্য, 'স্বামী' থিয়েটারে, নতুন বইএর রিহার্স্যাল' কৃষ্ণা শুনেছে।

জ্যোৎস্না রজনীগন্ধার মাদকতা, এবং কী একটা অজ্ঞাত সম্ভাবনা · কতকটা কৌতূহল, খানিকটা আশংকা, কিছুটা ভয়, কিছুটা আনন্দ সব মিলে রজনী উতলা হয়েছে আজ।

হ্যাঁ, তাইতো। সে এসেছে।

সে এল।

হ্যাঁ, রাহুল। হ্যাঁ দোরে মৃদু করাঘাত কচ্ছে।

দোর খুলে গেল।

'বৌদি! আজ সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। তোমার প্রসাদ পাব বলে এসেচি।'

'বল কি! কিন্তু এমন করে আর কদিন চলবে বলতো!'

"এই তো আমাদের জীবন। দিনে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। রাতে সাহস করে বেরুই। দলের লোকদের সংগে দেখা করতে হয়। টাকার যোগাড় দেখতে হয়। আর পারছি না বৌদি।'

কৃষ্ণা খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। রাহুল খাচ্ছে। এমন ভাবে খাচ্ছে, যেন কতদিন উপবাসী রয়েছে।

কৃষ্ণার মনে সত্যই মমতা জাগে।

'দাদাকে আমার কথা বলেছিলে?'

'না ভাই। সাহস পাইনি। তিনি তোমার নাম পর্যন্ত শুনতে পারেন না।'

'তবু একবার বলে দেখ না। হয়ত দয়া হতে পারে—হয়ত ক্ষমা করতে পারেন—তোমার কথায়। দেহটা আর টানতে পারছি না। অন্ততঃ কয়েকটা দিন যদি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারতাম, হয়তো আবার বেঁচে উঠতাম—তোমার শুশ্রূষায়। বলবে তাঁকে একবার?'

'দেখব। আচ্ছা, তোমাদের ওখানে এখন কি কাজ হচ্ছে? কী করছ তোমরা?' কৌতূহলী হয়ে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে।

বলা বাহুল্য "রাহুল" বস্তী জীবনের শোচনীয়তা থেকে সুরু ক'রে বস্তী উন্নয়নের গালভরা একটা পরিকল্পনা শুনিয়ে দেয়। 'এই কাজই আমি চেয়েছিলাম, এই সেবার কাজ, দেশের কাজ, এই-ই ছিল আমার সাধনা—আমার স্বপ্ন।' কৃষ্ণা স্বপ্নাতুর চোখে বলে।

'বৌদি! তুমি আসবে! আমাদের জীবনে! আসবে!'—রাহুল জিজ্ঞাসা করে। সে জিজ্ঞাসায় নিপীড়িত মানবাত্মার ব্যাকুলতম প্রার্থনা রূপায়িত হয়।

'এমন করে কেউ তো আমায় ডাকেনি ঠাকুরপো! অথচ এই জীবনই আমি চেয়েছিলাম।' দীর্ঘশ্বাসে কৃষ্ণা বলে।

'যদি চেয়েছিলে, তবে কোন বন্ধন তুমি মানতে পার না। ভেঙে ফেল শৃঙ্খল। এই অন্ধকারায় কেন তুমি থাকবে। বিধাতা এজন্য তোমায় সৃষ্টি করেন নি। মূর্তিমতী অগ্নি-শিখা তুমি, বেরিয়ে এস। বিপ্লবের আগুন জ্বালো।'

"রাহুল" আরো বলতে পারত—কিন্তু হায়! তার পার্ট ভুলে গেছে। পকেট থেকে পার্ট বের করে দেখে নিয়ে আবার সুরু করতে গিয়ে দেখে, কৃষ্ণা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

'তুমি কাঁদছ! বৃহত্তর জীবন তোমায় হাতছানিতে ডাকছে, তুমি কাঁদছ।'

'জানো না, জানো না ঠাকুরপো। কি বাঁধনে বাঁধা পড়েচি। আমি তোমার দাদাকে বলব। তার পায়ে পড়ব। তাঁকে নিয়েই আমি কাজে নামব।'

'দাদা! আসবেন! এই কাজে! দাদাকে তবে এখনো চেননি বৌদি! বেশ দেখ।'

'হ্যাঁ দেখব। তুমি এসো, এসো ঠাকুরপো, মাঝে মাঝে এসো।'

* * *

সূর্য চৌধুরী যখন বাড়ি ফিরল, বুঝল কৃষ্ণা তারই প্রতীক্ষা করচে। সূর্য আজ কৃষ্ণার মধ্যে একটা প্রীতির পরিবেশ দেখতে পেল। আজ যেন সে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়। আজ যেন সে স্বামীকে বশ করতে চায়—জয় করতে চায়। আলাপ জমিয়ে নেয় কৃষ্ণা। অনেক দিন পর সূর্য তাকে মনের মতো পায়। সূর্য সত্যিই আজ খুশী হয়। প্রেমে—প্রীতিতে তার মন ভরপুর হয়ে ওঠে। কৃষ্ণাকে নিয়ে সে বাগানে গিয়ে বসে। হ্যাঁ, ঐ অত রাতে। হ্যাঁ ঐ জ্যোৎস্নায়। গান গেয়ে কৃষ্ণা এই মধু যামিনীকে আরো মধুমতী করে।
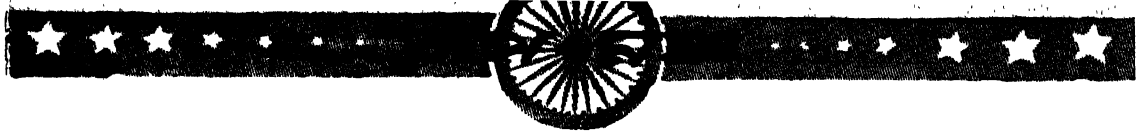
সূর্য বলে—জীবনের স্বপ্ন—স্বপ্নের জীবন সে পেল…এতদিনে পেল।… তখন—তখন কৃষ্ণা যাদুকরীর মতো কথা পাড়ে। দেশের কাজ—সমাজ সেবা।

সাপে পা পড়লে লোকে যেমন চমকে ওঠে, সূর্য চমকে উঠল।

'তা কি করে হয় কৃষ্ণা! তুমি আমার—একান্ত আমার। দশজনের মাঝে আমি তোমায় হারাতে পারবো না—পারবো না কৃষ্ণা।' আর্তস্বরে সূর্য জানায়।

ক্রমে কথা কাটাকাটি হয়।

জীবনের স্বপ্ন—স্বপ্নের জীবন—দুজনেরই ভেঙে যায়।

* * *

পরের দিন সব শুনে নাট্যকার প্রিয়বন্ধু বসু বলে—

'নাটক এগিয়ে চলেছে হে। climax এর দিকে ছুটচে। না: এ আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। দেখো তুমি! এই মিটিং এই দেখো।'

'দেখব।'—গম্ভীর সূর্য উত্তর দেয়।

সেই রাত্রে রাহুলকে কৃষ্ণা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, 'আমি যাব। তোমাদের কাজে আমি নামব। গৃহের কোণে পচে মরতে আমি পারব না। জীবনকে এমন করে ব্যর্থ হতে আমি দেব না।'

ঠিক হয়, পরের দিন সন্ধ্যায় দাদা থিয়েটারে গেলে ভায়া আসবে—এসে নিয়ে যাবে কৃষ্ণাকে বস্তীতে—কৃষ্ণা স্বচক্ষে দেখবে, মানুষকে মানুষ কী পংকে নিক্ষেপ করেছে—মানুষের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত মানুষকেই করতে হবে—তার দিন এসেছে—আর দেরী করা চলবে না—কারণ, "হে
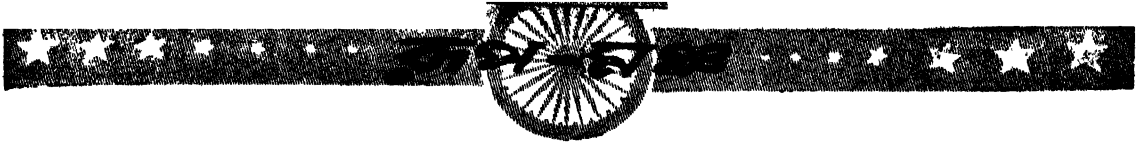
রাহুল এ সুযোগ ছাড়ল না। সুরু হ'ল তার অভিনেতা জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। নাট্যকারের বাকচাতুর্য এবং অভিনেতার অভিনয় চাতুর্য—একসংগে যে আবেদন সৃষ্টি করল, খুব কম মেয়েই তাতে অটল থাকবার কথা।

কিন্তু কৃষ্ণা অটলই রইল।

'আমায় আমার স্বামীর কাছে দিয়ে আসুন রাহুলবাবু। আপনাকে আজ আমি চিনলাম।'—কৃষ্ণা উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

'আমায় ক্ষমা কর কৃষ্ণা!' রাহুল হঠাৎ নতজানু হয়ে কৃষ্ণার দুই হাত ধরে মিনতি জানায়।

'ওঠ। চল।'—নতমুখে নিঃশব্দে দুজনে চলতে থাকে।

* * *

পরদিন সূর্য চৌধুরী নাট্যকার প্রিয়বন্ধুকে বলে, 'আর আমার ক্ষোভ নেই বন্ধু। অভিনেতা হিসাবে হেরেছি, কিন্তু স্বামী হিসাবে আমি জিতেছি। সীতার অগ্নি পরীক্ষার মতো কৃষ্ণারও এই পরীক্ষায় আমি খাঁটি সোনাই পেলাম।'

নাট্যকার রুখে ওঠে। বলে, "আমি এখনো তা স্বীকার করবো না। একে অগ্নি পরীক্ষা আমি বলব না। স্বামী যেখানে স্ত্রীকে চোখে চোখে রেখেচে ব'লেই স্ত্রীর দুঃসাহস হয় না। সূর্য চৌধুরী আজ ফিল্ম কন্ট্রাক্ট নিয়ে বোম্বে চলে যাক্, দেখবে রাহুল রায় জিতে গেছে।'

'হুঁ।...তাই তো।...আচ্ছা, সে পরীক্ষাও আমি নিচ্ছি।' সূর্য চৌধুরী এর শেষ না দেখে ছাড়বে না।'

* * *

খাবার টেবিলে সূর্য চৌধুরী জানায়, 'কে এক দেশনেত্রী তার গায়ের সব গয়না দেশের কাজে দিয়েছে। তাই নিয়ে খুব হৈ হৈ হচ্ছে। এ গয়না দেওয়া সোজা, কারণ এ ক্ষতি স্ত্রীর নয়, স্বামীর। মানো?

কৃষ্ণা বলে, 'স্বামীর ক্ষতি মানে? গয়না তো স্ত্রীর—স্ত্রী-ধন।'

সূর্য বলে, 'আ-হা, হোক না। কিন্তু গোটা স্ত্রীটাই তো স্বামীর সম্পত্তি। এই যে তুমি গা ভরা গয়না পরছ—একি! আজ দেখচি সব নতুন সেট! ব্যাপার কি? কোথাও যাবে নাকি?'

'যাবো যমের বাড়ি।'

'শোন—শোন। আমি কিন্তু সত্যি যাচ্ছি। বোম্বে। তিন মাসের জন্য একটা ফিল্ম কন্ট্রাক্ট পেয়েছি। কাল বিকেলে আমার গাড়ি। তাজমহল হোটেলে থাকব। জিনিষপত্তর তৈরি রেখো। হ্যাঁ, আর যা বলছিলাম। বোম্বেতে একটু Style-এ থাকতে হবে। ভেক না হলে ভিক মেলে না জানো। দিনকয়েক ভাল সুট কিনতে হবে। কিন্তু হাতে টাকা নেই। তোমার আগের সেট্ গয়নাটা আমায় দাও। ...এখনকার মত কাজ চালিয়ে নি। বোম্বে থেকে ফিরে খালাস করে আনব।'

কৃষ্ণা বলে, 'গয়না আমি দিতে পারব না।'

লেগে গেল—

স্বামীর অধিকার, পতি দেবতা, স্ত্রীর কর্তব্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা, উন্মার্গগামী বিংশ শতাব্দী, সতীধর্ম, ব্যাভিচার—কিছুই বাদ গেল না। সূর্য কৃষ্ণার কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে ঘোষণা করে গেল, স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর দাসী। তার অধিকার শুধু পতি সেবা, সন্তান পালন এবং রন্ধন, ব্যস্।

* * *

বলা বাহুল্য রাহুল, সেই রাত্রেই এল।

'আমায় নিয়ে যাবে এখান থেকে রাহুল? নিয়ে যাবে' আজই?'

'ব্যাপার কি? ব্যাপার কি কৃষ্ণা?'

'এ সংসারে আমার কোন অধিকার নেই। আমি নাকি শুধু দাসী, অধিকার শুধু পতি দেবতার সেবা। শোনা অবধি আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে। এই সঙ্কীর্ণতায় আমি বাঁচবো না—বাঁচবো না। আমায় বাইরে, উদার আকাশের তলে নিয়ে চল—আমায় বাচাও।'

'সেই কথা বলতেই আমি এসেচি কৃষ্ণা। বস্তির লোকেরা তাদের মাকে খুঁজছে। তারা তোমায় ডাকচে। তাদের মানুষের অধিকার দেবার ভার নাও। কদিন থেকেই আসব ভাবছি। কাগজে দেখলুম দাদা তিন মাসের জন্য কাল বোম্বে যাচ্ছেন। বিনা বাধায় তুমি কাজ করতে পারবে। কালই আমি আসব—রাত দশটায়। তুমি প্রস্তুত থেকো।'

'দাদার ভয় আর আমি করি নে। তার সংগে বোঝা-পড়া

শেষ। তাই হবে রাহুল। এমন করে এখানে আমি পচে মরতে পারব না।'

*　　*　　*

সূর্য চৌধুরী বোম্বে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বোম্বে। সুদীর্ঘ তিন মাসের জন্য। রাত্রি ৮টায় ট্রেন। এখনো কিছু সময় হাতে আছে। সূর্য কৃষ্ণার কাছে এসে দাঁড়ালো।

'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি কৃষ্ণা।' অনুতপ্ত কণ্ঠেই সূর্য বলে। বলে, তর্কের সময় তার জ্ঞান থাকে না। রক্ষণশীল লোক, সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু অতটা—অতটা বলা তার উচিত হয় নাই। তা ছাড়া, সে কৃষ্ণাকে অতি একান্ত ভাবেই পেতে চায় বলেই সে তাকে নিজের কাছে, নিজের বুকে বেঁধে রাখতে চায়।

কৃষ্ণা তার কাছে কখনো এত আবেগ—এত স্নেহ পায়নি—যা আজ পেল। সে হঠাৎ সূর্যের হাত ধরে বলে, 'তুমি বুঝতে চেষ্টা কর—আমায় একটি বার বুঝতে চেষ্টা কর। শুধু ঘরে নয়, বাইরেও আমায় তুমি পেতে চেষ্টা কর—'

'ও আমি বুঝি না। ও সব বুঝি নে কৃষ্ণা। শুধু বুঝি তুমি আমার। আর কারো কোন অধিকার নেই তোমার ওপর। কৃপণ, হ্যাঁ আমি বড় কৃপণ, জানই তো, কিন্তু সে তোমারি জন্য—তোমারি জন্য কৃষ্ণা। আচ্ছা, এইবার তবে আসি।' সূর্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়।

'না—না, দাঁড়াও। তুমি—তুমি—না তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।' আর্তকণ্ঠে কৃষ্ণা মিনতি জানায়।

'সে কি! তা কি কখনো হয়! না গেলে চলে! কণ্ট্রাক্ট!

'আমায় নিয়ে চল। তবে আমায়ও নিয়ে চল।'—ব্যাকুল কণ্ঠে কৃষ্ণা বলে। 'তাই বা কি করে হয়! এই ঘরবাড়ি—এই সংসার কে দেখবে! এ যে আমার প্রাণ!···না না, তুমি থাকো। চিঠি দেব। চিঠি দিয়ো। তোমার

মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাদের সমান।"

*　　*　　*

গভীর রাত্রে সূর্য চৌধুরী বাড়ি ফিরে দেখে আবহাওয়া সুবিধের নয়। আকাশে যেন মেঘ জমেছে।

'আমি কিছু দিন মার কাছে গিয়ে থাকতে চাই।' কৃষ্ণা বিনা আড়ম্বরে বলে।

'চৌধুরীদের বাড়ির বৌ'রা বাপের বাড়ি কথা ভুলে গিয়েই এ বাড়িতে আসে। আমার মা বিয়ের তিন মাস পর বাপের বাড়িতে গিয়ে ত্রিরাত্রি বাস করে সেই যে আসেন, আর ওমুখ হন নি।'—সূর্য চৌধুরী সগর্বে জানায়।

'সেটা এমন কিছু আদর্শ নয়। জীবনে অনেক কিছু বড় আদর্শ রয়েছে।' কৃষ্ণা সশ্লেষে বলে।

'আমি জানি।' কি বলতে গিয়ে সূর্য থেমে যায়। শুধু বলে, 'ওসব চলবে না।'

'বটে! আচ্ছা।—' কৃষ্ণা সেখান থেকে ঝড়ের মতো চলে যায়।

*　　*　　*

পরের দিন নাট্যকার প্রিয়বন্ধু বসু শুনে বলেন, 'এরকম তো আর বেশী দিন চলতে পারে না। climax-টায় আজই চলে এস। ভালো কতকগুলো লাইন লিখে দিচ্ছি। মুখস্থ করে ফেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা চরম আবেদনের অভিব্যক্তি অভ্যাস করে নাও। বস্তীতে নিয়ে এস। আমরা সব প্রস্তুত থাকবো। ফেরবার পথে পাকে চক্রে লেকে নিয়ে—মানে ভালো একটা রোমান্টিক লোকেশন চাই—একটা নির্জন কুঞ্জে বেঞ্চে বসে, তোমার শেষ অস্ত্র—চরম অস্ত্র প্রয়োগ কর। আজ হোক মহাপরীক্ষা, তোমার মানে তোমার অভিনয় প্রতিভার এবং তার। আজ যদি সে তোমায় আত্মদান না করে, বুঝব বাংলাদেশে এখনো তুমি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হতে পার নি। 'পূরবী' যা লিখেছে তাই সত্যি, সে সম্মান এখনো অনেক দূরে। আর যদি সে আত্মদান করে, তবে স্পষ্টই বুঝতে পারবে স্বামী হিসাবে তোমার কপাল পুড়েচে। যাও বৎস, আজ তোমার পরীক্ষা—সত্যই মহাপরীক্ষা।'

*　　*　　*

ট্যাক্সি নিয়ে রাহুল কথামত কৃষ্ণাকে আনতে গেল। নিয়ে এল তাকে বস্তীতে।

প্রিয়বন্ধু প্রস্তুত ছিল। বস্তীর লোকদের জানিয়ে রেখেছিল আজ এক দেশনেত্রী আসচেন।

রাহুল কৃষ্ণাকে নিয়ে প্রিয়বন্ধুর ঘরে এল। প্রিয়বন্ধুর সংগে কৃষ্ণার আলাপ করিয়ে দিল।

প্রিয়বন্ধু দুচার কথা বলেই বেশ একটা নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেলল। দেশ, জাতি, বৃহত্তর জীবন, বিবেকানন্দ, রাশ্যা, শোষণ, পীড়ন, সব কিছু জড়িয়ে এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করল—যা কৃষ্ণা চেনে, জানে এবং মনে প্রাণে চেয়েছে। বস্তীর লোকজন সব জড়ো হয়েছে—সামনের খোলা মাঠে। দেশনেত্রীর দর্শন চায়—বাণী চায়—প্রেরণা চায়।

কৃষ্ণাকে মিটিংএ যেতে হল। সভা বসল। নাট্যকার প্রিয়বন্ধু বসু সভাপতি হলেন। 'রাহুল'কে আদেশ দিলেন দেশনেত্রীর সম্বন্ধে কিছু বলতে। রাহুল তার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করে শোনাল। প্রিয়বন্ধু সে বক্তৃতা এমন জোরালো ভাষায় লিখে দিয়েছিল যে, ঘন ঘন করতালি হতে লাগল। সভায় একটা উন্মাদনা এল। রাহুল এই পরিবেশনের মধ্যে দেশনেত্রীকে তাঁর বাণীর জন্য অনুরোধ করল।

কৃষ্ণা তখন অভিভূত হয়ে পড়েচে। দুচোখের মুক্তা বিন্দুতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—ভাবাবেগে তার কণ্ঠে বাণী আসছিল না।

'মা, আপনি কিছু বলুন মা!'

'আপনার মুখ চেয়েই আমরা রয়েছি মা।' জনতার মাঝ থেকে আকুল আবেদন নিবেদিত হয়।

'কি বলব আমি! কী আমার ক্ষমতা! আমি বড় অভাগিনী—'কৃষ্ণা উদ্গত অশ্রুরোধ করতে পারল না।

সভার লোকেরাও অভিভূত হ'ল। অনেকের চোখেই জল দেখা দিল।

কৃষ্ণা নিজেকে সামলে নিল। হঠাৎ দেখা গেল সে তার গয়নাগুলো খুলচে।

রাহুল, মানে সূর্য চৌধুরী শংকিত হয়ে উঠল।

'আমার ভাইবোনদের জন্য আমার এগুলো দিলুম।'

অলংকারগুলো সভাপতির হাতে দিল কৃষ্ণা। 'আমায় মাপ করুন। আর কিছু বলতে আমি পারবো না।' কৃষ্ণা বসে পড়ল।

সভায় তখন জয়ধ্বনি হচ্ছে। উৎসাহ উদ্দীপনার বাণ ডেকেছে। রাহুল মানে সূর্য চৌধুরী এবং প্রিয়বন্ধুতে দৃষ্টি বিনিময় হল। সূর্য চৌধুরীর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অসহায় কৃপণের চরম কাকুতি।

সভাপতি ঘোষণা করলেন, 'রাহুলকে সম্পাদক করা যাক—এই ধন ভাণ্ডারের।' করতালিতে সর্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে—সভাপতি রাহুলের হাতেই অলংকারগুলি দিলেন।

রাহুল মানে সূর্য চৌধুরী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বাড়ি ফেরবার পথে রাহুল কৃষ্ণাকে বলল, 'বড্ড মাথা ধরেছে।'

'লেকে একটু বসবে ?'

'লেকে ! রাত হয়নি ?' কৃষ্ণার উৎসাহ দেখা যায় না।

'কি আর এমন রাত হয়েছে। ও ভয় করছ ?'

'না, ভয় আবার কি, চল।'

দুজনে লেকে একটা কুঞ্জে গিয়ে বসে।

'কি ভাবছ ?'

'ভাবচি আজকের কথা। জীবনে এটা আমার পরম স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এর আনন্দ—এর বেদনা—'

'বেদনাটা কি ?'

'স্বামীকে সংগে পেলুম না—এত বড কাজে—এত বড় সাধনায়। কি ভাবি জান ?'

'কি ?'

'বিধাতা তোমাদের দুজনকে এক চেহারা দিয়েছিলেন, এক মন দেন নি কেন !···ভাবি—'

'বল—'

'সে যদি তোমার মন পেত—আমার চেয়ে আজ সুখী কে !
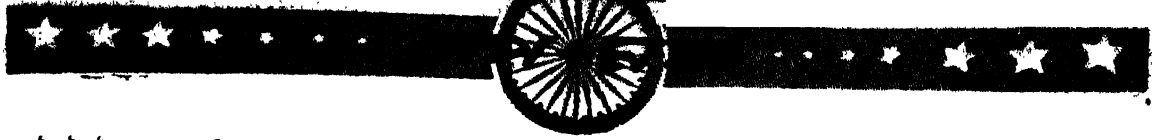
একাউন্টে টাকা জমা দিয়ে গেলাম। কোন অভাব হবে না। কোন অসুবিধা হবে না। তিনমাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'না—তুমি যাবে না। তুমি গেলে—তুমি গেলে—আমায় হয়তো হারাবে।' ভীতা ত্রস্তা কৃষ্ণা বলে।

সূর্য হেসে ওঠে। 'ছিঃ এত সেন্টিমেণ্টাল হতে নেই। Duty first। কর্তব্য আগে, তারপর প্রেম। এটা বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। আচ্ছা, বিদায়।'

সূর্য চৌধুরী কৃষ্ণার বাহুবন্ধন সরিয়ে দিয়ে—চলে গেল! কৃষ্ণা ষ্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ থেকে শুধু বেরুল,'এই আমার দাম!'

ঘড়ি চলছে টিক্—টিক্—টিক্।...৮টা বাজল—৯টা বাজল। কৃষ্ণা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দাস-দাসী সবার কাছ থেকে বিদায় নিল। ৯টা বাজল। কৃষ্ণা গয়নাপত্র সব খুলে রাখচে। ৯॥৹টা বাজল, দেখা গেল কৃষ্ণা নিতান্ত সাধারণ একখানি শাড়ি পড়েচে। একটি ছোট সুটকেশ ভরচে—আর একখানি শাড়ি—গোটা দুই জামা, খানকতক বই। পৌনে দশটা বাজল। দেখা গেল কৃষ্ণা একটা চিঠি লিখচে, 'যদি কখনো সহধর্মিনীর মর্যাদা দিতে পার, ডেকো, আসব। সেই শুভ-মুহূর্তের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করে থাকব। কৃষ্ণা...'

চিঠিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে—ঘড়ির দিকে তাকালো—দশটা বাজতে সাত মিনিট। স্বামীর অয়েল পেন্টিং ছিল—তার দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলল, 'বড় আশা করে তোমার কাছে এসেছিলাম, বড় আঘাত পেয়ে যাচ্ছি। তবু আশা আমি ছাড়ব না। নতুন করে, মনের মতো করে, তোমায় পাবার তপস্যাই আমি করব।' কৃষ্ণা স্বামীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করল।

একটা মটর এসে বাড়ির সামনে থামল।

আসচে—সে আসচে। সিঁড়িতে পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসচে। সে আসচে।
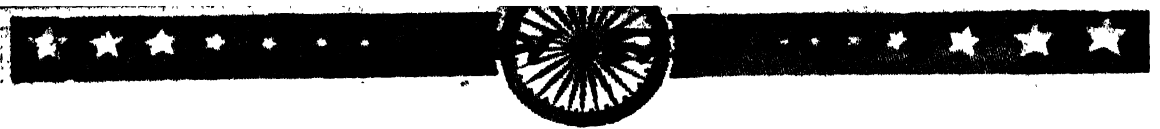
স্টকেশটা হাতে নিয়ে কৃষ্ণা দরজার কাছে এগিয়ে গেল।
দরজায় করাঘাত।
'এসো।'
দরজা খুলে গেল।
কে এ! স্বামী! সূর্য!
'তুমি?—কৃষ্ণার হাত থেকে স্টকেশটা পড়ে গেল।
'হাঁ আমি।'
'তুমি ফিরে এলে!'
'না এসে উপায় কি! ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে এই বেনামী চিঠি পেলাম! কুলে কালী দিয়ে সেই রাসক্যালটার সংগে রাত ১০টায় পালাচ্ছ! ব্যাভিচারিণী!
'মারো—আমায় তুমি মেরে ফেল।'
'মারবো। তোমায় নয়। কাকে মারবো সে আমি জানি।—' বলেই ড্রয়ার থেকে রিভলভার বের করে।
ঢং ঢং করে দশটা বাজে।
একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো।
'ঐ সে এল।' বলেই সূর্য রিভলভার হাতে ছুটে বের হয়ে গেল।
আতঙ্কে আশঙ্কায় কৃষ্ণা দুই কান ঢাকল। হয় তো এখনি শুনবে গুলির আওয়াজ—আর্তনাদ।
গুড়ুম! গুড়ুম! হঁ্যা হয়ে গেল। কৃষ্ণা আর্তনাদ করে উঠল।
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠে আসচে। খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের মতো ঢুকল, সূর্য নয়, রাহুল। রাহুলের হাতে সেই রিভলভার।
'আমাকে মারতে গিয়েছিল, কিন্তু জানেনা আমি কে! পিস্তল চোখের পলকে কেড়ে নিয়ে ওকেই আমি সাবাড় করেছি। এস কৃষ্ণা, এস'
'গুলি করে মেরেছ! ওঁকে।' কৃষ্ণা আর্ত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করে!
'হঁ্যা ওঁকে। পথের কাঁটা দূর করেছি। কিন্তু আর দেরি নয়। পথে পুলিশ রয়েছে। এখনি পালাতে হবে, এখনি।' 'দাঁড়াও। আমি··' কৃষ্ণা ঘরের বাইরে এসে চট্ করে ঘরের দুয়ারে চাবি মেরে দেয়।

'সে কি! একি করলে কৃষ্ণা!' ঘরের ভেতর থেকে পাগলের মতো রাহুল চীৎকার করে বলে।
'তুমি আমার স্বামীকে—উ:' কৃষ্ণা সিড়ি দিয়ে নামছে—কয়েক ধাপ নেমেই দেখে পুলিশ উঠে আসচে।
'গুলির শব্দ পেলাম! ব্যাপার কি?' পুলিশ জিজ্ঞাসা করে।
'স্বামীকে—আমার স্বামীকে গুলি করে মেরেছে!'
তাদের কাছে কেঁদে বলে কৃষ্ণা। 'কে? কে মেরেছে?'
পুলিশ জিজ্ঞাসা করে।
'রাহুল। তাকে আমি আমার ঘরে আটকে রেখেছি।'
'Quck.' পুলিশ কৃষ্ণাকে নিয়ে ওপরে ওঠে।
'এই ঘরে। এই নিন চাবী।' কৃষ্ণা পুলিশকে চাবী দেয়।
'আমরা পুলিশ। ঘরে ঢুকচি। রিভলভার বেড় কর'।
পুলিশ রাহুলকে শুনিয়ে বলে।
দুয়ার খোলে।
কিন্তু একি!
এযে সূর্য চৌধুরী!
'আপনার স্ত্রী বলছেন আপনাকে গুলি করে মারা হয়েছে!'—পুলিশ অবাক হয়ে সূর্যকেই বলে।
'বলচি। শুনুন।' সূর্য পুলিশ নায়ককে জানান্তিকে বলে 'মাঝে মাঝে ওর মাথা খাঁরাপ হয়। আজ আবার হয়েছে। নতুন প্লে দেখতে আসবেন'।
'তাই বলুন। দেখুন তো! আচ্ছা নমস্কার।'
পুলিশ চলে যায়।
ধীরে ধীরে সূর্য কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে যায়।
'কৃষ্ণা!'
'একি খেলা আমার সংগে খেললে!'
'না খেললে তোমায় চিনতাম না, বুঝতাম না, মানুষ হতাম না। সত্যিই এ আমার পুনর্জন্ম। চল।'
'কোথায়?'
সেখানে যাচ্ছিলে সেখানে—বৃহত্তর জীবনে।'
'স্বামী!' কৃষ্ণা স্বামীর বুকে মুখ লুকালো।
দুজনে নেমে গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। দেখাগেল গাড়ীতে বসে আছে প্রিয়বন্ধু!
কৃষ্ণা॥ আপনি! এখানে!
সূর্য॥ উনিই তো এই নাট্যের নাট্যকার।
প্রিয়বন্ধু॥ আর নয়, নাটক শেষ, এখন কাজ। আসুন।

পৃথক সিনেমা-সাহিত্যের সৃষ্টির কাজে তাঁদের সাধুকর্মব্যস্ততা ততোটা দেখা যায় না।

তবু সংবাদপত্রকে এতোখানি গুরুত্ব, এতোখানি সম্মান-আসন জনসাধারণ ও চিত্রশিল্প দেয় কেন? তার উত্তর অতি সুস্পষ্ট। গোটাকয়েক পত্র পত্রিকা ব্যাঙের ছাতার মতো জন্মলাভ করে অযোগ্য ও লজ্জাকর ভাবে চোরের মতো Black-Mrketer-এর মতো Exploiter-এর মতো, দিন কতক বেচে থেকে আবার মিলিয়ে যাওয়া মানেই, এ নয় যে, সংবাদপত্রের সিনেমা শিল্পগত কর্মক্ষেত্র ও সার্থকতার সম্ভাবনার মৃত্যুলাভ ঘট্‌ল।

সংবাদপত্রের সিনেমা শিল্পবিষয়ে বিরাট কল্যাণ সাধন-ক্ষমতা ও দর্শকগণে প্রভূত প্রভাবের কথা আজকের দিনে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে সবাইকার দ্বারাই, এমন কি সিনেমা ব্যবসায়ীদের দ্বারাও। প্রত্যক্ষে নাহোক, পরোক্ষে! এবং কৃতজ্ঞ যাঁরা (অবশ্য এই কৃতজ্ঞতা বস্তুটি আমাদের সিনেমা শিল্পের অদ্ভুত জীবগুলির ভিতর বিশেষ অভাব) সেই স্বল্প সংখ্যক ভদ্রব্যক্তি এ' শিল্পের তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও সম্মান দিয়ে আসছেন সংবাদ-পত্রকে। দুঃখের বিষয়, আমাদের সকল সংবাদ পত্র ঠিক উচ্চ ও মহৎ ব্রতের উজ্বল আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে পারেননা। কিন্তু তাতে করে তো গোটা সংবাদপত্র ও সাংবাদিক পংক্তিটাই অপদার্থ, হেয় প্রতিপন্ন হয়না। বরঞ্চ সেই তুলনামূলক দৃষ্টির সন্ধানী আলোকে সত্যিকারের যোগ্য সংবাদপত্র ও সংবাদপত্র-সেবীদের সার্থকতা ও দানের মহিমা অধিকতর দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। তাঁরাই সৃষ্টি করেছে একটা স্বতন্ত্র সংবাদপত্রীয় আদর্শের গৌরব-জগৎ এই বিষয়ে। তাঁরা খুঁটিনাটি, ছোট বড়ো সব রকম বিষয়েই আমাদের সিনেমা শিল্পকে বন্ধুর হাত বাড়িয়ে সহায়তা করেছে, পথ দেখিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে, অপ্রিয় সত্য কথা বলেও ভুল দেখিয়েছে ও এম্‌নি করে ভুলের সংশোধন ঘটিয়েছে। আমাদের সংবাদপত্র জগতের নিষ্ঠাবান কর্মীদের এই মূল্যবান প্রেরণা ও সংযোগিতা না পেলে যতোটুকু উৎসাহ, যতোটুকু সত্যাদর্শ, যতোটুকু উন্নতি এই শিল্প আজ লাভ করেছে, তার অর্ধেকও করতোনা। বাধাহীন, নির্বিরোধ-মূর্খতায় সে আজো অতলেই তলিয়ে থাকৃতো।

আত্মদর্শন ও আত্মপর্যালোচনা নিজের পক্ষে শুভ হলেও তার প্রকাশ্য মুক্তিদানে বাধা আছে। সে বাধা হলো শালীনতার, ভদ্রতার। ব্যক্তিগতভাবে এ'কথা বল্‌ছিনে, আমাদের এই সংবাদ পত্র সেবাব্রতীদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে। বিশ্বাস করুণ, তবু এ' প্রশ্ন যখন উঠেছে, এ' কথা না বলে উপায় নেই যে, বহু প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র-সংবাদপত্র ও সাংবাদিক আজ নির্মল প্রেরণায়, নির্দোষ কর্মানুরাগে ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাদের দেশীয় চিত্রশিল্পের পক্ষে অনেকখানি প্রকৃত অভিবাবকের, প্রকৃত বন্ধুর, প্রকৃত প্রেরণাদাতার কঠিন কর্তব্য সাধন করেছে। তার বিনিময়ে তাঁরা যে প্রতিদান পেয়েছে, তা হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে চরম অকৃতজ্ঞতার, অভদ্রতার, গুণ্ডাজনোচিত মনোভাবের ও আচরণের। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকেরা যেন গলার কাঁটা! বিষয়টি যেমন গুরুত্ব, তেমনি বেদনাদায়ক। তাই এর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রবেশ করা অবাঞ্ছিত। কিন্তু এ' আমার মনের বিশ্বাস যে, যতোটুকু প্রেরণা ও মংগল আমাদের দেশের সিনেমামূলক সংবাদপত্র ও পত্রীদের কাছে আমাদের সিনেমা শিল্প পেয়েছে, তারই ফলে আজ্‌কের দিনের নীতিন বসু, শান্তারাম, বিমল রায়, সৌরেন সেন, জ্যোতির্ময় রায়দের মতো কর্মীদের, বীরেন্দ্র-নাথ সরকারের মতো প্রযোজকের সৃষ্টি ও অগ্রগতি। নইলে আগাছা উৎপাটিত হতো না। এই সব ফুলে ও ফুলে আমাদের এই তরুণ শিল্পের ভবিষ্যৎ মধুময় হয়ে উঠ্‌তো।

অবশ্য এ' আলোচনার মধ্যে আমি আদৌ আনছিনা সেই সব সংবাদপত্রসেবীদের কথা, যাঁরা নিজেদের গণ্ডী থেকে সিনেমা-শিল্পের কর্মগণ্ডীতেই পা বাড়িয়ে' নতুন দীক্ষা নিয়েছেন।

সে আলোচনা কোন একদিন করার বাসনা রইল।

সরোজ পিকচার্সের
ভাই-বোন
রচনা ও পরিচালনা-
ইন্দু মাধব ভট্টাচার্য্য
ভূমিকায়-
অহীন্দ্র·ফণীরায়·বিমান
শরৎ·প্রমিলা প্রভৃতি
ন্যাশনাল ষ্টুডিওর
সরাইকে বাহার
রচনা ও পরিচালনা-কিষণচাঁদ
ভূমিকায়-সাবিতা·মহেন্দ্রনাথ
রাধিকা·কুক্কু প্রভৃতি
নবযুগ-এর
সিকায়েৎ
শ্রেষ্ঠাংশে-
গীতা নিজামী
ধাত্রীদেবতা
দুর্গা সেন
ভূমিকায়-
ছায়া·অঞ্জলি·চন্দ্রা·রাজলক্ষ্মী·অনুপ
শম্ভু মিত্র·মাষ্টার শম্ভু·বেচু·নৃপতি
প্রভৃতি
নবযুগ-এর
পারো
শ্রেষ্ঠাংশে-
স্নেহপ্রভা
গান্ধীজীর শান্তি-তপস্যার
বাস্তব ছবি
শান্তি সাধনায়
গান্ধীজী
একমাত্র পরিবেশক
ইষ্টার্ন ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ
৩২ এ. ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা
নবযুগ-এর
রুম নং ৯
গীতা নিজামী·শ্যাম·সরোজ
বোরকার·কে এন সিং প্রভৃতি
বারে বারে দেখবার মত কয়েকখানি ছবি
GORA
জনক পিকচার্সের
সন্তান
ভাবনানীর
বিশবী সদী
তলোয়ারের
মন-চলি

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল—সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম দেখা দেন। ধীরে ধীরে তাঁকে আমরা পাই চিত্রজগতে। তাঁকে পাই নির্বাক যুগে অভিনেতা রূপে—সবাক যুগে সহকারী পরিচালক ও চিত্রনাট্য-রচয়িতা রূপে। তাঁকে পাই একজন সুদক্ষ প্রচার সচিব রূপে। তাঁর প্রচার কাযের ভিতর তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভংগী ও শিল্পগত উৎকর্ষ, ব্যবসায়গত চাতুর্য যে-কোন প্রচার সচিবের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু! রূপ-মঞ্চের সংগে তাঁর যোগ রূপমঞ্চের প্রথম জন্ম থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক-শিক্ষার প্রাঙ্গণ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মা চিত্রজগতে 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদককে প্রতিষ্ঠিত হবার মূলে যাঁরা রয়েছেন, শ্রীযুক্ত পাল তাঁদের অন্যতম।

আমার এই রচনার সামান্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রচনাটি ঠিক ধারাবাহিক কোন কাহিনী নয়, প্রবন্ধ বলাও যায়না, জীবনীর মত বলা যেতে পারে। এমন একটি জীবনী যা যখন তখন খুঁজে পাওয়া যায় না—তবু জগতে এদের সংখ্যা নিতান্ত কম নেই। পরিপূর্ণভাবে না থাকলেও অনেক মানুষের অতৃপ্ত passion এর ছায়ায় এমনি একটি চরিত্রের ছায়া দেখতে পেয়েছি—যাদের শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে ক্ষুরধার, বিদ্যা আছে আত্মসীমাবদ্ধ, বিবেক মলিনতার স্পর্শ পায়নি। জীবনে এরা স্বপ্ন দেখেছে অনেক কিন্তু বাস্তবতার স্পর্শে এরা আঘাত পেয়েছে অথবা যদি বলি, এরাই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়নি তাহলে হয়তো ভুল করব না। এদের মনে হবে নিষ্ঠুর, এরা বুঝিবা শুধুই বোহেমিয়ান মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে, সর্ববিষয়ে এদের অনন্যসাধারণতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু এরা অগ্রসর হয়েছে ঝড়ের মত, টিকে থাকতে পারেনি কোথাও—এরা ভেসে গেছে, হারিয়ে গেছে, ভুলে গেছে বার বার নিজেকেই। এরা সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। কে এরা? অথচ মানুষের মধ্যে যে passion রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীকে করে মহাত্মা, সুভাষ-চন্দ্রকে করে নেতাজী, যে passion সৃষ্টি করে সাহিত্যিক, শিল্পী, বড় খেলোয়াড়, বড় ব্যবসায়ী, যে passion সাজাহানকে দিয়ে তাজমহল রচনা করিয়েছিল, ডিউক অব উইণ্ডসরকে করিয়েছিল সসাগরা রাজত্বের সিংহাসন ত্যাগ, সেই passion-এর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে কেন এরা জীবনের কোন আদর্শকে আঁকড়ে ধরল না—কেন এই অক্ষমতা, কিসের অস্থিরতায় আর অভাবে এরা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করে তুলতে পারলনা, কে বা কি এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী? শিক্ষার দোষ! যুগের দোষ! সমাজের চক্রান্ত অর্থের অপ্রাচুর্য! সাহসের অভাব! সর্বনাশের রোমাঞ্চকর যাত্রাপথে চলার দুর্নিবার আগ্রহ! এঁদের passion কি খাঁটি নয়!

আমি পারিনি এদের সমস্যার সমাধান করতে। এদের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি আছে, যাঁরা এদের চেনেন ও বোঝেন, তাঁরা হয়তো বলতে পারেন, কোথায় এদের পথ হারাবার মোহ রচিত হয়েছে।

আমি নিজে এদের ব্যর্থতার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি শুধু—সাহায্য করতে পারিনি কিছুই। আমি একটি বিচিত্র রহস্যময় চরিত্র দেখেছি নিখিল রায়ের মধ্যে। আমি দেখেছি লোকে তাকে পাগল বলে, Idiot বলে, বলে খেয়ালী, তার নামে অপবাদ শুনেছি অনেক—শুনেছি সে মাতাল, জুয়াড়ী, শুনেছি সে নারীলোভী নিষ্ঠুর। আমি দেখেছি তার অনেক যোগ্যতা, অনেক কৃতিত্ব, প্রচুর বিফলতা, সব দেখে ও শুনে মনে হয়েছে যে, মানুষের অসাধারণত্ব সহজে কেউ বিশ্বাস করেনা। অবিশ্বাসকে জয়

করতে যে অপরিসীম ধৈর্যের প্রয়োজন তার থেকে বঞ্চিত কোন ব্যক্তিত্ব তার সকল সম্ভাবনা ভ্রষ্ট হয়ে এমনি ভাবেই নিজের কাছ থেকে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সেই মর্মান্তিক ট্রাজেডির কথাই এখানে আমি বলব। যদি কোথাও কোন তীব্র নগ্নতা চোখে পড়ে, তাহলে পাঠকসমাজ আমাকে যেন মার্জনা করেন। কারণ, এ কাহিনীকে বিচার করতে হ'বে এমন একটি দৃষ্টি নিয়ে, যে দৃষ্টি সব ভালকে নিশ্চয় ভাল বলে শুধু চোখের চাওয়ায় বিশ্বাস করেনা।

মধ্যরাত্রি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নিখিল রায়। হাওয়ায় জেগেছে ব্যাকুলতা—এলোমেলো দুরন্ত হাওয়া। আকাশের এক পাশ থেকে এক রাশ কালো মেঘ ঝুঁকে এগিয়ে আসছে। বৃষ্টি হবে কি? ঝড় উঠবে নিশ্চয়। জ্যোৎস্না রাত ইতি মধ্যেই মিলিয়ে গেছে মেঘের মাঝখানে। ঝড় অনেকক্ষণ উঠেছে নিখিল রায়ের মনে। মনের মধ্যে ঝুঁকে পড়েছে কত ব্যর্থতার কথা—গভীর উদ্দামতা, আর অকস্মাৎ হারিয়ে যাওয়া জীবন সূত্রের প্রান্তগুলি খুঁজছে মনে মনে নিখিল রায়।

ঘরের ভেতর নিদ্রা শিথিল সুপ্রভার মুখে আনন্দের অবসন্নতা। মুখে তার চাপা একটি হাসির ক্ষীণ রেখা—অবিশ্বাসের হাসি। হয়তো নীলাভ আলোর মায়ায় ওই হাসিটুকু রচিত হয়েছে মিথ্যা ছায়ার ছন্দে। এমনি আর একটি রাত্রির কথা মনে পড়ে নিখিল রায়ের। তফাৎ শুধু এই, সে মেয়েটি জেগেছিল—সে মেয়েটি এসেছিল লুকিয়ে এক ফ্ল্যাট থেকে আর এক ফ্ল্যাটে—এসেছিল নিজের সম্বন্ধে বোঝাপড়া করে নিতে। মীরা তাকে চেনেনি অথবা চিনেও মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী নিজের সম্বন্ধেই একটু বেশী করে সচেতন হয়ে উঠেছিল সেদিন। মীরাকে দোষ দিয়ে লাভ কি!

বাতাসের শ্বাসশব্দ ছাপিয়ে একটি এরোপ্লেন মেঘের মধ্য দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে উড়ে আসছে। ওপরের আকাশও বোধ করি তেমন শান্ত নেই।

এরোপ্লেন দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে—তার পিছনের সবুজ আলোটি জোনাকার মত জ্বলছে আর নিবছে মেঘের মাঝখানে। কে এই এরোপ্লেনের পাইলট? হয়তো বা বন্ধু ফ্লাইট্ লেফ্‌টানান্ট সুখেন নন্দী উড়ে চলছে দিল্লী কি আগ্রা অভিমুখে।

সুখেন নন্দী, তোমার তারুণ্যকে অস্বীকার করা যায় না, তবু তোমরা যুদ্ধের যুগের ছেলে—বিলাতি যুদ্ধের উপকরণ মাত্র। তোমাদের জীবনের অনিশ্চয়তা তোমাদের হৃদ্‌-স্পন্দনকে দ্রুত করে তুলেছে। তোমাদের ভেতর Speed আছে, কাব্য নেই—পৃথিবীর যা কিছু অনিশ্চিত তারই পিছনে তোমরা ছুটে চলেছ। তোমাদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশক্তি দেখিনা, দেখিনা একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বপ্নসৃষ্টি। দেখি শুধু, বিংশ শতাব্দীর হুজুগে-মাতা উত্তেজনা। গজল গানের সংগে হুস্কির পাত্রে যে রোমান্স ঘনিয়ে ওঠে, তা তোমাকে ক্ষণিকের জন্যে ভাললাগা নীরবতায় থামিয়ে দেয় না; সব সময়েই তুমি কত বেশী কথা বল।

সুখেন নন্দী, তোমাকে দেখেছি রেসের মাঠে, দেখেছি তাসের আড্ডায়—সব সময়েই তুমি ক্ষমতার চেয়ে বেশী Invest করে চলেছ। তোমাকে দেখলাম পেগির সংগে নাচতে, জয়ার সংগে হাসতে, শেষে পণ্যা-নারী যূথিকার শয্যায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে। এক ভগ্নপ্রায় রাষ্ট্রের মর্যাদা জোড়া লাগাবার কাজে তোমরা নিযুক্ত ছিলে, সেইজন্যে তোমাদের এই পরিণাম। তোমাদের তারুণ্য নির্বাপিত হ'তে দেরী হবে না—পাখা ভেংগে যাওয়া এরোপ্লেনের মত কবে যে তোমরা অকস্মাৎ খসে পড়বে তাই ভাবি—খসে পড়বে তাদেরই মাঝখানে, যারা অনাদিকালের স্থবির সমাজ-গোষ্ঠী। তারুণ্যকে তোমরা সাম্প্রতিক অভ্যাস ও দৈহিক বয়সের মাঝখানে বেঁধে রেখেছ। তোমার মধ্যে যে অপরিসীম সম্ভাবনা ছিল তার অপমৃত্যুর জন্যে আপশোষ করি। তবু তোমাকে খুব ভাল লাগে আমার—যেমন ভাল লাগে মোটরে চড়ে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াতে।

* * * *

পিস্ কমিটির মিছিল বেরিয়েছে। নিখিল রায়ের হাতে জাতীয় পতাকা। নতুন রাষ্ট্র-গঠনের উদ্দীপনা বুঝি নিখিলকে মাতিয়ে তুলল। জীবনের সব কয়েকটি খোলা পথ নিয়ে সে খোলাখুলি ভাবে চিন্তা করেছে। সিনেমার

পরিচালক হওয়ার প্রয়াস করে মিছামিছি কিছুদিন সে সময় নষ্ট করল। যে লোকটি ছবির জন্যে টাকা খরচ করবে বলেছিল, তার সংগে তার মতের মিল হয়নি—দেশ সম্বন্ধে কতক গুলি ফাঁকা কথায় ভরা কাহিনীর ছবি সে তুলতে চায়নি। দেশে সত্যই অনেক সমস্যা—যে সমস্যা সাধারণের—যে সমস্যা জনতার বিক্ষোভ ও বেদনার ; যে সমস্যা মানুষের সারাদিনের সংগ্রামের মাঝখানে ভেবে দেখবার সময় পাওয়া যায়না। অথচ সেই সমস্যার সমাধানেই সংগ্রামের শেষ। সে শুধু দেশাত্মবোধ দিয়ে মীমাংসা করা যায় না—অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাবই সব চেয়ে বড় অভাব নয়, অভাব হচ্ছে সত্যকারের পরিশ্রম করবার আগ্রহের—প্রত্যেককে প্রত্যেকের বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক কাজে লাগতে হবে। সকলে হবে সচল, সকলেরই থাকবে দায়িত্ব—পেশা নেশা হয়ে দাঁড়াবে। এমনি বৃহত্তর গণজাগরণের ইংগিত দিয়ে তৈরী হোক ছবি, সৃষ্টি হোক সাহিত্য ও শিল্প। কিন্তু ক্যাপিটালিষ্টের মনে এই ধরণের কিছু স্থান পায় না—তাঁরা বলেন, আজকের দিনের হুজুক নিয়ে ছবি উঠুক অথবা মৃতযুগের ধ্বংসাবশিষ্ট সঞ্চয়ের মধ্যে যে কাহিনী আজও লোকের মনে পুরাতনের প্রতি অকারণ শ্রদ্ধার স্থিতিশীলতা প্রমাণ করে তারই ছবি তোলা হোক। অবিশ্বাস্য এই নূতন দিনের নূতন দূরদৃষ্টি—এর জন্যে পয়সার অপব্যয় করে কি হবে।

সত্যই সিনেমার জন্য নিখিলের অনেকখানি উদ্যম অপব্যয় হয়ে গেছে। সে বিশ্বাস করেনা, সিনেমা মানে শুধু টেকনিক নয়—চলতি জিনিষকে নূতন করে চালাবার টেকনিক; তার মধ্যে কল্পনা ও পরিকল্পনার স্থান থাকবেনা। কিন্তু তার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি যায় আসে যখন তাকেই লোকে বিশ্বাস করবেনা। কিন্তু সেখানে প্রোগ্রেসিভ্ মন নিয়ে কেউ টিকে থাকতে পারেন নি। পেরেছেন, দু'একজন যাঁদের মন দু'দিক সামলাবার চেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

নিখিল যদি এর চেয়ে দেশ-সেবকের কাজে লেগে থাকত তাহলে আজ হয়তো তাকে এমনি করে ভেসে বেড়াতে হ'তোনা কখন ষ্টুডিওর দরজায়—কখন রেসের মাঠে—কখন এ-অফিসে সে অফিসে—কখন লেখা নিয়ে সম্পাদকের কাছে—কখন মাথামুণ্ডু যে কোন একটা কারবার করবার ফন্দী নিয়ে। টাকার দরকার। বেঁচে থাকতে হ'লে, অত্যন্ত দরকার যে টাকার।

নির্দিষ্ট কোন ঘর বাঁধতে পারেনি নিখিল। ঘর বাঁধতে, ঘর রাখতে টাকা লাগে। মীরা বলেছিল চিরকাল loafer-এর মত ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন নিয়ে যারা মত্ত, তাদের নিয়ে ঘর বাঁধার চেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করা ভাল। মীরা নাকি তাকে ভালবাসত। নিখিল বলেছিল, নারী পুরুষের মধ্যে ভালবাসা আবহমান কাল ধরে ঘটে আসছে - জীবধর্মের বিরুদ্ধতা করার ক্ষমতা নেই বলে আমরা ভালবাসি কিন্তু শুধু সেই জন্যেই যাকে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার কথা ভাবা নির্বুদ্ধিতা কার মধ্যে কিসের অভাব হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে পরস্পরের মধ্যে অশান্তি ও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে ওঠে। বলা যায়না।

মীরা ক্ষেপে উঠে বললে, তুমি কি বলতে চাও আমি তোমার যোগ্য নই।

নিখিল হেসে জবাব দিয়েছিল, অকারণ রাগ করছ কেন, তুমি আমাকে বুঝতে পারনি। দর্জির দোকানে গায়ের মাপে জামা তৈরী করানো যায় কিন্তু মনের মাপে আজীবন সংগী জোটে এমন দোকান ভগবানের রাজ্যে নেই। মনের প্রসারতা ও সঙ্কীর্ণতা আকাঙ্খার ও রহস্যের জটিলতা এমন মুহুর্মুহু নতুন রূপ ধারণ করে যার মানানসই আর একটি মন খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। মীরা আরও রেগে গিয়ে বললে, যাদের আর কিছু সম্বল নেই, তাদের কথাই শুধু সম্বল।

নিখিল নির্লিপ্তের মত এবার বলল, বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাস করার মধ্যে যে কম্‌প্লেক্স আছে তা সান্ত্বনাদায়ক না হলেও সহজ স্বার্থবোধ তাকে সর্বদা জাগিয়ে রাখে। সাধারণের মাঝখানে হারিয়ে যেতে না পারলে তার সম্বন্ধে তোমাদের মনে সন্দেহ জাগে। জীবন
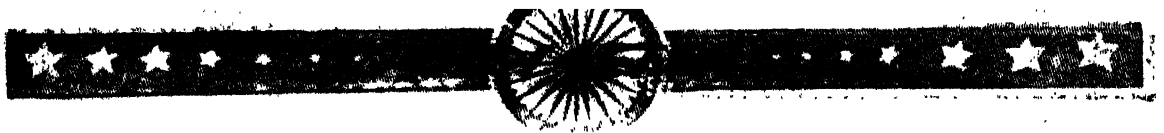
ধারণে সর্ববিষয়ে প্রাচুর্য প্রয়োজন হয়, শুধু মনের প্রাচুর্য ছাড়া। তোমার আকাঙ্খা অলঙ্কার, শাড়ী, বাড়ী আর গাড়ীতে গিয়ে থেমে গেছে কিন্তু আমার প্যাশন্ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে অনেক পথ ঘুরিয়ে—অজানা নিকটে আসছে। কোথায় গিয়ে যে আমি নিজেকে সত্য করে প্রতিষ্ঠা করতে পারব তা জানিনা। তবু পারব একদিন নিশ্চয়ই।

মীরা থমকে গেল। নিখিলের স্বরে যে দৃঢ়তা ফুটে উঠল তার প্রতিবাদ করা যায় না। কিন্তু আর পনেরোদিন পরে তার বিয়ে স্থির হয়ে যাবে। আজ রাত্রে সে লুকিয়ে এসেছিল নিখিলের কাছে, নিখিল যেন তাকে আজীবনের জন্য গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করে এই কথা জানাতে। এমনি ধরণের মানুষগুলিকে ভাল না বেসে পারা যায় না, তবু ছেড়ে চলে যেতে হয়। নিখিল বলল, কি ভাবছ বলব, ভাবছ পৃথিবীতে এমন অনেকগুলি লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের একটু জানলে আরও জানতে ইচ্ছে করে। এদের

সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে ইচ্ছে করে কিন্তু বহুদিন ধরে যখন এরা কোন কাজে লাগেনা তখন মনে হয় এদের Intelligence হ'ল ধাপ্পাবাজী, Intellect অসার। সংসার, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র দেশকে এদের দেবার কিছু নেই। এরা নিজেদের মনবিলাসের জন্য যেটুকু Intellect নিয়ে জন্মায়, তাই নিয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। কখন কখন কোন ঘাটে গিয়ে লাগে বটে কিন্তু কোন তীরেই এদের স্থান হয়না।

মীরার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে। নিখিল তার জন্যে দুঃখ করেনা। দুঃখ করতে গেলে আরও অনেকের কথা মনে পড়ে, বুলু, অনুপমা, ফিরিঙ্গি মেয়ে জেনিকে, পতিতালয়ের মেনকার নামটার জন্যে একটু আলাদা জায়গা করে দেওয়া ভাল; ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কার বাঁচিয়ে। মার্জিত সমাজের অন্য প্রণয়িনীদের নাক-তোলার আড়ালে। এই যে সুপ্রভা আজ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেছে—এ-ও একদিন তার সংস্পর্শের বাইরে চলে যাবে। এই সুপ্রভাকে একদিন সে নিতান্ত অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিল। তারপর সে সুপ্রভাকে নতুন করে গড়েছে। এই সুপ্রভাকে নিয়ে 'ককটেল'-পার্টিতে যাওয়া যায়, যাওয়া যায় যে কোন সমাজের অন্তঃপুরে —হোটেলে কি সিনেমায় বালীগঞ্জী-সোসাইটিতে বা বামুনবাড়ীর নিমন্ত্রণে। মিষ্টি চেহারায়, মিষ্টি ব্যবহারে, কথার গাঁথুনিতে, সভ্যতার সকল রকম কৃত্রিম ও অকৃত্রিম চাকচিক্যে সে অনেক মেয়েকে লজ্জা দিতে পারে। সুপ্রভা নিখিলের হাতে গড়া নতুন একটি মন ও মূর্তি।

নিখিল পাঁচ পাতা কি দশ পাতা গল্পের নায়ক নয়, তাকে এত সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে বোঝা বা ধরা যায় না। এ রচনা শুধু তার জীবন-কাহিনীর অবতরণিকা মাত্র; তার চরিত্রের একটু আভাস, তার প্যাশনে'র সামান্য স্পর্শ—তার মনের অপরিমেয় রহস্যের কুয়াসা ঢাকা অস্পষ্ট দৃশ্য।

বর্তমান যুগে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বংসের কাজে লাগাতে পারে এমন অনেক অস্ত্র। পৃথিবী চলে গেছে বৈজ্ঞানিকদের হাতে। মানুষের যে বুদ্ধি, যে সুতীব্র 'প্যাশন' জীবনকে একটা নতুন রূপ দিতে পারত তা অবজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাত হয়ে চলেছে। তাদেরই কথা বলবার জন্যে 'এলোমেলো'-র নায়ক নিখিল প্রতিবারেই 'রূপ-মঞ্চে' আত্মপ্রকাশ করবে।

আসল ও নকল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

●

কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনার যাদুস্পর্শে সকলের অন্তর জয় করে রেখেছেন—ছায়াচিত্র-রচয়িতা শৈলজানন্দ ছবির মধ্য দিয়ে নূতন করে অর্জন করেছেন খ্যাতি ও প্রীতি। সাহিত্যে তাঁর দান যেমন নূতনত্বের সন্ধান নিয়ে এসেছে—ছবিতে তাঁর দানও তেমনি সজীবতায় ও হৃদয় গভীরতায় দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। সামান্য মানুষের হৃদয়ে গভীরতাকে তিনি চিনিয়ে দিতে পেরেছেন। 'মানুষ' আর 'দেবতা'য় ব্যবধান অনেক, 'ময়ূর' আর 'দাঁড়কাকের' মধ্যে পার্থক্য অনেক হলেও, দুই-ই পাখী। আমরা মনে করি 'অভিমান' আর 'অহঙ্কারে'ও এমনি পার্থক্য আছে।

●

'কথামালার' নাম শোনেনি—এমন লোক বোধ হয় আমাদের দেশে নেই। 'কথামালার' গল্পগুলি আমার এক বন্ধু আবার নতুন করে লিখছেন। তিনি বলছেন—'কথামালা'র যুগ আর নেই, কাজেই সে-সব গল্প এখন পুরোনো হয়ে গেছে, তাদের আবার নতুন করে' লেখা উচিত।

'ময়ূরপুচ্ছ ও দাঁড়কাকে'র গল্প বোধহয় আপনারা সকলেই জানেন। গল্পে আছে: পুচ্ছে ময়ূরের পালক গুঁজে কয়েকটি দাঁড়কাক ময়ূর সেজে ময়ূরের দলে গিয়ে ভিড়েছিল। কিন্তু দাঁড়কাকের দুর্ভাগ্য, তাদের সে ভণ্ডামি ময়ূরেরা ধরে ফেললে। ধরে' ফেলে দল থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলে। এই তো গেল কথামালার গল্প।

কিন্তু 'নব কথামালা'র রচয়িতা আমার বন্ধু লিখেছেন, যুগধর্মে ময়ূর জাতি আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আপনারা মাঝে মাঝে যে সব ময়ূর দেখতে পান, তারা সত্যিকারের ময়ূর নয়, তারা সব দাঁড়কাক; লেজে ময়ূরের পালক গুঁজে ময়ূর সেজে ঘুরে বেড়ায়।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কোথায় কোন্ দূর দেশ থেকে সত্যিকার একটি ময়ূর আমাদের দেশে উড়ে এলো। দেখলে অনেক ময়ূর রয়েছে এখানে। কিন্তু তারা যে নকল ময়ূর—তা সে প্রথমে টের পেলে না, নিজেদের স্বজাতি ভেবে দাঁড়কাকদের দলে গিয়ে ভিড়লো।

ময়ূর-সাজা দাঁড়কাকের দল তার চারিদিকে এসে জড়ো হলো। জিজ্ঞাসা করলে: কোথেকে আসছো তুমি?'

ময়ূর বললে: 'অনেক দূর দেশ থেকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ঘন অরণ্যে ঢাকা এক পর্বতের প্রান্তদেশে আমাদের বাস।'

দাঁড়কাকেরা তৎক্ষণাৎ তার লেজ ধরে' টানাটানি সুরু করে' দিলে।

এরা কেন এমন করছে, ময়ূর কিছুই বুঝতে পারলে না। নতুন দেশে এসে নতুন স্বজাতিদের এই অদ্ভুত অত্যাচার কিছুক্ষণ ধরে' নীরবে সহ্য করলে।

অত্যাচারের একটা সীমা আছে। এক-একজন আসে আর তার লেজ ধরে' টানে। যন্ত্রণা যখন অসহ্য হ'য়ে উঠলো, তখন সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না, বললে: 'আমাকে নিয়ে তোমরা এরকম করছো কেন? আমি যে গেলাম!'

দাঁড়কাকেরা বললে: 'এ পালক কি তোমার নিজের?'

শ্রীবাণী পিকচার্সে'র 'যে নদী মরু পথে' চিত্রে সীতা দেবী
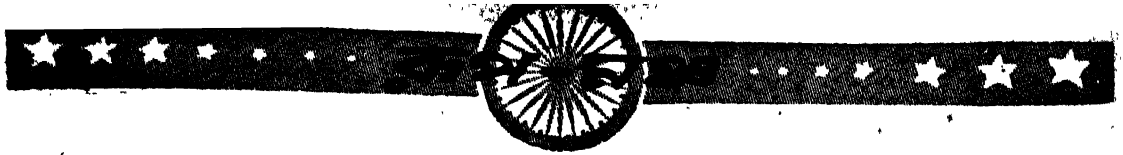
ময়ূর এই অদ্ভুত কথা শুনে তাদের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে: 'হ্যাঁ। আমার দেহের পালক আমার নিজের ছাড়া আর কার হবে? ভগবান আমাকে এমনি করেই সৃষ্টি করেছেন।' দাঁড়কাকেরা বললে: 'তা'হলে তুমি ভগবানের কাছেই যাও। আমাদের দলে তোমার স্থান নেই।' 'কেন?' ময়ূর বললে: 'তোমরাও তো ময়ূর।' দাঁড়কাকেরা বললে: 'না। আমরা ময়ূরের মত দেখতে বটে, কিন্তু আমরা ময়ূর নই। আমরা দাঁড়কাক।' দাঁড়কাকের দলে ময়ূরের আর জায়গা হ'লো না। মনের দুঃখে আসল ময়ূর গেল বনবাসে, আর দলে ভারি বলে' নকল ময়ূরেরাই আমাদের দেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করলে। অপরাধ নেবেন না। আজ আমি আপনাদেরও জিজ্ঞাসা করছি: আপনারা আসল না নকল? যদি নকল হ'ন, কোনও ভয় নেই। দল বেশ ভারি আছে, সংখ্যায় প্রচুর। সুতরাং নির্ভয়ে বিচার করুন। আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ আসল হ'ন, বনবাসের দুঃখ অনিবার্য। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, নিঃসংগ বনবাসের দুঃখ সহ্য করবার মত ধৈর্য্য ও সাহস যেন লাভ করতে পারেন!

সাগর পারে বাংলার চিত্রশিল্পী কানন দেবী

শ্রীমতী কানন দেবী গত ১২ই আগষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে তথায় গান করেন। তিনি ভারতের লণ্ডনস্থিত হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননের অনুরোধে সমবেত ভারতবাসী ও বিদেশীদের উদ্দেশ্যে তিনখানি গান শোনান। তিনি ২৭শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডন হতে বিশেষ বিমান যোগে ফ্রান্স যাত্রা করেন। ফ্রান্সে তিনি নানা ভাবে সম্মানিত হন। কয়েকদিন উক্ত স্থানে অপেক্ষা করবার পর তিনি পুনরায় লণ্ডনে আসেন। লণ্ডনে অপেক্ষাকালীন তাঁকে নানা প্রতিষ্ঠান নিমন্ত্রণ করেন। তিনি ২৩শে আগষ্ট তারিখে আলেকজাণ্ডার কোর্ডা ষ্টুডিওতে নিমন্ত্রিত হয়ে গান করেন। ষ্টুডিও মালিক তাঁর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন।

বিখ্যাত অভিনেত্রী "বিভিয়েন লি"-এর সংগে তিনি তিন ঘণ্টাকাল ভারতের ও সমগ্র পৃথিবীর চিত্রজগত সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত অভিনেত্রীর সহিত তাঁর কয়েকখানি ছবি তোলা হয়—লণ্ডন হতে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন—ওয়াশিংটন হতে এক বিশেষ আমন্ত্রণ আসাতে তিনি উক্ত স্থানে গমন করেন। উক্ত স্থানে একজন সাংবাদিক তাঁকে বলেন—'আপনি কি ভারতের গ্রিটা গার্বো?' শ্রীমতী কানন দেবী লজ্জিত হয়ে পড়েন।

সাংবাদিক বলেন—

'আপনার অভিনয়, গান, সৌন্দর্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আপনি ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এবং ভারতবর্ষের গ্রিটা গার্বো।'

তিনি নিউইয়র্কে ফিরে আসেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। ম্যানভয় হাঁসপাতালে তাঁহার 'এপেনডিসাইটিস' এর অপারেসন করা হয়।

তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন। অবিলম্বে তিনি ফিরে আসবেন আবার আমাদের মাঝে আমরা দিন গুণছি তাঁর আগমনের। —নিঃ সঃ

আমাদের আজকের কথা—

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড কী ভাবে ভেংগে দিয়ে গেছে—সে কথা নতুন করে কাউকে বলতে হবে না। তাই সে কথা থাক। কিন্তু এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষের মনুষ্যত্বকে কষ্টি পাথরে যাঁচাই করে নেবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। প্রতিফলকের মত দ্বিতীয় মাহাযুদ্ধ মানুষের নগ্নরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল। সে প্রতিফলকে আমরা দেখেছি, মানুষের সর্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা—দেখেছি শোষণের বীভৎসতা। মনুষ্যত্বের শোচনীয় অপমৃত্যুর বিভীষিকায় আঁতকে উঠেছি বার বার। এই বিভীষিকার ছায়াপাত চিত্রজগতের আকাশকেও ভয়াবহ করে তুলেছিল—কালোবাজারের কালো হাতীর পদভরে চিত্রজগতের মাটি কেঁপে উঠলো—তাঁদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়লো চিত্র-জগতের বড় বড় রুই কাতলা থেকে ছোট ছোট পোনা-মাছ অবধি। পেছন থেকে কিছু না দিলে কারোরই মন ওঠে না। পেছনের এই দানছত্রের বোঝা যেয়ে চেপে বসলো ছবির নির্মাণ-মূল্য তালিকায়—যা দর্শকদের ঘাড় ভেংগেই উঠে আসতে লাগলো। যেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকায় একখানা ছবি নির্মিত হ'তো, সেখানে দেড়লাখ-দু'লাখ থেকে বিশলাখ অবধি নির্মাণ মূল্য বৃদ্ধি পেল। কোটা সংগ্রহ করতে হবে, দাও কিছু—ষ্টুডিওর তারিখ পেতে হ'লে কিছু অন্য ভাবে না দিলে চলবে কেন? ফিল্ম সংগ্রহ করতে হবে—এধার ওধার দিয়ে কিছু দিতে হবে বৈকী! চিত্রশিল্পী—শব্দ যন্ত্রী—রসায়নাগারিক—রূপসজ্জাকর থেকে আরম্ভ করে বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও পিছন থেকে হাত না বাড়িয়ে পারেন নি। যাঁরা পেরেছিলেন—তাঁরা ব্যতিক্রমের দলে - তাঁদের কথা বাদ দিয়েই আমি বলছি। এতো গেল ছবির নির্মাণ অবস্থার কথা। ছবি নির্মিত হবার পর দর্শকদের সামনে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হ'লে প্রেক্ষাগৃহের মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু সেলামী না দিলে চলবে কেন? এবং এই সেলামী না দেবার জন্য বহু ছবির নির্মাণ-কার্য শেষ হওয়া সত্বেও মুক্তিলাভ করতে পারে নি—সে নজিরও যে না আছে তা নয়। কী পেলাম—সেদিকেই সকলের দৃষ্টি। কী দিলাম—তা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামান নি—ঘামাচ্ছেনও না। দেবার বেলায় যে ফাঁক আগেও ছিল, এখনও থেকে যাচ্ছে। আমার এই উক্তির সত্যতার সন্ধান অতি সহজেই পাওয়া যাবে, যদি কোন একজন দর্শক পূর্বেকার ও বর্তমানের ছবির নির্মাণ-মূল্যের তুলনা মূলক তারতম্য বিচার করে, পূর্বেকার ও এখনকার ছবির মানের তারতম্য যাচাই করে নেন। নির্মাণ-মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে বাংলা ছবির মান কী বৃদ্ধি পেয়েছে? মোটেই নয়। তাহ'লে এই অসন্তোষ—এই না-পাবার জ্বালা দর্শকদের মনকে ভরিয়ে তুলছে কেন? যুদ্ধের দরুণ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখতে পেয়েছিলাম, তারই জোর-এ এতদিন প্রেক্ষাগৃহের সামনে দর্শকদের ভিড় দেখতে পেয়েছি। পকেট যখন ভারি ছিল, দর্শকেরা যাঁচাই করে দেখেন নি, কী দিয়ে কী পেলাম। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ছিলেন—যাই দেই না কেন—মনের মত মাল টানতে পারবেন। আজ পকেটে টান পড়েছে—দর্শকেরা আত্ম-সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। কী দিয়ে কী পাবো—সেকথা বিচার করেই তাঁরা ছবি দেখতে যাচ্ছেন—প্রবঞ্চনার ফাঁদে আর তাঁরা পা বাড়াতে রাজী নন। তাঁ

প্রথম প্রেমের স্বপ্ন
ও তার
সার্থক পরিণতি
এর মাঝে আছে কত
বুক ভাঙ্গা কথা
রূপশ্রীর
আগামী নিবেদন
শাঁখা
সিঁদুর
প্রধানাংশে
সন্ধ্যারাণী
দীপক মুখার্জ্জী
মলিনা · ছবি · নরেশ
ধীরাজ · হরিধন · তুলসী
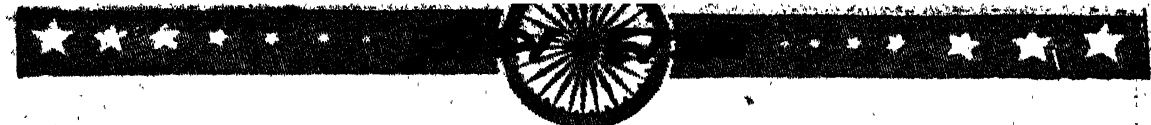
প্রেক্ষাগৃহের ভিড় ধীরে ধীরে কমে আসছে। কর্তৃপক্ষের টনকও নড়তে সুরু করেছে। যা খরচা করছেন—তা উঠে আসবার নিশ্চয়তায় অনিশ্চিতের কালো ছায়াপাতে চমকে উঠছেন তাঁরা। তারপর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বঙ্গ-বিভাগ প্রভৃতিও তাঁদের কম ভাবিয়ে তুলছে না। তাঁরা হাত গোটাতে চাইছেন। শুধু হাত গোটানোই নয়—কী দিয়ে কী পেতে পারেন, সে চিন্তায় বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করছেন। এত দিনের অজ্ঞানতার গণ্ডি ভেদ করতে পারছেন না—আলোর রেখা এঁদের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠছে না—অসহায়ের মত দাপাদাপি করছেন। দাপাদাপি করে আবার ভুলের পথে পা বাড়াচ্ছেন। এঁরা অর্থাৎ চিত্রজগতের ওপর একচ্ছত্র দাবী আছে বলে যেসব প্রতিষ্ঠান মনে করেন—তাঁরা গালাগালি দিচ্ছেন নবাগত ও একক-প্রযোজকদের। ভুইফোঁড় বলছেন তাঁদের। বলছেন—জোচ্চর। কোন বিশেষণ দিয়েই স্বাদ মিটছে না। আমরাও গালাগাল দি—গালাগালি দি তাদের—যারা হঠাৎ ঝিলিক মেরে যেতে চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন কালোবাজারের দম্ভে চিত্রজগতের একটা কেও-ক্যাটা হ'য়ে বসতে। তাদের আন্তরিকতা ছিল না—ছিল দম্ভ—ছিল লোভ—ছিল লালসা। তাদের আমরা গালাগাল দিয়েছি—গালাগাল তাদের বেশীদিন দিতে হয়ওনি—তারা আপনা থেকেই সরে পড়েছে—যারা এখনও আছে—তাদেরও যে দিন ফুরিয়ে এসেছে—একথা তারা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পেরেছে। এরা চিত্রের নির্মাণ-মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী—দায়ী এদের অযোগ্যতা চিত্রের অবনতির জন্য। কিন্তু তাই বলে একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে দিয়েত লাভ নেই। এদের সংগে আরো যেসব নবাগতরা পা বাড়িয়েছিলেন আন্তরিকতা নিয়ে—একক প্রচেষ্টায় যাঁরা চিত্রজগতের অংগন তলে একটু আশ্রয় পেতে, আজও যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন—তাঁদের তাড়িয়ে দিলে—তাঁদের প্রবেশ পথে অবরোধের সৃষ্টি করলে—সেটা যেমনি মানবতার দিক থেকেও কেউ সমর্থন করবেন না—ব্যবসায়ের দিক থেকেও এই একচেটিয়া মনোবৃত্তি কেউই সহ্য করবেন না। আমরা পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি—চিত্রজগতে 'আমাদেরই একচেটিয়া আধিপত্য' এই বালসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁদের এই স্বার্থান্ধ মনোভাব দূর করতে হবে। চিত্রজগতের দ্বার অবারিত, উন্মুক্ত তাঁদেরই জন্য—যাঁরা শিল্পের দিক থেকে—ব্যবসায়ের দিক থেকে আন্তরিকতা নিয়ে এখানে প্রবেশ করতে চাইবেন। আন্তরিকতা নিয়ে যাঁরাই আসবেন—তাঁদের দাবীকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না—তাঁদের ব্যর্থতাও কোন দিন তাঁদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। পুরোন-গোষ্ঠী যদি যোগ্যতার প্রশ্ন তুলতে চান—তাহ'লে তাঁদেরও আমরা পালটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো,—তাঁরাই বা তাঁদের কতখানি যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দর্শকদের শ্রদ্ধাভাজন হ'তে পেরেছেন? যোগ্যতার প্রশ্ন তাঁরা নিজেরাও হয়ত তুলতে চাইবেন না। কারণ, তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাও কম ওয়াকিফহাল নন। যোগ্যতার মাপকাঠি নিয়ে আজ যদি তাঁরা নূতনদের সামনে অবরোধের সৃষ্টি করতে চাইতেন—আমাদের কোন ক্ষোভ থাকতো না—আমাদের কিছু বলবার ছিল না। যোগ্যতার মাপকাঠিতে কারোর সংগে যুঝবার মুরদ এঁদের নেই—তাই আগে আসবার সুযোগ নিয়ে নবাগতদের বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর। আগে এসে এঁরা যে সব ঘাঁটি আগলে বসে আছেন—সে ঘাঁটি ভেদ করে অগ্রসর হ'তে কোন নূতনেরই সাধ্য নেই। তাই বাধ্য হ'য়ে নতি স্বীকার করে নূতনদের পথ করে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ পুরোনদল নূতনদের হাতের মুঠোর ভিতর নিয়ে নিজেদের খুশীমত তাঁদের চালাচ্ছেন—তাঁদের শোষণ করছেন। তাই একক প্রচেষ্টা নিয়ে যেসব নূতনদের আন্তরিকতার পদধ্বনিতে আমরা আশান্বিত হ'য়ে উঠেছিলাম—ধীরে ধীরে তাঁদের সে পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে বসেছে। জনসাধারণ প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন—আভ্যন্তরীণ প্যাঁচের খেলা তাঁদের জানবার কথাও নয়—এতে প্রত্যেক নূতন সম্পর্কেই তাঁরা যদি সন্দিহান হ'য়ে ওঠেন—তাতে তাঁদেরও কোন দোষ নেই। অথচ এই নূতনদের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছে—তার কী কোন বিহিতই হবে না? নিশ্চয়ই হবে। আজ

অষ্টম-সংখ্যা

১৩৫৪

— শ্রীমতী ছায়া দেবী —

এম, পি, প্রডাকসন্সের 'অনির্বাণ' চিত্রে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন। শ্রীযুক্ত সৌমোন মুখোপাধ্যায়।

ধীরাজ ভট্টাচার্য ও নবদ্বীপ হালদার
শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত
আওয়ার ফিল্মের 'নতুন খবর' চিত্রে।
চিত্রখানি রূপবাণী ও পূর্ণতে প্রদর্শিত হচ্ছে।
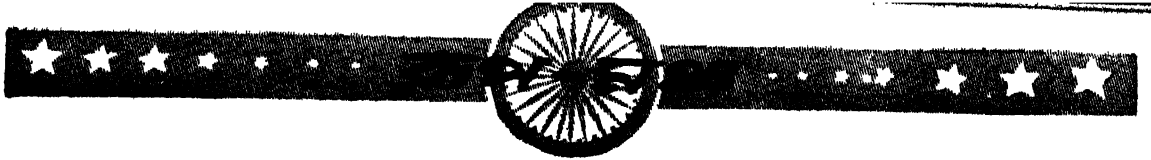
জনমত আর মূক নয়। এমন দিন ছিল, যখন ছবি দেখতে যেয়ে টিকেট কিনবার সময় ভিড়ের ওপর প্রেক্ষাগৃহ-মালিকদের চাবুক চলতো (নির্বাক যুগে)—কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার দুর্নীতিকে নীরবে জনসাধারণ সহ্য করে এসেছেন। আজ চাকা ঘুরে গেছে। জাগ্রত জনশক্তি কোন অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিতে রাজী নন। প্রেক্ষাগৃহগুলিতে যে অনাচার চলতো, তার প্রত্যুত্তর একাধিকবার দর্শকসমাজ দিয়েছেন। তাই প্রকৃত ব্যাপারটা দর্শক সাধারণের কাছেই আমরা তুলে ধরতে চাই। নতুন প্রযোজকদের কাছ থেকে একাধিকবার আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে এবং সে অভিযোগ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেই আমরা চিত্রজগতের রুই-কাতলাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনতে সাহসী হয়েছি। কোন ছবির আর্থিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে কলকাতার মুক্তি ও বিক্রীর ওপর। আজ প্রযোজকদের কাছে সবচেয়ে যে সমস্যা বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে—তা হচ্ছে কলকাতায় চিত্র মুক্তির সমস্যা। চিত্র-মুক্তির বিষয়ে পরিবেশক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রযোজক এবং প্রদর্শকের মাঝে সংযোগস্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের কথাও জনসাধারণ না জানেন এমন নয়। এই পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ গ্রহণ করে সহর ও মফঃস্বলে চিত্রের মুক্তির ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ চিত্রের ব্যবসায় দিক সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এঁদের ওপর।

সপ্তর্ষি চিত্র মণ্ডলীর 'শুধু-ছবি' চিত্রে সন্তোষ সিংহ ও অচিন্ত্যকুমার

অনতিবিলম্বে প্রদর্শন আরম্ভ হইবে

চিত্রা :: রূপালী

ভূমিকায় : মলিনা, ছবি রায়, ফণি রায়, শিশির বটব্যাল (এঃ)
তুলসী, রাজলক্ষ্মী, মায়া বোস, শুভ্রা, নরেশ বোস প্রভৃতি।

সর্ব্বংসহা স্নেহ, অমলিন প্রেম—ভালবাসা,
গ্রাম্য কিশোর জীবনের অনাবিল হাসিকান্না,
বেদনা-আনন্দের আবাল বৃদ্ধ বণিতার

চিত্তহারী সুমনোহর চিত্র।

নিউ থিয়েটার্সের বাংলা ছবির একমাত্র পরিবেশক :—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা।

এই পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি কোন ছবির নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হবার সংগে সংগে পূর্বে অথবা পরে অগ্রিম দাদন দিয়ে প্রযোজকের সংগে চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। বিভিন্ন পরিবেশকদের মাঝে একখানি ভাল ছবির পরিবেশন-স্বত্ব লাভ করবার জন্য অনেক সময় প্রতি-যোগিতাও দেখা যেত। এবং এব্যাপারে ছবির নির্মাণ-কর্তা—মূল ঝুঁকি যিনি নিচ্ছেন অর্থাৎ প্রযোজকই ছিলেন সর্বেসর্বা। যিনি পয়সা খরচ করে—পরিশ্রম করে ছবি নির্মাণ করলেন, তাঁর দাবীকে অগ্রাহ্য করবার মত অথবা তাঁর নিজের ছবি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতাকে খর্ব করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু আজ সে চাকা ঘুরে গেছে। বড় বড় পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে প্রেক্ষাগৃহগুলির ওপর তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন। অনেকক্ষেত্রে তাঁরা প্রেক্ষাগৃহগুলিকে মুঠোর ভিতর নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন। যেসব পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি এদের সংগে আর্থিক বলে যুঝে উঠতে পারছেন না—তাঁরা চাতকের মত এঁদেরই কৃপাদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে রয়েছে। প্রযোজকদের ত কথাই নেই। এদের আওতায় এদের ইচ্ছাধীন না চললে ছবির মুক্তির আর কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই এদের কাছে বাধ্য হ'য়ে নতি স্বীকার করতে হ'বে। কলকাতায় যে কয়টি প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে, জনসাধারণ তা জানেন—কিন্তু একথা হয়ত জানেন না, এই প্রেক্ষাগৃহগুলি মুষ্টিমেয় পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলছে। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় জনকয়েক অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সামনে অর্থের বলে বিরাট এক অবরোধ সৃষ্টি করে রেখেছেন। এতে ফল দাঁড়িয়েছে এই, অন্যান্যদের হয় চিত্রজগত থেকে বিদায় নিতে হবে—অথবা এঁদের কাছে অপমানজনক সর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ চিত্র-ব্যবসায়ক্ষেত্র সকলের জন্য যে প্রসস্ত পথ খুলে রেখেছিল, সে পথ একদিক দিয়ে যেমনি বন্ধ হ'য়ে গেল—তেমনি মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীদের স্বেচ্ছাচারিতার হাতে স্বভাবতঃই জনসাধারণও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন। প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে ছবির মুক্তি দেবার চুক্তিতে পরিবেশকদের সহায়তায় ছবির অংশ দাবী করছেন—তাঁদের চেলা-চামুণ্ডাদের মারফৎ পিছনের দরজা দিয়ে হাত বাড়িয়েও কিছু পকেটে পুরছেন। সুচতুর মার্কিণ ব্যবসায়ীরা এই অবরোধের দ্বারা ব্রিটেনের চলচ্চিত্র শিল্পকে কী শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন করে তুলেছিল চিত্রশিল্প সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যেকোন সুধীজন সে সংবাদ রাখেন। এবং এই অবরোধের হাত থেকে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষা করবার জন্য সেখানকার সরকারকে আইনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। আজ আমাদের দেশীয় চিত্র-শিল্পের সামনেও সেই দুর্যোগের ঘনঘটা চিত্রশিল্পের ভবিষ্যতকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—এই দুর্যোগ থেকে চিত্র-শিল্পকে রক্ষা করতে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার পূর্বে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মিষ্টি-কথায় সতর্ক করিয়ে দিতে চাই—যদি সমষ্টির খাতিরে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত সর্বগ্রাসী লালসাকে সংহত না করেন—তাহলে আমরাও জনমত গঠন করে এই অবরোধ ভাঙতে জাতীয় সরকারকে আইনের সাহায্য নিতে বাধ্য করাবো। কর্তৃপক্ষ যেন ভুলে না যান, আজ জাতীয় সরকার সমষ্টির স্বার্থকে কোন মতেই ব্যক্তিগত সর্বগ্রাসী স্বার্থের মুখে তুলে দিতে পারেন না। যেসব প্রযোজক ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান আন্তরিকতা নিয়ে—সৎ-ব্যবসা-বুদ্ধি নিয়ে চিত্রজগতে পা বাড়িয়েছেন বা বাড়াতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীদের বিন্দুমাত্রও যদি অবিচারের সংবাদ আমাদের কানে আসে—তাকে কোন মতেই আমরা বরদাস্ত করবো না। সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির যেকোন স্বার্থান্ধ অভিযানকে ব্যর্থ করে দিতে রূপ-মঞ্চ আপ্রাণ সংগ্রাম করবে এবং সে সংগ্রামে আমাদের পার্শ্বে চিত্রশিল্পের যে কোন শুভানুধ্যায়ীদের যে আমরা পাবো, সে বিষয়ে যেমনি আমাদের কোন সন্দেহ নেই—তেমনি আমাদের জয় সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত।

—শ্রী কাঃ

শুক্রবার, ১৪ই নভেম্বর হ'তে শুভারম্ভ—

পাইয়োনীয়ার পিকচার্স-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন
বাংলা সাহিত্যের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
অমর কাহিনী অবলম্বনে রূপায়িত !

চন্দ্রশেখর

বাংলা ছবির নায়করূপে প্রথম অবতীর্ণ
নবযুগের অপরাজেয় শিল্পী
অশোককুমার
নায়িকা—**কানন** : দলনী—**ভারতী**
এঁদের সঙ্গে আছেন : ছবি বিশ্বাস, অমর মল্লিক, আজুরী, গীতশ্রী, মণি ঘোষ, নীতিশ ও হান্স গ্রাস

উত্তরা, ছায়া, দীপক ও উজ্জ্বলা সিনেমায়

বাংলা সংস্করণের পরিবেশক :
ডি লকস ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

শৈবলিনী ঃ
"তুমি কি স্বপন সম আসিলে
বাহিয়া তরী
পথ চাওয়া হিয়া মোর
সুধায় উঠিল ভরি ?
এলে যদি চাহি মোরে—
কেন তবে যাও সরে"—

●

প্রতাপ ঃ
"তোমারে সুরভি সম
দূর হতে পাব বলে !"

●

দলনী ঃ
"রমজানের দিন শেষে
এলো কি মোর চাঁদ হেসে
তাই পথ চাওয়া প্রেম মম—
হাসে মধুহাসি আঁখি-জলে'

●

প্রত্যেকটি গান রসিক চিত্তে
যৌবনের রঙ্গীন স্মৃতিকে
জাগিয়ে তুলবে !

●

পরিচালনায় :
দেবকী কুমার বসু
সুর-সংযোজনায় :
কমল দাশগুপ্ত
চলচ্চিত্রায়ণে :
অজয় কর
শিল্প-নির্দেশনায় :
বীরেন নাগ

(৯)

উপন্যাস

কালীশ মুখোপাধ্যায়

●

জলিরপাড়ের গীর্জায় রাইকে তুলে দিয়ে নাসির যখন বাড়ী ফিরলো – হেমন্তের কুয়াসাচ্ছন্ন ভোরের পরমায়ু তখন অবধিও শেষ হয়নি। গীর্জার পাদ্রিকে ও নূর বিবির 'বোনাই' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে। আরও বলেছে, নূর বিবির 'সোয়ামী' মারা গেছে। ওরই ঘরে ছিল এতদিন। ও ভেবেছিল একটা নিকে-ঠিকে দিয়ে ঘারের বোঝা নামিয়ে দেবে। কিন্তু সে আর হ'য়ে উঠলো না। নূর বিবি বেঁকে বসলো। গায়ের পাঠশালায় 'নেখাপড়া' একটু-আধটু শিখেছিল—'ইস্কিরি'র প্রথম পাঠটাও শেষ করেছিল। ওইত হ'লো নূর বিবির সর্বনাশের মূল। সে আর 'নিকে' বসতে চায় না। চায় আরো 'নেখাপড়া' শিখে বামুন-কায়েতের মেয়েদের মত বিবি হতে। বলে, চাকরী করে টাকা আনবে সে—নাসিরকে সাহায্য করবে। কী তাজ্জব ব্যাপার! এও কী সম্ভব! গায়ে থেকে সম্ভব নয় মোটেই। আরও অসম্ভব, নাসিরের পক্ষে। তার শক্তি নেই নূর বিবির বোঝা বইতে। নিজের মাগকে—বালবাচ্চাগুলোকেও ও পেট পুরে খেতে দিতে পারে না। নূর বিবির বোঝা বইবে কেমন করে! গীর্জার কথা অনেকদিন থেকেই শুনেছে—নূর বিবিও জানে। ধরে বসলো গীর্জায় নিয়ে আসতে। কিন্তু বল্লেইত চলেনা। আনবে কী করে! জানাজানি হ'লে যে গায়ের লোকেরা আসতে দেবেনা। ও তাই চুপি চুপি রাতারাতি নিয়ে এসে হাজির করেছে। পাদ্রি সাহেব আশ্রয় না দিলে ওর আর মান-ইজ্জৎ থাকবে না। পাদ্রি সাহেবত দয়ার অবতার! ও বহুবার শুনেছে তাঁর দয়ার কথা। পাদ্রি সাহেব আর অমত করতে পারেন না। এই দুঃখ-কষ্ট জর্জরিত দেশের জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য ভগবান যীশুই যে তাঁদের পাঠিয়েছেন! যীশুর আদেশ তাঁরা অবহেলা করতে পারে না! বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে পাদ্রি সাহেব নাসিরকে অভয় দিয়ে বলেন, "হামার কছু করিবার নাহি। যীশুর পদে আনিয়াছো—যীশুই ওকে রক্ষা করিবেন।"

নাসির নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওঠে পড়ে। আসবার সময় চুপি চুপি পাদ্রিকে বলে আসে, যীশুর প্রতি নূর বিবির বহুত টান আছে। ও জানে তোমাদের দেবতাকে। মান্যি করে। ওকে যীশুর পায়েই টেনে নিতে পরামর্শ দিয়ে আসে। কেতাব পড়ে মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করলেও—জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে সত্য নাসির লাভ করেছে—তা থেকেই পাদ্রি সাহেবের সহানুভূতি লাভের জন্য, এই ইংগিত করে এলো। পাদ্রিরা যতই বুচকুনি ঝারুক, যতই বড় বড় লম্বা চওড়া দয়ার কথা বলুক—অশিক্ষিত নাসিরও জানে, ওরা এসেছে এদেশের মূল ধরে টানতে। বেনিয়ার জাত ওরা এখানেও বেশ ব্যবসা জেঁকে বসেছে। পেট পুরে খেতে দিয়ে—পরণে ভাল কাপড় দিয়ে, ওরা এদেশের ধর্মকে কিনে নিচ্ছে। ওরা ব্যবসায়ী পণ্যের মতই ধর্মকে নিয়ে বেসাতি খুলেছে!

যতই বাড়ির কাছাকাছি আসতে লাগলো—নূর বিবির সমস্যা দূর হ'য়ে আর এক সমস্যা ধীরে ধীরে নাসিরের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললো। মেজকত্তাকে কী করে সে সামাল দেবে! বাড়ী যখন ফিরলো—মেহেরউন্নিসা ঘুম থেকে উঠে কাজে লেগে গেছে। উঠোনটা লেপে গাড়ু-ঘটিগুলি মাজতে ঘাটে যাবে—। স্বামীকে দেখেই হাতের কাজ বন্ধ রেখে মেহের সামনে এসে দাঁড়ায়। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, "ঠিকছে দিয়া আইছোনী?" নাসির গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "অয় দিয়াতো আইছি। অ্যাহ্নে হরবা কী?" একটু থেমে বলে, "নে আগে এ্যাক ছিলাম তামাক দি, ভারী মোহানত অইছি।" মেহের একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। সত্যিইত, সারারাত নৌকো বেয়ে নাসির যে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, ও

তা খেয়ালই করেনি। তাড়াতাড়ি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে দেয়। কলকেতে তামাক সেজে নিয়ে আসে। বারান্দার খুঁটি ধরে ও ডোয়া ঠ্যাস দিয়ে উদগ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হুকোয় টান দিতে দিতে নাসির বলে, "মাইয়্যাডার নাইগ্যা পরাণ কান্দি! জাইল্যার ঘরির অলি কী অয়—হবাব চরিত্তির—বাচ্চিত-টাচ্চিত এ্যাহাবাবে বামনাদের নাগাল।" বলেই নাসির আবার দু'টো টান মারে। মেহেরের বুক কেঁপে ওঠে। জিজ্ঞাসা করে, "বেতাল অইছে না তো?" নাসির অভয় দিয়ে বলে, "না, স্যাডা অয় নাই। তয় অ্যান্নে মাইজা-কত্তারে সামাল দিমু ক্যাম্বালে! উইঠ্যা বয় দেহি। এ্যাড্ডা রাস্তা বাতলাই।" মেহের বারান্দায় উঠে পড়ে। মাদুরে বসে না। মাটিতেই উটকোভাবে গালে হাত দিয়ে নাসিরের সামনা-সামনি বসে। কারোর মুখে কথা নেই কিছুক্ষণ। দু'জনেই একটা উপায় নির্ধারণে ভাবতে থাকে। উপায় একটা স্থির করে ফেলে। নাসির আর বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব করে না। মেহেরকে কী কী বলে—নৌকোর ঘোনাটা নামিয়ে রেখে বল্লভপুরের দিকে রওনা হয়।

রোদ উঠে গেছে বেশ খানিকটা। মেজকর্তা কাছারীর ঘরে একটা টুলে বসে তামাক টানছিলেন। তার উদাসী দৃষ্টি দেখে বোঝা যাবে কোন এক গভীর চিন্তায় তিনি নিমগ্ন। নাসির বাইরে থেকে সেলাম দিয়ে আস্তে ডাক দিল, "মাইজ্যা কত্তা"। সামনে যেয়ে আবার ডাক দিল, "মাইজা কত্তা"। মেজকর্তা মুখ তুলে তাকালেন। নাসির আবার সেলাম দিল। নাসিরের দিকে তাকিয়েই মেজকর্তা অবাক হ'য়ে গেলেন। এ কী বিপদের ছাপ ওর সারা চোখেমুখে! সারারাত নৌকো বেয়ে নাসির পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল—তা ছাড়া এমনি একটা কৃত্রিম উদ্বিগ্নের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিল ওর চোখেমুখে যা, অতি সহজেই মেজকর্তাকে আতংকিত করে তুললো। মেজকর্তা সংকিত হ'য়ে উঠলেন। না জানি কী একটা সাংঘাতিক বিপদের সংবাদ বয়ে এনেছে নাসির! তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। স্তম্ভিতের মত তাকিয়ে থাকেন নাসিরের দিকে! নাসির কাছে এগিয়ে যায় দু'পা। মেজকর্তা উঠে পড়েন। নাসিরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, "কী রে, খবর কী?"

"হব্বলাস অইছে।" নাসির আর বলতে পারে না। থেমে যায়। মেজকর্তার তর সইছে না। সর্বনাশের বিভীষিকায় তিনি আতকে উঠেছেন। তিনি উদ্গ্রীব হ'য়ে ওঠেন জানবার জন্য, কী সে সর্বনাশ! বা হাতে হুকোটা ধরে অস্থির ভাবে ধমকে ওঠেন নাসিরকে, "ভণিতা রেখে বলনা কী হ'য়েছে!" নাসির এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, "রাই বিবিরে কাইল বাইত থ্যা পাইছি না।"

"এ্যা"—বিকট শব্দ করে ওঠেন মেজকর্তা। "বলিস কী?" মেজকর্তা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। তার দৃঢ় কর্কশ কণ্ঠে বেজে ওঠে, "হারামজাদা পাজি, আরামে ঘুমোচ্ছিলে বুঝি!" সংগে সংগে কষে এক চড় বসিয়ে দেন নাসিরের গালে। রাগে কাঁপতে থাকেন। দাতগুলি কড় মড়িয়ে ওঠে। হাতের হুকোটা মাটিতে ছিটকে পড়ে লুটোপুটি খেতে থাকে। নাসিরের শিরা উপশিরাগুলি দ্রুত স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। ওর সবল পেশীযুক্ত দেহটায় অসহ্য উত্তেজনার ঝঙ্কার খেলে যায়। ওর এতদিনের রুদ্ধ পৌরুষ ওর নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে চায়—এই অন্যায়—এই জবর-দস্তি আর সহ্য করবে না। গুড়িয়ে দেবে মেজকর্তার হাড়গুলি! হ্যা, নিশ্চয়ই গুড়িয়ে দেবে! কিন্তু না, এখনও সময় হয়নি। নাসিরকে আরো কিছুদিন এমনিভাবে সহ্য করে যেতে হবে। ধাবমান অশ্বের গতিকে যেমনি ভাবে সহিস রুদ্ধ করে দেয়, তেমনি ভাবে নাসির তার সমস্ত উত্তেজনাকে প্রশমিত করে। দীর্ঘদিন ধরে ভুলের যে বোঝা সে বয়ে নিয়ে এসেছে—আজ হঠাৎ তাকে ঝেরে ফেলে দেবার শক্তি নাসিরের নেই। নির্বাক। নিশ্চল পুতুলের মত ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। গালটা চিন চিন করে ওঠে। অসহায় দুর্বলের মত নাসির গালটায় হাত বুলাতে থাকে।
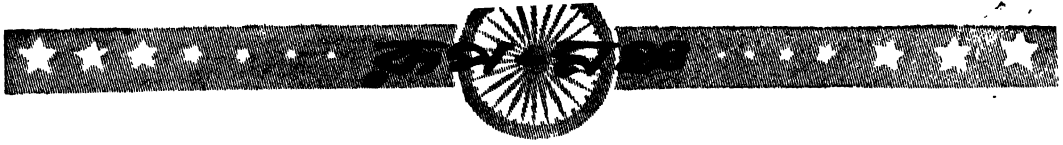
মেজকর্ত্তা খাটের ওপর খুটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। বুঝতে পারেন, উত্তেজনাবশতঃ কাজটি তিনি ভাল করেননি। নাসিরকে কোন মতেই তিনি চটাতে পারেন না। নাসির তার জীবনে আজ অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। তার জীবনের প্রতিটি অলিগলির সন্ধান সে রাখে—নাসির তার জীবনের বহু গুপ্ত কার্যের সহায়ক ও সাথী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গলার স্বরটা নামিয়ে টুলটা দেখিয়ে মেজকর্ত্তা বলেন, "বয়, বড্ড লেগেছে বুঝি! আচ্ছা, আগে গাড়ুটা থেকে জল নিয়ে রগড়ে দে একটু।" নাসির আজ্ঞাবাহীর মত মেজকর্ত্তার কথা শোনে। চৌকিতে না বসে, থপ করে মেজকর্ত্তার পা দু'টি ধরে অসহায়ের মত কেঁদে ওঠে, "মাইজ্যাকর্ত্তা আমাগো কী অবে! পুলুশে যদি খপর পায়।" নাসির চোখ-মুখে ফুটিয়ে তোলে সমূহ বিপদে আতংকিত অসহায়ের ছাপ। নাসিরের এই ভাব দেখে মেজকর্ত্তা মনে মনে খুশী হন অনেকটা। অভয় দিয়ে বলেন, "নে বয়। রাগ কী আমার এমনি হয়! বোকার মত এমন কাজ করবি যে, মেজাজ ঠিক রাখা দায়। ব্যাটা বুদ্ধির দোষে নিজেও মরবি, আমাকেও মারবি। বল দেখি সব খুলে।"

নাসির এবার টুলের ওপর বসে পড়ে নিতান্ত অপরাধীর মত যা বলে যায়—তার ভাবার্থ হচ্ছে, মেজকর্ত্তা ওদের বাড়ী থেকে চলে আসবার পর নাসির গরু বাছুর গুলিকে গোয়ালে তুলেছে—উজু করেছে—নামাজ পড়ে নিয়ে নাস্তা করেছে। রাইব সংগে কথা বলেছে, তাতে রাইর মেজাজটা ভাল বলেই মনে হ'য়েছে। রাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাওয়াতে রাজী করেছে। মেহের খাবার জন্য দুধ-মুড়ি-গুড় দিয়ে এসেছে। রাই খেয়ে নিয়েছে। মেহেরের সংগে গল্প করেও কাটিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ। রাত বাড়লে ওরা দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে মেহের তালা খুলে দেখতে পায়, ভিতরে লোক নেই। কোণের একদিকের বেড়া কাটা! নাসিরকে ডেকে তুলেছে। নাসির যেয়েও তাই দেখে। তখনই ওদের মনে সন্দেহ হ'য়েছে। পুকুর ঘাটে খুঁজেছে—গোয়ালঘর দেখেছে—ভিটের ঝারালো গাছগুলি কোনটা খুঁজে দেখতে বাদ দেয়নি। খালের ঘাট দেখেছে—নৌকো নিয়ে মাঠের এধার ওধারে খুঁজেছে, কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। তারপর ও সোজা ছুটে চলে এসেছে মেজকর্ত্তার কাছে। ওর যতটা ধারণা, খালের জলেই ডুবে মরেছে। সব শুনে মেজকর্ত্তা গম্ভীর স্বরে বলেন, "হু! তাছাড়া আর যাবেই বা কোথায়! যা রটলো, তাই ঘটলো!" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেজকর্ত্তা আবার বলেন, "আচ্ছা তুই যা, আমি মোনহারে নিয়ে যাচ্ছি। খবরদার, কিছু যেন বেফাঁস করিস না।" নাসির মেজকর্ত্তাকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ী চলে আসে। নাসিরের নির্দেশমত মেহেরউন্নিসা সবই ঠিক-ঠাক করে রেখেছিল। একটু বাদেই মেজকর্ত্তা এসে হাজির হ'লেন। কানপাতলা মোহনকে আর পাড়ে তুললেন না। সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে গোপনই রাখতে চান। রাই যে ঘরে ছিল—সেই ঘরে এসে মেজকর্ত্তা ঢুকলেন। বেড়া কেটে যে রাই বাইরে গেছে, সে বিষয়ে তার আর কোন সন্দেহই রইল না। এমন কী স্যাতসেঁতে মাটিতে পায়ের চিহ্নও দেখতে পেলেন।

রাই মরে যাক—মেজকর্ত্তার দুঃখ নেই। রাই পালিয়ে দূরে চলে যাক, তাতেও তার এখন কোন আপশোষ থাকবে না। কিন্তু যদি আবার বল্লভপুরে যেয়ে ওঠে—যদি বেঁচে থেকে সব বেফাঁস করে দেয়! এই দুশ্চিন্তাই মেজকর্ত্তাকে পেয়ে বসলো। মেজকর্ত্তার স্বরূপ বল্লভপুরে কারুর কাছে অজানা নেই। বহু অন্যায় তিনি করেছেন। কিন্তু অন্যায় করে হাত ছাপাইর দক্ষতা তার অদ্ভুত—সেজন্য প্রমাণাভাবে কোনদিন তার গায়ে আচরটি লাগতে পারে নি যে অন্যায় তিনি এতদিন করেছেন—সেজন্য কোনদিন তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'তে হয় নি! আজই তার জীবনে সবচেয়ে বড় পরাজয়—এ পরাজয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। মরে গেছে এর যদি নিশ্চিত কোন নিদর্শন পেতেন—তার কোন আপশোষ হ'তো না—কোন চিন্তা থাকতো না। দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য দু'একজনকে একদম সরিয়ে দিতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। কিন্তু আজ সে রকম কোন পথও তার খোলা নেই—সন্দেহের দোলা-

তেই তাকে দোল খেতে হবে। নাসির মেজকর্ত্তার মনের ভাবটা অনেকটা আঁচ করে নিতে পারে। তাই ও মেজকর্ত্তার মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় করে তুলতে চায়—হ্যাঁ রাই জলে ডুবেই মারা গেছে। এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। ও বলে, "লাস ভাইস্যা না উঠি। তাইলে আর ডর নাগছি না।" ঘোমটার নীচ থেকে মেহেরও নাসিরের কথায় সায় দেয়। মেজকর্ত্তা নিজেকে ধরা দিতে চান না। ওদের অভয় দিয়ে বলেন, "কয়েকদিন একটু নজর রেখো। খালের জলে ডুবলে স্রোতের জলে লাস ভেসে যাবে নিশ্চয়ই। তবে হুসিয়ার! একটি কথাও যেন বেফাঁস না হয়। থানার থেকে কোন ভয় নেই। আমি কাল একবার ভাঙ্গা যেয়ে সব ঠিক করে আসবো।" মেজকর্ত্তা ঘাটের দিকে দু'পা বাড়িয়েই আবার ফিরে দাঁড়ান। মেহেরকে উদ্দেশ্য করে নাসিরকে বলেন, "বৌকে এবার এক ছড়া হাইলা গড়িয়ে দে। টাকা নিয়ে নিবি আমার কাছ থেকে।" নাসির খুশীর ভাবে উত্তর দেয়, "সে আপনি যা কবেন-- ভয় ভাইব্যেন না। উর ঠ্যাং বাইরে যাবি ন্যা।" মেজকর্ত্তা তবু আবার একটু হুসিয়ার করে দিয়ে নৌকোয় যেয়ে ওঠেন।
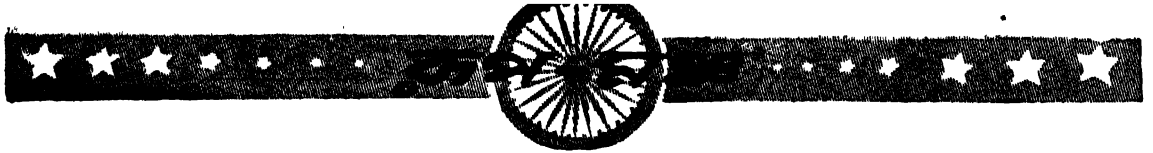
কলকাতায় দেবু রাইর এই অদ্ভুত পলায়ন বা মৃত্যু-রহস্যের কথা সুনন্দার পত্র মারফতই জানতে পারলো। রাই জলে ডুবে মরেছে—সুনন্দা নিজেও একথা বিশ্বাস করেনি—দেবুকেও বিশ্বাস করাতে চায়নি। দেবুর মন সুনন্দার বিশ্বাসেই বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে। আত্মহত্যা করার মত মেয়ে রাই নয়—এ বিশ্বাস দেবুর ছিল। নিজের ইচ্ছাতেই বা পালিয়ে যাবে কোথায়! তাই সমস্ত সন্দেহ মেজকর্ত্তাকে নিয়ে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে ওর মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো। এজন্য নিজেকেও কম অপরাধী বলে মনে করলো না। সত্যি, সে যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতো—রাইর কী কোন একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতো না! নিজের গাফিলতিটা নিজেই বা ভুলবে কেমন করে? রাই যদি বেঁচেই থাকে, আজীবন ওর কাছে অপরাধী হ'য়ে রইল। দিন দুই হ'লো বৌদির চিঠিটা দেবু পেয়েছে। এই দিন দুইয়ের ভিতর কোন সময় রাই ওর মন থেকে সড়ে যায়নি। কাজের মাঝে—অবসরের ফাঁকে—কোন সময়ই রাই ওকে ছাড়তে চায় না। পর পর কয়েকদিন রাত্রিতে কাজ করে আজ ও ছুটি পেয়েছে। সারা দিন-রাতটা প্রাণ-ভরে ঘুমিয়ে নেবে দেবু। চুল কেটেছে—সকাল সকাল স্নান করেছে, খেয়ে নিয়েছে। 'রুম-মেট'-রা অফিসে চলে যাবার পরই দরজায় খিল দিয়ে বিছানা নিয়েছে। মেসের চাকরগুলিকে বলে দিয়েছে—কেউ যেন ওকে না ডাকে। হাতের কাছে কয়েকখানা সাপ্তাহিক ও মাসিক নিয়েছে—ছবির পাতা ওলটাতে ওলটাতে ঘুমটাকে জাঁকিয়ে নেবে। ঘুম আর আসে না। উলটে পালটে রাইর সমস্ত ঘটনাই ওর মনটাকে জেঁকে বসে। ওদের সকলের সামনে—সকলের মাঝে এমনিভাবে একটা নিষ্পাপ নারীর জীবন ঝরে গেল—ওরা চলচ্চিত্রের ছবির মত চলমান ঘটনাগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া ছাড়া কীইবা করতে পারলো! ওদের পরিকল্পনা গড়ে উঠছে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার নিয়ে—মেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার আন্দোলন নিয়ে—ওরা অন্যায় ও অন্ধকারের মাঝ থেকে মানবাত্মাকে মুক্তি দিয়ে সত্য ও আলোকের পথ দেখাবে। ওরা জাগিয়ে তুলবে সুপ্ত শক্তিকে। অথচ আজ একটা অসহায় মেয়েকে মেজকর্ত্তার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না। সে আবেদন জানিয়েছে—অনুরোধ করেছে—ওরা কোন পথেরই নির্দেশ দিতে পারেনি—চেষ্টাও করেনি। ওদেরই বা দোষ কী—ওরাওত কম অসহায় নয়। ওরা পঙ্গু—পঙ্গু ওদের সমাজ। দেবু বিচলিত হ'য়ে ওঠে। ধিক্কার আসে নিজেদের ওপর। না—আর এমনি অসহায় অবস্থার মাঝে ও নিজেদের হাবুডুবু খেতে দেবে না। সমস্ত অবসাদ ও গ্লানি দূর করে ওদের সবলভাবে দাঁড়াতে হবে। নিশ্চল পাষাণের মত স্থানু-সমাজকে সচল করে তুলবে ওরা। ওরা তার মৃত নিশ্চল দেহে সঞ্জীবনী সুধায় স্পন্দন জাগাবে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো দেবু।
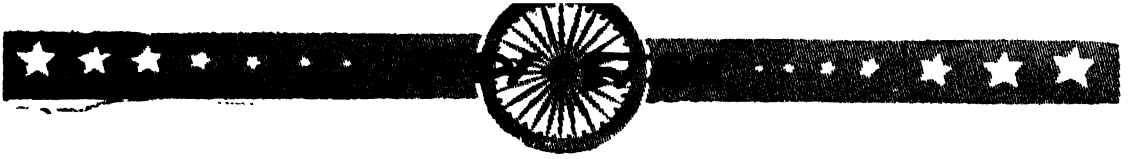
বন্ধ ঘরের মাঝে পায়চারী করতে লাগলো উত্তেজিতভাবে। যাক। গেছে যাক। একটা রাইকে নিয়ে অত ভেবে লাভ নেই। আরও দশজন রয়েছে। তাদেরকে ঘিরেই ওদের প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তুলবে। ও রাইর প্রসংগ একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। রাই—হলধরের মেয়ে রাই—জেলের মেয়ে রাই—ওদের সমাজে এরকম ঘটনাত নিত্যই ঘটে থাকে। কীইবা হয়েছে! কেন ভাববে ও রাইর জন্য! কিইবা সম্পর্ক ওর সংগে তার। ছোট বেলার খেলার সাথী—এইটুকু বইতো নয়! এরকম কতজনত ওর মনের কোণে হারিয়ে গেছে। রাইও যাক—হারিয়ে যাক তাদের মাঝে। ওর কোন ভাবনা নেই রাইকে নিয়ে—। ও কিছুতেই ভাববে না রাইর কথা। ভুলে যাবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুলে যাবে।

কিন্তু ভুলতে পারে কোথায়! নানানভাবে রাই ওর মনে চেপে বসতে চায়! বন্ধ ঘরে পায়চারীই বা কতক্ষণ করবে! মাটিতে পা ঝুলিয়ে চৌকীটার ওপর বসে পড়ে দেবু। একটা বালিস টেনে নেয়। বালিসের ওপর কনুইটা রেখে চুপচাপ থাকে কিছুক্ষণ। নাঃ, ঘুম আজ আর আসবে না—ঘুম আর হ'লো না। একটা ছবিই দেখে আসবে তাহ'লে তিনটের প্রদর্শনীতে ভাল বাংলা ছবিই বা কোথায় তেমন! না থাক! সময়ত কাটবে! হ্যাঁ, ছবিই দেখতে যাবে দেবু। সত্যি, ছবির মতই মনে পড়ে ওর ছোটবেলাকার দিনগুলির কথা। কী ছেলেমানুষই না ছিল! পাড়ায় আর কাউকে সোয়াস্তী দেয় নি। জ্বালিয়ে গেয়েছে সকলকে দৌরাত্মিপনায়। ছোটবেলার দিনগুলিব কথা ভেবে হাসি পায় দেবুর। আনন্দও হয়। একটা মধুর আবেশে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। কত অন্যায়—কত দৌরাত্মিপনা করেছে—তবু দেবুর ইচ্ছা হয়, যদি ফিরে যেতে পারতো ঐ দিনগুলির মাঝে! ঐ উদ্দাম-উচ্ছল-বন্ধন-না-মানা দিনগুলির মাঝে যদি সে আবার নিজেকে নিয়ে যেতে পারতো! মনে পড়ে দেবুর, গাঙ্গুলী বাড়ীর আমগাছ তলায় কালবৈশাখীর দিনগুলির কথা। মনে পড়ে, সন্ধ্যার আবছায়ায় মধু সেখের ক্ষেত থেকে মটর কলাইর সিম-চুরির কথা। নষ্ট-চন্দ্রার রাত্রে বাড়ুজ্জে বাড়ী নারকেল চুরি করতে যেয়ে ধরা পড়ে কী বেয়াকুবটাই না হ'য়েছিল ছোট গিন্নীর কাছে! শেষে তাকেও ক'টা ডাব ঘুষ দিয়ে রেহাই পায়। ওদের পাড়ার প্রতি বাড়ীর প্রতিটি গাছের সংগে ওদের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। কোন আম গাছটার বোটাটা নরম—একটু হাওয়ার দোলনেই আমগুলি খসে পড়ে—কোন গাছের কোন ডালটার পর কীভাবে পা রেখে ডালে ডালে যেতে হয়—কোন গাছটায় লাল পিপড়ের বাসা—এসব কিছুই ওদের অজানা ছিল না। ওরা জানতো গাছের খবর—গাছের ওপরের খবর—আর নিচের খবর রাখতো রাই ওরা। কোন যায়গার মাটিতে পা ডেবে যায় চোরা হাবড়ে—কোথাকার মাটিটা কত শক্ত এমনকী মাটির গন্ধ অবধি রাইদের নাকে ভেসে উঠতো। দেবুরা হয়ত গাছে উঠেছে—ওদের ধরবার জন্য কেউ ছুটে আসছে গাছ বেয়ে নামলে ধরে ফেলবে—রাই গাছের নীচ থেকে হুসিয়ার করে দিয়ে বলে উঠতো, "দেবুদা এই যাগায় লাফাইয়া পড়ো—নরম আছে। গায়ে লাগবে না।" দেবু রাইর নির্দেশমত লাফিয়ে পড়ে ছুট দিত। আবার কোন জায়গাটার মাটিতে লাফ দিলে হাত পা ছড়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে রাই পূর্বে থেকে হুসিয়ার করে দিত। এমনি ভাবে মাঠ-মাটি-গাছ-গাছরা-র সংগে দেবু ও রাইদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওদের মাঝে গড়ে উঠেছিল আত্মার আত্মীয়তা। বড় হয়ে কতবার দেবু বাড়ীতে গেছে—হলধরের গাব গাছটা ভেঙ্গে প্রতি বছর গাব এসেছে—গাঙ্গুলী বাড়ীর আমগাছগুলিও তেমনি ভেঙ্গে পড়েছে আমে। আম তলায়, গাব তলায় ওদেরই মত এক এক দল যেয়ে ভিড় করছে—গাছে উঠছে। বাড়ীতে যেয়ে দেবু হয়ত একবারও গাছে ওঠেনি—গাছ তলায় যায়নি—কিন্তু ওদের সে সম্পর্ক একটুকুও নষ্ট হয় নি। ওদের সেই যোগসূত্র আজও যেন রয়েছে অচ্ছেদ্য। রাই বড় হয়েছে—দেবুও বড় হয়েছে। কতবার দেখা হয়েছে। বয়সের ব্যবধানে লজ্জাবতী বধুর মত সংকোচ এসে ওদের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে—কিন্তু

ওদের আত্মীয়তাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। তাইত দেবুর অনুভূতির নাড়ীটা আজিও টনটনিয়ে ওঠে। ছোট বেলার দিনগুলির মতই রাইর চিন্তা বিচ্ছেদের বেদনার মত ওর সারা দেহে একটা ঝঙ্কার খেলে আবেশময় করে তোলে। ওর মনে গুন গুন করে গুঞ্জরিয়ে ফেরে কবি-গুরুর কবিতার একটা কলি, "এই করেছো ভাল নিঠুর, এই করেছো ভাল।" গীতাঞ্জলিটা টেনে নেয় দেবু বইয়ের থাক থেকে। পর পর বেছে বেছে কয়েকটা কবিতা আবৃত্তি করে যায়। গীতাঞ্জলিটা রেখে দেয়। চণ্ডীদাস—বিদ্যাপতির সংগ্রহ থেকে পড়ে যায় আবার কয়েকটা। তাও রেখে দেয়। আবার বের করে রবীন্দ্রনাথ—গলার স্বর চড়িয়ে আবৃত্তি করে, "ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়।" আরও কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে কিছুক্ষণ। আবৃত্তি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে দেবু। গলা নীচের দিকে নামতে থাকে। বিছানায় শুয়ে পড়ে—পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে চলে যায় বল্লভপুরে। সেই মাঠ—সেই মাটি—সেই গাছ—সেই খেলার সাথী—সেই বাড়ী—ওর দাদা-বৌদি—ছোট্ট ভাইঝী লেখা—সেই পুজোর উৎসব—লোকে লোকারণ্য—'জয় দেলো রামের মা তোর গোপাল এল ঘরে'—বিজয়ার সেই আনন্দ মুখরিত পরিবেশ। ওদের ঘর ও মণ্ডপ ঘরের মাঝের গলিতে সেই ভিজে কাপড়ে যেয়ে ও দাঁড়িয়েছে। কাপড় হাতে নিয়ে সেই রাই দাঁড়িয়ে—কাছারীর হ্যাজাকের এক ফালি আলো এসে রাইর মুখে পড়েছে—নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দেবু কিছুক্ষণ অভিভূতের মত। তাড়াতাড়ি হাত বারিয়ে কাপড়টা নিয়ে নেয় সেই রাইর হাত থেকে। —চল্‌বে।

বেতারের দায়িত্ব ও শ্রোতৃবর্গ

—লাউড স্পীকার—

★

লাউডস্পীকার-এর একমাত্র কাজ হলো শব্দ, সংগীত, সংলাপ—শব্দ সম্পর্কিত সব কিছু উচ্চগ্রামে তুলে সকলের কাজে সশব্দে ঘোষণা করা। এতকাল ধরে "রূপমঞ্চে" একাজটি একান্ত নিষ্ঠার সংগে করে আসছিল। এ-কাজ করতে গিয়ে—বেতার সম্পর্কীয় সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক অপ্রিয় আলোচনা, অনেক কঠোর নিষ্ঠুর সত্য, অনেক পোষ্য-পোষণের ঘৃণ্য কাহিনী জন সমাজে 'লাউড-স্পীকার' নির্বিকার চিত্তে উদ্ঘাটন করে এসেছে—বেতারকে সুন্দর, জনপ্রিয় এবং সত্যকারের কৃষ্টি-কেন্দ্রের উৎসে পরিণত করবার জন্যে।

এতদিন এদেশের সমস্ত কৃষ্টিকেন্দ্রের ঘাঁটিগুলো বিদেশীদের দখলে ছিল। তারা তাদের প্রয়োজন মত এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিকে নিজেদের প্রচার কাজে নিয়োগ করেছিল। নিয়োগ করেছিল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত এবং এদেশের শুভার্থীদের কুভাবে চিত্রিত করার কাজে। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীরা এই বিভ্রান্তকর প্রচার কাজ সুষ্ঠভাবে এবং ত্রুটিহীন পরিকল্পনায় করতে সক্ষম হয়েছিল এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মিরজাফরী বুদ্ধি-বৃত্তিতে।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও সংবাদ প্রকাশের ওপর নানা-রূপ বিধিনিষেধ আরোপ করলেও এদেশের সংবাদপত্রগুলি মধ্যে মধ্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আসল রূপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার বার বার চেষ্টা করেছে। এদেশের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ছিল—বিদেশীর বেতার কেন্দ্রগুলি। যদিও এদেশের স্বদেশী ভাইরা সেখানকার কর্মকর্তা হয়ে স্বদেশদ্রোহকর বিভ্রান্ত প্রচার কার্য চালিয়েছিল। সেকালে ইংরেজ যখন এদেশের প্রভু ও কর্তা ছিল, তখন এদেশের বেতার কেন্দ্রগুলি এদেশের ও এ জাতির সবচেয়ে ক্ষতি করেছে।

আজকের রাষ্ট্র গঠন কাজে, শিক্ষা বিস্তারে, স্বাস্থ্য আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হতে পারে বেতার—বেতার অতি সহজে অতি দূর পল্লীর অধিবাসীদের অন্তরের অন্তরে অতি সহজেই পথ করে নিতে পারে।

দেশের শাসন ব্যবস্থা হস্তান্তরিত হবার পর বেতার কেন্দ্রের ঘৃণ্য ও লজ্জাকর অনুসৃত নীতিতে লেগেছে পরিবর্তনের রঙ। সে রঙ্ এত ফিঁকে আর আল্‌তো যে তাকে ঠিক প্রকৃত পরিবর্তন বলতে রুচিতে বাধে—এই ফিঁকে পরিবর্তনের সংগে বেতারের কণ্ঠে সাম্প্রতিক কালে বাজতে সুরু করেছে এক নতুন সুর। এই সুর স্পষ্ট ও আবেদন-মুখর হয়ে উঠতে পারেনি বলেই এদেশের জনসাধারণের সত্যকারের শ্রদ্ধা পায়নি। লোক দেখানো ছেলে ভুলোনো গালভরা নাম দিয়ে কতকগুলো অর্থহীন অনুষ্ঠানের আয়োজন আগেও যেমন ছিল, শাসন ব্যবস্থা হস্তান্তরিত হবার পরও তেমনি চলছে। মোটকথা সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের দৃষ্টিভংগীতে এবং তাদের প্রয়োজনের মাপ-কাঠিতে বেতার কেন্দ্রের যে কাঠামোটা ছিল—সামান্য রংয়ের বদল ঘটলেও সেই অতি পুরাতন কাঠামো আজও তেমনি বজায় আছে এবং পুরাতন কাঠামোর সংরক্ষক হয়ে আছেন একালেও বিদেশী শাসকের আমলের বিদেশী মনোবৃত্তি সম্পন্ন পুরাতন চাটুকার চাকুরী জীবিরা। অবশ্য এখানে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করি, বেতারের এই পরিবর্তনের রূপ ও রঙ, সুর ও ছন্দ খুব অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল হলেও জনসাধারণের হৃদয় তা স্পর্শ করতে পেরেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেতার মারফৎ যাঁরা বিকৃত ও হেয় প্রতিপন্ন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—স্বাধীন ভারতে সেই সমস্ত বেতার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতারের মধ্যেই কি রাখা উচিত হবে?

এর উত্তরে আমরা বলবো, এদেশে সত্যকারের শুভার্থীর সংখ্যা অতি স্বল্প—জীবিকা অর্জনের জন্যে দেশের বিরুদ্ধা-চরণের জন্যে ফাঁসীকাঠে লট্‌কে দেয়া রাষ্ট্রের আইন হয়ে যদি বর্তমান কালে দেখা দেয়—তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, কার্যক্ষম শিক্ষিত জীবিতের সংখ্যা অসম্ভব
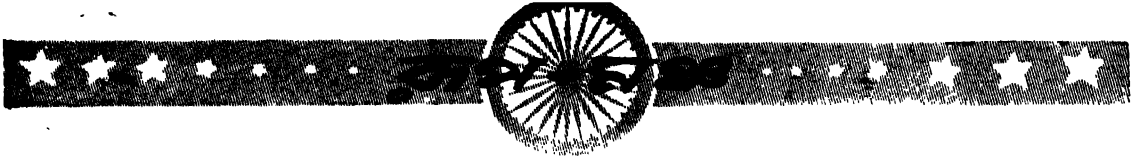
হারে হ্রাস পাবে। শাসন-ব্যবস্থাকে চালু রাখতে গেলে বর্তমানের এই সমস্ত তথাকথিত "স্বদেশ বাসীদের" অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত বিস্মৃত হয়ে তাদের বর্তমান দৃষ্টিভংগী ও মানসিক প্রস্তুতির বিচার খুঁচিয়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে, এই সমস্ত কর্মচারীরা তাদের অধীত বিদ্যা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশ উন্নয়নের কাজে কতখানি বাস্তব সহযোগিতা দিয়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সচল রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পূর্বে যারা 'বিদেশী শাসকদের জন্যে কিছু করতে পারছিল না' বলে আক্ষেপ করতো, আজকের দিনে সেই সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা জনসাধারণের সর্ববিধ উন্নতির মূলে বেতারকে কি ভাবে নিয়োজিত করে তা দেখতে হবে।

আজকের দিনে দেশ গঠনের কাজে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হতে পারে বেতার। বেতারের দায়িত্ব আজ বিরাট, বিপুল ও সুমহান। শুধু চিত্ত বিনোদন নয়, শুধু লোক ভুলানো ফাঁকি-বাজির কথার খেলা নয়—সত্যকারের কাজ বেতারের দ্বারাই করা সম্ভব।

দেশ গঠনের কাজে বেতারকে কি ভাবে নিয়োজিত করা যায় —তা নিয়ে দেশ নায়কগণ হয়তো চিন্তা করছেন, হয়তো এ ব্যাপারে তাঁদের ম—স্ত পরিকল্পনা আছে। হয়তো দু'এক বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার চেষ্টা হবে। কিন্তু যাঁদের মারফৎ এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া হবে—তাঁদের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার অভাব ঘটা বিচিত্র নয়—কেননা এই সমস্ত বেতার কর্তাদের অতীত ইতিহাসই এদেশের জসাধারণকে একটু সন্দেহ-ব্যাকুল ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে। পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে গেলে এ দেশের জননায়কগণের সতর্ক দৃষ্টির

যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এদেশের জনগণের ও শিল্পী বন্ধুদের সতত সতর্ক দৃষ্টির।

আমার মনে হয়, দেশ নায়কগণ দেশ উন্নয়ন কাজে যে পরিকল্পনাই পেশ করুন না কেন, তা বাস্তব সুন্দর হয়ে উঠবে না, যদি না এদেশের জনগণের ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের বাস্তব সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকে।

এদেশের শ্রোতাদের অখর্ব নিরীহ শ্রোতা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দেশ নায়কগণের পরিকল্পনা দেশ গঠনের সত্যিকারের কাজে কতখানি অগ্রসর হলো তা দেখবার জন্যে শ্রোতাদেরই এগিয়ে আসতে হবে, শিল্পী সাহিত্যিক বন্ধুদের এ দিক দিয়ে দায়িত্ব কম নয়।

দেশ গঠনে বেতারের দায়িত্ব অনেকখানি। বেতারের এই দায়িত্বকে সত্যিকারের 'কাজে' পরিণত করবার জন্য বেতার শ্রোতাদের আজকের দিনে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসা দরকার, প্রয়োজন শিল্পী বন্ধুদের মতো শ্রোতৃ সংঘ তৈরী করার। এই শ্রোতৃ সংঘ বেতারের সমস্ত শ্রোতাদের প্রতিষ্ঠান হয়ে বেতার কেন্দ্রের কর্তাদের সংগে সহযোগিতা করে, সাহায্য দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, দাবী জানিয়ে দেশ গঠনের কাজে বেতারের দায়িত্ব পালনে নিজেদের যুক্ত করতে পারেন—যুক্ত করা প্রয়োজন অন্ততঃ দেশ গঠনের কাজে বেতারের কর্তৃপক্ষকে ত্রুটিহীন করবার জন্যে। আজকের দিনে বেতারের দায়িত্বের সংগে শ্রোতাদেরও দায়িত্ব আছে, আছে শিল্পী সাহিত্যিকদের দায়িত্ব দেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও কুসংস্কারমুক্ত করার। শুধু 'লাইসেন্স' ফি দিয়েই এ দায়িত্ব পালন শেষ হবে না—দেশ উন্নয়নের কাজে বেতারকে নিয়োজিত করার দায়িত্ব শ্রোতাদের গ্রহণ করতে হবে। দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন দেশের জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পায়—আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? শ্রোতৃ-সংঘ গঠনে "রূপমঞ্চ" বদ্ধপরিকর —এই সংঘ গঠনে এদেশের শ্রোতাদের ও জনগণের চিত্তে সাড়া জাগুক—অবিলম্বে এই দিকে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের দৃষ্টি আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করছি।

বেতার জগৎ

পরিচালিকা - মনিদীপা

সুদীর্ঘ অবকাশের পর স্বাধীন ভারতের পাঠক সমাজকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করছি। এই কয়েকটি মাসের অবসরেও সম্পাদক মহাশয়ের মারফত বেতার শ্রোতৃবৃন্দের অনেক চিঠিই পেয়েছি। তাঁদের অভিমত, অভিযোগ ভরা—তাতে এই বিভাগটির প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয়ও পেয়েছি। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন পথে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে সন্দেহ নেই। বেতারের আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপথে তুলে ধরে তাকে যথার্থই জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য সবল মতবাদ প্রচার করাই এই বিভাগটির উদ্দেশ্য। শ্রোতৃবৃন্দের আন্তরিকতায় তা সফল হয়ে উঠ্‌বে এই আশা আমাদের আরো দৃঢ়তর হয়েছে। তাই তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা নিয়ে আমাদের চলার পথে আবার পা বাড়ালাম।

সাধারণ ভাবে বিচার করে দেখলে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রোগ্রামের অনেক আকর্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাবে। আগেকার অনেকগুলো অনুষ্ঠান তুলে দিয়ে অথবা পরিমার্জিত করে কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের অভিনন্দন লাভে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসংগে সর্বাধিক জনপ্রিয় "সংগীত শিক্ষার আসর" প্রবর্তন ও শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিকের এই আসরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে কর্তৃপক্ষ শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধ রক্ষা করে যে সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন—তা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গল্পদাদুর আসরের দাদুমণি শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে পেয়েও ছোটরা আনন্দিত হয়েছে। শিশুমন কি চায়—এই তথ্য শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের অজানা নেই। তাঁর পরিচালনাধীনে এই আসরটি আবার আগেকার রূপে পরিণত হতে চলেছে। কয়েকমাসের জন্য এই আসরটি নানারকম লোকের হাতে পড়ে যেন বারো ভুতের আড্ডাখানা হয়েছিল। আবার তাকে সুযোগ্য পরিচালকের হাতে দেখতে পেয়ে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে উঠেছি। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের উপর আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে—তিনি এর কর্ণধার হয়ে গল্পদাদুর আসরকে সত্যিকারের শিক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় করে তুলবেন। যে পরিবর্তন জাতীয় জীবনে এসেছে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করে তুলতে হলে চাই ভবিষ্যৎ জাতির প্রকৃত শিক্ষা—এই আসরটি এই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকখানি সহায়তা করবে এই আশা রাখি। শ্রোতাদের অভাব-অভিযোগ, অনুরোধ-উপরোধ কর্তৃপক্ষ যে উপেক্ষা করেন নি তারও কয়েকটি উদাহরণ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি। তবুও কতকগুলি অনুষ্ঠান আগেকার আবিলতা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। এই সম্পর্কে শ্রোতাদের অধিকাংশ অভিযোগ "অনুরোধের আসর" ও "১২-৩০ মিনিটের" রেকর্ড অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এই দু'টী আসরেই রেকর্ড বাজানো হয়। প্রথমটিতে শ্রোতাদের অনুরোধের এবং দ্বিতীয়টীতে এই আসরের কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত গানের রেকর্ড বাজানো হয়। অধিকাংশ শ্রোতারাই অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের অনুরোধের গান তাঁরা শুনতে পান না—অনেকে বলেছেন, তাঁরা শুনতে পান অনেকদিন পরে যখন নাকি শোনার আগ্রহ ও ধৈর্য তাঁদের নিঃশেষিত হয়ে যায় অপেক্ষা করে করে। "সবিনয় নিবেদনের" "লাউডস্পীকার" এই অভিযোগ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, অসংখ্য অনুরোধই এই বিলম্বের কারণ। প্রতি দিন এত অনুরোধ আসে যে, তা বাজাতে বাজাতে অনেক দেরী হয়ে যায়। এই কারণ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু যাতে সকলের অনুরোধ রক্ষা করা হয় তার দিকে কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার। তারপর এর গানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যায়। এই আসরে দিনের পর দিন পুরনো গানই বাজানো হয় কেন? শ্রোতারা কি নূতন গান শুনতে চান না? রেকর্ড কোম্পানী থেকে নূতন রেকর্ড বাজারে বেরোলেই শ্রোতারা নিশ্চয়ই সে সব গান শুনতে চান। কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত কোন নূতন গান শুনেছি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। বাজারে বেরোনোর দু'তিনমাস পরেও তা রেডিওতে শুনতে পাই
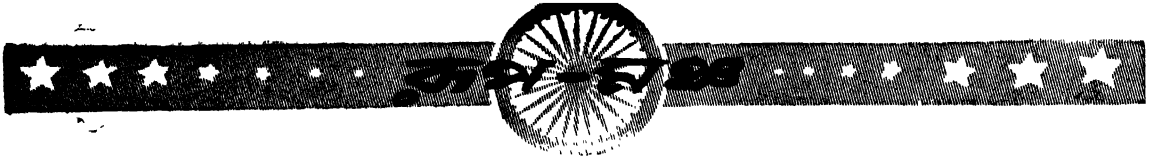
না—আমরা শুনতে পাই—জগন্ময় মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কয়েক বছরের পুরানো গান। কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবেন, শ্রোতারা পুরানো গানও শুনতে চায়। স্বীকার করি, কিন্তু তা সংখ্যায় নূতনকে ছাড়িয়ে যায় না—এই সত্য কথাটি কারোরই অজানা নয়। তাছাড়া নূতন গান শুনতেই আগ্রহ জাগে বেশী। যে গান হাটে, মাঠে, বাজারে সর্বত্রই শুনতে পাওয়া যায়, তা শুন্‌বার মত আগ্রহ খুব কম শ্রোতারই থাকতে পারে। বাংলা, হিন্দী যে গানই বাজানো হয়—তাতে শতকরা এক খানাও নূতন থাকে কি না সন্দেহ। দ্বিপ্রাহরিক অধিবেশনের রেকর্ড অনুষ্ঠান সম্পর্কেও এই অভিযোগ। কথাচিত্রের গান, ভজন, কীর্তন, উচ্চাংগ সংগীত, আধুনিক সকল শ্রেণীর গানই বাজানো হয় কিন্তু এক্ষেত্রে নূতনের প্রবেশাধিকার নেই। পুরানো তালিকাভুক্ত গানই এখনও তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন কি দু'একদিন পর পর একই গানও বাজাতে শোনা যায়। নির্দিষ্ট কয়েকটি কথাচিত্রের গান ছাড়া নূতন কোন কথাচিত্রের গান বাজানো হয় না। অসংখ্য নূতন রেকর্ড প্রতি মাসে প্রকাশ করা হয়—তাতে সকল শ্রেণীর গানই থাকে কিন্তু বেতারের কোন আসরে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। এই দুটা বিভাগের কর্তৃপক্ষ কি তাদের তালিকার কোন পরিবর্তন করবেন না? এর সঠিক কারণ নির্ধারণ করতে না পেরে শ্রোতাদের বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। সত্যিই—এর কারণ কি? সে কারণের কি কোন প্রতিকার নেই? আমার তো মনে হয়, কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু সজাগ দৃষ্টি দিলে সহজেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। শ্রোতাদের মন কি চায় তা বুঝতে পারা একটুও কষ্টকর নয়। তাদের এই গাফিলতী অথবা খামখেয়ালার বোঝা নিঃশব্দে সহ্য করে তাদের স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেবার মত পোষ্য মনোবৃত্তি শ্রোতাদের নেই। বিদেশী শাসকের স্পর্ধিত স্বৈরতন্ত্রের প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়ে এই ধরণের লোকেরা তাদের প্রভাবও বিস্তার করতে চায় জোর করে। বেতারের অভ্যন্তরের এই সব প্রতিক্রিয়াশীল লোকেদের রাজত্বকাল যত কমদিন হয় ততই শ্রেয়,—বেতার আজ মুষ্টিমেয় লোকের হাতের ক্রীড়নক নয় —তাকে আজ জনশক্তির ইচ্ছার বাহক হ'তে হবে। তাই, তার ভিতরকার দুষ্টক্ষতগুলো দূর করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সম্প্রতি আবির্ভূত "পার্থ-সারথী"র বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ জমা হয়ে আছে। "মজদুর-মণ্ডলী"র পরিচালনার ভার এঁর হাতে। শ্রমিকদের সুখ-দুঃখ দেশবাসীকে জানতে দেওয়া, তাদের উন্নততর জীবন যাত্রা কি করে সম্ভব এবং শ্রমিক ভাইদের আনন্দ ও শিক্ষা দেওয়াই এই আসরটী প্রবর্তনের উদ্দেশ্য। "পার্থ সারথী"র পরিচালনায় সে উদ্দেশ্য যে কতখানি সফল হতে চলেছে সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠেছি। ধনের আভিজাত্যে স্ফীত পার্থ সারথী শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার যে কোন রকম খোঁজ খবর রাখেন, তা মনে হয় না। যদি তাই হতো, তবে এই মণ্ডলীর সার্থকতা তাঁর হাতে পড়ে মার খেতো না। তিনি মজদুর স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থকে যে বেশ পূরণ করে নিচ্ছেন—তা প্রত্যেক শ্রোতারাই স্বীকার করবেন। মজদুর মণ্ডলীর আসরটি আরম্ভ হবার সংগে সংগে তার আগমনী দেবদূতের আগমনীর মত ঘোষিত হ'তে থাকে। এবং এই আগমনার ভাষা ঠিক এই রকম 'তিনি আসবেন তিনি আসছেন—তিনি এসেছেন—তিনি বলবেন—তিনি বাংলার মজদুরদের ত্রাণ করতে তার মুখ খুললেন—তিনি তার নিজের রচিত গল্প, নাটক শুনিয়ে মোহিত করলেন মজুরদের (যদিও হলফ করে বলতে পারি, তার আসার সময় কোন মজুরই বেতার যন্ত্রের কাছে থাকেননা)।' তিনি রবীন্দ্র নাথের কবিতা আবৃত্তি করে একেবারে শ্রাদ্ধ করে ছাড়লেন। ব্যক্তিগত মানুষটাকে আমরা জানি—আমরা চিনি। তাঁর শক্তির দৌড় আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। কেউ কেউ বলছেন, দিল্লী থেকে সর্দার প্যাটেলের এমনই অনুগ্রহ তিনি লাভ করে এসেছেন যে, বেতারে শুধু মজদুর মণ্ডলীতেই নয়, নানান বিভাগে তাঁর প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ কচ্ছে। কথাটা কতদূর সত্য আমরা জানিনা। তবে তাঁর যথেচ্ছাচার ও বাগাড়ম্বরের যে পরিচয় পাচ্ছি মজদুর মণ্ডলীতে—তা যদি তিনি সংহত না করেন এবং স্থানীয় বেতার কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্তা এমন শ্রমিক বিরোধী কার্যবন্ধ করতে যদি হস্তক্ষেপ না করেন, আজকে শুধু

রূপ-মঞ্চ
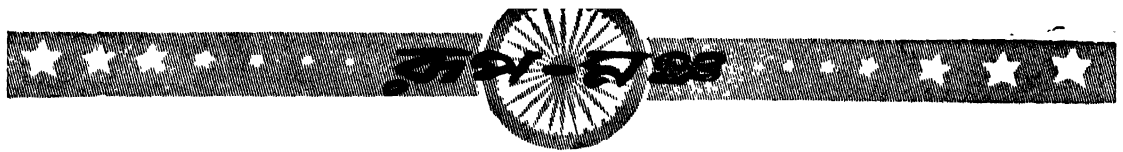
মিষ্টি কথায় আমরা জানিয়ে দিতে চাই—তাহ'লে তাঁর ব্যক্তিগত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কে তাঁর বলবার অনধিকারকে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য হবো। এবং একথাও আমরা বলে দিতে চাই—সর্দার প্যাটেলের দাওয়াই আমাদের হাতেও নেহাৎ কম নেই। জুনাগড়, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যে দাওয়াইর প্রতিক্রিয়া আজ সুবিদিত—যে দাওয়াইর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দীর্ঘ দ্বিশতাব্দীর ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান—সেই জনমত ও জনশক্তির দাওয়াই দিয়ে পার্থসারথীকে যে উচিত শিক্ষা দিতে পারবো সে শক্তি আমাদের আছে। কিন্তু তার পূর্বে তাঁকে আত্মসংশুদ্ধির সুযোগ দিতে চাই।

তিনি নিজস্ব রচনাবলী পাঠ করে শোনানো এবং দেশবিদেশের খবর বলা এই আসরের প্রোগ্রামভুক্ত করেছেন। এতে মজুর স্বার্থ সাধনে বিন্দুমাত্রও সহায়তা করেনা। দেশ বিদেশের খবর বলার মূল্যকে অস্বীকার করবো না। তবে তাতে প্রাধান্য থাকবে দেশ বিদেশের মজুরদের কথার। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি মালিকদের মহিমা-কীর্তনেই বিভোর থাকেন। আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলাই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কাজেই পার্থ সারথীর "মজদুর মণ্ডলীর" পরিচালনার ফলে মজুরদের স্বার্থসাধনের পথে সহায়ক না হয়ে মাঝে মাঝে স্বার্থবিরোধী প্রচার কার্যই হয়ে থাকে। এতে লাভ তো নেইই—বরঞ্চ উল্টো ফল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই আসরটীর দায়িত্ব এবং গুরুত্ব অনেকখানি। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগে সংগে দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ শ্রমিক, মজুর ও কৃষকদের সমস্যাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে—দেশের আর্থিক ও আংগিক মানের চাবিকাঠি যাদের হাতে। তাদের উন্নতির জন্য চাই জন-সাধারণের সহানুভূতি—তাদের দৃষ্টি এই অবহেলিত শ্রেণীদের প্রতি জাগিয়ে তোলা আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। তাই আমাদের মনে হয়, এর পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত এমন একটী লোকের উপর, যাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে শ্রমিকদের—যিনি বুঝতে সমর্থ হবেন এই গুরুদায়িত্বের মূল্য কতখানি—সমর্থ হবেন এই মণ্ডলী স্থাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথের কণ্টক দূর করতে। পার্থ সারথীর ইচ্ছামত অযথা কতকগুলি প্রোগ্রাম সৃষ্টি না করলেই কর্তৃপক্ষ সুবিবেচকের কাজ করবেন। এই আসরটী তার প্রভাবমুক্ত করাই আমাদের কাম্য।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের নাটক বিভাগ অভাবনীয়ভাবে উন্নতি লাভ করেছে। এই কয় মাসের মধ্যে যে কয়খানা নাটক তাঁরা নির্বাচন ও অভিনয় করেছেন, অধিকাংশগুলোই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, এই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের অভিমত, মতামতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের কাজে অগ্রসর হয়েছেন। বেতারের জন্য বিশেষভাবে লেখা নাটকের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে তাঁরা বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচিত নাটক অথবা উপন্যাস নির্বাচন করে তাকে রূপায়িত করে তুলেছেন। এভাবে অগ্রসর হলে এই বিভাগ আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। এই সংগে আরোও লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা আমাদের জনপ্রিয় চিত্র ও মঞ্চশিল্পীদেরও আবার সমাবেশ করাচ্ছেন—শ্রোতাদের মতামতকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি এটা তার আর একটা উদাহরণ। তাঁদের এই আন্তরিকতা ও উদ্যমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করছি। আরো আশা করছি, তাঁরা বর্তমান জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের দিয়ে নাটক লেখানোর উদ্যম থেকে বিরত হবেন না—তা হলে এর ফল হবে আরো শুভ। কালের পরিবর্তনে আমাদের জাতীয় জীবনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন—আমাদের জীবনকে এই পরিবর্তনের যথাযোগ্য করে তোলার পথে বেতার একটী অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। আজো বেতারে যে গলদ রয়েছে, তা দূর করবার জন্য আমরা নির্ভীক আলোচনা করা থেকে বিরত হব না। বেতারকে আমরা দেখতে চাই জাতির প্রাণকেন্দ্ররূপে। সেখানে থাকবে না কোন অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থপরতা, জেদ ও সংকীর্ণতা। বেতারের সত্যিকারের যে রূপ অযোগ্যতার চাপে রুদ্ধ—তার সুষ্ঠু-বিকাশ সাধন আজো আমাদের লক্ষ্য। —মণিদীপা

আমাদের থিয়েটারের সংস্কার ও সংগঠন

গোপাল ভৌমিক

★

বার্ণাড´শ তাঁর 'উইডোয়ার্স´ হাউসেস' নামক নাটকের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন : It is the drama that makes the theatre and not the theatre the drama." ব্যঙ্গনিপুণ বার্ণাড´শর সকল উক্তির মত এ উক্তিটিকেও বাছাই ও যাচাই করে নেবার প্রয়োজন আছে। তাঁর এ উক্তি যে মূলতঃ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একে পুরোপুরি সত্য মেনে নিয়ে যদি আমরা মনে করি যে, ভাল নাটক রচনায় সুসংগঠিত থিয়েটারের কোন প্রেরণাই থাকেনা, তা'হলে বড় রকমের ভুল করা হবে। নাটক প্রধানত অভিনয়ের জন্যেই লেখা হয় এবং সমসাময়িক যুগের থিয়েটারের প্রগতি ও প্রয়োগ কৌশল নাট্যরচনাকে প্রভাবান্বিত করে অনেকখানি। নাটক ও থিয়েটার পরস্পরের সংগে অংগাংগী সম্বন্ধযুক্ত এবং এদের একটিকে ছেড়ে অপরটির চলতে পারেনা।

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই আজ থিয়েটারকে জাতির জীবনে জীবন্ত সত্যরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদের স্কন্ধে। আমাদের দেশের থিয়েটার বর্ত´মানে একটা ম্রিয়মান অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। তার কুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতীয় নাট্যসাহিত্যের উপর। উপন্যাস, গল্প, কবিতা কিংবা প্রবন্ধ—সকল দিক দিয়েই বাংলা সাহিত্য আজ শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করতে পারে। দুঃখের বিষয় নাটকের ক্ষেত্রে আমরা সে গর্ব´ করতে পারিনা। আমাদের নাট্যসাহিত্য পড়ে আছে অনেক পিছনে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে´ও এ দুর্দশা ছিলনা। সেদিন বাংলা থিয়েটার ও নাট্যসাহিত্যে দেখা দিয়েছিল নব প্রাণের স্পন্দন। অথচ সেদিন আত্মরক্ষার জন্যে থিয়েটারের সম্মুখে সংগ্রামের অন্ত ছিলনা। থিয়েটারের মারফৎ যে জাতীয়ভাবধারা প্রচারিত হত, তা বন্ধ করার জন্যে বিদেশী শাসকদের শাসনদণ্ড উঁচানোই থাকতো। তবু সেসব বাধা নিষেধকে উপেক্ষা করে বাংলার থিয়েটারকে আমরা এগিয়ে যেতেই দেখেছি। কিন্তু আজ তার এ দুর্দশা কেন এবং তাকে এ দুর্দশার হাত থেকে উদ্ধার করার উপায়ই বা কি ?

আজ বাংলা দেশে আমরা যে থিয়েটার প্রচলিত দেখি তা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অপূর্ব´ সংমিশ্রণের ফল। কিন্তু তাই বলে থিয়েটার আমাদের দেশে নিছক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দান নয়। নাট্যাভিনয় আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ কালিদাস, ভাস প্রমুখ মহাকবিদের রচিত সুন্দর নাটকগুলি। গ্রাম্যজীবনেও অভিনয় ছিল অপরিহার্য অংগ বিশেষ। তার প্রমাণ যাত্রা, মনসার ভাসান, রামায়ণ গান প্রভৃতি। এই অভিনয় রীতির সংগে বর্ত´মানের থিয়েটার—অভিনয় রীতির পার্থক্য আছে এই মাত্র। সে যাই হোক, বাংলা দেশে শাসক ইংরেজদের শিক্ষা সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল বলে পাশ্চাত্য রীতির থিয়েটারেরও প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বহু শক্তিশালী নট ও নাট্যকারদের আবির্ভা´বে বাংলা থিয়েটার হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী ও শক্তিসম্পন্ন। স্বদেশী ভাব ধারার প্রচারেও বাংলা থিয়েটার কম সাহায্য করেনি। কেন জানিনা থিয়েটার জিনিসটি বাঙ্গালীদের নিজস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও স্থায়ী পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আছে বলে আমার জানা নেই। বাংলা দেশেও স্থায়ী পেশাদার রঙ্গমঞ্চ অবশ্য কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ। মফঃস্বল সহরগুলিতে আমাদের দল মাঝে মাঝে সখের অভিনয় করে থাকেন মাত্র। ভারতের মধ্যে এক মাত্র বাংলা দেশেই থিয়েটার স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে কেন—তার উত্তর দেওয়া কঠিন। এর কারণ এই হতে পারে যে, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে অধিকতর পরিমাণে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও নাটকীয় উপাদান আছে কিংবা এর অন্য কোন কারণ থাকাও বিচিত্র নয়।

যাই হোক, আমাদের জাতীয় জীবনে আজকে থিয়েটারকে
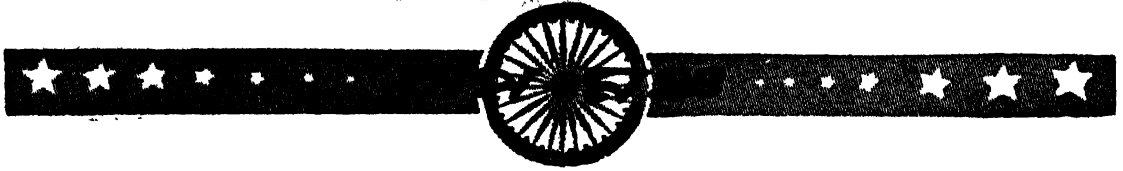
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ছড়িয়ে দেবার ও সংগঠিত করার প্রয়োজন আছে। শুধু বাংলা দেশেই থিয়েটার আবদ্ধ হয়ে থাক এটা আমার কাম্য নয়—ভারতের সর্বত্র থিয়েটারকে সুসংগঠিত করা শুধু সামাজিক প্রয়োজন নয়—রাষ্ট্রিক প্রয়োজনও বটে—আমাদের দেশ-নেতাদের আজ একথাটা বুঝে দেখতে হবে। থিয়েটার-নিছক আনন্দ বিতরণ ছাড়াও লোকশিক্ষার একটা বড় মাধ্যম। একে ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনেক রাষ্ট্রিক প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। কেন জানিনা, আমাদের দেশনেতাদের থিয়েটারের প্রতি যেন একটা সহজ বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আছে। অবশ্য এঁদের মধ্যে যে ব্যতিক্রম নেই—তা নয়। এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ আবার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জীবনে দেখে গেছেন জাতীয় নাট্যশালা গড়বার মহাস্বপ্ন। তবে তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য—এই যা। আমাদের অধিকাংশ দেশনেতাই থিয়েটার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। তাঁদের ফুটবল মাঠে দেখা যায়, ক্রিকেট মাঠেও তাঁরা বিরল নন। দৈহিক ক্রীড়া কৌশল শিক্ষায় তাঁরা উৎসাহ দেন, এমন কি সিনেমা প্রেক্ষাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটনও তাঁরা করে থাকেন। কিন্তু থিয়েটারে তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়না বললেই চলে। থিয়েটারকে তাঁরা যেন সযত্নে পরিহার করে চলেন। তাঁরা এদিকে দৃষ্টি দিলে থিয়েটার ও নাটকের রূপ যে পালটে যেতে পারে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। আজ জনশিক্ষার জন্যে সিনেমার উপর সরকারী হস্তক্ষেপের কথা শোনা যায়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট জনশিক্ষার জন্যে আংশিকভাবে চিত্রনির্মাণ কার্যেও হাত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা থিয়েটারের সংস্কারসাধন ও সংগঠনে আজও মনোনিবেশ করেননি কেন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

অনেকে থিয়েটারের বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার জন্যে দায়ী করেন বাণীচিত্রকে। আমাদের দেশের থিয়েটারের মালিকদেরও এই অভিযোগ করতে শোনা যায়। কিন্তু এর মধ্যে কোন সত্য আছে বলে আমি মনে করিনা। একথা সত্য যে, থিয়েটারের তুলনায় অনেক বেশী নরনারী আজ বাণীচিত্র দেখে অবসর বিনোদনের চেষ্টা করে। তার অর্থ এই নয় যে, তারা থিয়েটার বিরোধী হয়ে উঠেছে। কোন ভাল নাট্যাভিনয় দর্শকের অভাবে চলেনি এমন কথা আমি কখনও শুনি নি। যে যে সুবিধার জন্যে অধিকতর সংখ্যায় নরনারী টকি বা বাণীচিত্র দেখতে যায় সেই সব সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমাদের মঞ্চমালিক ও প্রযোজকবৃন্দ আদৌ আত্মসংশোধনের চেষ্টা করেন নি। আজকের অর্থনৈতিক দুর্দিনে মানুষের কাম্য হল কম পয়সায় বেশী আনন্দ লাভ করা। থিয়েটারের তুলনায় বাণীচিত্র দেখতে অনেক কম খরচ হয়। তদুপরি পাওয়া যায় অধিকতর আরাম। একটি আধুনিক চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগারের সংগে যদি একটি আধুনিক থিয়েটারের তুলনা করেন, তবেই আমার উক্তির সত্যতা ধরা পড়বে। সিনেমা-গৃহে বসবার ব্যবস্থা থিয়েটারের তুলনায় অনেক উন্নত ধরণের। অন্যান্য সুবিধাও অনেক বেশী। আর থিয়েটারে গিয়ে আপনাকে শ্বাসরোধ বদ্ধ আবহাওয়ায় অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হয়। তার জন্যে আপনাকে পয়সাও খরচ করতে হয় বেশী, অথচ আরামপান কম। আমাদের থিয়েটার-মালিকগণ দর্শকদের এইসব সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বাণীচিত্র কিংবা থিয়েটার কোনটার প্রতিই আমার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে যাঁরা মনে করেন যে, বাণীচিত্র থিয়েটারের বড় প্রতিদ্বন্দী, আমি তাঁদের সংগে একমত নই। বাণীচিত্র কোন পর্যায়েই থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দী হতে পারেনা। থিয়েটার দেখে আমরা যে আনন্দ পাই, সে আনন্দের ধরণই আলাদা। সেলুলয়েডে রূপায়িত কাহিনী কখনও জীবন্ত নাট্যাভিনয়ের শিল্পরস পরিবেশন করতে পারেনা। থিয়েটার মনকে যে উঁচু রসোপভোগের স্তরে টেনে নিয়ে যেতে পারে, বাণীচিত্রের সে শক্তি নেই। মঞ্চে অভিনীত একখানি ভাল নাটক আমাদের হৃদয়ে যে সাড়া জাগায়, মনের উপর যে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে বাণীচিত্রে রূপায়িত সেই নাটক কখনও সেই সাড়া জাগাতে পারেনা। সেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ 'প্রফুল্ল' নাটকখানির কথাই ধরা যাক না। মঞ্চে অভিনীত এই নাটকের শিল্পরসের সংগে চলচ্চিত্রে রূপায়িত

নাটকের শিল্পরসের তুলনা চলে কি? রক্তমাংসের নরনারীর অভিনয়ে ও যান্ত্রিক নরনারীর অভিনয়ে তফাৎ অনেকখানি। তাই আমার মনে হয় যে, বাণীচিত্র কখনও থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনা। আমরা এদের পরস্পরের পরিপূরক বলে ধরতে পারি কিংবা বড় জোর ধরতে পারি পরস্পরসম্বন্ধ বিযুক্ত বলে। এদের মধ্যে খাদ্যখাদকের সম্বন্ধ আছে বলে আমি মনে করি না। তা যদি না হত, তবে আজ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড কিংবা সোভিয়েট রাশিয়ায় থিয়েটারের অস্তিত্ব থাকতনা। এই তিনটি দেশেই বাণীচিত্র আশাতীত রকম উন্নতি করেছে। সংগে সংগে এই তিনটি দেশের থিয়েটারেও আমরা পাই নতুন প্রাণের স্পন্দন। বিরোধ থাকলে এটা সম্ভব হত কি? তাই আমার মনে হয় যে, একটা বিশেষ ধারায় বাণীচিত্রের উন্নতির যেমন অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তেমনই তার নিজস্ব ধারায় থিয়েটারেরও অশেষোন্নতি সাধনের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এইবার আমাদের থিয়েটার সংগঠনের প্রশ্নে আসা যাক। একাজ অত্যন্ত কঠিন আমি জানি। কিন্তু রাষ্ট্রসাহায্য যদি পিছনে থাকে তবে এ কাজ দুঃসাধ্য নয়। জাতীয় চরিত্রের ও জাতীয় সাহিত্যশিল্পের একটা দিককে আমরা যদি অন্ধ করে রাখতে না চাই, তবে অবিলম্বে আমাদের এই কাজে হাত দেওয়া উচিত। আজ কথায় কথায় জাতীয় চিত্রশালা কিংবা জাতীয় যাদুঘর স্থাপন পরিকল্পনার কথা শোনা যায়। এ পরিকল্পনা ভাল। কিন্তু সেই সংগে আমরা জাতীয় নাট্যশালা সংস্থাপনের কথা শুনি না কেন? ভাল নাট্যসাহিত্যের দ্বারা যদি আমরা জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চাই, তবে ক্ষয়িষ্ণু থিয়েটারে আমাদের নবপ্রাণের সঞ্চার করতে হবে, তাকে গড়ে তুলতে হবে দৃঢ়ভিত্তির উপর। তা নইলে আমাদের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির একটা দিক থাকবে বন্ধ্যা হয়ে। এজন্যে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ও একদল আত্মত্যাগী তরুণ তরুণীর। থিয়েটারকে নতুনভাবে সংগঠিত করাই হবে তাদের দিবসের কাজ ও রাত্রির স্বপ্ন। জাতিকে থিয়েটার-মুখী করে তোলারও একটা প্রয়োজন আছে। তবে সকল দিক বিবেচনা করে মনে হয় যে, জাতি নতুন নাটক ও নতুন থিয়েটার পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছে। তাদের সামনে খাঁটি জিনিষ তুলে ধরতে পারলেই তারা তা গ্রহণ করবে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ও কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের সাম্প্রতিক নাট্যাভিনয় সাফল্যের থেকেই আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। এবার প্রয়োজন শুধু জনগণের সংগে থিয়েটারের যোগাযোগ ঘটানো। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে থিয়েটারের ক্ষেত্র থেকে নিছক মুনাফালোভী গতানুগতিকতার পূজারীদের করতে হবে নির্বাসিত। একটা বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে থিয়েটার পুনর্গঠনে দিতে হবে হাত।

এইবার আর একটি প্রশ্নে এসে দাঁড়াতে হয়। একটি জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলতে পারলেই কি আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হবে এবং আমরা আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো? এর উত্তর হল 'না'। জাতীয় নাট্যশালা আমাদের মূল লক্ষ্য নয়—এটা মূল লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায় মাত্র। সেই মূল লক্ষ্য হল নবনাট্য আন্দোলন—যাতে এই আন্দোলন সহরের সীমা ছেড়ে পৌঁছুতে পারে গ্রামে এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সারা জাতিকে করে তুলতে পারে অনুপ্রাণিত। এর জন্যে থিয়েটারের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, কেন্দ্রীকরণ জাতির অমোঘ দুঃখের কারণ হতে পারে। থিয়েটারের ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য। থিয়েটারকে যদি জনকল্যাণেই নিয়োজিত করতে চাই, তবে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে জনগণের মধ্যে। জাতীয় নাট্যশালা থাকবে শুধু আদর্শ হয়ে। এর থেকে প্রেরণা পাবে সারা দেশ। অভিনয়োৎকর্ষ ও নাট্যোৎকর্ষে জাতীয় নাট্য-শালা দেশের সম্মুখে স্থাপন করবে একটা উচ্চাদর্শ। সেই আদর্শে মফঃস্বলের সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠবে নাট্যশালা। নাট্যরসপিপাসু জনগণ তার থেকে পাবে আনন্দ। মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারদল যাবে পল্লীঅঞ্চল পরিভ্রমণে। এর শিক্ষামূলক মূল্য হবে অপরিসীম। থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জনগণ শুধু আনন্দ ও শিক্ষাই পাবে না—তাদের হৃদয়বৃত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ হয়ে
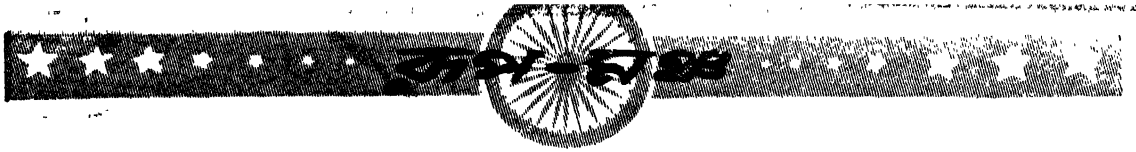
উঠবে। একটা খাঁটি রসশিল্প জনগণের মধ্যে তার প্রকৃত স্থান পাবে খুঁজে। আমাদের জাতিগঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় আমরা কয়েক পা এগিয়ে যেতে পারব।

লেখক গোপাল ভৌমিক

একটি জাতীয় নাট্যশালা ভারতীয় রঙ্গমঙ্গের জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে আমি করি না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব দেখা যায়। থিয়েটারকেও হতে হবে এই প্রাদেশিক স্বার্থের প্রয়োজনানুরূপ। বাংলা ও মাদ্রাজের রঙ্গমঞ্চের সমস্যা কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে না। তাই প্রাদেশিক প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আমাদের কাজে হাত দিতে হবে। কাজেই মনে হয় যে, থিয়েটারবিষয়ক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলে না দিয়ে, এর উপর প্রাদেশিক কর্তৃত্ব থাকতে দেওয়াই ভাল। সংগে সংগে দেখতে হবে সমস্ত প্রদেশ যাতে একটা সবভারতীয় নীতির ভিত্তিতে একই যোগে কাজ করে। এই ভাবে শুধু আমাদের জাতীয় থিয়েটারের সংস্কার ও সংগঠন সম্ভব বলে আমি মনে করি। এই পথে কাজ করে গেলে আমাদের ক্ষয়িষ্ণু থিয়েটারে যেমন আসবে নবজীবন, তেমনই নিত্য নতুন নাটকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যও হবে সুসমৃদ্ধ।

চিত্র জগত ও শিক্ষিত সমাজ

চিত্রশিল্পী নীরোদ রায়

●

বাঙলার চিত্রজগতে প্রবেশের জন্য শিক্ষিত ও উৎসাহী তরুণ তরুণীদের আগমন অতীতে বহু হয়েছে কিন্তু তাঁদের ভেতর বেশীর ভাগই তিক্ত ও বেদনাময় অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেছেন বলেই যে, এ লাইনে ভবিষ্যতে শিক্ষিত সমাজ আর সাড়া দেবেনা তা বলা চলেনা। আমাদের ভিতর উৎসাহী তরুণ-তরুণী বহু আছেন, যাঁরা বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকে মনেপ্রাণে ভালবাসেন এবং এই শিল্পের প্রসারতার জন্য তাঁরা পরিশ্রম স্বীকার করতে রাজী আছেন। তাঁদের আন্তরিকতার ওপর আমাদের কোন সন্দেহ করা চলেনা। কারণ, সংবাদপত্রে একটি মাত্র বিজ্ঞাপন দিয়েই তাঁদের কাছ থেকে আমরা সাড়া পাই।

বিজ্ঞাপন ছাড়াও অনেকে এ লাইনে আসবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অথবা চিত্রনির্মাতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুড়ে বেড়ান একটি বার সুযোগ পাবার আশায়। যে ভাবেই হোক, এক শ্রেণীর লোক চিত্রজগতের ভিতর প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়, এঁদের ভিতর খুব অল্পসংখ্যকই শেষ পর্যন্ত এই উৎসাহ নিয়ে চলতে পারেন। যাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন, তাঁদের ভিতর হয়তো চিত্রজগতের প্রয়োজনীয় গুণাবলী নেই, নয়তো তাঁরা উপযুক্ত কর্মকর্তাদের হাতে পড়েননি। আর নয়তো চিত্রজগতের আভ্যন্তরীন রূপ তাঁদের কল্পনার সাথে মেলেনি বলে নিরাশ হয়েছেন। উপরোক্ত তিনটির ভিতর প্রথমটি আমাদের খুব ভেবে নেওয়া উচিত। একটি কাজে হাত দেবার আগে নিজেকে যাচাই করে দেখে নিতে হবে' তার ক্ষমতা দিয়ে সে কাজটির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে কিনা। চিত্রজগতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্থান দাবী করতে হলে তাকে সেই ভাবে ভেবে

স্বর্গতা সবিতা ঘোষ, চলার পথের নৃত্য পরিচালনা করেছেন।

চিন্তে অগ্রসর হতে হবে। তার চেহারা, কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট উচ্চারণ, সংগীত, সহজ অভিনয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় গুণাবলী আছে কিনা দেখতে হবে। এসব Qualities যার ভিতর আছে তিনি সুযোগ পেতে বেশী ক্লেশ পাবেন কেন? অবশ্য তাকে এ লাইনের একজন উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করতে হবে, যিনি সত্যিকারের ভালমন্দ বোঝেন এবং সদুপদেশ দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারবেন। নইলে নিরাশ হয়ে ফিরে আসবার সম্ভাবনাই বেশী।

আজকাল বাংলাদেশের চিত্রজগতে বহু নতুন কোম্পানী গজিয়েছে, যার কর্মকর্তাগণ চিত্রশিল্পের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না নিয়েই এ লাইনে মাতব্বরী করছেন। তাঁদের খেয়ালের ওপর নির্ভর করছে কাহিনীরচনা, পরিচালনা, অভিনেতা—অভিনেত্রী নির্বাচন। কোনদিকেই অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ তাদের কাছ থেকে ন্যায্য বিচার আশা করা অন্যায় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা কোম্পানীর পরিসমাপ্তি ঘটান। এ'ের অর্থ ও প্রচেষ্টা চিত্রশিল্পের অগ্রগতিতে সহায়ক না হয়ে বাধাই বরং সৃষ্টি করে। নিজেদের খামখেয়ালীর বাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে অনভিজ্ঞতার দরুণ এদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। অবশেষে হিসাবে

মেলে—বহু অর্থব্যয়, বহু জটিল সমস্যা, বহু অপ্রিয় ঘটনা এবং বহুলোকের আশার মূল ধ্বংশ।

এখানে হয়তো প্রশ্ন হতে পারে যে, আমাদের উৎসাহী নতুন শিল্পীরা কোথায় গিয়ে ন্যায্য বিচার পাবে? এ কথার উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে। চিত্রশিল্পের কার্যকরী পরিকল্পনা আমাদের দেশে এখনও হয়নি। কাজেই চিত্রজগৎ কতকগুলো ধনীলোকের ব্যবসা ও খেয়ালের গণ্ডির ভেতর ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশের এই শিল্প কিভাবে বিদেশের মত প্রসারতা লাভ করতে পারে তা নিয়ে কেউ বেশী মাথা ঘামায়না। যা হোক, এই অবস্থায় নতুন শিল্পীদের একটু কষ্ট স্বীকার করে, চিত্রজগতে খ্যাতনামা লোকদের কাছে হাজির হবার চেষ্টা করতে হবে। তাঁদের ধৈর্য ধরে, নিজেদের মানসম্মান বজায় রেখে, এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।

তারপর বলা হচ্ছে নবাগতদের মানসিক ভাবের পরিবর্তনের কথা। যারা ছেলেবেলা থেকে চিত্রগৃহে বসে আরাম করে পর্দায় চিত্রাভিনয় দেখে এসেছেন, তাঁদের মনে চিত্রজগতের একটা সুন্দর কল্পনার ছবি থাকাই স্বাভাবিক। মনোরম দৃশ্য সজ্জার ভিতর অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধুর অভিনয় আর সংগীত মুখর আবহাওয়া, সকলেরই চোখের সম্মুখে একটা কাল্পনিক জগতকে এনে ধরে,—মনে হয় ওদের সবই সুন্দর! কিন্তু চিত্রজগতের বাস্তবক্ষেত্রে এসে সব ব্যাপার দেখে কিছুতেই ওদের মন বিশ্বাস করতে চায়না যে, এভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো করে সাধারণ অভিনয়গুলো পর্দায় সুন্দরভাবে একটি কাহিনী হয়ে ফুটে ওঠে। ওদের মনের ভিতর কল্পনা আর বাস্তবের দ্বন্দ্ব সুরু হয়। তারপর ভেতরের আবহাওয়া আমাদের দেশে এখনও নোংরামীতে ভরে আছে বলে বাইরের সাধারণ লোক এসে হাঁপিয়ে ওঠে। কলা ও বিজ্ঞানের মাধুর্য ওদের কাছে বিষ হয়ে দাঁড়ায়। তখন তারা ষ্টুডিওর ভিতর থেকে বাইরে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে। তাঁদের উৎসাহ, আশা, কল্পনা সবই মিলিয়ে যায় মাত্র দুদিনের ষ্টুডিও অভিজ্ঞতা লাভ করেই। ষ্টুডিওর বাইরে এসে বিচার করে দেখতে পায়, চিত্রজগতের ভিতর আকর্ষণীয় কিছুই নেই, ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও নেই,—সেখানের সব কিছু অপরিস্কার এবং ঝাপ্‌সা আবহাওয়া।

আমাদের ষ্টুডিওর ভিতর মাধুর্য কিছুই নেই, আকর্ষণীয় কিছুই নেই, আছে শুধু আর্ট ও বিজ্ঞানের খেলা,—যার মাধুর্য ও আকর্ষণ একমাত্র শিক্ষিত লোকদের কাছে আছে। বহু অশিক্ষিত লোকের হাতে আজ এই চিত্রশিল্প পড়ে বিষাক্ত হয়ে আছে বলেই আমাদের শিক্ষিত সমাজের তরুণ-তরুণীরা বিষাক্ত ধোয়ায় চোখে ঝাপ্‌সা দেখেন।

অবশেষে এ কথাই বলবো যে, আমাদের বাঙালাদেশের চিত্রজগতের বিষাক্ত আবহাওয়া দূর করতে হলে বাঙালার শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।—কষ্ট স্বীকার করে, বাধা অতিক্রম করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নতুন যুগ পরিবর্তনের সূচনা এঁকে দিতে হবে। না হলে শুধু নামের মোহে সখ করে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেলে এসবের কোন প্রতিকারই হবে না কোনদিন। মানবজায় রেখে এ লাইনে কাজ করে যাবার ক্ষমতা অর্জন করে আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আস্‌তে হবে এই শিল্পের উন্নতি কল্পে। এ লাইন অশিক্ষিত মস্তিষ্কবিহীনদের জন্য নয়,—এ লাইন আর্ট ও বিজ্ঞানের উপাসক বাঙালী শিক্ষিত সমাজের—বাঙলার ভবিষ্যৎ তরুণ-তরুণীদের।

ছোটদের ছায়াছবি

দিলীপ দে চৌধুরী

●

ছোটদের জন্যে ছবি তোলার আন্দোলন আজ নতুন কোন একটা বিষয় নয়। অনেকদিন থেকেই এ নিয়ে লেখা এবং অনুরোধের পালা চলেছে সিনেমা প্রতিষ্ঠান ও প্রযোজকদের কাছে। যদিও সে কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজন তাঁরা খুব বিশেষ অনুভব করেননি বলেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা পেয়েছে। সমস্ত দিক থেকে তাই তার একটা আমূল পরিবর্তন করার ঢেউ উঠেছে এবং সিনেমা জগতের কর্মকর্তারা এই ঢেউয়ের মুখে আজ কিছুটা বিপর্যস্ত। ঠিক কি ধরণের ছবি জনসাধারণ গ্রহণ করবে সেই চিন্তায় তাঁরা অনেকেই আজ যথেষ্ট ব্যাকুল। চুটকি প্রেম আর সস্তা স্বাদেশিকতা দিয়ে এতদিন ধরে যে ব্যবসা তাঁরা পিটে এসেছেন প্রাণভ'রে, তার মূলে দিব্যি ঘুন ধরেছে দেখতে পাচ্ছেন। অতএব পথ কোন দিকে ?

সিনেমা জগতের সংগে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা জিনিষ যা আমি লক্ষ্য ক'রেছি বিশেষ করে, সেটা হচ্ছে—প্রযোজকদের সবজান্তাপনা। তাঁরা মনে করেন, টাকাটা যখন আমার, তখন আমি যা জানি বা বুঝি তার ওপর স্বয়ং বিধাতা পুরুষও কিছু জানেননা এবং বোঝেননা। বাংলা ছবির অবনতির একটা প্রধান কারণ এঁদের এই মনোবৃত্তি। প্রযোজকেরা দুদিন ফ্লোরে যাতায়াত করেই শিখে যান সবকিছু। নিজেই লেগে যান তখন পরিচালনা ক'রতে—বসে পড়েন কলম-কালি নিয়ে গল্প লিখতে। টাকার জোরে হয়তো সবই হয় কোনপ্রকারে—শুধু হয় না সত্যিকার কোন ভাল ছবি। ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিপদ হ'য়েছে সব চেয়ে বেশী বেচারী প্রযোজকদের। কেননা, জনগণের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ধরণের গল্প লেখার মত ক্ষমতা তাঁদের নেই। অথচ টাকা খরচ ক'রে কোন সাহিত্যিকের কাহিনীকে চিত্ররূপ দেওয়ার মত বোকামীও ক'রতে রাজী নন চট্ করে। অতএব পথ কোন দিকে ?

এই সংশয়াবর্তের মধ্যে প'ড়ে দু' চারজন আজ ভাবছেন ছোটদের ছবির কথা। তাঁদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সম্প্রতি রঙ্গমঞ্চে শিশুনাট্যাভিনয়ের সাফল্যও এঁদের চিন্তার পেছনে যথেষ্ট কাজ ক'রেছে এবং ক'রছে। এতকাল ধ'রে এঁদের অজুহাত ছিল, এদেশে ছোটদের ছবির আর্থিক মূল্য (Commercial value)কিছু নেই (যদিও সেটা এঁদের কল্পিত ধারণা)। রঙ্গমঞ্চের সাফল্য তা অমূলক প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশে ছোটদের জন্যে আলাদা ছবি তোলা হয় এবং এবিষয় তাদের জাতীয় সরকার যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে থাকেন। শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষার ওপর ভবিষ্যৎ জাতি অনেকখানি নির্ভর ক'রে একথা বোধ করি কেউই অবিশ্বাস ক'রতে পারবেন না। এদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রত্যেকের। আমাদের মধ্যে এই যে আজ এত দৈন্য, এত অসম্পূর্ণতা এর জন্যে দায়ী কে ? দায়ী শিক্ষার অভাব। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেদের ভেতর যেন এই অভাব আর না থাকে সে চেষ্টা সকলেরই করা উচিৎ নয় কি? শিক্ষাদানের একটা বিশেষ মানদণ্ড হ'চ্ছে এই সিনেমা। কুইনিনকে যেমন সুগারকোটেড্ ক'রে রসনাকে আমরা তৃপ্তি দিয়ে থাকি, তেমনি শিক্ষনীয় বিষয় গুলিকে সুকৌশলে গল্পের মধ্যে দিয়ে রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত ক'রলে ছেলেরা আনন্দ এবং শিক্ষা দুটোকেই পেতে পারে একই সংগে। কৌতুহল শিশুমনের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। ওদের সেই কৌতুহল পূর্ণকরার ভেতরই যদি শিক্ষা থেকে যায়, তাকে ওরা ভুলবেনা কিছুতেই।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, ছোটদের বই ঠিক কি ধরণের হবে। কথাটা ভাববার মত এবং হয়তো অনভিজ্ঞের হাতে পড়ে ছোটদের ছবির নামে একটা কিম্ভুত কিমাকার অদ্ভুত পদার্থ হ'য়ে যার থাবার সম্ভাবনাও আছে। ছোটদের ছবির জন্য কাহিনী নির্বাচন একটা সমস্যার ব্যাপার। শিশু-সাহিত্যিকদের পরামর্শ নেওয়া এ বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য ক'রবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

আমাদের দেশে রূপকথার প্রচলন খুব বেশী। শিশুসাহিত্য ব'লে এদেশে যখন কিছু ছিলনা তখন এই রূপকথাই ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদাদের মুখ থেকে শিশুদের মনের খোরাক জুগিয়েছে। রাজকন্যার সেই সোনারকাঠি-রূপারকাঠি, পক্ষীরাজ ঘোড়া আর তেপান্তরের মাঠকে আজও কেউ আমরা ভুলিনি। কোন রূপকথাকে যদি চিত্রে রূপ দেওয়া যায় তাহ'লে কি হয়? অবশ্য তার মধ্যে শেখবার মত মালমশলাও পোরা হবে নিশ্চয়ই। রূপকথার ভেতর আমরা এমনিতেই পাই বীরত্ব, সাহস এবং অসত্য ও অন্যায়ের পরাজয় সত্য ও ন্যায়ের কাছে। উপরন্তু তাকে যদি রূপক হিসাবে আরো ব্যাপক রূপ দেওয়া যায় ছবির জন্যে খুব খারাপ হবেনা বোধহয় জিনিষটা।

তাছাড়া সামাজিক গল্পও যথেষ্ট লেখা যেতে পারে অনায়াসেই। বর্তমানে আমদের শিশু ও কিশোর জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। তাদের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা কতো বহুমুখী, কতো বিস্তৃত তা শিশুমনের ভাণ্ডারীরা জানেন। এই সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগের ওপর ভিত্তি ক'রে ভাল ভাল কাহিনী লেখা অসম্ভব নয় মোটেই। ছোট্ট একটি ঘটনার উল্লেখ হয়তো এই প্রসংগে খুব বেশী অপ্রাসংগিক হবেনা। কোন এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সংগে গল্প ক'রছিলাম। হঠাৎ একটি কিশোর ভিক্ষুক এসে হাত পাতলে—বাবু, দুটো পয়সা। জিজ্ঞেস ক'রলাম—পয়সা কি হবে ভাই? সে তার পিলে ভরা পেটটা দেখিয়ে বল্লে, বড্ড খিদে বাবু—দুদিন কিছু খাইনি। কিছুক্ষণ ধরে তার সংগে নানান প্রশ্নোত্তরে জানলাম, ছেলেটির মা, বাবা, ভাই বোন সবই আছে। বাবা অসুস্থ। মা গেছেন অন্যদিকে ভিক্ষের সন্ধানে। তাদের এই রোজগারের ওপরই নির্ভর ক'রছে বাপ এবং ভাই-বোনেদের জীবন। একটা আনি দিলাম তার হাতে।

ছেলেটি চলে গেল আনন্দের সংগে। কিন্তু পাশের দোকানেরই এক বিড়িওয়ালা আমাদের সাবধান করে দিলে তক্ষুনি—সালা একের নম্বর বদমাস বাবু, জোচ্চোর আছে। পয়সা ওদের দেবেন না। বাবা মা সব বাজে কথা। এক্ষুনি ওই পয়সা দিয়ে আমারই দোকান থেকে বিড়ি কিনে ফুঁকবে। খুব ভুল করেছেন বেটাকে পয়সা দিয়ে। শুধু বিড়িওয়ালা কেন, সকলেই ব'লবেন আমরা ভুল করেছি ওকে পয়সা দিয়ে বা করুণা দেখিয়ে। কিন্তু একথা কি কেউ ভেবে দেখেছেন কোনদিন, যে কেন ওরা এ কাজ করে? কেন ওরা প'ড়ে থাকে যুগ-যুগান্তর ধ'রে এই জঘন্যতার মধ্যে? ওই ছেলেটিই হয়তো হ'তে পারতো একজন বুদ্ধিমান ভদ্র মানুষ যদি পেতো সত্যিকার শিক্ষা, মানুষ হবার সহজ সুযোগ। এদের এই অভিশপ্ত জীবনকে কেমন ক'রে পাপমুক্ত করা যায়, কেমন ক'রে আলোকোজ্জ্বল করা যায় তার কোন বলিষ্ঠ ইংগিত দিতে পারে নাকি ছোটদের ছায়া ছবি?

আমাদের সহজ ব্যবস্থায়, শিক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে এতো দৈন্য, এতো গ্লানি আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে আজ যাকে মুছে দিতে না পারলে জাতীয় জীবনকে উন্নত করা অসম্ভব। এজন্য সিনেমার মধ্যে দিয়ে ছোটদের কাছে আবেদন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এরা একদিন যখন বড় হ'বে, দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্রের, সমাজের, এই দুর্নীতিকে তারা তখন নিঃশেষে মুছে দেবেই।

ছোটদের ছায়া ছবির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এতো কথা বলা যায় তার কোন শেষ আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শুধু কথা বলার মধ্যে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে—সফলতা থাকেনা। স্বাধীন ভারতবর্ষে যদি কোন আদর্শবাদী প্রযোজক এগিয়ে আসেন আজ এই দায়িত্বকে পালন ক'রতে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। যে সব প্রতিষ্ঠান অথবা প্রযোজকরা আজকে অন্ততঃ একবারও স্মরণ ক'রেছেন এই ছোটদের ছায়া ছবির কথা, তাঁদের আবার আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ছোট্ট ভাই বোনদের তরফ থেকে—আমার দেশবাসীর তরফ থেকে। তাঁদের এই শুভ ইচ্ছা কার্যকরী হোক, সার্থক হোক, এই আমাদের সকলের একান্ত কামনা।

নটী সুমিতার মৃত্যু

(গল্প)

—নির্মল দত্ত

★

সুমিতা নাকি মরিয়াছে!

যে জন্ম লইয়াছে—সে সুলতা।

পুরাতন ধ্বসিয়া-পড়া গৃহ-স্তূপের উপর যেমন করিয়া অতি আধুনিক রুচিসম্মত প্রাসাদ জন্মলাভ করিয়া উঠে, তেমনি করিয়াই জন্ম হইয়াছে সুলতার।

গ্রামের বাড়ীতে সে বাস করিত শৈশবকালে। গ্রামেরই মাইনর স্কুলটায় সে পড়িত। মাইনর স্কুল পাশ করিবার পর তাহার পিতা রামবল্লভ রায় তাঁহার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে চলিয়া যান সহরে এবং সুলতাকেও লইয়া যান্ সাথে করিয়া। এমনি করিয়া সুলতা পাশ করিয়া লয় প্রবেশিকা পরীক্ষাটা। কিন্তু আসলে তাহার ভাগ্যই তাহার উপর সুপ্রসন্ন ছিল না। তাই বিবাহটা হইয়া যায় তাহার নিতান্ত একটা পল্লীগ্রামে। ছেলেটী শিক্ষিত ও অবস্থাবান্। পল্লীগ্রাম হইলে আর এমন ক্ষতি কি! ইহা ভাবিয়াই রামবল্লভ রায় কন্যার বিবাহ দেন পল্লীগ্রামে।

তখন সে ছিল—সুমিতা।

সুমিতাকে স্বামীর ঘর বেশী দিন করিতে হয় নাই। দাঙ্গায় তাহাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়া যায়, জিনিষপত্র সব নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাকেও ধরিয়া লইয়া যায় দুর্বৃত্তেরা।

সুমিতার এখন সেই সব কথা ভাবিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সারা দেহ বোর্‌খায় আচ্ছাদিত হইয়া তাহাকে দিনের পর দিন স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে হইয়াছে, স্নান নাই, খাওয়া নাই, কথা বলিবার উপায় নাই, এঁদো-পচা অন্ধকার গহ্বরে বাস করিতে হইয়াছে,—একটী ভদ্রলোকের মুখ দেখিতে পায় নাই। তাহার উপর প্রতি মুহূর্তে কেবল অত্যাচার আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা। কি ভীষণ দিনগুলি গিয়াছে সুলতার। সেই দিনগুলির কথা মনে হইলে সুমিতার এখনও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

তাহার পর সে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে—দুর্বৃত্তেরাও ধরা পড়ে—কিন্তু তাহাদের শেষ পর্যন্ত কি শাস্তি হইয়াছে, তাহা সে জানে না। নারী মঙ্গল আশ্রম হইতে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু শ্বশুরবাড়ী হইতে তাহাকে গ্রহণ করা হয় নাই। স্বামীর মত ছিল সুমিতাকে গ্রহণ করিবার—কিন্তু শেষ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই। সুমিতারই ভুলের জন্য। এই ঘটনার পর তাহার ঘৃণা আসিয়া যায় সমস্ত পুরুষ জাতিটার উপর। সুমিতা পিতৃগৃহে যাইবার মনস্থ করিয়াছিল—কিন্তু রামবল্লভ রায় তখন বাঁচিয়া ছিলেন না। ভাইয়েরাও তেমন আদর করিয়া ডাকিয়া লয় নাই!

শেষ পর্যন্ত সুমিতা নিজের সংস্থান নিজেই করিয়া লইবে বলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

নিজের রূপ ছিল, শিক্ষা ছিল, কথা বলিবার শক্তি ছিল—সুমিতার স্থান হইয়া গেল অভিনেত্রী জীবনের মাঝে। এক সহৃদয় ভদ্রলোক তাহাকে অবশ্য উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন—নারী আশ্রমে থাকিয়া দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করিতে। সুমিতা তাহা করিতে পারে নাই! প্রতিহিংসা তখন তাহার মনে ভীষণভাবে জ্বলিতেছিল। সে দেখাইয়া দিবে—একদিন যাহারা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল তাহারাই তাহার দেহের জন্য আবার লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

সুযোগ মিলিল। সুমিতা অভিনেত্রী হইল।

তখন সুমিতা হইল—সুলতা।

মাত্র একটি বৎসর। ইহারই মধ্যে সে যথেষ্ট নাম করিয়া ফেলিয়াছে—একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে। কয়েকখানি চিত্রে সে অভিনয়ও করিয়াছে।

ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়া গেল।

যাহারা একদিন তাহাকে পথে তাড়াইয়া দিয়াছিল—এখন সেই তাহাদের তাড়াইয়া দেয় পথে। একদিন যাহাদের দ্বারে দ্বারে সে ঘুরিয়াছিল—এখন তাহারাই সুলতার দ্বারে দ্বারে ঘোরে। কত লোক তাহার নিকট আসে যায়—সামান্য একটু কথা বলিবার সুযোগ পাইলেই ধন্য হইয়া গিয়া তাহারা সহস্র সহস্র টাকা সুলতার পায়ে ঢালিয়া দিতে পারে। সুলতা এই সব দেখে আর নিজের মনে মনেই হাসে।
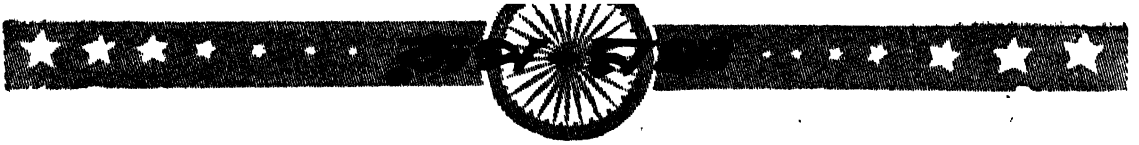
সুলতার মন্দ লাগে না—এই সব মাড়োয়ারী, বাঙালী সাহেব, সমাজ-সংস্কারক, ছাত্র, অভিনেতা প্রভৃতিদের দেখিতে--যাহারা তাহার নিকট নিত্যই আসে ও যায়। ইচ্ছা করিলে সে বহু অর্থই রোজগার করিতে পারিত ইহাদের নিকট হইতে। কিন্তু করে নাই। বিনা পরিশ্রমে শুধু তাহার রূপ বিক্রয় করিয়াই সে অর্থ উপার্জন করিতে চাহে না। কত লোক তাহার নিকট হইতে ম্লান-মুখে ফিরিয়া গিয়াছে—মদ খাইতে যাহাদের সে মানা করিয়াছে, তাহারা শুধু বিদ্রূপই করিয়াছে! করুক্—তবু সে যাহা ভাল মনে ভাবিবে তাহা করিবেই।

সাবিত্রী, মনসা, রূপা, মীরা, মহাতপা প্রভৃতিদের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে--ইহারা সকলেই অভিনেত্রী। ইহাদের জীবন একটী একটী করিয়া সুলতা জানিয়া লইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ গত দুর্ভিক্ষে খাইতে না পাইয়া, কেহ সমাজ হইতে বিতাড়িতা হইয়া, কেহ বা ভুলক্রমে পদস্খলিতা হইয়া এই জীবিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। দোষ ইহাদের কাহারও নহে --তবু দোষ ইহাদের সকলেই দেয়।

দেবকীরাম একদিন বলিল - জানেন, সুলতা দেবী, আপনার কাছে একজন আধা সাহেব রোজ আসে, আর বলে, আপনার সংগে দেখা করবে। ছিঃ ছিঃ, কি চেহারা! খাঁকি রঙের একটী প্যাণ্ট্ পরণে, একটা ময়লা সার্ট গায়ে, একটা ছেঁড়া জুতা পায়ে—মুখে মদের গন্ধ! কি আস্পর্ধা দেখুন্ গে, ও চায় কি না সিনেমার নামকরা অভিনেত্রী সুলতা দেবীর সাথে দেখা করতে!

—কেন চাইবে না, দেবকীরাম বাবু? খোঁড়াও কি চায় না, বাইরের পথটা দেখতে। সুলতা উত্তর দিল!

—যা বলেছেন। দেবকীরাম সুলতার কথার অর্থ কিছু বুঝিতে না পারিয়াই বোকার মত হি হি করিয়া হাসিল! তাহার পর কথার মোড় ফিরাইয়া লইয়া বলিল—কিন্তু লোকটা আপনার সংগে দেখা করবার জন্যে বেশী জুলুমও করে না—নীচের ড্রইং রুমের দেওয়ালে আপনার যে ফটোটা টাঙানো আছে, তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার চলে যায়।

—তা হ'লে পাগল-টাগল হবে বলুন! বলিয়া সে চা ঢালিতে লাগিল।

—তা হবে। উত্তর দিল দেবকীরাম।

এই দেবকীরামই হইতেছে একটী নূতন চিত্র কোম্পানীর মালিক—যাহাতে সুমিতা এখন অভিনয় করিতেছে। দেবকীরাম মাড়োয়ারী - বর্তমানে বাঙালী।

কিন্তু বিষয়টা সুলতা সেদিন আর উড়াইয়া দিতে পারিল না। বেয়ারা শ্যামকান্তও সেই কথাই বলিয়া অভিযোগ করিল—খাঁকি প্যাণ্ট্-পরা কে এক মাতাল ধূলি-কাদা-মাখা-পায় আসিয়া তাহার ড্রইং রুম নোংরা করিয়া দিতেছে। তাড়াইলেও যাইতে চাহে না। সুলতার ফটোটী একবার না দেখিয়া লইয়া কিছুতেই যাইবে না। ছবিটী একবার দেখিতে দিলে আর কিছু বলিতে চায় না, আপনিই চলিয়া যায়!

মাতালটী সুলতাকে ভাবাইয়া তুলিল।

কে এই লোকটী? এমন করিয়া তাহার ছবি দেখিতে আসে?

সেদিন তাহার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের একটী লোকের সহিত সুলতার দেখা। এককালে সুলতার শ্বশুর-বাড়ীতে সে চাকুরি করিত—এখন কলিকাতায় কোন্ দোকানে চাকুরি লইয়াছে। এই লোকটী গ্রামের সমস্ত খবরই দিল। সুলতার শ্বশুর মারা গিয়াছেন, স্বামী মদ্ খাইয়া খাইয়া পাগল হইয়া গিয়াছে—এখন দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া করিয়া কলিকাতায় বসিয়া মদ খায় আর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতে গেলে খুঁজিয়া পায় না—বাসার ঠিকানা কিছু নাই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রামবল্লভ রায় তাহার বিবাহের বহু অনুরোধ, এমন কি বহু প্রলোভনও দেখাইয়াছিলেন —কিন্তু সে কিছুতেই আর বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। গ্রামের লোকে বলে—সুমিতাই নাকি তাহার সর্বনাশ করিয়া গিয়াছে।

কথাগুলি শুনিবার পর হইতেই সুলতা যেন কিরূপ হইয়া গিয়াছে। কোন কাজেই আর সে তেমন উৎসাহ পায় না। দেবকীরাম আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কাগজের
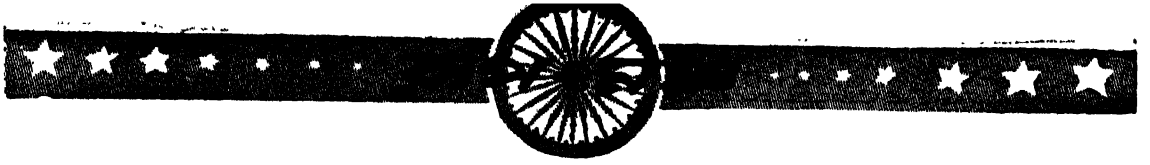
সম্পাদকরা তাহার দেখা পায় নাই, ছবিতে অভিনয় করিতে গিয়া সহ-অভিনেতা পরেশকে প্রয়োজনের বাহিরে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে! সকল বিষয়েই সুলতার যেন কেমন উদাসীন ভাব!

দেবকীরাম একদিন বলিল—আপনি যেন কি রকম হ'য়ে যাচ্ছেন দিন দিন, সুলতা দেবী!

সুলতা কেমন একটী উদাস-হাসি হাসিয়া উত্তর দিল—তা হবে!

সুলতার ভাব দেখিয়া দেবকীরাম আর বেশী কথা বলিবার সাহস পাইল না। অন্য প্রসংগ পাড়িল—নতুন বইয়ের তো ব্যবস্থা কর্‌ছি, সুলতা দেবী! এবার কত টাকা আপনি নেবেন আগেই ব'লে ফেলুন! তবে এবার আপনাকে অনেক খুসী কর্‌ব!

—সুমিতা পুনরায় পূর্বে'র মত উত্তর দিল—টাকা তো অনেক হয়েছে! আর টাকা চাইনে, দেবকীরাম বাবু! তার চেয়ে আমি যদি এখন এই সব থেকে মুক্তি পাই তা হ'লেই আমার টাকার চেয়ে অনেক বেশী কিছু পাওয়া হবে!

দেবকীরাম এবারও বুঝিল না। শুধু হি হি করিয়া

বি, কে, দালাল পরিচালিত 'দি রজনী ফিল্ম্ করপোরেশনে'র প্রথম চিত্র নৈবেদ্য "চলার পথে"র একটী দৃশ্যে বনানী চৌধুরী ও অনিল মুখোপাধ্যায়।
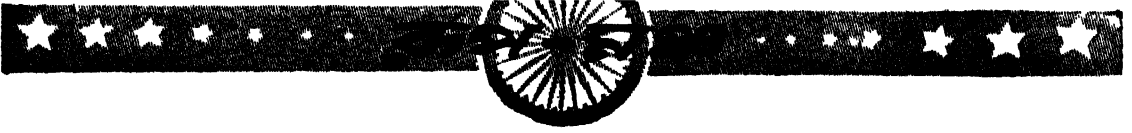
হাসিয়া লইয়া বলিল—কি যে বলেন, মুক্তি কি মানুষের আছে? কিছুতেই মুক্তি নেই!

—না, দেবকীরাম বাবু, মুক্তি আমি চাই-ই। এ জীবন আর ভাল লাগে না।

সত্যই কয়দিন হইতেই সুলতার মন বলিতেছে—মুক্তি চাই। কিন্তু কোথায় মুক্তি? এখন কেবলই তাহার মনে হইতেছে, একটী ক্ষুদ্র সংসার পাতিবার কথা—ইচ্ছা হইতেছে, আবার সে স্বামীর ঘরে যায়। অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া স্বামীকে অবহেলা করিয়া তাহার চলিয়া আসাটা উচিত হয় নাই। চলিয়া আসিয়া না হয় সে কিছু অর্থ পাইয়াছে, খ্যাতি পাইয়াছে, ধনীর সাহচর্য পাইয়াছে—কিন্তু আর কি পাইয়াছে? মানুষ যাহা চায় তাহা কি পাইয়াছে? নারীর একমাত্র কাম্য, স্বামী-পুত্র-পরিবেষ্টিত সুন্দর একটী সংসার। তাহা কি সে পাইয়াছে? না, সে এমনি করিয়া আর থাকিবে না। স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিবে কলিকাতার পথ হইতে—বন্ধ করিয়া দিবে তাহার মদ খাওয়া আর তাহার পাগ্‌লামি। আবার সে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে—পাতিবে একটী সুন্দর সংসার! স্বামী তো আজও তাহাকে ভালবাসে! হয়ত গ্রহণ করিয়া লইবে সুলতাকে স্ত্রী-রূপে! কিন্তু যদি না করে? কতদিন ছাড়াছাড়ি—মানুষের মন তো!

নূতন বইয়ের কয়েকটী দৃশ্য তুলিয়া ষ্টুডিও হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল সুলতা। বাড়ীর সম্মুখে একটী ভিড় জমিয়াছে। সুলতার মটর আসিয়া সেখানে থামিতেই শ্যামাকান্ত আগাইয়া আসিল। সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—বাড়ীর সামনে ভিড় কেন রে? ব্যাপার কি?

শ্যামাকান্ত উত্তর দিল—সেই পাগ্‌লা লোকটা! আজও এসেছিল আপনার ছবি দেখতে। কিন্তু বাইরে বের হ'তে গিয়ে হঠাৎ পড়ে মারা গিয়াছে। শ্যামাকান্ত তাহাকে তাড়াইয়া দিবার ফলেই যে, সে দরজায় ধাক্কা খাইয়া সিঁড়ি হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সে গোপন করিয়া রাখিল।

সুলতা নামিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। মৃতদেহ দেখিয়া হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। এতো তাহার স্বামীই—সুলতার চিনিতে ভুল হয় নাই! সেই খাঁকি রঙের প্যাণ্ট্ পরণে, ময়লা হাফ সার্ট গায়ে, ছেঁড়া জুতা পায়ে—সুলতা এতক্ষণে বুঝিল, সেই পাগল মাতালটাই তাহার স্বামী।

সুলতা তাড়াতাড়ি যাইয়া স্বামীর মাথাটী নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। তাহার পর পরণের দামী সাড়ীর আঁচল দিয়া স্বামীর মুখের চাপ্-চাপ্ রক্তগুলি সযত্নে মুছাইয়া দিতে লাগিল। দেবকীরাম হো-হো করিয়া ছুটিয়া আসিল—আহা আপনি করেন কি? করেন কি?

সুলতা কোন উত্তর দিল না। যাহা করিতেছিল, তাহাই করিয়া যাইতে লাগিল। মৃতের পকেটে সুলতার বিবাহের অব্যবহিত পরের একখানি ফটো ও একটী অসমাপ্ত চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিটী এইরূপ—

"সুমিতা, অনেক চেষ্টা ক'রেও তোমার বেয়ারা উমেদারের ভিড় ঠেলে তোমার কাছে পৌঁছাতে পারি নি। তুমি কি আজও তেমনি অভিমান ক'রেই রইবে? আমার সামান্য ভুলটুকু কি তুমি কিছুতেই ক্ষমা ক'রে নিতে পারবে না? আমার ঘরে সত্যিই তুমি আর আসবে না? আচ্ছা তাই—"

* * * *

মৃতের অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য বহু টাকা খরচ করা হইল। দেবকীরাম বেয়ারা হইতে সুরু করিয়া পাড়ার সকলেই দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল যে, একটী অপরিচিত মৃত পথিকের অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য একটী চিত্র-অভিনেত্রী এত টাকা খরচ করিতে পারে! ইহার সকল ব্যয়ই বহন করিয়াছে সুলতা নিজে। স্বামীর মৃতদেহ চলিয়া গেলে সুলতা সেই যে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, সারাদিনের ভিতর আর সে তাহা খোলে নাই—এমন কি দেবকীরামের শত অনুরোধেও না!

পরের দিন কলিকাতার কাগজে কাগজে ছাপা হইল—চিত্র জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুলতা দেবী এক মৃত পথিকের রূপে মুগ্ধা হইয়া নিজের ঘরে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

সুমিতা সত্যই মরিয়াছে।

সম্পাদকের দপ্তর

★

[রূপ-মঞ্চের কর্মী গোষ্ঠীর তরফ থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাজকে বিজয়া ও ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি জ্ঞাপন কচ্ছি। যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আমাদের বিচার শক্তিকে, মনুষ্যত্বকে অন্ধ করে রেখেছে—সেই বিষাক্ত আবহাওয়ার মাঝেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ অতীতের ভুল বুঝতে পেরে বর্তমানকে যেভাবে বুদ্ধির স্থিরতা দিয়ে গ্রহণ করেছেন—তাতে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাই। এই মহৎ দৃষ্টান্তে রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজেরও সক্রিয় অংশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। তাই তাঁদের উদ্দেশ্যেও বিশেষভাবে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কচ্ছি। রূপমঞ্চের শারদীয়া সংখ্যা আমাদের শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাজকে কতখানি খুশী করতে পেরেছে, তা তাঁরাই জানেন। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি, গত শারদীয়া সংখ্যার তুলনায় এবার অনেকখানি আমরা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেছি। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, যাঁর যে বিষয়ে বলবার অধিকার রয়েছে—তাঁকে সেই বিষয়েই শারদীয়া সংখ্যার জন্য লিখতে অনুরোধ করা হ'য়েছিল। একথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে চাই, আমাদের লেখক গোষ্ঠী আমাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করতে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্যের পরিচয় দেন নি। এমনি ভাবে সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছায় রূপ-মঞ্চ তার অভিযানকে দিন দিন গৌরবমণ্ডিত করে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যে ত্রুটি বিচ্যুতি অতীতের পাতায় আমরা রেখে গেলাম, ভবিষ্যতের সাফল্যে তাকে অপসারিত করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এই প্রতিশ্রুতি পালনে পাঠকগোষ্ঠীর সজাগ দৃষ্টিই আমাদের পরম সম্বল। জয়হিন্দ।]

দাশরথি চক্রবর্তী (বর্ধমান)

ছবি বাবুর বর্তমান ঠিকানা কী ?

●● ৩৩৪, সুভাষচন্দ্র রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা।

সাবদার হোসেন ও বিশ্বনাথ দাস (মালদহ)

(১), (২) বিখ্যাত অভিনেতা ভূমেন রায় কি সিনেমা জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন ?

●● (১) হ্যাঁ। (২) শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় সিনেমা জগৎ থেকে ঠিক বিদায় নিয়েছেন বলা চলে না। চিত্র জগতে তাঁর চাহিদা কমে এসেছে বলেই তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না এবং আমার মনে হয়, এজন্য তিনি নিজেই দায়ী। কেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। মঞ্চের সংগে তাঁর এখনও যোগ রয়েছে। বর্তমানে ষ্টার মঞ্চের সংগে তিনি জড়িত। নাট্যমঞ্চের কাছে এখনও তাঁর যে চাহিদা রয়েছে—নিজে যদি এখনও সতর্ক হ'য়ে না চলেন, সে চাহিদাও যদি ভবিষ্যতে না থাকে, বিস্মিত হবার কোন কারণ থাকবে না। আমি সত্যি, তাঁর জন্য বেদনা অনুভব করি।

দিলীপকুমার সিংহ (সিংহসদন, পাথুরিয়াঘাটা)

●● আপনার পরিকল্পনাকে রূপ-মঞ্চের পাতায় রূপ দিতে বর্তমানে অসুবিধা আছে। যখনই আমরা এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠবো, তখনই আপনার অনুরোধ রক্ষা করবো। এবিষয়ে আমরা যথেষ্ট যত্নবান আছি।

প্রসাদকুমার দাস (জিন্দাবাজার, শ্রীহট্ট)

চন্দ্রাবতী ও মলিনার আগামী চিত্র কি ? দৃষ্টিদানে কে কে আছেন ?

●● চন্দ্রাবতীকে এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটার্স'র 'রাঙ্গামাটী' চিত্রে এবং মলিনাকে দেখতে পাবেন প্রিয়তমা, ঘরোয়া, শাঁখা সিঁদুর, রামের সুমতি প্রভৃতি চিত্রে। দৃষ্টিদানের বিভিন্ন ভূমিকায় থাকবেন সুনন্দা দেবী, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিমান, অমিতা, কেতকী প্রভৃতি।

ভাস্কর সেন (একডালিয়া রোড, কলিকাতা)

(১) বেতারে জাতীয় সংগীত পরিচালনায় কে বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় না সন্তোষ সেনগুপ্ত ?

(২) এদের পর পর সাজিয়ে দিন—উৎপলা সেন, সুপ্রভা সরকার, কল্যাণী দাস, যূথিকা রায়, বীণা চৌধুরী, বেলা মুখোপাধ্যায়।

●● (১) বেতারে জাতীয় সংগীত পরিচালনায় এঁরা দু'জনেই ব্যর্থ হ'য়েছেন বলে আমি মনে করি।

(২) বীণা চৌধুরী, সুপ্রভা সরকার, কল্যাণী দাস, যূথিকা রায়, উৎপলা সেন, বেলা মুখোপাধ্যায়।
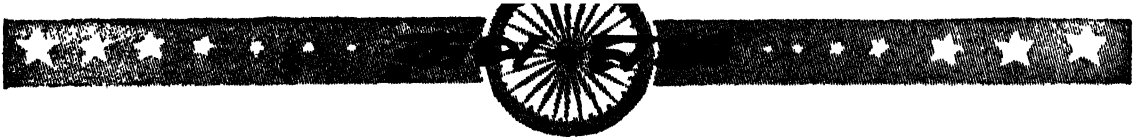
কুমারী সবিতা রায় (কাটনীর পাড়া, বগুড়া)

●● মেঘদূত চিত্রখানি আমি দেখিনি, তাই ও সম্পর্কে কিছু বলতে পারলুমনা। ক্ষমা করবেন।

হেমন্তকুমার দত্ত (টাফ´ রোড, ভবানীপুর)

কিছুদিন আগে একটী বাংলা দৈনিক পত্রিকার ছায়াছবি সংক্রান্ত সমালোচনায় জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন যে, শোনা যাচ্ছে হলিউডের চিত্র নির্মাতারা তাহাদের নির্মিত চিত্রগুলি ভারতে পাঠাবার সময় ছবির মধ্যেকার বাক্যালাপ গুলি এ দেশীয় কয়েকটী প্রধান প্রধান ভাষায় অনুবাদ করে পাঠাবেন। যাহাতে বিদেশীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি এইভাবে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত চিত্রগুলি এদেশে দেখাইয়া বাজার দখল না করিতে পারে সেদিকে নজর রাখিবার জন্য ভদ্রলোক দেশের সরকারকে ও আমাদের চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধারগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। এবিষয়ে আমার নিজস্ব মত এই যে, বিদেশীয় ভাল ছবিগুলি যদি দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিয়া আরও বেশী আনন্দ পাইব। Good Earth, Random Harvest, For whom the Bell Tolls, How Green was my Valley ও Less Miserable ইত্যাদি ভাল বিদেশীয় ছবিগুলি দেখিবার সময় যদি আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথোপকথনের বাংলা অনুবাদ তথনই শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের ছবি দেখার আনন্দ আরো বেশী গুণে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহার আর একটী দিক আছে। তাহা এই যে, এইভাবে বিদেশীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের দেশ হইতে আরও বেশী পরিমাণ অর্থ শুষিয়া লইতে পারে—যাহা মোটেই এযুগে সমর্থনযোগ্য নয়। এবিষয়ে আপনার মতামত চাই।

●● দৈনিকে যে সংবাদ কী শুনেছিলেন সেটি মোটেই ভিত্তিহীন নয়। মার্কিণ চিত্র-ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসায় ঘাটিকে সবসময়ই দৃঢ় করে রাখতে সচেষ্ট থাকে। প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যথনই নূতন কোন পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দেয়—তারাও নূতন পরিকল্পনা নিয়ে নূতন রূপে দেখা দেয়। বৃটিশ চলচ্চিত্রের সংগে এমনি ভাবে তাদের প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি। ভারতের বাজারে—শুধু ভারতের বাজারে কেন পৃথিবীর বাজারে নিজেদের স্বার্থকে কায়েমী করবার জন্য তাদের এই নূতন পরিকল্পনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি তারিফই করবো। এখন কথা হচ্ছে, ভারতীয় চিত্রশিল্পের এজন্য কোন আশঙ্কা করার সম্ভাবনা আছে কি না। এবং সেজন্য সরকার থেকে তাকে রক্ষা করবার কোন প্রয়োজন আছে কি না। ব্যক্তিগতভাবে এতে আশঙ্কিত বা ভীত হবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কেন তা পরে বলছি। তবে একথা ঠিকই, প্রতিযোগিতাকে ভয় করে যারা চলেন—তাঁরা কোন দিন কোন ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারবেন না। অবশ্য অবৈধ প্রতিযোগিতাকে সব সময়ই নিন্দা করবো।

অর্থনীতির 'free-trade' অর্থাৎ অবাধ-বাণিজ্য কথাটী আশা করি জানেন। আজ আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগী আন্তর্জাতিক পরিধির মাঝে পরিব্যাপ্ত। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেদিক থেকে কোন বাধা নিষেধ থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ আমার যা নেই অন্যের কাছ থেকে তা উচিত মূল্যে আমি কিনতে পারবো। তবু কতগুলি বিষয় আছে যেখানে সংরক্ষণ-নীতি একান্ত প্রয়োজনীয়। সে শিল্পটী শিশু অর্থাৎ কেবলমাত্র গড়ে উঠছে—তাকে সংরক্ষণ-নীতির দ্বারা যতদিন স্বাবলম্বী হ'য়ে না ওঠে ততদিন রক্ষা করতেই হবে। আমাদের চিত্রশিল্প শৈশবত্ব ডিঙ্গিয়ে এসেছে বলেই মনে করি—শৈশবত্বের অছিলায় তাকে ক্ষমা করতে অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজী নই। মার্কিণ চিত্র ব্যবসায়ীরা যদি আমাদের প্রদর্শক ও পরিবেশক গোষ্ঠীকে হাতে করে বাধ্যতামূলকভাবে মার্কিণ চিত্র প্রদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সেই ক্ষেত্রই সরকার বা দেশীয় ব্যবসায়দের সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। অন্যথায় সংরক্ষণ-নীতির মুখাপেক্ষী হ'য়ে না থেকে দেশীয় চিত্রের মানবৃদ্ধির প্রচেষ্টায়ই তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে অনুরোধ জানাবো।

শ্রীঅসীমকুমার (কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

'রামপ্রসাদ' চিত্রের প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুধাংশু ভট্টাচার্যের ঠিকানা দিতে পারেন কি ?

★★★
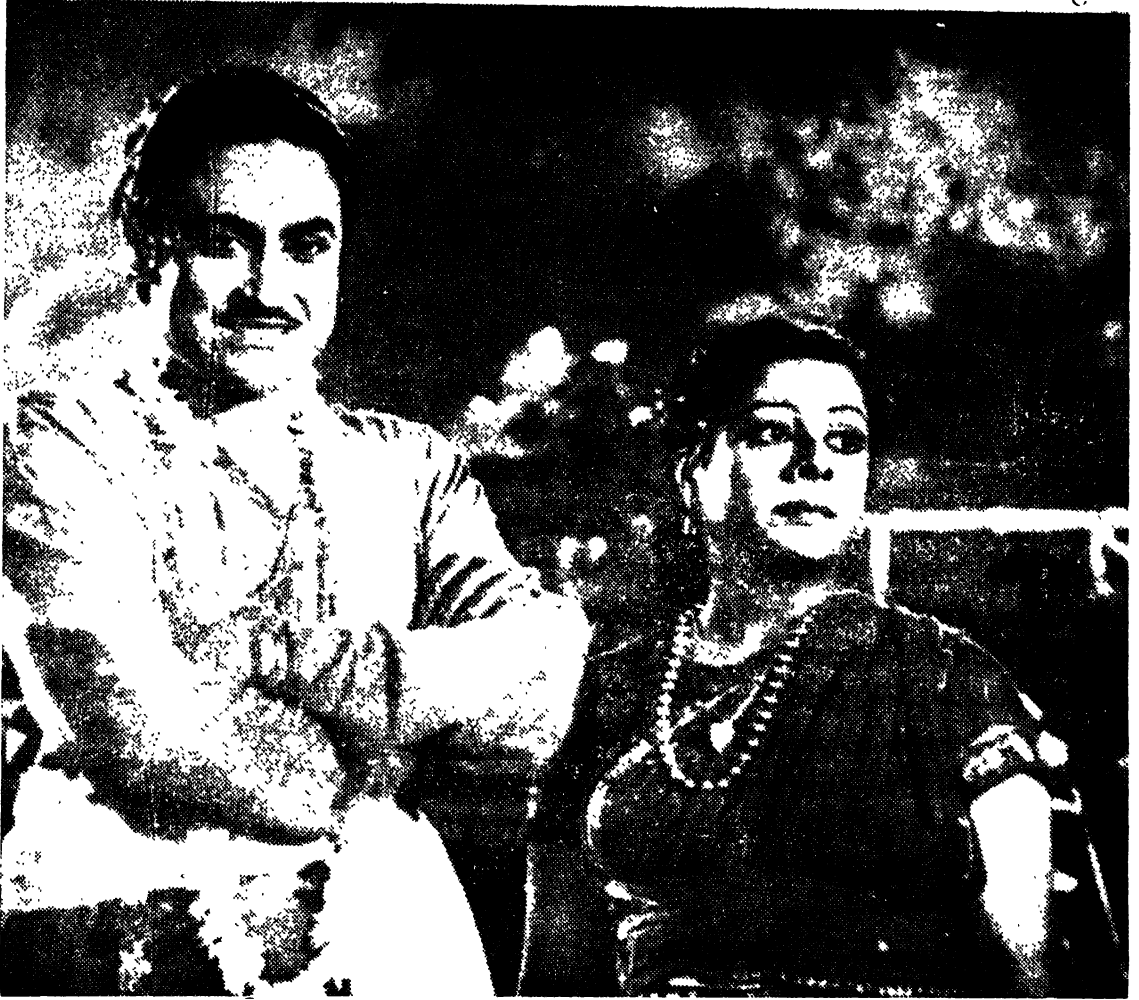
সন্তমুক্ত পাইয়োনীয়ার পিকচার্স-এর চন্দ্রশেখর চিত্রে অশোক কুমার ও কানন দেবী, পরিচালনায় :—দেবকী বসু

ওরিয়েন্টাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স, ৯০।১ হাজরা রোড।

পবিত্রকুমার দাশগুপ্ত (অম্বিকা রোড, ফরিদপুর)

বর্তমানে বাংলা চিত্রজগতে গুণী Sound manকে ?

●● শ্রীযুক্ত অতুল চট্টোপাধ্যায়, যতীন দত্ত, শম্ভু সিং প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

রবী বসু (চুচুড়া)

●● আপনার প্রশ্নের উত্তর এই বিভাগেই অন্যত্র দেখুন।

রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

(১) কঙ্কাবতী এবং চন্দ্রাবতী কি দুই সহোদরা ?

(২) শ্রীমতী কাননের জীবনী জানিতে চাই। তাঁর কি কোন জীবনীর বই আছে ?

●● (১) হ্যাঁ। (২) না। রূপ-মঞ্চে তাঁর জীবনী প্রকাশিত হ'য়েছিল। ঐ সংখ্যা বর্তমানে আর নেই। রূপ-মঞ্চে যে সব শিল্পীদের জীবনী প্রকাশিত হ'য়ে থাকে, সেগুলি দিয়ে পৃথকভাবে পুস্তক প্রকাশের জন্য আমরা আয়োজন কচ্ছি।

ফনীভূষণ গুপ্ত (গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
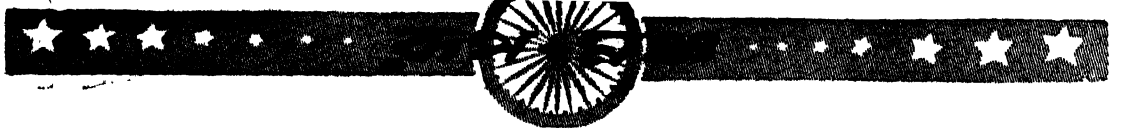
আপনার আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ। প্রচ্ছদপট সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, আবার অনেকে চান যাতে প্রতি মাসেই বদলে দেওয়া হয়। তাতে চোখকে আনন্দ দেয় সত্য কিন্তু সে ব্যয়ভার সব সময় কাগজের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

সুধীরেন্দ্রনাথ বর্মন (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর)

●● কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে কারোর কাছে আমরা উমেদারী করতে পারি না। আমাদের প্রচেষ্টা সব সাধারণকে নিয়ে। তবে যদি আপনার উপযুক্ততা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র আপনার সহায়ক হতে পারি।

মথুরা নাথ গুপ্ত (অপার চীৎপুর রোড, কলিকাতা)

রূপ-মঞ্চ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আপনার মতে আমাদের দেশে যতদিন অভিনয় শিক্ষা দেবার জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠে ততদিন আমাদের মধ্যে যারা প্রতিভাবান তাঁদের প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ হবে না এবং হ'লেও তাঁরা ততটা উন্নতি লাভ করতে পারবেন না। আমারও এরকম ধারণা এবং কেউই এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারেন না। আপনারা যদি সকলে মিলে এরকম একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন, তা হ'লে আশা করি শিল্পপ্রিয় জনসাধারণ আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

●● নাট্য-বিদ্যালয় নিয়ে আপনি যে চিন্তা করেন এজন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমরা কাগজের মারফৎ যতটুকু করার তা করে যাচ্ছি—সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হ'তে পাচ্ছি না বলেই এরূপ প্রচার কার্য করে যাচ্ছি। রূপ-মঞ্চকে যদি এমন একটা স্তরে আমরা পৌঁছে নিয়ে যেতে পারতাম—যখন তার কোন মালিন্যই থাকতো না, তখন আমাদের প্রচেষ্টা এরূপ নাট্য বিদ্যালয় প্রভৃতি কার্যকরী পরিকল্পনায় নিয়োগ করতে পারতাম।

হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দী রোড, সাকচী, জামসেদপুর)

●● 'রাই'র জন্য যে অভিনন্দন পাঠিয়েছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের ওখানে নতুন বাংলা ছবি দেখানো হয় না বলে যে অভিযোগ করেছেন—তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। এবিষয়ে সংঘবদ্ধভাবে স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের কাছে আবেদন করুন।

পুষ্পরাণী ও মানিক চক্রবর্তী (থানা রোড, শিলং)

(১) শিশুদের উপযোগী 'এ্যাডভেনচার' ছবি তোলা সম্বন্ধে আপনার কি মত? (২) সিনেমার জন্য কোন বইয়ের স্বত্ব কিনিতে হইলে কি করিতে হয় (৩) রাত্রি বইটির পরিবেশক কে?

●● (১) রূপ-মঞ্চ মারফৎ এ বিষয়ে আমার অভিমত একাধিকবার ব্যক্ত হ'য়েছে, এর প্রয়োজনীয়তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। (২) লেখক, প্রকাশক অথবা যিনি বইটির স্বত্বাধিকারী তাঁর কাছ থেকে অর্থের বিনিময়েই স্বত্ব ক্রয় করতে হয়। বর্তমানে বাংলা চিত্রজগতে একটা কাহিনীর মূল্য দু' হাজার থেকে বারো হাজার টাকা অবধি। (৩) মিঃ পি, কে, আচান। তবে বর্তমানে ছবিটি নিতে হ'লে ৩, কেমাক ষ্ট্রীটে মিঃ বি, আর সিংদেওর কাছে অনুসন্ধান করতে হবে।

মণি গাঙ্গুলী (রামাপুরা, বারাণসী)

বর্তমান চলচ্চিত্র কাহিনী সম্বন্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে। আজকাল প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, পরিচালক নিজেই কাহিনীকার হয়েছেন। ছবিকে ভাল করতে হ'লে চাই ভাল কাহিনী। আর কাহিনী সম্বন্ধে পরিচালকের জ্ঞান এত অল্প যে, তাতে তার অজ্ঞতাই বার বার প্রকাশ পায়। পরিচালকদের এইটুকু রূপ-মঞ্চ যেন জানিয়ে দেয় যে, অর্থ এবং ক্ষমতা বলেই কাহিনীকার হওয়া যায় না।

●● ছবির কাহিনীই যে মূল, আপনার মত একথা স্বীকার করি এবং আজকাল বহু পরিচালক যাঁদের সাহিত্যে হাতে খড়িও হয় নি, তাঁরা কলম ধরে নিজেদের পরিচালিত চিত্রগুলি যেরূপে আমাদের কাছে তুলে ধরছেন, তাতে শুধু অজ্ঞতাই নয়, ধৃষ্টতারও পরিচয় পাচ্ছি। রূপ-মঞ্চ এই ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করেনি, করবে ও না।

মাণিকরতন ভট্টাচার্য (বড় বাজার, মেদিনীপুর)

চার পৃষ্ঠার চিঠিতে আপনি রূপ-মঞ্চকে আক্রমণ
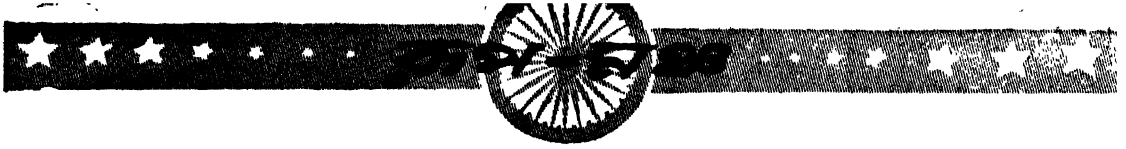
প্রসংগে যে সব হীন উক্তি এবং ছেলে মানুষের মত যুক্তি দেখিয়েছেন—তা প্রকাশ করে যেমনি অযথা রূপ-মঞ্চের পাতা নষ্ট করতে পারি না, তেমনি রূপ-মঞ্চের অন্যান্য পাঠক-গোষ্ঠীর কাছে আপনার নীচতাকে উদ্‌ঘাটনও করবো না। তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বাণীকুমার এঁদের লেখা রূপ-মঞ্চে কেন দেখতে পান না সেজন্য অভিযোগ করেছেন। প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র,নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য এঁদের রচনা একাধিকবার রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হ'য়েছে। ভবিষ্যতে হবেও। তারাশঙ্করের রচনাও রূপ-মঞ্চে দেখতে পাবেন। এবার পূজোতেও তাঁকে লিখতে অনুরোধ করা হ'য়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্যই তিনি লিখে উঠতে পারেন নি। বনফুলের সংস্পর্শে অবশ্য আমরা আসতে পারিনি। বাণীকুমারকে এঁদের সম মর্যাদা দিতে আমি নারাজ। একমাত্র বেতার বা বেতার-নাটক সম্পর্কেই তাঁর বলবার অধিকারকে আমি মেনে নেবো এবং সে বিষয়ে তাঁকে লিখতে অনুরোধ করা হবে। তাছাড়া চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের বিশেষজ্ঞদের রচনাই রূপ-মঞ্চের বেশী প্রয়োজন এবং আমরা সেদিকেই লক্ষ্য রাখি। নিছক খ্যাতনামা সাহিত্যিক-দের রচনা যদি আপনি চান, রূপ মঞ্চ আপনাকে তৃপ্তি দিতে পারবে না। নিছক সাহিত্য পত্রিকার দ্বারস্থই আপনাকে হ'তে হবে।

খোকন সরকার (ফরিদপুর হাইস্কুল, ফরিদপুর)

আজ আমরা একটি প্রস্তাব আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই। আমাদের একটি 'Yong Boys' Club' আছে। এটী কেবলমাত্র খৃষ্টানদের জন্য। এই ক্লাবের যারা সভ্য, তাদের বয়স আট থেকে আঠারো বৎসর। এখানে তাদের খেলা শেখান হয়। অভিনয়, গান ইত্যাদিও শেখানো হয়। গত ২৮।১০।৪৭ তারিখে আমাদের এই ক্লাবে একটী সভা হয়। এই সভায় ক্লাবের সভ্যগণ প্রস্তাব করিয়াছে যে, চিত্র জগতে আজ পর্যন্ত খৃষ্টানদের কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। আমরা চাই, যাতে খৃষ্টানরা চিত্র জগতে উপযুক্ত স্থান লাভ করিতে পারে সেজন্য রূপ-মঞ্চ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এই কমিটি আরো স্থির করিয়াছে যে, যদি আমাদের এই

সারা জীবন যিনি ক্যামেরার সামনে এসেছেন – আজ তিনি নিজেই ক্যামেরা ধরেছেন।

প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্য হইতে যাহাদের নৈপুণ্যের পরিচয় পাইবো তাহাদের আপনাদের কাছে পাঠাইয়া দিতে পারি।

●● আপনার চিঠির মারফৎ আপনাদের ক্লাবের প্রস্তাব সম্পর্কে অবগত হলাম। চিত্র বা নাট্য-জগতে ক'জন খৃষ্টান, মুসলমান বা হিন্দু শিল্পী আছেন ধর্মের ভিত্তিতে আমরাও যেমনি হিসাব কষে দেখিনি, আপনাদেরও তেমনি কষে দেখতে নিষেধ করবো। সংখ্যগণের ভিত্তিতে আর কিছু দাবী করবেন না। আপনাদের কথা দিচ্ছি, যদি আপনাদের ভিতর সে রকম উপযুক্তের আবির্ভাব হয়, আমায় জানাবেন। অভি-নয় জগতে তাদের প্রবেশ পথে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

গীতা মুখোপাধ্যায় (বেলিয়াঘাটা)

●● নামের সংগে পুরো ঠিকানা না লিখলে কোন চিঠিরই জবাব দেওয়া হয় না। অবশ্য কোন পাঠক পাঠিকারই পুরো ঠিকানা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় না।

চন্দ্রশেখর প্রসাদ দে (জামালপুর, মৈমনসিংহ)

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। আপনাদের রূপ-মঞ্চকে প্রাণাধিক ভালবাসি। সময়মত না পাইলে অস্থির হইয়া যাই। গত বৎসর (১৩৫৩)-এর চৈত্র সংখ্যার জন্য দশ আনা অতিরিক্ত 'মণি-অর্ডার' করিতে হইয়াছিল। যদি এভাবে আমাদের প্রায় সংখ্যারই আলাদা দাম দিয়া লইতে হয় তবে বড়ই দুঃখের ও লজ্জার কথা। আপনি এই দশ

আনা গত ২রা জুন গ্রহণ করিয়াছেন। সেই পয়সার জন্য এখন আপনি কী করিবেন। গ্রাহক ও গ্রাহিকাদের প্রতি যদি আপনার "কৃপাদৃষ্টি" না থাকে তাহা হইলে আমরা খুবই মর্মাহত হইব। * * * অন্যান্য মাসিক পত্রের তুলনায় আপনারা যথেষ্ট লাভবান হন। কারণ, মাসিক পত্রিকার দাম এক বৎসরে যোগ (Including Postage Charge) করিলে যাহা হয় তাহা অপেক্ষাও কিন্তু বেশী লইতেছেন, তাহা নয় কী? একবার হিসাব করিয়া দেখুন।

●● রূপ-মঞ্চের প্রতি আপনার অন্তরের গভীরতাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের এই অনুরাগই একমাত্র আমাদের পাথেয়। যদি কোন দিন আপনাদের অনুরাগের মর্যাদায় আঘাত দিয়ে থাকি, আমাদের সে অক্ষমতার জন্য আশা করি ক্ষমা করবেন। ডাকযোগে অনেক সময় রূপ-মঞ্চ পান না বলে আপনি যে অভিযোগ করেছেন, সে অভিযোগ সত্যি আমাদের কতখানি প্রাপ্য দয়া করে একবার যদি তা বিচার করে দেখতেন! প্রতি মাসে গ্রাহকদের কাগজ পাঠানোর সময় যারা কাগজ প্যাক করে, আমরা শুধু তাদের পরই নির্ভর করে থাকি না। রূপ-মঞ্চ সম্পাদক স্বয়ং তার সহকারীদের নিয়ে 'প্যাকিং' এবং 'চেকিং' এর কাজে হাত লাগান। দূর থেকে আপনারা হয়ত বিশ্বাস করতে পারবেন না—কাগজ প্রকাশিত হবার মুখে যে সব স্থানীয় পাঠক-পাঠিকারা আমাদের কার্যালয়ে আসেন, একাধিকবার তাঁরা ঐ কাজে আমাদের রত থাকতে দেখেছেন। এতখানি সতর্কতার সংগে চলেও যখন আপনাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে—তখন বুঝতে পারেন দোষ আমাদের নয়। স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের বন্ধুরা আমাদের সর্ব-প্রকার সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু গোলমালের সৃষ্টি হয় তখনই, যখন তাঁদের হাতের বাইরে যেয়ে পড়ে। ডাক-বিভাগের বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে শুধু আমাদেরই নয়—আজকাল প্রত্যেকেরই অভিযোগ দিন দিন স্তূপীকৃত হচ্ছে। বলতে পারেন, যদি কোন গ্রাহক কাগজ না পেয়ে থাকেন, তাহ'লে তাঁকে আবার কেন পাঠানো হয় না। এই প্রসংগে বলতে পারি—স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সার্টিফিকেট সহ যদি কোন গ্রাহক কোন মাসের কাগজ পাননি বলে আমাদের লিখে জানান—বিনা মূল্যে তাকে পুনরায় কাগজ পাঠিয়ে থাকি এবং এই যে কাগজ হারানো যায় এজন্য যদি পোষ্ট-অফিসের কাছে আপনারা একাধিকবার অভিযোগ করেন তাতে তাদেরও একটু চৈতন্য হয়। অথচ আপনারা সে কষ্ট স্বীকারটুকু করতে নারাজ। আপনি গ্রাহকদের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করে যে ব্যঙ্গ করেছেন, সেজন্য সত্যই মর্মাহত হলুম। রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজের সংগে কী তার এই সম্পর্কই গড়ে উঠেছে? রূপ-মঞ্চ পাঠক সমাজের ইচ্ছানুযায়ীই পরিচালিত হয়—পরিচালকগণের ইচ্ছানুসারে নয় এবং একথা আপনারা অনেকেই জানেন না—রূপ-মঞ্চে যেসব কর্মীরা রয়েছেন, সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ বা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আত্মীয় বা পরিচিতদের ভিতর থেকে কাউকে গ্রহণ করা হয় নি। আমাদের প্রতিজন কর্মীকে পাঠক সাধারণের মধ্য থেকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। আপনি লিখেছেন, বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং আমাদের হিসাব কষে দেখতে বলেছেন। আমি হিসাব কষেই দেখাচ্ছি। ধরুণ, এগারোটা সংখ্যা এবছরে প্রকাশিত হবে। কাগজের নিয়ন্ত্রণ আইন এখন পর্যন্ত বলবৎ থাকার দরুণ পুজো বা বিশেষ সংখ্যাগুলিতে আমরা যে পৃষ্ঠা সংখ্যা ব্যবহার করে থাকি, তাতে একটী সংখ্যা যুগ্ম না করলে আইনের চোখে অভিযুক্ত হ'তে হবে। আচ্ছা এই এগারোটী সংখ্যার ভিতর নয়টীর দাম দশ আনা করে হ'লে মোট দাঁড়ায় পাঁচ টাকা দশ আনা। পূজা সংখ্যা আড়াই টাকা, পৌষালী এক টাকা। তা হ'লে সর্বসমেত দাঁড়াচ্ছে নয় টাকা, দু'আনা। এছাড়া ডাক খরচ রয়েছে এবং মাঝে মাঝে আরও অতিরিক্ত বিশেষ সংখ্যা প্রয়োজন বোধে প্রকাশিত হয়—তাছাড়া—নিয়ন্ত্রণ আদেশ উঠে গেল আরও অতিরিক্ত এক সংখ্যা পাচ্ছেন। এবার বলুনত, সত্যিই বার্ষিক গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কিনা?

পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ)

আপনি যে কোন দিন ১০-১১টার ভিতর আমার সংগে দেখা করতে পারেন।
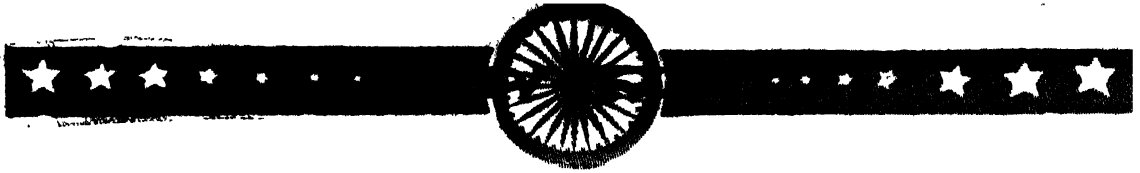
'সর্বহারা' চিত্রের একটী দৃশ্যে তুলসী, রবীন প্রভৃতি।

এম, চ্যাটার্জি (ধুবড়ী, আসাম)

(১) রূপ-মঞ্চের ২য় সংখ্যায় নবাগতা অনুভা গুপ্তার ছবি দেখলাম। মুখখানা যেন চেনা মনে হ'লো—ইনি কি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন? বিনতা রায়, কানন দেবী, সন্ধ্যা রাণী, দেবীকারাণী এঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে কী?

●● (১) এর আসল নাম মৃদুলা গুপ্তা। রূপমঞ্চে ইতিপূর্বে এর একখানি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। ইনি কবি আভা গুপ্তার মেয়ে। শান্তি নিকেতনের ছাত্রী ছিলেন কিনা আমি তা ঠিক বলতে পারবোনা। (২) এরা কেউ ডিগ্রী ধারী নন। তবে দেবীকারাণী—বিনতা রায়—শিক্ষার গর্ব করতে পারেন।

এম, এ সালেক (এগরা, মেদিনীপুর)

(১) Filmfan কাহাকে বলে। চিত্রতারকাদের সংগে এদের সম্পর্ক কী?

(২) স্বপ্ন ও সাধনার পরিচালক দেখলাম অগ্রদূত। এঁর আসল নাম কী?

●● (১) Filmfan. বলতে সাধারণতঃ অতি উৎসাহী দর্শকদের বোঝায়। সিনেমার প্রতি যাঁদের অনুরাগের মাঝে উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা বেশী পরিলক্ষিত হয়। এঁদের শ্রেণীরই অনেকে যাঁরা বিশেষ বিশেষ শিল্পীদের অনুরক্ত তাঁদের সেই শিল্পীদের "Fan" বলা হয়। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এই Fan সৃষ্টি করার জন্য শিল্পীরা যথেষ্ট সতর্ক থাকেন। 'Fan'-দের
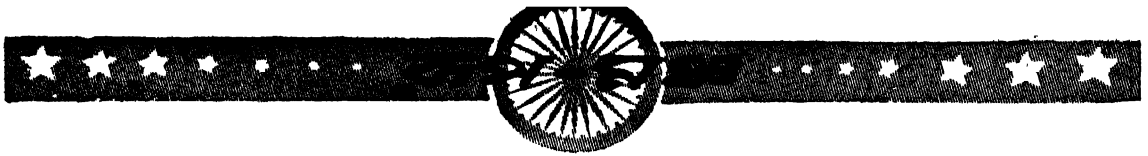
সংখ্যা থেকে অনেক সময় শিল্পীদের জনপ্রিয়তা পরিমাপ করা হয়। 'Fan' এবং শিল্পীদের সম্পর্ক আশা করি আর বেশী বুঝিয়ে বলতে হবেনা! (২) শ্রীযুক্ত বিভূতি লাহা, বর্তমানে পথের দাবীর হিন্দি সংস্করণের পরিচালনা করছেন।

সইদুল রহমান (সুভাষ চন্দ্র রোড, বাঁকুড়া)
সুনন্দা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, সুমিত্রা ও রেণুকা এদের পর পর সাজিয়ে দিন। এঁদের মধ্যে কে কে নিজস্ব কণ্ঠে গেয়ে থাকেন?

●● সুনন্দা, সন্ধ্যা, সুমিত্রা, রেণুকা, সাবিত্রী। পর্দায় এদের প্রত্যেকের মুখেই অন্যের কণ্ঠ শুনতে পান।

নিশারাণী বসু (ধর্মতলা লেন, হাওড়া)
অশোক কুমার কি নিজে গেয়ে থাকেন?

●● হাঁ।

রফীউদ্দীন আহম্মদ (জংসন রোড, খুলনা)
বর্তমানে বাংলা চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেখা যায়না কেন? আর প্রমোদ গাঙ্গুলীই বা কোথায়?

●● ধীরাজ ভট্টাচার্যকে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'নতুন খবর' চিত্রে দেখতে পারেন। প্রমোদ গাঙ্গুলী কলকাতাতেই আছেন। প্রশান্ত প্রডাকসন্সের রক্তরাখী চিত্রে অভিনয় কচ্ছিলেন। চিত্রখানির নির্মাণ কার্য কিছুদিন বন্ধ আছে। শীঘ্রই আবার সুরু হবে।

সুষমা চৌধুরী (রতনবাবু রোড, কাশীপুর)
কিছুদিন পূর্বে রূপ-মঞ্চে দেখেছিলাম যে, সবচেয়ে সুন্দর অভিনেতা অসিতবরণ আর সুন্দরী সুমিত্রা দেবী। এখন কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর অভিনেতা শ্রীপ্রদীপকুমার (অলকানন্দার) আপনার এবিষয়ে কি অভিমত?

●● প্রদীপ কুমারের অভিনয়-দক্ষতা সম্পর্কে আমি আশাবাদী। প্রিয়দর্শনও বটে। দেহের তুলনায় তার মাথাটা একটু ছোট, নইলে তাকে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দর অভিনেতা বলা যেত। প্রদীপ কুমার ছাড়াও আজকাল কয়েকজন প্রিয়দর্শন নবাগতের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি এবং পাবো। তাই বর্তমানে সবচেয়ে কে বেশী সুন্দর বলা কঠিন। 'বার্মার পথে' চিত্রে নবাগত সমর রায়ের সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। তার মিঠেল চেহারা সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আবজল রহমান খাঁ (হবিবপুর, মেদিনীপুর)

●● আপনি কয়েকটি এমন প্রশ্ন করেছেন, রুচির দিক-থেকে সেগুলিকে মোটেই সমর্থন করতে পারিনা। আশা করি ভবিষ্যতে এই ধরণের কৌতূহল দমন করেই রাখবেন।

শঙ্করপদ বন্দোপাধ্যায় (মিনিষ্ট্রি অফ ওয়ার্কস, মাইনস এ্যাণ্ড পাওয়ার, নিউ দিল্লী)
(১) আপনারা সর্বদাই চিত্র নির্মাতা, পরিচালক ও অভিনেতাদের সংস্পর্শে আসেন। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হ'য়েছে। এখন সুট ও টাই লাগিয়ে অভিনয় করাটা কি ঐসব লোকদের বলে বন্ধ করানো যায়না? (২) যুদ্ধের অবসান হ'য়েছে। দেশও স্বাধীন হ'য়েছে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে Ministry of Education প্রত্যেক বছর বিদেশে এদেশের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার্থ পাঠায় কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, কাঁচা ফিল্ম যাতে এদেশে তৈরী হতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্য কাউকেই পাঠানো হয়না। এবিষয়ে আপনারা আন্দোলন করেননা কেন? (৩) সিমলার বিখ্যাত অবৈতনিক মঞ্চাভিনেতা মিহির দেব (H. Q of India-তে চাকুরী করেন) ভাস্কর দেব নাম নিয়ে লীলাময়ী পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র' দেবদূত এ অভিনয় করেছেন একথা কী সত্য?

●● (১) আপনার প্রশ্ন শুনে একটী প্রাচীন প্রচলিত গল্প মনে পড়ে গেল। এক ব্রাহ্মণের এক ক্রীতদাস ছিল। ক্রীতদাসের চিহ্নস্বরূপ তার গলায় একটা লোহার বেড় ঝোলান থাকতো। ক্রীতদাসটী যখন বড় হ'লো, প্রায়ই এর ওর কাছে আক্ষেপ করতো—। ব্রাহ্মণটী সত্যই খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি ক্রীতদাসটীর অসন্তোষের বা দুঃখের কারণ জানতে চেষ্টা করলেন। এবং মনে মনে স্থির করলেন, না ওকে মুক্তিই দিয়ে দেবেন। কিন্তু অন্তরালে থেকে একদিন ব্রাহ্মণ শুনতে পেলেন—পরাধীনতার জন্ম তার গ্লানি নয়-সে কিছু কিছু অর্থ কামনা করে যা, সে তার মনের মত খরচা করতে পারে। ব্রাহ্মণ এর পর থেকে ক্রীতদাসকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু দেখা গেল ক্রীতদাসটী সে অর্থ আর খরচা করেনা। বেশ কয়েকদিন চলে গেল। একদিন ক্রীতদাসটী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে
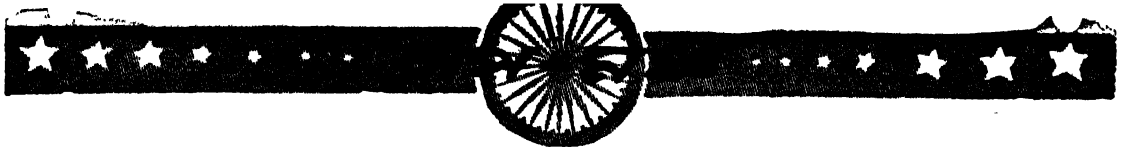
সামনে এসে দাঁড়ালো। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—কী, কিছু বলবে? ক্রীতদাস নতমস্তকে বল্লে, আপনি যে আমায় অর্থ সাহায্য করতেন তা জমিয়ে আমি গলার এই লৌহ বেড়কে স্বর্ণ দিয়ে আচ্ছাদন করে নিয়েছি। আর আমার কোন দুঃখ নেই। ঐ লৌহ বেড়টাই আমার কাছে বিশ্রী-ঠেকতো। ব্রাহ্মণ গম্ভীর স্বরে একবার স্বর্ণ গলাবন্ধের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, বেশ, এসো। ব্রাহ্মণটীর মনে এরপর ধিক্কার এলো, সত্যই এই লোকটী ক্রীতদাস থাকতে থাকতে তার স্বাধীনচেতা মন নষ্ট হ'য়ে গেছে। সে স্বর্ণ বেড়দিয়ে তার ক্রীতদাসের চিহ্নটাকে নিজেই স্থায়ী করে নিল। কিছু-দিন বাদে ব্রাহ্মণটী তার সমস্ত সম্পদ জনহিতকর কার্যে দান করে—ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়ে সংসার ধর্মত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণটীর এই মহানুভবতায় সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। ক্রীতদাসটী মুক্তি পেয়েও কিন্তু তার কণ্ঠের স্বর্ণাচ্ছাদিত বেড়টাকে খুলে ফেললোনা। সে গর্বের সংগে বলতো, জানিস, আমি অমুক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলাম। আমার প্রভুর দয়াতেই আমার কণ্ঠের এই বেড় স্বর্ণাচ্ছাদিত। দীর্ঘদিনের দাসবৃত্তি মানুষের মনের স্বাধীন সত্তাকে এমনি ভাবে নষ্ট করে ফেলে। আমাদের প্রভুরা অবশ্য ইচ্ছা করে আমাদের মুক্তি দিয়ে জাননি—দীর্ঘ-দিনের পরবশতার মাঝেও আমাদের যাঁদের স্বাধীনচেতা মন নষ্ট হয়ে যায়নি, তাঁদেরই আজীবন সাধনা ও সংগ্রামে দেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসটীর মত মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকেরও অভাব নেই। তাদের ইংরেজ প্রভু প্রথম আগমনের দিনে দয়া করে তাদের হাতে মদের বোতল তুলে দিয়েছিলো—গলায় বিদেশীয় পোষাকের ফাঁস লাগিয়ে ছিলো—এমনি আরো বিলাসের উপকরণে তাদের মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলো। তারা কী এত সহজে প্রাক্তন বিদেশী প্রভুর কৃপাদৃষ্টির কথা ভুলে যেতে পারে! অতটা কৃতঘ্নই বা তাদের হতে বলবেন কেন? শুধু অভিনেতাই নন, বড় বড় প্রথম শ্রেণীর প্রযোজকেরাও এখন পর্যন্ত গলায় টাই বেঁধে—মুখে পাইপ ধরিয়ে তাঁদের প্রাক্তন প্রভুদের দানের মহিমা কীর্তন করেন। এখনও তাঁরা বড় সাহেব, ছোট সাহেব ডাকের মাদকতার হাত থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এরাই ছিল মস্তবড় প্রতিবন্ধক—অতীতেও এদের বাদ দিয়েই আমরা সংগ্রাম করে এসেছি। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে এদের অশুচি আত্মার কাছ থেকে আমাদের দূরেই থাকতে হবে—নইলে ভবিষ্যতে জাতিকে খাঁটি করে গড়ে তোলা যাবেনা। (২) এবিষয়ে Ministry of Education-এর দৃষ্টি অকর্ষণের জন্য আমরা চেষ্টা কচ্ছি। কতদূর কী করতে পারি সময় মত জানতে পাবেন। (৩) ভাস্করদেব নামে এক সৌখীন অবৈতনিক অভিনেতা লীলাময়ী পিকচার্সের দেবদূত চিত্রে অভিনয় করেছেন। রূপমঞ্চে তাঁর ছবিও প্রকাশিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাঁর উল্লেখযোগ্য অভি-নয় নৈপুণ্যের কথাও আমরা শুনেছি। তিনিই আপনার উল্লিখিত মিঃ বি দেব কিনা বলতে পারিনা।

মিসেস সুফিয়া হক (সুকান পুকুর, বগুড়া)

(১) কিছুদিন পূর্বে বগুড়ার উত্তরায়, "ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী", বলে একটা হিন্দি ছবি দেখেছিলাম। কয়েক মাস আগে Light House-এ Edward G. Robinson অভিনীত Scarlet Street ছবিটির সংগে "ইয়ে হ্যায় জিন্দগী" গল্পটার আশ্চর্য মিল দেখতে পেলাম। Director Mr Nararng শুধু সামান্য অদল বদল করে ছবিটি চালিয়ে দিয়েছেন এবং ছবিটি যে Scarlet Street এর ছায়া অব-লম্বনে তোলা সে কথা কোথাও স্বীকার করেননি। কোন কোন স্থানে পরিচালনারও হুবহু নকল করা হয়েছে। আমাদের দেশের পরিচালক ও প্রযোজকেরা আর কতদিন বিদেশী ছবি ও গল্পের অনুকরণ করে চলবেন? এই মনো-বৃত্তি কি দুঃখের আর লজ্জার বিষয় নয়? (২) সংবাদ পত্রে কিছুদিন পূর্বে ভারতে 8 M, M film এর ভবিষ্যৎ ও প্রসারতা সম্বন্ধে পড়েছিলাম। আমেরিকান ও বৃটিশ ব্যবসায়ীরা নাকি এই বিষয়ে খুবই তৎপর হয়ে উঠছেন। সেই সম্বন্ধে তাদের প্রতিনিধিরাও নাকি ভারতে কয়েকবার যাওয়া আশা করেন। ইতিমধ্যে 8 MM Talkie Projector ও বাজারে নাকি বেরিয়েছে। (Fazalbhoy Patel Co প্রভৃতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গুলির বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য) এবং এও শুনেছি যে, বোম্বাই এর Ranjit film

Co. এরই মধ্যে 8 M M film. এর একটা ছবিও তুলে ফেলেছেন ও ভবিষ্যতে আরও তুলবেন। ভারতে ও পাকিস্থানে 8 M M film এর বিস্তার লাভ সম্বন্ধে আপনার মত কি? এর দ্বারা 35 M M film এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার কী?

●● (১) 'ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী' বা Scarlet Street চিত্রের কোন খানিই আমি দেখিনি। আপনি যখন দু'খানি ছবিই দেখতে পেয়েছেন, তখন আপনার বিচার শক্তিকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। এবং আমাদের দেশীয় প্রযোজক বা পরিচালকদের এই হীন প্রবৃত্তিকে কোন সময়ই প্রশংসা করতে পারবো না। একটা কথা কী জানেন, মানুষের নিজের ওপর যখন বিশ্বাস থাকেনা—অর্থাৎ অপরকে দেবার মত যখন স্বকীয় প্রতিভার কিছু থাকেনা—তখনই এই ধরণের চৌর্যবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু মি: নারাং-ই নন—আমাদের চিত্রজগতে এই অন্তঃসার শূন্যদের আনাগোনা এখনও বন্ধ হয়নি। অধিক সংখ্যক প্রতিভার আগমন যখন হবে তখন এরা বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। (২) 8 M M filim এর প্রচলন 35-M M পথে আশংকার কোন কারণ থাকতে পারেনা। বরং পল্লী অঞ্চলে, বিদ্যালয়ে, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান উপলক্ষে 8 M M film অতি সহজে তার স্থান করে নিয়ে চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় করে তুলতে যেমনি প্রভূত সাহায্য করবে, তেমনি জনকল্যাণের প্রভূতকার্যে তাকে নিয়োগ করতে পারা যাবে।

ইন্দু সেন (নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা)

(১) স্ব ও সাধনা, অলকানন্দা ও অভিযোগ এই তিনটির মধ্যে কোনটিকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যেতে পারে? (২) ইলা ঘোষ, সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন, বীণা চৌধুরী ও তৃপ্তি সিংহ এরা সবাই কি চলচ্চিত্রে গান গেয়ে থাকেন?

●● (১) নিঃসন্দেহে স্বপ্ন ও সাধনাকে (২) হ্যাঁ এরা সবাই পর্দায় Play back-এ গেয়ে থাকেন।

এম, এ, হেনা (বণ্ডেল, হুগলী)

রবীন মজুমদারকে অনেকদিন দেখতে পাইনি। তিনি কি চিত্র জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন?

●● না। তাঁকে আগামী একাধিক চিত্রে দেখতে পাবেন। বর্তমানে মজুমদার-স্বামী প্রডাকসন্সের সর্বহারা চিত্রে অভিনয় করছেন।

শ্যামল দাশগুপ্ত (মীরবাজার, মেদিনীপুর)

আপনাদের আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীমতী রমা দত্তের প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন যে, জনসাধারণের রুচিকে আঘাত করতে পারে এমন কোন বই যদি কোন প্রেক্ষাগৃহে আসে—তাহলে সে প্রেক্ষাগৃহের ও তার মালিকের নাম ও ঠিকানা জানালে তাদের অবহিত করতে চেষ্টা করবেন। আমাদের এখানে হরি সিনেমা নামে একটী প্রেক্ষাগৃহ আছে। তার মালিকের নাম শ্রীহরিচরন সাউ, সাং বল্লভপুর, পোঃ মেদিনীপুর। এরা রুচি বিগর্হিত বহু ছবি আনে। এদের একটু অবহিত করে তুলবেন।

●● আপনার চিঠি পেয়েই শ্রীযুক্ত হরিচরণ সাউকে পত্র লেখা হয়েছে। তবে যে সব ছবি এরূপ রুচিবিগর্হিত আশা করি সেগুলির নাম লিখে আমাদের জানাবেন।

কোন ধরণের চিত্র ও নাটক চাই-

করালীমোহন

করালীমোহন চট্টোপাধ্যায়
(নবীন সরকার লেন, কলিকাতা)

দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের পরও চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যে সকল ছবি তুলছেন, তাতে তাঁদের মনোবৃত্তির কোনই পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কাহিনীকার সেই একই ভাব নিয়ে গল্প লিখছেন। প্রথমেই নায়ক-নায়িকার প্রেম, মাঝখানে দু'জনে দু'জনকে ভুল বুঝে বিরহের গান গাইলেন—আবার ছবির শেষে তাঁদের সে ভুল ভেংগে গিয়ে দোলনায় দুলে গান গেয়ে মিলন—এর কি কোনও ব্যতিক্রম নেই? গান না থাকলেও যে ছবি সমাদর লাভ করে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ "ভাবীকাল"। আজকাল বেশীর ভাগ ছবি হচ্ছে সব খদ্দরের টুপী পরা স্বাদেশিকতা নিয়ে। শিশুদের উপযোগী ছবি তোলা যে কত দরকার কর্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ নেই। কারণ, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ।

জি, কুণ্ডু (রাঁচি)

আজ আমরা বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হ'য়েছি—সামনে জাতি গঠনের বিরাট পরিকল্পনা। এই সমস্ত কল্পনাকে রূপ দিয়ে জাতিগঠনের কাজে সহায়ক হ'তে হবে চিত্র শিল্পীকে বড় বড় বুলি না দিয়ে এক একটী চিত্রে কেবলমাত্র এক একটী বিষয় নিয়ে আনন্দরসের মাঝখান দিয়ে সমস্যা ও তাহার সমাধান যথাযোগ্য ভাবে রূপ দিতে হবে। আর আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে যে সমস্ত বীর শহীদ হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে, তোপের সামনে বা জেলের মাঝে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন; যাঁরা নির্বাসিত জীবন যাপন করে জীবন ও যৌবন পঙ্গু ক'রেছেন; যাঁদের ইতিহাস আজ অধিকাংশ দেশবাসীর কাছে অজানা হ'য়ে আছে, সেই সমস্ত বীরের কার্যাবলী চিত্রে রূপান্তরিত করে আমাদের সামনে ধ'রতে হবে।

জি, কুণ্ডু

উৎপল

উৎপল রায় (দত্তভিলা, টবিন রোড)

যে ছবি ও নাটক আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতিকে সহজ ও সরল করে তুলতে সাহায্য করবে, স্বাধীন ভারতে সেই ধরণের ছবি ও নাটক আমরা চাই। ইতিহাস ও পুরাণের সেই সব কাহিনী আমরা দেখতে চাই, যা' আমাদের পূর্বপুরুষদের তেজস্বিতা, বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় বয়ে নিয়ে আসবে। সামাজিক ছবি বা নাটকে শুধু সামাজিক সমস্যার আলোচনা নয়, তার সমাধানের ইংগিতও যেন পাওয়া যায়। কেবলমাত্র হাল্কা আনন্দদানের জন্যই যে সব ছবি ও নাটক নির্মিত হবে, তার পরিবেশন যেন নির্মলভাবে করা হয়। শিশুদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত নাটক ও ছবির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বিদায় নিলাম।

সুধাংশুকুমার রায় (খুলনা)

আমাদের দেশে আজ চলচ্চিত্র শিল্প
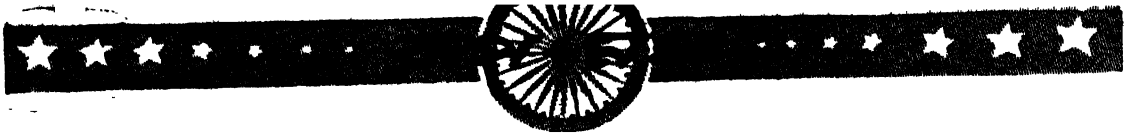
এমনি হওয়া দরকার, যার দ্বারা দেশের অশিক্ষিত জনগণের উপকার হয়। কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ চলচ্চিত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। চিত্র-শিল্পের ভিতর দিয়ে জাতীয় আদর্শ ও কর্তব্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সার্থকতম ও শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে সোভিয়েট্-নাট্যশিল্প।' 'Cinema is the most important of all arts' for us.' লেনিনের বাণীতে তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে। উচ্চাংগের চিত্র সৃষ্টির জন্য উত্তম কাহিনীর আবশ্যক। অভিনয় যতই ভাল হোক্ না কেন, গল্প ভাল না হোলে প্রথমশ্রেণীর চলচ্চিত্র গড়ে উঠ্‌তেই পারে না। নাটকগুলি ও সেরূপ হওয়া দরকার, যার মধ্যে শুধু জাতীয়তাবাদ বা আদর্শবাদের বড় বড় বুলি না দিয়ে কাজ এবং আদর্শের মধ্য দিয়ে যেটি বাস্তব সত্য, সেটি ফুটিয়ে তোলা দরকার যাতে, অশিক্ষিত, অবহেলিত, অনাদৃত, অপমানিত জনগণের সুখ-দুঃখের কথা স্থান পায়।

সুধাংশু
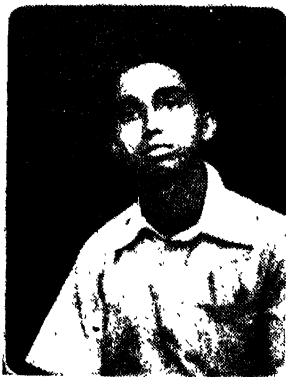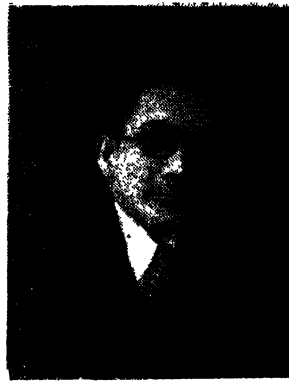
বিমল

বিমল ঘোষ (জলপাইগুড়ি)

নিছক ন্যাকামি, প্রেমের পাগলামী ও মামুলী পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে শোষিত মানব-সমাজের রুচি ও নীতিজ্ঞানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হেতু যথোপযুক্ত "ছবি ও নাটক" চাই।

গগনচাঁদ

গগনচাঁদ মল্লিক (কলিকাতা)

স্বাধীনতা অর্জনে সে সব শহিদ আজীবন সংগ্রাম করে জীবনপাত করেছেন—তাঁদের সেই গৌরবদীপ্ত কার্যাবলী নিয়ে নির্মিত চিত্র বা নাটক আমরা দেখিতে চাই।

খগেন্দ্রনাথ ঘোষ (হেলাতলা রোড, খুলনা)

আজকের দিনে ভারতে এমন চিত্র হওয়া দরকার, যার দ্বারা দেশের অগণিত অশিক্ষিত বুভুক্ষিত জনগণের পথ প্রদর্শকের সহায়তা করে। দেশ আজ স্বাধীন বটে কিন্তু আমাদের মনে আশার স্পন্দন কোথায়? সেই স্পন্দন ও অনুভূতিকে জাগাতে চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের আশা-আকাংখাকে মঞ্চে ও পর্দায় রূপায়িত করতে হবে। তবেইত হবে দেশের উন্নতি। আবার চিত্রকে সুষ্ঠু ও মার্জিত করতে হলে ভাল বই দরকার। শুধু ফাঁকা জাতীয়তাবাদের বড় বড় বুলি না দিয়ে যাতে দেশ গঠনের পক্ষে উপযোগী নির্দেশ থাকে সেইরূপ নাটক হওয়া দরকার। চিত্র ও নাট্য-মঞ্চে কর্তৃপক্ষদের এবিষয়ে অবহিত করে তুলুন।
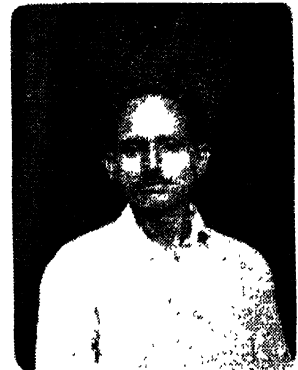
খগেন্দ্রনাথ
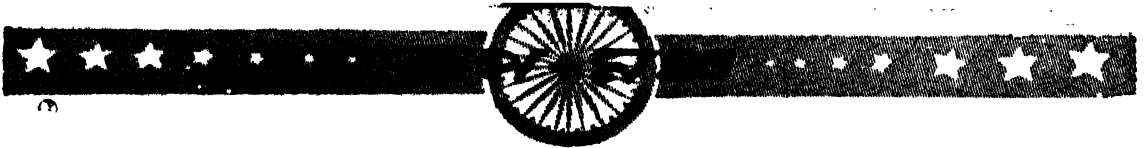
পাঁচুগোপাল

পাঁচুগোপাল পাল (ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা)

শিশুদের জন্য কতকগুলো ছবি তোলবার আবেদন আপনাদের মারফৎ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট জানাচ্ছি।—অধুনা যে সকল ছবি বাজারে বেরোচ্ছে—তা শিশুদের দেখার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নেহাৎ ব্যবসার জন্য এই সকল ছবি তুলে দেশের ও দশের যে অশেষ ক্ষতি করেছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই তাঁদের কাছে আমার ঐকান্তিক অনুরোধ, তাঁরা যেন পয়সাটাই বড় করে না দেখে একটু সমাজের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ ২।১ খানি শিশুদের উপযোগী ছবি তোলবার বন্দোবস্ত করেন।

কালিপদ সাহা (রেলওয়েইয়ার্ড, খুলনা)

'রূপমঞ্চের' অসংখ্য গুণমুগ্ধ গ্রাহকদের ভেতরে থেকে নিজেকে ধন্য মনে করছি। একটু গর্বও যে না হচ্ছে, তা নয়। দু'শ বছরের পরাধীনতার অন্ধকূপের পঙ্কিলতা কাটিয়ে স্বাধীন ভারতের নতুন দিনকে শারদীয়া 'রূপমঞ্চ' অভিনন্দন জানাতে চলেছে। আশা করি, পরাধীন ভারতের কলুষতাকে মুক্ত করবার যে নির্ভীক সাধনা নিয়ে 'রূপমঞ্চ' জন্মগ্রহণ করেছিল, স্বাধীনতার দিনেও সে তার নির্ভীক সমালোচনার ক্ষমতায় পাঠকদের অন্তরে স্থায়ী আসন অক্ষুণ্ণই রাখবে। সামাজিক চেতনার মাঝে বয়ে চলে তৎকালীন মঞ্চ ও চিত্রের ধারা; 'রূপমঞ্চ' সে চেতনাকে নতুন পথে চালনা করুক, এই হচ্ছে আমার কামনা।

কালীপদ

সূর্যকুমার সুর (ডিব্রুগড় আসাম)

রূপমঞ্চের দৃষ্টিভংগী, নিরপেক্ষ মতবাদ, জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত সমালোচনা, স্পষ্টবাদীতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। ছায়া-ছবিকে আমরা জাতীয় সম্পদরূপে পেতে চাই যা, আমাদের উন্নতির সহায়ক হয়। নিছক আনন্দ দান অথবা নীরস দেশপ্রেমের ফাঁকা বুলি

সূর্যকুমার

আমরা চাই না। এমন চাই, যা আমাদের চিন্তা শক্তিকে বিকৃত না করে দৃঢ় করে এবং সুপথে চালিত করে। রূপমঞ্চ চিরকাল জনকল্যাণে লিপ্ত থাকুক, এই আশা। আপনারা এই অসমীয়া পাঠকের অভিনন্দন গ্রহণ করুণ।

ব্যোমকেশ অধিকারী (ব্যাটরা পারিজাত সমাজ, হাওড়া)

স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই বাংলার তথা ভারতের মঞ্চ ও পর্দা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষ এবং তৎসম্পর্কীয় সাংবাদিকগণেরও উপর জাতিগঠনের গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। দেশাত্মবোধ ও গণসংযোগের ভিতর দিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং সর্বপ্রকার গঠনমূলক কার্য প্রসারের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করাই এখন তাঁহাদের এবং আপনাদেরও প্রধানতম কর্তব্য হইবে, ইহাই আমি মনে করি। জয় হিন্দ।

নায়ক-নায়িকার চরিত্রে দেশের জন্য প্রাণদান, দরিদ্র সেবা, সমাজ ও পল্লী সংস্কারক হিসাবে দেখাইলে কি কোন আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ?
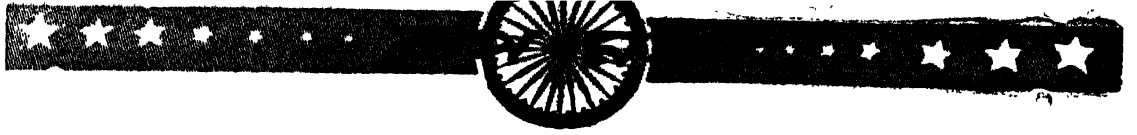
ব্যোমকেশ

প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়
(জামসেদপুর)

দেশের ভবিষ্যত সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, সেইরূপ অবদান লইয়া ছবি সৃষ্টি করাই মঙ্গলকর। প্রেমের মূল্য ও সম্মান সর্বকালীন। তথাপি মামুলি ধরণের প্রেম বা শাদা কথায় ঢলাঢলি আজকের দিনে অচল। প্রেম এমন সস্তা জিনিস নয় যে, দু'দশ মিনিটে মানুষ প্রেমে পড়িতে পারে। এ জিনিসটি ছবিতে প্রাধান্য না দিয়া

প্রভাতকুমার

নির্মল

নির্মল দে (আদরা, মানভূম)

প্রায় দু'শ বৎসরের পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের পরাধীনতার গ্লানি দূর করতে হ'লে আজ সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশের মহামারী, দারিদ্র, কুশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি উচ্ছেদ ক'রে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনচেতা মানুষ গড়ে তোলা। সেই গুরু-দায়িত্বই আজ নিতে হ'বে ভারতের চলচ্চিত্র এবং নাট্যশিল্পকে। শিল্প এবং আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়ে দূর করতে হবে দেশের সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা —তৈরী করতে হ'বে ভবিষ্যৎ ভারতের সত্যিকারের মানুষ! স্বাধীন ভারতের চিত্র এবং নাটকগুলির মাঝে আমরা সেই প্রচেষ্টাই দেখতে চাই।
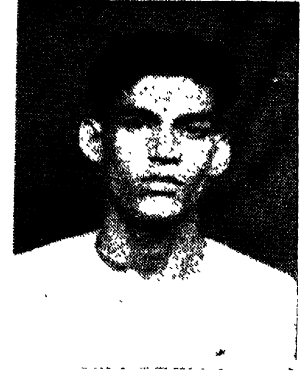
পঞ্চানন বন্দ্যো

পঞ্চানন বন্দ্যো (কলিকাতা)

নিছক চিত্তবিনোদনের কাজেই নয়, চিত্র ও নাট্য-মঞ্চকে দেশ ও জাতির গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চাই।

ব্রজকুমার ঘোষ (কলিকাতা)

যে ছবি ও নাটকে আমাদের জাতীয় জীবনের অসংখ্য সমস্যার সমাধান দেখতে পাবো আজকের দিনে সেই ছবি ও নাটকই চাই।

ব্রজকুমার
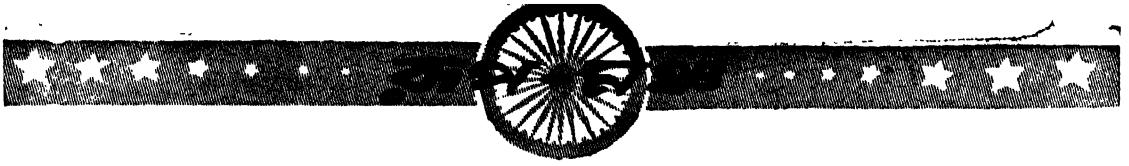
কুমারী রমা বসু
(কাঁথি, মেদিনীপুর)

"আমি এমন ধরণের চিত্র ও নাটক চাই, যা হতে দেশের, দশের ও সমাজের উন্নতি হয় এবং এমন চিত্র ও নাটক হয় যাহা আমাদের মা, বাবা, ভাই, বোন ও ছোট বড় সকলেরই সহিত এক সংগে বসিয়া দেখিতে পারি। আমাদের স্বাধীন ভারতের সমাজকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য এমন ধরণের চিত্র ও নাটক হওয়া উচিত, যাহাতে আমাদের সমাজ আরও দৃঢ়, সুন্দর ও নিখুঁত হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক কালের ছবিতে ইহার কোন কিছুই পাই না। সস্তা প্রেমের ন্যাকামী—সুসজ্জিত ড্রইং রুম—কুরুচিপূর্ণ পরিবেশ পরিবেশন করে চিত্র নির্মাতারা আমাদের ভুলাইয়া রাখিতে চান। বার বার আমরা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছি—তাহারা সেদিকে কর্ণপাত করেন নাই। সমষ্টির স্বার্থ হইতে তাহাদের ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থকে তাহারা এতদিন বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আজ তাহাদের দৃষ্টিভংগী পালটাইতে হইবে—পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিবার জন্য তাহাদের প্রস্তুত হইয়া লইতে হইবে। এতদিন অন্ধকারের মাঝখানে যে ভুল লইয়া আমরা হাতড়াইয়াছি—আজ স্বাধীনতার নূতন সূর্যোদয়ে—আমাদের সমস্ত ভ্রান্তি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে—স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমরাও যেমন আর কোন ভুল করিবনা বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—তেমনি কাহারও ভুল বরদাস্ত করিতে রাজী নই। আমাদের চিন্তাশক্তি ও চাহিদার সংগে তাল রাখিয়া যে সব চিত্র ও নাট্য-প্রযোজকেরা দেশ ও জাতির স্বার্থের প্রতি-দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারিবেন দেশ ও জাতির অভিনন্দন আশীষ একমাত্র তাঁহাদের যাত্রাপথেই বর্ষিত হইবে—যাহারা তাহা পারিবেন না, তাহাদের বাধ্য হইয়াই এই পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। চিত্র ও নাট্য প্রযোজকদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া আজকের মত বিদায় লইতেছি।—জয়হিন্দ।

রমা

আদিত্য পাল (দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা)

সাময়িক আনন্দ দিয়েই যে চিত্রের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, এ ধারণা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। যাঁরা এই নীতি গ্রহণ করে ছবি তোলেন তাঁদেরও আমরা সমর্থন করতে পারি না। কী আমরা চাই এই প্রশ্ন যদি কেউ আমাদের করেন, তবে আমরা জবাব দেই যে, নতুন আমরা কিছু এ দেশের ছায়া-ছবিতে চাই, যা শুধু নতুনত্বের দাবী নিয়েই টিকে থাকবার চেষ্টা করবে না, অথচ তার মধ্যে আমরা পাব যা আমাদের মন, চরিত্র ও জীবন যাত্রাকে সুন্দরতর করবার প্রেরণা দেবে। এ দেশের চিত্রে বৈচিত্রহীন একঘেয়েমীর পালা চলেছে বহুদিন থেকে। তাই এ দেশের চিত্র প্রযোজকদের এ বিষয়ে অবহিত হতে আমরা অনুরোধ করি।

ছেলেবেলায় বাপ-মা ডাকতো খোকা বলে—বড় হ'লে সবাই বলতো রবি ঠাকুর। আর আজ দশখানা গায়ের ছেলে বুড়ো সবাই তাঁকে ডাকে রবীন মাষ্টার। আর জানে সে বদ্ধ পাগল। সত্যি, পাগলই বটে। রবীন মাষ্টার গায়ের তার স্কুলটীর জন্য পাগল—আজীবনের সাধনা দিয়ে গায়ের মূক মুখে ভাষা ফোটাতে সে যে বাক-দেবীর পূজা করেছে তার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারই রবীন মাষ্টারের কাছে বড় নয়—তার উন্নতির জন্য কোন পরিশ্রমই রবীন মাষ্টারের কাছে বেশী নয়। সে স্কুলটীর জন্য পাগল—সারা দিনরাত যেমন হাড়ভাংগা খাটুনী খাটছে—তেমনি পড়াশুনায় কাটিয়ে দিচ্ছে বাকী সময়টুকুও। লোকে পাগল বলবে না কেন? পাগলইত বটে! বি, এ, ফেল করে সে গায়ে বসেছিল—গায়ের এমনি আরো কতজনের মত তারও পড়বার সংগতি না থাকলেও আর কারোর মত সে ঐ ব্যর্থতার বুকে গা ঢেলে দেয়নি—সে গভীর পড়াশুনা ও ঐকান্তিকতা দিয়ে তার বি, এ, ফেলের ব্যর্থতাকে সার্থক করে তুলেছিল। উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় মনটা তার সব সময় থাকতো ভরপুর। আদর্শের গরিমায় কোন কিছুকেই সে অসম্ভব বলে মনে করতো না। গায়ের জমিদার ভুবনবাবু ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন কিছু অর্থ। জমজমাট স্কুল করে তুললো। কিন্তু তাতেই কী সে দমবার! স্কুলটাকে হাই স্কুল করলে। ভুবনবাবুর কাছে দরবার করে উঠলো দু'খানা টিনের ঘর—নাম হ'লো ভুবনমোহন হাই স্কুল। ওপর থেকে ফর্দ এলো লম্বা। গ্রাজুয়েট হেডমাষ্টার চাই—মাষ্টারের সংখ্যাও বাড়াতে হবে—বই কিনতে হবে—কমিটি করতে হবে। রবীন মাষ্টার আপ্রাণ খেটে সবই জোগাড় করলো। গ্রাজুয়েট হেডমাষ্টারকে আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে থাকলো থার্ডমাষ্টার হ'য়ে। এই দীন থার্ডমষ্টারের অক্লান্ত পরিশ্রমেই চারিদিকে স্কুলের নাম পড়ে গেলো। গাধাপিটিয়ে মানুষ করায় স্কুলের সুনাম গেল বেড়ে—দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে স্কুলটি জমজমাট হ'য়ে উঠলো। কিন্তু বিরোধ উঠলো ঘনিয়ে। নতুন পাশ করা হেডমাষ্টারের সংগে শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে—স্কুলের পরিচালনা নিয়ে রবীন মাষ্টারের সংগে বিরোধ দেখা দিল। বিরোধ শুধু বাইরেই নয়, নিজের ঘরেও রবীন মাষ্টার সংগ্রামের সম্মুখীন হ'লো। আজীবনের শিক্ষা, সাধনা ও পরিশ্রম দিয়ে রবীন মাষ্টার যে সংসারের রূপ দিতে চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে—ঘর এবং বাইরের দৈনন্দিন বিরোধের ঘাত প্রতিঘাতে—এই সর্বত্যাগী অদের্শবাদী দীন পল্লী শিক্ষকের সকরুণ জীবন কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে—আমাদের বর্তমান চিত্র 'রবীন মাষ্টার'—বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে এই আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতীর সন্ধান আজও বিলুপ্ত হ'য়ে যায়নি। রূপালী পর্দায় এই আদর্শবাদীর সন্ধান পাবেন—রবীন মাষ্টারের মর্মন্তুদ জীবনালেখ্যে।— ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের এই সর্বজনপ্রিয় কাহিনী সুকুমার বসুর প্রযোজনায় ভ্যারাইটি ফিল্ম পর্দায় রূপায়িত করে তুলেছেন। রবীন মাষ্টারের চরিত্রটী সার্থক মণ্ডিত হ'য়ে আপনাদের সামনে দেখা দেবে উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় নৈপুণ্যে। অন্যাংশে থাকবেন রাজলক্ষ্মী (ছোট), ইন্দিরা রায়, অজন্তা কর, দীপালী গোস্বামী, সন্তোষ সিংহ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। চিত্রখানির সুর সুংযোজনা করেছেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর।

বাংলা নির্বাক ছায়াছবির গোড়ার কথা

স্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিল্টু)

স্নেহেন্দ্রগুপ্তের সংগে রূপ-মঞ্চের পাঠকসমাজ পরিচিত আছেন। ইতিপূর্বে বাংলা সবাক ছায়াছবির তালিকা ইনি আপনাদের উপহার দিয়েছেন। নির্বাক ছায়াছবির তালিকা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হ'লো। একাজ খুবই কষ্টসাধ্য। ভুলত্রুটি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। যদি কোন ভুলত্রুটি পাঠকসাধারণের চোখে পড়ে, আমাদের জানাবেন—রূপ-মঞ্চের পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন করে নেবো।

অরোরা সিনেমা কোম্পানী।

৪৭, কাশীমিত্র ঘাট রোড।

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ বসু।**

১। **রত্নাকর।** আরম্ভ—১৩-৮-১১ : চিত্রগৃহ—রসা-থিয়েটার : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীসুরেন্দ্র নারায়ণ রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ : ভূমিকায়—চুণীলাল দেব, শশীমুখী, সুশীলাবালা। ২। **ডাব্বুর কেলেঙ্কারী।** আরম্ভ—১৯২১ সাল : পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ : ভূমিকায়—চাণি দত্ত। ৩। **বিদ্যা-সুন্দর।** আরম্ভ—১৯২২ সাল : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ : ভূমিকায়—দুর্গারাণী। ৪। **কৃষ্ণসখা।** আরম্ভ—১৯২৭ সাল : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী : আলোক-শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ : ভূমিকায়—সন্তোষ সিংহ, ব্রজেন্দ্র, ফিরোজাবালা, সরস্বতী। ৫। **কেলোর কীর্ত্তি।** আরম্ভ—১৯২৮ সাল : কাহিনী—শ্রীভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীসুধাংশু মুস্তাফী : আলোক-শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ : ভূমিকায়—লালু, বেলারাণী, নীহার বালা।

এ ছাড়া এঁরা অনেক "হেলথ পিকচার" ও "নিউজ রীল" তুলিয়াছিলেন।

অরোরা ফিল্মস্ করপোরেশন।

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীঅনাদি নাথ বসু ও মিঃ জি, রাম সেসন।**

৬। **পূজারী।** আরম্ভ—১৪-১১-৩১ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীনিরঞ্জন পাল : আলোক-শিল্পী—শ্রীধীরেন দে : ভূমিকায়—ভাস্কর পাল, মণি বর্মা, মণি ঘোষ, মিসঃ বিমলা, মিসঃ চৌধুরী। ৭। **নিয়তি।** আরম্ভ—১৫-৯-৩৪ : চিত্রগৃহ—জুপিটার : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীযোগেশ চৌধুরী : আলোক-শিল্পী—শ্রীধীরেন দে : ভূমিকায়—শৈলেন চৌধুরী, অজিত ভট্টাঃ, নৃপেশ রায়, হেনা, শিশুবালা।

আর্য্য ফিল্মস।

১৮৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ।**

৮। **বুকের বোঝা।** আরম্ভ—১-১১-'০ : কাহিনী—শ্রীহরেন্দ্র নাথ ঘোষ : পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু : ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যোঃ, বোকেন চট্টোঃ, বীণা, রেণুকা ঘোষ।

ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস।

৮, বাগমারী রোড।

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীঘনশ্যামদাস চৌখানী।**

৯। **পুনর্জ্জন্ম।** আরম্ভ—১৯২৭ সাল : কাহিনী—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী : পরিচালনা—শ্রীজয়গোপাল পিলে : আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু : ভূমিকায়—কেদার চট্টোঃ,
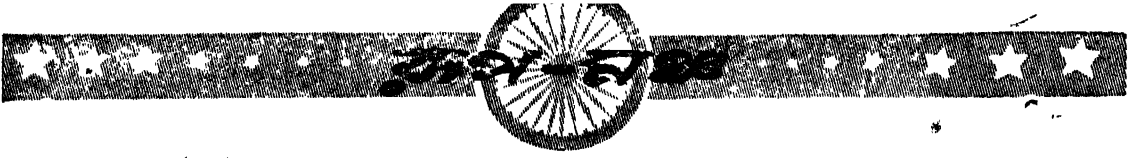
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ইন্দিরা। ১০। **শঙ্করাচার্য্য।** আরম্ভ—১৯২৭ সাল: কাহিনী—শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ: পরিচালনা—শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ: আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল ও শ্রী পি, সান্যাল: ভূমিকায়—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ধীরেন গঙ্গো:, জীবন গঙ্গো: মন্মথ পাল, কার্তিক দে, অহি সান্যাল, প্রফুল্ল, নিভাননী, রেণুবালা। ১১। **নিষিদ্ধ ফল।** আরম্ভ—১৯২৮ সাল: কাহিনী—শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়: পরিচালনা—শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ: আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল: ভূমিকায়—ভানু বন্দ্যো:, প্রফুল্ল, নিমাই, রেণুবালা, নিভাননী। ১২। **অপহৃতা।** আরম্ভ—১৯২৯ সাল: কাহিনী—শ্রীএস, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা—শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ: আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস: ভূমিকায়—ভূমেন রায়, এস, বি, রাজহন্স, প্রফুল্ল, নিমাই, রেণুবালা। ১৩। **কণ্ঠহার।** আরম্ভ—২২-১১-৩০: কাহিনী—শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়: পরিচালনা—শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ: আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস: ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যো:, রাজহন্স, শরৎ চট্টো:, প্রভাত সিংহ, তিনকড়ি চক্র, প্রফুল্ল, নিমাই, সমর, বোকেন, রেণুবালা, সবিতা।

১৪। **পরদেশীয়া।** আরম্ভ ২৮-১১-৩১: কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীনিরঞ্জন পাল: আলোক শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস: ভূমিকায়—কালিদাশ দাস, মনি ঘোষ, হরিরাম দাস, মিহির, নীতাদেবী, বীণাপাণি।

১৫। **ভাগ্যলক্ষ্মী।** আরম্ভ—১৬-৪-৩২: চিত্রগৃহ—চিত্রা: কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ: পরিচালনা—শ্রীকালী প্রসাদ ঘোষ: আলোক-শিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস: ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যো:, প্রমথেশ বড়ুয়া, ক্ষিতিশ রায়চৌধুরী, সবিতা, উমা।

ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসিং কোম্পানী

১৪, কালীচরণ সেঠ লেন, দমদম।

স্বত্তাধিকারী:—**শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।**

১৬। **মায়াবী।** আরম্ভ—১২-৭-৩০: কাহিনী—শ্রীপাঁচকড়ি দে: পরিচালনা—শ্রীবেচারাম ঘোষ: আলোক-শিল্পী শ্রীডাবকে: ভূমিকায়—বেচারাম, ভোলা, রেণুবালা।

ইউনিক পিকচার্স করপোরেশন

৪০, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট।

১৭। **চুপ।** আরম্ভ—৮-৮-৩১: কাহিনী—শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত: পরিচালনা—শ্রীহীরেন বসু: আলোক-শিল্পী—শ্রীসুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়: ভূমিকায়—হীরেন বসু, নিভাননী, মিস: লাইট, রেণুবালা।

ইণ্টার ন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট্।

৪৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

স্বত্তাধিকারী:—**শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার**

১৮। **চোর কাঁটা।** আরম্ভ—৩-৪-৩১: কাহিনী—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়: পরিচালনা—শ্রীচারু রায়: আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু: ভূমিকায়—অমর মল্লিক, রাজীব রায় বোকেন চট্টো:, জ্যোৎস্না গুপ্ত, শান্তি গুপ্তা, মনোরমা।

১৯। **চাষার মেয়ে।** আরম্ভ—৪-৯-৩১: কাহিনী—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী: পরিচালনা—শ্রীপ্রফুল্ল রায়: আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু: ভূমিকায়—জীবন গঙ্গো:, অমর মল্লিক, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কুঞ্জলাল সেন, ভানু বন্দ্যো:, চানি দত্ত, বোকেন চট্টো:, জ্যোৎস্না গুপ্ত, প্রেমকুমারী, মনোরমা, রেণু।

ইণ্ডিপেণ্ডেট প্রোডিউসার্স

২০। **শেষপথ।** আরম্ভ—৩-৫-৩০: কাহিনী—শ্রীমণি বর্ম্মা: পরিচালনা—শ্রীফণী বর্ম্মা: আলোক-শিল্পী—শ্রীদ্বারকা খোসলা: ভূমিকায়—ফণী বর্ম্মা, মণি বর্ম্মা, বঙ্কিম দত্ত, সুশীলা।

ইষ্টার্ন ফিল্ম সেণ্ডিকেট

১১, নারিকেলবাগান লেন।

স্বত্তাধিকারী:—**শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।**

২১। **দেবদাস।** আরম্ভ—১৯২৯ সাল: কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: পরিচালনা—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র:
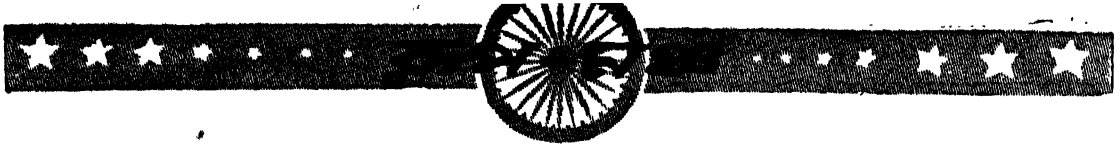
আলোক-শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু : ভূমিকায়—ফণী বর্ম্মা, নরেশ মিত্র, মণি ঘোষ, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, কণকনারায়ন ভূপ, মিস্ লাইট, নীহারবালা। ২১। **বিচারক**। আরম্ভ-১৯২৯ সাল : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচালনা—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী : আলোক শিল্পী—শ্রীনীতিন বসু : ভূমিকায়—শিশির ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ-চৌধুরী, কঙ্কাবতী, শেফালিকা।

ইণ্ডোবৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী

দম দম রোড।

স্বত্তাধিকারী :—**মিঃ পি ঃ এন, দত্ত।**

২৩। **বিলাত ফেরত**। আরম্ভ—২৬-২-২১ : চিত্রগৃহ রসাথিয়েটার : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীনীতিশ চন্দ্র-লাহিড়ী : আলোক শিল্পী—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র সরকার : ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গো : মন্মথ পাল, কুঞ্জলাল চক্র : সুশীলাবালা।

২৪। **সাধু—কি—শয়তান**। আরম্ভ—৩—২ : পরিচালনা—নীতিশ চন্দ্র লাহিড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীজ্যোতীষচন্দ্র সরকার : ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও সুশীলাবালা।

২৫। **যশোদানন্দ**। আরম্ভ—১৯২২ সাল : পরিচালনা—শ্রীনীতিশচন্দ্র লাহিড়ী : আলোক-শিল্পী—শ্রীজ্যোতীষচন্দ্র সরকার : ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও সুশীলাবালা।

গ্রাফিক আর্টস

২, রসা রোড।

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীমনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়**।

২৭। **বঙ্গবালা**। আরম্ভ—১৯২৯ সাল : কাহিনী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার : আলোক-শিল্পী—দ্বারকা খোসলা : ভূমিকায়—ফণীবর্ম্মা, মণি বর্ম্মা, বঙ্কিম দত্ত, উমাশশী।

২৮। **বিগ্রহ**। আরম্ভ—২৯-১১-৩০ : কাহিনী—শ্রীজ্যোতীষ বাচস্পতি : পরিচালনা—শ্রীচারু রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ : ভূমিকায় জীবন গঙ্গো : ফণী বর্ম্মা, উমাশশী, রেণুবালা, রেণুকা ঘোষ।

২৯। **অভিষেক**। আরম্ভ—২৩-১২-৩১ : কাহিনী-শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত : পরিচালনা—শ্রীপ্রফুল্ল রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ, শ্রীগুপী ঘোষ ও শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী। ভূমিকায়—ভাস্কর পাল, জীবন গঙ্গো, চানি দত্ত, কেশব, উমাশশী, পূর্ণিমা সোম, বেলারাণী।

ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান

৩০। **শক্তিপূজা**। আরম্ভ—১-১০-৩২ : চিত্রগৃহ নিউ সিনেমা : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীসন্তোষ বন্দ্যো-পাধ্যায় : অলোক-শিল্পী—শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী : ভূমিকায়—সরসী, সন্তোষ, দ্বারিকা, কালিদাস, উষা, উষারাণী।

এসিয়াটিক ফিল্ম কোম্পানী

১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

স্বত্তাধিকারী :—**সয়দা এণ্ড কোম্পানী।**

২৬। **বালিকাবধূ**। আরম্ভ—১১-৪-২১ : পরিচালনা পণ্ডিত সয়দা : আলোক-শিল্পী—বর্ম্মণ ষ্টুডিও : ভূমিকায়—সয়দা, তারক বাগচী, মিস আলি।

তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী

৩১। **আঁধারে আলো**। আরম্ভ—১৯২২ সাল : চিত্রগৃহ—মনোমহন থিয়েটার : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শিশির কুমার ভাদুড়ী ও শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : ভূমিকায়—শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, দুর্গারাণী। ৩২। **মানভঞ্জন**। আরম্ভ—১৯২৩ সাল : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচালনা—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যো:, নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখো:, তিনকড়ি চক্র:, নীলিমারাণী। ৩৩। **চন্দ্রনাথ**। আরম্ভ—১৯২৪ সাল : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যো, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, শিশুবালা।
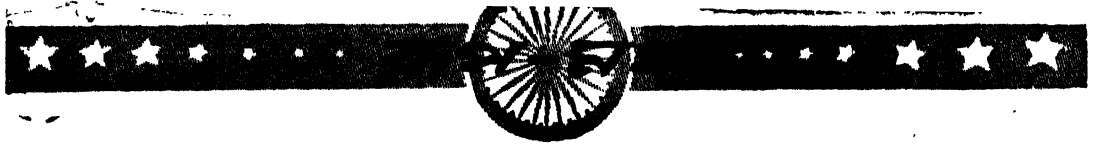
৩৪। **খোকাবাবু**। আরম্ভ—১৯২৩ সাল : কাহিনী, পরিচালনা ও প্রধান অভিনেতা—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল।

ন্যাশনাল পিকচার্স

গৌরীশঙ্কর। আরম্ভ-২৬-১০-৩২ : চিত্রগৃহ—ছবিঘর : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীআনন্দমোহন রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীসরোজ মিত্র : ভূমিকায়—আনন্দ রায়, রাধিকানন্দ মুখো:, কেশব, রণধীর, ননী, ডলিদত্ত, আয়েষা বাঈ, রেণুকা ঘোষ।

প্রতিভা সিনেমা

২, কুমারটুলি ষ্ট্রীট।

৩৬। **দিলদরিয়া**। আরম্ভ—২৬-৪-৩০ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীতারাপদ সাহা : অলোক-শিল্পী—শ্রীজিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় : ভূমিকায়—তারাপদ সাহা, দেবেন মল্লিক, মিস জো, মাইকেল।

৩৭। **ভস্মাসুর**। আরম্ভ—১৯৩০ সাল : কাহিনী, পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীতারাপদ সাহা : ভূমিকায় দেবেন মল্লিক।

এ ছাড়া এরা পাঁচটী 'নীউজ রীল' তুলিয়াছিলেন।

প্রভিন্সিয়াল ফিল্মস প্রডিউসার্স।

২৩ ডি, কুমারটুলী ষ্ট্রীট

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীদেবেন মল্লিক**।

৩৮। **বিদ্যুৎ বারের বারবেলা**। আরম্ভ—১৯৩০ সাল : কাহিনী—শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা ও আলোক শিল্পী—শ্রীদেবীঘোষ : ভূমিকায়—এ, হোসেনি, বীণা।

পিক্টোরিয়াল ক্লাব।

৩৯। **কলেজ গার্ল**। আরম্ভ—৩০-১২-৩২ : চিত্রগৃহ—ছবিঘর : ভূমিকায়—শীলা।

ফটো প্লে সিণ্ডিকেট

৪০। **সোল অফ এ শ্লেভ**। আরম্ভ—১৯২২ সাল : কাহিনী—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীহেম মুখোপাধ্যায় : শব্দযন্ত্রী—মিঃ চার্লস ক্রীড : ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, গোকুল নাগ, প্রফুল্ল ঘোষ, হেম মুখোপাধ্যায়।

ফিল্মস্ অফ দি ইষ্ট লিমিটেড

৯৫।১ হরিশ মুখার্জী রোড। স্বত্তাধিকারী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

৪১। **স্বামী**। আরম্ভ—১১-৭-৩১ : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীচারু রায় : আলোক শিল্পী—শ্রীদেবী ঘোষ ও শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী : ভূমিকায় ফণী বর্মা, তিনকড়ি চক্রবর্তী, রেণুবালা, বীণা।

ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান্স ফিল্ম কোম্পানী

৪০ দমদম রোড।

৪২। **কামনার আগুন**। আরম্ভ—২২-১১-৩০ : কাহিনী—শ্রীদেবকীকুমার বসু : পরিচালনা—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস : আলোক-শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণগোপাল : ভূমিকায় ধীরেন গঙ্গো : দেবকী বসু, দীনেশ দাস, হেম গুপ্ত, কালিদাস, সবিতা, রাধারাণী, প্রেমিকা।

৪৩। **অলীক বাবু**। আরম্ভ—২৪-৫-৩০ : কাহিনী—শ্রীজ্যোতীরীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচালনা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ও শ্রী পি, সান্যাল : ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গো : দীনেশ দাস, কালিদাস। ৪৪। **পঞ্চশর**। আরম্ভ—১-১১-৩০ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীদেবকী কুমার বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ও শ্রী পি, সান্যাল : ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গো, দেবকী বসু, দীনেশ দাস, হেম গুপ্ত, নিমাই সাহা, মিহির লাল, প্রেমকুমারী নেহেরু, রাধারাণী।

৪৫। **টাকায় কি না হয়**। আরম্ভ—৭-২-৩১ : পরিচালনা—শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী শ্রীপি, সান্যাল : ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গো : নিমাই সাহা, সবিতা দেবী।

৪৬। **মরণের পরে**। আরম্ভ—৭-২-৩১ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রী এ, কে, রায় : আলোক-শিল্পী—শ্রী পি,
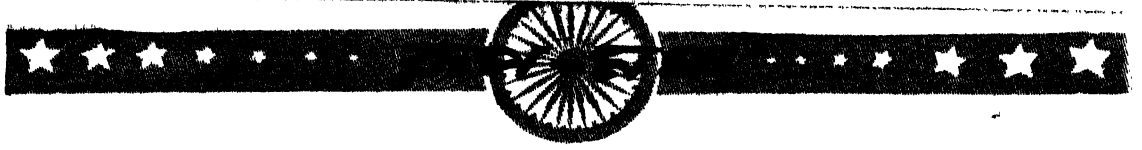
সান্যাল : ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গো : হেম গুপ্ত, মিহিরলাল, কালিদাস, সবিতাদেবী, রাধারাণী।

৪৭। **চরিত্রহীন**। আরম্ভ—৯-৫-৩১ : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীপি, সান্যাল : ভূমিকায়—হেম গুপ্ত, কালি দাস, নমিতাদেবী, শীলা।

বেঙ্গল ম্যুভি এণ্ড টকী ফিল্ম লিঃ

৩৯, হ্যারিসন রোড।

৪৮। **জীবন প্রভাত**। আরম্ভ—২-৫-৩১ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীসন্তোষ হাজরা : আলোক-শিল্পী—শ্রীডি, ডি, ডাবকে : ভূমিকায়—কান্তি বন্দোঃ, সত্য মুখোঃ, সুশীল, ডলি দত্ত, শান্তি গুপ্তা।

বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিট

১৪, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড।

স্বত্বাধিকারী—**শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া**

৪৯। **অপরাধী**। আরম্ভ—২৮-১১-৩১ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীদেবকী বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণগোপাল : ভূমিকায়—বড়ুয়া, রাধিকানন্দ, নির্ম্মল, সমর, শান্তি, সবিতা, আরতি, প্রভাবতী, রেণু। ৫০। **একদা** আরম্ভ—২-৪-৩২ : চিত্রগৃহ—চিত্রা : কাহিনী—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া : পরিচালনা—শ্রীসুশীল মজুমদার : ভূমিকায়—সুশীল মজুমদার, প্রভাবতী।

ম্যুভি প্রোডিউসার্স

১, ন্যায়রত্ন লেন।

স্বত্বাধিকারী—**শ্রীবিমল পাল**

৫১। **পিয়ারী**। আরম্ভ—১৯২৯ সাল : কাহিনী—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : পরিচালনা ও আলোক-শিল্পী—শ্রীবিমল পাল : ভূমিকায়—অর্দ্ধেন্দু বন্দোপাধ্যায়, নীলমণি দে, কালীপদ, চন্দ্রাবতী।

এ ছাড়া এঁরা পরেশনাথের মিছিল তুলিয়াছিলেন।

ম্যাডান এণ্ড কোম্পানী

৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

স্বত্বাধিকারী—**মিঃ জে, এফ, ম্যাডান**।

৫২। **মাধবী কঙ্কন**। আরম্ভ—৯-৭-৩২ : চিত্রগৃহ—এম্প্রেস : কাহিনী—শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—জয়নারায়ণ, ভানু, ললিতা। ৫৩। **নৌকাডুবি**। আরম্ভ—৩-৬-৩২ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচালনা—শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র : ভূমিকায়—নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাঃ, কুঞ্জলাল চক্র, কনকনারায়ণ ভূপ, শিশুবালা, সুনীলা। ৫৪। **দেবীচৌধুরাণী**। আরম্ভ—১১-৭-৩১ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—নরেশ মিত্র, কার্ত্তিক দে, কার্ত্তিক রায়, ননী, অনুপমা, রাণীসুন্দরী। ৫৫। **কেরাণীর মাস কাবার**। আরম্ভ—২৩-৫-৩১ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—শান্তি গুপ্তা। ৫৬। **বিবাহ বিভ্রাট**। আরম্ভ—০-৫-৩১ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—পেসেন্স কুপার, রাণী সুন্দরী। ৫৭। **গুপ্তরত্ন**। আরম্ভ—২৩-১-৩১ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : কাহিনী—শ্রীসন্তোষ বন্দোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীবি, এস, রাজহন্স : আলোক-শিল্পী—মিঃ হানিফ : ভূমিকায়—রাজহন্স, সমর, সন্তোষ। ৫৮। **মৃণালিনী** আরম্ভ—২৭-১২-৩০ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ মংলু : ভূমিকায়—জয়নারায়ণ বন্দোঃ, ধীরাজ ভট্টাঃ, কার্তিক দে, কালিপদ, ফনী, রেণুবালা। ৫৯। **মাণিকজোড়**। আরম্ভ—১৫-১১-৩০ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : আলোক-শিল্পী—মিঃ চার্লস ক্রীড। ৬০। **কৃষ্ণবর্ণ তীরন্দাজ**। আরম্ভ—১৩-৯-৩০ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : পরিচালনা—

মিঃ বি, এস, রাজহংস : আলোক-শিল্পী—মিঃ সিনর মার্কনী, ভূমিকায়—রাজহংস, কার্তিক রায়, সমর ঘোষ, ললিতা। ৬১। **রাজসিংহ**। আরম্ভ—৬-৯-৩০ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন, এম্প্রেস, আলবিয়ান ও খিদিরপুর : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ হানিফ : ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, পেসেন্সকুপার, ইন্দিরা, মনোরমা। ৬২। **দালিয়া**। আরম্ভ—২৬-৭-৩০ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর : পরিচালনা—শ্রীমধু বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—রাজহংস, কার্তিক। **কাল পরিণয়**। আরম্ভ—১৯৩০ সাল : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাঃ, রাজহংস, কার্তিক দে, দীপ্তি সান্যাল, ভানু বন্দ্যোঃ, পেসেন্সকুপার, সীতা, শান্তি, প্রকাশমণি। ৬৪। **রাধারাণী**। আরম্ভ—৮-৩-৩০ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ মংলু : ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দোঃ, জয়নারায়ণ মুখোঃ, সত্যেন, কার্তিক, ললিতা, লীলাবতী। ৬৫। **গিরিবালা**। আরম্ভ—১৯২৯ সাল : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিচালনা—শ্রীমধু বসু : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—ধীরাজ ভট্টাঃ, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রঃ, লীলাবতী, শান্তি, ললিতা। ৬৬। **ইন্দিরা**। আরম্ভ—১৪-১২-২৯ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ মংলু : ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দোঃ, সত্যেন, তারক, ললিতা, লাইট, লীলাবতী। ৬৭। **কপালকুণ্ডলা**। আরম্ভ—১৩-৪-২৯ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ সিনর মার্কনী : ভূমিকায়—দানীবাবু, দুর্গাদাস বন্দোঃ, নরেশ মিত্র, তুলসী, পেসেন্সকুপার, ইন্দিরা, সীতা, ললিতা। ৬৮। **রজনী**। আরম্ভ—২-৩-২৯ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন ; কাহিনী—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দো, মনোরঞ্জন ভট্টা, জয়নারায়ণ মুখোঃ, কার্তিক দে, লাইট, লীলাবতী। ৬৯। **যুগলাঙ্গুরীয়**। আরম্ভ—৯-২-২৯ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ মংলু, ভূমিকায়—জয়নারায়ণ, তুলসী, সত্যেন, রাজহংস, লাইট। ৭০। **শাস্তি কি শান্তি**। আরম্ভ—৮-১২-২৮ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষ : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—দানীবাবু, অহীন্দ্র, দুর্গাদাস, তুলসী, জয়নারায়ণ, কার্তিক, সত্যেন প্রভাবতী, লাইট, তারাসুন্দরী। ৭০। **সরলা**। আরম্ভ—১-৯-২৮ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—শ্রীযতীন দাস : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, শৈলেন, নরেশ, চিত্তরঞ্জন, সীতা, রাণীসুন্দরী, মনোরমা। ৭২। **ভ্রান্তি**। আরম্ভ—২-৬-২৮ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—দানীবাবু, সত্যেন, পেসেন্সকুপার। ৭৩। **দুর্গেশ-নন্দিনী**। আরম্ভ—৩-১২-২৭ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ মংলু : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, জয়নারায়ণ, নরেশ, পেসেন্সকুপার, ইন্দিরা, গীতা। ৭৪। **চণ্ডীদাস**। আরম্ভ—২-৪-২৭ : চিত্রগৃহ—এম্প্রেস : ভূমিকায়—তুলসী বন্দোপাধ্যায়, পেসেন্সকুপার মনোরমা। ৭৫। **জনা**। আরম্ভ—২-৪-২৭ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : ভূমিকায়—দীনেশ, তুলসী, পেসেন্সকুপার, ইন্দিরা। ৭৬। **কৃষ্ণকান্তের উইল**। আরম্ভ—১২-৩-২৭ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মিঃ চার্লস ক্রীড ও যতীন দাস : ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দো, অমৃতলাল বসু, প্রবোধ বসু, ইন্দু মুখোঃ, চাণি দত্ত, কার্তিক দে, প্রফুল্ল, পেসেন্সকুপার, সীতা। ৭৭। **জয়দেব**। আরম্ভ—২৫-১২-২৬ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : কাহিনী—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—
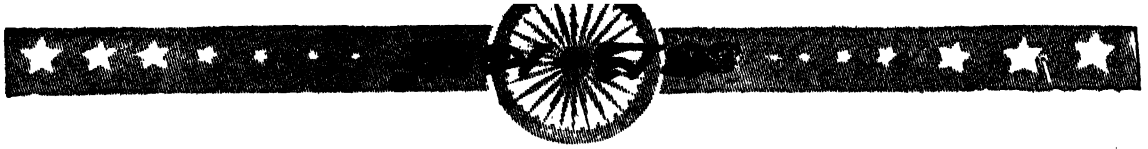
শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : আলোক-শিল্পী—মি: চার্লস ক্রীড : ভূমিকায়—পেসেন্সকুপার, ইন্দিরা, বীণাপাণি, রেণু-বালা, মনোরমা, কাননবালা, সত্যেন, কার্তিক দে, কালিদাস।

৭৮। **প্রফুল্ল**। আরম্ভ—১৭-৭-২৬ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন কাহিনী—শ্রীগিরিশ ঘোষ : ভূমিকায়—সত্যেন, পেসেন্স কুপার।

৭৯। **ধর্ম্মপত্নী**। আরম্ভ—২৯-৫-২৬ : চিত্রগৃহ—ক্রাউন : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, কার্তিক, পেসেন্সকুপার।

৮০। **সতীলক্ষ্মী**। আরম্ভ—১-১১-২৫ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চ বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—ধীরাজ, মন্মথ, কুঞ্জলাল, কার্ত্তিক, পেসেন্সকুপার, শিশুবালা।

৮১। **প্রেমাঞ্জলি**। আরম্ভ—২৮-৩-২৫ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, অহীন্দ্র, কালিদাস', কালিদাসী।

৮২। **জেলের মেয়ে**। আরম্ভ—১০-১-২৫ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র-বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, কালিদাসী।

৮৩। **মিশর রাণী**। আরম্ভ—৬-১২-২৫ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : কাহিনী—অপরেশ মুখোপাধ্যায় : পরিচালনা

ডানদিক থেকে :—পরিচালক উদয়ন, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক ও প্রচার-সচিব বিমলেন্দু ঘোষ।
ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্স লিঃ-এর 'মানুষের ভগবান' চিত্রের মহরৎ উপলক্ষে চিত্রখানি গৃহীত হ'য়েছিল
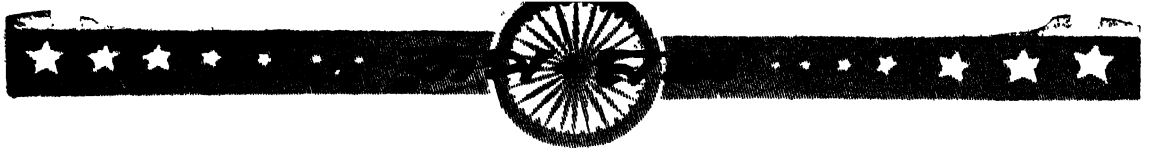
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—দুর্গাদাস, অহীন্দ্র, নীহারবালা।

৮৪। **কমলে কামিনী**। আরম্ভ—২৩-২-২৪ : চিত্রগৃহ—এম্প্রেস : পরিচালনা—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী : ভূমিকায়—শিশির, তুলসী, পেসেন্স কুপার।

৮৫। **মাতৃস্নেহ**। আরম্ভ—১৭-৩-২৩ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—তুলসী, অমর, পেসেন্স কুপার, বীণাপাণি।

৮৬। **বিয়ের বাজার**। আরম্ভ—১৭-১০-২২ চিত্রগৃহ কর্ণওয়ালিস : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী ভূমিকায়—তুলসী, চিত্তরঞ্জন।

৮৭। **মোহিনী বা একাদশী**। আরম্ভ—২-৯-২২ চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীশিশির কুমার-ভাদুড়ী : ভূমিকায়—শিশির ও তুলসী।

৮৮। **মা দুর্গা**। আরম্ভ—১৫-১০-২১ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

৮৯। **শিবরাত্রি**। আরম্ভ—১৯-২-২৬ : চিত্রগৃহ কর্ণওয়ালিস : পরিচালনা—শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় : ভূমিকায়—প্রবোধ বসু।

৯০। **পাপের পরিণাম**। আরম্ভ—২৬-৭-২৪ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস : কাহিনী—মিঃ আগা হাসার-কাশ্মেরী : ভূমিকায়—নির্মলেন্দু ও প্রভা।

৯১। **বিষবৃক্ষ**। আরম্ভ—২২-৪-২২ : চিত্রগৃহ—কর্ণওয়ালিস। কাহিনী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : ভূমিকায়—অহীন্দ্র, তুলসী, নিভাননী, প্রভা, সরস্বতী।

রাধাফিল্ম কোম্পানী।

৫৪, বেন্টিক ষ্ট্রীট

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীরাধাকিষণ চামেরিয়া**।

৯২। **শ্রীকান্ত**। আরম্ভ—২০-১২-৩০ : চিত্রগৃহ : চিত্রা : কাহিনী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পরিচালনা—শ্রীতারা-কুমার ভাদুড়ী : আলোক শিল্পী—শ্রীবিমল মিত্র : ভূমিকায় তারাকুমার, কস্তি, শান্তাকুমারী।

৯৩। **গীতা**। আরম্ভ—৫-৯-৩১ : কাহিনী ও পরিচালনা শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী : আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল : ভূমিকায়—তিনকড়ি, জহর, কুমার, ললিতা :

রূপমফিল্ম কোম্পানী।

৯, শাঁখারি টোলা লেন।

স্বত্তাধিকারী :—**শ্রীসুধাংশু মুস্তাফী**।

৯৪। **সহধর্মিনী**। আরম্ভ—১৯-৯-৩১ : কাহিনী—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী : পরিচালনা—শ্রীঅনুপম বন্দোপাধ্যায় আলোক-শিল্পী—শ্রীধীরেন দে : ভূমিকায়—রথীন, জীবজ্যোতি, ভোলা, অণিমা, রেণু।

য়্যাঙ্গোরা ফিল্ম কোম্পানী।

৮, রামচাঁদ ঘোষ লেন।

৯৫। **রোমেন্টিক লাভার**। আরম্ভ-১১-৮-৩১ : পরিচালনা—শ্রীচারু ঘোষ : আলোক-শিল্পী—শ্রীশচীন দাস : ভূমিকায়—হোসেনী ও বীণা।

হীরাফিল্ম কোম্পানী।

৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট।

৯৬। **জামাই বাবু**। আরম্ভ—২৩-৫-৩১ : কাহিনী ও পরিচালনা—শ্রীকালীপদ দাস : আলোক-শিল্পী—মিঃ বরোডকার : ভূমিকায়—কালীপদ দাস, শিবপদ ভৌমিক, রাধারাণী।
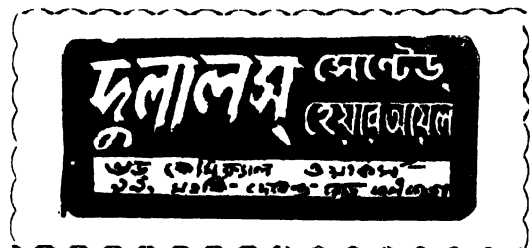
মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলাই নাটকের ধর্ম। নাটকের এই ধর্মাচরণের জন্য প্রয়োজন রঙ্গমঞ্চের। নাটকও কাব্য। একে মানব জীবনের গতিমান কাব্য বলা চলে। নাটকের কুশীলবদের অভিনয়ের সাহায্যে এই কাব্যে প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে। নাটক যে কাব্য, এ-কথা হয়ত অনেকে গ্রাহ্যই করেন না। কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কারিকরা নাট্য-সাহিত্যকে কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। শুধু স্থান দিয়েছেন বলাও ঠিক হবে না, তাঁরা নাট্য-সাহিত্যকে কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। তাঁরা ব'লেছেন—কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।

জনকয়েক পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনই নাটকের প্রাণ নয়। নাটক রচনার সময় নাটকীয় কথা-বস্তু, নাটকীয় ঘটনা-পারম্পর্য সৃষ্টি করার উপযোগী চরিত্র-সৃজন, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ, নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে নাটককারের দিব্য জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ-ছাড়া নাটককারের নিজস্ব বিশিষ্ট রচনাভংগি অর্থাৎ ষ্টাইল, মানবজীবন ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকাও দরকার।

বাংলা নাটকের দুর্ভিক্ষের কারণ আছে। অনেকে বলেন, নাট্যকারের অভাবই এর কারণ। কারো কারো মতে রঙ্গমঞ্চের কর্তাদের ঔদাসীন্যই এর জন্যে দায়ী। আবার কেউ কেউ বলেন, দেশে দর্শক নেই, যারা নাটক দেখে তারা শিক্ষিত নয়, অর্থাৎ ভালো নাটক দেখার যোগ্যতা তাদের নেই।

কথাগুলি হুবহু সত্যি না হ'লেও আগাগোড়া মিথ্যেও নয়। এখন যাঁরা নাটক লিখছেন, তাঁদের কারো নাম না ক'রে বলা যেতে পারে, তাঁরা নাটকের সূত্র ও সংজ্ঞা জানলেও অন্য সব হুঁস বাদ দিয়ে বক্স-অফিসের দিকে চোখ রেখেই তাঁরা নাটক লেখেন। এতে কয়েকজন দর্শক খুসি হয়ত হয়, কিন্তু নাটকের সমূহ ক্ষতি হ'য়ে থাকে। গল্পকার, কবিতাকার, ও নাটককার আলাদা আলাদা লোক। সকলের হাতেই সব জিনিষ খুলবে এমন কোন কথা নেই। যাঁর মন নাট্যরসে জড়িত, যাঁর চিন্তা ও চেষ্টা নাটকীয় উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাঁর রচনাভংগী নাটকোপযোগী প্রকৃত নাট্যকার হবার উপযুক্ত লোক তিনিই। কিন্তু গল্প ও কবিতায় ব্যর্থ হ'য়ে অনুবাদ-সাহিত্য, শিশু সাহিত্য বা নাট্যসাহিত্যে যিনি মনোনিবেশ করবেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা হয়ত অন্য অনেক জিনিষই পেতে পারি, কিন্তু নাটক কখন পাব না। বাংলা নাটকের অভাবের অন্যতম কারণ এখানে।

দ্বিতীয় কারণ, শিক্ষিত প্রযোজক আমাদের দেশে নেই। নাটক তাঁদের কাছে মুনাফা করার একটা কৌশল মাত্র। নাটক তাঁদের কাছে কাব্য নয়, একটা পণ্য বিশেষ। জীবনের মূল থেকে উপড়ে এনে খোলা বাজারে তাঁরা এই পণ্য তুলে ধরেন, বলেন—এই তাঁদের নাটক।

তৃতীয় কারণ, দর্শক। দর্শকদের যা দেখান হয়, তাতেই তাঁরা পরিতৃপ্ত। কিসে তাঁদের তৃপ্তি এ-হুঁস তাঁদের নেই, অন্যের হাতের মধ্যে তাঁদের যথাসর্বস্ব যেন জিম্মা রাখা
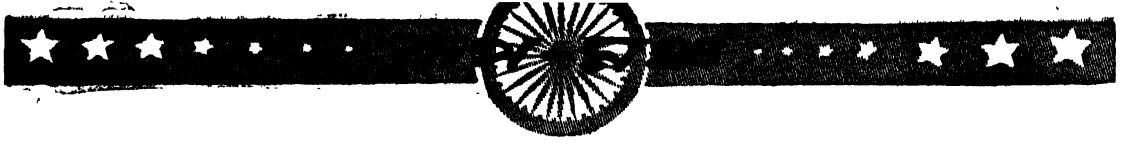
আছে। তাঁদের কোনো চাহিদা নেই। এই চাহিদার অভাবও বাংলা নাটকের দুর্ভিক্ষের আর একটি কারণ। আরও একটি কারণ আছে, সেটা হ'চ্ছে অভিনেতাদের আন্তরিকতার অভাব।

নাটকের সাফল্যের জন্যে যেমন শক্তিমান নাট্যকার দরকার, তেমনি অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ ও সহৃদয় সামাজিকও প্রয়োজন। এঁদের সবার একটা টীম-ওয়ার্ক বা সম্মিলিত আন্তরিক চেষ্টায় নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেড়শ বছর আগে বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের জন্ম। এই সুদীর্ঘ-কাল ধ'রে বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় একটানা ভাবে না হ'লেও, হ'য়ে আসছে। তবু এতদিনেও বাঙ্গলা রঙ্গালয় একটা বিশেষ লক্ষ্য ব'লে কোনো কিছুই গ্রহণ করতে শেখেনি। এর জন্যে হয়ত অনেকে বিদেশীশাসকদের ওপর দোষারোপ করবেন। কুশাসকদের দোষত্রুটি থাকবেই—এটা বিচিত্র কথা কিছু নয়। কিন্তু বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের প্রথম পত্তন যিনি করেন, তিনিও আমাদের দেশী লোক নন্। হেরাসিম লেবেডফ তাঁর নাম। তিনি একজন রুশদেশবাসী। তাঁরই উদ্যমে প্রথম বাঙ্গলায় নাট্যাভিনয়
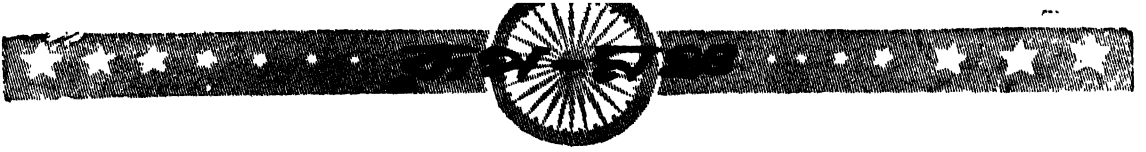
হয়। তার পরে কলকাতার ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাটক অভিনীত হ'য়ে থাকে। এখানে তার বিস্তারীত বিবরণ দেওয়া অপ্রাসংগিক। অবশেষে সিপাই যুদ্ধের কাছাকাছি সময় অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এক-শ বছর আগে নাটুকে নারায়ণের লেখা নাটক বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার বাগান বাড়িতে অভিনয় হয়। নাটুকে নারায়ণ অর্থাৎ রামনারায়ণ তর্করত্নই তখনকার সেরা নাটক লিখিয়ে ছিলেন। সকলেই জানেন, রামনারায়ণের নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদন তৃপ্ত হতে পারেননি। তাই, তিনি নিজেই বাঙ্গলা নাটক লেখার ভা'র নিয়েছিলেন। লেবেডফের আমল থেকে যে সব নাটকাভিনয় হ'য়েছে, সেগুলিকে যথার্থ নাটক বলা চলেনা। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন যখন বাঙ্গলায় নাটক লিখবেন ব'লে ঘোষণা করলেন, তখন তিনি পৃথিবী লিখতে 'প্রথিবী' লেখেন। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে তখন তাঁর জ্ঞানের নমুনা এমনি। তা সত্বেও যে তিনি নাটক লিখবেন ব'লে নিজের ওপর ভরসা করতে পারলেন, তাঁর কারণ তাঁর অন্তরাত্মা ছিল নাটকের রসে জড়িত।

আমাদের নাট্য-জগতে আজ একজন মধুসূদন দরকার। যিনি সমস্ত বাধার বাঁধ ভেঙে দিয়ে প্রকৃত নাটকের রস-স্রোত আমাদের ঘরের কিনারে ও আঙ্গিনার অভ্যন্তরে টেনে আনতে পারবেন, চাই এমনি একজন সতেজ নাট্যকার।

আমাদের রঙ্গমঞ্চে আজকাল যা অভিনীত হ'চ্ছে, তা সংলাপ সর্বস্ব ও কথোপকথন দুরন্ত মাত্র। তাতে না আছে বাঁধুনী, না আছে গাঁথুনী। ঢিলে পায়জামার মত তা সর্বদাই আমাদের অংগ থেকে আলগা থাকতে চায়। নাট্যাভিনয়ের সময় সিচুয়েশন সৃষ্টির জন্যে ম্যাজিক দেখান হয়ে থাকে। পৌরাণিক নাটকে এই রকম অলৌকিক ঘটনা ম্যাজিকের মারফৎ দেখাবার সুযোগ আছে। তাই, রঙ্গমঞ্চ আজকাল পৌরাণিক নাটকে ঠাসা। এটা দেশের, দশের ও নাটকের পক্ষে কুলক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা বেঁচে আছি, জীবন বহন করছি, কিন্তু জীবনের সংগে পরিচয় নেই। জীবনের সংগে পরিচয় নেই ব'লেই পুরাণ আমাদের মন টেনেছে। বস্তুনিষ্ঠ না হ'তে পারলে নাটক জমবে কেন। ঐতিহাসিক নাটকে আমাদের আপত্তি নেই বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক লেখার মূলেও আছে নাট্যকারের অক্ষমতার অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি। তিনি ব'লে দিচ্ছেন, 'আমি আমাকে চিনিনে, আমার সমাজকে চিনিনে, প্রতিবেশীকে চিনিনে, নিজের জীবনের সংগে পরিচয় আমার নেই, সুতরাং ইতিহাসের আবরণ দিয়ে আমি আমার অক্ষমতাকে ঢাকতে চেষ্টা করছি। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করছিনে কিন্তু নাট্যকারের কেন এই পলায়ন, এইটেই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন নাটকে-নাটকে ঠাসা। নাটকীয় ঘটনায় আমাদের জীবন জড়িত। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেবার এই যে উদগ্র চেষ্টা, এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী আর কেউ নয়, দায়ী নাট্যকার স্বয়ং। তিনি নাটক লেখেন, কিন্তু নাটক লেখার মত নিষ্ঠা তাঁর নেই। জীবনকে পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে যে-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও ধৈর্য প্রয়োজন, তা তাঁদের নেই। তাই তাঁরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন।

আমাদের এখন প্রয়োজন একটি জাতীয় নাট্যশালা। এই নাট্যশালাকে একটা বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে চলতে হবে। প্রকৃত নাট্যকারকে দিয়ে প্রকৃত-জীবন প্রকৃত-আলেখ্যের দৃশ্য কাব্য রচনা করাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেক প্রতিভাই মাঠে মারা গেছে অতীতের জন্যে হা-হুতাশ ক'রে সময় নষ্ট করার আর প্রয়োজন দেখিনে। এখন ভাবতে হবে ভবিষ্যতের ভাবনা। এখন থেকে আমাদের জীবনের প্রথম পাঠ্য আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। নতুন ক'রে জীবনকে গ'ড়ে তুলতে হবে, নতুন পথে পা বাড়াতে হবে, নতুন আলোর সন্ধান করতে হবে। আমাদের জীবনের এই নব-অভিযানের উপর যে-কাব্য গ'ড়ে উঠ্‌বে, আমাদের জাতীয় নাটককে হ'তে হবে তার গতিমান আলেখ্য। বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়কে দুর্দশার পাঁক থেকে উদ্ধার করতে হ'লে অবিলম্বে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

নৃত্যের গতি

যূথিকা মুখোপাধ্যায়

দেহের গতি নৃত্যের ভাষা। দেহের গতি ও ছন্দান্বিত দেহভংগীর মধ্যেই নৃত্যে চরিত্রের রূপ ফুটে ওঠে। মনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, শান্তি-অশান্তি, আশা-আকাঙ্খা পদক্ষেপের ভংগীতে প্রকাশিত হয়।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যের গতি দিয়ে মনোভাব প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

শান্তভাবে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলে চরিত্রের অন্তরের শান্ত ভাব প্রকাশিত হয়। করুণ রস অভিনয়ে অভিনেতা যখন অবসন্ন দেহ ও শূন্যদৃষ্টি নিয়ে বিলম্বিত পদক্ষেপে প্রবেশ করেন, তখন দর্শকের মনে করুণ রসের সৃষ্টি হয়। বীরের দৃপ্তভংগী ও বিস্তৃত পদক্ষেপ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করে।

ভরত বিভিন্ন রস প্রকাশের জন্য বিভিন্ন নৃত্যগতি বর্ণনা করেছেন।

শান্ত রস প্রধান গতি—

(ক) সন্ন্যাসী ও ব্রতচারী—সন্ন্যাসী ও ব্রতচারীর গতির মধ্যে একটা শান্ত ভাব ফুটে ওঠে। নিশ্চল দেহ, প্রশান্ত মুখ, অচঞ্চল দৃষ্টি ; সম্পদে অবস্থান করে চতুর মুদ্রাযুক্ত হস্ত প্রসারিত। 'চতুর' মুদ্রায় কনিষ্ঠ অঙ্গুলী বাদে অন্য অঙ্গুলীগুলী সাপের ফণার আকারে বাঁকাতে হবে।

(খ) বণিক ও মন্ত্রীর গতি—এক হাত ঘটকামুখ মুদ্রায় চিৎভাবে (উত্তান) নাভিতটে রাখতে হবে, অন্য হাত অরাল মুদ্রায় স্তনের পাশে থাকবে। গতির সময় অংগ দোলাতে হয়না—শুদ্ধই থাকে।

(গ) ভ্রমণের অভিনয়—অন্ধকারে পথিকের গতি—পদ স্খলনের ভয় প্রকাশিত হবে; পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে দুটি হাত উভয় পাশে সঞ্চারিত হতে থাকবে।

উচ্চে আরোহণের গতি—বাড়ীর ওপর বা পাহাড় প্রভৃতি উচ্চস্থানে আরোহণের অভিনয়কালে দৃষ্টি থাকবে অধোগামী। অতিক্রান্ত পদে দেহ করতে হবে-যেন ডিঙ্গিয়ে ওপর দিকে ওঠার ভাব।

অল্প জলে অবতরণের গতি—অল্প জলের মধ্যে দিয়ে চলবার অভিনয়ে কাপড় অল্প তুলে চলতে হবে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে উপস্থিত হলে রথারোহীর গতি—পদ বিক্ষেপ এমন ভাবে ফেলতে হবে যেন ঘুরছে।

বিমান গতি—বিমান আরোহণকালে উর্ধ্বমুখে সারা দেহ যেন ওপরের দিকে তুলতে হবে।

আকাশ গতি—দৃষ্টি থাকবে নীচের দিকে।

আকাশ থেকে নামবার সময় শরীর সোজা মুখ নীচের দিকে থাকবে।

(ঘ) বিকলা গতি—বিকলা গতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় :—চিন্তা; ভয়, আবেগ ও ত্বরান্বিত অবস্থায় বিপদের কথা শুনে, নিন্দায় ও হিংস্র জন্তুর অনুসরণ অভিনয়ে।

শৃঙ্গার রস প্রধান গতি—

অপ্রচ্ছন্ন শৃঙ্গার গতি—বিচিত্র ফুল সাজে। নৃত্যগীতের মধ্যে ললিত পদক্ষেপে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করতে হয়।

প্রচ্ছন্নশৃঙ্গার গতি—অবিন্যস্ত অলঙ্কারবিহীন সাজ কোনরূপ পারিপাট্য নেই। অনুচর বিহীন। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ভীত কম্পমান দেহে চলতে হবে। রঙ্গভূমির আলো হবে ম্লা।

করুণ-রস-প্রধান গতি—

করুণ রসের অভিনয়ে দেহে অবসন্ন ভাব এবং চোখে শূন্যদৃষ্টির ভাব প্রকাশ করে বিলম্বিত পদক্ষেপে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। অমঙ্গল বা বিপদ বোঝাবার জন্য এই রকম গতি প্রয়োগ করা হয়।

আহত ব্যক্তির গতি—প্রহারে অভিভূত ব্যক্তির অভিনয়ে সারা দেহে অবসন্নভাব এবং হাত পা শিথিল দেখাতে। চলবার সময় দেহ টলবে।

শীত ও বৃষ্টির কষ্ট—শীত বা বৃষ্টির কষ্টপ্রকাশ করতে হলে সারা দেহ সঙ্কুচিত ও হাত দু'টি বুকের ওপর রেখে কুঁজো হয়ে চলতে হবে। সারা দেহ এবং দাঁত অধর ও চিবুক কাঁপবে।

রূপ হলো অপরূপ
অপরূপ
রূপ-বিন্যাসে
আমাদের অপূর্ব
সমাবেশ পরীক্ষা
প্রার্থনীয়—
আধুনিকতম
পরিকল্পনা
আমাদের বৈশিষ্ট্য

ভয়ানক রসপ্রধান গতি—

কম্পিত দেহ ও মাথা, চক্ষু বিস্ফারিত এবং ভয়চকিত চঞ্চল দৃষ্টি, হাতে কপোতক মুদ্রা। দ্রুত পদে আসতে হবে। পদে পদে যেন পা টলে পড়ে যাবার উপক্রম। কাপুরুষ এবং দুর্বল পুরুষের গতি এই রকমই হবে।

রৌদ্র রসপ্রধান গতি—

উদ্ধত, দুর্দ্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির চরিত্র অভিনয়ে রৌদ্র রসের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

(ক) স্বভাবজ রৌদ্র—রুক্ষবেশ, রক্তচক্ষু, বিকৃতস্বর

(খ) নেপথ্য রৌদ্র—রক্তাক্ত মুখ।

(গ) অংগ রৌদ্র—অস্ত্রসজ্জিত দীর্ঘ সবল দেহ।

রৌদ্র রসে গতি এই রকম হবে—চার তাল অন্তর পা ওঠাতে হবে, দুই তাল অন্তর পা মাটিতে ফেলতে হবে। অর্থাৎ পা ওঠাতে যতটা সময় লাগবে তার অর্ধেক সময়ে ফেলতে হবে।

কোহল প্রভৃতির মতে রৌদ্র রসে এই কয়টি লয় ব্যবহার করা যেতে পারে

(ক) নর্তনক—নর্তনক লয়ে থাকে তিনটি যতি, দ্বিপদী ছন্দের মতন। তিনটি দ্রুত তালের শেষে বিরাম পূর্বক তিনটি যতি ইহার লক্ষণ। নর্তনকের প্রয়োজন হয় দুঃসাহসিক অভিযান বা যুদ্ধ যাত্রায় ও বিজয় উৎসবে।

(খ) উৎফুল্ল—উৎফুল্লকে চারটি যতি থাকে—তার মধ্যে দুটি দ্রুত এবং একটি লঘু।

(গ) প্রফুল্লক—সংস্কৃতে তোটক ছন্দে রচিত কবিতায় প্রত্যেক চরণে চারটি অক্ষর থাকে। প্রথমে দুটি হ্রস্ব, তারপর একটি লঘু, এই রকম ক্রম অনুসারে অক্ষরগুলি সাজানো হয়। অর্থাৎ মোট চারটি গুরু বা দীর্ঘ অক্ষর থাকে।

প্রফুল্লক লয়ে তোটক ছন্দের চারটি গুরু বা দীর্ঘ তালের সংগে আরো একটি অতিরিক্ত দীর্ঘ তাল থাকে।

বীর গতি—

বীর রসের অভিনয়ে দৃপ্ত ভংগীর সংগে দূরে দূরে পদক্ষেপ ফেলে প্রবেশ করতে হয়। বাঁ হাতে শিখর ও ডান হাতে পতাকামুদ্রা।

বীভৎস গতি—

বীভৎস রস অভিনয়ে পা কখনও কাছে, কখনও দূরে দূরে ফেলতে হয়।

মানুষ অনেক সময় কতকগুলি প্রাণীর লীলায়িত দেহভংগীতে মুগ্ধ হয়ে তার অনুসরণ করছে। ময়ূর নৃত্য যুগে যুগে কবি ও শিল্পীর মনোরঞ্জন করে এসেছে। হাঁস, সাপ, হাতী, ঘোড়া এমন কি বেঙের নৃত্য ও মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। নন্দিকেশ্বর অভিনয়-দর্শনে প্রাণীর অনুকরণে কয়েকটি নৃত্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

(ক) ময়ূরী গতি—দুই হাতে 'কপিত্থ মুদ্রা' পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে পর্যায়ক্রমে এক একটি জানু (হাঁটু) চালনা করা হয়।

হংসী গতি দুই হাত ত্রিপতাকা মুদ্রা। ধীরে ধীরে ১২ আঙুল পরিমান অন্তর একটির পর আর একটি পা ফেলে চলতে হবে। গমন কালে যেদিকে পা ফেলা হবে সেই দিকে দেহও হেলবে, ঠিক যেমন হাঁস চলে।

(গ) মৃগীলগতি—উভয় হস্তে ত্রিপতাকা মুদ্রা। হরিণের মত দেহ নীচু করে ত্রস্তভাবে দু'পাশের দিকে বা সামনে গতি।

(ঘ) গজলীলা গতি—দুই হাত দুই পাশে, পতাকা মুদ্রায় আবদ্ধ করে সম্পদে চলতে হবে।

(ঙ) তুরঙ্গিনী গতি—বাঁ হাতে শিখর এবং দক্ষিণ হাতে পতাকা মুদ্রা। ডান পা তুলে ঘোড়ার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে।

(চ) সিংহী গতি—দুই হাতে শিখর মুদ্রা। প্রথমে দুই পায়ের আঙুলের ওপর দেহভার রেখে সামনের দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।

(ছ) মণ্ডূকী গতি—দুই হাতে শিখর মুদ্রা। বেঙের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হবে। অনেকটা সিংহী গতির মতন ; কেবল গতি তত দ্রুত নয়।

(জ) ভুজঙ্গী গতি—দুই হাতে ত্রিপতাকা মুদ্রা। খুব তাড়াতাড়ি সামনের দিকে লাফিয়ে চলতে হবে, যেন সাপ ছোবল দিতে যাচ্ছে।

প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্রের গতির বর্ণনাগুলিতে ভরতের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে মানুষের আচার ব্যবহার ও রুচির পরিবর্তনের জন্য শিল্পীকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে নৃত্যভংগীর পরিবর্তন করতে হয়েছে।
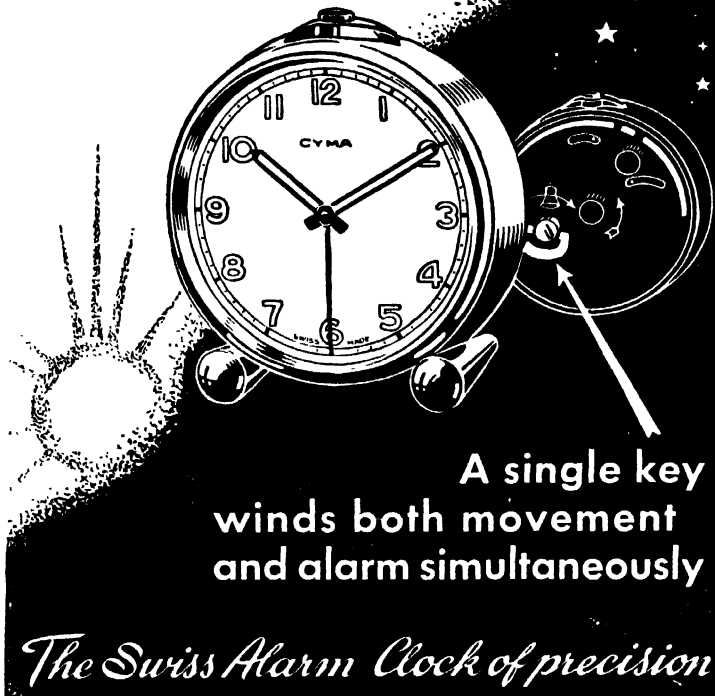
খুচরো খবর

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী

সম্প্রতি সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী নামে একটী নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের ম্যানেজিং এজেণ্টস নিযুক্ত হ'য়েছেন মেসার্স চিত্র চক্র এ্যাণ্ড কোং। চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা, প্রদর্শনা, ষ্টুডিও নির্মাণ প্রভৃতি চিত্র ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠলেও এদের বর্তমান প্রচেষ্টা চিত্রনির্মাণ কার্যেই নিয়োজিত হবে। গত মহালয়ার দিন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত নীরোদ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ন্যাশানল সাউণ্ড্ স্টুডিওতে এদের প্রথম ছবি 'শুধু ছবি'র মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। নবীন নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্যের সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'শুধু ছবি' গড়ে উঠবে। চিত্র পরিচালনার ভার গ্রহণও করেছেন নাট্যকার বিধায়ক। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের নূতন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলার চিত্র ও নাট্যজগতে প্রথম আগমনের সংগে সংগেই তিনি সুধীজনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ঘটনার অভিনবত্বে—চরিত্রের বিশ্লেষণ দক্ষতায়—ভাষার মাধুর্যে—সংলাপের স্নিগ্ধতায় মধু-সংলাপী বিধায়ক ইতিপূর্বেই জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছেন। সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী নূতন প্রতিষ্ঠান হয়েও যে, যোগ্য ব্যক্তির হস্তে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আশা করি 'শুধু ছবি' বাংলা চিত্র জগতের আর দশখানা ছবির মতই শুধু ছবি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে না—সে তার অন্তর সম্পদে দর্শকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা অর্জন করবে। আমরা আরো শুনতে পেলাম, কর্তৃপক্ষ পরিচালনা ও কাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে বিধায়ককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে স্বাধীনতার মর্যাদা আশা করি তিনি রক্ষা করবেন। শুধু ছবির বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন ছবি বিশ্বাস, সরযূ দেবী, রেণুকা দেবী, সন্তোষ সিংহ, মৈত্রেয়ী দেবী, অচিন্ত্যকুমার ও আরো অনেকে। শ্রীমতী রেণুকা বহুদিন বাদে এই চিত্রে চিত্রাবতরণ করবেন—তার গুণগ্রাহীর দল—এ সংবাদে খুশীই হবেন। পুরোণ গোষ্ঠী ছাড়া নূতনদের ভিতর থেকেও কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে গ্রহণ করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। চিত্র জগতে প্রবেশেচ্ছুকদের আমরা এই প্রসংগে রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী, ১৩, আপার সার্কুলার রোডে আবেদন করতে অনুরোধ করছি। অনুপযুক্তদের আবেদন করবার কোন প্রয়োজন নেই। 'শুধু ছবি'র সংগীত পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়েছে শ্রীযুক্ত চিত্ত রায়ের ওপরে।

যুদ্ধের ডামাডোলে বহু প্রযোজক প্রতিষ্ঠানকে চিত্র জগতের প্রাঙ্গনে আমরা ভিড় করে দাঁড়াতে দেখেছি। এই ভিড়ের মাঝ থেকে মাত্র জনকয়েক যাঁরা আন্তরিকতা নিয়ে পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁরা অভীপ্সিত পথে হয়ত অনভিজ্ঞতার জন্য ব্যর্থতার আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন—কিন্তু তবু তাঁদের আন্তরিকতার কথা মনে করে আমরা অভিনন্দন না জানিয়ে পারিনি। আর একদল এসেছিলেন—চোরাবাজারের দন্তে—হঠাৎ এসে ঝিলিক মেরে যেতে। এই ঝিলিক মারার দল চিত্র-জগতের যে সর্বনাশ করেছেন, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই অবহিত আছেন। তাই, আজও যখন নতুন কোন চিত্রপ্রতিষ্ঠানের নাম শুনতে পাই, আমরা আঁতকে উঠি। তাদের সততায় আমাদের সন্দেহ জাগবার কারণ আছে বৈকী! সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী সম্পূর্ণ নূতন প্রতিষ্ঠানরূপে আমাদের সামনে দেখা দিলেও, তাকে অবিশ্বাস করবার মত কারণ নেই। এই জন্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের মূলে যাঁরা রয়েছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে তাঁদের সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। এঁদের সকলেই যে চিত্রশিল্পের
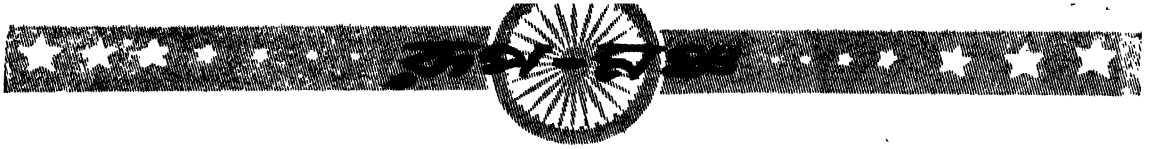
অভিজ্ঞতা নিয়ে পা বাড়িয়েছেন, তা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে—ব্যবসায় ও বাণিজ্য-জগতে এঁরা প্রত্যেকেই দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। কালোবাজারের দম্ভে এঁরা কোনদিন চটক লাগাতে চাননি—কালোবাজারের কালিমা এঁদের কাউকেই স্পর্শ করতে পারেনি। তাই এঁদের আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চিত্র জগতে এঁদের আগমনকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। এঁদের ভিতর রয়েছেন—স্বাধীন ভারতের কলিকাতা করপোরেশন-এর সর্বপ্রথম মেয়র ও খ্যাতিসম্পন্ন সলিসিটর শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী—জাহাজী ব্যবসায় যে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানটী অন্যতম অগ্রণী বলে দাবী করতে পারেন—এ্যালেক্সমিলার এ্যাণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নীরোদ চন্দ্র ঘোষ। ঘোষ লেনস্থিত ঘোষ পরিবারটি তাঁদের পারিবারিক আভিজাত্য ও বনেদিয়ানায় ও অঞ্চলে সুবিদিত—কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর সুপ্রসিদ্ধ বি, কে, পাল এ্যাণ্ড কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত নিতাই চন্দ্র পালও কারোর কাছে অপরিচিত নন। চিত্রজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা—নাট্য ও চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসও চিত্রমণ্ডলীর পরিচালকমণ্ডলীতে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানটিকে সুদৃঢ় করে তুলেছেন। তাছাড়া আছেন সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বর্গতঃ বি, সরকার-এর অন্যতম বংশধর জমিদার ও স্বর্ণব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জগৎজ্যোতি সরকার। শ্রীযুক্ত বলাই দত্ত, জমিদার ও ব্যবসায়ী এবং তরুণ জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়ও এঁদের পরিচালকমণ্ডলীতে যোগদান করেছেন বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন। চিত্রজগতে সুপরিচিত—অক্লান্ত নীরব কর্মী শ্রীমান অচিন্ত্যকুমার বেরা এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাধ্যক্ষ রূপে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠানটির গঠন-মূলে তারই প্রচেষ্টা নিহিত রয়েছে অচিন্ত্যকুমার অভিনেতা-রূপেও কয়েকবার দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানিয়েছেন। সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলীর কর্ণধাররূপে—যাঁদের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি—রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে তাঁরা যে সুনাম ও মর্যাদা অর্জন করেছেন-আশা করি, চিত্রজগতে পা বাড়িয়ে সে সুনাম ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা সব সময়ই যত্নবান থাকবেন। নইলে মনে করবো, এই প্রতিষ্ঠানটী এসেছে ক্ষণিক চটক লাগাবার চাকচিক্য নিয়ে—আন্তরিকতার গভীরতা এঁদের কারোরই নেই।

লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ

লীলাময়ী পিকচার্স প্রযোজিত রহস্যমূলক কথাচিত্র 'দেবদূত'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লালপাঞ্জার' কাহিনীকে কেন্দ্র করে বর্তমান চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। দেবদূতের সংলাপ, কাহিনী, সংগীত ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনা করেছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্যাতনামা সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত বিনয় গোস্বামীর ওপর সংগীত পরিচালনার ভার ছিল। দেবদূতের বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অমিতা বসু, অভি ভট্টাচার্য—(নৌকাডুবি-খ্যাত), ভাস্কর দেব (এঃ), প্রণব বাগচী, অজন্তা কর, সন্তোষ চৌধুরী, শেখর মুখার্জি, চিত্ত চৌধুরী, হারাধন বন্দ্যো, অচিন্ত্যকুমার প্রভৃতি। লীলাময়ী পিকচার্সের অন্যতম নবীন প্রযোজক শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী চিত্রখানিকে নিখুঁত রূপ দিতে কোন দিক দিয়েই শৈথিল্যের পরিচয় দেন নি। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী ও তাঁর ভ্রাতারা যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত রয়েছেন, এঁরা বাংলার এক সুপ'রচিত ব্যবসায় পরিবার থেকে এসেছেন। বাঙ্গালীর নিজস্ব অর্থে ও শ্রমে প্রতিষ্ঠিত মোহিনী মোহন মিলস্ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ মোহিনী মোহন চক্রবর্তী মহাশয় এঁদের পিতামহ ছিলেন। বস্ত্র ব্যবসায়ও এঁরা যেমনি বাঙ্গালীর বিশ্বাস ও সহানুভূতি লাভ করেছেন, চিত্র ব্যবসায়েও আশা করি তা থেকে বঞ্চিত হবেন না। এবং আমরা শুনে খুশী হলাম যে, এঁদের চিত্রখানির পরিবেশন স্বত্ব লাভ করেছেন সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ। বাংলার এই দুইটী উল্লেখযোগ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্যবসায় সম্পর্ক গড়ে উঠবার জন্য আমরা উভয়কেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
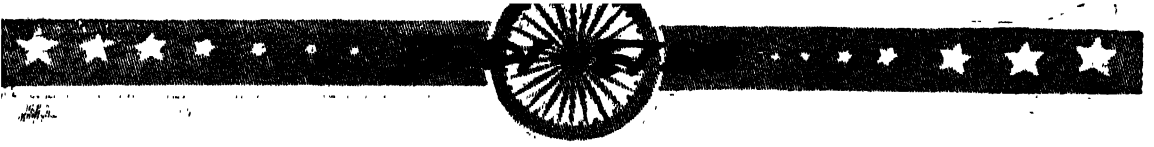
স্ক্রীন ল্যাণ্ড লিঃ

এদের প্রথম বাণীচিত্র 'ভাঙ্গন'এর মহরৎ উৎসব কিছুদিন পূর্বে বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। প্রথিতযশা কথাশিল্পী তারাশঙ্করের এই কাহিনীটাকে পর্দায় রূপায়িত করে তুলবার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রফুল্ল চৌধুরী, নরেশ চৌধুরী, সুরেন সরকার, মোহিনী চৌধুরী, বিশ্ববাসু চৌধুরী, শুভো মুখো প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রযোজক শ্রীযুক্ত অহী বসু সব সময়ই মাননীয় অতিথিদের আপ্যায়নে সতর্ক ছিলেন। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা কচ্ছি।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স

অগ্রদূতের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'কে এরা হিন্দি চিত্রে রূপায়িত করে তুলেছেন। পথের দাবীর সব্যসাচীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন শ্রীযুক্ত কমল মিত্র।

এ. এল, প্রডাকসন্স

এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'ঘরোয়া' চিত্রখানি এসোসিয়েটেড ডিসষ্ট্রীবিউটার্সের পরিবেশনায় মিনার, ছবিঘর ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে ৫ই, ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত মনি ঘোষ। ঘরোয়ার কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন মলিনা দেবী, সুপ্রভা মুখোঃ, অশোকা গোস্বামী, ভানু বন্দ্যোঃ, শ্যামলাহা, প্রীতিধারা, নমিতা, তুলসী চক্রবর্তী নৃপতি প্রভৃতি আরো অনেকে। পূর্বপরিষদের খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির মিত্রকে এই চিত্রে সর্বপ্রথম নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে। ঘরোয়ার সংগীত পরিচালনা করেছেন কালোবরণ দাস।

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে এদের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন 'মাটি ও মানুষ'এর চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে 'মাটি ও মানুষের কাহিনী রচনা করেছেন সাহিত্যিক পরিচালক শ্রীযুক্ত সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। আমবাড়িয়াগড়ের জমিদার প্রযোজক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চৌধুরী 'মাটি ও মানুষ'কে মাটির মানুষদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কোন প্রকার শৈথিল্যের পরিচয় দিচ্ছেন না। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন নরেশ মিত্র, বিমান বন্দ্যো, হরিধন, তুলসী চক্র, অমর চৌধুরী, বাণীব্রত, আশু বসু, গীতশ্রী, মণিকা ঘোষ, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, রেবা বসু প্রভৃতি।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

নবীন পরিচালক শ্রীযুক্ত কার্তিক বসু 'রামের সুমতি'র কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছেন। সম্ভবতঃ বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার পূর্বেই 'রামের সুমতি' অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে। 'রামের সুমতি'র নামভূমিকায় অভিনয় করেছে শ্রীমান ছবি রায়। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমর মল্লিক ও মলিনা দেবী। বাংলার নবীনদের জন্য নিউ থিয়েটার্সের নবীন পরিচালক যে চিত্রোপহার দিলেন—আশা করি তা তাদের মন দখল করতে সক্ষম হবে। নিউ থিয়েটার্সের অপর দুখানি চিত্রের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিচালক বিমল রায় 'অঞ্জনগড়' এবং পরিচালক হেমচন্দ্র 'অচ্যুত' এই দুখানি চিত্র দ্রুত সমাপ্তির পথে নিয়ে চলেছেন। অঞ্জনগড় সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। অঞ্জনগড়ের হিন্দি ও বাংলায় অভিনয় করছেন বাংলা: দেবী মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালা সরকার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, বিনতা বসু, জীবেন বসু, শ্রীলেখা, রাজা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। হিন্দি: অজয়কুমার, আখতার জাহান, হীরালাল, বি, এস, কাপুর, রাইমোহন, আন্সারী, পল মাহীন্দ্র প্রভৃতি।

মজুমদার-স্বামী প্রডাকসন্স

শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় এদের 'সর্বহারা' বাণীচিত্রের কাজ এগিয়ে চলেছে। শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর মঞ্চ-সাফল্য নাটক দুঃখীর ইমানকে কেন্দ্র করে সর্বহারা চিত্রখানি গড়ে উঠছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন, কানু বন্দ্যোঃ, সুশীল মজুমদার, নমিতা রায়, লীলা দাশগুপ্তা

প্রভৃতি। 'সৈনিকের স্বপ্ন' নাম দিয়ে এদেরই আর এক-খানি পূর্ণাংগ চিত্র শ্রীযুক্ত মজুমদার পরিচালনা করছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বীরত্বের ঘটনা নিয়ে এই চিত্রখানি গড়ে উঠছে।

চিত্রে বিবেকানন্দ

শ্রীযুক্ত অমর মল্লিকের পরিচালনায় 'স্বামী বিবেকানন্দের' চিত্রগ্রহণের কাজ যথারীতি নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিওতে চলছে। নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হ'য়েছেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিবেকানন্দের জীবনী চলচ্চিত্রোপযোগী করে রচনা করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীযুক্ত মল্লিককে ষ্টুডিওর দিক থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য করছেন।

ফিল্ম আর্ট প্রোডিউসার্স

ফিল্ম আর্ট প্রোডিউসার্সের প্রথম চিত্র "উমার প্রেম" রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন সাংবাদিক-পরিচালক খগেন রায়। চিত্রকাহিনীটিও শ্রীযুক্ত রায়ের রচনা। এই ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, প্রমীলা-ত্রিবেদী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি দাস, অজিত-বন্দ্যোপাধ্যায়, অহী সন্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শান্তা ও আরো অনেকে। "উমার প্রেম" একটি বঞ্চিতা মেয়ের করুণ কাহিনী। এবং crime-drama-র জৌলুষও এই চিত্রের মধ্যে কিছুটা পাওয়া যাবে বলে কতৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন। সংগীতাংশ অনিল বাগচীর ওপর অর্পিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, "উমার প্রেম" বড়দিনের পূর্বেই আত্ম-প্রকাশ করবে।

হিন্দুস্থান আর্ট পিকচার্স লিঃ

হিন্দুস্থান আর্ট পিকচার্স লিমিটেডের প্রথম বাংলা ছবি— "দুধারা"র কাজ কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে সমাপ্তির পথে। কয়েকটা প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলতে ছবির কর্মীবৃন্দ ওয়ালটিয়ার ও দার্জিলিং গিয়েছিলেন বলে প্রকাশ।

"দুধারা"র মধ্য দিয়ে ব্যষ্টি ও সমাজ জীবনের বাস্তব সংঘাত সুস্পষ্ট ফুটে উঠবে। গল্পের নায়ক একজন যশস্বী সুরকার এবং তার মধ্য দিয়েই এক জাগতিক সমস্যা মূর্ত হয়ে উঠছে। সমস্যামূলক হয়েও গল্পটী প্রণয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ ও দুঃসহ শ্লোগান বিবর্জিত।

প্রথিতযশা কলাকুশলী ও শিল্পীদের নিয়ে একটী বলিষ্ঠ গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। পরিচালনার ভার এই গোষ্ঠীর উপর ন্যস্ত হয়েছে।

কৃষ্ণা ফিল্মস লিঃ

ঋষি বঙ্কিমের অমর উপন্যাস 'আনন্দমঠের' চিত্ররূপ বেঙ্গল ন্যাশানাল ষ্টুডিওতে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর '৪৭ হতে সুরু হয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কৃষ্ণা ফিল্মস্ এণ্ড ষ্টুডিও লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ যে কঠিন কাজে নেমেছেন, তা' সফল করতে প্রযোজক বিমল সিংহ ও অভিজ্ঞ পরিচালক সন্তোষ হাজরার অক্লান্ত পরিশ্রম সত্যই প্রশংসার্হ। এ পর্যন্ত যেটুকু অংশ গৃহীত হয়েছে— তাতে মহেন্দ্র, কল্যাণী, শান্তি, নিমাই, জীবানন্দ ও সত্যানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ যথাক্রমে—অনু মুখোপাধ্যায়, মণিমালা দেবী, সীতা দেবী, চিত্রা দেবী, কালী ব্যানার্জী ও কৃষ্ণ সরকার তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্যে বঙ্কিম আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখবেন বলে প্রকাশ। পরিচালক সন্তোষ হাজরার সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে—"আনন্দমঠ" জন-সাধারণের মনে আনন্দ উচ্ছ্বাস অব্যাহত রাখবে, কর্তৃপক্ষের তাই বিশ্বাস।

রমা আর্ট প্রডিউসার্স লিঃ

এদের প্রথম বাণীচিত্র "সংসার"এর কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অনেকটা এগিয়ে চলেছে। বহুদিন পরে "সংসার" বাণীচিত্রে জনপ্রিয় অভিনেতা রবীন মজুমদার ও চিরচঞ্চলা অভিনেত্রী সন্ধ্যারাণীকে একযোগে দেখা যাবে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করছেন সুবল দাশগুপ্ত এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন অহীন্দ্র, সুপ্রভা, ইন্দু মুখোঃ, শান্তি গুপ্তা, বেচু সিং সনাতন, সুকুমার প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে মুরারী ঘোষ ও সত্যেন ঘোষ। রীতেন এণ্ড কোং পরিবেশনায় চিত্র-

খানি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে। আমরা শুনে আনন্দিত হলাম যে, এই বাণীচিত্রের প্রযোজক তরুণ ব্যবসায়ী স্বরাজ বসু নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও চিত্রনির্মাণে বিরত হননি।

রূপায়ণ ঃ—

গত রবিবার এঁদের সপ্তম নিবেদন "সর্বহারার স্বপ্ন" নাটকের শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হ'য়েছে। নাটকটী রচনা করেছেন—দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন সৌখীন সম্প্রদায়ের অন্যতম নট শ্রীসতু মতিলাল। যে সমস্ত তরুণ দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁদের স্বপ্ন সার্থক করে গেলেন, এমনি কয়েকটী বিপ্লবীর জীবনী নিয়ে রচনা করা হয়েছে এই নাটকটী। এতে অংশ গ্রহণ করবেন সৌখীন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ ও চিত্রজগতের কয়েকজন শিল্পী। সুর সংযোজনার ভার নিয়েছেন—"মডার্ণ আর্টিষ্ট"। আমরা এদের সাফল্য কামনা করি।

ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়ার্স ঃ—

এঁদের আগতপ্রায় নাটক বিধায়কের "রক্তের ডাক" রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে মুক্তিপ্রতীক্ষায়। প্রযোজনার ভার অরুণ রক্ষিত ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে—কৌতুক অভিনেতা আশু বোস, অরুণ রক্ষিত, দেবু মুখোপাধ্যায়, রাধা মল্লিক, অমূল্য বসু, উমা দত্ত, বিমল চট্টোপাধ্যায় ও গোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া তরুণের দল ঃ—

গত শনিবার ৬ই অগ্রহায়ণ, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত বিজলী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে "পাইকপাড়া তরুণের দল" কর্তৃক "টিপু সুলতান" ও "বিশবছর আগে" অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন—শ্রীযুক্ত জ্যোতীষ চন্দ্র রায়। এই অনুষ্ঠানকে সর্বাংগসুন্দর করবার জন্য, নেপাল মিত্র, বিশ্বময় ঘোষ, গোবিন্দ সিংহ, প্রেমাংশু বোস ও শক্তিময় ঘোষ আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা অভিনয় চাতুরীতে উপস্থিত জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। নতুনদের এই প্রচেষ্টাকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্মৃতি ও বর্তমান-মণিপুর।

সম্প্রতি ভারতের শিক্ষামূলক খণ্ডচিত্র নির্মাতা 'দি টপিক্যাল ফিল্ম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' মণিপুরে গমন করে ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বহু স্মৃতিচিহ্ন ও মণিপুরের বিখ্যাত নৃত্যকলার চিত্র গ্রহণ করে এনেছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' বুকের রক্ত দিয়ে একদিন ইম্ফলের রণাঙ্গনে যে বীরত্বের নিদর্শন রেখে গেছেন, এই চিত্রে তার পরিচয় মিলবে। এতদ্ব্যতীত মণিপুরী নৃত্যের ও কুটীরশিল্পের বহু দৃশ্য এই খণ্ডচিত্রে স্থান লাভ করেছে। মণিপুরের অধিবাসীরা একদিকে যেমন নৃত্য, গীত ও বাদ্যে পারদর্শী, অন্য দিকে কুটীরশিল্পে এখনও তারা অনেক বিষয়ে অগ্রণী। তাদের সেই কলাকুশলতা ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রকৃত পরিচয় এই খণ্ডচিত্রে পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই চিত্র নির্মিত হচ্ছে। চিত্রখানি যাতে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই প্রদর্শিত হতে পারে, সেজন্য উক্ত চিত্র-প্রতিষ্ঠান চিত্র-পরিবেশকদের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করছেন।

ওরিয়েণ্ট পিকচার্স

নবীন প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুনীল বসু মল্লিক প্রযোজিত ওরিয়েণ্ট পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'বিচারক' এর কাজ ইন্দ্রপুরীতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত। চিত্রনাট্য, সংলাপ রচয়িতা ও পরিচালক রূপেও ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত গুপ্তের সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। বিচারকের বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবী প্রসাদ, নবাগতা অলকা দেবী ও সুধা রায় বি, এ, নবাগত কালিপদ, তারক মুখোপাধ্যায়, হরিদাস, অনাদি প্রভৃতি। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করছেন শ্রীযুক্ত পূর্ণ মুখোপাধ্যায় 'বিচারক' কোয়ালিটি ফিল্মস-এর পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করবে।

উদয়ন প্রডাকসন

কিশোর চলচ্চিত্রের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে মানুষের

ভগবান চিত্রের পরিচালক মিঃ উদয়ন 'কৈশোরিকা' নামে একখানি শিক্ষামূলক কিশোর চিত্র নির্মাণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা শুনে খুশী হলাম, সম্প্রতি ন্যাশানাল সাউণ্ড স্টুডিওতে উক্ত চিত্রের মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। আমরা মিঃ উদয়নকে এই সম্পর্কে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্স লিঃ

ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন "নতুনেরী জোয়ার এলো" মহরৎ উৎসব ন্যাশানাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। পরিচালক উদয়নের একটি নতুন ধরনের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রখানি গড়ে উঠবে। চিত্রপরিচালনার দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করেছেন। এদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'মানুষের ভগবান' দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। 'মানুষের ভগবান'-এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন বিপিন মুখোপাধ্যায়, প্রমীলা ত্রিবেদী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী, স্বপন, শুভ্রা, গৌরশী, সুলতা, সুরুচি, দেবকুমার, অনিল মিত্র প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করছেন বিশ্বনাথ মৈত্র। দৃশ্য পরিচালনায় আছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। মানুষের ভগবানের কাহিনীও রচনা করেছেন পরিচালক উদয়ন। প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ঘোষ আমাদের জানিয়েছেন, 'মানুষের ভগবান' শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। মেসার্স রাজা ফিল্ম এদের পরিবেশনা স্বত্ব লাভ করেছেন।

অজন্তা আর্ট ফিল্ম

অজন্তা আর্ট ফিল্মের প্রযোজনায় শ্রীযুক্ত পৃথ্বিশ ভট্টাচার্য রচিত 'কারটুন'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। কাহিনীকার শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এই চিত্রে ডি, জি'র সহযোগী পরিচালক রূপে কাজ করছেন। চিত্রজগতে আর একজন সাহিত্যিকের এই আগমনকে আমরা অভিনন্দিত কচ্ছি। কারটুনের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন পাল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা ভাদুড়ী, গীতা চট্টো, অজন্তা কর প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত দক্ষিণা মোহন ঠাকুর।

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান

হাওড়ার 'পারিজাত' প্রেক্ষাগৃহের স্বত্বাধিকারীর প্রযোজনায় এদের প্রথম চিত্রনিবেদন গড়ে উঠবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'কে অবলম্বন করে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত দর্শক সাধারণের কাছে অপরিচিত নন। বহুদিন থেকেই তিনি বাংলা চিত্রজগতের সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। পোষ্যপুত্র, কর্ণার্জুন প্রভৃতি একাধিক চিত্র পরিচালনা করে তিনি বাঙালী দর্শক সমাজের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। সম্প্রতি 'পথের দাবী' পরিচালনায় তাঁর নৈপুণ্যে অনেকেই প্রশংসা করেছেন। পথের দাবীর পর শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তকে বাংলা সাহিত্যের আর একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসকে চিত্ররূপ দিতে দেখে আমরা খুশীই হ'য়েছি। কিন্তু এসম্পর্কে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তকে আমাদের কিছু বলবার আছে। সম্প্রতি দেবকী বসু মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরকে যে ভাবে হত্যা করেছেন, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তকে সে সম্পর্কে প্রথম থেকেই সতর্ক থাকতে বলি। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনী দাস, তারাশঙ্কর, ডাঃ সুনীতি কুমার, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় মন্মথ মোহন বসু, নাট্যকার শচীনসেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি আরো যে সব সুধীজন রয়েছেন—এঁদের একদিন আমন্ত্রণ করে চিত্রনাট্য রচনার পূর্বে যেন পরামর্শ গ্রহণ করে এই কঠিন কাজে অগ্রসর হন। নইলে শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর মত শুধু ঢকা-নিনাদ সার হবে। তাঁর প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিক ভাবে গ্রহণও যেমনি করতে পারবো না—তেমনি এই হত্যাকাণ্ডের প্রশ্রয়ও দিতে পারবোনা। "অগ্নিযুগের মেয়ে" এই নাম দিয়ে রূপায়ণচিত্র প্রতিষ্ঠান আর একখানি রাজনীতিমূলক চিত্রগ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন। বাংলার অগ্নিযুগের মেয়েদের বিপ্লবী কার্যকলাপ মূলতঃ এইচিত্রে প্রাধান্য পাবে।
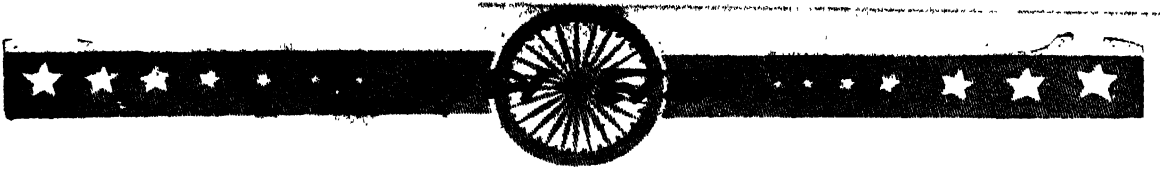
রূপশ্রী লিঃ

রূপশ্রী লিঃ-এর বর্তমান বাংলা ছবি শাঁখা সিঁদুর এর কাজ কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের 'বুভুক্ষা' কাহিনীটিকে কেন্দ্র করে বর্তমান চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা সাংবাদিক মৌচাকে ঢিল খ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। শাঁখা সিঁদুর-এর সুর-সংযোজনা করছেন শ্রীযুক্ত গোপেন মল্লিক। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন সন্ধ্যারাণী, দীপক মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, হরিধন, তুলসী প্রভৃতি। রূপশ্রী লিঃ-এর শ্রীযুক্ত কেশব দত্ত চিত্রখানিকে সর্বাংগ সুন্দর করে তুলতে প্রযোজনার দিক থেকে বিন্দু মাত্রও ত্রুটি করছেন না। আশা করি তাঁর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবে।

বোসার্ট প্রডাকসন্স লিঃ

শ্রীযুক্ত সুখেন্দু বসু প্রযোজিত এদের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন প্রিয়তমার কাজ ইন্দ্রপুরীতে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সুর-সংযোজনা করেছেন নবীন সুরকার শ্রীযুক্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, আরতি মজুমদার, অহীন্দ্র, ইন্দু, অজিত, ইন্দিরা রায়, তুলসী চক্র, রেবা বসু, মাষ্টার দিলীপ কানু বন্দ্যোঃ প্রভৃতি।

সিলভার স্ক্রিন

বোসার্ট প্রডাকসনের প্রযোজনায় শ্রীযুক্ত সুখেন্দু বসুর নিয়ন্ত্রণাধীনে নূতন চিত্র প্রতিষ্ঠান সিলভার স্ক্রিনের প্রথম চিত্র নিবেদন 'পরিণতি' প্রযোজকের নিজেরই একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত সুধীন গুপ্ত। সংগীত রচনার ভার নিয়েছেন শ্রীযুক্ত গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। সংলাপ লিখছেন ফণীবাবু। চরিত্র নির্বাচন ও ছবির কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। এই চিত্রে অভিনয়ের জন্য নবাগত ও নবাগতাদের সুযোগ দেওয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষ রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নূতনদের ভিতর যদি কোন উপযুক্ত বা উপযুক্তা থাকেন এবিষয়ে রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে আবেদন করতে পারেন।

রঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিঃ

এদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'সাহারা' শ্রীযুক্ত সুনীল মজুমদারের পরিচালনায় প্রায় সমাপ্ত হ'য়ে এসেছে। খ্যাতনামা ব্যবসায়ী প্রযোজক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ 'সাহারা'কে দর্শক-মন-নন্দিত করে তুলতে কোন প্রকার গাফিলতির পরিচয় দেননি। 'সাহারা'র কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন যথাক্রমে বিনয় রায় ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন খগেন দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী, বিপিন, সাবিত্রী, সাধন সরকার, আশা বসু, প্রভা, জহর, নিভাননী, নৃপতি সন্তোষ, মাষ্টার লক্ষ্মী, তুলসী প্রভৃতি আরো অনেকে।

এস, বি, প্রডাকসন্স

শ্রীযুক্ত নীতিন বসুর প্রযোজনায় এদের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিদান রামের সুমতির পরই সম্ভবতঃ চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে। দৃষ্টিদানের বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন সুনন্দা দেবী, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, কেতকী, প্রভৃতি আরো অনেকে।

দি রজনী ফিল্ম করপোরেশন

শ্রীযুক্ত বি, কে, দালালের পরিচালনায় এদের 'চলার পথে' চিত্রখানির কাজও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চলার পথের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র কুমার রায়। সংগীত পরিচালনা করছেন সমরেশ চৌধুরী। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন দেবী মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, সমর রায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী বিশ্বাস, রবি রায়, ছায়া চৌধুরী, অলকা মিত্র, প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিরাণী প্রভৃতি।

ভ্যারাইটি ফিল্মস

নবীন প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুকুমার বসুর প্রযোজিত 'রবীন-মাষ্টার'-এর চিত্র গ্রহণের কাজ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের সর্বজন প্রশংসিত 'রবীন মাষ্টার' উপন্যাসখানিকে কেন্দ্র করেই বর্তমান চিত্রখানি গড়ে

—রূপায়ণে—

অহীন্দ্র, সন্ধ্যারাণী, বিপিন, সাবিত্রী, সাধন সরকার, আশা বসু, প্রভা, জহর, নিভাননী, আশু বসু, অলকা নৃপতি, সন্তোষ, তুলসী, মাষ্টার লক্ষ্মী প্রভৃতি।

★

কলিকাতার বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তি প্রতীক্ষায়

মুক্তি-প্রতীক্ষায়—

মাটি ও মানুষ

ভূমিকায়: নরেশ মিত্র, তুলসী চ, হরিধন, তুলসী চ, এস কুমার, অমর চৌধুরী, আশু বসু, হেম গুপ্ত, গীতশ্রী, মনিকা ঘোষ, রেবা শ্রীমতী মুখার্জি

গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনা
• সুধীরবন্ধু •

সঙ্গীত পরিচালনা • খগেন দাশগুপ্ত
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী • বিভূতি দাস
আলোক চিত্র-শিল্পী • দিব্যেন্দু ঘোষ

উঠেছে। রবীন মাষ্টারের সুকঠিন চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তুলেছেন উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী (ছোট), ইন্দিরা রায়, অজন্তা কর, সন্তোষ সিংহ, প্রভৃতি আরো অনেকে। রবীন মাষ্টার পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত দক্ষিণামোহন ঠাকুর। এদের অপর একখানি হিন্দি চিত্র 'প্রেমকী দুনিয়ার' চিত্র গ্রহণের কাজ সমাপ্ত হ'য়ে মুক্তির দিন গুনছে।

ভ্যারাইটি ফিল্মের কর্ণধার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু মহাশয়ের উদ্যোগে শ্যামবাজার অঞ্চলে 'অরুণ' নামে নূতন একটি প্রেক্ষাগৃহের নির্মাণ-কার্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

সমালোচনা—

শ্রীমতী

মিনার্ভায় অভিনীত 'শ্রীমতী' আমরা দেখে এসেছি। শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যালের 'প্রিয়বান্ধবী' উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীমতী নাটক রচিত হ'য়েছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রিয়বান্ধবী ইতিপূর্বে বাংলা ও হিন্দি চিত্রে রূপলাভ করেছে। চলচ্চিত্রে যতখানি সম্ভাবনা ছিল নাট্যমঞ্চে তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় এবং এই অসুবিধার কথা চিন্তা করেই নাট্যকারকে 'শ্রীমতীর' রূপ দিতে হ'য়েছে। এবং 'শ্রীমতীর' রূপদানে প্রিয়বান্ধবীর যে মর্যাদাহানি হয়নি একথা আমরা স্বীকার করবো। তবে জহরের চরিত্রের প্রতি তিনি খুবই অবিচার করেছেন। একমাত্র শেষের দৃশ্য ছাড়া জহর সেরকম সুবিচার পায়নি। একদিক দিয়ে নাটকটার নাম শ্রীমতী রাখা সার্থক হ'য়েছে।

অভিনয়ে শ্রীমতীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালা যথাযথ ভাবে শ্রীমতীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রোপলব্ধির দিক থেকে, বাচনভংগী ও অভিনয়ের দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলবার নেই। যে যে দৃশ্যে তাঁর অভিনয় একটু ঝুলে পড়েছে বলে মনে হয়েছে, সেজন্য শ্রীমতী সরযূকে দায়ী করবো না—দায়ী করবো তাঁর সহ অভিনেতা জহরের ভূমিকায় জহর গঙ্গোপাধ্যায়কে। নাটকের জহরের প্রতি নাট্যকার কিছুটা অবিচার করেছেন সন্দেহ নেই—কিন্তু যে সব দৃশ্যে জহরের পূর্ণমর্যাদা রক্ষিত হ'য়েছে, সেসব দৃশ্যেও জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যর্থতায় ব্যথিতই হ'য়েছি। এমনকী অনেকাংশে অভিনয়াংশও তিনি মুখস্ত করতে পারেননি। এজন্য শুধু তিনিই দায়ী নন—মনে হ'লো শ্রীমতী প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সময় পায়নি তাই অন্যান্য পার্শ্ব অভিনেতারাও যেন তৈরী হ'য়ে নিতে পারেননি। অবশ্য নাটকের গোড়ার দিকেই আমরা শ্রীমতী দেখে আসি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় যে ভাবে অভিনয় করেছেন, তাতে তাঁর আন্তরিকতার কোন পরিচয়ই পাইনি। একথায় শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় নিজের সপক্ষে বলতে পারেন, উদাসী ভবঘুরে জহরকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর অমনি ধরনের একটা উদাসী ভাব গ্রহণ করতে হ'য়েছে—তাহলে বলবো যে, তিনি একদিকে যেমনি চরিত্রটিকে উপলব্ধি করতে পারেননি, অন্যদিকে তেমনি চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। জহরকে নিছক উদাসী ও ভবঘুরে বলে মনে করলে ভুল করা হবে। জহরের চরিত্রের দৃঢ়তা কম নয়। জহর এবং শ্রীমতীকে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে আদর্শের প্রতীকরূপে দাঁড় করাতে চেয়েছেন উপন্যাসিক। শ্রীমতী সরযূ শ্রীমতীর চরিত্রের এই মর্মকথাটুকু উপলব্ধি করলেও শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় জহরের মর্মোদ্ধার করতে পারেননি। এমনকি শেষের দৃশ্যে যেখানে নাট্যকার জহরকে তার নিজের মুখ দিয়ে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করলেন, সেখানে জহর গাঙ্গুলী সম্পূর্ণ রূপেই ব্যর্থ হ'য়েছেন। অন্যান্য চরিত্রের ভিতর দুলালচাঁদের ভূমিকায় শ্যামলাহাকে প্রশংসা করবো। অন্যান্য চরিত্রের বেলায় নিন্দা করবার কিছুই নেই। মোটের ওপর শ্রীমতী শিক্ষিত নাট্যপিপাসুদের কাছে কিছুটা সমাদর লাভ করবে। —শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
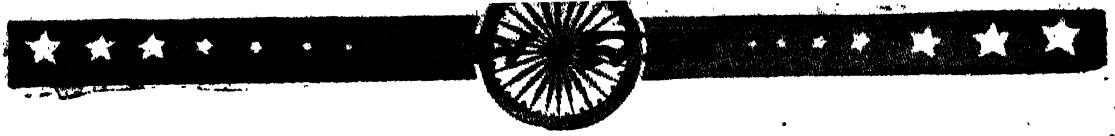
নৌকাডুবি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবী' মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্সে'র পরিবেশনায় মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে মুক্তিলাভ করেছিল। চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন বম্বে টকীজ লিঃ। পরিচালনা: নীতিন বসু। চিত্রনাট্য রচনা: সজনী দাস। সুর-পরিচালনা: অনিল বিশ্বাস। রবীন্দ্রসংগীত তত্ত্বাবধায়ক: অনাদি দস্তিদার। চরিত্র রূপায়ণে: মীরা সরকার, মীরা মিশ্র, অভি ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, বিমান বন্দ্যোঃ, প্রীতি মজুমদার, সুনলিনী দেবী, গায়ত্রী রায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবীর সংগে বাংগালী দর্শকসমাজ মোটেই অপরিচিত নন। নৌকাডুবীকে পর্দায় রূপান্তরিত করতে যেয়ে তার চিত্রনাট্য রচনার ভার পড়েছিল শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের ওপর। ইতিপূর্বে কবিগুরুর যে কয়টি কাহিনী পর্দায় রূপলাভ করেছে—তার প্রায় প্রত্যেকখানিতেই কবিগুরুর কাহিনীর মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। নৌকাডুবি এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। নৌকাডুবি এই জন্যই মূলতঃ শিক্ষিত দর্শক সমাজের কাছে স্বীকৃতি পাবে। খোদার ওর খিদ্মদ-গারী করবার লোভ চিত্রজগতের অনেক মহাত্মারাই সম্বরণ করতে পারেননা—শ্রীযুক্ত দাসকে তার ব্যতিক্রম রূপে দেখতে পেয়েছি বলেই তাঁকে সমালোচনার পূর্বে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। পরিচালনায় শ্রীযুক্ত নীতিন বসুকেও প্রশংসা করবো। সবচেয়ে প্রশংসা করবো চিত্রখানির চিত্রগ্রহণের নৈপুণ্যের জন্য। বাংলা ছবিতে এমনি নিখুঁত চিত্রগ্রহণ খুব কমই দেখা যায়। নৌকাডুবির দৃশ্যের পরিবেশটিও চমৎকার। তবে একটা জিনিষ নীতিন বসু এড়িয়ে গেছেন, নৌকারগতি মোটেই ফুটে ওঠেনি। নৌকাডুবির দৃশ্যটি দেখে মনে হয়—যেন নিকটে নৌকাটিকে বেঁধে রেখে চিত্রগ্রহণ করা হ'য়েছে। অর্থাৎ নৌকোর চলমান গতি মোটেই ফুটে ওঠেনি।

অভিনয়াংশ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাবো—যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী আলোচ্য চিত্রে কর্তৃপক্ষ সমাবেশ করেছেন—একমাত্র গায়ত্রী রায় ছাড়া তাঁদের সকলের মধ্য দিয়েই একটা আভিজাত্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সিনেমার তথাকথিত ছাপ আলোচ্য চিত্রে মোটেই চোখে পড়েনা যা রুচিবান দর্শকদের অনেক সময়ই যথেষ্ট পীড়ার উদ্রেক করে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রাভিনয়ে যদি সে ছাপ থাকতো, তবে রসসৃষ্টিতে যথেষ্ট বিঘ্ন জমাতো। অভিনয়ে অক্ষয়, হেমনলিনী, ও কমলার ভূমিকায় যথাক্রমে পাহাড়ী সান্যাল, মীরা সরকার ও মীরা মিশ্রকে এক শ্রেণীতে ফেলতে চাই। সত্যি, এঁরা অপূর্ব অভিনয় করেছেন। বড়দিদির পর পাহাড়ী সান্যালের এমন নিখুঁত অভিনয় দেখেছি বলে মনে হয়না। অনেক দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, হেমনলিনী ও কমলা চরিত্রাভিনয়ে কাকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে? কমলার চরিত্রটা স্বভাবতঃই সাধারণ বাঙালী হিন্দু দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এ কথায় আমি বলতে চাইছিনা যে, কমলার ভূমিকায় মীরা মিশ্র কম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—মীরা সরকারের অভিনয় নিয়ে। হেমনলিনীকে ফুটিয়ে তুলতে যতখানি কৃতিত্বের দরকার, মীরা সরকারের ভিতর তার অভাব হয়নি। অন্যান্য ভূমিকায় বিমান, সুনলিনী দেবী, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতিকে প্রশংসা করবো। রমেশের ভূমিকায় নবাগত অভি ভট্টাচার্যকে নূতন বলেই ক্ষমা করা চলে। হেমনলিনীর পিতার ভূমিকায় মণি চট্টোপাধ্যায়কে প্রশংসা করতে পারবো না। গায়ত্রী রায়ের নির্বাচনকে নিন্দাই করবো। নৌকাডুবির শিল্পী সমাবেশের মাঝে শীলতার যে স্বচ্ছরূপ ফুটে উঠেছে শ্রীমতী গায়ত্রী রায়ের অভিনয়ে তা অনেকখানি ব্যাহত হ'য়েছে। রবীন্দ্রসংগীত ক'খানিই সুগীত হ'য়েছে। 'বদর বদর' গানখানিও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে। পাহাড়ী সান্যাল যে গানখানি গেয়েছেন—সেখানি সুগীত হয়নি বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন—আমরাও এই অভিযোগ অস্বীকার করবোনা। তবে মূল উপন্যাসে আছে যে, অক্ষয় গান গাইতে জানতো অবশ্য, তবে সে সময় ধৈর্য ধরে বসে
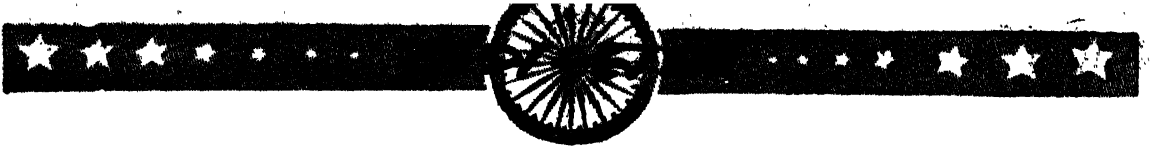
থাকা কঠিন হ'য়ে উঠতো। হেমনলিনীর পিতা অক্ষয় যাতে গান না গান, এই জন্যই বলতেন, উনি গান জানেন বলেই তোমরা কেন ওর প্রতি অত্যাচার কর্‌রো। তাই সেদিক থেকে অক্ষয়ের গানখানি খারাপ হওয়াতে দর্শকদের ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। —শীলভদ্র

দুই বন্ধু

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অমর দত্ত। কাহিনী অজিত দত্ত। সুরশিল্পী-গোপেন মল্লিক। এ, কে, ডি, প্রোডাকসনের চিত্র। পরিবেশক—ইনল্যাণ্ড ফিল্ম লিঃ ভূমিকায়—দেবী মুখার্জি গীতশ্রী, প্রভা, কানু বন্দোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তি, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আশু বোস, ইত্যাদি।

বাংলা দেশে পূর্ণ দৈর্ঘ্য হাসির ছবি নেই বল্লেই চলে। সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য হাসির ছবি তোলার জন্য তাঁদের সর্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু সংগে সংগে আর একটি কথা বলে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই—বাংলা দেশে হাসির ছবি নেই বলে যাতা দিয়ে হাসাতে গেলে লোকে হাসবে না, বরং তাঁরা বুঝবে, এর চেয়ে বেশী কিছু দিয়ে হাসাবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নেই। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অমর দত্ত। চিত্রজগতে পরিচালক হিসাবে ইনি এই প্রথম আমাদের সামনে দেখা দিলেন। পরিচালক কোন রকম বাহাদুরী দেখাতে না গিয়ে খুব সতর্কতার সংগে সহজ সরল ভাবে বলবার চেষ্টা করলেও যায়গায় যায়গায় কাঁচা হাতের কাজ বোঝা যায়। প্রেক্ষাগৃহের হাসি ও হাততালি শুনে কর্তৃপক্ষ নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে যেন মনে না করেন। অজিত চট্টোপাধ্যায়ের মারফৎ ছবির মধ্যে হাসাবার জন্য যে উপকরণ উপস্থিত করা হ'য়েছে, তা আমরা ইতিপূর্বে রেডিও মারফৎ অনেকবার শুনেছি। নবদ্বীপ ও অজিতের মধ্যে কথাবার্তা গুলি উপভোগ্য হলেও বাস্তবে সম্ভব নয়। ভৃত্য তার মনিবের বন্ধুকে নিজের মনিবের মতই সম্মান করে। দর্শকদের হাসাতে হবে—কারণ, এটা হাসির ছবি। অতএব যেমন করে হউক মনিব ও ভৃত্য এক সংগে কমিক করতে লেগে গেল। এই দৃশ্যগুলি বাস্তবে সম্ভব নয় অতএব দেখান উচিত নয়। অভিনয়ে—গীতশ্রী ও প্রভাকে মন্দ লাগেনি। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। অজিত চট্টোপাধ্যায়ের কমিক গুলি ভাল, তবে অভিনয় বড় একঘেয়ে। দেবী মুখার্জির অভিনয়ে নতুনত্ব কিছুই নাই। নবদ্বীপ হালদারের বিকৃত কণ্ঠস্বর পীড়ার উদ্রেক করে। তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও আশুবোসকে বোধ হয় নামের জন্য স্থান দেওয়া হয়েছে কারণ এটা হাসির ছবি। চিত্রগ্রহণ ভাল বলা চলে না। শব্দগ্রহণ এক প্রকার। সংগীত মোটামুটি এক রকম। —স্নেহেন্দ্র গুপ্ত

স্বয়ংসিদ্ধা

পরিচালনা: নরেশ মিত্র ও প্রভাত মিত্র। চিত্রনাট্য —নরেশ মিত্র। কাহিনী—মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরশিল্পী—নিতাই মতিলাল। শব্দযন্ত্রী—এস, চ্যাটার্জি। চিত্রশিল্পী—দশরথ বিশাল। সম্পাদনায়—শ্যাম দাস। ভূমিকায়—গুরুদাস বন্দ্যোঃ, নরেশ মিত্র, শিবশঙ্কর সেন, অমর বোস, পার্থ মজুমদার, কুমার মিত্র, দীপ্তি রায়, উমা গোয়েঙ্কা, লীলা, বন্দনা দেবী ও আরও অনেকে।

"স্বয়ংসিদ্ধাকে" চিত্রে যে রূপে পরিবেশন করা হয়েছে তাহা যে গ্রহণ যোগ্য সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। একটা সংসারকে গড়ে তোলার কতখানি দায়িত্ব নারীর থাকা প্রয়োজন তা আমাদের দেশের প্রতিটী নারীকে আজ হৃদয়ংগম করতে হবে। একটা সংসারকে গোড়ে তোলার সমস্ত দায়িত্ব থাকে নারীদের উপর। এবং সংসারকে সুন্দর করে তুলতে হলে প্রতি সমস্যার সংগে তাল রেখে চলতে হবে। স্বয়ং সিদ্ধা এমনই একটা ছবি যাতে এসম্বন্ধে আমরা আভাষ পেয়েছি। যে কুসংস্কার আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে দুর করতে হবে। অন্তঃপুরের নারীকে এই কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হবে। কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধার আদর্শ বধূ রূপে যাঁকে দেখেছি, তিনি যে উপযুক্ততা নিয়ে স্বামীর
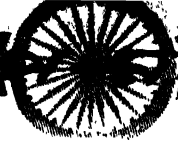
ঘর করতে এসেছিলেন, সেই উপযুক্ততা অর্জন করতে হ'লে আমাদের সমাজে যে বিপ্লব বা সংগ্রাম আনার দরকার, সেরূপ কোন ইংগিত আমরা পাই নাই। চণ্ডী বিবাহ হবার পর জড় ও নিবু'দ্ধি স্বামীকে পেয়ে তার উপর উৎপীড়নের কথা শুনে ব্যথিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তার স্বামীকে মানুষ করে তুলবেন। এবং চিত্রে সেরূপ খানিকটা ফুটে উঠেছে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের এইরূপ উন্নতিমূলক কাজের আদান প্রদানই সংসারকে সুন্দর ও শান্তিময় করে তোলে। কিন্তু প্রকৃত শান্তিময় করে তোলার কোনরূপ সত্যপথের ইংগিত আলোচ্য চিত্র থেকে আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম না। বাগুলী জমিদারের বাড়ী—চণ্ডী এই বাড়ীতে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সুযোগ পেয়েছিলেন। তাছাড়া গৃহকর্তা শ্বশুরের মত একজন ব্যক্তিকে পেয়েছিলেন সহায়। এমতাবস্থায় হয়ত

একজন স্ত্রীর পক্ষে খানিকটা সহজ হয়ে পড়ে স্বামীর তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু এরূপ সুযোগ সুবিধা কতজনের মেলে এবং বাস্তবে এর আদৌ সন্ধান মেলে কিনা সন্দেহ। শিবের ধ্যান ভংগ করতে উমার আরাধনার কথা আমরা শুনেছি—স্বয়ংসিদ্ধা এমনি একটা আদর্শের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বাস্তবের সংগে যে এর কোন যোগ নেই, একথা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। তবু স্বয়ংসিদ্ধাকে প্রশংসা করবো। যে আদর্শের ওপর সে প্রতিষ্ঠিত, তার সাবলীল গতি নিয়ন্ত্রণে পরিচালকদ্বয় সফল হ'য়েছেন। একটী পরিবারের কাহিনী নিয়ে স্বয়ংসিদ্ধা গড়ে উঠেছে এবং পরিবারের সকলকে নিয়েই ছবিখানি দেখা চলে। নীতিকথার সব কথা যেমন সব সময় মেনে চলা যায় না—তবু যেমন ভাল বলে স্বীকৃত হ'য়ে আসছে, তেমনি ভাল লাগবে স্বয়ংসিদ্ধা। "স্বয়ংসিদ্ধার" বিরুদ্ধে আমাদের যা অভিযোগ, তা তার কাহিনীর অবাস্তবতার বিরুদ্ধেই। সরকারী কর্মচারীদের ঘুষের ব্যাপার দেখাতে যেয়ে পরিচালকদ্বয় নেহাৎ ছেলেমানুষীর পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ে জমিদার হরিনারায়ণের ভুমিকায় অভিনয় করেছেন পার্থ মজুমদার। তিনি স্বীয় চরিত্রের মর্যাদা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গোবিন্দর ভুমিকায় অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দোঃ। জড় নায়কের সুকঠিন চরিত্রটী তিনি অভিব্যক্তিতে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। খোকা রাজার ভুমিকায় শিবশঙ্কর আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। নরেশ মিত্রের বিশু ডাক্তার উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীর ভুমিকায় অভিনয় করেছেন দীপ্তি রায়। প্রথম প্রকাশেই তিনি দর্শকদের মন জয় করতে পেরেছেন। রাণীমার ভুমিকায় উমা গোয়েঙ্কার অভিনয় মোটের উপর একরূপ হয়েছে। মৃণালিনীর ভুমিকায় বন্দনা দেবী কোন কৃতিত্বই দাবী করতে পারেন না। সংগীত পরিচালক বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন বলে মনে করি। সংগীতগুলি দর্শকমনের খোরাক জোটাতে পেরেছে। আলোক ও শব্দনিয়ন্ত্রণ প্রশংসনীয় নয়।

—মদন

চন্দ্রশেখর

প্রযোজনা : পাইওনিয়ার পিকচার্স। পরিচালনা-দেবকী কুমার বসু। সংগীত পরিচালনা : কমল দাশগুপ্ত। বিভিন্নাংশে : ছবি বিশ্বাস, অশোককুমার, কানন দেবী, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, হান্স ম্যাল, মণি ঘোষ, গীতশ্রী ম্যালকম প্রভৃতি আরো অনেকে। পরিবেশন : ডি লুক্স ফিল্ম ডিস্‌ট্রিবিউটর্স।

সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বজন পরিচিত চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য চিত্রখানি নির্মিত হ'য়েছে বলে প্রচারিত (!)। চিত্রখানি কলকাতায় উত্তরা, উজ্জ্বলা, দীপক, ছায়া, এবং মফঃস্বলে বহু প্রেক্ষাগৃহেই ইতিমধ্যে মুক্তিলাভ করেছে। কলিকাতার রমণীয় প্রেক্ষাগৃহ 'লাইটহাউস'-এও সম্ভবতঃ এক সপ্তাহের জন্য প্রদর্শিত হবার সৌভাগ্য চন্দ্রশেখরের হয়েছিল। এবং এর কোন এক প্রদর্শনী বাংলার অস্থায়ী গভর্ণর মাননীয় স্যার বি, এল, মিত্র মহাশয়ের উপস্থিতিতে ধন্য হ'য়েছিল—সেই সংগে উক্ত প্রদর্শনীতে বহু সাংবাদিক ও সুধীজনের সমাবেশও হ'য়েছিল। নির্মাণ-পরিকল্পনার প্রথম দিন থেকে 'চন্দ্রশেখর'-এর ঢক্কা-নিনাদ এতই প্রচণ্ড বেগে নিনাদিত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল—চন্দ্রশেখর আসছে দুর্গত বাংলার নিন্দিত চলচ্চিত্র জগতে আশার বাণী বহন করে—তার মালিন্য অপসারণের দাবী নিয়ে। চিত্রখানি দেখে এসে যখন আমাদের সে আশা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হ'য়েছে, তখন চিত্রসমালোচনার পূর্বে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো, প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালকে—বাহাবা দিয়ে নেবো তাঁর বোল ও ঢাকের রেওয়াজকে। তাঁর ঢাকে প্রথম থেকেই এমনি চড়া সুরে বোল বাজছিল, যা শুনে শ' এবং হাজারের চিন্তা আমাদের মন থেকে অতি সহজেই চাপা পড়ে গিয়ে—লক্ষের অংক ছাড়া আর কিছু মনে স্থানলাভ করতে পারেনি। চাটাইতে শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখাতে কিছুটা আনন্দ আছে বৈ কী—অন্ততঃ যতক্ষণ স্বপ্নের আমেজে মশগুল থাকা যায়। চাটাইতে শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখে—স্বপ্ন ভেংগে যাবার পর মানুষের মনের অবস্থা যা হওয়া স্বাভাবিক, 'চন্দ্রশেখর' চিত্রখানি দেখে এসে আমাদের মনের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ হ'য়েছে। এই লাখটাকার স্বপ্নের আমেজ চিত্রজগতকে এমনই সংক্রামিত করে তুলেছিল যে--পাঁচ টাকার 'এক্স্‌ট্রা-গার্ল' নাকি কোন একখানি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় সুযোগ পেয়ে এক লাখটাকা দাবী করে বসে! অভিনেতা থেকে আরম্ভ করে প্রচার সচিব অবধি হাওয়াই জাহাজে উড়ছেন—এই হাওয়াই জাহাজের হাওয়ার ঢেউ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে যাঁরা ঐ সময় কাজে অকাজে সচরাচর যাতায়াত করতেন, তাঁদের মনে এমনই দোল খাইয়ে দিয়েছিল যে, অনাবৃত গাড়ী বা ট্যাক্সীতে হাওয়ায় চুল না-উড়িয়ে কেউ ষ্টুডিওতে প্রবেশ করতেন না! এমন কী পদযানে যাঁরা যেতেন, হাওয়ার রেওয়াজে তাদের মাথাটা মাঝে মাঝে ভোঁ-ভোঁ করে উঠতো। কোন একজন অভিনেত্রী অন্য কোন একটি ছবিতে অভিনয় করতে করতে নাকি পরিচালককে চীৎকার করে বলে উঠেন—দেখুন, দেখুন মিঃ 'গ' হাওয়ায় আমি কেমন ভেসে যাচ্ছি—ধরুন, ধরুন আমাকে! দৃশ্যপটের লোকজনত অবাক! কয়েক ফুট ফিল্ম নষ্ট করে পরিচালক সেদিনকার মত নাকি প্যাক-আপ করে দিয়ে শিল্পীটিকে চিকিৎসার জন্য তাঁর পরিচিত ষ্টুডিওর বাইরে একটা ডার্করুমে নিয়ে যান। অবশ্য এসব কথাও হাওয়ায় ভেসেই আমাদের কানে এসেছে। তাই দর্শকসাধারণ যেন নিশ্চিত সত্য বলে মেনে না নেন। হাওয়াই বটে! হাওয়ার কী শক্তি! চন্দ্রশেখরের নির্মাণ-পরিকল্পনার প্রথম থেকে এতদিন যে ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে আসছিল—চন্দ্রশেখর দেখে এসে এতদিনের সে ধারণা কোথাকার কোন দমকা হাওয়ায় একেবারে উড়ে চলে গেল!

বাদ্যযন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দের ভিতর 'Drum' কথাটি যে গাম্ভীর্য নিয়ে আছে, চিত্রজগতে পরিচালকদের নামের আক্ষরিক প্রতিশব্দের ভিতর D. K. B. র গাম্ভীর্যকে

তার সংগে তুলনা করা যায়। যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি কার্যে 'Drum' অপরিহার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মত বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম স্রষ্টার একখানি জনপ্রিয় উপন্যাসের হত্যাকাণ্ড নেপি-ছেপি পরিচালকদের দ্বারা সাধিত হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অসম্মানই করা হ'তো। সেদিক থেকে কর্তৃপক্ষ বঙ্কিমের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন বৈ কী? এবং দেবকী বাবুও যে নির্মম জল্লাদের মত এই হত্যাকাণ্ড মহাসমারোহে সমাধান করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য তিনি বাহবা পেতে পারেন বৈকী? কিন্তু কথা হ'চ্ছে, এই হত্যাকাণ্ড কী বাঙালী জনসাধারণ মেনে নেবেন? বাঙালী জনসাধারণ বলছি এইজন্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী আজ তাঁরাই। আমার ত মনে হয়, তাঁরা এই স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নেবেন না—মেনে নিতে পারেন না। ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রতিবাদের সুর কর্তৃপক্ষের মনে হৃদকম্পের সৃষ্টি করেছে—প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ভিড় কমে এসেছে। প্রতিবাদ উঠেছে বাংলার সর্বশ্রেণীর সুধীসমাজের কাছ থেকে—দর্শক ও জনসমাজের মধ্যে থেকে। বাংলা সাহিত্যের দু'জন দিকপাল 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফৎ এই হত্যাকাণ্ড ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন দেখে আমরা খুশী হলাম। তাঁদের প্রতিবাদ থেকে কতকাংশ পাঠকসাধারণের জ্ঞাতার্থে এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি,—"* * * কিন্তু ছবি দেখে মর্ম্মান্তিক বেদনা নিয়ে ফিরে এসেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের ছায়া অবলম্বনে রচিত এই অজুহাতে তিনি চন্দ্রশেখরের ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে এমনভাবে নিজের মনোমত ঘটনার সৃষ্টি করেছেন যে, তাকে যথেচ্ছাচার ছাড়া কিছু বলা চলেনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির ওপর এমন অত্যাচার দেবকীবাবু কোন অধিকার বলে এবং বুদ্ধি বিবেচনায় করবার মত মানসিকতা অর্জ্জন করলেন কোনক্রমেই তা বুঝতে পারি নাই। দেবকীবাবু বালক হ'লে এই কটু বস্তুটিকে অমৃত বলে গ্রহণ করতে পারতাম—অথবা তিনি বৃদ্ধ হ'লে এটিকে তাঁর দ্বি-সপ্ততিতম জন্মোৎসবের অবদান বলে গ্রহণ করতে পারতাম। পৃথিবীতে এক কাল চলে যায় অন্যকাল আসে, যা দুর্ব্বল যা ক্ষুদ্র যা ঠুনকো কালের পদক্ষেপে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়; তার মধ্যে বেঁচে থাকে কতকগুলি সৃষ্টি যা সহজ যা বৃহৎ যা কল্যাণময়, তাই। কালের পরিবর্ত্তন সত্বেও পুরাতন পটভূমির উপর তার স্বকীয় পরিবর্তিত রূপ নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার কালকেও স্বীকার করতে হয়। মিসরের পিরামিডের অংশকে ভেঙে নূতন কালের স্থপতি বিদ্যা অনুযায়ী কোন অংশ জুড়ে দেবার অধিকার কারও নেই। রামায়ণের কাহিনীকে নূতন স্বর্গ অনুযায়ী পরিবর্তন করে অশোক বনে বন্দিনী সীতার হাতে একখানা ছুরি অথবা ব্রহ্মাস্ত্র বলে একখানা রিভলবার বা আঙ্গুল দলনী কোশের বিষভরা আংটির মত একটা আংটি পরিয়ে রাবণের সামনে দাঁড় করাবার অধিকার কারও নাই। বা রাবণের ব্যাভিচার সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের মুখে জওহরলাল ও প্যাটেলের কোন উক্তি বসান যায় না। শ্রদ্ধেয় দেবকীবাবুকে এত কথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে বলে আমরা লজ্জিত। আইনের দিক দিয়ে বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনাগুলিকে অর্থনৈতিক মূল্যগত উক্ত অধিকার আজ হয়ত লুপ্ত হয়েছে। কপিরাইট আইনের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে কেউ পাঁচালী করলেও কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আর একটী উত্তরাধিকার আছে—সে ক্ষেত্রের অধিকার আইনের ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়—সে উত্তরাধিকার অমোঘনীতির ভিত্তির
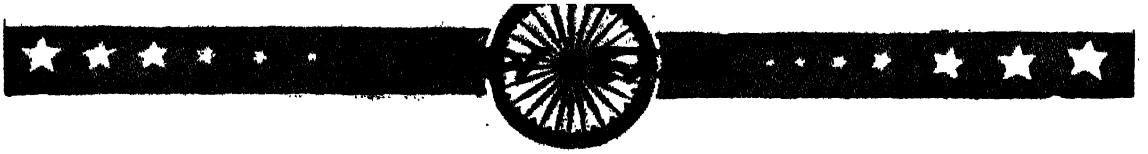
ওপর স্থাপিত। সেই অধিকারেই সবিনয়ে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চাই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নিয়ে এমন স্বৈরাচারের অধিকার দেবকীবাবুর ছিলনা এবং কারও নাই। * * *।" শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও তারাশঙ্করের এই উক্তির সংগে আমরাও সুর মিলিয়ে দেবকীবাবুর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং এতে বাংলার দর্শকসাধারণেরও যে সাড়া পাবো, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। তাই, তাঁদের কাছে আমরা আবেদন জানাবো, অনুরোধ করবো, যে কোন স্থানে যে কোন প্রেক্ষাগৃহে 'চন্দ্রশেখর' মুক্তিলাভ করুক না কেন—স্থানীয় জনসাধারণ ও দর্শকসমাজ তার বিরুদ্ধে যেন সংঘবদ্ধভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানান। একটা কথা যেন তাঁরা ভুলে না যান—অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহ্য করে—এরা দু'জনেই সমান অপরাধী। তাই এই অন্যায়, এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বাঙালী দর্শকসমাজ নির্বাক মূকের অভিনয় করতে পারেন না। অশোক-কাননের-চাটুল্য—ঘোড়দৌড় দেখবার সস্তা লোভ সম্বরণ করে তাঁরা যেন স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের উক্ত চিত্র-প্রদর্শন থেকে বিরত করান। প্রযোজকদের আর্থিক ক্ষতির কথা চিন্তা করে আমরা আর একটা পাল্টা প্রস্তাবও এই প্রসংগে করতে চাই—সে প্রস্তাব যদি কর্তৃপক্ষ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তবে তাঁদের আর্থিক লাভের পথে আমরা কোন অবরোধের সৃষ্টি করবোনা। এই প্রস্তাবানুযায়ী পাইওনিয়ার পিকচার্সের পক্ষ থেকে প্রযোজক মৃণাল দত্ত ও নেপাল দত্ত-এবং পরিচালক দেবকী বসু মিলিত ভাবে সংবাদ-পত্র মারফৎ বাঙ্গালী জনসাধারণের কাছে চন্দ্রশেখরের বিকৃতরূপের জন্য বিবৃতি প্রসংগে ক্ষমা চাইবেন। কারণ, এই অপরাধ সাধারণ ভাবে স্বীকৃত হওয়ার প্রয়োজন আছে—যদি না হয়, তবে এমনি ভাবে যে হত্যাকাণ্ড সুরু হবে তাতে বাংলা-সাহিত্য—বাংলা চিত্রশিল্প দিন দিনই মসীলিপ্ত হ'য়ে উঠবে। আমাদের এই প্রস্তাবটি জনসাধারণের কাছেও তুলে ধরছি—কর্তৃপক্ষ যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তবে তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সবল ভাবে দাঁড়াবার মত দৃঢ়তা আমাদের মাঝে অভাব হবেনা।

সমালোচনায় প্রবেশ করবার পূর্বে 'চন্দ্রশেখর' মূল উপন্যাস সম্পর্কে আমরা কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। চন্দ্রশেখর ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'লেও মূলতঃ তার ঐতিহাসিক মূল্যে খুবই কম। এবং যে সব ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র এর সংগে যোগ করেছেন —ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভংগীতে তা অনেক স্থানেই বিকৃত ভাব নিয়ে দেখা দিয়েছে। এবং এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেও কম বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু এখানে 'চন্দ্রশেখর'-এর ঐতিহাসিক ভিত্তিকে নিয়ে আমরা যাচাই করতে আসিনি—এবিষয়ে আগ্রহশীল পাঠক সাধারণ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের 'মীর কাসেম' পড়লেই বিস্তারীত জানতে পারবেন। এবং চন্দ্রশেখরের ঐতিহাসিক মূল্যের সমালোচনা প্রসংগে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর ভূমিকার একাংশে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যে কথা বলেছেন, তার প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাঁরা বলেছেন, "উপন্যাসে ঐতিহাসিক এবং অলৌকিক বিষয় সন্নিবেশের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল; 'বিষবৃক্ষ' এবং ইন্দিরা লিখিয়া তাঁহার রোমান্স প্রবণ মন যেন একটু হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া বাঙলার বীরত্ব ও মহত্ব প্রদর্শনের বাসনা বরাবরই তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ স্ফূর্তি তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন। ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানসপুত্র, ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখানে রোমান্স-রচনার যে অবকাশ তিনি পাইলেন। নিতান্ত

সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি ততখানি অগ্রসর হইতে পারিতেন না। আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশ্বাস ছিল। 'চন্দ্রশেখরে' আমরা সর্ব্বপ্রথম তাহারই পরিচয় পাই। তাঁহার সৃষ্ট উপন্যাস-জগতে সর্ব্বপ্রথম আদর্শ চরিত্র হিসাবে তিনি প্রতাপের অবতারণা করিয়াছেন। বহুবিধ সংস্কার এবং বাসনার সংঘর্ষে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শিল্প-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। বহু সমালোচক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ (গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী) চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্প কীর্তি বলিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখর' ইতিহাস যৎ সামান্য; সুতরাং সেদিক দিয়া ইহার বিচারের বিশেষ সার্থকতা নাই।"

এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর পরিচালনায় পর্দায় কী রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটি কয়েকটি চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারবো—কী ছিল আর কী দাঁড়িয়েছে। এবং এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়েই দেবকী বাবুর অপরাধের মাত্রা 'চন্দ্রশেখর' না দেখলেও যে কোন দর্শক উপলব্ধি করতে পারবেন। আর একটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল—চন্দ্রশেখর সম্পর্কে আমাদের এই সমালোচনা নিয়ে যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক-মণ্ডলীর সামনে দাঁড়াবার মত দৃঢ়তা আমাদের আছে। তাই একে স্বার্থ-প্রণোদিত অথব্য বিদ্বেষপূর্ণ আখ্যা দিয়ে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না।

প্রথম চন্দ্রশেখরের কথাই বলি। মূল উপন্যাসে চন্দ্রশেখর যখন জল থেকে প্রতাপকে উদ্ধার করলেন, তখন তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করেছেন। তিনি গৃহস্থ অথচ সংসারী ছিলেন না। বিদ্যার্জনে বিঘ্ন ঘটবে বলেই তখন পর্যন্ত বিয়ে করেন নি। এক বৎসরের ওপর মা মারা যাওয়াতে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হয়। গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজা করতে হয়। আরো নানান কাজে সময় নষ্ট হওয়াতে বিদ্যার্জনেও ব্যাঘাত জন্মে। তাই বিয়ে করবেন স্থির করলেন—তবে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করবেন না। কারণ, তাতে মন মুগ্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু শৈবলিনীকে দেখে সে সংকল্প তার ভেঙে গেল। তিনি মুগ্ধ হ'লেন। শেষে নিজে ঘটক পাঠিয়ে শৈবলিনীকে বিয়ে করলেন। দেবকী বাবু শৈবলিনীর মায়ের তরফ হ'তে ঘটক পাঠিয়েই চন্দ্রশেখরকে রাজী করালেন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে দেখে মুগ্ধ হলেন, এই মুগ্ধ হওয়ার ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র যে ইংগিত দিয়েছেন, দেবকী বাবু তা অস্বীকার করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর মানসপুত্র চন্দ্রশেখরও তাই। চন্দ্রশেখরের গৃহদেবতা যে 'শালগ্রাম' তা স্পষ্টভাবেই মূল উপন্যাসে আছে। দেবকী বাবু চন্দ্রশেখরের যে গৃহদেবতা পর্দায় দেখিয়েছেন, তাতে ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ফুটে ওঠেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু চরিত্রের মূলগত ধর্ম' কোথায় যেয়ে দাঁড়ালো তা আর তিনি বিচার করে দেখলেন না। চন্দ্রশেখর বিবাহের পর প্রায় আট বৎসর শৈবলিনীকে নিয়ে ঘর করেন। এবং পুঁথিপত্রে যতই মত্ত থাকুন না কেন—শৈবলিনীর সৌন্দর্য-সুধা যে মাঝে মাঝে পান না করেছেন তা নয়। বঙ্কিমের ভাষাতেই বলি, "বাতায়ণ পথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ সুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনু:—খণ্ডবৎ নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূ যুগ তলে; মুদ্রিত পদ্মকোরক-সদৃশ্য, লোচন-পদ্ম দু'টি মুদিয়া রহিয়াছে; সেই প্রশস্ত নয়ন পল্লবে; সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপালে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে—......।" শৈবলিনীর সৌন্দর্য চন্দ্রশেখরকে এতই মুগ্ধ করে এবং শৈবলিনীর চিন্তা তাকে এতই ভাবিয়ে তোলে যে তাকে বলতে শুনি—'এই ক্লেশ

সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণী মুখপদ্ম কি এ জন্মে সারভূত করিব?'

অবশ্য তিনি তা করেন নি। রমণীর সৌন্দর্য-সান্নিধ্যে পুরুষের স্বাভাবিক চিত্ত চাঞ্চল্যকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমনি চন্দ্রশেখরের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি—তেমনি কামনার বহ্নির ছোঁয়াচেও চন্দ্রশেখরকে পুড়িয়ে দিতে চান নি—। ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিকে যেমনি প্রকাশ করেছেন—তেমনি তার মোহ থেকে চন্দ্রশেখরকে অতিন্দ্রিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। দেবকী বাবু চন্দ্রশেখর চরিত্রের এই ইন্দ্রিয় এবং অতিন্দ্রিয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর যেতে চান নি—কাপুরুষের মত এই সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন। এবং তাতে চন্দ্রশেখর চরিত্রের মহত্ব ফুটে ওঠে নি—তার জড়ত্বেরই প্রকাশ পেয়েছে। শৈবলিনী অপহৃতা হবার পর চন্দ্রশেখরকে রমানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে দেখি। চন্দ্রশেখর যোগবল দ্বারা জানতে পারেন, শৈবলিনী নিষ্পাপ। চন্দ্রশেখরের মনে শৈবলিনী সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে—এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যও যোগবলের কিছুটা প্রয়োজন ছিল বৈকী? বাল্য-প্রেম নিষ্পাপ—তাই প্রতাপও শৈবলিনীর প্রেমকে কোন সময় চন্দ্রশেখর হেয় বলে মনে করেন নি। বরং প্রতাপের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধই হ'য়েছিলেন—তাই রূপসীর সংগে প্রতাপের বিয়ে দেন এবং নবাবের দরবারে উমেদারী করে চাকরী ঠিক করে দেন—চন্দ্রশেখরের এই মহত্বটুকু দেবকী বাবু সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে গেছেন।

এবার প্রতাপ চরিত্রটি ধরা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র "তাঁহার সৃষ্ট উপন্যাস জগতে সর্ব্বপ্রথম আদর্শ চরিত্র হিসাবে তিনি প্রতাপের অবতারণা করিয়াছেন।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত চন্দ্রশেখরের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসতো। আজীবন ভালবেসে গেছে—কিন্তু সে ভালবাসার ভিতর কোন লালসা ছিলনা। ছিলনা ইন্দ্রিয়ের উদগ্র কামনা। প্রতাপ জানতো, শৈবলিনী তার জ্ঞাতিকন্যা। শৈবলিনীর সংগে তার বিয়ে হ'তে পারেনা। এসত্ত্বেও সে শৈবলিনীকে ভালবাসতো। আজীবন ভালবেসে গেছে—তার এই ভালবাসার মর্যাদাকে কলুষের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মৃত্যুকে একরকম স্বেচ্ছায়ই বরণ করে নিল। দেবকী বাবু প্রতাপের এই ভালবাসাকে মিলনের উদগ্র কামনায় কলঙ্কিত করে তুলতে দ্বিধাবোধ করেননি। দেবকী বাবুর প্রতাপ জানতো, শৈবলিনীর সংগে তার বিয়ে হবে। এবং যখন শৈবলিনীর মা বল্লেন, তোমাদের বিয়ে হতে পারেনা—উল্টে দেবকী বাবুর প্রতাপ অভিযোগ আনলো, একথা আগে বলেননি কেন? কেন আমাদের এভাবে মিশতে দিয়েছেন। প্রতাপ দরিদ্রের সন্তান ছিল। চন্দ্রশেখরই নবাব সরকারে তার কাজ ঠিক করে দেয়। স্বীয় গুণাবলী ও চন্দ্রশেখরের জন্যই প্রতাপ জমিদার হ'য়ে ওঠে। চন্দ্রশেখরের এই মহত্ব—কোন সময়ই প্রতাপ ভুলতে পারেনি। চন্দ্রশেখরের কাছে সে আজীবন কৃতজ্ঞ রয়ে গেছে—যখন সে জানতে পারলো, সে বেঁচে থাকতে শৈবলিনী তাকে ভুলতে পারবেনা—চন্দ্রশেখরের জীবনে শান্তি আনবার জন্যই সে যুদ্ধ যাত্রা করে। শৈবলিনীকে প্রতাপ লরেন্স ফষ্টরের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল তার নিজের জন্য নয়—চন্দ্রশেখরের বিপদে তার দায়িত্বই এই দুঃসাহসিক কাজে তাকে প্রেরণা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ কত মহৎ—কতবড় ত্যাগী তা কল্পনা করবার শক্তিও যদি দেবকী বাবুর থাকতো—তবে তাকে বিকৃত ভাবে চিত্রে রূপায়িত করতেন না। প্রতাপের মত মহান চরিত্রকে যতখানি ছোট করেছেন দেবকী বাবু, তাতে তার নীচতার পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। শৈবলিনীকে উদ্ধার করে প্রতাপ জগৎশেঠের বাড়ীতে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল। রামচরণ তা না করে প্রতাপের বাড়ীতেই শৈবলিনীকে নিয়ে আসে। নিজের কাছে শৈবলিনীকে দেখে প্রতাপ চোখ ফিরাতে পারেন না—। প্রতাপের এই চাহনীর ভিতরও কোন লালসা বা ক্ষুধার বহ্নি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে লিখেছেন। "সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া,
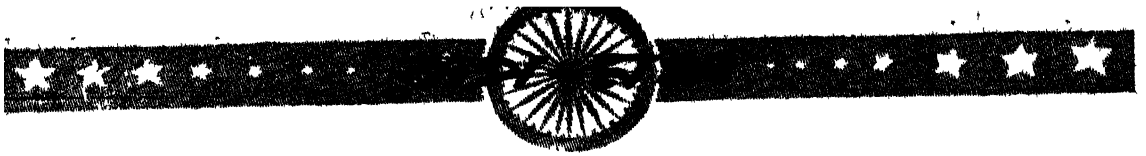
বা ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিলনা এমত নহে—কেবল অন্যমনবশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।" পাঠকরা যদি কোন সময় প্রতাপের উপর অবিচার করেন, সেজন্য এরূপ ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র হুসিয়ার করে দিতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু দেবকী বাবুর কানে সে হুসিয়ারবাণীর কী মূল্য আছে!

বঙ্কিমচন্দ্রের রামচরণকে দেবকী বাবু একটা ভাড়রূপে দাঁড় করিয়েছেন। রামচরণ জাতিতে গোয়ালা এবং বীর। সে যুগে গোয়ালাদের সাহস ও শক্তিমত্তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইংরেজের বজরা থেকে মুক্তি পাবার জন্য রামচরণের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সব কৌতুক কথা বলিয়েছেন, তাতে তার ভাড়ামী প্রকাশ পায়নি—প্রত্যুতপন্নমতিত্বই ফুটে উঠেছে। আম্রকাননে ললিতা সখীর মত রামচরণকে দেবকীবাবু ঘুর পাক খাইয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী লালসাহীন ছিলনা একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু দেবকীবাবুর মত বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে লালসার প্রতিমূর্তি বলে গড়ে তোলেননি। তিনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে শৈবলিনীর লালসার বহ্নিকে নির্বাপিত করে তার নারীত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেমকে কখনও অস্বীকার করতে চাননি। প্রতাপের সংগে শৈবলিনীর মিলনের উদগ্র কামনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিনি প্রতাপের সংগে বিয়ে হবে এই ধারণা জন্মিয়ে দেন। শৈবলিনী জানতো, প্রতাপের সংগে তার বিয়ে হবে। প্রতাপের ভিতর দিয়ে প্রথম থেকেই তিনি অতিন্দ্রিয় প্রেমকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। শৈবলিনীর ভিতর দিয়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রেমকে অতিন্দ্রিয়ে

পৌঁছে দেবার ইচ্ছাই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দু'টি হৃদয়কে দু'ভাবে চালিত করে দুইয়ের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে একের (শৈবলিনীর) দুর্বলতা শুধরে নিতে চেয়েছেন। দেবকীবাবুর শৈবলিনীর মনে চন্দ্রশেখরের কোন স্থান নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের প্রতি কম শ্রদ্ধাবতী ছিল না। সুন্দরীর চরিত্রটীত সম্পূর্ণরূপে দেবকীবাবু বাদ দিয়েছেন। রমানন্দস্বামী সম্পর্কেও সেই কথা বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের লরেন্স ফষ্টর অল্পবয়স্ক এবং প্রেমিক ছিল। দেবকীবাবুর ফষ্টর একজন লালসাগ্রস্ত অথর্ব ছাড়া আর কিছু নয়। তকী খাঁ, সমরু প্রভৃতি আরো বহু চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হ'য়েছে। এবং ঘটনা সংস্থাপনের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন মর্যাদাই দেবকীবাবু রক্ষা করেননি। কোন উপন্যাস বা কাহিনীকে পর্দায় রূপায়িত করতে হ'লে পরিচালকের কিছুটা স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন—সে স্বাধীনতাকে আমরা অস্বীকার করবো না। কিন্তু স্বাধীনতা বলতে যথেচ্ছাচার নয়।

কী ছিল—কী দাঁড়িয়েছে সে বাকবিতণ্ডা রেখে যা দাঁড়িয়েছে—তার ভিতর কী পেয়েছি এবং সে পাওয়ার ভিতর কী বঞ্চনা রয়ে গেছে তা নিয়ে একবার তলিয়ে দেখা যাক। এরূপ জমকালো চিত্র প্রযোজনায় ব্যয়ের দিক থেকে প্রযোজকের যে আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়—সেদিক দিয়ে কোন কার্পণ্যের পরিচয় পাইনি। যে জড় পটভূমিকার উপর দেবকীবাবুর চন্দ্রশেখর গড়ে উঠেছে—জাক-জমকতার দিক থেকে সেখানে কোন ফাঁক খুঁজে পাইনি। তবে অন্যান্য দৃশ্যপটের তুলনায় নবাব প্রাসাদের দৃশ্যপট দুর্ব'ল বলেই মনে হ'য়েছে। সার্কাসের ঘোড়ার কৃতিত্ব দিয়ে সাধারণ দর্শক-মনকে দেবকী বাবু অভিভূত করতে পেরেছেন। তবে ঘোড়াটি যদি নবাবের কাছে যাবার পূর্বে মরণোন্মুখ মনিবের মুখে জল দিয়ে যেত, দেবকী বাবু আরো হাততালি পেতেন! চন্দ্রশেখরের চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ কান এবং চোখ দুইকেই খুশী করে। নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেবকীবাবুর শিল্পমনের পরিচয়ও দেয়। কিন্তু এ কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য না যন্ত্রশিল্পীদের তা অবশ্য ভেবে দেখবার আছে। নদীর তীরের রাখালের
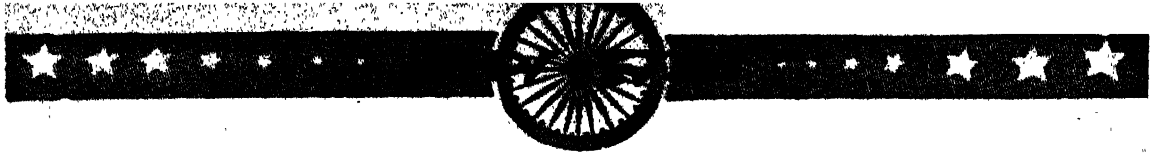
মিঠেল সুর—ধোপানীদের সমাবেশ—নৃত্যের ঝঙ্কার দেবকী বাবুর কল্পনাবিলাসী মনের পরিচয় দিয়েছে সত্য—কিন্তু বাস্তব থেকে যে তিনি অনেক দূরে সরে গেছেন, সেকথা তিনিও অস্বীকার করতে পারবেন না। তরঙ্গের সংগে সংগে তারকে দেখাতে যেয়ে তিনি যদি তাঁর বাস্তব দৃষ্টিশক্তির প্রয়োগ করতেন, তাতে বেশী খুশী হতাম। শৈবলিনীর যখন বিয়ে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তখন তার বয়স বারো বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, কারণ এখন আমরা আলোচনা করছি দেবকীবাবুর চন্দ্রশেখর নিয়ে। কিন্তু যে সময়ের ঘটনা দেবকীবাবুর 'চন্দ্রশেখরে' ও স্থান পেয়েছে—তখনকার দিনে একটী মেয়ের বয়স বিবাহ-কালে যদি বারো বছর হ'তো—সমাজে তাই ছিল নিন্দনীয়। তাই নববধূ বেশে কাননকে দেখতে পেয়ে দর্শকমন যদি বিরূপ হ'য়ে ওঠে—দেবকীবাবু কী তার জবাব দেবেন? আমরা অবশ্য শ্রীমতী কাননের সঠিক বয়স সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে চাই না। কারণ, সেটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। কিন্তু দেবকীবাবু কী চৌদ্দবছর বলেই তাকে চালিয়ে দিতে চাইবেন?

চিত্রের সাবলীল গতি নিয়ন্ত্রণে দেবকীবাবুর প্রশংসা করবো—ঘোড়ার সার্কাস দেখিয়েই হউক—অশোক কাননের ঝিলিক দেখিয়েই হউক—নর্তকীর ওড়না, বন্দুকের আওয়াজ—তরোয়ালের খেইল আর বজরা অথবা যাদুবিদ্যার ব্লাক আর্টের মত কুলসম ও দলনীকে দেখিয়েই হউক চন্দ্রশেখর দেখতে দর্শকমন ক্লান্ত হ'য়ে উঠে না। আচ্ছা, দলনীর পাশে কুলসমকে দেবকীবাবু নিয়ে গেলেন কোন বিবেচনায়? যে নিদ্রিত বেগমের শয়নকক্ষে নবাবও যেতে ইতস্তত: কচ্ছিলেন—সেই বেগমের পার্শ্বে তার বান্দী কোন অধিকারে থাকতে পারে?

অভিনয়ে প্রথমেই প্রশংসা করবো নাম ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসকে। যতটুকু সুযোগ তিনি পেয়েছেন—তার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেছেন। চন্দ্রশেখরের ধীর স্থির ভাব ও পাণ্ডিত্য তাঁর অভিব্যক্তিতে পূর্ণ রূপ পেয়েছে। তাঁরই পার্শ্বে প্রতাপ ও শৈবলিনীর ভূমিকায় যথাক্রমে অশোক-কুমার ও কাননদেবীর চুলবুলে অভিনয় মনকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। দলনীর ভূমিকায় ভারতীকেও এর চেয়ে বেশী মর্যাদা দিতে রাজী নই। নবাব ও কুলসমের ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রীকে তবু প্রশংসা করবো। রামচরণ রূপে অমর মল্লিক দেবকীবাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেননি। অন্যান্য ভূমিকা একরূপ। সংগীতে কমল দাশ-গুপ্তকে অতীত খ্যাতির মাঝেই মশগুল থাকতে দেখেছি।

বাংলার ভূতপূর্ব অস্থায়ী গভর্ণর মহোদয়ের পত্নী লেডী প্রতিমা মিত্র 'চন্দ্রশেখর' চিত্রখানি সম্পর্কে যে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন উক্ত অভিমত বিজ্ঞাপণের সংগে প্রকাশিত হ'য়েছে। তিনি বলেছেন, "Judged from all angles I must say that this picture is much above the average standard in India and I am particularly happy to note that the quality of the production has been quite befitting the honour and prestige of Bankimchandra, the immortal writer of the classic." রবি-বাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা (কলিকাতা, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪)। কর্তৃপক্ষ লেডী প্রতিমা মিত্রের এই অভিমতটি দ্বারা জনসাধারণকে যে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন—সে বিষয়ে জনসাধারণকে আমরা হুসিয়ার করে দিতে চাই। কোন কিছু সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে—সে স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না। কিন্তু লেডী প্রতিমা মিত্রকে পরম শ্রদ্ধার সংগেই আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই, চন্দ্রশেখর চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষিত হ'য়েছে বলে দায়িত্বজ্ঞানহীনার মত এই উক্তি তিনি কোন সাহসে করলেন! তাঁর মত একজন বিদুষী নারীর এই অভিমত বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে আনে নি কী? যদি সত্যই তিনি বঙ্কিম-সাহিত্য অনুশীলন করে থাকেন—বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে আমরা তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারকে একটু যাঁচাই করে দেখতে চাই! যদি তিনি সাহসী হন, আশা করি এবিষয়ে সাড়া দেবেন। —শ্রীপার্থিব

নতুন খবর

প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'নতুন খবর' রূপবাণী

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্থান অবিসংবাদিত। চিত্র জগতের সংগেও বহুদিন থেকে তিনি জড়িত রয়েছেন। তাঁর বহু কাহিনী চিত্রজগতে বৈশিষ্ট্যের খ্যাতি অর্জন করেছে। সস্তা বাহবা পাবার জন্য তিনি কোনদিন কোন কিছু রচনা করেন নি—কী সাহিত্যে—কী চলচ্চিত্রে—তাঁর সৃষ্টিতে পাই গভীরতার সন্ধান। তাঁর নতুন খবরও নতুন উদ্দেশ্য নিয়েই দেখা দিয়েছে। সভ্যতার যুগে সংবাদ পত্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারোরই নেই। জনমত গঠনে—দেশ ও জাতির স্বার্থ-সংরক্ষণে সংবাদ পত্রের দান ও দায়িত্ব অনেকখানি। তবু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সংবাদপত্রকেও অনেক সময় দেশ ও জাতি-বিরোধী কার্যে রত থাকতে দেখা যায়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের মত এখানেও সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব রয়েছে প্রতিনিয়ত। একদল সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকজীবনের আদর্শকে উন্নত রাখবার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারকেই বড় বলে মনে করেন না—আর একদল ব্যক্তিগত স্বার্থকে বজায় রাখবার জন্য এই আদর্শের গর্বিত শির ধুলায় লুটিয়ে দিতে সর্বশক্তি নিয়োগে তৎপর হয়ে ওঠেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে দ্বন্দ্ব আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে দেখতে পাই—নতুন খবরে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র তারই নতুন করে নতুন পরিবেশের মারফৎ অবতারণা করেছেন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন খবর সংবাদপত্র পরিবেশন করে থাকে—একটু বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখা যাবে—এই সংবাদের ভিতর ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের বেঁচে থাকবার ইতিহাস আমরা সংবাদপত্র মারফৎ পাই—কিন্তু সংবাদপত্রগুলির ইতিহাসের কথা ক'জন জানেন? 'নতুন খবর' এদেরই খবর বহন করে এনেছে—এনেছে ব্যষ্টির স্বার্থান্ধ অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সমষ্টির সংগ্রাম-মুখর অভিযানের কথা। তাই তাকে অভিনন্দিত কচ্ছি। 'নতুন খবর'-এ নতুনত্বের সন্ধান পেয়েছি—পেয়েছি কাহিনীর সম্ভাবনার পরিচয়। কিন্তু সে সম্ভাবনা সিদ্ধিলাভ করতে পাবেনি—এজন্য কম দুঃখিতও হইনি। এবং এজন্য দায়ী করবো পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে—কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নয়। চিত্রখানি প্রথমার্ধে আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। বক্তব্য বিষয় বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—দ্বিতীয়ার্ধে পরিচালক যেন তার খেই হারিয়ে ফেলে চিত্র-জগতের চিরাচরিত পরিবেশের মাঝে হাবুডুবু খেয়েছেন। তবু যেটুকু পেয়েছি, রুচিবান দর্শকদের তা তৃপ্তি দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অভিনয়ে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি চরিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্যকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করবো। প্রশংসা করবো নায়িকার ভূমিকায় ভারতীর আভিজাত্য পূর্ণ অভিনয়কে। কৌতুক অভিনেতা নবদ্বীপ হালদার—নবাগত নন্দবাবুও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করতে পাবেন। শিশির মিত্র কৃষ্ণধন, অমর মল্লিক, কেতকী এদেরও নিন্দা করবো না। ইন্দু মুখোপাধ্যায় ও পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ততখানি প্রশংসা করতে পারবো না। সংগীতের কোন প্রয়োজনই ছিল না। সংগীতের সুরকেও প্রশংসা করতে পারবো না। পরিচালনায় খুঁত আছে অনেক—ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্রের বৈপরীত্য বহুবার বেদনা দিয়েছে—তবু কাহিনীতে যে সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছি সেজন্য নতুন খবরকে অভিনন্দিত করবো। সমাধানের পর 'নতুন খবর' প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত চিত্রগুলির ভিতর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে একথাও সংগে সংগে বলবো। তাই পথ বেঁধে দিল, বিদেশিনী প্রভৃতি চিত্র দেখে পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে যে হতাশা জেগেছিল, নতুন খবর তা কিছুটা দূর করতে পেরেছে বৈকী?

দেবী-স্মৃতি সংখ্যা
১৩৫৪

রূপ-মঞ্চ

সপ্তম বর্ষ
নবম-সংখ্যা

২৩শে জানুয়ারী

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ২৩শে জানুয়ারী চিরদিন রক্ত আখরে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। এই শুভ দিনে জাতির ভাগ্যাকাশে এমন একজন বিপ্লবী নেতার আবির্ভাব হয়—যাঁর স্বদেশপ্রীতি--স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে অপূর্ব আত্মত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠা দীর্ঘ দ্বিশতাব্দীর পরবশতার অবসান ঘটিয়ে আমাদের পূর্বতন শহীদদের অসমাপ্ত সংগ্রামকে জয়মণ্ডিত করে তোলে। ভগীরথের কঠোর সাধনায় অন্ধকার পাতালপুরীর শুষ্ক কণ্ঠ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছিল—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বত্যাগী সাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজীবন সাধনায় দীর্ঘ দ্বিশতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানি ভেদ করে ভারতের ভাগ্যাকাশে যে স্বাধীনতা সূর্য ভাস্বর হ'য়ে দেখা দিয়েছে—তাকে অস্বীকার করবে কে? তাই এই মহাসাধকের জন্ম দিবস ২৩শে জানুয়ারীকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি।

সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন কী নেই—সে বাকবিতণ্ডায় আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর আদর্শের আলোকচ্ছটায় আমরা আলোকিত হ'য়ে উঠেছি—তাঁর আদর্শ পরম সত্যের মতই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনসমাজের অন্তরে অন্তরে ভাস্বর হ'য়ে থাকবে। স্বাধীন জাতির যাত্রাপথে যদি কোন দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে—তিমির ঘন নিকষ কাল যদি আবার আমাদের যাত্রা পথকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়—সুভাষচন্দ্রের আদর্শের আলোকবর্তিকা সেদিন আমাদের পথনির্দেশ দেবে। তবু আমরা কামনা করি, সুভাষচন্দ্রের দেহগত জীবন দীর্ঘ-জীবন লাভ করুক। তাঁরই দেওয়া অভিবাদন আমাদের শতসহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে তাঁর জয় ঘোষণা করুক—জয় হিন্দ।

নেতাজী সুভাষ ও সিপাহী কা স্বপ্ন

কলকাতায় নেতাজী জন্মদিবসে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কীয় দু'খানি চিত্র মুক্তিলাভ করেছে। প্রথমখানি প্রযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল। আজাদ হিন্দ সরকার গৃহীত চিত্রের সংগে ত্রিপুরী কংগ্রেস-এর পর থেকে নেতাজীর বিভিন্ন কার্যকলাপ এই চিত্রের সংগে সংযোজিত হ'য়েছে। দ্বিতীয় চিত্রখানি নির্মিত হ'য়েছে কলকাতায়। আই, এন, এ, অর্কেষ্ট্রা এ্যাণ্ড ড্রামেটিক পার্টির সভ্যরা এই চিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। ভারতের বাইরে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টাই এই চিত্রে সংযোজিত হ'য়েছে। এই শেষোক্ত চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত ভি, ডি, স্বামী ও সুশীল মজুমদার। আমরা এই উভয় চিত্রের প্রযোজক, পরিচালক পরিবেশক, প্রদর্শক ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নেতাজীর জন্মদিনে দর্শকসাধারণকে নেতাজীর কীর্তিকলাপ চিত্রের মারফৎ দেখিয়ে তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের চিত্র জগতের কর্তৃপক্ষ এমনি ভাবে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকদের জীবনী ও আদর্শ চিত্র মারফৎ জাতির সামনে তুলে ধরে নিজেদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার পরিচয় দিতে পিছু হটবেন না।

—শ্রীকাঃ

পরলোকে উদীয়মান অভিনেতা
দেবী মুখোপাধ্যায়

১১ই ডিসেম্বরের ভোরের পত্রিকাগুলি চিত্রামোদীদের কাছে এক পরম দুঃসংবাদ বহন করে আনলো। "গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সন্ধ্যায় খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ মারা গেছেন।" সংবাদ পত্রের সংবাদের ভিড় ঠেলে দৈনিকের এই ছোট্ট সংবাদটি যে কোন চিত্র ও নাট্যামোদীর অন্তরকে যে মথিত করে তুলেছিল, সেকথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই। চিত্র জগতে দেবী মুখোপাধ্যায়ের আগমন যেমনি অকস্মাৎ—মৃত্যুও তেমনি। বলতে গেলে প্রথম প্রকাশের সংগে সংগেই তিনি দর্শকসাধারণের অন্তর জুড়ে বসতে পেরেছিলেন—তাই তাঁর মত একজন প্রতিভাবান অভিনেতার অকস্মাৎ মৃত্যু যে দর্শকসাধারণের অন্তরকে ব্যথিত করে তুলবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী, ছাপরায় মাতামহের বাড়ীতে দেবী মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর মাতামহ সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। দেবী মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ী হুগলী জেলার জনাই গ্রামে হ'লেও তাঁরা শ্রীরামপুরের বাসীন্দা ছিলেন। সেখানে তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওকালতি ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে প্রবোধবাবুর বয়স ৫৮ বৎসর হবে। ছয়টি ভাই, দুইটি বোনের ভিতর দেবীবাবুই জ্যেষ্ঠ। বোন দু'জনই বিবাহিত জীবন যাপন করছেন। ভাইয়েদের ভিতর মাত্র দেবীবাবু ও মেজ জন বিয়ে করেছিলেন। বাকী চার জন অবিবাহিত আছেন।

শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলেই দেবী বাবুর বিদ্যারম্ভ হয়। এবং এই স্কুল থেকেই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে দেবীবাবু আই, এ পড়বার জন্য শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পূর্বেই তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন।

ছোটবেলায় খেলাধুলার প্রতি দেবীবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। এবং ভাল খেলোয়াড়রূপে অতি অল্পদিনের ভিতরই ছাত্র মহলে সুনাম অর্জন করেন। স্কুল জীবনে স্কুলের ফুটবল টিমের তিনি ছিলেন অধিনায়ক। কলেজে এসেও তাঁর সে অধিনায়কত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। ফুটবলের সংগে সংগে ক্রিকেট খেলায়ও তিনি সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি কতকটা বেপরোয়া ভাবের ছেলে ছিলেন। ভয় কাকে বলে জানতেন না। কোন কাজেই কোনদিন পিছু হটেন নি। যখন তাঁর মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়স, তাঁর মাথায় চাপলো—তিনি বিলেত যাবেন—বড় হবেন—অনেক কিছু শিখবেন। অমনি তিনি ছুটলেন। বাড়ীতে কাউকে না জানিয়ে রওনা দিলেন সকলের অগোচরে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন হাওড়া স্টেশনে। বাধ্য হ'য়ে তখন ফিরে আসতে হ'লো। যখন তাঁর সতের বৎসর বয়স—খেয়াল হলো নিজের পায় নিজে দাঁড়াবেন। এই বিরাট পৃথিবীর মাঝে নিজের শক্তিমত্তাকে—নিজের ভাগ্যকে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন! অমনি ছুটলেন। সংগে মাত্র দশ টাকা নিয়ে দিল্লী চলে গেলেন। এমনি দুঃসাহসিক বে-পরোয়া মনের পরিচয় বাল্য ও কৈশোরে তিনি একাধিক বার দিয়েছেন। তাঁর কলেজ জীবনের আর একটি দুঃসাহসিক কাযের ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ খৃঃ-এ শ্রীরামপুর হ'তে ব্যারাকপুরে সৈনিকদের সংগে এক ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় কী কারণে যেন কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে সৈনিকদের সংগে মারামারি আরম্ভ হয়। দেবীবাবু একা সৈনিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং বেশ মারপিট করেন। উপায়ান্তর না দেখে সৈনিকেরা বন্দুক নিয়ে এসে আক্রমণ করে। দেবীবাবুও এবার কোন উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু মুস্কিল দেখা দেয় শ্রীরামপুরে তক্ষুনি ছুটে আসবার কোন যানবাহন ধরতে পারেন না। উপায়ান্তর না দেখে গঙ্গায় ঝাপিয়ে পড়েন এবং সাঁতার কেটে শ্রীরামপুরে চলে আসেন।

আবৃত্তি, অভিনয় ও সংগীতে ছোট বেলা থেকেই দেবীবাবুর অনুরাগ ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুলে একাধিকবার তিনি আবৃত্তি

আছি, আমার সামনে একটি সুদর্শন ছেলে এসে বসলো। তাঁর সংগে আলাপ করে জানলাম, সে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র, নাম দেবী মুখোপাধ্যায়। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে মনে হ'য়েছিল নাট্য-মঞ্চ অথবা চলচ্চিত্রে এর উন্নতির আশা আছে। তখন আমি সিনেমা বা ষ্টেজ-এর সংগে জড়িত ছিলাম না। তার কিছুদিন পড়ে সেনোলা কোম্পানী-তে আমার লেখা "রাবণ" পালা তৈয়ারী হবে ঠিক হয় এবং আমি বিভীষণের ভূমিকায় দেবীকে নির্বাচন করি। তখন বিভীষণের ভূমিকায় ওর সুন্দর আবৃত্তি আমাকে মুগ্ধ করে। তখন প্রায়ই দেবী শ্যামপুকুরে আমার বাড়ীতে আসত। "রাবণ" পালা রেকর্ড হবার ২।৪ দিন পূর্বে এক দিন দেবী বিষন্ন মুখে আমাকে এসে জানালে, "বাবার মত নেই।" তখন আমি বাধ্য হয়ে অন্য লোক দিয়ে ওই পাঠ করাই। এর পর আমি আর তাঁর খবর রাখতে পারিনি। নীতিনবসুর পরিচালনায় বম্বে থেকে তোলা "বিচার" ছবিতে Inspectorএর ভূমিকায় দেবীকে দেখি। আমি যখন "অভিনয় নয়" ছবির কাজ কচ্ছি, তখন একটী ভূমিকার জন্য মুরলীবাবুর কাছে ধীরাজকে চাইতে গেলাম, মুরলীবাবু টাকার যা ফর্দ দিলেন, তাতে আমার পক্ষে ধীরাজকে লওয়া সম্ভব হয় নাই। তখন প্রণবের কথায় আমি সেই ভূমিকাটি দেবীকে দিয়ে করাই। দেবী আমাকে শ্রদ্ধা করত এবং প্রয়োজনে আমি তাঁকে তিরস্কার করলে সে মুখ বুঁজে সহ্য করত। এমন অনেক সময় হয়েছে যে, দেবীও আমাকে দশকথা শুনিয়ে দিয়েছে। আজ আমরা মাত্র কয়েকজন এখানে এসেছি—যে চলে গেল তাঁর আত্মীয়ের মত তাঁর গোষ্ঠীর মত--তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। শিল্পী নিজেকে ধ্বংস করে সকলকে আনন্দ দেয়। বিধাতার ইংগিতে কখন যে কার মৃত্যু হয়, কখন যে কার জন্ম হয় কিছুই বলা যায় না। আত্মীয় বা নিজের গোষ্ঠীর মৃত্যুতে যে ব্যথা লাগবে না তা নয়, তাই আজ সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাই না। জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন দেবীর আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন।"

নাট্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবার উঠলেন তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে—আমরা কোন একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই রীতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আছে। আজ এই শিল্পী সংগ ছিল বলেই আমরা অর্থাৎ শিল্পীরা বা তাঁদের বন্ধুরা বা তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা আজ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার সুবিধা পেয়েছি। আগে শিল্পীরা চলে গেলে কেউ তাদের খবর রাখত না। শিল্পীসংঘের জন্য আজ তা সম্ভব হয়েছে। দেবী শচীনবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই আসত এবং তাঁর নিজের জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলত। অনেকে বলে, একজন শিল্পীর কি চরিত্র আছে, যার জন্য আপনারা দল বেঁধে শ্রদ্ধা জানিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেন? শিল্পী হচ্ছে স্রষ্টা। সে চরিত্র সৃষ্টি করে। যদি কোন শিল্পী আপনাদের জীবনের ২।৪টী সন্ধ্যায় আনন্দ দিয়ে থাকে সেই-টুকুই যথেষ্ট। শিল্পী আপ্রাণ চেষ্টা করে আপনাদের২টী কি কি ১টী সন্ধ্যাতে যদি সত্যিই আনন্দ দিয়ে থাকে, সেইটাই কি যথেষ্ট নয়? আমরা আজ মৃত শিল্পীর জীবনী নিয়ে বা চরিত্র নিয়ে বা কোন চিত্রে তাঁর অভিনয় ভাল হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি, সকলে মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে যে, ভগবান যেন দেবীর আত্মার মঙ্গল করেন।"

পরিচালক নীরেন লাহিড়ী (বেণুবাবু) দেবীর অন্তরঙ্গদের অন্যতম—তিনি বললেন—"দেবীর মৃত্যুতে আমরা সকলে এখানে এসেছি। দেবী আমার কাছে ছিল Artistএর কাছে যেমন থাকে Model। আমি যখন কোন বইএর কথা ভাবি, তখন দেবীকে বাদ দিয়ে কিছুতেই ভাবতে পারি না। দেবী যাওয়াতে যে শুধু সিনেমার ক্ষতি হ'ল তা নয়। দেবী যাওয়াতে stageএরও ক্ষতি হল। কারণ, দেবীর stageএ অভিনয় করবার ইচ্ছা ছিল। আজ দেবী আমাদের বঞ্চিত করে গেল। দেবীকে যাঁরা ভালবাসতেন তাঁরাই এখানে এসেছেন, তা না হলে তাঁরা আজ এখানে আসতেন না।" নীরেন বাবুর বক্তৃতার পর সভাপতি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের মধ্যে যদি কেউ দেবীর বিষয় কিছু বলতে চান তবে বলতে পারেন।" কিন্তু আর কেউ কিছু না বলাতে সভাপতি তাঁর নিজের কথা বলতে আরম্ভ করেন—

"দেবীর সংগে আমার প্রথম আলাপ হয় যখন ও 'শুকতারা' বইতে কাজ করে। যখন আমি বম্বেতে ছিলাম একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ আমাকে এসে বল্লে "আমাকে চিনতে পারেন?" আমি বললাম, কোথায় দেখেছি ব'লত? তখন ও আমাকে বলল, আমি 'শুকতারা' বইতে আপনার সংগে কাজ করেছি। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখানে কি কচ্ছ? দেবী আমাকে বলল, এখানে আমি হিন্দি বইতে অভিনয় কচ্ছি এবং আস্তে আস্তে উন্নতিরও আশা করি আর উন্নতি করবও। এরপর দেবীর সংগে আমার দেখা হয় নিউ থিয়েটার্সে'র কৃষ্ণকান্তের উইলএর হিন্দি ওয়াসিৎনামা চিত্রে ও "অভিনয় নয়" চিত্রে। দেবী আমাকে বলত,আমি দাঁড়িয়ে দেখি যখন আপনাদের জন্য গাড়ী অপেক্ষা করে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় নিয়ে যাবার জন্য। আমার জীবনে কবে ওই রকম হবে তাই ভাবি। দেবীর জীবনে সেই রকম দিন এসেছিল এবং ও যা চেয়েছিল তা পেয়েছিল। যখন তাঁর শরীর খারাপ হয় তখন ও আমাকে বলত, আমার ইচ্ছে করে আবার আগের মত পুরো উদ্দমে কাজ করি।

আজ ২।৩ বছরের মধ্যে মহামারি এসেছে শিল্পী সংগের গোষ্ঠীর মধ্যে, তা না হলে শিল্পীরা এত তাড়াতাড়ি চলে যায় কেন? এ মহামারি এল কেন? মহামারি এলে টিকে নেওয়া, ঔষধ খাওয়া নানান রকম ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমাদের এই মহামারির ভিতর কি কিছুই ব্যবস্থা নেই? শিল্পীসংঘ কি এর কোন ব্যবস্থাই করতে পারেন না? যত তাড়াতাড়ি একজন শিল্পী চলে যায় তত তাড়াতাড়ি একজন শিল্পী আসেন না।

সুধীপ্রধান যা বললেন যে, দেবীর ইচ্ছা ছিল শিল্পীসংঘ থেকে শিল্পীদের জন্য সোসাল ইনসিওরেন্স এর ব্যবস্থা করা। এখন সেইটাই যদি শিল্পীসংগ করতে পারেন তবেই দেবীর প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখান হয়।"

সভাপতির বক্তৃতার পর সভাস্থ সকলে দাঁড়িয়ে ২ মিনিট মৌন থেকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর দ্বিজেন চৌধুরী একটী গান করেন ও সভা ভংগ হয়।

সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, অহীন্দ্র চৌধুরী, শচীন সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোঃ নীরেন লাহিড়ী, কমল মিত্র, বীরেন ভদ্র, রবি রায়, প্রভাত সিংহ, ফণীন্দ্র পাল, মামু সেন, ধীরেন দাশগুপ্ত, সুধী প্রধান, নবদ্বীপ হালদার, বেচু সিংহ, অজিত-চট্টোপাধ্যায়, কমল চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন চৌধুরী, প্রণব রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুধীর গুহ, জ্ঞান ঘোষ সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রভৃতি আরো অনেকে।

—স্নেহেন্দ্র (বিন্টু) গুপ্ত

অভিনেতা দেবী মুখুজ্জে

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

★

আজ বাংলা চিত্রজগতের যে অপরিসীম ক্ষতি হয়ে গেল তা' পূর্ণ হবার আশু সম্ভাবনা দেখছি না আগামী নূতনদের মধ্যে। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে যে প্রকৃত শিল্পী জনগণের মনে ছাযা ফেলতে পারেন—তাদের মাঝে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পাবেন, দেবী বাবুই তার প্রমাণ। তাঁর মত এত অল্প সময়ে কেউই এত খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করতে পারেন নি।

'বিচার' এবং আর একখানি হিন্দী বইএ (খিলাওনা) বোম্বেতে প্রথম দেখা দিলেন তিনি। তারপরই ফিরে এলেন বাংলায়। বোম্বেতে কি ভাবে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তিনি প্রথম চিত্রজগতে অবতীর্ণ হন, তা হয়ত এখানের অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তিনি তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন আর স্বীকার করতেন সেখানের এক বাঙ্গালী হোটেলওয়ালার কৃতজ্ঞতা—যে সাধারণ ব্যবসায়ী হয়েও একজন বাংলার উদীয়মান শিল্পীকে কিভাবে সাহায্য করেছিলো, নিঃস্ব হয়ে বোম্বেতে পাড়ি জমিযেছিল এখানে কোন আশা না পেয়েই।

শ্রীরামপুরে থাকতেন তখন। ছেলেবেলা ততটা পড়াশোনার দিকে নজর ছিল না, যতটা ছিল অভিনয়—বিশেষ করে গানের দিকে। ঠিক স্মরণ নেই, বোধ হয় ১৯৩৩ বা ৩৪ সালেই Matric পাশ করে I. A. পড়তে সুরু করেন শ্রীরামপুর Missionary College-এ। তখন হতেই কলেজের অভিনয় বা সংগীত জলসায় সাক্ষাৎ পাওয়া যেত তাঁর। পাড়ার কুণ্ডুদের বাড়ীর অর্গানটা বুঝতে পারত, কে তার উপর সব চেয়ে বেশী অত্যাচার চালায়।

তাঁর বাবা প্রবোধবাবু তখন শ্রীরামপুর বারের ওকালতি করতেন। আশা করেছিলেন পড়াশোনা করে দেবীবাবু ভাল ছেলের মতই পাশ করবেন—কিন্তু এই সব দেখে—বেশ একটু আঘাত পেতেন। দেবীবাবুর কোন দিকে

শক্তিপদ রাজগুরু

ভ্রূক্ষেপ নাই, ছনু বাবু (ছনু গোসাই), শামু গুপ্ত আরও কয়েকজন বন্ধু-সহপাঠী মিলে বেশ গানের আসর জমাতেন রীতিমত। সেই থেকেই হয়ত মনের কোণে দেখা দিত শিল্পী হবার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

সারা বাড়ীতে কংগ্রেসী ভাবাপন্নের প্রতিষ্ঠা, ছোট ভাই বাসুদেব বাবুও একাধিকবার জেল ফিরে এসেছেন দেশ-সেবার জন্য...এমনি এক বাড়ীর আবহাওয়াতেও দেবী বাবুর শিল্প চেষ্টা ব্যাহত হয়নি, নানা পারিবারিক অশান্তির মধ্যেও চলছিল। I. A. ফেল করবার পর কিন্তু আর চলল না, বাবা বাধা দিলেন। শেষ অবধি বাবার নিষেধ—পারিবারিক শান্তি বিপন্ন করেও ··তিনি পা বাড়ালেন বাইরের জগতে। শিল্পীর সাধনা নিয়েই।···সে বোধ হয় ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে।

জীবনী লিখতে বসিনি, তবুও যেটুকু মনে এসে গেল সেটা অপরিহার্য বলেই।

কয়েক বৎসর কেটে গেল, সে বোধ হয় '৪৩ সাল। সবে বিপ্লব থামান হয়েছে—বৃটিশ বেয়োনেটের শক্তির পরা-কাষ্ঠায়। দেখা দিয়েছে মন্বন্তর। ফিল্মের বাজার সবে মন্দার হাত হতে বাইরে আসছে। সরকারী কনট্রোলের

দায়ে ছবি তৈরি কমে গেছে, যে কয়টি হচ্ছে তাও সামান্য। একদিন শ্রদ্ধেয় বিনয় দা'র (নিউ থিয়েটার্সের বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের) বাড়ীতে বিমল বাবু, হেমচন্দ্র, জ্যোতির্ময় বাবু, রাধামোহন ভট্টাচার্য, পরিচালক সুবোধ মিত্র সকলেরই মুখে প্রশংসা শুনলাম একটি নবাগতের। উদয়ের পথের মুক্তির পরেই দেবীবাবুর অভিনয় প্রতিভা পেল সাদর সম্বর্ধনা। এমন স্বচ্ছ সাবলীল অভিনয়—ভরাট কণ্ঠস্বর, প্রশস্ত ললাট, নায়কের সমস্ত প্রতিভারই পরিচয় দেয়।

একজন বিখ্যাত দেশ নেতা, উদয়ের পথে দেখে এসে বল্লেন, "তোমাদের বিগত যুগের অর্থাৎ দেখে এলাম যেন ধনতন্ত্রবাদ অবসানের পর আসছে নতুন এক জগৎ, ভাল কথা, কিন্তু যে যুগ যেতে বসেছে—সেই চরিত্রগুলো যাঁরা রূপায়িত করেছেন—তাঁদের সামনে আগামী নতুন যুগকে দেখে, মনে হয় যেন মিনমিনে, প্যানপ্যানে কোন মেকি মাটির পুতুল হে।"

অভিজাত কথাটা বেশ গুছিয়ে বলতে চাইলেন না তিনি, তবু বুঝলাম যে, দেবীবাবুর অভিনয়ের সামনে কাটাকাটা কথা, শুকনো পাটোয়ারী কাঠখোট্টা অনুপের চরিত্রকে তাঁর ভাল লাগেনি, তাই সম্পূর্ণ নীতিবিরোধী হয়েও, দেবীর অভিনয়ই তাঁর মন ছুঁয়েছে।

তাঁর অভিনয়ের পরে ওসম্বন্ধে আলোচনা করছি না।

একদিন বৈকাল বেলা ইন্দ্রপুরীতে নিজেদের কাজ সেরে, বিরাজ বৌয়ের সহকারী পরিচালক বন্ধুবর সুবোধ রায়ের সংগে ছোটাই বাবুর স্টুডিওতে গেলাম। সেদিন "বিরাজ-বৌ"এর Take হচ্ছে। বিরাট এক শ্মশানের Set, জমিদার শিকার ফেরতা, তাঁবু তুলে রওনা হচ্ছেন বজরায় করে—।

কিন্তু যবনিকার অন্তরালে অনেক গোলমালই ঘটে, সেদিনও ঘটেছিল তাই। ক্যামেরা যেন বিগড়ে গেছে। একটা ছবি পোড়াবার 'সট' ছিল, সেটা ঠিক হয়েছে, না N. G. হয়েছে, N. G. হলে আবার take করতে হবে, নইলে set ভেঙ্গে ফেলে অন্য set করা হবে। বেলা তখন প্রায় ৪টা হবে। ফিল্মটা Laboratoryতে গেছে সেখানে wash করে দেখতে হবে। তবে report আসবে, artist, টেকনিশিয়েনেরা সকলেই অপেক্ষা করছেন অধৈর্য হয়ে— যেতেই দেবীবাবু এগিয়ে এলেন।

'একটু গল্প ত করা যাক্, আসুন।'

আমার হাতের 'রূপ-মঞ্চ'খানা নিয়ে দেখতে লাগলেন। এগিয়ে এলেন ক্যামেরাম্যান শৈলেন বসু। এখন তিনি কারদার প্রোডাকসে রয়েছেন বোধ হয়।

বিখ্যাত এক পরিচালকের কোন এক বিখ্যাত বইএর সমালোচনা, দেবীবাবু তাতেও অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু দেখলাম 'রূপ-মঞ্চ'র সমালোচনাকে সমর্থন করে চিত্রখানির অকুণ্ঠ সমালোচনা করতে তিনিও পিছপা হলেন না।

বাইরের বাগানে কেয়ারী করা সিজন ফ্লাওয়ার বেঞ্চের ধারে বসে প্রায় দু ঘণ্টা আড্ডা দিলাম, দেবীবাবু costume পরে রং মেখেই সমান তালে আড্ডা দিয়ে চললেন।

মাঝে মাঝে অভিযোগ করতে শুনতাম। আপনারা লেখকরা কেন এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন না, যাঁরা আপনা হতেই কায করে, কথা বলে, হাসে, কাঁদে। আমার মনে হয় যে সব বইএ অভিনয় করি তার অনেক চরিত্রই কষ্ট প্রসূত। অভিনয় করে আনন্দই পাই না, লোক দেয় অপবাদ—তাদেরই বা দোষ কি।

আমাদের দেশের বর্তমান সাহিত্যের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল দেখতাম। আলাপ আলোচনায় তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন। তারাশঙ্কর বাবুর সাহিত্যের কথা, কালিন্দী ধাত্রীদেবতার কথা। বলতেন ধাত্রীদেবতার মধ্যে যে বলিষ্ঠ চরিত্র খুঁজে পাই, সত্যিই যদি কোন প্রতিভাবান অভিনেতা ওতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন অমর হয়ে থাকবেন তিনি। সন্দীপন পাঠশালার কথাও বলতেন। প্রত্যেকটি আলাপ আলোচনায় দেখতাম শিল্পী মনের গভীর

অনুরাগের পরিচয়—বিদেশী অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর মনে বিশেষ ছাপ রেখেছিল চার্লস বয়ার।

মনে পড়ে Constant Nymph দেখে এসে প্রায়ই বলতেন, প্রেমের কাহিনী ত অনেকেই লিখে—সব ছবি তাই নিয়ে হয়। কিন্তু অমন কি করে করা যায়। চার্লস বয়ারের যে কোন বই-ই হোক বাদ দিতে পারতেন না পারতপক্ষে। যেটুকু মিশবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর সংগে, অনুভব করেছিলাম কত বড় দরদী শিল্পী মন রয়েছে। যেদিন 'পথের-দাবী'র কর্মীগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পেলাম। প্রযোজক মিঃ মজুমদার বা পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত মশায় ও দিগম্বরবাবুকে এই কথাটাই বলতাম, অহীন বাবু ত আছেনই, কিন্তু আরও একজন সব্যসাচী'র চরিত্র রূপ দিতে পারবেন, তিনি দেবী মুখোপাধ্যায়। তাঁরাও অনুভব করেছিলেন সেটা।

কতদূর কৃতকার্য হয়েছেন সব্যসাচীর ভূমিকায় দেবীবাবু বা কতখানি মর্যাদা আমরা দিতে পেরেছি 'পথের দাবী'র, সে বিচার সাধারণের উপর। কিন্তু, তাতে দেবীবাবুর দিক হতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে সেটা তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়—শারীরিক অসুস্থতাই।

তবুও দেখেছি যতদূর সম্ভব তিনি চেষ্টা করেছিলেন, চরিত্রটিকে রূপায়িত করবার। অনেকে অভিযোগ করেন, তিনি নাকি বিপ্লবীর চরিত্র বুঝতে পারেন নি। তাঁরা কম বেশী অনেকেই ভ্রান্ত। কারণ, তাঁর মত প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা যে ও চরিত্র বুঝতে পারবেন না, এটা আর যিনিই বিশ্বাস করুন না কেন, তাঁর সংস্পর্শে একদিনও যাঁরা এসেছেন তাঁরা সহজে এটা বিশ্বাস করবেন না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়টায় তাঁর শারীরিক এবং মানসিক একটা দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল—যে পারিবারিক জীবন বম্বে হতে ফিরে এসে আবার নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন তাতে দেখা দিয়েছিল অশান্তির কালো ছায়া। একজনকে কেন্দ্র করে আবার ঝড় ঘনিয়ে এলো তাঁর জীবনে।

এমনি ভাঙা মন নিয়ে আর যাই হোক শিল্পসৃষ্টি হয় না। তাই হয়ত এমনি ভাঙন এল তাঁর শিল্পী জীবনে।

'পথের দাবী'র পর যে কখানিতেই অভিনয় করেছিলেন, তিনি খুব দাঁড়াতে পারেননি।

শেষের দিকে টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্ক অঞ্চলে বাসা বেঁধে ছিলেন।

এক মানসিক শারীরিক দুর্যোগের মধ্যেও মুখের হাসি মুছে যেতে দেখিনি।

ন্যাশনাল Studioতে 'বিশ বছর আগে' Shooting চলেছে এই মাত্র কয়েকদিন আগেকার কথা। গীতিকার মোহিনী চৌধুরীকে দেখে রসিকতা করে উঠলেন—

"কত মোহিনী জানরে বন্ধু কত মোহিনী জান
মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে হায় ডাংগায় বসে টান।"

হাস্যমুখর সদালাপী দেবীবাবুকে ভুলতে পারিনা। সেদিন বৃহস্পতিবার—আগের সপ্তাহেও দেখা হয়েছে তাঁর সংগে। একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম, সকালে কলকাতায় ফিরে শুনলাম দেবীবাবু নেই, মারা গেছেন। বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না।

সত্য, তবু আজও ভুলতে পারি না দেবীবাবুকে, তাঁর অভিনীত ছবিতে তাঁকে দেখা যায়। কিন্তু আজও আমার মনে ভেসে ওঠে—ওই যবনিকার অন্তরালে আর একটি শিল্পী—সদাহাস্যমুখর—সদানন্দময়। তার সংগে ভেসে ওঠে কত স্মৃতি-মধুর দিনগুলো।

দুঃখ হয়, আমাদের সমাজ, দেশ এখনও তৈরী হয়নি, যাঁরা এদের দোষ ত্রুটিগুলো দেখেই ওদিকে দূরে ঠেলে দেবে না, শুধরে নিয়ে মানুষের সমাজেই বাসা বাঁধতে সাহায্য করবে, আমাদের সমাজের প্রত্যাখ্যানই—তাঁদের অভিমানী অন্তর বিক্ষুব্ধ করে তোলে—সামান্য আঘাত প্রতিরোধ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে তাঁরা—তাই হয়ত সমাজের বিরুদ্ধে তাঁদের এই অভিমান—এই প্রতিবাদ।

দুর্গাদাসের পর আর একজন প্রতিভাবান অভিনেতাকে পেয়েছিলাম আমরা—তাঁর অকাল-বিয়োগ বাংলা চিত্রজগতে অপূরণীয় ক্ষতিই করে গেল।

দেবী মুখুজ্জের অন্তরঙ্গ যারা—

পঙ্কজ দত্ত

★

সকাল আটটা হবে তখন।

'বিশ বছর আগে'র স্যুটিং—পদ্মা দেবী ও আরতি দেবী ইতিমধ্যেই এসে গেছেন, তাদের মেক-আপও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারটা রোদে টেনে নিয়ে কাগজ হাতে শীতের সকালে আড়ষ্টতা ভেঙে নিচ্ছি, ব্যবস্থাপক শ্রীবাস্তবকে দেখলুম দৌড়ুচ্ছে অফিস থেকে মেক্-আপ্ ঘরের দিকে। কর্মব্যস্ত লোক, এমন ও প্রায়ই দৌড়োয়, কিন্তু প্রশ্ন ক'রতে গিয়ে মুখের চেহারা দেখে কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। আমার কথার জবাব না দিয়েই ও দৌড়লো এবং পর মুহূর্তেই ফিরতিমুখে ওর সংগে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন আরতি দেবী ও পদ্মা দেবী আধা-মেক-অপ্ করা অবস্থাতে অত্যন্ত উতলা ভাবেই। তাঁদেরও প্রশ্ন করলুম কিন্তু কোন জবাব দিতে পারলেন না কেউই, তাঁরা দৌড়লেন গাড়ীর দিকে। আচ্ছা রহস্য তো!

ওদের পিছনে পিছনে গেলুম কিন্তু গাড়ী পর্যন্ত আমার পৌঁছবার আগেই শ্রীবাস্তব ও আরতি দেবী একরম লাফিয়েই গাড়ীর মধ্যে বসে পড়েছেন এবং উপস্থিত হত-চকিতদের আরও বিস্মিত করে সংগে সংগেই চলে গেলেন। পদ্মা দেবীর কাছে ফিরে এলুম, খাপছাড়াভাবে দু'একটা কথা বললেন, তাতে ব্যাপারটা কিছুই পরিষ্কার হ'লো না। তবে এইমাত্র বুঝলুম যে, দেবীবাবুর একটা কিছু হ'য়েছে, ভবানীপুরের কোন ব্যাঙ্ককর্মীর সংগে টেলিফোনে আলাপ সময় শ্রীবাস্তব এইমাত্র সে খবর পেলো।

তখুনি টেলিফোন করা হ'লো নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। আগের দিন ওদের ওখানে দেবীবাবুর স্যুটিং ছিল সুতরাং তারা যদি কিছু বলতে পারেন। কিন্তু কিছুই তাঁরা বলতে পারলেন না। তবে জানালেন যে, তাঁরা খবর নিচ্ছেন এবং সঠিক খবর আমাদের জানাবেন। ষ্টুডিওর এখানে সেখানে যে যেথায় ছিল সবাই একত্র এসে জড়ো হ'য়েছে। কথা বলার চেষ্টা ক'রেও কারুর মুখ দিয়ে কিছু বেরুচ্ছে না—অচিন্ত্যনীয় ঘটনাটা চিন্তার প্রতিটি খোপর থেকে ঠোকর খেয়ে ফিরে ফিরে বেড়াতে লাগলো। সকলে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে, নিশ্চল নিশ্চুপ!

খানিকপরই টেলিফোন এলো—যা এতক্ষণ মনে হলেও মন থেকে অলীক ব'লে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছিলো সবাই—তাই-ই সত্যি—গতকাল রাত আন্দাজ দশটায় টালিগঞ্জের বাসায় দেবী মুখুজ্জের হার্ট ফেল হয়েছে!

অসম্ভব! সবায়ের মুখ থেকে একসংগে একভাবে যেন উচ্চারিত হয়ে উঠলো। এইতো—এই সেদিন, ওরা ডিসেম্বর—'বিশ বছর আগে'র গান নেবার দিনে সবাই-ই দেখলুম সম্পূর্ণ সুস্থ কথাউৎফুল্ল মজলিসী লোকটীকে! গানগুলো যাতে ভাল হয় সেজন্য সেকি উৎসাহ আর কেই বা জানতো যে সংগীতে তার অতখানি দখল!......

একদিন বলতে তো কথাটা উড়িয়েই দিয়েছিলেম। বলেছিলুম, আপনার তো মশাই গায়ক রূপেই প্রথম পরিচয় পাই আমরা অবশ্য বাংলাতে নয়, বম্বের হিন্দী ছবি 'খিলৌনা'-তে' কিন্তু এখানে তো ও গুণটা একেবারে চেপেই গিয়েছেন। বললেন, থাক মশাই ও আর কাঁচিয়ে তুলবেন না, বাংলা ছবিতে যখন ওকথা কেউ এদ্দিন তোলেনি তখন গাইয়ে ব'লে স্বীকৃত আর হলুম কৈ? .....

সেদিন কিন্তু দেবীবাবু না হ'লে সত্যিই গানে থাম্‌তী থেকে যেতো। শব্দযন্ত্রী সত্যেন চাটুজ্যে একখানা গান বারবার নিয়েও কিছুতেই খুসী হচ্ছেন না। তৃতীয় বারেরটা সবদিকেই ও-কে হ'লো কিন্তু খুঁৎখুঁতে চাটুজ্জের কাছে তবুও যেন খুঁৎ একটা থেকে গেল। দেবীবাবু শুনলেন সে কথা। এসে বললেন, আর একবার নেওয়া হোক এবং যে খুঁৎটা সত্যেনের মনে ঠেকছে সেটা তিনি ঠিক ক'রে দেবেন। সত্যেনের ইতঃস্ততাঃ সবাই যখন ও-কে দিয়েছে তখন আ-বা-র নিতে......

'তা হোক, আমি বলছি নিতে।'—জোর করে বললেন দেবীবাবু।

সত্যেন বর্তে গেলো; আবার নেওয়া হলো এবং এই-বারেরটাই হ'লো সবচেয়ে সেরা আর নিখুঁত। কৃতিত্বের

সোপান দৃঢ়তর করার জন্যে সত্যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে ছিলো। আর এই সত্যেনেরই দেবীবাবু সম্পর্কে গোড়াতে কি উল্টো ধারণাই না হ'য়েছিল একটা সামান্য ব্যাপারে।— 'চলার পথে'র স্যুটিং হ'চ্ছে, সত্যেন দেবীবাবুকে জানিয়ে পাঠালে যে তার গলাটা একটু ধরা ধরা বোধ হচ্ছে কাজেই উনি যেন একটু স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করেন। দেবীবাবু যেন একটু উষ্মা প্রকাশ ক'রে গম্ভীরভাবে ব'লে পাঠালেন, তাঁর গলা ঠিকই আছে, আসলে শব্দধারক যন্ত্রটারই গলা ধ'রে গেছে। চাটুজ্জে তো চটে আগুণ। এ কী রকম কথা! এরপর একদিন আউটডোর স্যুটিংয়ে প্রসংগক্রমে একথাটা উঠতে আলোকচিত্র-শিল্পী 'খোকাদা' (প্রবোধ দাস) দেবীবাবুকে ডেকে বললেন। শুনে দেবীবাবু হোহো ক'রে হেসে উঠলেন।—

'সে কী মশাই! ওটা ঠাট্টা, তাও বোঝেননি?

'কিন্তু যেরকম গম্ভীর রাগতভাবে আপনি ব'লেছিলেন—'

'আরে মশাই, ওভাবে না ব'লে হাল্কা ক'রে বললে ওটা কী আর ঠাট্টা হ'তো।'

এবারে সকলেই হেসে উঠলো। সত্যি স্যুটিং ক'রতে এসে মাঝের বিরক্তিকর বিরতি সময়গুলোকে হাসি ঠাট্টা গল্পগুজবের মধ্যে এমনি কাটিয়ে দিতো যা ষ্টুডিওর কর্মীরা খুব কম লোকের মধ্যেই পেয়েছে। সে আসরে ছোট বড়ো সবায়েরই কেমন অবাধ ঠাঁই, সবাইই কেমন একটা অন্তরঙ্গতার টানে ওকে ঘিরে বসতুম আর ওরও লোককে কাছে টানার কেমন একটা সহজ অনাড়ম্বর ব্যক্তিত্ব। কোন বড় বড় কথা নয়, গুমোরও নয় এতটুকুও। কুলি থেকে পরিচালক পর্যন্ত সবাই-ই যেন সমান দোস্ত্।

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'বিশ বছর আগে' চিত্রের একটী দৃশ্যে দেবী, আরতি ও মিহির।

ক্যান্টিনে সবায়ের সংগে হুল্লোড় ক'রে খেতে বসে গেল হয়তো,—কেউ কেউ বলেছে, আর্টিষ্টদের নাকি যার তার সংগে ওরকম মিশতে নেই। তারা ষ্টুডিওতে পাঁচজনের মত খাবে না– তারা যদি খায়ও তো তারা আলাদাভাবে মেক্-আপ্ ঘরে বা অন্য কোন জায়গায় একা বসে খাবে এই হ'চ্ছে রীতি। দেবীবাবু তার কিছুই তো মানতেন না, চলতেনও না।

'বিশ বছর আগে'র প্রথম স্যুটিং দিন। দেবীবাবু এলেন নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই। কাজ আরম্ভ হ'তে না হ'তেই কর্মীদের সবায়ের সংগেই কেমন আলাপ জমিয়ে তুললেন, কতকাল যেন একসংগে কাজ ক'রে আসছে সবাই। খোকাদাকে ব'ললেন—মনে পড়ে খোকাবাবু পথভুলের কথা? সেদিন আপনিই আমার ছবি তুলেছিলেন, আমার প্রথম চিত্রাবরণ, সামান্য এক এক্সট্রার পার্ট, আর আজও আপনিই ছবি তুলছেন কিন্তু আজ আমি হীরো।'

খোকাদা হেসে ব'ললেন, হ্যাঁ, লগ্ কেবিন থেকে হোয়াইট হাউস, কিন্তু কিছু বদলাস্নি তুই, যেমনটি তেমনিই আসিস্।' খোকাদা কী তখন জানতেন যে পর্দায় দেবী বাবুর প্রথম ছবি তিনিই তুলেছেন আর তাঁর শেষ ছবিখানিও তোলা জন্য বম্বে-ক'লকাতা ঘুরে শেষে দেবী তাঁর কাছেই এসে জুটবে!

ছোট থেকে বড় হ'য়েছিলেন তাই না ছোটদের সংগে নির্দ্বিধায় এমন মাখামাখি ক'রতেন, বিশেষ ক'রে ষ্টুডিওর অবহেলিত অবজ্ঞাত কলাকুশলী সম্প্রদায়কেই তিনি সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েছিলেন। শট্ না থাকলেই দেবীবাবুর আড্ডা বাইরে সাউণ্ড-ট্রাকের সামনে বেঞ্চির মাঝখানে তিনি আর চারপাশে তাঁকে ঘিরে আর সবাই, মজলিস্ জ'ম্‌তো বটে!

বাজারে কত কথাই না রটেছিলো—দেবীকে নিয়ে কাজ করা দুষ্কর; নিয়মিত আসে না আর এলেও যেমন খুসী কাজ কোরেই চলে যায় ইত্যাদি। কিন্তু কৈ, 'বিশ বছর আগে'তে তাঁর সংগে কাজ ক'রে গেলুম, নালিশ করার তো কোন কারণ ঘটেনি একদিনও। নির্ধারিত সময়ের বরং কিছু আগেই এসে পৌঁছেছে সবদিনই এবং নির্দিষ্ট সময় কাজ না হ'লেও তো অনুযোগ তোলেনি একদিনও, উল্টে কাজ বাকি থাকলে পীড়াপীড়ি ক'রে শেষ ক'রে নিয়েছে। আর তাছাড়া কাজেও যে নিষ্ঠা ও অনুরাগ দেখেছি তা তো আমার অভিজ্ঞতায় খুব কমই চোখে পড়েছে। ওর প্রতিভারও তুলনা হয় না। চালচলনে অমন সাদাসিধে অতি সাধারণ, অথচ না দেখলে কে বলবে যে এই ব্যক্তিই অসাধারণ অভিনয় দক্ষতাসম্পন্ন অমন এক গুণী। অভিনীত চরিত্রকে বিনা আয়াসেই এমন প্রাণবন্ত ক'রে যে, মনে হ'তো ওটা যেন ওর স্বভাবজ ক্ষমতা। 'বিশ বছর আগে'-তে দেখতুম, অভিনয় ক'রতো না চরিত্রটির মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতো বুঝতে পারতুম না। প্রায়ই বিনা রিহার্শ্যালে বিনা মনিটারে অপূর্ব কাজ দেখিয়েছেন। এক জায়গায় অনেকখানি লম্বা ওর একার একটানা সংলাপ ছিল; একঘেয়ে যাতে না লাগে সে জন্যে ঐ সংলাপের মাঝে মাঝে কিছু কিছু ইনসার্ট দেওয়া ছিল। দেবীবাবু বললেন, আর্টিষ্টের অভিনয় দক্ষতা ওতে ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। সংলাপ যত লম্বাই হোক আর্টিষ্ট যদি তার বাচনভংগী ও অভিনয়ের দ্বারা ওকে প্রাণস্পর্শী করতে না পারে, যদি তা একঘেয়ে লাগে তাহ'লে সে আবার শিল্পী কিসের? কোন কোন বিলাতী ছবির নজীরও দেখালেন। এবং তিনি একটানা অব্যাহত বলে যেতে পারবেন, তাঁকে পরীক্ষা করা হোক। তাই করা সাব্যস্ত হ'লো। তিন মিনিটেরও বেশী সময়ের সট, রিহার্শ্যাল নয়, মনিটারও নয় তোলা হয়ে গেলো। শেষ হ'য়ে যেতে সমস্ত ফ্লোর পাথরের মত স্তম্ভিত, হতবাক, ক্যামেরা ঘুরেই চলেছে, বাতি জ্বলছে কারুর আর হুঁস ছিল ছিল না, চমক ভাংগতে বেশ সময় লেগেছিল। একি অভিনয়! না বাস্তবের এক লহমা চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেলো। বাস্তবিকই ভারতীয় ছবির ইতিহাসে এমন solilogue আর কারুর দ্বারা সম্ভব হয়নি। দেবীবাবুর কথাই বোধ হয় সত্যি। বলেছিলেন, এই অংশটা অভিনয় করার আগে, এ আর অভিনয় কি করবো? এতো আমারই জীবন কাহিনী। তাই যে কী দুস্তর অশান্তিই না ছিল ওর মনে!

প্রতিযোগিতায় নিজের দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। কলেজে এসে তাঁর এই দক্ষতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। তিনি কলেজের নাট্য-বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এবং ইরাণের রাণী ও শেষ রক্ষা নাট্যাভিনয়ে যথাক্রমে দারা ও চন্দ্রদা'র ভূমিকায় যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কলেজে বৈকুণ্ঠের উইলে তাঁর অভিনয়ও উপস্থিত সুধীজনের প্রশংসা লাভ করতে সক্ষম হয়।

সৌখীন নাট্যাভিনয়ে বহুবার বহুস্থানে দেবীবাবু অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই তাঁর কৃতিত্ব সকলকে ছাড়িয়ে যাবার স্পর্ধার পরিচয় দিয়েছে। শ্রীরামপুরে 'রীতিমত নাটক'ও'মানময়ী গার্লসস্কুল'-এ যথাক্রমে তাঁর বসন্ত ও মানস,বম্বেতে 'বিশ বছর আগে' নাটকে তাঁর দীপক, কলকাতায় শ্রীপঙ্কের 'সংঘাত'এবং বিধায়কের 'রক্তের ডাক' নাটকে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। মিনার্ভায় 'অভিযান' নাটকেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কর্মজীবনে দেবী মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম প্রবেশ করেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। আসানসোল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তিনি সর্বপ্রথম সহকারী শিক্ষকের একটি পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন শিক্ষকতার পর বিরাট জীবনের হাত ছানিতে সাড়া দিয়ে তিনি নিজের ইচ্ছায় সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দেন। এরপর আমেদাবাদ, কানপুর ও বম্বে এলাকায় বেঙ্গল বেলটিংকোং-র এজেন্সী গ্রহণ করেন। তারপর অভিনেতা জীবনকেই তিনি পেশারূপে গ্রহণ করেন। অভিনয়ের প্রতি ছোটবেলা থেকেই দেবী মুখোপাধ্যায়ের ঝোঁক ছিল। তিনি একজন বড় অভিনেতা হবেন, তাঁর অন্তরের এই আশাকে জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাঝেও মরে যেতে দেননি। চিত্রজগতে প্রবেশ করতে তাঁকে বহু বেগ পেতে হ'য়েছে। বহুজনের কাছ থেকে ফিরে আসতে হ'য়েছে। ভিড়ের দৃশ্যে অভিনয় করেও সুযোগ পান কিনা—তাও পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, কিন্তু তখন কৃতকার্য হননি। চিত্র জগতে সর্বপ্রথম তিনি যোগদান করেন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম অভিনীত চিত্র 'শুকতারা'। ১৯৪০ খৃঃ তিনি

অভিনয়ের অবসরে প্রয়োগশালার ভিতর দেবী মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রার এই চিত্রখানি চিত্রশিল্পী পান্না সেন গ্রহণ করেন

বম্বে যান এবং ওখানে প্রথম প্রথম ব্যাকগ্রাউণ্ড এবং প্লে ব্যাক মিউজিকে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। তারপর হিন্দি চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। আসরা, বহিন, কসৌতি, ফরিয়াদ, খিলৌনা, পরায়েধন ও বিচার (বাংলা) বম্বেতে এই চিত্রগুলিতে তিনি অভিনয় করেন। বম্বেতে 'ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া'র বিভিন্ন প্রচার চিত্রে অনেকবার এই সময় Back ground-এ কথা বলতেন।

বম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে এসে সর্বপ্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীযুক্ত বিমল রায় পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'উদয়ের পথে' চিত্রে। উদয়ের পথে চিত্রে দেবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রতিভা দর্শক সমাজের স্বীকৃতি লাভে ধন্য হয়। বাংলার চিত্র জগত এই উদীয়মান প্রতিভাকে অকুণ্ঠ প্রশংসায় স্বাগত অভিনন্দন জানাতে মোটেই দ্বিধা বোধ করে না। এরপর দেবী মুখোপাধ্যায়কে আমরা দেখতে পাই নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি চিত্র ওয়াসীয়াৎ নামা ও

উদয়ের পথের হিন্দি সংস্করণে। তাঁকে দেখতে পাই নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত ভাবীকাল চিত্রে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটী চরিত্রে। অভিনয়, রূপসজ্জা ও বাচন ভংগীতে দেবীবাবু 'ভাবীকাল' চিত্রে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেন। দেবীবাবুর সংগে সাক্ষাৎ হয় পথের দাবী চিত্রে সব্যসাচী রূপে—শৈলজানন্দ পরিচালিত অভিনয় নয় এবং নতুন বৌ, ভাবীকাল, অভিযোগ প্রভৃতি বাংলা চিত্রে। দেবী মুখোপাধ্যায় অভিনীত ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্সের জয়যাত্রা—রজনী ফিল্ম করপোরেশনএর চলার পথে এম, জি, পিকচার্স-এর বিশ বছর আগে এই চিত্রগুলি এখনও মুক্তি লাভ করেনি। বিশবছর আগে চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশবছর আগে দেবী মুখোপাধ্যায়ের শেষ অভিনীত চিত্র। দেবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রতিভা তাঁর জীবিতকালেই দর্শক সাধারণ ও সুধীসমাজের প্রশংসায় ধন্য হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলার অভিনয় জগতের যে এক অপূরণীয় ক্ষতি হ'য়ে গেল সেকথা বলাই বাহুল্য।

দেবী মুখোপাধ্যায়ের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় জনসাধারণ পেয়েছেন কিন্তু মানুষ হিসাবে—যাঁরা তাঁর নিকট সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন—সেপরিচয়ের কথা একমাত্র তাঁরাই বলতে পারেন। মানুষের দুঃখকষ্টের বেদনা অতি সহজেই তাঁর অন্তর স্পর্শ করতো। চিত্রজগতের অবহেলিত শিল্পী, বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের চিন্তা তাঁর মনের অনেকখানি ভরিয়ে রাখতো—এঁদের আর্থিক কৃচ্ছতা অপসারণেও তিনি যথেষ্ট উদ্যোগী হ'য়েছিলেন। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তিনি তিনটি দুঃস্থ পরিবারকে অর্থ সাহায্য করতেন।

পড়াশুনাতে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। অবসর সময় তাঁর কাটতো বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ে। ইংরেজীতে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। ইংরেজী বই খুব বেশী ও নিয়মিতভাবে পড়তেন। ইংরেজী ছবি দেখতেও ভালবাসতেন তিনি। চার্লস বয়ার ও রোণাল্ড কোলম্যান-এর অভিনয় তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগত। বাংলাছবি মোটেই তিনি দেখতেন না। এমন কী যে, 'ভাবীকাল' শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে তাঁকে সম্মানিত করে, সে চিত্রখানিও তিনি দেখেননি।

ব্যক্তিগত প্রচার কার্যের তিনি ছিলেন বিরুদ্ধে। বহু পত্র-পত্রিকায় দেবীবাবুর সম্পর্কে অনেক ভুল সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে। অনেকের ধারণা, পরিবারের সংগে তাঁর তেমন সদ্ভাব ছিল না। এটীও সম্পূর্ণ ভুল। পরিবারের সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধা তিনি যতখানি পেয়েছিলেন, তাঁর অন্যান্য কোন ভ্রাতাই তা পাননি। বাড়ীর ছোট থেকে বড় সকলের সংগেই তাঁর প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও ছিল অটুট। তাঁর সম্পর্কে পরিবারের সকলেই খুব উচ্চাশা পোষণ করতেন। শিল্পী সংঘের সভায় পরিচালক শৈলজানন্দ বলেছেন দেবীবাবু বিদ্যাসাগর কলেজেরছাত্র ছিলেন,এ সংবাদটিও ভুল। শ্রীরামপুর কলেজ ব্যতীত অন্য কোন কলেজে তিনি পড়েননি।

চিত্রজগতে প্রবেশ করতে যাঁরা দেবীবাবুকে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল ও ৺রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দেবীবাবুদের পরিবারটি খুবই উন্নত। তাঁর মাতৃকুল সম্পর্কেও একথা বলা চলে। দেবীবাবুর এক মামা বার্মার পাবলিক প্রসিকিউটর এবং এক দাদামশায় ভারত সরকারের অধীনে ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। দেবী বাবুর চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে অভিনয় জগতে প্রবেশ করেছে। আশা করি তাঁর ভবিষ্যত অভিনেতা-জীবন তাঁর দাদার প্রতিভার আদর্শে মহীয়ান হ'য়ে উঠবে। মৃত্যুকালে দেবীবাবু দুইটী স্ত্রী ও দুটী পুত্র রেখে গেছেন। বৃদ্ধ পিতা ও অন্যান্য শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমাজ ও রূপমঞ্চ পাঠক সমাজের তরফ থেকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। দেবী মুখোপাধ্যায় প্রতিভাবান অভিনেতা ছিলেন—প্রতিভার মৃত্যু নেই। দেবী মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভার নৈপুণ্যে তাঁর গুণগ্রাহীদের মাঝে অমর হ'য়ে থাকবেন। ভগবান তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন। —শ্রীকাঃ

আগামী সংখ্যায় মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণে আমরা স্মৃতি তর্পণ করবো।

পরলোকগত শিল্পী দেবী মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শিল্পী-সংঘের শ্রদ্ধা নিবেদন

★

২১শে ডিসেম্বর ১৯৪১ সকাল, ৯টা। শিল্পী সংঘের উদ্যোগে বাংলার উদীয়মান অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন করা হ'য়েছে সংঘের কার্যালয় ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে। স্বর্গতঃ শিল্পীর প্রতিভার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে আজ তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধুরা সমবেত হবেন। রূপ-মঞ্চ ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির পক্ষ থেকে আমি, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক ও মণিদীপা রওনা দিলাম। পূর্বে থেকেই জনৈকা মহিলা শিল্পীর সংগে ওদিন সাক্ষাতের তারিখ নির্দিষ্ট হ'য়ে থাকাতে—সম্পাদক ও মণিদীপা অপেক্ষা করতে পারলেন না। আমায় রেখে গেলেন তাঁরা প্রতিনিধি স্বরূপ। আর রেখে গেলেন শ্রীযুক্ত সুধীপ্রধানের কাছে শিল্পীর প্রতি সম্পাদকের লিখিত শ্রদ্ধার বাণী।

সভামণ্ডপে স্বর্গতঃ শিল্পীর একখানি প্রতিকৃতি রাখা হ'য়েছে। তার পিছনে বসে আছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, প্রণব রায়, প্রচার সচিব ফণীন্দ্র পাল—অভিনেতা রবি রায়, প্রভাত সিংহ—আরো অনেকেই। সামনের গৃহ-প্রাংগনেও বহু শিল্পী ও বিশেষব্যক্তিরা বসেছেন—বসেছেন স্বর্গতঃ শিল্পীর বহু গুণগ্রাহী অভ্যাগতবৃন্দ। কারোর মুখে কোন কথা নেই। সকলের মনে একই বেদনা ঝংকার খেলছে। ৯টায় সভা আরম্ভ হবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত সভার কার্য আরম্ভ হয় বেলা সাড়ে দশটায়। শ্রীযুক্ত সুধীপ্রধান নটসূর্যকে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ জানান। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত সুধীপ্রধানের অনুরোধকে সমর্থন করেন। নটসূর্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রধান স্বর্গতঃ শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে বলেন, "দেবী মুখোপাধ্যায় নিজে শিল্পীসংঘের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। শিল্পীসংঘকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায় কোন ফাঁক ছিল না তাঁর। কিছুদিন থেকে তিনি শিল্পীসংঘ থেকে শিল্পী-

রূপ-সজ্জার বাইরে দেবী মুখোপাধ্যায়। চিত্রখানি শিল্পীর অন্যতম ভ্রাতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
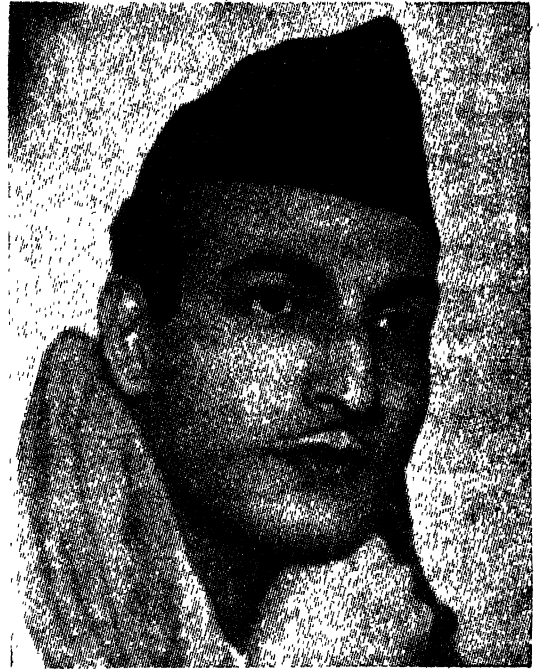
দের জন্য "সোশ্যাল ইনসিওরেন্স" প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা কচ্ছিলেন। তাঁর সে চেষ্টাকে ফলবতী করে যেতে পারলেন না।" এরপর শ্রীযুক্ত প্রধান সভাপতির অনুমতি নিয়ে রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন—সম্পাদক লিখেছেন, "বাংলা চিত্রজগতের উদীয়মান অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথার মতই মনে বেজেছে। দেবী প্রতিভাবান অভিনেতা ছিলেন। প্রতিভার মৃত্যু নেই। তাই আমাদের পরম সান্ত্বনা। দেবীর স্মৃতিসভার আয়োজন করে আপনারা শুধু স্বর্গতঃ শিল্পীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি, নিজেদেরও সম্মানিত করে তুলেছেন। আজ আর কোন শোকের কথা নয়। চোখের জল মুছে ফেলে দিয়ে, আসুন, আমরা এই পরম মুহূর্তে স্বর্গতঃ শিল্পীর প্রতিভার গুণ-কীর্তন করে—তাঁকে আমাদের মাঝে চির জাগরূক করে রাখি।" এরপর উঠলেন পরিচালক ও গীতিকার প্রণব রায়। কথা বলবার পূর্বেই তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর হৃদয়াবেগ তাঁর কণ্ঠকে রোধ করে ধরলো

বারবার। "দেবীর সংগে আমার আলাপ বম্বেতে। বন্ধু জ্ঞান ঘোষ দেবীর সংগে আমায় আলাপ করিয়ে দেন। তখন দেবী রঞ্জিত মুভিটোনে কাজ কচ্ছিল। আমি তাঁকে বলি, তুমি বাংলার ছেলে বাংলাতে ফিরে যাও এবং আমার মনে হয় বাংলাতে তুমি উন্নতি করতে পারবে। দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'জয়যাত্রা' চিত্রখানি নিবেদন করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী আমাকেই শ্রদ্ধাবাণী লিখতে হয়। দেবী এসেছিল শুকতারার মত যেমনি অকস্মাৎ—চলে গেলও তেমনি। মৃত্যু শোকের হলেও—অকাল মৃত্যু বেশী শোকের।" চিত্র ও নাট্যজগতের দাদামশায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কম্পিতস্বরে দেবীর কথা বলতে যেয়ে বল্লেন,

দেবী মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর মালমশলা সংগ্রহে তাঁর পরিজনবর্গ সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতায় আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। দেবী মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত প্রামাণ্য সংবাদ পূর্বোক্ত জীবনীতেই প্রকাশিত হ'লো। দেবীবাবুর বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহে দেবীবাবুর ভ্রাতারা—নিউ থিয়েটার্সের ছোটাইবাবু—এম, জি, পিকচার্সের পঙ্কজ দত্ত, ভ্যানগার্ডের প্রচার-সচিব ফণীন্দ্র পাল ও চিত্র-শিল্পী পান্না সেন আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা রূপ-মঞ্চের এই সংখ্যা দেবী মুখোপাধ্যায় স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। সম্পাদক : রূপ-মঞ্চ

"বলবার কথা নূতন কিছুই নাই। দেবীর পরিচয় সে তাঁর নিজের অভিনয় প্রতিভার দ্বারা দিয়ে গিয়েছে। দেবী শিল্পী বলে আমাদের একটু বেশী শোক হয়। কারণ, আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে একটা সম্পর্ক পাতান থাকে, যেমন দাদা, কাকা, বড়দা প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে যাঁরা লাইনের আগে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁদের ডিঙ্গিয়ে যাঁরা আগে চলে যাচ্ছে এবং গিয়েছে যেমন দুর্গা, রতীন, বিশ্বনাথ, অমল প্রভৃতি অথচ আমরা আগেই দাঁড়িয়ে রইলাম—তাই ওদের যাওয়ায় বেদনাটা আমাদেরই বেশী। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা দেবীর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা তাঁকে ভালভাবে বুঝবার সুযোগ পেয়েছেন। দর্শকরা শুধু তাঁর ছবি দেখেছেন—শিল্পী রূপকে চিনেছেন। মানুষটিকে জানতে পারেননি।" অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, "দেবীর বিষয় আমার কিছুই বলবার নেই—প্রথম দিন থেকেই আমি তাঁর দাদা। আজ দেবী নেই। এই ব্যথাটাই সবচেয়ে বড় করে প্রাণে বাজে।"

এর পর উঠলেন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে এ মানুষটা যেন একটা লোহার মানুষে পরিণত। কিন্তু একটা জায়গায় ভগবান এঁকে নরম করে রেখেছেন—পারিবারিক আত্মীয়তার গণ্ডির বাইরে বাংলার অনাদৃত চিত্রও নাট্য-মঞ্চের শিল্পী ও কর্মীরা এই লোহার মানুষটিকে নিয়ে যে আত্মীয়তার গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে—তাঁরাই ওর মনের কোমলতার সন্ধান পেয়েছেন। দেবী অনাদৃত চিত্রশিল্পেরই একজন পূজারী ছিলেন। তাঁর বিয়োগ ব্যথা ওর প্রাণে কার চেয়ে কম বাজবে! শচীন্দ্রনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, "মনোরঞ্জন যা বল্লেন তা ঠিক। এই ক' বছরের ভিতর আমরা বহু শিল্পীকে হারিয়েছি। যখন কোন শিল্পী আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমরা খুবই আনন্দ পাই। কারণ, বাংলাদেশে শিল্পীর খুবই অভাব আছে। যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান খুবই কম মেলে। যাঁদের মাঝে মেলে—তাঁরা আগে আগেই চলে যান—বেশীদিন থাকেন না। একে বিড়ম্বনা বলবো নাত কী?

মৃত্যুর দু'চার দিন আগেও দেবী আমার সংগে দেখা করে এবং আমাকে বলে, আমি ভাবছি stage-এ যাব কিনা? আমি তাঁকে বলি বেশতো! খুব ভাল কথা। আমরা তোমাদের মত লোকইত stage-এ চাই। একটু চুপ করে থেকে আমায় বল্ল, না যাব না stage-এ। stage-এর বাইরে বেশ আছি। সে যে একেবারে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে তা ভাবতেও পারিনি।"

পরিচালক শৈলজানন্দ এবার উঠলেন স্বর্গত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। "আমার সংগে দেবীর পরিচয় একটু বেশী রকম ছিল। একদিন আমি 'মহৎ আশ্রমে' বসে

গান নেবার দিনে স্বাভাবিকের চেয়ে উৎফুল্ল দেখে প্রশ্ন করাতে বললেন যে, ১লা ডিসেম্বর তাঁর একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে। মিষ্টিমুখ করাবার জন্য ধরলুম সবাই। বললেন এবার যেদিন আসবেন সেদিন তার ব্যবস্থা করবেন। আর সেদিন——গান নেওয়া শেষ হ'লো। দেবী বাবুর কাজ শেষ হ'য়েছে তিনি চলে যাবেন। ভোরে কে এসে খবর দিলে, দেবীবাবু আমাকে ডাকছেন। গিয়ে দাঁড়াতে বললেন, 'কাজ শেষ হ'লো, চলি তাহ'লে।' কিন্তু বলাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক, দৃষ্টিটা কি বিচিত্র, ঠোঁটের এক কোণে অদ্ভুত হাসি। চট করে কোন কথা আমার বেরুলো না। দেবীবাবুই বললেন, খোকাবাবুকে বলে দেবেন আমি চললুম। বললুম, 'আচ্ছা বলবো'। সেই কি শেষ দেখা আর ঐ বিদায় নেওয়া? অথচ—

গাড়ীর শব্দে চমক ভাঙলো। স্টুডির সবাই তখনও তেমনি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। কি যেন ভাবছে সবাই, কারুর বা চোখের কোনটা চিক্‌চিক্‌ ক'রছে। গাড়ী থেকে নামলেন দাদামশাই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর মিহির ভট্টাচার্য; তাঁরাও শুনলেন। দাদামহাশয়ের চোখের জল বাগ্‌ মানলো না, মিহির দাঁড়িয়ে পড়লেন পাথর-মূর্তির মতো। তার সংগে সংগে আর একখানি গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার দরজা খুলে দিলে। কিন্তু কেউ নামলো না দেখে এগিয়ে গেলুম। গাড়ীর এককোণে হাতের মধ্যে মাথা রেখে বসে আছেন পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়; চোখের জল লুকোতে পারেননি; গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। বুঝলুম খবরটা তিনি আগেই পেয়েছেন।

গোলঘরে এসে বসলো সবাই জড়ো হ'য়ে। দু'একটা কথা কেউ কেউ বলার চেষ্টা ক'রলে কিন্তু অত্যন্ত অসংলগ্ন মনে হ'তে লাগলো। দেবীবাবু প্রসংগে কোন আলোচনাই জমলো না, তখনো যেন ঘটনাটা সকলের কাছে অলীক। শেষে, সেই অভাবনীয় ব্যথাতুর ঘটনাটিকেই সত্য ব'লে বিশ্বাস করার জন্যেই বোধ হয় তার সহকর্মী অন্তরঙ্গ কলাকুশলী ও শিল্পীদের একটি দল টালিগঞ্জের পথে ধীর পদে এগিয়ে চললো।

* * * * *

ভারতীয় চিত্রাকাশের একটি উজ্জ্বল তারা খসে পড়লো।

আসন্ন সমস্যা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

গল্প উপন্যাস লিখেই দিন যাচ্ছিল, অকস্মাৎ ছায়াছবি শিল্পের সংগে জড়িয়ে পড়ে তার সম্বন্ধে ভাবতে হচ্ছে। ভেবে যা বুঝেছি তাতে অন্ততঃ আমি নিঃসন্দেহ যে, বাংলার ছবিশিল্প অত্যন্ত দুর্দিনের সম্মুখীন। এখন ভেবে চিন্তে না চললে তার একেবারে বিলোপও খুব অনৈসর্গিক হবেনা। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা সকলেরই ভাববার দিন এসেছে।

যুদ্ধের বাজার নেই, বাড়তি টাকা কমে আসছে। যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা যাঁরা করেছেন, তাঁরা এখন সরে পড়তেও পারেন। কিন্তু যাঁরা সিনেমা শিল্পকে উপজীবিকা বলে গ্রহণ করেছেন তাঁদের পালিয়ে যাবার জায়গা নেই—যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে হবে। সিনেমা দর্শককেও একটু অবহিত হ'তে হবে—বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে বাঁচাতে হলে।

সমস্যার কারণ প্রথমতঃ, বঙ্গবিভাগ। পাকিস্তানে অর্ধেকের বেশী সিনেমা হাউস পড়েছে—শোনা যায় সেখানে ছবি পাঠান বিপদজনক এবং লাভজনকও নয়। দুই একজন পরিবেশক নাকি ইতি মধ্যেই অর্থ ও ছবি উভয়ই হারিয়েছেন। অতএব পশ্চিম বঙ্গের দর্শকগণ ও হাউজের উপর নির্ভর করেই বাংলা ছবিকে বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ—হিন্দি ছবির বহু প্রচলন। হিন্দি ছবির বাজার সমগ্র ভারত [পাকিস্তান বাদ] কাজেই অনেক দিকে তাদের সুবিধে। বেশী খরচ করতে পারেন তাঁরা, ছবি ভালও হয়ত করাতে পারেন। কারণ গুড় বেশী দিলেই বেশী মিষ্টি হয়। বাংলা ছবির প্রধান বাজার কলকাতায়ও হিন্দি ছবির প্রতাপ কম নয়।

তৃতীয় কারণ—বহু সমাপ্ত ছবি মুক্তি প্রতীক্ষায় কিন্তু কত দিন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে তা বলা যায় না। যেহেতু বাংলা ছবি রিলিজের যথেষ্ট হাউজ কলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতায় চারখানা ছবিমাত্র একসংগে চলতে পারে-কিন্তু সমাপ্ত ছবির সংখ্যা যথেষ্ট। যদি তাই হয়, তবে নতুন ছবি তুলে লাভ কি?

চতুর্থ কারণ—বাংলা ছবি ভাল হচ্ছে না বলে একটা অভিমত প্রায় জনপ্রিয় হ'তে চলেছে। এটা সুলক্ষণ নয়,—যাদের উপর নির্ভর করলে শিল্পের ভবিষ্যৎ তারা যদি তাকে ভাল চোখে না দেখেন তবে সে শিল্প বাঁচবে কি করে? যদি তাঁরা বাংলা ছেড়ে হিন্দি দেখতে আরম্ভ করেন, তবে বাংলা ছবি চলবে কি করে?

পঞ্চম কারণ,—শোনা যাচ্ছে আমেরিকান বড় বড় কোম্পানীগুলি ভারতীয় দেশীয় ভাষায় ছবি তুলে এদেশের বাজার দখল করবার একটা অশুভ সঙ্কল্প করেছেন। বাংলার সিনেমা শিল্পকে কচি ছেলে বললে অনেকে আপত্তি করবেন, তবে কিশোর বললে হয়ত ঠিক হবে, সে আমেরিকায় জোয়ান যুবকের আঘাতে টিকবে না। তাতে বাঙ্গালী জাতিই সুবিধাবাদী, আমেরিকান কোম্পানীতে চাকুরী করে দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে জখম করতে কুণ্ঠিত হবেন, এমন ছেলে অন্য যে দেশেই থাক অন্ততঃ বাংলায় নেই।

মোটামুটি সামনে অন্ধকার। অন্ধকার দেখে তাকালে চলবে না—মানুষের জীবনটা সংগ্রাম-সংঘাতময়। রোগ, শোক, জরা ও অকৃতকার্যতাকে জয় করে বেঁচে থাকাই বাঁচা। বাংলা ছবিকে তাই বেঁচে থাকতে হবে। বাংলার টাকা বিদেশীকে লুট করতে দেওয়া কাপুরুষতা হবে। এই প্রতিকূল অবস্থায় উঠে পড়ে লাগতে হবে, যাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকে। সেজন্যে কাগজের মারফতে প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, লেখক, প্রেক্ষাগৃহের মালিক সকলকে সুচিন্তিত ও সর্বজন অনুমোদিত জাতীয় স্বার্থ-রক্ষী একটা বিশেষ কর্মপন্থা অবলম্বন করা দরকার। স্বার্থ দেখতে গেলে তাঁরাও ডুববেন,—দেশকেও ডোবাবেন। কি করে এ শিল্পকে বাঁচানো চলে সে সম্বন্ধে আমার অক্ষম চিন্তা প্রসূত দু'চারটী কথা বলতে চাই

রেণুকা রায়
পৌষালী - সংখ্যা
রূপ-মঞ্চ : ১৩৫৪

এম, পি, প্রডাকসনের অনির্বাণ চিত্রে ছবি, জহর, নরেশ, কৃষ্ণচন্দ্র। পৌষালী : সংখ্যা : রূপ-মঞ্চ : ১৩৫৪

কারণগুলিকে যদি আমরা দূর করতে পারি তবে সমস্যার সমাধান হয়। প্রথম কারণ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে,—ছবি তুলবার খরচ এত কমাতে হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গের হাউজেই তা উঠে আরও লাভ থাকতে পারে। সিনেমা অভিনেতাগণ অবিশ্বাস্য রকমের টাকা নেন, নানা বাজে ব্যয় হয়, সেই জন্যেই খরচটা বেশী হয়। বর্ত্তমান দুর্দিনে ৭০,০০০ টাকায় ছবি শেষ করা প্রয়োজন হ'য়েছে, ৫০,০০০ হাজার হলে ভাল হয়। কিন্তু ওসব সিনেমা অভিনেতারাই এক লক্ষ টাকা চান এবং পানও। কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বাংলা ছবিতে যদি লোকসানই হয় তবে ভবিষ্যতে তাঁরা কি করবেন? অবশ্য যাঁরা যথেষ্ট উপার্জন করে নিয়েছেন, তাঁরা এখন বিদায় নিয়ে ভাগবদগীতা পাঠে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা তা পারেন নি, তাঁরা খাবেন কি? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক,-গুজব, চন্দ্রশেখর হিন্দি ও বাংলার জন্যে কয়েক লক্ষাধিক টাকা খরচ হ'য়েছে। কানন ও অশোককুমার নাকি প্রত্যেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়েছেন। বাংলা ছবির খরচ যদি কয়েক লক্ষাধিক টাকা ধরা যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তা উঠবার সম্ভাবনা নেই, তবে দু'টো মিলে হয়ত লাভ হতে পারে। যাঁরা শুধু বাংলা ছবি করবেন তাঁদের অবস্থাটা কি? আর যিনি একবার লক্ষাধিক টাকার অভিনয় করেছেন তাঁকে যদি ৫ হাজার টাকায় অভিনয় করতে বলা যায়, তবে তা তিনি করতে পারেন না—অতএব বিদায় নেওয়া ছাড়া তাঁর পথ নেই অথবা প্রযোজক রূপে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। কাজেই, খরচ কমাবার উপায় প্রথম কম টাকা দিয়ে পরে কিছু লভ্যাংশ দেওয়ার। যাঁরা খ্যাত নট নটী তাঁদের আমরা চাই, দর্শকও চায়।

পাকিস্তানের জন্য Zonal distribution-এর ব্যবস্থা করা দরকার। কোনও পরিবেশক অগ্রিম টাকা দিয়ে যদি পাকিস্তান পরিবেশনের ভার নেন তবেই এ সমস্যাটা কমে কিন্তু পাকিস্তানে কবে পরিবেশক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে, কি উঠবেইনা তা কে জানে। আর বাংলার সংগে সংগে হিন্দি সংস্করণেরও চেষ্টা করা দরকার যাতে সমগ্র ভারতে তার প্রচার হয় এবং বাজারও থাকে।

হিন্দি ছবির বহু প্রচলন অর্থ এই নয় যে, হিন্দি ছবি ভাল। প্রধান কারণ, হিন্দি সমগ্র ভারতের বোধ্য ভাষা। হিন্দি ছবি বেঁচে থাক্, বড় হোক তাতে ব'লবার কিছু নেই। কিন্তু তার চাপে বাংলা ছবি মারা যাক্ এটা আমরা চাইনা। হিন্দি ছবির পিছনে প্রচুর অর্থবান লোক আছেন, আর বাংলা ছবির পিছনে যাঁরা আছেন, তাঁরা বড়লোক একথা না বললে হয়ত ক্ষুন্ন হবেন, কিন্তু যথেষ্ট অর্থবান নন। কাজেই বাঙ্গালী হাউজের মালিকগণের উচিত লাভ লোকসান বিবেচনা না করে বাংলা ছবিকে প্রাধান্য দেওয়া। হিন্দি ছবির স্থলে বাংলা দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত একটু লোকসান হবে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই লোকসানটাই লাভের হ'য়ে দাঁড়াবে। দর্শকদেরও তাঁদের সহায়তা করা প্রয়োজন। দর্শক হয়ত ব'লবেন,—যা ভাল লাগে তাই দেখবো পয়সা খরচ করে, মালিক হয়ত ব'লবেন, যাতে লাভ বেশী সেই ছবি দেখাবো, কিন্তু এই ব্যক্তি-স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের অন্তরায় হবে।

দর্শক ও হাউজের মালিকগণের সাহায্যে তৃতীয় কারণ নিমেষে অদৃশ্য হ'তে পারে। কিন্তু চতুর্থ কারণ দূর করা বড় কঠিন। বাংলা ছবি কেন ভাল হয়না তা সংকীর্ণ স্থানে বলা সম্ভব নয়। যদি পাঠকগণের কৌতুহল হয়, বারান্তরে তা নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁরা যদি প্রশ্ন করেন, বাংলা ছবি ভাল না হ'লেও দেখতে হবে, এত মন্দ আব্দার নয়। তবে তার উত্তরে আপাততঃ এই কথাই বল'বো যে, যে কারণে মিলের লংক্লথ না প'রে খদ্দর পরা উচিত, সেই কারণেই এ আব্দার সহ্য করতে হবে।

পঞ্চম কারণ এখনো এসে দাঁড়ায় নি সামনে, তবে তাকে দূর করা কঠিন নয়। এখন আমাদের মাঝে জাতীয়তা বোধ একটু জেগেছে। আমাদের সোজা-

যুক্তি কর্তব্য বিদেশী এমনি কোন কোম্পানীর প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে বাধা দেওয়া এবং তাকে বয়কট করা। প্রয়োজন হ'লে জাতি সে একতা ও স্বজাতিপ্রীতি দেখাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস আছে।

এক কথায় ব'লতে গেলে—এখন সকলের সহযোগিতায় অল্পখরচে ভালছবি করতে হবে। ভালছবি করতে হ'লে নতুন লোক, নতুন উত্তম ও নতুন দৃষ্টিভংগির প্রয়োজন। যাঁরা প্রথমে ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষিত নন একথা বল'লে অনেকে ক্ষুব্ধ হবেন জানি, তবুও সত্যের খাতিরে অপ্রিয় বল'তে হচ্ছে। তাঁদের অনেকের কাছে Inherent রসবোধ (Asthetio sense) থাকায় তাঁরা উন্নতি করেছেন, কতক ওঠেন নি নামেনও নি। জোঁকের মত লেগে আছেন তাঁদের অক্ষমতার বোঝাকে প্রতিষ্ঠানের স্কন্ধে চাপিয়ে। তাঁদের যাবার সময় হ'য়েছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আসবার সময় হয়েছে।

তাঁরা এলে ছায়াছবি শিল্প সত্যিকার ব্যবসায় পরিণত হবে এবং সর্বসাধারণের চোখেও মর্যাদা বৃদ্ধি হবে। প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান সমস্যা থেকে বাঁচতে হলে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আনতে হবে এবং যারা এই রাজ্যে পৃথিবীর সর্বজননীকে আয়ত্ত করে। বৃহৎ ধরিত্রীকে যারা জ্ঞানে তুচ্ছ করে নির্লজ্জ দুর্নীতিকে গর্বের বস্তু করে নিয়ে কস্তুরী মৃগসম আপনার গন্ধে আপনি মুগ্ধ হ'য়ে আছেন, তাদের যেতে হবে। এখনও যদি গতানুগতিক ভাবে চলে তবে সংক্ষেপে বলতে হবে,—

"আপনি ডুবিবে তুমি ডুবাইবে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী॥"
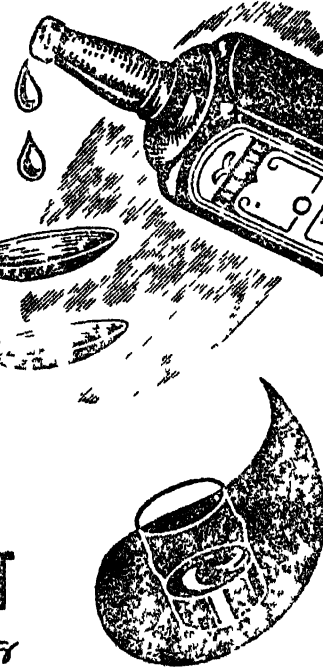
চৈনিক রঙ্গমঞ্চ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

★

নাট্যকলার প্রধানতঃ দু'টি দিক্ আছে। একটি হল কাব্যের দিক। অনেকে নাটকের কাঠামোতে রসবস্তুকে অর্পণ করে সাহিত্যের একটা রাজ্যকে এভাবে রসোজ্জ্বল করে। Byron এর ম্যানফ্রেড, এমন কি গ্যেটের (Gaethe) 'ফাউষ্ট' এই পর্য্যায়ে পড়ে, যদিও এ দু'টি নাটককে মঞ্চের উপরও প্রদর্শন করা চলে। এর অন্যদিক হ'ল অভিনয়ের,—অর্থাৎ অভিনয়ের ভিতর দিয়ে নাটকের একটা বিশিষ্ট শ্রী উদ্ঘাটন। এক্ষেত্রে নানা দেশে মঞ্চ, যবনিকা, বাদ্য ও নৃত্য প্রভৃতির সৃষ্টি করা হ'য়েছে। ফলে এর রসশ্রী গ্রহণের জন্য সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রফুল্ল করতে হয়। কাব্যাধারে অর্পিত নাটক শ্রবণ ও পাঠের ব্যাপার। অভিনয়-মূলক নাটককে গ্রহণ করতে হয়, বর্ণ, সংগীত, নৃত্য, চিত্র প্রভৃতি সকল কলালঙ্কারের সহায়তায়। এর ভিতর চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত প্রভৃতি অংগ সবসময় মুখ্য হয়নি। এযুগে ইউরোপের বিশিষ্ট ব্যবস্থায় যে সমস্ত উপকরণ এর সহিত যুক্ত করা হয়েছে—তা' সবসময় মুখ্য নয়। আধুনিক নাট্যকার বা মঞ্চপ্রযোক্তারা অনেক কিছুকে আবর্জনা হিসেবে ত্যাগও করেছেন, তাতে নাট্যশ্রী মূর্চ্ছিত বা অংগহীন হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইউরোপের ক্যাবারেট (Cabaret) থিয়েটারে দৃশ্যপটাদি সবকিছুই বর্জ্জিত হয়েছে। একখানি টেবিল ও কয়েকটা চেয়ারের সাহায্যে সমগ্র অভিনয়কে মঞ্চচিত্ত করেই এর সাফল্য সুচিত হ'য়েছে। বস্তুতঃ বাইরের পুঞ্জীভূত উপকরণের প্রগলভ প্রাচুর্য নাটক অভিনয়ের অবিচ্ছেদ্য অংগ মোটেই নয়। রঙ্গমঞ্চ ঐতিহাসিক যাদুঘর নয়।—একটা যুগকে নকল করে তার একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ জাল-ব্যাপার সৃষ্টি করা নাট্যমঞ্চের লক্ষ্য নয়। একথাকে ভাল করে না বুঝলে চৈনিক রঙ্গমঞ্চ বা প্রাচ্য যে কোন নাট্যমঞ্চের স্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব হবে।

বস্তুতঃ পাঠ করে' কিম্বা শুনে' কোন নাটকের যে রসস্বাদ হয় তা' যথার্থ নাট্যাভিনয়ের মত ব্যাপারই নয়। সংগীত ও কবিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার—যদিও দুইটিই সাহিত্যের উপদানে গ্রথিত। "যমুনে এইকি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী" এ পদ্যটি সংগীতের অবয়ব পেলে সুরের বাহনকে আশ্রয় করে একেবারে নূতন দিব্যদেহ গ্রহণ করে। তা' সুরের রূপ পেয়ে অপ্সরীর মত ঘুরে ফিরে সমগ্র রসপ্রাঙ্গনকে এক অজ্ঞাত-বেদনায় মুখরিত করে অগ্রসর হয়। এই রূপটিই সংগীত কলার দান—যমুনার প্রাচীনত্ব নিয়ে গবেষণা করা তা'র প্রাণবস্তু বা মুখ্য উদ্দেশ্যই নয়। তেমনি কোন নাট্যের অভিনয়গত রূপোদ্ঘাটনে প্রত্নতত্ত্বের গুদাম বা জীবতত্ত্বের চিড়িয়াখানা নির্মাণ মোটেই লক্ষ্য নয়। ইউরোপীয় মঞ্চে বহু আবর্জনা এসে উপস্থিত হয় নানা ঐতিহাসিক কারণে। এসমস্ত বাহুল্য প্রাচ্যজগতের নাট্যকলাকে কখনও ভারাক্রান্ত করেনি পুঞ্জীভূত মেঘাড়ম্বর নিয়ে এখানকার অভিনয়কলা স্বচ্ছ, সরল, ও উদ্দাম প্রেরণায় উচ্ছসিত হয়েছে যথার্থ পথে। অথচ আজ সকলের নিকট প্রাচ্য নাট্যাভিনয়ই 'অদ্ভুত' ও 'বিরূপ' মনে হচ্ছে! ইদানীং বহু পর্দা, বৈদ্যুতিক আলোকের কেরামতি এবং অঘটন ঘটনাপটু, বৈজ্ঞানিক কারসাজি সৃষ্টি করতে না পারলে থিয়েটার হ'ল বলে কেউ মনে করেনা। থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ইদানীং একটা ম্যাজিকের কারখানায় পরিণত হয়েছে। জলপ্রপাত, গুরুগর্জন, ঘূর্ণিকল, প্রভৃতি নানা উপাদান ক্রমশঃই এর ভিতর এসে ঢুকেছে। সুশোভন ও সুবৃহৎ যমুনাতীরের কদম্ব তরুতে যেন পরগাছায় ঘিরে রেখেছে।

এপ্রসংগে বলতে হয় আধুনিক ইউরোপ নিজের রসসৃষ্টি-ব্যাপারে দুর্বলতা ভালরকমেই বুঝেছে। এ জ্ঞান হয়েছে প্রাচ্য মঞ্চগুলির সংস্পর্শে এসে। অভিনয়কলার মূল লক্ষ্যই হল দর্শকদের ভিতর একটা

রসোদ্রেকের সৃষ্টি করা। অথচ নানা কারণে ইউরোপীয় থিয়েটার একটা সুদূরস্থিত 'বক্সমঞ্চ' রচনা করে দর্শক ও অভিনেতাদের ভিতর একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এই বাক্সমঞ্চের ভিতরকার আলো, আসবাব ও বর্ণকেলি একটা অস্বাভাবিক জগৎ সৃষ্টি করতে বাধ্য। এর ভিতর দর্শকদের কোন স্থান নেই। এই বিরোধ ও বৈপরীত্য রসোদ্রেকে বাধা সৃষ্টি করে। অভিনেতাদের সহিত দর্শকদের "Intimacy" যা' অভিনয়ের প্রাণবস্তু, তাই এক্ষেত্রে ছিন্নমস্তা হয়ে যায়। প্রচুরভাবে দর্শকগণের সহিত যে অভিনেতাদের সংস্পর্শ ও সংযোগ প্রয়োজন একথা ইউরোপ ইদানীং বহু সাধনায় উপলব্ধি করেছে। এজন্য রুশিয়ায় Kerensky থিয়েটারে অভিনেতাগণ এই দূরত্ব অন্তর্হিত করতে বার বার দর্শকদেব ভিতর সুযোগ নিয়ে ছুটে এসে পড়ত—ফলে Auditorium ও হয়ে পড়ত থিয়েটারের অংশ বিশেষ।

গোড়াতেই এইটুকু ভূমিকা না করে যদি বলা হয় যে, চৈনিক থিয়েটারে প্রায়ই কোন মঞ্চেরই দরকার হয়না তবে কেউ যেন মনে না করেন চীন দেশে নাট্যকলারই একটা উচ্চ ধারণা নেই। পিকিন, ক্যানটন (Canton) এবং শুধু কয়েকটা বন্দর ছাড়া অর্থাৎ যেখানে ইউরোপীয় সঙ্কলন রুঢ়ভাবে চৈনিক চিন্তাকে আহত করেছে—আর কোথাও চীনেদের স্থায়ী মঞ্চ নেই বললেই চলে। এসব মঞ্চের আসবাব ও আয়োজন এত সামান্য যে সকলেরই বিস্ময় উৎপন্ন হ'তে বাধ্য। অথচ এদের পরিকল্পনা এত গভীর ও ব্যাপক যে, তা যেন সমগ্র ইউরোপীয় সাধনাকে পরিহাস করছে মনে হয়। যথাস্থানে সে আলোচনা করা যাবে। আমাদের ভিতর অসামান্যের উদ্বোধন কি করে হয় তা চৈনিক নাট্যকলার রসরূপ বিশ্লেষণে সহজেই চোখে পড়বে। এসব যায়গার চৈনিক স্থায়ীমঞ্চ কতকটা আন্তর্জাতিক প্রেরণাই অবশ্যম্ভাবী করেছে।

সাধারণতঃ চৈনিক-মঞ্চ অস্থায়ীভাবে বাঁশের ও কাষ্ঠফলকাদির সাহায্যেই তৈরী হয়। কোন ধনী ব্যক্তির জন্মদিনে বা কোন দেবতার উৎসবে সচরাচর চৈনিক অভিনয় হয়ে থাকে। এসব অভিনয়ে সর্বসাধারণের বিনা ব্যয়ে প্রবেশাধিকার আছে। সকলেরই আমোদপ্রমোদ ও মনোরঞ্জনের জন্য এসব থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়। দেবতার উৎসবে অভিনয় হ'লে অনেক সময় জনসাধারণের চাঁদার সাহায্যে তার ব্যবস্থা হয়—সেজন্য প্রবেশ মূল্য কিছুই থাকেনা। কখনও বা মন্দিরাধ্যক্ষ সে ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রসবস্তুকে একটা পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা উচ্চশ্রেণীর প্রয়াস নয়—তাতে বিচারবুদ্ধিও বিপর্যস্ত হয়। রসচর্চা ছাড়া ছুতো করে এর ভিতর সামাজিক মেলামেশার একটা বাতায়ন খোলা প্রাচ্য অভিনয়ের উদ্দেশ্য নয়। প্রচুর বাঁশ, কাষ্ঠফলক এবং মাদুর প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণতঃ কোন বৃক্ষতলেই একটা সাময়িক অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী হয়; অথবা ধনীব্যক্তি কর্তৃক আহূত হলে নিজের গৃহের সামনের রাস্তার উপরই এরকম একটা আস্তানা করা হয়ে থাকে। মন্দিরের সামনে যদি প্রাংগন থাকে তা'তেও এরকম একটা অভিনয়ের জন্য প্রেক্ষাভূমি রচনা করা হয়। দেখা যাচ্ছে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ও সরল। কিন্তু এর ভিতর যে রসসৃষ্টি হয় জগতে তার তুলনা পাওয়া যায়না। ইউরোপীয় দ্রষ্টারাই স্বীকার করেন, চৈনিক অভিনেতার অভিনয় জগতে অপরাজেয়। এর ভিতর যে দুনিয়া নেই তা' সে অভিনয়ের মায়াদণ্ডেই সৃষ্টি করে। W. Ridgeway বলেছেন, "The Chinese actors are notoriously among the finest in the world"। এ প্রশংসা সামান্য নয়। আধুনিকতম আলোচকেরাও চৈনিক অভিনয়ের ভিতর জটিল প্রাচ্য মনস্তত্ত্বের হেরফের এবং গভীর সংকেত ও রূপকের বাহুল্যে আচ্ছন্ন গতিছন্দ দেখে' অবাক্ হয়েছে।

গোড়াতেই মঞ্চের কল্পনা বিষয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন। তা' না হ'লে প্রাচ্য নাট্যকলার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং প্রাপিতব্য আদর্শ কি তা' বোঝা দুষ্কর

হবে। অস্থায়ী মঞ্চসমূহের কল্পনায় দেখা যায়, যা'তে দর্শকেরা অভিনয়ক্ষেত্রকে ঘিরে বসতে পারে তারই একটা পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। চুরি করে আড়ালে ঢুকে পড়া বা অদৃশ্য অঞ্চল থেকে পরীর মত হঠাৎ আজগবীভাবে উপস্থিত হওয়ার ভিতরে যে প্রবঞ্চনা লুকানো আছে ইউরোপীয় মঞ্চে, তা' এতে নেই। যা কিছু চৈনিক মঞ্চে উপস্থিত করা হয় তা' সকলেরই সাম্‌নে। ইউরোপীয় আর্টের লক্ষ্য ছিল "Illusion" বা ভ্রান্তি উৎপন্ন করা নানা রকমের নকল ও কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে। চৈনিক মঞ্চে এরকম প্রতারণা নেই। এমন কি যদি কোন অভিনেতাকে অশ্বারোহী বীর হিসাবে উপস্থিত করতে হয়, অনেক সময় তাকে একটা দীর্ঘ দণ্ডের উপর উপবিষ্ট হয়ে মঞ্চটিকে ঘুরে আসতে দেখা যায়। তা'তে ঘোড়ায় চড়া অবস্থানটি প্রমাণিত হয়। এতে কোন রকম হাস্যোদ্রেক হয়না বা বিদ্রূপের সূচনা হয়না। কারণ ঘোড়ায় চড়া ব্যাপারটিতে আছে একটা সাধারণ অবস্থার প্রতিপাদন মাত্র। তা'তে কোন সূক্ষ্ম অভিনয়-রস উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যই থাকেনা। কাজেই অশ্বারোহীকে একটা জীবন্ত অশ্ব নিয়ে মঞ্চের উপর আনার প্রয়োজনই হয়না। তা' দরকার হয় সার্কাসে।

বলা হয়েছে অস্থায়ী মঞ্চ হয় মন্দিরের সামনের মুক্ত প্রাঙ্গনে, প্রকাশ্য রাস্তার মাঝখানে কিম্বা কোন বড় গাছের নীচে গাছের উভয় দিকে। এতে "Intimacy" প্রতিষ্ঠিত হয় গাঢ়ভাবে অর্থাৎ দর্শক ও অভিনেতার মাঝখানটা কোন কৃত্রিম ব্যবধান বা দূরত্ব এ ব্যবস্থায় সৃষ্ট হয়না। চৈনিকদের স্থায়ীমঞ্চ পরিকল্পনাকেও এজন্য ভাল করে লক্ষ্য করতে হয়। পিকিন, ক্যানটন প্রভৃতি নগরে নাট্যগুলির ভংগী হচ্ছে কলকাতার বিলিতি অনুকরণে রচিত Box-stage এর মত নয়। মঞ্চ-গুলি একেবারে দর্শকদের আসনের ভিতরে পর্যন্ত বিস্তৃত করে রচিত হয় যাতে করে মঞ্চের তিন দিক ঘিরে লোক বসতে পারে। মঞ্চের সামনে থাকে Pit, তা'তে থাকে অনেকগুলি বেঞ্চ। বেঞ্চগুলির সামনে এক একটি টেবিল। একটা balcony-ও থাকে বিভক্ত ভাবে, যা'তে দর্শকদের জন্য স্বতন্ত্র আসন রচিত হয়ে থাকে। এই রকমের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থায় সমগ্র ইউরোপীয় আদর্শই খণ্ডিত হয় পূর্ণভাবে। কারণ, দর্শক ও অভিনেতার ভিতরকার দূরত্ব এই কৌশলে একেবারেই দূর করা হয়। এ না হ'লে রসসৃষ্টি করা কঠিন ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা'তে হয় একটানা অলীক তামাসা বা একটা অসংলগ্ন দৃশ্য রচনা মাত্র। এরকম ব্যাপারের সংগে রসসূত্র সৃষ্টিও অবলম্বন করে' দর্শককে যুক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা না হ'লে একটা কাণ্ড সৃষ্টি হয় সন্দেহ নেই—তবে তা নাট্য-কলা নয়। এদেশের যাত্রাগানের আসর রচনায়ও এই দূরত্ব নির্বাসিত হয়ে থাকে এবং দর্শকেরা অভিনেতা-দের সংস্পর্শে ভাবাপ্লুত হয়ে আত্মহারা হয়ে যায়।

চৈনিক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে পর্দার তৈরী কোন উদ্ভট ভোজের বাজি নেই। অরণ্যকে পর্দা টেনে রাজপ্রাসাদে পরিণত করার হাস্যকর দুশ্চেষ্টাও নেই। চৈনিক নাট্যে দৃশ্যপট নেই, পর্দা নেই এবং আসবাবের বাহুল্যও নেই। এর পেছনে দু'টি দরজা থাকে। একটার ভিতর হ'তে অভিনেতারা মঞ্চের উপর আসে অন্যটি দিয়ে তারা ভিতরে চলে যায়। বলা হয়েছে—প্রবেশের জন্য সচরাচর কোন মূল্য দিতে হয়না—তবে সকলকেই জলযোগের জন্য কিছু পয়সা দিতে হয়. চীনদেশে সাধারণতঃ মুক্তবায়ুতেই (Open air) অভিনয় হয় অগণ্য চৈনিক জনতার চিত্তবিনোদনের জন্য। কোটি কোটি লোকের রসসুধা যেখানে মেটাতে হয় সেখানে ক্ষুদ্র বাঁশের তৈরী মঞ্চে কুলোয় না। তা'কে ব্যাপক ও বিরাট করে তুলতে হয়—অন্য উপায়ে। চীনদেশ স্মরণাতীত কাল হ'তে তা' করে' এসেছে।

বস্তুত: চীনদেশের নাট্যকলার সূত্রপাত হয় ধর্মাচারমূলক আচার অর্চনা হতে। কনফুসিয়দের যুগে এরকমের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে রাজকীয় আদেশে নাট্যপ্রদর্শনের একটা ব্যবস্থা হয় অন্য আকারে। সম্রাট Hsuar Tsuneg একটা নাট্যপরি-

ষদের প্রতিষ্ঠা করেন [৭১২ খৃঃ—৭৫৬ খৃঃ] এই পরিষদের নাম দেওয়া হয় Pear Tree Garden। এ পরিষদে তরুণদের গীত, নৃত্য ও অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজকীয় সুঙ্গবংশের শেষের দিকে—চৈনিক নাট্যকলার আর একটি অভ্যুদয়ের যুগ আসে। এ সময় মঙ্গোলবংশ চীনদেশের প্রভুত্ব গ্রহণ করে। এদের বংশধরগণ ব্যবহারে ও আচারে চৈনিকই হয়ে পড়ে। সবচেয়ে প্রাচীন অভিনীত নাটকের নাম ছিল 'পশ্চিম তাঁবুর গল্প'। তারপর বহুনাটক রচিত হয়। Yuan বংশে ৮৫ জন নাট্যকার প্রায় ৫৬৩ টি নাটক লেখেন। হঠাৎ এরকম একটা সমুত্থান যুগের আবির্ভাব একটা বিস্ময়ের বিষয় ছিল সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ মিঙ্গ ও ম্যাঞ্চুবংশের আমলেও নাট্যকলা অবনতির দিকে যায়নি।

আধুনিক চৈনিক নাটকের রচনায় সাহিত্যিক ঐশ্বর্য তেমন নেই একথা স্বীকার করতে হয়। সাধারণতঃ চীনে নাটকে চারটি অঙ্ক থাকে। তা'তে কখনও বা একটি prologue বা ভূমিকাও থাকে কখনও বা থাকেনা। সমগ্র অভিনয়কালে একটা orchestra-র বাদ্য-ঝঙ্কার চলতে থাকে যন্ত্রের ভিতর-তাতে থাকে 'Gong' Drum ও Cymbab। এসব ছাড়া অন্য বাদ্য যন্ত্রও থাকে। অভিনেতারা অতি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে থাকে কাজেই শোনবার কোন কষ্ট হয়না দর্শকদের। এর ভিতর কখনও বা উচ্চস্বরে গীতও হতে থাকে কোন বিশেষ অংশকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য যা'তে করে' নাট্যরস ঘনীভূত হয়। কখনও বা উচ্চনাতি-মূলক আবৃত্তিকে পরিস্ফুট করবার জন্য যুক্ত সংগীতেরও অবতারণা করা হয়। তা ছাড়া এসব নাটকে একজন নির্দিষ্ট অভিনেতা থাকে যে মাঝে মাঝে হঠাৎ সংগীতের দ্বারা সমগ্র নাটককে অলংকৃত করতে অগ্রসর হয়। এর কাজ অনেকটা Chorus এর মত। একঘেয়ে বক্তৃতার ধারাকে রুদ্ধ করে তা যেন হঠাৎ একটা নূতন বাণীর মত উপস্থিত হয়ে সকলের চিত্তবিনোদন করে। বলা প্রয়োজন এরকম ব্যাপার অর্থাৎ Chorus এর মত একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আলঙ্কারিক অনুষ্ঠান প্রাচীন গ্রীসে যেমন ছিল তেমনি ভারতেও ছিল। ইদানীং এদেশের যাত্রাগানের অধিকারী এরকমের ভূমিকার স্থান পূরণ করে।

চীন দেশের নাটককে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ঐ তিনটি ভাগই ব্যক্তি ও জাতি জীবনের তিনটা দিককে মুকুরিত করে সকলের চিত্তবিনোদন করে। প্রথম হোল যোদ্ধৃদের বিষয় নিয়ে লিখিত নাটক—এসবের উপাদান চীনদেশের ইতিহাস হতেই গৃহীত হয়। এসব নাটকে বীর রসের চর্চা হয়। সম্রাট, বিখ্যাত সেনাপতি, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের চরিত্র নিয়ে এসব নাটক রচিত হয়। মঞ্চের উপর প্রচুরভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের অভিনয় হয়। তাতে, শারীরিক শক্তি ও ব্যায়ামের বহু নিদর্শন উপস্থিত করে' দর্শকদের বিচলিত করা হয়। বস্তুত রঙ্গমঞ্চকে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধমঞ্চে পর্যবসিত করে অভিনেতারা সুকৌশলে সকলের তুষ্টি বিধান করে। অসামরিক (civil)নাটক গুলিতে দৈনন্দিন জীবনের ধারা প্রতিফলিত করা হয়। পারিবারিক বিচিত্র ঘটনা গুলি হাসি ঠাট্টা ও কৌতুকের সমভাবে অভিনীত হয় এরকমের নাটকের ভিতর দিয়ে। তা ছাড়া নানা ষড়যন্ত্র ও জুয়াচুরির দৃশ্যও প্রচুর থাকে। হাস্যরসাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক নাটকও প্রচুর অভিনীত হয়। চৈনিক চিত্ত প্রাচীন হলেও সরল। অপরদিকে অনেক সময় অশ্লীলতার অবতারণা করেও উপস্থিত জনতাকে তৃপ্ত করা হয়। প্রাচ্যাঞ্চলে এসব উপস্থিত করাকে অনেক সময় আপত্তিকর ব্যাপার মনে করা হয়না।

তৃতীয় শ্রেণীর নাটক আংশিকভাবে ধর্মের ব্যাপারে পূর্ণ থাকে। তাতে ত্যায়োদের (Tao) রহস্যবাদ ও ভোজবাজির ব্যাপার যেমন থাকে তেমনি হাসিঠাট্টার ব্যাপারও থাকে প্রচুর। কাজেই বিষয়ের বৈচিত্র্য চৈনিক নাটকে আছে প্রচুর। এই বৈচিত্র্যকে সুষ্ঠু অভিনয়ের ভিতর দিয়ে উপস্থিত করার অধিকার চৈনিক নাট্যকারেরা ভাল রকমে পেয়েছে। বলা হয়েছে চৈনিক থিয়েটারে মঞ্চের উপর দৃশ্যপটের সাহায্যে কোন পরিবর্তন ঘটান হয়না। তা ছাড়া যে সব আসবাব ও উপকরণ ব্যবহৃত হয় তাদেরও কোন বিশেষ প্রাধান্য কেউ স্বীকার করেনা। এমনকি শুধু

নাটকখানিরও নাটক হিসেবে চৈনিক রঙ্গমঞ্চে মূল্য অতি সামান্য। নাট্যকলার আসল মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে অভিনয়—এসব আসবাব বা উপকরণের প্রাচুর্য নয়। এজন্য কোন ইউরোপীয় সমজদার সহজ ভাবেই বলেছেন, "It is the art of the actor alone that the Chinese Theatre is represented"। এ কথাটি ভাল করে' উপলব্ধি করা দরকার। সাহিত্যে রচিত নাটক একটা নূতন দেহই পরিগ্রহ করে, যখন তা' অভিনেতাদের বাণীর ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। চৈনিক নাটকের ভংগী ও কায়দা প্রাচীন আচার রীতির রূপে (Convention) বদ্ধ। নানা রকমের ঐশ্বর্যসূচক সজ্জা ও জমকাল পোষাকে যখন অভিনেতা দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তা'কে চেনা মুস্কিল হয়ে পড়ে। মনে হয় সে যেন একটা নূতন জয়লাভ করে উপস্থিত হয়েছে। অথচ এর ভিতরও যে একটা চলন্ত রীতির নাগপাশে বদ্ধ—সে যা' তা' বল'তে পারেনা বা যে কোন ভংগীতে চলতে পারেনা। প্রত্যেক বাক্যের বা গতির সাংকেতিক অর্থ আছে—তা' হ'তে বিচ্যুত হওয়া চলেনা। তবুও সে এরই ভিতর এরূপ বিস্ময়জনক প্রকাশকারুতার সূচনা করে যে, তা'তে দর্শক অভিভূত হয়ে পড়ে। এজন্য G. A. Amberg বলেছেন, "Yet with all limitations the histrionic art develops consciously and perposefully to still unequalled hight of final for realised expressiveness and utmost artistic completeness"। এর চাইতে অধিক প্রশংসা ভাষার সাহায্যে করা যায় না।

বস্তুতঃ অনেক ব্যাপার প্রাচ্য ষ্টেজে সহজভাবে গৃহীত হয় যা' অন্যত্র হাস্যজনক মনে হ'তে পারে। নাটকের কুশীলবেরা অর্থাৎ পাত্রপাত্রীগণ গোড়াতেই নিজেদের বিবরণ নিজেরাই দর্শকদের দিয়ে অভিনয় সুরু করে। সে কে, কেন এসেছে বা কোথা যাবে এসব বিবরণ দিয়ে অগ্রসর হয়। জাপানেও এরকম আত্ম-বর্ণনার প্রথা আছে—তা' কেউ দোষাবহ মনে করেনা। কারণ, কাগজ ছাপিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করার ব্যবস্থা এসব দেশে নেই। সব কিছুই নাটককে কেন্দ্র করে' উপস্থাপিত করতে হবে। উড়ন্ত বিজ্ঞাপন বা খবরের কাগজের ভূমিকার এক্ষেত্রে কোন সত্যিকার অধিকার নেই। জাপানী নাটকের আদর্শও ভারত ও চীনদেশের প্রভাবে কোরিয়ায় প্রথম কল্পিত হয়—তারপর তা জাপানে যায়। এজন্য চৈনিক নাট্যকলা ও জাপানী নাট্যকলায় অনেক সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ প্রাচ্য নাটকের ঐক্য অন্য-কোথাও কল্পিত বা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনা।

অথচ চৈনিক অভিনয়ের এসব শিরোমণিদের সামাজিক মর্যাদা মোটেই নেই। অভিনেতাদের জীবন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। মঙ্গোল ও মিঙ্গ সম্রাটদের আমলে নারীদের অভিনেত্রী রূপে মঞ্চে উপস্থিত হ'তে কোন বাধা জন্মেনি। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্রাট Chiu Leung এই প্রথা বন্ধ করেছেন। আধুনিক কালে এই বাধা অন্তর্হিত হয়েছে—সম্প্রতি অভিনেত্রীরা স্বচ্ছন্দে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হতে পারেন। কিন্তু অভিনেত্রীগণের সামাজিক জীবন বহুপরিমাণে ঘৃণ্য বিবেচিত হয়। গরীব মাতাপিতা হ'তে ভাড়া বা ক্রয় করে ছেলে বয়েস থেকে অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এ শিক্ষা অতি কঠিন ও শরীরের ও কণ্ঠের ক্ষমতাকে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত করা হয়। অন্ততঃ দুইশত পার্ট এক একজনকে মুখস্থ করতে হয় যাতে যে কোন মুহূর্তে rehearsal ছাড়া যে কোন নাটক তারা অভিনয় করতে পারে। সমাজে অভিনেতাদের পতিত মনে করা হয় এবং তিন পুরুষ পর্যন্ত এদের বংশধরেরা কোন প্রকাশ্য পরীক্ষায় অন্যের সংগে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে না। কাজেই চৈনিক রংগমঞ্চের এই উত্তুংগ শ্রীর পশ্চাতে আছে এই কৃষ্ণ অভিশাপ যা' হ'তে কোন আর্টিষ্ট মুক্তি পেতে পারেনা। গরীব পিতামাতার পরিত্যক্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে নটনটীরূপে এরূপ উৎকর্ষ গান করা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। তাদের সাধনাও অসাধারণ এবং সিদ্ধিও অতুলনীয়। রাতারাতি কেউ অভিনয়ে সাফল্যের দুরাশা করতে পারে না।

চৈনিক নাট্য ওদেশের খোস মেজাজ রক্ষার কাজেও সহায় হয়। বিরাট ভোজের পরে সচরাচর একটা অভিনয়-সম্প্রদায় কর্তৃক সকলের চিত্তবিনোদন একটা প্রচলিত প্রথা। আহারের শেষে বহু নাটকের তালিকার ভিতর হতে আটটি দশটি নাটক নির্বাচিত হলে সেগুলিকে অভিনয়ের আয়োজন সুরু হয়। এসময় নারীরা তা সূক্ষ্ম পর্দার ভিতরে বসে পেছনকার গ্যালারী হ'তে দেখবার সুযোগ পায়।

একটি থিয়েট্রিকাল কোম্পানীতে চীনদেশে প্রায় ৫৬টি লোক থাকে। এরা নানা ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে। এদের ভিতর শ্রেণী বিভাগ আছে। এক শ্রেণীর অভিনেতারা অন্য শ্রেণীর পার্ট গ্রহণ করেনা। এদের ভিতর চারটি শ্রেণীই প্রধান। এদের পরিষ্কারভাবে গণ্ডী দিয়ে পৃথক করে' দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীকে বলা হয় 'শেঙ্গ' (Sheng)—সামরিক 'শেঙ্গ' হচ্ছে নায়ক স্থানীয় সেনাপতি বা সম্রাট এবং অসামরিক 'শেঙ্গ' হচ্ছে কোন বড় রাজকর্মচারী বা বিশিষ্ট ভদ্র-লোক। দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলা হয় "চিঙ্গ"। এরা হল Villain—নায়কের প্রতিরোধী ও বিরুদ্ধ শক্তির দুষমন স্থানীয়। "ট্যান" বল্‌তে যে নারীর শ্রেণী বোঝায় তাতে ভদ্র ও অভদ্র উভয় সম্প্রদায় থাকে। তারপরের শ্রেণীতে আছে 'ভাঁড়'। এর কাজ হচ্ছে বদ ইয়ারকি করা বা নানাভাবে হাস্যোদ্রেক করা। এ নানা শ্রেণীর অভিনেতারা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টভাবে শিক্ষিত হয়। একের অভিনয় অন্যে করেনা। এজন্য অভিনয়ে এদের কৃতিত্ব ও সফলতা হয় একেবারে নিখুঁত। চীনদেশের অভিনেত্রীদের ভিতর যারা প্রচুর দক্ষ তারাই সবচেয়ে অধিক বেতন পেয়ে থাকে। কিন্তু পেলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ এসব নারীর ভাগ্যে সম্ভব হয়না।

আধুনিক বিশ্লেষণপন্থী ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চের আদর্শে ভারতের নাট্যরূপ কল্পিত হয়ে সমগ্র কলালক্ষ্মী ছিন্নমস্তা হয়েছেন। প্রাচ্য নাট্যকলার অখণ্ড শ্রী সম্ভব হয়েছিল শুধু এজন্য যে, তাতে অবাস্তর আবর্জনা বর্জিত হ'ত। ইলেকট্রিক আলোর ভেলকি উপস্থিত করলে নাট্যলক্ষ্মী প্রদীপ্ত হয়ে উঠেনা। প্রচুর আসবাবও অকল্পনীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বাহুল্য সৃষ্টি করে, এদেবীর সকল পূজা সম্ভব হয়না। বিজ্ঞানকে গরুড়ের মত বাহন করে' অগ্রসর হলেও নাট্যকলার রূপশ্রী উদ্‌ঘাটিত হয় না। অথচ অভিনয়কে গৌণ করে ইউরোপে Revolving stage, Sinking stage, Symbolical stage প্রভৃতি অসংখ্য ফন্দীর আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে লোককে চমৎকৃত করতে। আবার এ যুগের থিয়েটারও হয়েছে বহুশীর্ষা। তাতে বহুলোকের নেতৃত্ব সুস্পষ্ট। একটি মঞ্চের সহিত যুক্ত আছে বহু নেতা অর্থাৎ তার মালিক, ব্যবসায়ী ম্যানেজার, মঞ্চ পরিচালক, আলোকপরিচালক, যন্ত্রের ম্যানেজার, বাদক প্রভৃতি বহু পরিচালক। এদের ভিতর ঐক্যসংস্থাপন অসম্ভব বল্‌তে হয়। এর ভিতর-কার বাহুল্য বর্জন, এজন্য এক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য। এ বাহুল্য বর্জন কি করে' সফল ভাবে সম্ভব হয় তা, দেখতে হলে চৈনিক থিয়েটারকে বিচার করতে হয়। গোড়াতেই অপরিবর্তনীয় চৈনিক মঞ্চের কথা বলা হয়েছে। বার বার মঞ্চকে ভোজবাজির মত পর্দা ফেলে রূপান্তরিত করার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়না। নদীতটে কথোপকথনের দৃশ্য থাকলে একটা আস্ত নদী পেছন দিকে চিত্রপটে এঁকে না দিলেও তার অভাব কেউ অনুভব করেনা। অভিনেতার ইংগীতে, আভাসে সংকেতে ও ব্যবহারে সত্যই নদী তীরের প্রতিমা জেগে উঠে। কীর্তনীয়ারা যমুনা পুলিনে রাধাকৃষ্ণের লীলা ব্যাখ্যার সময় কথার ভিতর দিয়েই এ দৃশ্যকে জীবন্ত করে তুলতে পারে, একথা এদেশের লোকের জানা আছে। শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিহারে কীর্তনীয়ারা শুধু অভিনয় ও বাক্যপ্রপঞ্চের সাহায্যে যে নদী-চিত্র উপস্থিত করে, একটা কাপড়ের উপর রং ফলিয়ে তাকে পাওয়া যায়না। এজন্য চীনদেশ এ শ্রেণীর বহু উপাদান যথাযথভাবেই প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। তা ছাড়া মঞ্চটিকে বাক্সের মত করে একটা প্রতারণার ভাণ্ডরূপে ব্যবহার করা হয়না চীনদেশে। কারণ, বাদকেরা বাদ্যযন্ত্র সহ তার উপরেই উপবিষ্ট হয়। সামনের দিকে

অন্ধকারে বা ভিতরে কোথায় লুক্কায়িত ভাবে বাগুঝংকার করা বাহাদুরী বলে মনে করেনা। আশে পাশে বাদ-কেরা থাকে। বাহকেরা স্পষ্টভাবে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি বহন করে নিয়ে এনে নগরের প্রাচীর, গৃহাদি, অরণ্য এমনকি পাহাড়ও সাংকেতিক ভাবে তৈরী করে সরে পড়ে। এতে অস্বাভাবিক কিছুই ঠেকেনা-এসব নাট্যকলার গৌণ ব্যাপার—মুখ্য বস্তু নয়। একটা প্রকাণ্ড পাহাড়কে অবতারণা করতে হলে কোন বিরাট গন্ধমাদন পর্বতের আমদানী করা একটা বাহুল্য ব্যাপার মাত্র। এসব নিয়ে বিব্রত হলে নাটকীয় রস হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। একটা কৃত্রিম নগর নির্মাণ বা অতিকায় দুর্গনির্মাণ অভিনয়কলা ক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয়। বলা হয়েছে, একটা কাষ্ঠখণ্ডের দু'দিকে পা ফেলে সমগ্র মঞ্চ ঘুরে এসে অভিনেতা প্রমাণ করে যে, সে অশ্বারোহনের কাজ শেষ করেছে। এসবকে Symbolical acting বলতে হয়। বস্তুতঃ চৈনিক নাটকের পোষাক পরিচ্ছদ, অংগভংগী, উপকরণ ও আবেষ্টন এরকমের রূপকে পরিপূর্ণ। এসব ইউরো-পীয়েরা বা ভিন্ন দেশীয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেনা।

কাজেই সমগ্র দিক দিয়ে প্রাচ্য সৃষ্টিকে অনুভব করার পথ সহজ হয়না। এরকমের সৃষ্টি যে সব আবেষ্টনের ভিতর কল্পিত তা'তে বহুভাবে প্রবঞ্চনামূলক উপ-স্থাপনের কোন দোহাই নেই। এজন্য রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনেতাকে যদি মৃতের অভিনয় করতে হয় তবে তাকে একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকবার প্রয়োজন হয়না। কিছুকাল পরে মুখভংগী পরিবর্তন করে' নিজেই নিজের বাহক সেজে নিজের মৃতদেহ বহন করার অভিনয় করে অভিনেতা মঞ্চ হ'তে অদৃশ্য হয়। এতে অস্বাভাবিক কিছু হয় একথা কেউ কল্পনাই করেনা। আবার কোন চৈনিক অভিনেতার আবৃত্তির সময় স্বরভঙ্গ হ'লে যে কোন পার্শ্ববর্তী পরিচারক হ'তে এক পেয়ালা চা নিয়ে পান করাতে কিছুমাত্র সংকোচ করেনা এবং তা'তে রসভংগ কোন কালে ঘটেনা। এদেশে যাত্রাগানে কৃষ্ণের অভিনেতাও কোন সুযোগে তামাক পান করতে ইতঃস্তত করেনা।

এরকমের বহু ইংগীত রঙ্গমঞ্চে অকুণ্ঠভাবে প্রচলিত আছে। একটা দৃশ্যের পরিবর্তন সূচিত হয় কোন বিশেষ কার্যসূচীর সাহায্যে। কিম্বা সব অভিনেতারে একসংগে সারিবদ্ধ হয়ে একবার মঞ্চকে প্রদক্ষিণ করে' এসে এই পরিবর্তন সূচিত করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে দৃশ্যপট, পর্দা, আলোর খেলা প্রভৃতি ছাড়াও অভিনয় সম্পন্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দর্শকদের ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তির মর্যাদা দান করতে হয়। উভয় দিক হ'তে অগ্রসর হ'লেই নাট্যলক্ষ্মী বিম্বিত হয়ে উঠেন, মঞ্চের বাহুল্য বর্জিত আধারে। প্রাচ্য জনতা এক্ষেত্রে প্রচুর ভাবে অগ্রসর হ'তে চিরকালই যে প্রস্তুত তা ভারতবর্ষেও দেখা যায়। এখানকার যাত্রাগান, কীর্তন, গীতি বা কথকতা অঘটন ঘটন করতে পারে পলকে। কোন আসবাবপত্র ছাড়া অলংকার ঐশ্বর্য উপস্থিত করা ভারতীয় নটনটীর পক্ষে চিরকালই সম্ভব ছিল। সে জন্য বৈজ্ঞানিক সম্ভার, কলকব্জা প্রভৃতি কোন কালেই প্রয়োজন হয়নি। ভারতীয় ও চৈনিক রসশ্রীচর্চার ভিতর এক অসামান্য সমানভূমি সহজেই চোখে পড়ে। যা চীনদেশে উৎকট বাহুল্যে ভরপুর ভারতের আর্য সম্পর্কতাকে সারসংকর্ষণের সহায্যে সংযত ও সীমাবদ্ধ করেছে। রসবিচারের মুখ্য প্রাংগনে ভারতের রচনা চীন হ'তেও সূক্ষ্ম ও দূরগামী ঐশ্বর্যে পূর্ণ। কিন্তু ভারতকে যথার্থভাবে বিচার করতে হলেও একবার চীনের সাধনা ও আদর্শকে লক্ষ্য করতে হয়। কারণ, চীনে ইউরোপীয় প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়নি।

চীনের থিয়েটার আলোচনার সময়েও বিচার করতে হয়। সাধারণত দ্বিপ্রহরে চৈনিক অভিনয় সুরু হয় এবং তা চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে। তা'তে কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনা। অনেকে এটাকে একটা দোষের ব্যাপার মনে করে। কিন্তু বস্তুতঃ এর ভিতর ততটা ব্যাপকতা নেই। আধুনিক চৈনিক নাটকের অভিনয় এক ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হয়না।

বস্তুতঃ পরপর অনেকগুলি নাটক একসংগে অভিনীত হয় বলেই অভিনয়কে দীর্ঘ মনে হয়। এজন্য অনেকে চৈনিক অভিনয়কে বিদ্রূপ করে। বস্তুতঃ চীনের নাটক কল্পনায় "Interval" বলে কোন ব্যাপার নেই। বস্তুতঃ এটা রসসৃষ্টির অন্তরায় বলে ইউরোপীয় মঞ্চে ক্রমশঃ বর্জিত হচ্ছে। নাটকীয় ঘটনার পরম্পর উদ্ঘাটনে মাঝখানটা হঠাৎ সব বন্ধ করে Interval এর খাতিরে যবনিকাপাত করা একটা বিরাট রসভংগের ব্যাপার। এদেশে এখনও তা' চলছে। হঠাৎ এক মুহূর্তে 'পান তামাক চাই' মস্তকোলাহল সমগ্র রঙ্গগৃহকে প্রতিধ্বনিত করে এক্ষেত্রে একটা উৎকট পরিহাস সৃষ্টি করে। এটা অত্যন্ত কদর্য প্রথা। ইউরোপে Herr Savits এজন্য non stop Shakespeare-এর অভিনয় করে সকলের চিত্ত রঞ্জন করেছে অখণ্ডভাবে। এদেশে রবীন্দ্রনাথ non-stop "বিসর্জনের" অভিনয় করেছেন। এর ভিতর কোন "Interval" ঢোকবার অবকাশ ঘটেনি। কাজেই দেখা যাবে চৈনিক আদর্শ নাট্যকলার মূলসূত্রকে কখনও হস্তচ্যুত করেনি। ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে এখনও অহল্যা পাষাণীর মত মৃত ও আত্মবিস্মৃত।

উপন্যাস

(১০)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

কাটাখালি নদীর পূবপাড়ে জলিরপাড় অবস্থিত। নদীর ঠিক গা ঘেসে মিশনারীদের গীর্জাটা অনেকটা স্থান দখল করে আছে। বলতে গেলে ছোট খাটো একটা মফঃস্বল সহর। অথচ তার মালিন্য একে স্পর্শ করতে পারেনি। জলিরপাড় গ্রামের এলাকা থেকে বাইরে নয় অথচ গাম থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ধৌত কলেবরে এমনি প্রচ্ছন্নভাবে গীর্জাটি দাঁড়িয়ে আছে যা অতি সহজেই পথচারীদের বিশেষ করে—নৌকো ও স্টীমার যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে উপাসনাগার ছাড়া একটা হাইস্কুল আছে—হাসপাতাল আছে। খেলার মাঠ—উদ্যান—বেশ বড় রকমের একটা স্টেশনারী দোকানও আছে। বাংলো-টাইপের সার-বরাদ্দের ছোট ছোট টালির ঘরগুলি বেশ একটা বসতি গড়ে তুলেছে। প্রথম যখন গীর্জাটি নির্মিত হয় তার সংগে কেবল মাত্র পাদ্রীদের বসবাসের জন্য একটা ব্যারাক উঠেছিল। নদীর তীর ঘেষে ফসলের জমির মাঝখানে মিশনারীদের গীর্জাটি ঠিক ভুষণ্ডি-কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকতো। আজ তার প্রথম দিনের সে সংগহীনতা চোখে পড়েনা। তার রং পালটিয়েছে। রূপ বদলেছে। প্রথম যুগে সামান্য কয়েক বিঘে জমি মাত্র কিনে নেয় মিশনারীরা। এখন বলতে গেলে জলিরপাড় এলাকার সমস্ত পাড়টাই দখল করেছে তারা। কয়েক বিঘে আবাদি জমিও রয়েছে এর ভিতর। কোনটায় ধান হয়—পাট হয়—আবার একটু উঁচু জমিতে হয় আঁকের চাষ—তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি। প্রথম প্রথম অনেকেরই ধারণা ছিল, নদীর পাড়ের শ্মশানের ভুত-প্রেতের উপদ্রবে এরা বেশীদিন টিকতে পারবে না। লোকজনও তখন বেশী ভিড়তো না। আল্লা-কালী আর কৃষ্ণের প্রভাব দূর করে যীশুর মানবাত্মা কিছুতেই পথ করে নিতে পারবেনা। কিন্তু এদের ঘর বাঁধবার নমুনা দেখে শেষ পর্যন্ত অনেকেরই সে ভুল ধারণা মন থেকে লোপ পেতে লাগলো। এরা ভুতের ভয়ে পালাবার লোক নয়। ভবঘুরেদের মত দু'দিনের জন্য বাসাও বাঁধতে আসেনি। এরা এসেছে কায়েমী হ'য়ে বসবাস করতে। এরা শিকড় গেড়েছে মাটির অন্তঃস্থলে। সে শিকড় উপড়ে ফেলার শক্তি আছে কার ?

জলিরপাড়ের বাসীন্দাদের বেশীর ভাগ মুসলমান আর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের হিন্দু। এরা কেউ চাষাবাদ করে। কেউ নদীর জলে জাল বেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কারোর কারোর জীবিকা নির্ভর করে নদীর জলে নৌকো বেয়ে—পথচারীদের এপার ওপার করে—দূর-দেশাগত যাত্রীদের গ্রাম গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দিয়ে। কেউবা সেনদিয়াঘাট কী জলিরপাড় অথবা আশপাশের স্টেশনে মোট বয়, আবার ভিক্ষাবৃত্তিও কারোর কারোর জীবিকা নির্বাহের উপায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এরা সারা দিনরাত দেহের রক্ত জল করে অপরের পেট ভরায়—নিজেদের পেট ভরাতে পারেনা। এরা শ্রদ্ধা ও সম্মানে অপরকে অভিষিক্ত করে তোলে বিনিময়ে ঘৃণা ও অবহেলার বোঝা বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নেয়। নদীর উজান স্রোত ঠেলে এরা যাত্রীদের পারাপার করে গ্রাম গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দিয়ে কত ঘর কত ঘরণীর মুখে আলোর ঝিলিক খেলিয়ে দেয়। এদের ঘরের আঁধার কিন্তু কোনদিন দূর হয়না। অমাবস্যার গাঢ় তমিস্রাকে ভেদ করে সেখানে কোন দিন আকাশের জ্যোৎস্না উঁকি মারতে যায় না।

শীতের দিনে কুয়াসাচ্ছন্ন নদীর বুক দিয়ে এরা তর তর করে নৌকা বেয়ে চলে—নৌকোর গতির সংগে সংগে এরা অনাবৃত অথবা ছিন্নবস্ত্রাচ্ছাদিত দেহে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। তবু মনে কোন ক্ষোভ নেই। নালিশও নেই কারোর বিরুদ্ধে। ধর্মের শিকড় গাড়তে এর চেয়ে উর্বর জমি বৈদেশিক মিশনারীরা আর

কোথায় পাবে? ইংরাজের ন্যায়সংগত শাসনাধীনে ভারতের শতকরা পঁচানব্বই জন অধিবাসীর মতই এরা নিরন্ন—বস্ত্রহীন ও ব্যাধিগ্রস্ত। তবু এরা বেঁচে আছে। যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। জড়ক্রীড়নকের মত শোষক ও শাসকদের হাতে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ-দিন আর এদের থাকবেনা। এরাও একদিন বাঁচার মত বাঁচবে। এদের বাঁচার মত বাঁচতে হবে। তাইত দেশের জল, মাটি আর হাওয়া আজও এদের মরে যেতে দেয়নি। জাগরণের সারায় এদের দেহ ও মন দুইকেই উদ্দীপিত করে তুলবে—মূক মাটি সেই সুদিনের আশায় আজ নির্বাক হ'য়ে আছে। তার অন্তরে চলছে মহাজাগরণের প্রস্তুতি।

বাণিজ্যের ছলনা করে সুচতুর ইংরেজ ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিল—ভারতের হীরা মুক্তা মাণিক্যের জৌলুষ তাদের চোখ ঝলসে দিয়েছিল—নদ-নদী বিধৌত ভারতের পলিমাটিতে সম্পদের ঝনঝনানি তাদের পাগলা করে তুললো—ভারতের বুকে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে কায়েমী করবার জন্য আনতে লাগলো অস্ত্র সম্ভার। ভারতবাসীর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে করলো রাজ্য প্রতিষ্ঠা—শোষকের মর্মান্তিক রূপ পরিগ্রহ করে শোষণ করতে লাগলো তার জীবনী শক্তিকে। তাতেও কী বৈদেশিক বেনিয়াব জাত ক্ষান্ত হয়—তারা অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিল—দেশের আত্মা যখন জেগে উঠবে—তাদের স্বরূপ যখন প্রকাশিত হ'য়ে উঠবে—আত্মরক্ষার জন্য তখন অস্ত্রসম্ভারই যথেষ্ট হবে না। তাই ভারতের আত্মাকে কিনে নিতে চাইল—অধিকার করতে চাইলো। যীশুখৃষ্টের মানবাত্মার বাণী দিয়ে বেঁধে নিতে চাইল। ভারতের গ্রাম গ্রামাঞ্চলে পাঠাতে লাগলো মিশনারীর দল। যুগ যুগ ধরে যে ভারত তার আত্মার আলোকে সমস্ত বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেছে—যুগ যুগ ধরে যে ভারত সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোকে সমস্ত বিশ্বের অন্ধকার দূর করেছে—তার আত্মাকে বশীভূত করবার শক্তি পৃথিবীতে কারোরই নেই। নিরক্ষর অধিবাসীদের সংস্কারের অর্গল ভেদ করেও যীশুর মানবাত্মা পথ করে নিতে পারলো না। মিশনারীরা পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারলো, কাজটি খড় সহজ নয়। ছিঁচকে টানে পারবো না তারা এদের হাত থেকে কৃষ্ণের বাঁশী কেড়ে নিতে। পারবে না তারা করাল কালীর হাতের খড়্গ খানিকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে—মসজিদের আজানই বা বন্ধ করবে কী করে? প্রথমে যিনি এলেন, সুবিধা না বুঝে সুড় সুড় করে সরে পড়লেন তিনি। তারপর এলেন আর একজন। খাস বিলেত থেকে। সাদা পোষাক পরলে কী হয়, 'রুল ব্রিটানিয়া রুল'. সেই ব্রিটেনের তাজা লালরক্তের টগবগানী তখনও তার ভিতর টগবগ করছে। হার মানবার লোক তিনি নন। বিশেষ করে কালা আদমীদের বেইমানীকে কখনই তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তিনি এক সভা ডাকলেন। চোখ রাংগিয়েই তিনি এদের ভুল ভাঙ্গাবেন। তিনি স্পষ্ট এবং সরলভাবে সত্যকে তুলে ধরলেন—"টোম্‌হাদের কিরিস্‌টা লম্পট আছি —ও শঠ, ও মিট্যাবাডী, ও ছোর আছি।" সভায় গুঞ্জন আরম্ভ হ'তে থাকে। তিনি উৎসাহীত হ'য়ে ওঠেন। টেবিল চাপড়ে বলতে থাকেন, "টোম্‌হাডের কা—লী—ডাইনী আছে। ও নেকেড—আই মিন ডেখিটে কডাকার। গডেজ নাহি—ডেমন—আই মিন—রা—রা—ক্ষ—" সংগে সংগে জনতাও রা-রা করে ওঠে। পাদ্রী সাহেব তাঁর কথা শেষ করতে পারেন না। বক্তৃতায় বাঁধা পড়ে। মৃদু গুঞ্জন ধীরে ধীরে মার মার কাঠ কাঠ শব্দে তাকে আক্রমন করে। তিনি দৌড়ে গিয়ে গীর্জার ভিতর আশ্রয় নেন। ক্ষিপ্তজনতা আস্ফালনে প্রতিবাদ জানিয়ে ফিরে চলে যায়। এরপর থেকে এই পাদ্রীকে আর কেউ কখনও দেখতে পায়নি। তারপর এলেন আর একজন। বয়সটা একটু কমই ছিল তার। অক্সফোর্ড থেকে সবেমাত্র অর্থনীতিতে ডিগ্রী লাভ করেছেন। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এলেন তিনি। তিনি একা এলেন না। সংগে আনলেন ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী। প্রথমে ছোট দেখে একটা

ডিসপেনস্যারী খোলা হ'লো। ডাক্তার পয়সা নেয়না। ঔষধও বিনে পয়সায় দেয়—প্রয়োজন বোধে পথ্যও দিয়ে দেয়। তবু রোগী হয়না। স্কুলে পড়তে মাইনে লাগেনা কিন্তু বিনা মাইনেতেও কেউ পড়তে আসেনা। গীর্জার ত্রিসীমানাও কেউ মারাতে রাজী নয়। বৈদেশিক গল্পের দৈত্যের বাগানের মত বৈদেশিক মিশনারীদের এই গীর্জাটি জনসাধারণের কাছে ভীতির বস্তু হ'য়ে রইল। মিশনারীরা ভেবে অস্থির। ভাবলোনা শুধু নবাগত যুবক পাদ্রীটী। ডাক্তার ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের উৎসাহ দিতে লাগলেন তিনি। গীর্জার এলাকা ছাড়িয়ে সকাল বিকেলে ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ কেটে যেত তাঁর এই ভ্রমণে। ভ্রমণ করতে করতে মাঝে মাঝে লোকালয়ে যেতেন। কাবোর বাড়ীর দু' পয়সার লাউটাকে একটাকা দিযে কিনে আনতেন। নিজেই বয়ে আনতেন। সকলে অবাক হ'য়ে যেতো। কেউ ভাবতো পাগল—কেউ ভাবতো খেয়ালা—কেউ ভাবতো দেলখোলসা। বেড়ানোর সময় দু' পকেটে লজেন্স-বিস্কুট ভরে নিয়ে যেতেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখলে হাত ভরতি করে বিলিয়ে দিতেন তাদের। প্রথম প্রথম শিশুরা ভয় করে তাঁর কাছ ঘেসতো না। ধীরে ধীরে তাদের ভয় দূর হ'য়ে যায়। ভ্রমণের সময় ক্রমে ক্রমে তারা দল ভারি করে পাদ্রী সাহেবের পিছু পিছু ছুটতো। পাদ্রীসাহেব পোষাক পরেই নদীর তীরে ওদের সংগে খেলায় মেতে যেতেন। পাদ্রীসাহেবকে ছিটগ্রস্ত বলেও অনেকে মনে করতেন। শুধু মনে করা নয়, পাগলা সাহেব বলেও ডাকা সুরু করেছিল। মুখে মুখে পাগলা পাদ্রীর নাম গল্পচ্ছলে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কৌতূহলবশতঃ অনেকে যেচে আলাপ করতে লাগলো পাদ্রীর সংগে। হাইস্কুলের নতুন ইংরেজী শেখা ছেলেরা ভুল ইংরেজীতে পাদ্রীর সংগে কথা বলে বাহাদুরী নিতে লাগলো। পাদ্রী এদেশ সম্পর্কে তাদের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে—। পাদ্রীকে তারা নিমন্ত্রণ করে আনে ক্লাবে—আনে খেলার মাঠে। পাদ্রী স্ব-ইচ্ছায় তাঁদের চাঁদা দিয়ে যায়। পাদ্রীসাহেব প্রায়ই সেনদিয়া ঘাট স্টেশনে নৌকোয় যাতায়াত করেন। ওখানে ড্রেজারের বড় সাহেব তার পরিচিত। বরফের কলেও কয়েকজন বন্ধু আছেন। এঁদের সংগে প্রায়ই দেখা করতে যান। নৌকোয় যাতায়াত করতে করতে চালকদের সংগে বেশ গল্প জমিয়ে নেন। ওদের জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে সমবেদনায় সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। এমনি আকর্ষণে জরাক্রান্ত জয়নুদ্দিনকে একদিন গীর্জায় নিয়ে আসেন। ওষুধ দিয়ে রোগ ছাড়ান। পথ্য দিয়ে তাজা করে তোলেন। সেই থেকে জয়নুদ্দিন দারুন ভক্ত হ'য়ে উঠলো পাদ্রীর। স্টেশনে মোট ব'য়ে ওর দিন কাটতো। প্লাটফরমই ছিল ওর ঘর আর ঘরণী। সারা নৌকোঘাটায় পাদ্রীদের প্রশংসা করে বেড়ায়। জয়নুদ্দিনের প্রচারকার্য বিফলে গেল না। নৌকোর মাঝিরা একটু অসুখ বিসুখ হ'লেই গীর্জায় ছোটে। গীর্জায় এদের যাতায়াত বেরেই চললো। জয়নুদ্দিন ত একদিন তার লোটা কম্বল নিয়েই হাজির! না—ও আর যাবেনা গীর্জা থেকে। পাদ্রীকে ধরে বসলো, গীর্জাতেই একটা কাজ দিতে—ও যীশুর পায়েই থেকে যাবে। পাদ্রী কাজ দিলেন। বাগানের কাজ দিলেন জয়নুদ্দিনকে। ঘরও দিলেন থাকতে। দীক্ষা দিলেন। জয়নুদ্দিন শেখ হ'লো মিঃ গ্রেগরী। আর দিলেন ঘরণী। সেনাদিয়া ঘাট স্টেশনে মোট ব'য়ে যে জয়নুদ্দিনের দিন কাটতো—মিঃ গ্রেগরী হ'য়ে তার এখন আর মোট বইতে হয়না। ছেঁড়া গামছা পরে থাকতে হয়না তার। সে এখন প্যাণ্ট পরে। সাহেবদের সংগে উপাসনায় যোগ দেয়। ফাদার-মাদার ইংরেজী বুলিও শিখেছে দু'চারটে। মাঝে মাঝে আল্লা-আল্লা কী তোবা-তোবা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেও সে সাহেবদের মত বুকে ক্রশ এঁকে সংশোধন করে নিতে শিখেছে।

এরপর এলো দীনু গড়াই। নৌকা বাইতো। মিঃ গ্রেগরীই ওকে টেনে আনে। কাটাখালির জলের ওপরই ওর বাসা। পাড়েও যে বাসা না ছিল তা নয়। কিন্তু সে এক বেদনাময় কাহিনী। ওর বউ

ওর সংগে ঘর করতো না। ওর ছোট ভাইকে নিয়ে থাকতো। প্রথম জীবনে মেয়ে হ'য়েছিল একটা। সাত আট বছর বয়স হ'য়েছিল তার। কিন্তু মায়ের পাপে নিজের মেয়েকে ও ধরে রাখতে পারলো না। কলেরায় দু'দিনের ভিতর মারা যায়। মেয়েটি মারা যাবার পর মাটির ঘরের মায়া কাটিয়ে দীনু এসে নদীর জলে বাসা বাঁধে। যাত্রীদের পাড়াপাড় করে—গ্রাম গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেয়। অবসর সময়ে তীরে নৌকো বেঁধে রান্না করে—নৌকো বেঁধেই ঘুমিয়ে নেয়। দীনুর নৌকো বড় বেশী যাত্রীহীন হ'তোনা। পারিশ্রমিকের দরকষাকষি ও কারোর সংগে করতো না কোন দিন। অন্যান্য মাঝিরা কম সংখ্যার যাত্রী খুঁজতো—ওছিল তাদের ঠিক উলটো। অনেক কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে যারা নদীর ঘাটে আসতো ও আগে তাদেরই সাথে কথা বলতো। শিশুযাত্রীদের কলরবের ভিতর দিয়ে নৌকো বাইতে ওর ভারি ভাল লাগতো। ও তাদের সংগে গল্প জুড়ে দিতো নৌকো বাইতে বাইতে। কখনও কখনও বলতো, "দ্যাহো খুকুমণি, পানকাউড়ি ক্যামনে ডুবাইছে—ঐ দ্যাহো পুলুষের লক্ষ—দত্ত বাড়ীর ঘাটলা দ্যাখছোনী।" এমনি ভাবে দীনু দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়ে চলতো। কখন কখন সাপলা তুলে দিত। ধানের মঞ্জরী দিয়ে তাদের হাত ভরিয়ে দিত। কত শিশু এমনি ভাবে আসে যায়—কিন্তু দীনু কোন দিন কাউকেই তার নৌকোয় ধরে রাখতে পারেনা। তারা যতক্ষণ থাকে নৌকোটা ঝলমলিয়ে রাখে - চলে যাবার সংগে সংগে সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে আসে। হাসি মিলিয়ে গিয়ে কোথা থেকে কোন নিবিড় আঁধার নেমে আসে দীনুর নৌকোয়। ঘিরে ধরে দীনুর মনকে। প্রথম প্রথম যখন নৌকো বাইতে—মন্দ লাগতো না দীনুর। কিন্তু বয়স বাড়ার সংগে সংগে ওর মনটা যেন হাহুতাশ করে ওঠে। ও ভাবে, অন্ততঃ একটা শিশুকেও যদি ও ওর নিজের বলে আজীবন ধরে রাখতে পারতো। কিন্তু তার উপায় কোথায়। উপায় এলো। পাদ্রীসাহেবকে একদিন পৌঁছে দিতে যেয়ে ও বলেই বসলো, "দাওনা সাহেব জয়নুদ্দিনের মত আমায় একটা ঘর আর ঘরণী। তাহ'লে বাকী জীবনটা যীশুর পায়েই কাটিয়ে দিতাম।" দীনুর আর্জি বিফল হয় না। জয়নুদ্দিনের মত সে ঘর পেল। পেল ঘরণী। ব্যাপতাইজিত দীনুর নাম হ'লো মিঃ লং।

দীনুদের মতই তাদের ঘরণীরা এসেছে আশপাশের গাঁ থেকে। কেউ বালবিধবা, ভাইয়ের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতো—কারোর স্বভাব চরিত্রে একাধিক বার দাগ পড়েছে—কেউ ভিক্ষে করে জীবিকার্জন করতো—এদেরই বেশীর ভাগ এসে গীর্জায় স্থান নিয়েছে। কেউ কেউ দু'চারটে বাচ্চা কাচ্চাও সংগে এনেছে। নতুন করে আবার সংসার পেতেছে গীর্জায়। এঁরা সবাই যে আশপাশের গাঁ থেকে এসেছে তা নয়। কতকগুলি সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে ও ছেলেও এনে হাজির করেছে পাদ্রীরা বাইরে থেকে। কাউকে এনেছে মাদ্রাজের উপকূল হ'তে—এনেছে ছোটনাগপুর, খাসিয়া, মণিপুর প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চল থেকে। বাইরে থেকে পাদ্রীরা কতককে করেছে আমদানী আবার এখান থেকে বাইরে কতককে করেছে রপ্তানী। যীশুর প্রতি মন এদের কতখানি আকৃষ্ট হ'য়েছে বলা কঠিন—তবে এদের চেহারা ফিরেছে। রং লেগেছে মনে। জীবন যাত্রার মান বেরেছে। প্রাথমিক শিক্ষাও পেয়েছে। মনের সংকীর্ণতা দূর করে নিয়ম শৃংখলা ও সংঘবদ্ধ ভাবে চলতেও শিখেছে। প্রথম প্রথম দানু জয়নুদ্দিনের সংগে খেতে আপত্তি করতো। শেষ অবধি সে আপত্তিকে আর জিইয়ে রাখতে পারেনি। দীনু একটু আধটু বাংলা লেখাপড়া জানতো—ধারাপাতটাও শেষ করেছিল পুরোপুরি। নৌকা বাইতে বাইতে মরচে ধরে উঠছিল সে বিদ্যায়। গীর্জায় এসে মিঃ লং তাকে সাফাই করে নিয়েছে। ঘসে মেজে তার চাকচিক্য বাড়িয়েছে। পাদ্রীসাহেব এবিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। মিঃ লং বাংলা বাইবেল পড়তে পারে। সু-সমাচার পড়ে—যীশুর অলৌকিক কাহিনীগুলি মুখে মুখে বলতে পারে। নতুন ব্যাপতাইজিতদের সে সু-সমাচার পড়িয়ে শোনায়। যীশুর অলৌকিক কাহিনী তাদের কাছে
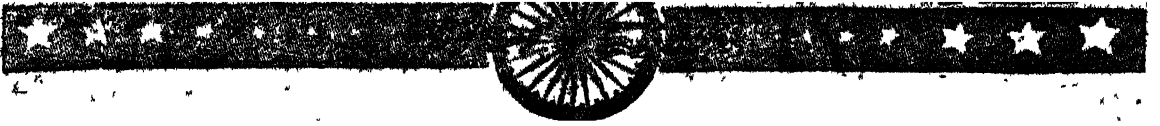
বর্ণনা করে। শুধু তাই নয়, মিঃ লং তাদের শোক-দুঃখের কথা শুনে সহানুভূতি জানায়—তাদের নতুন সংসারকে মধুময় করে তুলতে উৎসাহ দেয়।

শুভদিনে নূরবিবি ব্যাপতাইজিত হলো। কিন্তু একি বিড়ম্বনা! এই প্রবঞ্চনার জন্য মহামানব যীশু কী তাকে ক্ষমা করবেন? সে যখনই যীশুর কথা চিন্তা করে—সেই কৃষ্ণ—সেই রাধা যে যুগল মূর্তিতে ওর মনে ভেসে ওঠে! না, সে পারবেনা তাঁদের কথা ভুলে যেতে। এই অভিনয়ই বা সহ্য করবে কেমন করে! মিনতি জানায় যীশুর পায়ে, "হে মহামানব, তুমি ক্ষমা করো। শুনেছি, যেই যীশু, সেই কৃষ্ণ, সেই আল্লা—তোমরা বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ডাকে বিভিন্ন রূপ নিয়ে সাড়া দাও—তাহ'লে আমার অপরাধ নিওনা প্রভু! তুমি আমার অন্তরের রূপেই আমার পূজা গ্রহণ করো। আমি তোমায় প্রবঞ্চনা করতে চাইনি—আমি চেয়েছি মানুষের অধিকারে বাঁচতে। তুমি মহামানব, মানুষের কাতরতা কী পৌছবেনা তোমার কানে।" মিঃ লং লক্ষ্য করেছে, নূর বিবি রোজ ভোরে উঠে সূয্যি ঠাকুরকে প্রণাম করে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভেদ করে যখন নদীর ওপার থেকে শঙ্খধ্বনি ভেসে আসে, নূর বিবি চুপি চুপি অস্তগামী রবিকে যুক্ত করে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। নয়—কিছুতেই নয় নূর বিবি নূর বিবির সত্যিকারের পরিচয়। প্রথম দিন থেকেই নূর বিবি মিঃ লং এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নূর বিবিকে দেখে মিঃ লং-এর বহুদিনের পুরোন স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। নূর বিবির মাঝে তার হারানো মেয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। ব্যাপতাইজিত হবার পর সাধারণ মেয়েদের ব্যারাক থেকে মিঃ লং পাদ্রী সাহেবকে বলে তার বাংলোতে নূর বিবির থাকবার অনুমতি নিয়েছে। নূর বিবি যথারীতি মিঃ লং-এর কাছে ধর্মোপদেশ নেয়। মিঃ লংকে ভারী ভাল লাগে তার। মিঃ লং যেন তার বাপের অভাব পূরণ করেছে। ভিড় কমে গেলে মিঃ লং একদিন নূরবিবিকে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমিত মা মুসলমানের মেয়ে ছিলেনা—আমার কাছেত ধরা পড়ে গেছো—সত্যি করে বলোত তোমার পরিচয় কী?"

নূর বিবি কথা বলেনা। হঠাৎ এমন প্রশ্ন আশা করেনি মিঃ লংএর কাছ থেকে। মাথা নীচু করে থাকে। সত্যি, আজ সে ধরা পড়ে গেছে।

মিঃ লং নূরবিবির পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, "ভয় কী মা, আমার কাছে কোন ভয় নেই। পারিত তোমার উপকারই করবো। এবুড়োকে বিশ্বাস করে সব খুলে বলো।" নূর বিবি মিঃ লংএর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। তার চোখের জল তার অতীত কাহিনীর আভাষ নিয়ে ভেসে ওঠে মিঃ লংএর চোখে। নূর বিবি প্রকৃতিস্থ হ'যে সমস্ত কথা খুলে বলে মিঃ লংকে। তার মনের বোঝা অনেকটা হালকা হয়ে যায়। মিঃ লং বুকে টেনে নেয় রাইকে—তার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভ অশুভ সকল দায়িত্ব পিতার মতই গ্রহণ করবার আশ্বাস দেয়।

নূরবিবির নামকরণ হ'য়েছে মিস লাইট। অল্পদিনের ভিতরই মিস লাইট গীর্জায় সকলের স্নেহ পেয়ে ধন্যা হ'য়ে উঠলো। মেম শিক্ষয়িত্রীর সংগে সে স্কুলে 'ক্লাশ' নেয়। 'নিটিং'-এর কাজ শেখায়। আবার পাদ্রী সাহেব নিজে তাকে পড়ান। মেম শিক্ষয়িত্রী উল বোনা শেখায়। বিকেলে নার্সের পোষাক পড়ে হাসপাতালে হাজির হয়। তার উপস্থিতি রোগীদের প্রাণে যেন নতুন সাড়া এনে দেয়। কেউ মা—কেউ দিদি—কেউ কাকা—দাদা—ভাই—বোন্ এমনি ভাবে সে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে রোগীদের সাথে। কারোর মাথার বালিশটা একটু ঠিক করে দেয়—কারোর মুখে ফলের রসটা তুলে ধরে। ছোট্টশিশুর রোগ যন্ত্রনাকে গান গাইয়ে ভুলিয়ে দিতে চায়। হাসপাতালে তার কোন নির্দিষ্ট ডিউটি নেই। কিন্তু একঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টা হাসপাতালে তার উপস্থিতি একরকম ডিউটি হয়েই দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালের কাজ সেড়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পাল্‌টিয়ে মাঠে ছোটে। ইতিমধ্যেই বাংলোর শিশুরা সেখানে যেয়ে ভিড় করে তোলে। মিস লাইটের আগমন প্রতীক্ষায়

ওদের অধৈর্য মুহূর্তগুলি কাটে দৌড়-দৌড়ি ও বিভিন্ন ক্রীড়া কৌতুকে। মেম শিক্ষয়িত্রীকে সংগে নিয়ে মিস লাইট এসে হাজির হয়। এরা তাদের ঘিরে দাঁড়ায়। মেম শিক্ষয়িত্রী পাশে দাঁড়িয়ে তদারক করেন। তাঁর নির্দেশমত মিস লাইট সংগীতের ভিতর দিয়ে এদের ড্রিল করায়। অনেক সময় পাদ্রীসাহেব ও লং অথবা কাউকে সংগে নিয়ে শিশুদের ক্রীড়া কৌতুক পরিদর্শন করতে করতে আসেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও ওদের সংগে ড্রিল করতে সুরু করে দেন—ওদের উৎসাহ যেন শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

মিস লাইট এমনি ভাবে গীর্জার প্রতিটি বিভাগে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। কোন অনুষ্ঠানেই তাকে না থাকলে চলেনা। অসুস্থতাবশতঃও যদি কোন দিন কোন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকে—সমস্ত মাধুর্যই যেন তখন নিস্প্রভ হ'য়ে যায়। নিজের ঘর থেকে বাইরে যেতে না পারলে গীর্জার প্রাণচাঞ্চল্য যেন মন্থর হ'য়ে আসে। একদিন ছোটদের খেলা দেখবার সময় মুচকী হাসতে হাসতে লংকে পাদ্রী সাহেব বললেন, "আমার নামকরণ সার্থক হয়েছে। মিস লাইট সত্যসত্যই মূর্তিমতী আলোকশিখা।"

মূর্তিমতী আলোকশিখা সুনন্দাও বল্লভপুরের পাঁচকড়ি বালিকা বিদ্যালয়ে। বছর দুই কেটে গেছে। শিবশঙ্কর রায় এরই মাঝে স্কুলটিকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন—তিনি বাইরেকার মূর্তিটি গড়েছেন—তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে সুনন্দা। বাইরে থেকে এসেছেন চার-পাঁচজন শিক্ষয়িত্রী। গ্রামেরও দু'একজন রয়েছেন। আর সর্বোপরি সর্ব বিষয়ে রয়েছে সুনন্দা। শুধু বল্লভপুরেই নয়—আশে-পাশের গাঁ থেকেও বহু মেয়ে, বিধবা ও সধবারা পাঁচকড়ি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। আসে বিভিন্ন হাতের কাজ শিখতে ও করতে। তাত বসেছে—বসেছে সেলাইর কল। চরকার ঘরঘর শব্দ বল্লভপুরের প্রতি ঘরকে মাতিয়ে তুলেছে। তাত—চরকা-সেলাইর কল-এগুলিকে শুধু শিক্ষার কাজেই নয়—বিদ্যালয়ের আর্থিক সংগতি ও কর্মী-মেয়েদের জীবিকার কাজেও লাগানো করা হয়েছে। পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করবার জন্য গ্রামবাসীদের আর থানা সহর ভাংগায় ছুটতে হয়না। তাতের কাপড়ও মধ্যবিত্তদের অনেকটা অভাব দূর করেছে। মণিপুরী খ্যাস—পরদা—বিছানা ও গায়ের চাঁদর প্রভৃতি আর যা যা তৈরী হচ্ছে, স্থানীয় চাহিদা নেই বলেই এগুলিকে কোলকাতায় চালান দেওয়া হয়। কোলকাতায় ব্যবসায়ীদের সংগে দেবু যোগাযোগ রক্ষা করে। আর এখানকার ঝুকি বহন করে এ অঞ্চলের সর্বজনপ্রিয় বিপ্লবীনেতা অপূর্ব ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশানাল মটর কোম্পানী'র বিপ্লবী কর্মীরা। মাল রপ্তানী ও আমদানীর ব্যাপারে মূলতঃ থাকলেও, এঁদের সংঘশক্তির অদৃশ্য হস্ত বিদ্যালয়টিকে সবলভাবে দাঁড় করাতে যথেষ্ট সাহায্য করছে। বাইরে থেকে এঁদের চিনবার কোন উপায় নেই। এঁরা কেউ খবরের কাগজের হকার—কেউ বইয়ের দোকান খুলে বসে ভাংগায়—কেউ কাটাকাপড় অথবা কেউ অন্যান্য ব্যবসায় লিপ্ত আছে। ভাংগা থেকে ফরিদপুর অবধি যে মটর ও লঞ্চ সার্ভিস প্রচলিত আছে এঁরা কেউ সে রাস্তায় মটর চালায়—টিকেট বিক্রী করে—বা ঐ ধরণের কাজে মেতে থাকে। এঁরা ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের সংগে দরকষাকষিও করে—বিনা ভাড়ায়ও কাউকে পৌঁছে দেয়। পুলিশ অফিসার দেখলে সেলাম ঠুকে আগে দরজা খুলে দেয়—তাদের পকেটেও মাঝে মাঝে গোপনে কিছু ভরে দেয়। বাইরে থেকে মনে হবে পরাধীন জাতীর দাসমনোবৃত্তি এঁদের মাঝে পূর্ণরূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর স্বচ্ছধারার মত এঁদের অন্তরে অন্তরে মুক্তির যে প্রস্তুতি চলছে, তার সন্ধান বাইরে থেকে কে জানে? কেউ জানেনা। জানে তাঁরাই, এঁদের অন্তরের সঙ্গে রয়েছে যাঁদের নিবিড় যোগ। জানেন, বিপ্লবীনেতা অপূর্ব ভট্টাচার্য—আত্মভোলা স্কুলমাষ্টার শিবশঙ্কর—তাঁর সাধ্বী স্ত্রী সুনন্দা—জানে দেবু। আর জানে তাঁরাই, বিশ্বস্ত সৈনিকের মত যাঁরা এই মহা-প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করেছে। যে মহা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলতে
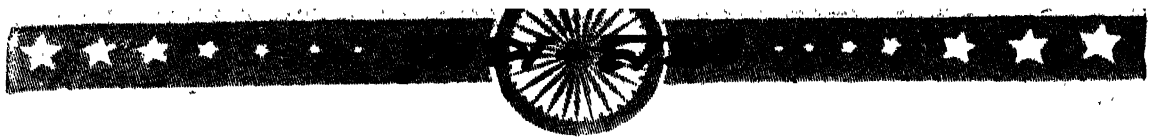
কোন ত্যাগ স্বীকারকেই বড় বলে মনে করেনা। এদের ভিতর আছে সবাই। হিন্দু, মুসলমান। বল্লভপুরের মজুমদার মহাশয়—মল্লিক মহাশয়ের দল গঠন-মুহূর্তে বিদ্যালয়ের সামনে নানান বাঁধা সৃষ্টি করতে চাইলেও তাদের সে বাঁধা ফুৎকারে উড়ে গেছে।

শিবশঙ্কর রায় আরো খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং হাউস উঠবে সেখানে। আশপাশের বা একটু দূর গাঁয়ের মেয়েরা এখানে থেকে পড়াশুনা করতে পারবে —হাতের কাজ শিখতে পারবে। এ অঞ্চলে এই ধরণের বিদ্যালয় ইতিপূর্বে আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মেয়েদের সামনে স্বাধীনভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে জীবিকা নির্বাহের এই অভিনব পরিকল্পনা আর কেউ ইতি-পূর্বে তুলে ধরেনি।'না জাগিলে যত ভারত ললনা—এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা'—বহুবার কংগ্রেসের বহু কর্মিদল এই ধ্বনিতে এঅঞ্চলের গ্রামকে মুখরিত করে তুলেছে। কিন্তু কোন নারীকেই তারা জাগাতে পারেনি। বড় জোর কেউ গায়ের দু'একখানা গয়না খুলে দিয়েছে—কাপড় ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। দেশের মুক্তি আন্দোলনে দু'একজন হয়ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে—কিন্তু ঘরে থেকে ঘরকে সে রকম তারা তৈরী করতে পারেনি—সামাজিক অনুশাসন—আর্থিক বন্ধন নাগপাশের মত তাদের জীবনী-সত্তাকে এতদিন পঙ্গু করে রেখেছিল—আজ পাঁচকড়ি বালিকা বিদ্যালয় সেই বন্ধন খুলে যে মহাসুযোগ এনে উপস্থিত করেছে…তাকে গ্রহণ করবার জন্য যেন এঅঞ্চলের সুপ্ত নারীসত্তা জেগে উঠেছে। এ মহা সুযোগকে তারা ফিরিয়ে দিতে পারে না। চক্রান্তকারীদের চক্রান্তজাল উপেক্ষা করে তারা সাড়া দিয়েছে।

রাইর প্রসংগ উড়ে গেছে আজকাল। প্রথম প্রথম কিছুদিন কেউ কেউ কানাকানি ও বলাবলি করে জিইয়ে রেখেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের উৎসাহে ভাটা দেখা দেয়। বর্তমানে তারা ওটাকে অতীতের খাতায় বন্দী করে রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের মুখরোচক কিছু পেলে একদলের জিব লক্‌লকিয়ে ওঠে। আপনা থেকেই তাদের লক্‌লকানী ক্লান্ত হয়ে পড়ে—আবার নতুন কিছুর জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। হলধর, মেজকর্ত্তা এদের সকলেরই ধারণা, রাই জলে ডুবেই মরেছে। সুনন্দাও যেন সেই বিশ্বাসেই কতকটা বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে। জেলে বৌ মাঝে মাঝে বিলের পাড়ে যেয়ে বসে থাকে। একা একাই ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। মাঝে মাঝে এই ডুকরে কাঁদা ছাড়া তার আগের সে গলা আর কেউ শুনতে পায় না। মেজকর্ত্তাকে আজকাল গায়ের পথে কেউ বড় একটা দেখতে পায় না। তার আসরও রীতিমত বসে না। কারোর সাথে বড় কথাবার্তাও বলেন না। কাছারী ঘরেই বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দেন। রাইর ঘটনা ঘটবার পর ভাঙ্গায় যাতায়াত বেরেছিল। কেউ বলে, সেখান থেকে কোন দৈহিক ব্যাধি বাধিয়েছেন। কেউ বলে, এত দিনের পাপের অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছে। কোনটা ঠিক সঠিক কেউ বলতে পারে না। হয়তো দুটোই ঠিক। অল্পদিনের ভিতরই যেন অনেকটা বয়েস বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে। লোহার মত পেটান দেহটাও যেন দিন দিন নুইয়ে পড়েছে। (চলবে)

লণ্ডনের প্রাচীন নাট্য-মঞ্চ

'ওল্ডভিক'এর গোড়ার কথা

কন্সট্যান্স কামিংস

লণ্ডন সহরের অতি প্রাচীন নাট্য-মঞ্চ 'ওল্ড-ভিক'এর নাম আজ দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনতার দিক থেকেই শুধু নয়—আভিজাত্য ও অভিনবত্বের দিক থেকে 'ওল্ড-ভিক' আজ সকলের শ্রদ্ধার্জন করেছে। এই 'ওল্ডভিক'এর গোড়ার ইতিহাস ক'জনই বা জানেন? কী পংকিল পরিস্থিতি ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তার গোড়ার দিনগুলি কেটেছে, লণ্ডনের খ্যাতনামা অভিনেত্রী কন্সট্যান্স কামিংস্ সেই কথাই বলতে প্রয়াস পেয়েছেন। শ্রীমতী কামিংস্ এর এই প্রবন্ধটি 'ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস'-এর মারফৎ আমরা সংগ্রহ করেছি। উক্ত সংবাদ পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের সংগে আমরা যে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়েছি তাতে, যুক্ত-রাষ্ট্রের বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত বহু তথ্যই পাঠকসাধারণকে আমরা উপহার দিতে পারবো। উক্ত প্রতিষ্ঠান এজন্য রূপ-মঞ্চের জন্য বিশেষভাবে প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশের আঞ্চলিক অধিকার একমাত্র রূপ-মঞ্চেরই থাকবে।

লণ্ডনের 'ওল্ড ভিক' নাট্যশালাটি নিছক নাট্য-মঞ্চের ইতিহাসের প্রয়োজনেই নয়—কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে এর গতি-পরিবর্তনই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। টেমস নদীর দক্ষিণ তীরে কয়েকটী ব্যবসায়ী ফুলের বাগানের কাছে নীচু জলা জায়গার ভিতর ১৮১৮ খৃঃ-এ 'দি রয়্যাল কোবার্গ থিয়েটার' দ্বারোদ্ঘাটন করে। নাট্য-মঞ্চটির অবস্থিতি এমনই বিদঘুটে যায়গায় ছিল যে, নাট্য-মঞ্চের প্রবেশ পথে বহু সংখ্যক পথ প্রদর্শক রাখা হবে বলে পৃষ্ঠপোষকদের পূর্বেই আশ্বাস দেওয়া হ'তো। এবং প্রকৃতপক্ষে নদীর সেতুর কাছে বহু সংখ্যক পথ প্রদর্শক রাখা হ'তো—তারা সেতুর ধার থেকে যে রাস্তাটি থিয়েটার পর্যন্ত এসেছে, পৃষ্ঠপোষকদের সেই রাস্তাটি দেখিয়ে দিতেন। এবং রাস্তায় প্রচুর আলোরও ব্যবস্থা করা হ'তো। নাট্য-মঞ্চটির অবস্থান এরূপ অসুবিধাজনক স্থানে হ'লেও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্য-মঞ্চটির প্রথম জীবনের ত্রিশ বৎসর অভিজাত দর্শক গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল—বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর আসনগুলির জন্য। নিম্নশ্রেণীর আসনগুলি থেকে অনেক সময় শীষ দিত, আপেল ও কমলালেবুর খোসা ছুড়ে মারতো। কোন অভিনয় সম্পর্কে তাদের অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য এই পন্থাই অনুসরণ করতো। নাট্যামোদীদের অভিনয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার এই প্রথাকে যেমনি কোন মতেই সমর্থন করা চলেনা—তেমনি কোন নাট্য-প্রযোজনায় প্রযোজকদেরও সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যেত না। নাট্যকারদের পুরস্কৃত করা হ'তো সত্য, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য নয়—যিনি যে নাটকে অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংস্থাপনে কৃতকার্য হ'তেন—পুরস্কারের ভাগটা তার ভাগেই পড়তো। কত বিচিত্র লোমহর্ষ পলায়ন—লম্পটের হাত থেকে বীর নায়কের পবিত্র কুমারীদের রক্ষা প্রভৃতি এই ধরণের ঘটনাবলী যে নাটকে বেশী থাকতো—সেই সব নাটকের নাট্যকারেরাই পুরস্কৃত হতেন। এবং এগুলি জাকজমকময় দৃশ্যাবলীর

পটভূমিকায় অভিনীত হ'তো। দৃশ্যসজ্জায়ও অত্যাশ্চর্য পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকতেন। দক্ষিণ মহাসাগরের মরুভূমি দ্বীপ—উত্তর মেরু—ভেনিস—চীন—সাইবেরিয়ার অনুর্বর জমি প্রভৃতি হুবহু ফুটিয়ে তুলে নাট্যামোদীদের চোখে ধাঁধাঁ সৃষ্টি করতেন কর্তৃপক্ষ। কোবার্গ এই ধরণের নতুনত্বের জন্য এতই উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত নাট্যশালাটি সার্কাসে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছিলও বলা চলে। কর্তৃপক্ষ মঞ্চের ওপর পোষা কুকুর, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু নিয়ে হাজির করতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত। দৃশ্যাবলীর ভিতর অগ্নিদগ্ধ জুয়াড়ীদের জাহাজ—জলপ্রপাত প্রভৃতিও দেখিয়ে ছাড়লেন।

১৮২৫ খৃঃ থেকে অন্যান্য তালিকার মাঝে কর্তৃপক্ষ সেক্স্পীয়রকেও জুড়ে দিলেন। এই প্রযোজনাগুলি যতদূর নিন্দনীয় বলা যেতে পারে। নাটকগুলিকে সাধারণের সস্তা রুচী অনুযায়ী এবং দর্শকদের চাহিদানুযায়ী ইচ্ছামত অদল বদল করে নেওয়া হ'তো। এতে সব কিছুই হ'তো—কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটকের অর্থ টাই পরিস্ফুট হ'তো না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ 'হ্যামলেট'এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পোলোনিয়াস, ওফেলিয়া ও হ্যামলেটের জন্য সেক্সপীয়র যে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন—এখানকার কর্তৃপক্ষ তা একবারে রহিত করে দিয়ে রাজা হ্যামলেট ও রাণী ওফেলিয়ার রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করে দিলেন। নাটকটি যিনি ঢেলে সাজিয়েছিলেন (Playbill) সরল এবং খোলাখুলী ভাবেই স্বীকার করলেন যে, সেক্সপীয়রের অমর বিয়োগান্ত নাটকের ছায়াবলম্বনে বর্তমান নাটকটি লেখা হ'য়েছে একথা ঠিক বলা চলেনা। বর্তমান নাটকটি সম্পূর্ণ নূতন একটি বিষয়বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

"The playbill was frank to admit that, 'the piece in not an adaptation of Shakespeare's admirable tragedy of the same name; it fact, in many respects it is wholly different."

১৮৩৩ খৃঃ-এ নাট্য-মঞ্চটির নাম পরিবর্তিত হ'য়। নতুন নাম হয় 'দি রয়াল ভিক্টোরিয়া মিউজিক হ'ল। ওয়াটারলু রেল-

দেবদূত চিত্রে অভি ভট্টাচার্য

ওয়ে ষ্টেশন তখন সবেমাত্র খোলা হ'য়েছে এবং নদীর দক্ষিণ তীরও বাঁধিয়ে তোলা হচ্ছিল। এত পরিবর্তন সত্বেও নাট্য মঞ্চটির দুভাগ্যবশতঃ কোন সুবিধা হ'লো না। পারিপার্শ্বিক অন্যান্য পরিস্থিতি বেশ খানিকটা প্রতিকূলের সৃষ্টি করলো। এই জেলাটি ধীরে ধীরে কদাকার ও নোংরা হ'য়ে উঠলো। এবং অধিবাসীদের চাহিদা মিটাতে যেয়ে প্রযোজকেরাও মেলোড্রামা অথবা সস্তা আনন্দ পরিপূর্ণ নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে লাগলেন।

এই সময় ডিকেন্স-এর কয়েকটি নাটকও মঞ্চস্থ করা হয়। কিন্তু অভিনয়ের সংগে মূল নাটকগুলির কোন সম্পর্কই রইল না বলা চলে। এই জেলাটিও যেমনি ধাপে ধাপে অবনতির দিকে পা বাড়াচ্ছিল—থিয়েটারটিও তেমনি তার সংগে তাল রেখে চলতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত তার চলা গেলো বন্ধ হয়ে। ১৮৮০ খৃঃ-এ নাট্যমঞ্চটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

এই বছরের শেষের দিকে ইমা কোন্স (Ema Cons) নামে একজন সমাজ-সেবিকা নাট্য-মঞ্চটির দিকে দৃষ্টি দিলেন। ইমা কোন্স এ অঞ্চলে জনসাধারণের উন্নত ধরণের বস-

দেবদূত চিত্রে অমিতা

বাসের জন্য অনেক চেষ্টা করে আস্থা অর্জন করেছিলেন। তিনি একদল নিষ্ঠাবান লোককে নাট্য-মঞ্চটিকে সংগীতাগারে রূপায়িত করতে উৎসাহীত করে তুললেন। ইমা কোন্‌স বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সব দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে যতটা সম্ভব সস্তায় রুচিসম্পন্ন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময় থেকে প্রায় বিশ বছর অবধি নাট্য মঞ্চটির ইতিহাস বেঁচে থাকবার তীব্র সংগ্রামের ইতিহাস। একদিকে ঋণ ভারে জর্জরিত, কোন আশা নেই—আলোক নেই। কিন্তু তবু মিস কোন্‌স কখনও ভেংগে পড়েননি। তাঁর দৃঢ়তা ও আশাবাদ সমস্ত বাধাবিপত্তির সামনে ছিল অবিচলিত।

নাট্যশালায় কোনরকম পানীয় বিক্রয় করতে দেওয়া হতো না। আমোদ প্রমোদের ধারাও দেওয়া হলো সম্পূর্ণ পালটে। পূর্বেকার নাট্যামোদীরা ধীরে ধীরে নাট্যমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলো। তাদের আসন দখল করে বসলো সম্পূর্ণ নূতন এক শ্রেণী। কনসার্ট, জলসা, সাময়িক বক্তৃতা, সভা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের অংগ হ'য়ে দাঁড়াল। মজুর শ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষদের জন্য গড়ে উঠলো "মোর্লে মেমোরিয়াল কলেজ।" এই গড়ে ওঠার কথাই একটা পৃথক কাহিনী হয়ে দাঁড়ালো। ১৮৮৯ খৃঃ-এ অপেরা সংযোজিত হ'লো। এবং আজকের জনপ্রিয় 'ইংলিশ অপেরা কোম্পানী'র জন্ম বলতে গেলে সেদিন থেকেই সুরু। ১৯০০ খৃঃ-এ মাঝে মাঝে ভিক নাট্য-মঞ্চে চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হ'তো। যদিও এগুলি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বলিত চিত্রই—তবু তখনকার দিনে নাট্যমঞ্চের পক্ষে এও একটা নতুন বিষয় হ'য়ে দাঁড়ালো। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে 'ভিক' নাট্যমঞ্চে নতুন দৃষ্টি ভংগী নিয়ে পুনরায় দেখা দিল সেকস্‌পীয়র নাট্যাভিনয়। সে অভিনয়ের ধারা সেদিন থেকে আজও চলে আসছে।

গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 'ভিক' লবীতে শিশুদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা রাখতো। অবসর উপভোগকারী যুদ্ধ-কর্মীদের দিনে ভাড়ায় থিয়েটারে থাকবার ব্যবস্থা করে দিত। এবং যুদ্ধের পোষাক পরিহিত যে কোন নাট্যামোদীদের বিনা প্রবেশ মূল্যে অভিনয় দেখবার ছাড়পত্র দিত। তা ছাড়া ছোটদের জন্য বিনা প্রবেশ মূল্যে সেকস্‌পীয়র নাট্যাভিনয় মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হত। ১৯২১খৃঃ-এ ভিক যে কোন ধরণের ব্যয়বহুল সংস্কার সাধন ও উন্নতির প্রয়োজনানুরূপ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। 'ভিক' জনসাধারণের কতখানি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করেছিল তা প্রমাণিত হলো, মজুর সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মঘটের সময়। ভিক-এর সংস্কার সাধন কেবলমাত্র আরম্ভ হ'য়েছে এমনি সময় 'বিল্ডার্স ইউনিয়ন' ধর্মঘট করে বসলো। কিন্তু 'ভিক'-এর সংস্কার সাধন কার্যে তারা কোন বাঁধার সৃষ্টি করলো না। হাসপাতাল প্রভৃতি অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কার্যের তালিকায় 'ভিক'কে গ্রহণ করলো। ইমা কোন্‌স-এর পরিশ্রম ও আন্তরিকতা স্বীকৃতি পেল। মজুর শ্রেণীর লোকেরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারলো—এই থিয়েটার অল্প অর্থের বিনিময়ে তাদের প্রচুর আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে থাকে। এর সংগে তাদের সম্পর্কও অন্য ধরণের।

১৯২১ খৃঃ-এ ব্রুসেলে অভিনয়ের জন্য 'ভিক' আমন্ত্রিত হয়। ফ্রান্স, আমেরিকা, নেদারল্যাণ্ডস, মিশর, ইটালী প্রভৃতি বৈদেশিক পর্যটনের ভিতর এই হলো ভিকের সর্বপ্রথম বিদেশ

যাত্রা। এই সময়ে ব্যালেট এবং অপেরার জন্য আর একটি প্রেক্ষাগৃহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এবং থিয়েটারের জন-সমাগম এতই বৃদ্ধি পায় যে, স্থান সংকুলান অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। স্যাডলার্স ওয়েলস এজন্য সংগ্রহ করা হ'লো। লণ্ডন সহরের উত্তরাংশে এক জনাকীর্ণ মজদুর বসতির মাঝে এই নাট্যমঞ্চটি অবস্থিত ছিল। বলতে গেলে এই নাট্য-মঞ্চটি 'ভিকের' জীবনে এক অভিনব প্রেরণা সঞ্চার করলো। আশ পাশ থেকেই শুধু নয়, বহু দূর দূর স্থান থেকে এই দুইটি নাট্য-মঞ্চে পৃষ্ঠপোষকেরা আসতে লাগলেন। প্রযোজনা ও অভিনয়ের মান দিন দিনই উন্নত হতে লাগলো। দুইটি নাট্যমঞ্চই একদিকে যেমনি নতুন প্রতিভাকে স্থান করে দিতে তৎপর হয়ে উঠলো, তেমনি নতুন ভাবধারাকে নাট্যাভিনয়ের ভিতর দিয়ে বিকশিত করে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করলো না। এর ফলে দেখা গেল প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী নাট্যজগতে উপহার দিতে ভিকের মত লণ্ডনের আর কোন নাট্যমঞ্চ পেরে উঠলো না। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভিকের মর্যাদা এতই বেশী পেল যে, সেখানে অভিনয় করবার সুযোগ পেলে যে কোন শিল্পী নিজেকে গৌরবান্বিত বলে মনে করতেন। বর্তমানে ওল্ডভিক প্রেক্ষাগৃহে একটি নাট্যবিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বোমা বিধ্বস্ত ভিকের সংস্কার সাধনে যখন কর্মীদের রত থাকতে দেখা যায়—অধিবাসীদের সেকী উত্তেজনা ও আগ্রহ! 'ভিক' সম্প্রদায় কবে আবার তার এই পুরোনস্থানে অভিনয় সুরু করবে—প্রত্যেকে এসে বার বার সে খোঁজখবর নিয়ে যেত, ভিকের আগমনে তাদের আগ্রহের কারণ আছে বৈকী। ভিকের সংগে যে তাদের রয়েছে অন্তরের যোগাযোগ।

বি. বি. সি থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান 'বিচিত্রা'র প্রযোজক শ্রীযুক্ত কমল বসুকে সম্প্রতি রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিল্পী পান্না সেন গৃহীত চিত্রে বাদিক থেকে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ, ফনীন্দ্র পাল, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক, কমল বসু, বিমল বসু, প্রদ্যোত মিত্র, তারক গাঙ্গুলী (ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর প্রতিনিধি), পুষ্পকেতু মণ্ডল ও শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সম্পাদকের দপ্তর
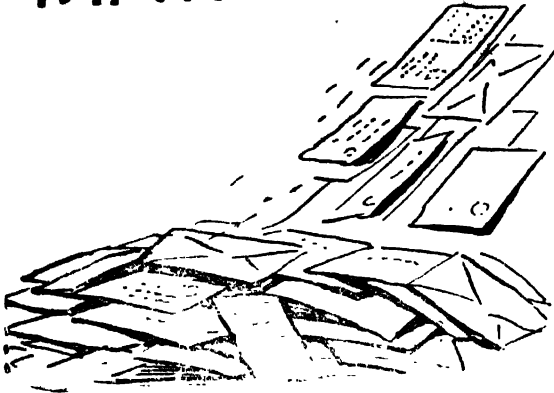
সুচিত্রা ঘোষ (শ্যামবাজার, কলিকাতা) 'পথের দাবী' চিত্রে 'প্রলয় ঝঞ্ঝা বজ্র হানিছে' গানটি কে গেয়েছেন ?

●● সত্য চৌধুরী।

সরোজ কুমার দাশগুপ্ত (দপ্তরখানা, বরিশাল) ১৯৪৬ সালে কোন অভিনেতা ও অভিনেত্রী সবচেয়ে বেশী টাকা উপার্জন করেছেন ?

●● নির্দিষ্ট কারোর নাম অথবা উপার্জনের পরিমাণ বলা সম্ভব নয়। তবে ছবি বিশ্বাস, কানন দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, মলিনা দেবী, সুনন্দা দেবী এঁরা ১৯৪৬ সালে বাংলা চিত্রজগত থেকে মোটা রকমের উপার্জন করেছেন বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীটগর রায় (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● শ্রীমতী আরতি মজুমদার পরিচালক সুশীল মজুমদারের স্ত্রী।

পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোড়াবাজার, বহরমপুর) অভিনয়ের দিক থেকে ভারতী দেবী ও সন্ধ্যারাণীর ভিতর কে শ্রেষ্ঠ ?

●● ভারতী দেবী।

শচীন ভৌমিক (দ্বারিক গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা) 'অগ্রদূত' নামে যেমন এক পরিচালক গোষ্ঠির সৃষ্টি হ'য়েছে—উদয়ণও কী তাই ?

●● না।

মিহির সেনগুপ্ত (মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা) 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবিখানিতে নায়িকার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তিনিই কি উমা গোয়েঙ্কা ?

●● না। তাঁর নাম দীপ্তি রায়। জমিদার গিন্নীর ভূমিকায় শ্রীমতী উমা গোয়েঙ্কা অভিনয় করেছেন।

ফটিকচন্দ্র ভকত (কর্ণেলগোলা, মেদনীপুর) শ্রীপার্থিবের আসল নাম কি ?

●● নাম দিয়ে আমরা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করি। শ্রীপার্থিব ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমষ্টির মাঝে মিশে থাকতে চান—তাই, তাঁর নামের আসল আর নকল বলে কিছু নেই। তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে যে পরিচয় পান, সেইটুকুই তাঁর আসল পরিচয়।

মহম্মদ কোরবান আলী মিঞা (পানাগড়, বর্ধমান)

●● গত শারদীয়া সংখ্যায় যে যে শিল্পীদের জীবনী প্রকাশিত হবার কথা ছিল তা প্রকাশিত হয়নি বলে আপনি অভিযোগ করেছেন। আপনার এই অভিযোগ নিতান্ত ভিত্তিহীন। বাংলা চিত্র ও নাট্যমঞ্চের চারজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের জীবনী একসংগে দেখতে পেয়েও যদি আপনি খুশী না হন, তাহ'লে কোনোদিনই আপনাকে এই জীবনী প্রকাশ করে খুশী করতে পারবো না। বাংলা চিত্র ও নাট্যজগতের প্রত্যেক শিল্পী—কর্মী ও ব্যবসায়ীদের জীবনী আপনাদের কাছে আমরা উপস্থিত করবো। তবে কোন সংখ্যায় কাকে দেখতে পাবেন, সে সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। এটা সম্পূর্ণরূপে সুযোগ ও সুবিধার ওপর নির্ভর করে।

অবনীকুমার বসু (ভবানীপুর, কলিকাতা) ভানু ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায় কী দুই ভাই ?

●● না।

প্রতিমা দেবী (বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা) অলকানন্দার প্রদীপকুমার কোথায় ?

●● প্রদীপকুমার বর্তমানে কোন ছবিতে অভিনয় করছেন কিনা সঠিক বলতে পারবো না। সংবাদ পেলেই জানাবো। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের বলে উত্তর দিলাম না। ওসব এড়িয়ে যাওয়াই উচিত।

অশোক সরকার (কলেজ রো, কলিকাতা।)

নৌকাডুবির মীরা সরকার ও মীরা মিশ্র কী আর চিত্র জগতে অভিনয় করবেন না ?

●● একবার যখন নেমেছেন তখন কেন পেছিয়ে যাবেন ? মীরা মিশ্রকে হিন্দি 'পথের দাবী' চিত্রে ভারতীর ভূমিকায় দেখতে পাবেন।

প্রভুষরঞ্জন কর (হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা) রবীন মজুমদারকে এর পর কোন চিত্রে দেখা যাবে ?

●● মজুমদার স্বামী প্রডাকসনের 'সর্বহারা' চিত্রে দেখতে পাবেন।

শ্রীদিলীপ (কুষ্টিয়াবাজার)

●● বড়ুয়ার জীবনী বহু পূর্বেই প্রকাশিত হ'য়েছিল।

দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় (বটতলা, হুগলী) শুনিলাম ছবি বিশ্বাসের আসল নাম ছবি বিশ্বাস নয়। ইহা কি সত্য ? সত্য হ'লে তাঁর আসল নাম কী ?

●● ছবি বিশ্বাসের আসল নাম শচীন্দ্র নাথ দে বিশ্বাস। 'ছবি' ছবিবাবুর মায়ের দেওয়া নাম।

সুনীল কুমার ঘোষ (কালী কুণ্ডু লেন, হাওড়া) আমি ফরিদপুর জেলার লোক। আপনিও শুনেছি ফরিদপুর শহরে ও গ্রামে বহু বছর কাটিয়েছেন। আপনি 'রাই' উপন্যাসের মধ্যে সে গ্রাম্য পটভূমিকা অবতারণা করেছেন তা কি ফরিদপুর জেলার কোন গ্রামের ?

●● হ্যা। শুধু ফরিদপুর নয়—ফরিদপুরের মত বহু জেলার গ্রামে গ্রামে 'রাই'-র মত মেয়েরা নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হ'চ্ছে। এই নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবলভাবে দাঁড়াবার প্রেরণা দেওয়াই আমার 'রাই'র উদ্দেশ্য। জানিনা কতখানি সফলকাম হবো।

আমির আলী চৌধুরী ও আবদুল গফ্ফার চৌধুরী (চকবাজার রোড, বরিশাল) (১) পঙ্কজ মল্লিক ও জগন্ময় মিত্রের মধ্যে কার গলা মিষ্টি এবং কে বেশী জনপ্রিয়। (২) আপনার 'রাই' আমাদের ভাল লেগেছে। অভিনন্দন গ্রহণ করুন।
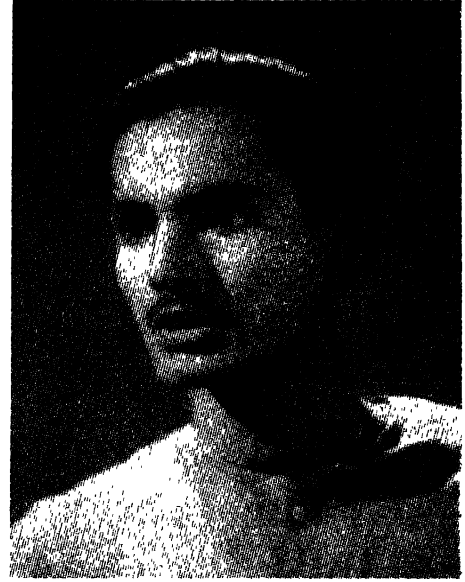
'দেবদূত' চিত্রে নবাগত রমাপদ

●● (১) জগন্ময় মিত্রের গলাই বেশী মিষ্টি বলে আমার কাছে মনে হয়। জনপ্রিয়তা ও দক্ষতার দিক থেকে পঙ্কজ বাবুর আসন অনেক উপরে। (২) আপনাদের অভিনন্দনের মর্যাদা যাতে শেষ অবধি রাখতে পারি সেজন্য সচেষ্ট থাকেবো।

গোবিন্দ প্রসাদ মিশ্র (কাঁথি, মেদিনীপুর) 'অনির্বাণ' কবে মুক্তি লাভ করবে ?

●● 'অনির্বাণের' চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে বলে সংবাদ পেয়েছি। মুক্তি দিবস এখনও জানতে পারিনি।

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় (যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা) অশোককুমার ও ছবি বিশ্বাসের মধ্যে অভিনয়ে কার স্থান প্রথম।

●● অভিনয়ে ছবি বিশ্বাসের কাছে অশোককুমার এখনও ছেলেমানুষ বলেই আমি মনে করি। 'চন্দ্রশেখর' চিত্রে আরও তা প্রমাণিত হ'য়েছে।

এ, বি, এম, মৈণুদ্দিন মিঞা (নাজের বিল্ডিং, যশোহর)

●● রেণুকা রায়ের জীবনী বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি তার ভিতরই আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন।

অমল গঙ্গোপাধ্যায় (আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা) সুমিত্রাকে আগামী কোন কোন ছবিতে দেখা যাবে?

●● ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্সের 'জয়যাত্রা' চিত্রে দেখতে পাবেন।

অরুণ কুমার সেন (গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর) পর পর সাজিয়ে দিন অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সত্য চৌধুরী (সংগীত শিল্পী হিসাবে)।

●● এঁরা তিনজনেই সমান খ্যাতিসম্পন্ন গায়ক। জনপ্রিয়তা ও গলার মিষ্টতার দিক থেকে অসিতবরণ ও রবীন মজুমদারের নাম আগে করবো। জাতীয় সংগীতে সত্য চৌধুরীর প্রশংসা করবো। তাঁর উদাত্ত গলা আমায় খুশী করে।

রমেশচন্দ্র পাল (বাগেরহাট, খুলনা) (১) 'ঝড়ের পর' ছবির কাহিনীটি কার লেখা? (২) মানে-না-মানা, শহর থেকে দূরে ও তপোভঙ্গ—এই তিনখানি চিত্রের কোনখানাতে জহর গঙ্গোপাধ্যায় সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন।

●● (১) নাট্যকার মন্মথ রায়ের। (২) শহর থেকে দূরে ও মানে-না-মানা চিত্রে।

বিমলকান্তি হাজরা, রবীন্দ্রনাথ সুর, অরুণ কুমার সেন, শ্যামাচরণ সাহা (মাতৃসংঘ, হুগলী) ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'চিতা বহ্নিমান' নামক বইটি কবে আমরা রূপালী পর্দায় দেখিতে পাইব।

●● শুনেছি ক্যালকাটা টকিজ লিঃ 'চিতাবহ্নিমান' এর চলচ্চিত্র স্বত্ব ক্রয় করেছেন। এসম্পর্কে তারা কতখানি অগ্রসর হ'য়েছেন সে সম্পর্কে আমরা কোন সংবাদ পাইনি।

বিশু বসু (কালাচাঁদ সান্যাল লেন, কলিকাতা) বাংলার উদীয়মান অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হ'য়েছি। তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

●● আপনার সংগে রূপ-মঞ্চের অন্যান্য পাঠক সাধারণও যে যোগ দেবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে।

প্রাণকৃষ্ণ রায় (রাণীগঞ্জ, হাটখোলা, বর্ধমান) (১) অশোককুমার কি আর কোন বাংলা ছবিতে অভিনয় করিতেছেন? (২) সুনন্দা, ভারতী ও সুমিত্রা কি সত্যই গান জানেন না?

●● বর্তমানে কোন বাংলা ছবিতে অশোককুমার অভিনয় করছেন না। (২) গান জানেন কিনা বলতে পারি না তবে পর্দায় এঁদের কারুরই কণ্ঠ শুনতে পান না।

সুশীল রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় (কালীঝোঁড়া, দার্জিলিং)

ছায়াচিত্রের পরিচালক, আলোকশিল্পী, শব্দযন্ত্রী ও অন্যান্য বিভাগে ব্যাবহৃত বিশেষ শব্দ যেমন কাট, ডিজলভ্, ওয়াইপ ইত্যাদি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ টিপ্পনি সহ রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করবেন কী?

●● বহুদিন পূর্বে রূপ-মঞ্চে এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ টিপ্পনি সহ প্রকাশ করা হয়েছিল। আপনাদের অনুরোধে ওগুলি ভিন্ন প্রবন্ধাকারে আবার প্রকাশ করা হবে। সম্প্রতি বাংলা সরকার ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, সজনীকান্ত দাস,নাট্যকার মন্মথ রায় প্রভৃতি সুধীজনের ওপর বৈদেশিক শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ ঠিক করবার ভার দিয়েছেন। তাঁরা যেটা করবেন সাধারণ ভাবে সেইটেই গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করি। তবে আমরা চিত্র ও নাট্য জগতে ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দগুলির যে প্রতিশব্দ তৈরী করবার কাজে লেগেছি, তার একটা খসড়া বাংলা সরকারকে পাঠানো হবে এবং তাদের অনুমোদন পেলে যথাসময়ে টিপ্পনি সহ প্রকাশ করবো।

সুমিত্র কুমার গুপ্ত (দপ্তর খানা, বরিশাল)

'অভিনয় নয়' বাণীচিত্রের সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত গিরীন চক্রবর্তী আর ঢাকার সংগীতজ্ঞ গিরীন চক্রবর্তী কী একই ব্যক্তি ?

●● হাঁ। তবে বর্তমানে গিরীন বাবু ঢাকায় আছেন কিনা বলতে পারিনা।

শ্যামলী চৌধুরী (মহারাজ ঠাকুর রোড ঢাকুরিয়া)

●● হাঁ। কার্তিক অগ্রহায়ণ সংখ্যার ও ছবিটি কানন দেবীর।

ননী বালা গাঙ্গুলী (রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা)

●● একসংগে দুটি প্রশ্নের বেশী উত্তর দেওয়া সব সময় সম্ভব নয় বলেই ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী এ ব্যবস্থার যে রদবদল করা হয় আশা করি তাও লক্ষ্য করেছেন। যে কোন মাস থেকে রূপ-মঞ্চের গ্রাহক হওয়া চলে। গ্রাহক মূল্য বার্ষিক সডাক বিশেষ সংখ্যা গুলি নিয়ে আট টাকা।

অসীম রায় (শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা)

দেবী মুখোপাধ্যায় কী সুমিত্রা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন ?

●● হাঁ।

অবনী ভূষণ নাথ (কয়লাঘাটা, খুলনা)

(১) মণিকা গাঙ্গুলী। খবর কি? তিনি কি চিত্র জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। (২) সন্ধ্যা, সুমিত্রা প্রভৃতি যে সব অভিনেত্রীরা চিত্রে নিজেরা গান গেয়ে থাকেন না, তাদের প্রত্যেকের প্লে-ব্যাক করার জন্য কি কোন গায়িকা নির্দিষ্ট থাকেন ?

●● (১) মণিকা বিবাহিতা। বর্তমানে তিনি মণিকা গুহ ঠাকুরতা। ডি, জি, পরিচালিত 'জীবন ও যুদ্ধ' চিত্রে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটা চরিত্রে তাকে দেখা যাবে। প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট শিল্পী অনেক ক্ষেত্রে থাকেন,
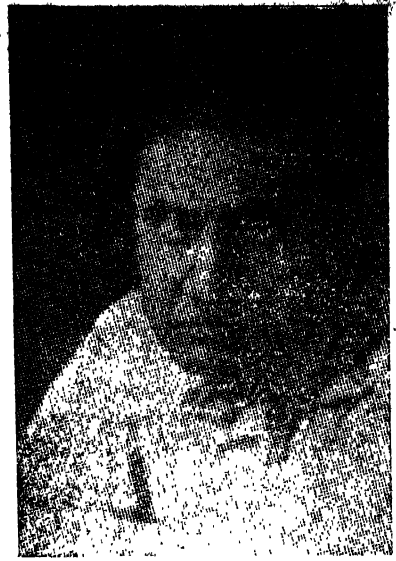
'পরিণতি' চিত্রের একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপ-সজ্জায় গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তবে নির্বাচন অনেকটা নির্ভর করে সংগীত পরিচালকদের ওপরে। তাই অনেক সময় রদবদল দেখা যায়।

ইপ্সিতা দেবী (ডাঃ জগবন্ধু লেন, কলিকাতা)

●● শিল্পীদের সৌন্দর্য বিচারের জন্য আপনি যে তালিকা দিয়েছেন – আমাকে যদি নিরপেক্ষ ভাবে রায় দিতে হয়, তাহলে সমস্ত সম্পাদকীয় দপ্তরটাই লেগে যাবে। আর এর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। অন্য ধরণের প্রশ্ন করবেন উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

তপতী দেবী (কম্বুলিয়াটোলা লেন, কলিকাতা)

কোন একটি পত্রিকায় গত শারদীয়া সংখ্যায় ছবি রায় বলে একটি মেয়ের ছবি বেরিয়েছিল। তলায় লেখা ছিল 'রামের সুমতি' চিত্রে দেখা যাবে। অথচ রূপ-মঞ্চে দেখলাম, রামের সুমতিতে নাম ভূমিকায় ছবি রায় বলে

একটি ছেলে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনটা ঠিক? মেয়েটিই কী পুরুষের বেশে অভিনয় করেছে?

●★ রামের সুমতি চিত্রে দু'জন ছবি রায় আত্মপ্রকাশ করেছে। একজন শ্রীমান আর একজন শ্রীমতী। তাই সবাই ঠিক। রামের ভূমিকাভিনয় করেছে শ্রীমান আর ডাক্তারের স্ত্রীর ভূমিকাভিনয় করেছেন শ্রীমতী।

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অতীন্দ্র ও সুনীল-চট্টোপাধ্যায়
প্রদীপকুমার কী সর্বপ্রথম অলকানন্দা চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন?

★★ হ্যাঁ।

অজয় পাল (কলিকাতা) (১) 'ঘরোয়া' চিত্রের কাহিনী কী প্রবোধ সান্যালের কোন বই থেকে গ্রহণ করা হ'য়েছে? (২) উক্ত চিত্রে অশোকা গোস্বামী কী এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো?

★★ (১) না। একটী বৈদেশিক চিত্রের কাহিনীর ছায়া-বলম্বনে গড়ে উঠেছে 'ঘরোয়া'। চিত্রখানির নাম সম্ভবতঃ 'This love of Ours'। (২) না। ইতিপূর্বে দীপালী গোস্বামী নামে একে আপনারা দেখেছেন।

এম, এল, রায় (শ্রীমঙ্গল, শ্রীহট্ট)

★★ আপনার অনুরোধ ভবিষ্যতে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

প্রফুল্ল দাস (ব্রড ষ্ট্রীট, কলিকাতা) মানুষ যা চায় তা পায় না কেন?

★★ মানুষ যা পায় না, তা চায় কেন?

শোভা ভট্টাচার্য (মার্কেট রোড, নিউদিল্লী) (১) লেখক অথবা লেখিকারা কি তাঁদের বই প্রযোজক-দের কাছে বিক্রয় করে দেন? ছবি তোলার পর যদি লেখক লেখিকারা দেখেন যে, তাঁদের উপন্যাসের বিকৃতরূপ দেওয়া হ'য়েছে, তাহলে তাঁরা কী তার প্রতিবাদ করতে পারেন না? (২) রেখা মল্লিক কি চিত্রজগত থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন?

★★ (১) নিশ্চয়ই। তবে শুধু 'ফিল্ম'-স্বত্ব। প্রতিবাদ তাঁরা সব সময়েই করতে পারেন। করা উচিতও তাঁদের। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, তাঁরা প্রযোজকদের ভয়ে অর্থাৎ যদি আর কেউ তাঁদের কাহিনী গ্রহণ না করেন এজন্য প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদই করেন না। (২) বর্তমানে শ্রীমতী রেখা মল্লিক সংসারধর্ম নিয়েই ব্যস্ত আছেন।

মণিময় দাশগুপ্ত (হরি বোস লেন, কলিকাতা) শ্রদ্ধেয় পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্রজগৎ থেকে কি অবসর গ্রহণ করেছেন?

●● না। তিনি ইন্দ্রপুরি ষ্টুডিওর তরফ থেকে মায়া-কানন (বাংলা) ও মায়াবাগ (হিন্দি) এই দু'খানি চিত্র সম্ভবতঃ শেষ করে ফেলেছেন। উর্মিলা চিত্রপটের 'অগ্রগামী' ছবিখানিরও পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছিলেন। চিত্র-খানির কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে।

গীতা মুখোপাধ্যায় (বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা) গীতশ্রী, দীপ্তি রায়, সন্ধ্যা, সুমিত্রা, প্রমীলা ত্রিবেদী—এদের পর পর সাজিয়ে দিন।

★★ সন্ধ্যা, সুমিত্রা, দীপ্তি রায়, গীতশ্রী, প্রমিলা ত্রিবেদী।

উমা, আদিত্য, শেফালী (শিবপুর রোড, হাওড়া) সুমিত্রা দেবী কি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন?

★★ না। কিছুদিন পূর্বে তাঁকে 'অভিযোগ' চিত্রে দেখতে পেয়েছেন। আবার 'জয়যাত্রায়' দেখতে পাবেন।

সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (ঘোহালী রোড,
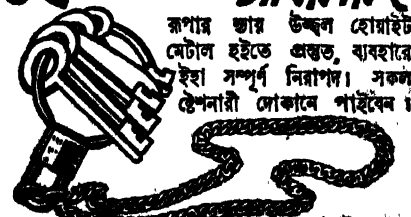
জামসেদপুর) আমার মনে হয় রূপ-মঞ্চের নিজস্ব কোন বাড়ী নেই। ভাড়া বাড়ীতেই রূপ-মঞ্চের কাজ চলে। আমি বহুবার সম্পাদকের দপ্তরে বহু পাঠককে লিখতে দেখেছি, আমি 'রূপ-মঞ্চ'কে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। এখন আমার আবেদন তাঁদের কাছে—যাঁরা রূপ-মঞ্চকে এতটা ভালবাসেন, তাঁরা যদি রূপ-মঞ্চ ভাণ্ডারে প্রতিমাসে একটাকা করে চাঁদা দেন তা' হলে আমার মনে হয় অল্পকালের মধ্যেই 'রূপ-মঞ্চ' নিজস্ব বাড়ী তৈয়ারী করতে সক্ষম হবে। এক-জন নগণ্য পাঠক হ'য়ে আমার মনের কথা জানালাম—যদি কোন দোষ করে থাকি ক্ষমা করবেন।

★★ আপনার চিঠিতে রূপ-মঞ্চের প্রতি আপনার গভীর অনুরাগের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে—আপনার এই অনুরাগকে পরম শ্রদ্ধার সংগে অভিনন্দন জানাচ্ছি। রূপ-মঞ্চ আজ যতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছে, তার মূলে রয়েছে তার পাঠক সম্প্রদায়ের অনুরাগ। এই অনুরাগ থেকে যদি রূপ-মঞ্চ কোনদিন বঞ্চিত না হয়—রূপ-মঞ্চ পরিচালনায় যে সব অসুবিধা আমরা ভোগ করছি—তা একদিন কাটিয়ে উঠবোই। বাড়ীর পূর্বে রূপমঞ্চের প্রয়োজন নিজস্ব প্রেস। রূপ-মঞ্চ মুদ্রণের জন্য রূপ-মঞ্চের নিজস্ব পৃথক একটা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে—রূপ-মঞ্চকে আপনাদের সামনে নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে পারবো। এবং এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠায় কোন ধনীর কাছে আমরা হাত পাতবোনা—আপনাদের এই অনুরাগই পরম সম্পদরূপে দেখা দেবে।

দ্বিজেন চৌধুরী (দিনহাটা, কুচবিহার)

●● আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। রূপ-মঞ্চ আপনাকে খুশী করতে পেরেছে জেনে খুশী হলাম। আশা-করি তার চলার পথে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তার অভিযানকে সার্থক ও জয়মণ্ডিত করে তুলবেন। সুমিত্রা দেবীর জীবনী যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।

হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দীরোড, আমবাগান, জামসেদপুর)

দেবী মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আমি বড়ই মর্মাহত হলুম। সবে মাত্র তিনি চিত্রজগতে নাম করে উঠেছিলেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে চিত্রজগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'লো, আমার বিশ্বাস সকলেই তা স্বীকার করবেন। ভগবানের কাছে আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

●● প্রতিভার মৃত্যু নেই। দেবী মুখোপাধ্যায় প্রতিভাবান অভিনেতা ছিলেন। তিনি বেচে থাকবেন, তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে তাঁর গুণগ্রাহীদের মাঝে।

সরোজ কুমার রায় (জানিয়ালী হোটেল, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

'শিশির, ছবি, অহীন্দ্র' কোঠারীর পরবর্ত্তী দলের মধ্যে নিম্নলিখিতদের কার স্থান কোথায়? বিপিন, পরেশ, রবীন অসিতবরণ, শিবশঙ্কর, মিহির, দীপক, অভি, বিমান, কমল মিত্র, নির্মল রুদ্র, জীবেন বসু।

●● প্রথমে কমল মিত্রকে এঁদের সকলের মাঝখান থেকে পৃথক করে নিতে চাই। তারপর অসিতবরণ, বিপিন (অভিনয়ে, সৌন্দর্যে নয়) পরেশ, মিহির, জীবেন, বিমান, দীপক, শিবশঙ্কর, নির্মল।

শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (লারমৌড়বাগ, কানপুর)

অভিযাত্রীর শ্রীমতী বিনতা রায় গ্রাজুয়েট না ম্যাট্রিকুলেট?

●● আই, এ অবধি পড়েছিলেন সম্ভবতঃ। গ্রাজুয়েট নন।

অলোক চাঁদ মিত্র (বিডন ষ্ট্রিট, কলিকাতা)

দুইপুরুষ কথাচিত্রে 'হে বিজয়ী বীর' গানটি কি সুনন্দা দেবী নিজে গেয়েছেন?

●● না। শ্রীমতী ইলা ঘোষ গেয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন চৌধুরী (রাণাঘাট, নদীয়া)

সুমিত্রা, ভারতী ও সন্ধ্যারাণী এদের পর পর সাজিয়ে দিন।

●● ভারতী, সন্ধ্যারাণী, সুমিত্রা।

শ্রীঅরিন্দম, রুদ্রবিষাণ ও অজিত কুমার (হাওড়া)

●● পুরো ঠিকানা না লিখলে কোন চিঠিরই জবাব দেওয়া হয় না। আপনাদের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই।

এস, বন্দ্যোপাধ্যায় (ডি, এম, ও অফিস, শিয়ালদহ) অলিম্পিক পিকচার্স লিমিটেড বর্তমানে কি বই তুলছেন এতে কানন দেবী জড়িত আছেন কি?

●● অলিম্পিকের তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানিনা। তবে পরিচালক অপূর্ব মিত্র এবং কানন দেবী এর সংগে জড়িত আছেন বলে শুনেছি।

ফনীন্দ্র কুমার ঘোষ (সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ)

●● আপনাদের বন্ধু মহলে রূপ-মঞ্চ যথেষ্ট সমাদর পায়—আপনাদের যথেষ্ট খুশী করে, এজন্য রূপ মঞ্চের তরফ থেকে আপনাকে ও আপনার বন্ধুদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। রূপ-মঞ্চ এ বর্তমানে খেলাধুলার কোন বিভাগ খোলা সম্ভব নয়—এজন্য আশা করি ক্ষমা করবেন।

বুড়ো সেন (হ্যারিসন রোড, কলিকাতা) চিত্রাভিনেত্রী দেবী মুখোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হলাম। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজ প্রতিভা গুণে সকলের প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন। তাই হয়ত এত শীঘ্র আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিলেন। পৃথিবীতে কেউই অমর হ'য়ে থাকে না কিন্তু শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকেন। আমরা তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

●● প্রতিভার মৃত্যু নেই। দেবী মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়ের মাঝে বেঁচে থাকবেন। সেইত আমাদের পরম সান্তনা।

তপন চট্টোপাধ্যায় (রায়বাহাদুর রোড, বেহালা)

●● আপনি কলেজের মাইনের খাতা অথবা নিদর্শন এরূপ কোন নিয়ে এলে চিত্রগ্রহণ দেখবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। তবে যেদিনই আসবেন, দশটা থেকে বারোটার ভিতর।

পার্থ প্রতিম গুপ্ত (মহেন্দ্র সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) আমার প্রশ্ন অভি ভট্টাচার্যের সম্বন্ধে। নবাগত এই তরুণকে রমেশের ভূমিকায় দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। এই চরিত্রকে বোঝা এবং তাকে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। শুনলাম তিনি ব্যারিষ্টার এবং বোম্বাইয়ে বাস করেন। এর কতদূর সত্য জানিনা। যদি তিনি কলকাতার লোক হন তাঁর ঠিকানাটা আমাকে দয়া করে জানাবেন। তাঁর সংগে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করতে চাই।

**শ্রীযুক্ত অভি ভট্টাচার্য সম্পর্কে সঠিক কোন সংবাদ রাখিনা। তবে তাঁকে লীলাময়ী পিকচার্সের মুক্তি প্রতীক্ষিত চিত্র 'দেবদূত'-এ দেখতে পাবেন। আপনি রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ, ১,৪, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতায় পত্র লিখলে অভি ভট্টাচার্য সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে পারবেন।

সরোজ কুমার ঘোষ (গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা) সুরশিল্পী হিসাবে কমল দাশগুপ্ত এবং ধীরেন মিত্র এই দু'জনের মধ্যে কাকে আপনার শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে কমল দাশগুপ্ত। পাণ্ডিত্যের দিক থেকে ধীরেন মিত্র।

মহীউদ্দিন আহম্মদ (বহরমপুর)

(১) অশোককুমার কি ছায়াদেবীর ভাই? (২) আমার একটী দশ বৎসরের ছেলে আছে। সে অভিনয় করতে পারে এবং এতে তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। তাকে কোন পরিচালকের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি কি?

(১) হ্যাঁ। মাসতাতো কি পিসতাতো ভাই বলে শুনেছি। (২) আপনার ছেলের যদি অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পেয়ে থাকেন, তাহ'লে বর্তমানে স্কুলে ও পাড়ার সোখীন অভিনয়ের ভিতর দিয়ে সে প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলুন। শিক্ষা দিয়ে তাকে স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলুন। দায়িত্ব গ্রহণ করবার মত কোন দায়িত্ব সম্পন্ন পরিচালক বা প্রতিষ্ঠান আজও আমাদের বাংলা দেশে হয়নি বলে আমি মনে করি।

মোহন লাল ঘোষ (খুরুট রোড, হাওড়া) শশধর দত্ত লিখিত 'যুগের দাবী'র খবর কী?

যুগের দাবী আমাদের দাবী মিটিয়ে আপনাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। তার প্রচেষ্টা সফল হউক।

সুরমা রায় (পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা) (১) বরোয়া চিত্রের নায়ক শিশির মিত্রের ঠিকানা কি। তিনি কি আশুতোষ কলেজে পড়তেন? আর কোন ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন? (২) আমরা জানি বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় একজন খুব ভাল সাতারু—তার চেহারাও সুন্দর। তাকে দিয়ে শিশুদের উপযোগী টার্জন ছবির মত বাংলা ছবি প্রযোজকেরা কেন তোলেন না? (৩) রূপ-মঞ্চের চন্দ্রশেখরের সমালোচনা পড়ে আমি এবং আমার কলেজের সমস্ত মেয়েরা খুব খুশী হ'য়েছে। এবং শ্রীপার্থিবের নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করছি।

★★ (১) শিশির মিত্রের ঠিকানাটা আমার জানা নেই তিনি আশুতোষ কলেজে পড়তেন কিনা তাও বলতে পারি না। তিনি পূর্ব পরিষদের অভিনেতা ছিলেন। 'নতুন খবরে' তাঁকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর আগামী চিত্রের সংবাদ আগামীতে জানাবো। (২) টার্জনের মত ছবি এদেশে তোলায় এখনও অনেক বাধা আছে। কারণ, যান্ত্রিক কৌশলের দিক থেকে এখনও আমরা অনেক পেছিয়ে আছি। ছোটদের চিত্রগ্রহণের জন্য যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে কর্তৃপক্ষ যদি সে বিষয়েও সচেতন হ'তেন তাহ'লেও কোন অভিযোগ থাকতোনা। (৩) চন্দ্রশেখরের সমালোচনা আপনাদের খুশী করেছে—এজন্য খুব খুশী হলুম। আপনি ও আপনার বান্ধবীরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনারাই ভবিষ্যত রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সত্য ও অসত্যের উন্মেষ এখন থেকেই আপনাদের মাঝে দেখতে চাই এবং তা দেখতে পেয়েছি বলেই কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অহমিকার বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযোগ—তার সুনিশ্চিত জয়ের আশায় উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছি। এমনি ভাবে আসুন, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতি ক্ষেত্রে সমবেত কণ্ঠে আমরা প্রতিবাদ জানাই। কে বলবে আমাদের কণ্ঠ ক্ষীণ—কে বলবে বাঙ্গালী দর্শকসমাজ অচেতন মূক! দর্শকসমাজের এই কলঙ্ক অপসারণে আশা করি সব সময়ই আপনারা সাড়া দেবেন। —জয় হিন্দ

কালোটাকা

মিনার্ভা নাট্য-মঞ্চে অভিনীত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'কালোটাকা' আমরা দেখে এসেছি। বর্তমান নাটকে শচীন্দ্রনাথ কালোবাজারের কারসাজীদের যেমনি মুখোস খুলে দিয়েছেন – তেমনি কালোবাজারী স্বামী ও তার আদর্শবাদী স্ত্রী এই দুইটী বিপরীত ধর্মী চরিত্রের ভিতর দিয়ে—যে উপপাদ্য বিষয় উপস্থিত করেছেন তা একদিক দিয়ে যেমনি কালোপযোগী হ'য়েছে—তেমনি আমাদের বর্তমান দুর্নীতিদুষ্ট সমাজ জীবনে তার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। বাংলার বর্তমান নাট্য-জগতে খ্যাতিমান নাট্যকারদের ভিতর বয়সের মাপ কাঠিতে শচীন্দ্রনাথ হয়ত প্রবীণের দলেই পড়বেন কিন্তু তাঁর প্রগতিবাদী দৃষ্টিভংগী যে নবীনদের চেয়েও স্বচ্ছ ও সম্মুখের দিকে প্রসারিত, তা বর্তমান নাটক খানির বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভংগী উভয়তেই ফুটে উঠেছে। সমাজের মালিন্য অপসারণে নাট্যকার ও নাট্য মঞ্চের দায়িত্ব অনেকখানি। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যখনই কোন অন্ধকার ঘনীভূত হ'য়ে আসে, নাট্য-মঞ্চের আলোকমালার দ্যুতি সে অন্ধকার অপসারণ করে সত্য ও সুন্দরের নির্দেশ দিয়ে জাতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে—নাট্যকার ও নাট্য-মঞ্চের এই ক্ষমতা সর্ববাদীসম্মত। শচীন্দ্র নাথের কালোটাকা সে দায়িত্বের বোঝা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। আশা করি তার অভিযান ব্যর্থ হবে না।

নাটকের চিরাচরিত গতিপথ বেয়ে বর্তমান নাটকে নাট্যকারকে চলতে দেখিনি। বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর অবতাড়না করেন নি। নাটকখানি হ'য়ে উঠেছে বিবরণ-ধর্মী। অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে উপপাদ্য বিষয়কে উপস্থিত করা হ'য়েছে। চরিত্রগুলির অন্তরাল হ'তে নাট্যকার স্বয়ং যেন তাঁর আদর্শ বা বক্তব্যকে ব্যক্ত করে তুলেছেন। সাধারণ দর্শকদের পক্ষে যদি এই প্রকাশভংগী গ্রহণযোগ্য না হয়; তাতে আমাদের ক্ষোভ নেই। কারণ, তাহ'লে সাধারণের দোহাই দিয়ে কোনদিনই নূতন কিছু আমরা পাবো না। এমনিভাবে একটু একটু করে সাধারণকে অসাধারণের পর্যায়ে টেনে তুলতে হবে। অভিনয়ে স্বামী-স্ত্রার ভূমিকায় যথাক্রমে জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও সরযূকে প্রশংসা করবো। শ্যাম লাহা নাট্যামোদীদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে সক্ষম হ'য়েছেন। শ্রীমতী অঞ্জলি রায়ের আলোচ্য নাটকের অভিনয়ও আমাদের খুশী করেছে। নাটকের শেষের দৃশ্য সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ আছে—শেষটা যেন ঠিক শেষ হ'য়ে ওঠেনি। —শ্রীপার্থিব

ক্ষুদিরাম

রঙমহল নাট্য-মঞ্চে শশাঙ্কশেখর লিখিত ক্ষুদিরাম—বাংলার বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরামের জীবনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। 'ক্ষুদিরাম'-এর জীবনী আপামর বাঙ্গালী জনসাধারণের কাছে পরিচিত—স্বাধীনতা আন্দোলনের এই বীর শহীদের পুণ্য জীবন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করে রঙমহল কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কয়েকটী কথা আমাদের শ্রুতিগোচর হওয়াতে খুবই মর্মাহত হলুম। ক্ষুদিরামের মাতৃসমা বড়দিদি শ্রীযুক্তা অপরূপা দেবী এখনও জীবিতা। তাঁর বড় ছেলে ললিতমোহন ক্ষুদিরামের প্রায় সমবয়সী এবং সহকর্মীও ছিলেন—তিনিও জীবিত। অন্য ছেলে ভীমাচরণ কলকাতায় থাকেন। অপরূপা দেবী ও ললিতমোহনের চরিত্র নাটকে স্থানলাভ করেছে।

অথচ কর্তৃপক্ষ 'ক্ষুদিরাম' নাটক মঞ্চস্থ করতে যেয়ে ব্যক্তিগতভাবে এঁদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছেন। এঁরা উপযাচক হ'য়ে কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত হ'লেও, তাঁদের অসম্মানকর ব্যবহার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়। মেদিনীপুরে শ্রীযুক্তা অপরূপাদেবীকে সভানেত্রী করে ক্ষুদিরামের স্মৃতিরক্ষা করবার জন্য একটী কমিটি গড়ে তোলা হ'য়েছে—এঁরা প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করে উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারে কর্তৃপক্ষকে কিছু সাহায্য করবার অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেহেতু আইনের বিধানে জাতীয় নেতাদের জীবনী স্বত্ব নিয়ে কোন বাধা উঠতে পারে না—সেই জন্য কর্তৃপক্ষ সাহায্য-ভাণ্ডারে এক কপর্দক দান করতেও অস্বীকার করলেন। কিন্তু আইনের ওপরেও অনেক কিছুই আছে। ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত ললিত মোহন রায় মেদিনীপুর থেকে আমাদের সংগে সাক্ষাৎকার প্রসংগে কর্তৃপক্ষের মানবতা ও ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধার যে কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন—তাঁর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের যদি কিছু বলবার থাকে আমরা সেজন্য তাঁদের আহ্বান কচ্ছি। কর্তৃপক্ষ যেন ভুলে না যান, তাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনমত আজ কতখানি শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। জনমতকে অস্বীকার করে যদি তাঁরা চলবার স্পর্ধা রাখেন—আমরা তাহলে তাদের সে স্পর্ধাকে একটু পরিমাপ করে দেখতে চাই! আজ স্বাধীনতার সূর্য ভারতের দীর্ঘ দিনের তমসা নাশ করে জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে উদ্ভাসিত—জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সব শহীদের আত্মত্যাগ এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলেছে—শুধু সেই সব শহীদরাই আমাদের নমস্য নন! যে সব পরিবার নিজেদের পারিবারিক স্বার্থকে ভুলে যেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তাঁদের এগিয়ে দিয়েছিলেন জাতির মুক্তি সংগ্রামে—তাঁরাও জাতির নমস্য—তাদের কাছেও জাতি কৃতজ্ঞ। ক্ষুদিরামের মাতৃসমা দিদি শুধু ক্ষুদিরামের দিদি নন—তিনি আমাদেরও দিদি—ভবিষ্যৎ সমাজের অন্তরেও তিনি অধিষ্ঠিতা থাকবেন। তাই, তাঁর প্রতি অথবা ক্ষুদিরামের পরিজনদের প্রতি কর্তৃপক্ষ যদি বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকেন—জাতি কোন দিন তাঁদের ক্ষমা করবে না। বাংলার নাট্যামোদী জনসাধারণ জাগ্রত জাতিরই এক বিরাট অংশ—একথা যেন রংমহল কর্তৃপক্ষ ভুলে না যান।

'ক্ষুদিরাম'-এর পরিজনবর্গ যে অবজ্ঞাত হ'য়েছেন, তার প্রমাণ ফুটে উঠেছে আলোচ্য নাটকটিতে বহু স্থানের বিকৃত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। যদি তাঁরা প্রকৃত তথ্য সন্ধানের জন্য তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন, তাহ'লে এই অসত্য ঘটনাগুলি 'ক্ষুদিরাম' নাটকে স্থান পেত না। এই বিকৃত ঘটনার কয়েকটি আমরা এখানে উপস্থিত কচ্ছি। ক্ষুদিরাম কোন দিন স্কুল-কামাই করতো না—সত্যেন বসুর সংগে কোনদিন অপরূপা দেবী কথা বলতেন না। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ললিত মোহনের মারফৎ দিয়ে হ'তো। সত্যেনের দাদা ললিত মোহন ব্রাহ্ম ছিলেন অথচ কর্তৃপক্ষ তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা চড়িয়েছেন। আরও খুঁটিনাটি বহু অসংগতি নাটকটিতে বিদ্যমান। কিন্তু সবচেয়ে যে মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল নাটকটিতে রয়েছে, তাহ'চ্ছে, ক্ষুদিরামের ফাঁসির দৃশ্য। অন্তিম মুহূর্তে ক্ষুদিরামের কি ইচ্ছা বৃটিশ সরকার জিজ্ঞাসা করলে সে তাঁর জন্মভূমি, বড়দি, জামাইবাবু ও ভাগীনেয় ললিতকে দেখতে চায়। বৃটিশ সরকার তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। সরকারের নির্মমতা এখানে আরো বেশী ফুটে উঠেছে এবং ক্ষুদিরামের সংগে তাঁর দিদিদের সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দেওয়া হয় না। সরকারী নথীপত্রেই এ নিদর্শন রয়েছে। অথচ আলোচ্য নাটকে কর্তৃপক্ষ ক্ষুদিরামের সংগে তাঁর দিদিদের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন।

নাটকের অভিনয় এবং প্রযোজনার বিরুদ্ধেও আমাদের অনেক কিছুই বলবার আছে। বাংলার যে বিপ্লবযুগের কাহিনীর পটভূমিকায় 'ক্ষুদিরাম' গড়ে উঠেছিল—সেই যুগ

রক্ষা করেছেন চিত্রখানি দেখে এসে সেকথা নিঃসংশয়ে আমরা বলতে পাচ্ছি। অভিনয়ে রামের ভূমিকায় দেখতে পেয়েছি শ্রীমান ছবি রায়কে। রামের দুর্দান্ত ভাবটা তার ভিতর বেশ ফুটে উঠেছে কিন্তু রামের হৃদয়াবেগকে শ্রীমান আশানুরূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। এ দিক দিয়ে মঞ্চে বুদ্ধদেব বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। শ্যামলালের ভূমিকায় নবাগত শিশির বটব্যালকে নিন্দা করবার কিছু না থাকলেও—মঞ্চে জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় যাঁদের মনে আজও ছাপ মেরে রেখেছে, তাঁরা শিশিরবাবুর অভিনয়ে খুশী হতে পারবেন না। নীলমণি ডাক্তারের ভূমিকায় ফণীরায়-এর নির্বাচনকে সমর্থন করতে পারবোনা মোটেই। কারণ, তাঁর অভিনয়ে ডাক্তার চরিত্রটির মর্যাদা নষ্ট হ'য়ে একটি কমিক চরিত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বৌদি নারায়ণীর ভূমিকায় মলিনা দেবী এবং তার মাতা দিগম্বরীর ভূমিকায় রাজলক্ষ্মীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করবো। অন্যান্য ভূমিকায় নবাগতা শ্রীমতী ছবি রায়, মায়া বোস, শুভ্রা, ইন্দু মুখো, তুলসীচক্র প্রভৃতিও প্রশংসনীয়। চিত্রে দু'খানি সংগীত সংযোজিত হ'য়েছে। 'রামের সুমতি' যে রস মাধুর্যে পরিপূর্ণ,তাতে সংগীতের কোন প্রয়োজনই ছিল না। বিশেষ করে 'গহন কাননে বাঁশী বাজে গো' গানখানি কাহিনীর মূল ধর্মকে কিছুটা আঘাত করেছে বৈকী! কর্তৃপক্ষকে অন্ততঃ এই গানখানি বাদ দেবার জন্য আমরা অনুরোধ করেছিলাম, জানিনা সে অনুরোধ তাঁরা রক্ষা করেছেন কিনা। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন-এর ছোটবাবুর সংগে এ বিষয়ে টেলিফোন যোগে আমাদের কথাবার্তা হয় এবং তিনি বলেন, নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন। যদি তাঁরা গান খানি ইতিমধ্যে বাদ দিয়ে থাকেন—তবেত ভালই, নইলে গানখানিকে বাদ দিতে আমরা অনুরোধ কচ্ছি।

মোটের উপর চিত্রখানি সর্বশ্রেণীর দর্শকদের খুশী করতে পারবে। বাংলার চিত্রামোদী জনসাধারণ রামের সুমতির পৃষ্ঠপোষকতা করে আশা করি কর্তৃপক্ষকে কিশোরোপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহীত করে তুলবেন। —শীলভদ্র

ঘরোয়া—

মিনার,বিজলী, ছবিঘরে মুক্তিলাভ করেছিল, এ.এল্, প্রডাক্সনের প্রথম বাংলা চিত্র। কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন মণি ঘোষ। অভিনয় করেছেন মলিনা দেবী, শিশির মিত্র, অশোকা গোস্বামী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোঃ প্রভৃতি।

একটা বৈদেশিক গল্পের ছায়াবলম্বনে বর্তমান চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠলেও, ঘরোয়ার কাহিনী চিত্রোপযোগী ছিল। ঘরোয়া আমাদেরই মতো মধ্যবিত্ত একটি ঘরের কাহিনী—যেখানে প্রেম আসে কালের জোয়ারে, আঘাতে ও ব্যাঘাতে, অভাবে ও অভিযোগে, নির্দিষ্ট নিশ্চিত পথে আসে বিরহ ও বেদনা, আবার হয়তো নিয়তির প্রচ্ছন্ন হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে মিলনের চাঁদিমা। কাহিনীর পরিণতিতে নায়িকার মাঝে জীবিতা ও মৃতা মা'র যে দ্বন্দ্ব লেখক দেখিয়েছেন, তার করুণ আবেদন ব্যর্থ হবার নয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক গতানুগতিকতার সস্তা বুলি ও ধ্বনি ঘরোয়ার পরিবেশকে আবিল করে তোলেনি বলেই দর্শকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌বার সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রীযুক্ত মণি ঘোষকে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সম্বন্ধে কয়েকটি ত্রুটির প্রতি সচেতন না করে পারছি না। প্রথমতঃ ডাঃ রায়ের গবেষণাগারের কর্মীরূপে তিনটি ভাঁড়কে যে পরিস্থিতিতে ও যে সময়ে ছ্যাব্‌লামি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাতে চিত্রনাট্যের গতি ও রস বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। পার্টিতে ডাঃ রায়ের সংগে দেখা হওয়ার পর থেকে অঞ্জনার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা পর্যন্ত চিত্রাংশকে
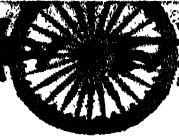
অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত করা হ'য়েছে। কাহিনীর সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা সত্বেও চিত্রটি প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোটেই জমাট হয়ে ওঠেনি, এর জন্যে আমরা পরিচালককেই দায়ী করবো।

নায়িকার ভূমিকায় মলিনাদেবীর অভিনয়কে প্রশংসা করবো, নায়কের ভূমিকায় শিশির মিত্র মলিনার পাশে যে জড়তাহীন অভিনয় করেছেন তার প্রশংসা করবো। তবে তাঁর চেহারা দর্শকমন জয় করতে বেশ বাঁধার সৃষ্টি করবে বলেই মনে হয়। অশোকা গোস্বামী মাতৃহারা আদরিণী অভিমানিনী মেয়েটির ভূমিকায় প্রশংসা পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যেটুকু জড়তা ও ভীরুতা আছে ভবিষ্যতে সেটুকু দূর হলেই অশোকার সম্ভাবনাকে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারবো। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই।

ঘরোয়ার আলোকচিত্র প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণে বহু ত্রুটি আছে। সুরস্রষ্টা কালোবরণকে প্রশংসা করবো। গুরু-দেবের 'নতুন ক'রে পাবো বলে' গানটি ছবির পরিণতিকে অনেকটা সমৃদ্ধ ক'রেছে, এ ব্যাপারে গানের নির্বাচক ও তত্ত্বাবধায়ককে অভিনন্দন জানাই। —সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

চতুর্বিংশ বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী (গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট)

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের চতুর্বিংশ বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী আমরা দেখে এসেছি। গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাজই বর্তমান প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া পূর্বতন ছাত্রছাত্রী ও বর্তমান শিক্ষকগোষ্ঠীর কাজও আছে। সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে অন্যান্য বারের চেয়ে এবার ছাত্রেরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এমনকী শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্রদের কাজগুলি রেখে যদি তুলনা করে দেখা যায়—তাহলে গুরু-শিষ্যদের ভিতর যে খুব ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে তা মনে হয় না। ছাত্রদের এই কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের গৌরব শুধু তাদেরই প্রাপ্য নয়—তাদের শিক্ষকদেরও প্রাপ্য—যাঁরা তাঁদের সৃজনী ক্ষমতায় ছাত্রদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলছেন। তাই আমরা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক প্রত্যেককেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনীর পাশে এই প্রদর্শনীটী যে কোনদিক দিয়েই দুর্বলতার পরিচয় দেয়নি একথা দু'টী প্রদর্শনীই যাঁরা দেখেছেন—তাঁরাই স্বীকার করবেন। সমগ্রভাবে প্রত্যেক ছাত্রদের ভিতর যে সম্ভাবনার পরিচয় পেয়েছি, তাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি। তবু ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন শিল্পী ও তাঁদের সৃষ্টির নামোল্লেখ করতে চাই। প্রথমেই মডেল বিভাগের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সতীশ চক্রবর্তীর কথা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ১৫৯ নম্বরের 'নটিবয়' মডেলটি পুরস্কার পেলেও প্রত্যেকটি মডেলেই তাঁর কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে। তাঁর 'ডেডসোল'ও আমাদের আকৃষ্ট করেছে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর রথীন্দ্রনাথ মিত্রের বেনারস লেন—বেগার্স কলোনী—জ্যোতিলাল অধিকারীর ক্লাউডস্, লোনলি কটেজ, রণেন আয়ন দত্তের 'এগেন্স্ট দি ক্লাউডস্, হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্যের তালপুকুর, কমল বসুর দি ষ্টেবল, সন্তোষ কুমার বসুর ষ্টিল লাইফ, নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রাগলিং হিউম্যানিটি, বিজন বিহারী চৌধুরীর পাথুরিয়া পট্টি, এস্কেচ্ অফ্ এ পিকনিক, অনুগ্রহ দাসের এ পোষ্টার, যতীন দাসের পোষ্টার (২৬৪), চিত্ত দাশগুপ্তের এ রেফিউজি, এ পেজ্যাণ্ট, সীতেশ গুপ্তের মহিষমর্দিনী, সোমনাথ হোরের দুঃখীরামের মা, গান্ধীজীর প্রেয়ার মিটিং, কুমারী চিত্রলেখা মজুমদারের নুন, কুমারী শান্তা মজুমদারের ষ্টিল লাইফ, কুমারী অমিয়া সেনের কাজ, গায়ত্রী দত্তের শ্রীলক্ষ্মী, বাণীপ্রসাদ মজুমদারের ভয়েজ অফ্ বিজয় সিংহ টু সিলন, সুখদেব সাহার এ টেম্পল অফ্ দক্ষিণেশ্বর, চিন্তাহরণ মালোর দি হাউস, ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের চতুরশর্মা প্রভৃতি আমাদের খুবই খুশী করেছে। আমরা এই প্রসংগে যে সব শিক্ষক ও ছাত্রেরা আমাদের প্রতিনিধিদল ও আমার সংগে থেকে প্রদশনী দেখতে আমাদের সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে নিচ্ছি। —মণিদীপা

শ্রীমতী রেণুকা রায়ের সংগে মণিদীপার সাক্ষাৎকার

২১ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭। রবিবার। সকাল সাড়ে নয়টা। শিল্পীসংঘ বাংলার উদীয়মান অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন করে স্বর্গত শিল্পীর প্রতি তাঁর গুণগ্রাহীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সুযোগ দিয়েছেন। রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে সম্পাদকের সংগে আমরাও কয়েকজন কর্মী এই শোকসভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। কিন্তু যেয়ে শুনলাম, সভার কার্য আরম্ভ হ'তে দেরী আছে। এদিকে সেদিনই শ্রীমতী রেণুকা রায়ের সংগে আমাদের সাক্ষাৎকারের কথা বহুপূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে ছিল। সকাল বেলাই শ্রীমতী রায়ের কাছ থেকে অচিন্ত্যকুমার আমাদের নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তাঁকে নিয়েই আমরা শোকসভাতে উপস্থিত হলাম—উদ্দেশ্য ছিল সভায় যোগদান করে শ্রীমতী রায়ের বাড়ীর দিকে রওনা দেবো। কিন্তু সভা আরম্ভ হবার দেরী দেখে সকলের অনুমতি নিয়ে শিল্পীর প্রতিভার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি রেণুকা-রায়ের বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। অন্যকাজে ব্যস্ত থাকায় শ্রীপার্থিবকে এবার সংগে পেলামনা—আমার সংগে চল্লেন রূপ-মঞ্চ সম্পাদক স্বয়ং। শ্রীপার্থিবের সংগে কয়েকটী পরিক্রমায় ঘুরে সংকোচের বাধা অনেকটা কাঁটিয়ে উঠেছিলাম—ভুল ত্রুটি যা হতো, নিজেরাই আপসরফায় তা শুধরে নিতাম বন্ধুর মতো। এবার সম্পাদক সংগে থাকাতে বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। গাড়ীতে যেতে যেতে নানা প্রশ্নের আলোচনার ভিতর দিয়ে এই বিব্রত ভাবটাকে কাটিয়ে নিতে চাইলাম—খানিকটা কৃতকার্যও হলাম। অবশেষে শ্রীমতী রেণুকা-রায়ের প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ীর সামনে যেয়ে আমাদের গাড়ী থাম্‌ল। অচিন্ত্যকুমার আগে নেমে পড়লেন, পিছনে পিছনে আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। শ্রীমতী রেণুকা সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে এলেন আমাদের অভ্যর্থনার জন্য। তাঁর মিষ্টিহাসি মিশ্রিত অভ্যর্থনাকে আমরা অন্তরের সংগে গ্রহণ করলাম। তাঁর সাথে দোতালার বৈঠক ঘরে গিয়ে বস্‌লাম। দেয়ালে শ্রীমতী রায়ের অভিনীত বিভিন্ন চিত্রের বিভিন্ন প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টি পড়লো। কিছুক্ষণ ধরে দেখতে লাগলাম—এমন সময় শ্রীমতী রায় বল্লেন—"যা শীত পড়েছে, আগে একটু কফি খেয়ে নিন, তারপর কথাবার্তা হবে।" আমরা আপত্তি করলাম না। কার্যক্ষেত্রে শুধু কফি নয়, তাঁর সংগে আরো অনেক কিছুই শেষ করা গেল। শরীরটাকে চাংগা করে নিয়ে আমি আমার পরিক্রমার খাতা খুলে বস্‌লাম। শ্রীমতী রায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করছি আর উত্তর গুলো টুকে নিচ্ছি।

ছোটবেলা থেকেই শ্রীমতী রায়ের চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মে। "ভাগ্যলক্ষ্মী" ছবিটি দেখে তিনি চলচ্চিত্রের দিকে খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং কি করে একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী হবেন সেই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসে। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি পূর্ণ-থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন এবং তৎকালীন অন্যতমা জনপ্রিয়া অভিনেত্রী উমাশশীর সংস্পর্শে আসেন। উমাশশী তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন - ভবিষ্যত অভিনেত্রী জীবনের প্রতি উৎসাহিতও করে তুলতেন। ১২।১৩ বছর বয়সে শ্রীমতী রায়ের বড় হবার বাসনা প্রথম রূপলাভ করে "খাসদখল" চিত্রে গিরিবালার ভিতর দিয়ে। তারপর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁকে "মহানিশা" চিত্রের অপর্ণার চরিত্রে রূপদান করবার জন্য নির্বাচিত করেন। রেণুকা রায়ের অভিনয় প্রতিভা বিকাশ লাভের পথ খুঁজে পায়। তারপর তাঁকে আমরা দেখতে পাই নানা রূপে নানা চিত্রে—রজনী, বিষবৃক্ষ, নরনারায়ণ, প্রভাস-মিলন, বামনাবতার, ছিন্নহার, ঠিকাদার, অবতার, সমাজ, নারী, দিকশূল, মীনাক্ষী, হিন্দি রামানুজ, বন্দী, শহর থেকে দূরে, অভিনয় নয়, শ্রীদুর্গা, মানে-না-মানা, প্রতিকার, পথের সাথী, নতুন বৌ, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, কর্ণার্জুন, পোষ্যপুত্র, আজ (হিন্দি) মিলন, বঞ্চিতা, রাতকানা, পায়েরধুলা, কলংকিনী, জীবন সংগীনী,

নিবেদিতা প্রভৃতি চিত্রে। শ্রীমতী রেণুকা গানও জানেন এবং জীবনসংগীনী চিত্রে তাঁর গলার স্বরই আমরা শুনতে পেয়েছি। এখন তিনি একসংগে বন্ধুরূপে, যুগের দাবী তরুণের স্বপ্ন, শুধু ছবি ও স্বামী শঙ্করনাথ চিত্রে অভিনয় করছেন। তরুণের স্বপ্ন চিত্রে শ্রীমতী রায়ের ছোট বোন্‌ও এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করছে। চলচ্চিত্র ছাড়া তিনি গ্রামোফোনে "রাণীভবাণীতে" এবং রেডিওতে কৃষ্ণকান্তের উইল, বিসর্জন, নূরজাহান, ম্যাকবেথ, চন্দ্রনাথ, মরিচীকা, বিরাজ-বৌ, লাখটাকা, আবু হোসেন, আবর্তন, ঘটনা-চিত্রমালা, মডার্ণ শকুন্তলা, দেবীদুর্গা, গ্রীণ হোটেল, মায়ের দাবী, দুষমন, গোলকুণ্ডা, অপরাধ, ভক্ত-কা-ভগবান, বেকারী-কা-এলাহী, বিদুবৎ ও ব্ল্যাকআউটে অংশ গ্রহণ করেন। মঞ্চে রক্তের ডাক ও তেরশ-পঞ্চাশেও তিনি জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করেন। অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে মহানিশার অপর্ণা চরিত্র তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। আধুনিক চিত্রের মধ্যে ছিন্নহার, বন্দী, শহর থেকে দূরে, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, প্রভৃতি চিত্রের চরিত্রগুলি তাঁকে মুগ্ধ করেএবং এই চরিত্রগুলিতে অভিনয় করে নিজে যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহের পর্দাতে নিজের অভিনীত ছবিগুলি দেখতে তাঁর খুবই আগ্রহ হয়। ছবি দেখে এবং সমালোচনা পড়ে তাঁর দোষ ত্রুটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে সমর্থ হন এবং পরবর্তী ছবিতে তা সংশোধন করতে চেষ্টা করেন। পত্র পত্রিকার যথার্থ সমালোচনাতে তিনি দুঃখ বোধ করেন না বরঞ্চ দোষ ত্রুটি শুধ্‌রে নিতে উৎসাহিত হন। তাঁর চলচ্চিত্রে নামবার উদ্দেশ্য কি— এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী রায় বলেন যে, আর্থিক কারণে নয়, খ্যাতি এবং সখের জন্যই তিনি চলচ্চিত্রে যোগ-দান করেন। অর্থের দিকে কোদিনই তিনি দৃষ্টি দেন না। সত্যিকারের একজন শিল্পী হবার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয় করে যাওয়াই তাঁর আদর্শ। অর্থের লোভ তাঁকে তাঁর আদর্শচ্যুত করতে পারবেনা। এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর আছে। তিনি বলেন—"টাকা চাইলে অভিনয় হয়না—অভিনয় করতে পারলে টাকা আসে"। অনেকের মনে এই বিশ্বাস নেই বলেই অনেক উদীয়মান শিল্পী অতি সহজেই অর্থের মোহে নিজের প্রতিভা বিকিয়ে অকালে নিঃশেষ হয়ে যান। অভিনেত্রী জীবনে অভিনয় শিক্ষা সম্বন্ধে কারো সাহায্য পেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত মিত্র সত্যিকারের যত্ন নিয়ে অভিনেতৃদের শিক্ষা দেন। পরিচালক রূপে অভিনেতৃদের সবদিক দিয়ে সাহায্য ও সুযোগদানে শ্রীযুক্ত মিত্র সহযোগিতায় শিল্পীদের উৎসাহিত করে তোলেন। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ, দেবকী বসু, মধু বসুও অভিনেতৃদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেন। অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত লোকের অভাব আছে আমাদের চলচ্চিত্র জগতে, এই অভাব দূর হলে অভিনেতৃদের কাছ থেকে উন্নততর অভিনয় আমরা পেতে পারি। এই প্রসংগে তিনি ইংরাজী ছবির উল্লেখ করেন। ইংরাজী ছবি তিনি সুযোগ পেলেই দেখে নেন এবং এর অভিনয় ভংগীমা যে অনুকরণীয় তা'ও স্বীকার করেন। বৈদেশিক অভিনেতৃরা নিজ নিজ চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে যে যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করেন তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিটী ছবিতে। আমাদের দেশের অভিনেতৃরা তাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন থাকেননা-কাজেই চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ওঠেনা। এদিকে অভিনেতৃ ও অভিনয়-শিক্ষাদাতাদের সজাগ দৃষ্টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে মলিনার অভিনয় নৈপুণ্য শ্রীমতী রায়কে মুগ্ধ করে। তারপর পদ্মাদেবীর সহজ সরল অভিনয়ও তিনি ভালবাসেন। অভিনেতাদের মধ্যে স্বর্গতঃ দুর্গাদাসের অভিনয় প্রতিভার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তারপর ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় তাঁর ভাল লাগে। সরযুবালার মঞ্চাভিনয়ও তিনি দেখতে ভালবাসেন।

চলচ্চিত্রের সার্থক রূপ কি হওয়া উচিত—এই প্রসংগে তিনি বলেন যে, চিত্র শুধু আনন্দদায়ক হলেই চলবেনা, এর ভিতর দিয়ে জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি-

মূলক কিছু প্রচার করবার দায়িত্বও নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে জনসাধারণকে তার উপযুক্ত করে তুলবার দায়িত্ব নেবার পক্ষে চলচ্চিত্রের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত আর কিছুই নেই। কাজেই এদিকে প্রযোজক এবং শিল্পী সকলেরই আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন। নবাগত শিল্পীদের মাঝে যে মনোভাব প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিবর্তন দরকার। পুরানো শিল্পীদের প্রতি তাঁরা যে অবজ্ঞা মিশ্রিত মনোভাবের পরিচয় দেন তা' তাঁদের পক্ষেই ক্ষতিকর। কারণ, পুরানো শিল্পীদের অভিনয়-আদর্শ আজও অনুকরণীয়। শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস, ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, মলিনা, উমাশশীর ন্যায় অভিনেতৃ আর একটিও আজও খুঁজে পাই না—কাজেই তাঁদের প্রতিভাকে নবাগত শিল্পীরা অবনতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাবে এটুকু আশা আমরা রাখি। তাঁরা আজও শিক্ষার্থী—তাঁদের পথপ্রদর্শকদের অনুকরণ ক'রে চলতে হ'লে অন্তরে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিনয়ও থাকা চাই। এই প্রসংগে প্রযোজকদের প্রতি শিল্পীদের মনোভাবের প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থের লোভে প্রযোজকদের যথার্থ অবস্থা অনুভব না করে তাঁরা অর্থের উপর চাপ দিয়ে প্রযোজকদের বিব্রত করে তোলেন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার সময় জোর করে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখেন —এতে অনেক সময় প্রযোজকগণ তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হয়েও পড়েন—কাজেই তাঁরাও শিল্পের পরিবর্তে অর্থপ্রাপ্তির দিকেই লক্ষ্য রেখে চিত্রটিকে অর্থ প্রাপ্তির অস্ত্ররূপে রূপায়িত করে তোলেন। এর ফলে সবকিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়—চিত্রে না থাকে আদর্শ না থাকে শিক্ষণীয় কিছু—শুধু কতকগুলি সস্তা মামুলী ধরণের ছবি দিনের পর দিন প্রেক্ষাগৃহে চেপে বসে থাকে।

নানা সমস্যার আলোচনা সেরে আমরা আবার ফিরে এলাম শ্রীমতী রেণুকার জীবনে। তিনি বলেন, কাজই তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন—ষ্টুডিওতে কাজ নিয়ে থাকার চেয়ে তাঁর কাছে আনন্দদায়ক আর কিছু নাই। তারই ফাঁকে তিনি যেটুকু অবসর পান বই পড়ে এবং পালিত বিড়াল ও খরগোস নিয়ে মেতে থাকেন। সাময়িক পত্র পত্রিকার মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা ও রূপ-মঞ্চ তিনি নিয়মিত পড়েন। দেশের রাজনৈতিক খবরাখবর নেওয়া তাঁর নেশা। রূপ-মঞ্চের সম্পাদকের দপ্তরের প্রশ্ন তাঁর কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। রূপ-মঞ্চের নির্ভীক সমালোচনা তাঁকে বিস্মিত করে। জাতীয় নেতাদের মাঝে সুভাষচন্দ্রকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করেন। বর্তমানে জহরলাল জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক বলে তিনি মনে করেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের লেখা তাঁকে সত্যিই আনন্দ দেয়। আধুনিক গায়ক গায়িকাদের মধ্যে সন্তোষ সেনগুপ্ত, সাবিত্রী ঘোষ, উৎপলা সেন, কল্যাণী দাসের সুরেলা স্বর তাঁর মনে আনন্দের পরশ লাগায়।

প্রায় তিন ঘণ্টা আমাদের আলোচনা চলছিল, সামনের বড় ঘড়িটায় দেখি প্রায় একটা বাজে। পাততাড়ি গুটিয়ে রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে জানালাম, আমার কাজ আজকের মত শেষ হয়েছে। সম্পাদক মশাই এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা হয়ে বসেছিলেন—এবার গা ঝারা দিয়ে উঠ্‌লেন। অচিন্ত্যকুমারও সম্পাদকের অনুসরণ করলেন। শ্রীমতী রায়ের কাছ থেকে করজোড়ে বিদায় নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালুম। শ্রীমতী রায় মিষ্ট হাসি হেসে সিঁড়ি অবধি এলেন সংগে সংগে। অবশেষে গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। সারাপথ ভাবতে ভাবতে এলাম—বাইরে থেকে কতরকম ধারণা আমাদের এঁদের সম্পর্কে! কাছে এলে এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়। শ্রীমতী রায়ের সহজ, সরল, অকপট ব্যবহার তাঁকে আমার আপন জনের মতই করে তুলেছে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। এই কয়েক ঘণ্টার মধুর স্মৃতি শুধু আমার পরিক্রমার খাতার পাতায়ই লেখা থাকবে না—আমার মনেও অংকিত থাকবে চিরদিন—তাঁর মধুর মিষ্টি ব্যবহারের কথা। —মণিদীপা

মাটি ও মানুষ

গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনা
• সুধীরবন্ধু •
সঙ্গীত পরিচালনা • খগেন দাশগুপ্ত
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী • বিভূতি দাস
আলোক চিত্র-শিল্পী • দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দ যন্ত্র শিল্পী • পরিতোষ বসু
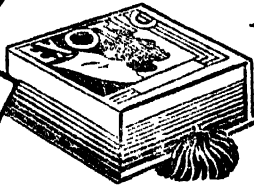
ওরিয়েন্ট পিকচার্স

ওরিয়েন্ট পিকচার্সের 'বিচারক' চিত্রের চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরীতে শেষ হয়েছে। বিচারক চিত্রে দেখা যাবে একদিকে অশ্রুর বন্যা অপর দিকে কর্তব্যের প্রতীক "বিচারক" পাষাণের ন্যায় অচল অটল। অশ্রু কি শুধু পাষাণে আছার খেয়েই মরবে? এই ঘাত প্রতিঘাত নিয়েই বিচারকের কঠোর করুণ কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। এই চিত্রে রূপদান করেছেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ দাস, দেবী চৌধুরী, কালী চক্রবর্তী, তারা মুখোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মণি মজুমদার (এঃ) বাণীবাবু, অলকা দেবী, ঝরণা দেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়) কনক ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার প্রভৃতি। আবহ সংগীত ও সুর দিয়েছেন দক্ষিণা মোহন ঠাকুর ও পূর্ণ মুখোপাধ্যায়। পরিবেশনের ভার নিয়েছেন কোয়ালিটি ফিল্মস। চিত্রটি শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে।

ভ্যারাইটী ফিল্মস

এঁদের আগামী পৌরাণিক চিত্র "ভক্ত রঘুনাথ"-এর কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। এঁদের হিন্দি ছবি 'P. W. D. (প্রেমকী দুনিয়া) শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। মিঃ সেনের চরিত্রে ছবিবাবু অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় দেবেন। অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে বসির হোসেন, রণজিৎ রায়, অলকানন্দা ও আমিনা খাতুন। এই ছবি খানিতে সুর দিয়েছেন সুবল দাশগুপ্ত।

চলচ্চিত্রে শহীদ ক্ষুদিরাম

লক্ষ্ণৌর খ্যাতনামা যন্ত্রবিদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বসু প্রযোজিত কলানিধি প্রডাকসন্সের প্রথম বাংলা চিত্র বাংলার বীর শহীদ ক্ষুদিরামের জীবনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। ক্ষুদিরামের মাতৃসমা বড় দিদি শ্রীযুক্তা অপরূপা দেবী ও তদীয়া পুত্র শ্রীযুক্ত ললিত মোহন রায় লিখিত 'শহীদ ক্ষুদিরামে'র ফিল্ম সত্ব এতদসম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসু সংগ্রহ করেছেন এবং ক্ষুদিরামের উত্তরাধিকারীরা শ্রীযুক্ত বসুকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের ওপর চিত্রনাট্য রচনার ভার দেওয়া হয়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন কৃতী চিত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন গুহ।

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠান

'মাটি ও মানুষ' এখন মুক্তির দিন গুনছে। সুধীরবন্ধু লিখিত অমল তরুর আত্মকথা অবলম্বনে মাটি ও মানুষ গড়ে উঠেছে। এই পৃথিবীতে মানুষের মাটির নেশাই বড় নেশা। এরই জন্য আত্মকলহ, এরই জন্য সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস, এরই জন্য জেগে ওঠে পৃথিবীব্যাপী মহামারী। অথচ মানুষের এই পৃথিবীতে প্রয়োজন মাত্র সাড়ে তিন হাত জমি। এই ভাবধারাকে কেন্দ্র করে নূতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে সুধীরবন্ধু এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। এতে অভিনয় করেছেন নরেশ মিত্র, বিমান, সুধীর, তুলসী, নবদ্বীপ গীতশ্রী, শ্রীমতী মুখার্জি, মণিকা ঘোষ, রেবা বসু। পরিচালনা করেছেন সুধীরবন্ধু।

বিশ্বভারত ফিল্মস লিঃ

বাংলা দেশের গতানুগতিক ধারা এড়িয়ে প্রতিদিনকার খুঁটি-নাটি রাজনৈতিক ও প্রেমের ভ্যাপসা আবহাওয়ার বাইরে ছায়াছবির জগতে যে একটা গঠনমূলক নবীনতার সৃষ্টি করা যেতে পারে সেই কল্পনাকে বাস্তবরূপ দেবার কাজেই চলেছে এই কোম্পানীর প্রচেষ্টা। সত্যিকারের সাফল্য কার্যক্ষেত্রে কতখানি আসবে এখন সেটা বলা কঠিন, কিন্তু এ কথাটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, কর্তৃপক্ষ ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। এঁদের প্রথম ছবি "বাড়ী ভাড়া" এবং পরে "হে তুমি অগ্রগামী"। দুই গ্রন্থের লেখক নবাগত হলেও

ভাবীকালের সাহিত্যের আসরে এঁদের স্থান হবে। এর পরিচালনাও করবেন একজন নবাগত।

হিন্দুস্থান ফিল্মস লিঃ

এঁদের বাংলা বাণীচিত্র 'সংসার' ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সমাপ্তি পথে এগিয়ে এসেছে। সংসার-এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র, সন্ধ্যারাণী,রবীন,সুপ্রভা, রবি রায়, জয়নারায়ণ, ইন্দু মুখো, শান্তি গুপ্তা, বন্দনা দেবী, নিভাননী, রেবা প্রভৃতি। সুরসংযোজনা করেছেন সুবল দাশগুপ্ত এবং কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন আশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্যাসন্যাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ

মনোজ বসু রচিত 'ভুলি নাই' চিত্রের কাজ শ্রীযুক্ত হেমেন গুপ্তের পরিচালনায় প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চিত্রখানির বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন রাধামোহন, নিবেদিতা দাস, সুদীপ্তা রায়, মাষ্টার শম্ভু, সুপ্রভা মুখার্জি, প্রদীপ বটব্যাল প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত অজয় কর ও বীরেন নাগ যথাক্রমে চিত্র-গ্রহণ ও শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

মাতাজী চিত্র প্রতিষ্ঠান

নবগঠিত মাতাজী চিত্র প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই তাঁদের প্রথম ছবি 'মায়ের পূজার' কাজ শুরু করবেন। ভারত ব্যবচ্ছেদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে নবীন নাট্যকার মন্মথ চৌধুরী এই চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন।

রূপশ্রী লিঃ

রূপশ্রী লিঃ-এর বাংলা বাণীচিত্র শাঁখা সিঁদুর একযোগে আলেয়া, কালিকা ও ছায়া প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির দিন গুনছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের "বুভুক্ষা" নাটককে কেন্দ্র করে বর্তমান চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ। চন্দ্রশেখর নামে ইনি সাংবাদিক মহলে সুপরিচিত এবং এঁর পূর্বেকার চিত্র 'মৌচাকে ঢিল'-এর সংগেও দর্শক সাধারণ পরিচিত আছেন। শাঁখাসিন্দুর-এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী, দীপক মুখোপাধ্যায়, মলিনা, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নিভাননী, হারাধন মুখুজ্জে, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত গোপেন মল্লিক।

নৃত্য-ভারতী

গত ৮ই ডিসেম্বর কালিকা রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস পরিচালিত নৃত্য-ভারতী ও সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নৃত্য নাট্য রূপকথা ও পারমিট অভিনয় করে। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রী কমলকৃষ্ণ রায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ছাত্রীদের উৎসাহ দেন। যন্ত্রসংগীত পরিচালনা করেন অমিয়কান্তি এবং ব্যবস্থাপনা করেন নীলিমা দাস ও জয়া দাস।

কনোজ ফিল্ম প্রডিউসিং কোং লিঃ

শ্রীনিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রক্ততিলক' কাহিনীকে কেন্দ্র করে এঁদের বর্তমান ছবির মহরৎ উৎসব কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে।

সোসাইটি সিনেমা

করপোরেশন প্লেসে নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহ সোসাইটি গত ১৬ই জানুয়ারী দারোদ্ঘাটন করেছে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকের শুভ মহরৎ।—

হাওড়ায় বাঁটরা পারিজাত সমাজের প্রমোদ সংসদের সভ্যবৃন্দ এই বৎসরের শিবরাত্রি উপলক্ষে স্বাধীন ভারতে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রথম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ও তৎসংগে তাঁরই রচিত সামাজিক নাটক "প্রফুল্ল" ই, আই, আর, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করবার সংকল্প করেছেন। বিগত ১২শে পৌষ, রবিবার, বৈকাল ৫ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় কালীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে ৯,
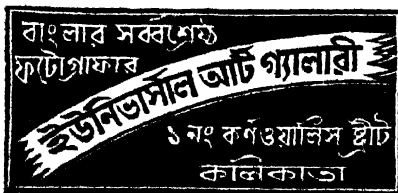
নরসিংহ দত্ত রোডস্থ সমাজ ভবনে উক্ত নাটকের "মহরৎ"—উৎসব সম্পাদিত হ'য়েছে। সমাজের প্রধান কর্মকর্তা শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী কর্তৃক পুরোহিত বরণের পর উদ্বোধন সংগীত গাহেন শ্রীগণেশ দাস। ইহার পর নাটকের পরি-চালক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় "কালীঘাটে" অনুষ্ঠিত মায়ের পূজার প্রসাদ সকলকে বিতরণ করেন। কুমারী পরাগরেখা সরকার ও শ্রী ফণিভূষণ সামন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হতে আবৃত্তি করেন। সংগীতের আসরে উৎসবের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন যথাক্রমে প্রতিমা অধিকারী, কল্যাণী ঠাকুর, শিবানন্দ অধিকারী ও যুথিকা মণ্ডল। এর পর পুরোহিত কালীশবাবু মহাকবির আলেখ্যে মাল্যদান করে ত্রিবর্ণ ফিতায় বাঁধা "প্রফুল্ল" নাটকখানি শুভমহরতের জন্য বন্ধন মুক্ত করেন। তিনি বলেন, "এই উৎসবের পৌরহিত্য করবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না। তথাপি আপনাদের প্রধান কর্মকর্তা ব্যোমকেশবাবুর আন্তরিকতায় আমাকে এই ভার গ্রহণ ক'রতে হয়েছে। প্রথমেই বয়োজ্যেষ্ঠদের জানাচ্ছি আমার প্রণাম এবং কনিষ্ঠগণকে জানাই আমার প্রাণের অভিনন্দন। কলকাতার অনেকেই ব'্যাটরা পারি-জাত সমাজের নাম জানেন, সুতরাং এই সমাজ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি না। নাটক সম্বন্ধেও বেশী বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে আমি যা ব'লব, সেগুলো আমার আবেদন ব'লেই গ্রহণ করবেন। নাট্যাভিনয়ের একটা আদর্শ নিশ্চয়ই আছে। আগে নাটক আবদ্ধ ছিল রাজরাজাদের বা বড়লোকের বিলাসব্যসনের মাঝে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রই নাটকের এই সীমাবদ্ধ গণ্ডী ভেংগে তাকে নিয়ে এলেন সাধারণের কাছে—সাধারণ নাট্যা-লয়ে। নাট্যশিল্প এবং অভিনয়ের ভিতর দিয়ে কিভাবে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করা যায়—গিরিশচন্দ্রের প্রতিটি নাটক বিচার করলে তা খুব ভালভাবেই বোঝা যাবে। নাট্যশিল্পের ভিতর দিয়ে তিনি জ্ঞানালোক বিতরণের যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তা আজ স্তিমিত হ'লেও শিশিরকুমারের বিরাট প্রতিভায় তার আলোকপাত দেখতে পাই। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে আমরা হয়ত এই প্রতিভার ঠিক

বিচার করতে পারবো না। বর্তমানে গিরিশচন্দ্রের সিরাজ-দ্দৌলা নাটকাভিনয়ের প্রয়োগকর্তা হিসাবে শিশিরকুমার কী দিয়ে কী দিয়েছেন এটাই আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। নাট্যান্দোলনের ভিতর দিয়ে জাতীয় শিল্পকলার প্রসার সম্বন্ধে কোন নিয়ম পদ্ধতি আজ পর্যন্তও প্রস্তুত হয়নি। আজ সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়কে এই সব ভার নিতে হবে এবং এই সব নিয়েই তাঁদের বাঁচতে হবে। সম্প্রদায়ে যাঁদের নাট্য প্রতিভা রয়েছে তাঁদের দিয়ে যুগোপযোগী নাটক রচনা করাতে হবে এবং সেই সব নাটক অভিনয় করবার বন্দোবস্ত করলে দেশের প্রভূত উপকার করবার সুযোগ পাবেন। নাটকের প্রচারধর্মও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে। শিশির কুমার এমন অনেক অখ্যাত শিল্পীকে খ্যাতি সম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন—যাঁদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন এমন অভিনেতা খুব কমই আছেন। শিশিরবাবুর কাছে ঋণী নন এমন নট বা নটি খুব কমই আছেন। প্রত্যেক নট বা নটিকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন য', অন্য কোন মঞ্চাধ্যক্ষের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। আপনাদেরও নূতন শিল্পী গ'ড়ে নিতে হবে।" এর পর উদ্যোগসচিব শ্রীইন্দুভূষণ পালচৌধুরী পুরোহিত মহোদয় ও সমাগত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান প্রসংগে সমাজের কতিপয় সভ্যপরিকল্পিত "পারিজাত চিত্র প্রতিষ্ঠান" ও সমাজের আগামী রজত জয়ন্তী উৎসব সম্বন্ধে কালীশ বাবুর পরামর্শ ও সহযোগিতার

আবেদন জানান। তাহার পর প্রধান কর্মকর্তা কালীশ বাবুর সহিত সভ্যগণকে পরিচয় করিয়ে দেন। উৎসবের শেষে প্রমোদ সংসদের সভ্যগণ সকলকে জলযোগ দ্বারা পরিতুষ্ট করেন। এই উৎসব সম্পাদনে অন্যতম সহকারী সমাজপতি শ্রীবিধুভূষণ পালচৌধুরীর সময়োচিত সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বন্ধন ও মুক্তি

গত ৪ ঠা পৌষ, শনিবার সেণ্ট জ্যাভিয়াস কলেজ হলে আন্তঃ-কলেজীয় নৃত্যনাট্য 'বন্ধন ও মুক্তি' এবং নাটক 'সমন্বয়' অভিনীত হলো। রূপ-মঞ্চের প্রতিনিধি হ'য়ে অনুষ্ঠানটি দেখে এলাম।

'বন্ধন ও মুক্তি' শুধু মেয়েরা রূপায়িত করেছেন আর 'সমন্বয়'-তে ছিলেন শুধু ছেলেরা। নৃত্যনাট্যে 'পৃথিবী' ও 'মায়ার' ভূমিকা বেশ মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছিলো, কিন্তু শেষ দৃশ্যের অবতারণায় আরো সুরুচি ও শুচিতার পরিচয় পেলে দর্শকেরা খুশী হোতেন। 'সমন্বয়' নাটকে বিজ্ঞান ও কলার সমন্বয় দেখানো হ'য়েছে। নাটকে বৈজ্ঞানিক ডাক্তারের ভূমিকাটি উপভোগ্য হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের ব্যবহারিক সাফল্য আশানুরূপ না হলেও এর প্রয়োজনীয়তাকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বীকার ও সমর্থন করি। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হ'তে মুক্তি দিতে তরুণ ছাত্রসমাজকে এরকম প্রীতিসম্মেলন অনেকটা সহায়তা ক'রবে।

স্নেহময়ী স্মরণে—

খ্যাতনামা চিত্র সাংবাদিক ও প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালের স্ত্রী ৺স্নেহময়ী দেবী সম্প্রতি দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। স্নেহময়ী স্বর্গত ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর দৌহিত্রী এবং শ্রীযুক্ত বি, কে, লাহিড়ী ব্যারিষ্টার এ্যাট-ল-র একমাত্র কন্যা ছিলেন। ১৯২০ খৃঃ শ্রীযুক্ত সান্যাল যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন স্নেহময়ীর সংগে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। স্নেহময়ীও তখন লরেটো কনভেণ্ট থেকে সবেমাত্র জুনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় সর্ব বিষয়ে সর্বপ্রথমা হ'য়ে উত্তীর্ণা হ'য়েছেন। সুধীরেন্দ্র সান্যাল পুঁটিয়ার স্বর্গতাঃ রাণী স্বর্ণময়ী দেবীর পৌত্র। পনেরো বৎসর বয়সের সময় পিতৃমাতৃহীন হন। আঠারো বৎসর বয়ক্রমকালে বিবাহ করেন। সুধীর সান্যাল ও স্নেহময়ীর বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ তিরিশ বৎসর কাটে পরম আনন্দ ও শান্তির ভিতর দিয়ে। বন্ধুর মত জীবনের বন্ধুর পথের সকল বাঁধা বিপত্তি তাঁরা পরস্পরের সাহায্যে ডিঙ্গিয়ে চলতেন। বি, এ, পাশ করবার পর শ্রীযুক্ত সান্যাল যখন বম্বেতে 'মিল ষ্টোস অর্গানাইজিং' শিখবার জন্য গমন করেন, স্নেহময়ী এই অবসরে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যানুশীলনে নিজেকে নিয়োগ করেন এবং নাটোর মহারাজার সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত ভূবনেশ্বর বাগচীর নিকট প্রাচীন সংগীত শিক্ষালাভ করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, শ্রীযুক্ত রসময় ভট্টাচার্যের নিকট স্নেহময়ী দীর্ঘদিন ফাইনআর্টস শিক্ষালাভ করেন। সীবন শিল্পেও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। সীবন শিল্পের বহু নিদর্শনই তিনি রেখে গেছেন।

স্বর্গতা স্নেহময়ী

স্নেহময়ী খুব ধর্মাপ্রাণা মহিলা ছিলেন। মৃত্যুর বিশ বৎসর পূর্বে তিনি হাওড়ার শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুভাইদের ভিতর ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, বনোয়ারী লাল রায়, যোগেশ দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। স্বগতাঃ সরলা দেবীও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের একজন ভক্ত ছিলেন।

মৃত্যুকালে স্নেহময়ী তাঁর শোককাতর স্বামী ও দুইটি পুত্র—শ্রীমান সৌমেন্দ্র সান্যাল ও দীপ্তেন্দ্র সান্যালকে রেখে গেছেন। পুত্র দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত এবং সাহিত্য ও চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে স্নেহময়ী একটি পুত্র সন্তানকে হারান।

স্নেহময়ীর মৃত্যুতে শ্রীযুক্ত সান্যালও তাঁর পুত্রদ্বয়কে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই—ভগবানের কাছে এই মহীয়সী নারীর আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীযুক্ত সুশীল সিংহের স্ত্রী বিয়োগ

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্সের প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুশীল সিংহের সম্প্রতি স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। মাত্র তিন চার বছর পূর্বে শ্রীযুক্ত সিংহ বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর এই অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। ভগবান মৃতার আত্মার মঙ্গল করুন।

শেষ নিবেদন

শুক্রবার ৩০শে জানুয়ারী রূপবাণী চিত্রগৃহে ডি, জি, পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য শরৎচন্দ্রের-'আলোছায়া' কাহিনী অবলম্বনে চিত্র-রূপায়িত 'শেষ নিবেদন' মুক্তিলাভ করবে। শরৎচন্দ্রের কোন কাহিনী আজও অবধি রঙ্গমঞ্চে ও রূপালী পর্দায় ব্যর্থ হয়নি। দরদী কথাশিল্পী মানবমনের রহস্য ও অনুভূতি এমনভাবে তাঁর কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ করেছেন যা অন্য কোন রূপান্তরে ক্ষুণ্ণ হয়না। দেবতার নিকট সমর্পিতা এক তরুণীর জীবন মনে একটী মানুষ যে মোহ সৃষ্টি করেছিলো তাতে দেবতা হারিয়ে গেল দূরে-মানুষ হ'লো নিকটতম। তবু পরস্পরের মিলন সম্ভব ছিলনা এবং সেজন্য অপরীসীম বেদনায় ক্ষতবিক্ষত অন্তর পুনরায় দেবতার চরণে আশ্রয় নিতে ছুটল। কিন্তু সংসারের সকল কামনা বাসনার বিসর্জন কী এতই সহজ! অন্তরের এই মধুর ও করুণ দ্বন্দের আবর্তে যারা গিয়ে পড়ে তারা শুধু নিজেদেরই নানা সমস্যায় জড়িয়ে ফেলেনা—তাদের সংস্পর্শে যারাই আসে তারাও নিষ্কৃতি পায়না। শরৎচন্দ্রের মায়াময় লেখনী মানুষের জীবন নাটকের বিচিত্র সেই আলো ছায়ার কাহিনী লিখে গিয়েছেন। লোকে বলে, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় চিরকালই নারীচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। একথা সত্য—'শেষ নিবেদন' চিত্রকাহিনীতে নারীচরিত্রগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে চিত্রিত হ'য়েছে। শেষ নিবেদন পরিচালনা করেছেন অভিজ্ঞ চিত্র পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলী। সংলাপ রচনা করেছেন দেব-নারায়ণ গুপ্ত। বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন ছবি বিশ্বাস, শ্রীমতী মলিনা, সরযূবালা, ডিজি, নবদ্বীপ, অহী, কমল চট্টো, হরিদাস, রাম, আশা, তারা।

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্স

শনিবার ৩১শে জানুয়ারী সকাল আটটায় পরিচালক নীরেন লাহিড়ী তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভ্যানগার্ড প্রোডাক-সন্সের দ্বিতীয় কথা-চিত্রের মহরৎ করবেন। চিত্র-কাহিনীর নাম 'সাধারণ মেয়ে' রচয়িতা পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী দীপ্তি রায়, পাহাড়ী সান্যাল, শ্যামলাহা নীতীশ মুখোঃ এবং কয়েকজন নতুন শিল্পী এই চিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। সুর সংযোজনা করবেন রথীন চট্টোপাধ্যায়।

সিনেমা সেন্সার বোর্ড

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পশ্চিমবঙ্গ সিনেমা সেন্সার বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত করেছেন। (১) কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, সভাপতি (পদাধিকার বলে)। (২) পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এলাকার হেড কোয়াটার্স কর্তৃক মনোনীত এক ব্যক্তি। (৩) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে), (৪) পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের (ডিরেক্টর পদাধিকার বলে), (৫) মিঃ মোহাম্মদ রফিক, (৬) ডক্টর প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত পি, এইচ, ডি, (৭) শ্রী জে, সি, গুপ্ত, এম, এল এ (৮) মিঃ ই, এস, এম, আয়ুব, এম, এ, (৯) শ্রীযুক্তা সীতা চৌধুরী। সভাপতি ব্যাতীত অপর সদস্যগণের কার্যকাল ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে। পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে মন্তব্য করবার ইচ্ছা রইল।

রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধি দলের কলিকাতা বেতার কেন্দ্র পরিদর্শন

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে রূপ-মঞ্চ থেকে এক প্রতিনিধি দল কিছুদিন পূর্বে কলকাতা বেতারকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শ্রীযুক্ত রণেন আচার্যের সংগে আলাপ আলোচনা করেন। শ্রীমতী নীলিমা সান্যাল এই প্রতিনিধি দলটিকে কলিকাতা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি বিভাগে ঘুরিয়ে নিয়ে দেখান। বর্তমান সংখ্যায় স্থানাভাব বশতঃ বিশদভাবে এই পরি-ক্রমার বিবরণী প্রকাশ করা সম্ভব হ'য়ে উঠলো না।

শ্রীযুক্ত কমল বসু

লণ্ডন বি, বি, সির 'বিচিত্রার' প্রযোজক শ্রীযুক্ত কমল বসু কিছুদিন হলো কলকাতায় এসেছেন। রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে তাঁকে এক চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। বি, বি, সির তরফ থেকে স্থানীয় সাংবাদিকদের গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে অনুরূপ এক চা পানে আপ্যায়িত করা হয়। এ সম্পর্কে বি, বি, সি কর্তৃপক্ষ, তাদের দিল্লীস্থিত প্রতিনিধি মিঃ পাণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত বসুকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গত ২৩শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত বসুর সংগে ডাঃ বীরেশ্বর মিত্রের কণিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কণিকা রাণীর শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হ'য়েছে। আমরা নবদম্পতির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ছাত্রীগণ কর্তৃক বিন্দুর ছেলে ও উদয়ের পথে অভিনীত

শ্রীযুক্ত সুকুমার বারিকের উদ্যোগে 'দহলওদা' গ্রামে কাঁথি ব্রাহ্ম গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী আবাসের ছাত্রীগণ কর্তৃক 'উদয়ের পথে' ও 'বিন্দুর ছেলে' অভিনীত হয়। নাটক দু'খানি পরিচালনা ও প্রযোজনা করেন কুমারী লক্ষ্মী ত্রিপাঠী ও সুলতিকা বারিক। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন অনুপ ও যাদব—লক্ষ্মী ত্রিপাঠী, সুমিতা—দীপ্তি দাস, বৌদি ও প্রিয়নাথ—সুলতিকা বারিক, সৌরীন্দ্র ও মাধব—মণিকা সামন্ত, গোপা ও বিন্দু—শেফালিকা বারিক, বাড়ীওয়ালা ও এলোকেশী—চপলা মাইতি, জমিদার ও অন্নপূর্ণা—রেণুকা, অমূল্য—পারুল দাস, নরেন—মঞ্জু মাইতি, ভৈরব—সাধনা পয়ড়া, কদম—রেণুকা শাসমল। অভিনয়ে লক্ষ্মী ত্রিপাঠী, সুলতিকা বারিক ও শেফালিকা বারিক যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। দুটি নাটকের অভিনয়ই খুব সুন্দর হয়েছিল। আমরা ছাত্রীদের এই অভিনয় অনুষ্ঠানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ

এদের অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ পাল মহাশয়ের শোভাবাজার ষ্ট্রিটস্থিত বা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত পাল এক চা চক্রের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক খ্যাতনামা অভিনেতা ছবি বিশ্বাস শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ও নাট্যমঞ্চের দায়িত্ব ও জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। সভায় সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলীর পরিচালকেরা ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানকে সর্ব প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। উপস্থিতদের ভিতর শ্রীযুক্ত বলাই মজুমদার, অল্ডারম্যান, স্যার হরি শঙ্কর পাল, সরোজ দত্ত (কানুবাবু), সুখদেব সাহা, যোগেশ ঘোষ কাউন্সিলর, ডাঃ বি এন দে, শঙ্কর কুইয়া, গৌর পাল, কানাই পাল, রাখাল চক্র, হরিদাস মুখার্জি, ফকির ঘোষ, রাসবিহারী সরকার, শৈল রায়, বিজয় নন্দী, সুবোধ চন্দ্র বসু প্রভৃতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ বি, এন, দে, সুধীর চন্দ্র বসু, কানাই মজুমদার, সত্যেন ঘোষাল, বলাই ঘোষাল প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলীতে গ্রহণ করা যায়।

জাগ্রত শিল্পী চক্র

এদের উদ্যোগে গত ২৮শে নভেম্বর রঙমহল রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-নাট্য 'স্বাধীন ভারত' অভিনীত হয়। নাট্য রচনা, সুর সংযোজনা ও পরিচালনা করেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনা করেন মণিশঙ্কর।

সালকিয়া তরুণ দল

গত ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় সালকিয়া তরুণ দলের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে হাওড়া ই, আই, আর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'পরিণীতা' নাটক অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়। প্রথম জাতীয় সংগীতের পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ সভাপতি বরণ ও সমিতির কর্ম প্রচেষ্টা সাম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। এরপর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পালের পক্ষ থেকে জনৈক সদস্য সমিতির কর্ম বিবরণী পাঠ করেন। সর্বশেষে সভাপতি সৌখীন নাট্যান্দোলন ও জাতীয় সংগ্রামে নাট্যোভিনয়ের অবদান

সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন এবং হাওড়ার অধিবাসীবৃন্দকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়কে হাওড়া সহরে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করতে আবেদন জানান। সমিতির দুজন উৎসাহী কর্মী শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন্দ্র নাথ মণ্ডলের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে সভাপতি উপস্থিত জনসাধারণকে দণ্ডায়মান হয়ে এক মিনিটের জন্য মৌন থেকে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মঙ্গল কামনা করতে অনুরোধ করেন। এর পর পরিণীতা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কমিশনার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র বি, এল, মহাশয়। সংগীত পরিচালনা করেন—সুধীর চন্দ্র দাস। মঞ্চাধ্যক্ষ—বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মারক—প্রভাস চন্দ্র কুণ্ডু, কৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ বি, এল, সম্পাদক—মনীন্দ্রনাথ দত্ত ও মদন মোহন রাণা। অভিনয়াংশে ছিলেন—গোবিন্দ লাল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় ভূষণ কাঞ্জিলাল, সুশীল কুমার-বসাক, অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভূপতিনাথ ভঞ্জ, কালী প্রসাদ রায়, কার্তিক ঘোষ, নিরঞ্জন সরকার, ইন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন রাণা, শৈলকুমার ঘোষ, জয় গোপাল রায়, অনন্ত দেব বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় সর্বাংগ সুন্দর হ'য়েছিল।

মহামানব মহাত্মাজীর স্মৃতি-তর্পণ সংখ্যা

আগামী সংখ্যা রূপ-মঞ্চ মহামানব মহাত্মাজীর স্মৃতি-তর্পণ সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করবে। রূপ-মঞ্চের পাঠক ও লেখক গোষ্ঠী—চিত্র ও নাট্যজগতের সুধীবৃন্দ আশা করি রূপ-মঞ্চের এই স্মৃতি তর্পণে যোগ দেবেন।

রূপ-মঞ্চ প্রকাশে অনিয়মানুবর্তিতা

রূপ-মঞ্চ প্রকাশে আবার অনিয়মানুবর্তিতা দেখা দিয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিয়মিত সময়ে আমরা কাগজ প্রকাশ করতে পাচ্ছিনা। এর একমাত্র কারণ—কাগজ নিয়ে যে কালোবাজার চলছে—তা চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতে যে কয়টি কাগজের মিল আছে একমাত্র টিটাগড় ব্যাতীত কারোর সহযোগিতা আমরা ইতিপূর্বে পাইনি। তার কারণ, অন্যান্য মিলের যে সব দালাল রয়েছেন, তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠি এবং স্বার্থ ব্যাতীত অপর কোন খরিদ্দারকে এক 'সিট' কাগজ দিতেও রাজী নন। ভারতের বৃহত্তম কাগজের কল টিটাগড়ও গত জ্যৈষ্ঠমাস থেকে একসিট কাগজও আমাদের দেননি। আমরা দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে বিদেশী কাগজ দিয়ে এতদিন কাজ চালিয়ে এসেছি। বর্তমানে বিদেশজাত দ্রব্যের আমদানী সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি পরিবর্তনের জন্য বিদেশী কাগজও সংগ্রহ করা যাচ্ছেনা। সরবরাহকারকদের কাছে যে মজুত মাল আছে তা দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হচ্ছে। শুধু আমরাই নই, যে সব পত্র-পত্রিকা সাদা কাগজ ব্যবহার করে থাকেন, তাঁদের প্রত্যেকের সামনেই এমন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে যা যুদ্ধের সময়েও অনুভূত হয়নি। জাতির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পত্র পত্রিকার অবদান জাতি কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেনা। আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, জাতীয় সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করছেন। জাতীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে কী তাঁরা নির্বাক মূকের মত অভিনয় করবেন? আমরা এ বিষয়ে জাতীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছি। এবং স্থানীয় মিল কর্তৃপক্ষদেরও অবহিত করে তুলতে চাই।

পারিবারিক বনভোজন

রূপমঞ্চের কর্মী মহেন্দ্র গুপ্ত ও আবগারী সুপারেনটেণ্ডেণ্ট দেবকুমার গোস্বামীর উদ্যোগে গত ৪ঠা জানুয়ারী শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটি পারিবারিক বনভোজনের ব্যবস্থা হয়। এই বনভোজনে এঁদের পরিবারের অনেকে যোগদান করেছিলেন।

পাইকপাড়া মহিলা সমিতি।

গত শুক্রবার ২রা মাঘ "পাইকপাড়া মহিলা সমিতি কর্তৃক এক সাধারণ সভা আহুত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বীণা দাস এম, এল, এ। তিনি উপস্থিত মহিলা-বৃন্দকে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দেন। এই সভায় বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমরা এইরূপ একটী প্রগতিবাদী মহিলা সমিতির [illegible]তাকে সমর্থন করি।

ধাঁধা

— লায় কি নিজেদের জমি হারাবো?

— মি বলবে এ হলো অন্যায়?

— লে মিশে কাজ করতে বলছো?

— গুপমদা কি পথ প্রদর্শক নন্?

— হের বিপর্য্যয় ছাড়া এটাকে কি বলো?

— ছ তলায় থাকতে হবে কেন?

— মাং সার সর্ত্ত দিলে কে?

নি য় মা ব লী ঃ

১। প্রত্যেক লাইনের প্রথম অক্ষরটি (যুক্তাক্ষরও হতে পারে) খুঁজিয়া বসাইতে হইবে।

২। এই ভাবে সাতটি লাইনের প্রথম অক্ষরগুলি মিলাইয়া যে শব্দ গঠিত হইবে তাহাই ধাঁধার উত্তর, এই উত্তর ও ১০৲টি টাকা বন্ধ খামে পত্রিকার অফিসে রাখা হইয়াছে।

৩। নিভুল উত্তর দাতাকে ১০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। একাধিক নির্ভুল উত্তরের জন্য উক্ত পুরস্কার সমভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। এই কাগজ প্রকাশিত হওয়ার সাতদিনের মধ্যে উত্তর কাগজের অফিসে পৌছান চাই—সেখান হইতেই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৫। এ প্রতিযোগীতায় কোনও প্রবেশ মূল্য নাই।

৬। ধাঁধার যা উত্তর হবে সেটি প্রচারের উদ্দেশ্য কি?

প্র চা র ক—

ক লে জ — ডি — সা ই ন

কলেজ—ডি—সাইন সম্পর্কে পশ্চিম বাংলা সরকারের রাজস্ব বিভাগীয় কলেক্টর যা বলেন—

আমি গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী **"কলেজ—ডি—সাইন"** পরিদর্শন করিয়াছি। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিশ্বনাথ সেন আমাকে সমস্ত কিছু দেখাইয়াছেন ও তাঁহার সুচিন্তিত পরিকল্পনা আমাকে খুলিয়া বলিয়াছেন। মিঃ সেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ তাঁহাদের আন্তরিক অনুপ্রেরণার সহিত যে ইহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছেন ও তাহা চালু করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। স্বাধীন ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রসার এবং গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়! এই পরিকল্পনা জয়যুক্ত হোক্।

স্বাঃ—এম্, সি, দাশগুপ্ত
কলেক্টর—কলিকাতা
রাজস্ব বিভাগ

মহাত্মা
স্মৃতি-তর্পণ
সংখ্যা

সপ্তম-বর্ষ
দশম-সংখ্যা
১৩৫৪

'গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধীর গাহ জয়!'

আবির্ভাব :
পোরবন্দর (সুদামাপুরা)
২রা অক্টোবর, ১৮৬৯

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস।

এই অকূল সংসারে
দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
ঘোর বিপদ মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস।

তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।"

তিরোভাব :
ন য়া দি ল্লী
২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

গান্ধীবাদে শিল্পকলার স্থান

আমাদের অনেকের মনেই একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে মহাত্মা গন্ধী সম্পর্কে। শুধু একটা কেন, গান্ধীবাদ সম্পর্কে বহু বিকৃত ধারণাই আমাদের মনে শিকড় গেঁড়ে নিয়েছে। অথচ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত মত ও পথ এত সরল ও সহজ, যা আজ অবধিও পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে আমরা পাইনি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধের আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই গান্ধীবাদ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের চল্লিশ কোটি নির্যাতিত ও শোষিত জনসাধারণের মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীবাদ তার সত্য ও অহিংসার আদর্শ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। এই বিকাশ শুধু চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মুক্তি আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকেনা—বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তি-সংগ্রামে গান্ধীবাদ পূর্ণতা লাভ করে। কেবল মাত্র বৃটিশ রাজশক্তির কবল থেকেই নয়—পৃথিবীর নিপীড়িত মানবাত্মাকে সমস্ত অন্যায় ও অসত্যের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে—আত্মসচেতন করে তুলতেই গান্ধীবাদের জন্ম। এই সর্বজনগ্রাহ্য ও বোদ্ধ মতবাদকে বুদ্ধিজীবিরা যতখানি বিকৃত ভাবে গ্রহণ করেছেন—অশিক্ষিত জনসাধারণও তা করেনি। তার প্রমাণ—গান্ধীবাদে তাদের বিপুল ও ব্যাপক সাড়া এবং আন্তরিক আনুগত্য। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে গান্ধীজির সাধনা সফল হয়েছে। তাঁর মত ও পথ পেয়েছে পূর্ণ মর্যাদা। জেগেছে কৃষক—জেগেছে মজুর—জেগেছে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অসহায় মধ্যবিত্ত। তাঁর চরকার ঘড় ঘড় শব্দে ভারতের গ্রাম-জীবন আজ মুখরিত। এবং কোনদিনই বুদ্ধিজীবি দলগতস্বার্থান্বেষীরা এঁদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। যখন তাদের হীনচক্রান্ত সাম্প্রদায়িক নীচতাকে—সামাজিক ভেদবুদ্ধিকে খুঁচিয়ে নিয়েছে—গান্ধীবাদ অমলিন দীপশিখার মত সে ভুলের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের সত্য ও সুন্দরের নির্দেশ দিয়েছে। গান্ধীবাদ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করতে আমি এখানে আসিনি। আমি এসেছি গান্ধীবাদ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার মাত্র একটি দিক নিয়ে দু'চারটি কথা বলতে। অনেকের মুখেই শুনতে পাই, গান্ধীবাদে শিল্পকলার স্থান নেই। ব্যক্তিগত ভাবেও গান্ধীজি বিরোধী ছিলেন এবং ঘোর অবিচার করেছেন শিল্পকলার প্রতি। সমস্ত জীবন যাঁর কেটেছে কৃচ্ছ্র সাধনায়—সে নগ্ন ফকিরের কাছে শিল্পকলার সন্ধান মিলবে কী করে? কথাটি যে কতখানি ভ্রান্ত এবং অজ্ঞতার পরিচায়ক, গান্ধীজির জীবিতকালে যাঁরা তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাত স্বীকার করবেনই—তা ছাড়া তাঁরাও অস্বীকার করতে পারবেন না—যাঁরা গান্ধীজির জীবন-দর্শনের আনাচি-কানাচিতেও একটু উঁকি ঝুঁকি মেরেছেন। আমার বর্তমান নিবন্ধে গান্ধীবাদে শিল্পকলার স্থান সম্পর্কে আমার জ্ঞান এবং ধারণার ক্ষুদ্রতা নিয়েই কিছু বলবো। গান্ধীজি ও শিল্পকলা সম্পর্কে যাঁদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে—যদি তাঁদের সে ভ্রান্তির মূলে খানিকটা নাড়া দিতেও পারি—মহাত্মাজির প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন সার্থক হবে বলেই মনে করবো। নইলে বুঝবো, গান্ধীজিকে যে দৃষ্টিভংগীতে আমি দেখেছি, তাতেও ফাঁক থেকে গেছে অনেকখানি এবং এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের অধিকারও আমার জন্মেনি।

শুধু গান্ধীজিই নন—দেশের মুক্তি সংগ্রামে যে সব সৈনিক আত্মোৎসর্গ করে জাতির দীর্ঘদিনের পরবশতার গ্লানি অপসারণে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও এরূপ অভিযোগ বহু শুনতে হয়েছে। ব্যবসায়ের প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য যদি কোন কংগ্রেস নেতাকে কোন অনুষ্ঠানে পুরোহিত রূপে পাওয়া গেলনা—অমনি রটে গেল, জাতীয় শিল্প কোন সহানুভূতি পেলনা জাতীয় আন্দোলনের যোদ্ধাদের কাছ থেকে। নিজেদের প্রতি ক্ষেত্রের, প্রতি গলদের বোঝা এঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেও কেউ কসুর

করেননি। কিন্তু একথাটা কেউ তলিয়ে দেখতে চাননি, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকেরা যে মহা-কর্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার ভিতর শুধু রাজনৈতিক মুক্তিই নয়, জাতির রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিগত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার মুক্তিই নিহিত ছিল। একথা তখন না বুঝলেও আশা করি, স্বাধীনতা অর্জন করবার পর ধীরে ধীরে সবাই উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন। তাছাড়া বিরাট কর্তব্য যখন এসে হাতছানি দেয়, তখন ছোটখাটোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা মোটেই সংগত নয়। বিশেষ করে যে-বিরাটের ভিতর সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে নিহিত। গান্ধীজি যদি শিল্পকলারপ্রতি অবিচার করেও থাকতেন—তাঁর সপক্ষে এ যুক্তি প্রদর্শনও অন্যায় হ'তো না। তবে তার কোন প্রয়োজন করে না। কারণ—তিনি নিজেই যে ছিলেন শিল্পময়। তবেতাঁর শিল্পদৃষ্টি আর আমাদের শিল্পদৃষ্টির মাঝে ব্যবধান অনেকখানি। তিনি ছিলেন স্বভাবশিল্পী। স্বভাবশিল্পীর চাহিদা মেটানো বড় সহজ কথা নয়। অনৈসর্গিক কোন শিল্পসম্ভার তাঁকে খুসি করতে পারে না। তাঁর চাহিদা একমাত্র প্রকৃতিই মেটাতে পারে। মহাত্মাজির নিজের কথাতেই বলি: "তারা ভরা আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কতদিন এ-জ্যোতিরহস্যের অতল বিস্ময়ে আমি ডুবে গেছি—কখনো চোখ ক্লান্ত হয়নি। প্রান্তর, কান্তার, গিরি, নদী, সাগর এসব কি নেই—এসব থেকে যখনই চেয়েছি মেটেনি কি আমার সৌন্দর্যের ক্ষুধা? তারা জাগা আকাশ, মহান সমুদ্র, স্বপ্নালু শৈলমালা এদের গানে গানে মনে প্রাণে যে শিহরণ জাগে তার সঙ্গে কি কোনো ছবির শিহরণের তুলনা হ'তে পারে কখনো? অস্ত গোধুলির বিদায়াভা, উদয় গোধুলির হাস্যচ্ছটার কাছাকাছিও কোনো বর্ণসম্পদ কি কোনো মানুষী তুলির থাকতে পারে কখনো?··· প্রকৃতি থাকুন আমার বেঁচে—আর কোনো প্রেরণাই আমার চাই না। আজো তাঁর রহস্যভাণ্ডার আমার কাছে তেমনি অফুরন্ত, আনন্দময়, স্বপ্নভরা। মানুষের ছেলেমানুষি কারুকলার কী দরকার আমার? ভগবানের শিল্পকারুর গভীর রহস্যের পাশে মানুষের সৃষ্টি আমার কাছে লাগে রঙচঙে খেলনা।" এর পরেও অভিযোগকারীরা কী জবাব দেবেন? প্রকৃতির ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের সন্ধান যিনি পেয়েছেন, মানুষের সৃষ্ট শিল্প তাঁর চাহিদাকে মেটাবার স্পর্ধা পাবে কোথায়? আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদার সংগে মহাত্মাজির শিল্পমনের চাহিদাকে তুলনা করতে যাই বলেই, তাঁর সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মনে শিকড় গেড়েছে। মহাত্মাজীর কথায়ই বলতে হয়। "My values are different."

স্থূল থেকে সূক্ষাতিসূক্ষের সন্ধান যিনি পেয়েছেন, ইন্দ্রিয় থেকে অতিন্দ্রিয়ে যিনি পৌঁছেছেন, আমাদের স্থূল এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত মন দিয়ে তাঁকে বিচার করবার মত মূর্খতা আর কাকে বলবো? তবু যে শিল্পসৃষ্টি স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাকে কোনদিন গান্ধীজি অবহেলা বা অস্বীকার করেননি। যে শিল্পের ভিতর পরম-পাওয়ার জন্য শিল্পীর আকুল আর্তনাদ আন্তরিকতার রূপ পরিগ্রহ করেছে অর্থাৎ যার ভিতর কোন মেকী নেই—তাকে চিরদিন গান্ধীজি শ্রদ্ধা করে এসেছেন। মীরার ভজন তাঁকে কতইনা অভিভূত করেছে! রামধুন সংগীত শুধু কথা ও সুরের বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর কানে বাজেনি—তার ভিতর পরম-পাওয়ার জন্য যে ব্যাকুলতা তাই গান্ধীজিকে মুগ্ধ করেছিল। এমনি মুগ্ধ করেছিল ছোট বেলায় নাটকাভিনয়। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতেই লিখে গেছেন: "But some how my eyes fell on a book perchased by my father. It was Shravana Pitribhakti Nataka a play about Shravana devotion to his parents. I read it with intense interest. There came to our place about the same time itinerant show-men. One of the pictures I was shown was of Shravana carrying, by means of slings fitted for his shoulders, his blind parents on the pilgrimage. The book and the picture left an indelible impression on my

mind. 'Here is an example for you to copy.' ...There was a similar incident connected with another play. Just about this time; I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. This play Harischandra—captured my heart." তবুও বলবো গান্ধীজি অভিনয়ের প্রতি অবিচার করেছেন? ছোট বেলায় 'শ্রবণ পিতৃভক্তি নাটক' এবং হরিশ্চন্দ্র তাঁর মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিলো, পরিণত বয়সেও তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। কবিগুরুর কয়েকটি সংগীতও গান্ধীজির খুব প্রিয় ছিল। যা তাঁর লাগতো, তা তাঁর মুক্তকণ্ঠ-প্রশংসা পেয়েছে। যা তাঁর ভাল লাগেনি, তাকে তিনি কোন দিনই স্বীকার করে নেন নি। শিল্পকলাকে যেমন কোন দিনই অবহেলা করেন নি, তেমনি সবকিছুকে শিল্পকলা বলে মেনে নিতেও পারেননি। শিল্পবিমুখ বলে যারা গান্ধীজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন—তারা যে কতখানি ভ্রান্ত, সে কথা তারা নিজেদের মনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাবেন।

আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প গান্ধীজির আশীর্বাদ পায়নি বলেও অনেকে অভিযোগ করেন। এর উত্তরে শুধু এই কথাই বলা চলে যে, সে দোষ গান্ধীজির নয়, চলচ্চিত্রের দিক থেকে যদি তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন, সেজন্য অপরাধ আমাদেরই। অর্থাৎ আমরা এই শিল্পটীকে এমন ভাবে রূপায়িত করে তুলতে পারিনি, যা গান্ধীজির চাহিদাকে খুসি করতে পারতো। আর গান্ধীজি কেন, চলচ্চিত্র শিল্প কী আমাদের চাহিদা মেটাতেই কৃতকার্য হয়েছে? —হয়নি। কিন্তু তবু তাঁর বিরুদ্ধে একথা বলতে পারবো না যে, তিনি চলচ্চিত্রের প্রতি বিমুখ ছিলেন। তিনি যখন 'মিশন টু মস্কো' এই বৈদেশিক চিত্রখানি দেখেন, তখন ভারতীয় চিত্র-ব্যবসায়ীরা অভিমান করে বসেন—তিনি তাদের সে অভিমান ভাঙাতে ভারতীয় চিত্রও দেখেন। এ থেকেই বোঝা যাবে, তিনি চলচ্চিত্রের প্রতি মোটেই বিমুখ ছিলেন না। তবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে চলচ্চিত্রের জন্য কোন প্রচারকার্য করেন নি, একথা সত্য। অথবা কারোর ব্যবসায়স্বার্থকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে কোন চিত্রকে উচ্চাঙ্গের শিল্প বলে শিরোপাও দেননি।

গান্ধীজির জীবিতকালে চলচ্চিত্র, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি শিল্পকলার যে রূপ আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারিনি, আজ তাঁর অবর্তমানে যদি আমাদের সে দুর্বলতা শুধরে নিতে পারি, তবেই আমাদের অতীতের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকা পড়বে। যে সত্য ও অহিংসার বাণী গান্ধীজি প্রচার করতে যেয়ে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন, আজ তাকে আমাদের চিত্র ও নাট্যাভিনয়ের ভিতর দিয়ে মূর্ত করে তুলতে হবে। শুধু তাই নয়, মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ আমাদের সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে, যে শ্রেণীবৈষম্যের কবলে আমাদের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়েছি—যে নিষ্পেষিত মানবাত্মার জন্য গান্ধীজি আজীবন সাধনা করে গেছেন—ভারতের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে যে বিষবাষ্প দেশের ও জাতির মন থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন—তাকে সফল করে তুলবার দায়িত্ব আজ আমাদের চিত্র ও নাট্যজগতকে গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীজির প্রেমের বাণী—অহিংসার বাণী প্রচার করে চিত্র ও নাট্যজগত যদি জনসাধারণের মনে শুভবুদ্ধির সঞ্চার করতে পারে, তবেই চিত্র ও নাট্যজগতের কর্মীদের গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন সার্থক হবে।

গান্ধীজির মৃত্যু নেই। তিনি অমর। তাঁর আত্মার শান্তি-কামনার জন্য আমাদের কোন প্রার্থনাই করতে হবে না। কারণ, যিনি সমস্ত পাপ ও সংশয়ের বহু উর্দ্ধে ছিলেন, তিনি তাঁর নিষ্পাপ আত্মার গুণেই পরম শান্তিলাভ করে পরমব্রহ্মে আশ্রয়লাভ করবেন।

"লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥"

—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

'দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা— —

জিজ্ঞাসা

কবি ও চলচ্চিত্রবিদ শ্রীনরেন্দ্র দেব

●

অনেক দিনের কথা, এই পৃথিবীতে—
অহিংসার মহামন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে চারিভিতে
কপিলাবস্তুর শিখা ম্লান হয়ে এসেছিল যবে
জ্বলেছে নূতন আলো বেথে্ল হেমের নীল নভে,
দীপ্তি তার পাছে নিভে যায়
তাই এসেছিল গোরা প্রেমমন্ত্র নিয়ে নদীয়ায়।
মানুষ ক্রমশঃ তাহা যেতেছিল ভুলি,
তুমি এসে আরবার সেই দীপ ধরেছিলে তুলি
হিংসার আঁধার রাত্রে দেখাইতে পথ—
হে প্রেমিক, শাশ্বত ভিখারি; তব জয় রথ—
রুদ্ধ কি করিল তার গতি
আমাদের অন্তরের জিঘাংসার পাশবিক মতি ?
তব পূর্বাচার্যগণ ব্যর্থ হয়েছেন জনে জনে,
তা ব'লে কি মানুষের মনে
পশুরই আসন রবে সবার উপরে ?
ক্রুশকাষ্ঠে আজও রক্ত ঝরে
রক্ত ঝরে
দিল্লীর পথের ধূলি পরে ;
মানুষের অশুর দেবতা যুগে যুগে কেন নাহি জানি
পরাজয় লয় হেন মানি।
প্রেম তবে মিথ্যা কিগো, মিথ্যা ভালবাসা,—
নিরুত্তর রবে কি এ শাশ্বত জিজ্ঞাসা ?

জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

মহা বিস্ময়ের মত মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়েছিল জাতিব ভাগ্যাকাশে। তাঁর তিরোধানও তেমনি মহা-বিস্ময়ের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। মহাত্মাপুরুষের কার্য-কলাপ আমাদের সাধারণ বিচারশক্তি দিয়ে বোঝা যায় না—তাঁদের আলোকচ্ছটা আমাদের উদ্ভাসিত করে তোলে-শুধু এইটুকুই উপলব্ধি করতে পারি। তাই হে মহাজীবন ! হে মহামবণ ! তোমায় প্রণাম জানাবার অধিকাব দাও !

অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্য (ষ্টার থিয়েটার)

জীবিতকালে যাঁর আদর্শের মর্মোদ্ধার করতে পারিনি, আজ তাঁর অবতর্মানে তাঁর আদর্শের ধ্বজা ধরে জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার শক্তি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছি !

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স লিঃ, কলিকাতা)

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান-এ শুধু আমাদেরই ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি সমস্ত মানবজাতির। কিন্তু আজ শোকের সময় নয়। মৃত্যু কখনও মহাত্মার জীবনের অবসান ঘটাতে পারেনা, তাঁর আদর্শের মাঝে তিনি সমস্ত মানব জাতির অন্তরে বিরাজ করবেন। তাঁর আদর্শের পতাকা বহন করে যাতে আমরা চলতে পারি, সেজন্যই সচেষ্ট হতে হবে।

প্রাইমা ফিল্মস, দি স্ক্রিণ করপোরেশন ও রূপবাণী থিয়েটার্স লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ (কলিকাতা)

মানবতার আদর্শ মহাপুরুষ ও অহিংসার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক তিরোভাবে সমস্ত পৃথিবী আজ শোকে মুহ্যমান। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এমনিভাবেই তাঁহার স্বজন কর্তৃক একজন শ্রেষ্ঠ মহামানবের নশ্বর দেহের বিনাশ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বাণী ও সাধনাকে আজিও অবিনশ্বর ও অমর করিয়া রাখিয়াছে। যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

— —চিত্তের বলে লংঘিয়া চলে পাহাড় প্রমাণ-বাধা ;’

মহাত্মাজীর অহিংসার বাণী সমগ্র দেশে বিদেশে মানবতার মহান্ আদর্শকে পথ দেখাইবে সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। মহাত্মাজী হিংসার কাছে আত্মবলিদান দিয়া অহিংসাকে চিরজয়ী করিয়া গেলেন। তাঁহার অহিংস সংগ্রাম ভারতকে স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং তাঁহার বাণী ও সাধনার আদর্শ আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করুক—ভগবানের নিকট আজ এই কামনাই করি।

জনপ্রিয় সুরকার ও সংগীতশিল্পী শ্রীজগন্ময় মিত্র (কলিকাতা)

বহু-জন-পরিচিত রূপ-মঞ্চ পত্রিকায় মহাত্মার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার নিমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আমি একজন গীত শিল্পী, পরের কথাই আমার কণ্ঠের মধ্যবর্তীতায় প্রচারিত হয় এবং এ সম্বন্ধেও তাহার অন্যথা হয়নি। মহাত্মার জীবদ্দশায় প্রথিত-যশা কবি সজনীকান্ত দাসের রচিত দুইখানি গান “গান্ধীজীকি জয়” এবং “মহাত্মাজীরে করি প্রণাম” রেকর্ড করিয়া তাঁর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে নিবেদন করি। তাঁর দেহাবসানের পর যখন সারা বিশ্ব তাঁর গুণ-কীর্তনে মুখর হ’ল, তখন মহাত্মার প্রিয় রামধুন রেকর্ড করি এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি শৈলেন রায় রচিত দুইখানি শ্রদ্ধাঞ্জলি “জয় গান্ধীর জয়” এবং “তুমি যে কর্ণধার” রেকর্ড করি। মহাত্মার সম্বন্ধে আমার নিজের তরফ্ থেকে কিছু বলার চেষ্টা করাকে প্রদীপ জ্বেলে সূর্য বন্দনা করার মতই ধৃষ্টতা বলে মনে করি। এই যুগাবতারকে আমার দীন-হৃদয়ের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এই লেখা শেষ ক’রলাম। “মহাত্মা গান্ধী কি জয়”

সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা কমল মিত্র
(কলিকাতা)

মহাত্মা আমাদের ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। অর্ধ-শতবর্ষের উপর যে শীর্ণ সন্ন্যাসী আমাদের চালনা করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যসীমার এক বাঁকে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁর অপসৃয়মাণ জ্যোতির্দেহ যেন দৃষ্টির সম্মুখে আসিতেছে—জল রাখিতে পারিতেছি না। শুধু আমার নয়, সকলের আজ এক অবস্থা। উদ্গত অশ্রু হৃদয় ভরিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। প্রকাশের ক্ষমতা নাই—প্রকাশ করিতে ইচ্ছাও হয় না। সেইজন্য ভাবিতেছি—গান্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন, মনের মধ্যে একটা বেদনার সঞ্চার হইতেছে—সে বেদনা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব ও প্রকাশ করিবার প্রয়োজনই বা কি ?

উচ্ছ্বসিত বিলাপের মধ্যেও একটা অত্যন্ত গভীর কারুণ্য বার বার ধ্বনিত হইতেছে। জীবনদ্রষ্টা তিনি। আমাদের মত গান্ধীজী তো জীবনের মধ্য দিয়া চোখ বুজিয়া চলেন নাই। তাঁহার জীবনায়নের একটা নৈশ্চিত্য ছিল। দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি কেবল চলিয়াছেন, চলিয়াছেন। এক লক্ষ্য তাঁর, পথ তাঁর এক। আত্মনিগ্রহের কঠোর পথে তাঁর যাত্রা। শেষ পদক্ষেপের সংগে শেষ নিগ্রহ তাঁর সমাপ্ত হইল। তাই মহাত্মার জন্য শোক করিবো না।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র নান (প্রাইমা ফিল্মস লিঃ)

জাতি ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র জাতির শান্তি প্রচারের অগ্রদূত, লোকোত্তরচরিত মহাত্মা গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণে বিশ্বের অতিমাত্র ক্ষতিপূরণ কে আর করিবে? কোন বস্তুর বিনিময়ে আমরা এই শোকের অপনোদন করিতে পারিব কী? দেশ যদি তাঁহাকে প্রকৃতই ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রচারিত সত্য ও অহিংসার পথ সকলেই যেন অবলম্বন করে। এই পথ অবলম্বন করিলে দেখিব, তিনি অন্তর্হিত হন নাই। আমাদের সকলেরই অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। এ মহাপুরুষের মৃত্যু নাই। তিনি অমর।

গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আমাদের চিত্র ও নাট্যজগত যে অভাবিত সাড়া দিয়েছেন—তাতে তাঁরা নিজেদেরই গৌরবান্বিত করে তুলেছেন। এজন্য প্রথম ৩২ পাতা রাখা হ’য়েছিল। কিন্তু তাতেও স্থান সংকুলান করা যায়নি— **তাই ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।** — — —

মহাপ্রয়াণে মহামানব মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর দান

শ্রীসজনীকান্ত দাস

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও চিত্রনাট্যকার

ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অবির্ভাবের পূর্বে দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কতিপয় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁরা ইংরেজ গুরুর কাছে শেখা অস্ত্রে এবং তাদের দেওয়া অস্ত্রেই ইংরেজের সংগে লড়াই করবার ভাণ করতেন। ভাল ইংরেজীতে চোখা চোখা যুক্তি দিতে পারলেই তাঁরা খুসী থাকতেন, ইংরেজরাও বাহবা দিত। একে বলা হত কন্‌স্টিটিউশ্যানাল বা বিধি-সম্মত আন্দোলন। ১৮৮৫খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও এই সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রথম বিপ্লবাত্মক ধাক্কা দিল ১৯০৫ সালের পর বাংলাদেশ। স্বদেশী আন্দোলন এসে এভলুইশান বা ক্রমবিবর্তনের বুদ্ধিটাকে বেশ একটু নাড়া দিল। বিলিতি কাপড় কিছু পুড়ল, সংগে সংগে ইংরেজ ভক্তিও কিছু প্রশমিত হল। কিন্তু সব কিছু মিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন 'ভদ্রলোক-শ্রেণী' অর্থাৎ সমাজের উপরের স্তরেই আবদ্ধ রইল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষিত সত্যাগ্রহ অস্ত্র নিয়ে গান্ধীজী এলেন ভারতবর্ষে। জড় সুতরাং অসহায় পনেরো আনা দেশের লোকের চৈতন্য বিধান করতে তিনি ভারতের কিষাণ-মজদুরদের সংগে এক হয়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন নিষ্ঠুর এবং শোষণ-সমর্থনকারী রাজশক্তিকে। ভারতের সাধারণ মানুষ মনের মানুষ খুঁজে পেলেন তাঁর মধ্যে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে শুধু আদর্শের জোরে তিনি চরম বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন। ভারতের চিরন্তন বাণী—অহিংসা ও সত্যের বাণী তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুধু প্রচার নয়, প্রয়োগ করতে লাগলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের শাসন টলল, আন্দোলন শিকড় গাড়ল চল্লিশ-কোটি মানুষের মনে। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরণের বিপ্লব একক এবং অনন্য ধরণের। মহাত্মা গান্ধীর এইটিই হচ্ছে বিশেষ দান। রাজনীতি থেকে তিনি সকল রহস্য ও গোপনতার আবরণ সরিয়ে তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন।

●

হে সন্ন্যাসী

জনপ্রিয় কবি ও গীতিকার—শৈলেন রায়

তব জীবনের হোমানলে হে সন্ন্যাসী
হোক শান্তি হোক শান্তি হোক শান্তি
বিদ্বেষ-জর্জর-বিশ্বলোকে পুড়ে যাক মোহ ভয় ভ্রান্তি
হোক শান্তি হোক শান্তি হোক শান্তি॥
মরণেরে দিলে তুমি তব দেহ-আবরণ
বিশ্বেরে দিলে তুমি প্রাণ
আত্ম-বিসর্জন সার্থক হোক তব
মানুষের হোক কল্যাণ
ঘুচুক হিংসা দ্বেষ শত্রু মিত্র হোক
নিভে যাক দহনের ক্লান্তি
হোক শান্তি হোক শান্তি হোক শান্তি॥
ব্যর্থ এ মরণের হোক পরাজয়
সত্যের সারথী হে আলোক অনির্বাণ
হে অমৃত হোক জয় হোক জয় হোক তব জয়
অম্বরে ওঠে ঐ তব জয়গান
অহিংসা বাণীতব ঘুচাক এ বিশ্বের
মানুষের যত ব্যবধান
ক্রন্দন থেমে যাক বন্ধন টুটে যাক
মিথ্যার হোক অবসান।
দুঃখের শেষ হোক শান্ত হোক এ ধরা
দূর হোক হৃদয়ের শ্রান্তি
হোক শান্তি হোক শান্তি হোক শান্তি॥

●

মহাত্মাজীর আদর্শ

নাট্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

মহাত্মার মৃত্যুর পর জগদ্ব্যাপী যে শোকপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে এবং আজও বহিতেছে তাহার তুলনা ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলিলেই চলে। বহুজন বহুভাবে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন—তাহার আন্তরিকতা সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

কিন্তু দুঃখ হয় তখনই, যখনই দেখি যে, তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের নাম লইয়া মারামারি হইয়াছে, ব্যবসাদারদের ব্যবসা জাঁকাইয়া উঠিতেছে। অবশ্য ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারণ, এরূপ সুযোগ সহসা মিলেনা এবং এরূপ প্রলয়কারী ঘটনাও সচরাচর ঘটেনা। কিন্তু ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়াই শ্রদ্ধাপ্রকাশের নামে স্ব স্ব ব্যবসাকে ফাঁপাইয়া তোলার যে নির্লজ্জ প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে তাহাই লজ্জাকর। মহাপুরুষের নামে ঘটি বাটি ছাতার নামাকরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতিকৃতির ছাপ মারিয়া যাঁহারা নির্লজ্জভাবে ব্যবসাকে জাঁকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে বলিতেছি। নেতাজীর নাম লইয়াও এইভাবে কয়েকজন ব্যবসাদার ছেলেমানুষী করিয়াছেন, বর্তমানে মহাত্মাজীকে লইয়াও সেইরূপ ছেলেমানুষী চলিতেছে।

হৈ হৈ করিয়া এই সমস্ত করার যিনি বিরোধী ছিলেন, আমরা ঠিক তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছি যে, আমরা তাঁহাকে কত ভালবাসিতাম! তাঁহার মৃত্যুর পরে শোকের বন্যার সহিত যখন আবার উচ্ছাসের প্রাবল্য ঘটিল তখনই বুঝিলাম যে, মহাত্মাজীকে বুঝিয়াছিল খুব অল্প লোকে।

যে স্মৃতিকে পাথরে খোদায় করিয়া রাখিবার চেষ্টা হয় সে স্মৃতি থাকে না—তাহার ক্ষয় আছে। কিন্তু মনের মধ্যে যে স্মৃতি থাকে এবং যুগের পর যুগ লোকের পর লোক যে স্মৃতিকণা বহন করিয়া লইয়া যায়, নিজেদের জীবনের আদর্শে প্রতিফলিত করে, তাহাই অমরত্ব অর্জন করে। অতএব বাহ্যিক আড়ম্বরের সহিত মহাত্মাজীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা অতি মূঢ়তার পরিচয়। মহাত্মার নাম লইয়া পল্লী উন্নয়ন কর, অস্পৃশ্যতা দূর কর, মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা কর, আর্তকে সাহায্য কর এবং সেইভাবে যাহাতে কার্য চলে তাহার ব্যবস্থা কর—তাহার সমর্থন করিতে রাজী আছি কিন্তু নিছক তাঁহার নামে একটি রাস্তার নাম রাখিয়া কিম্বা মূর্তি গড়িয়া কাক ও বকের আশ্রয়স্থল স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার অমর্যাদা-করিও না।

শিল্পীকুলেরও মহাত্মার স্মৃতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। যে মহাজীবনের আদর্শ তিনি জগতে স্থাপন করিয়া গেছেন তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া ও তাঁহার ভাবধারাকে নানা প্রকারে রূপায়িত করিয়া তাঁহারা মাহাত্মাজীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করুণ, এই আশা করা বোধ হয় জনসাধারণের পক্ষে অসংগত দাবী বলিয়া কেহ মনে করিবেন না।

মহাত্মাজীর আদর্শ বুঝিয়া সামান্য কিছু কাজ করাই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একমাত্র উপায়।

মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণে

—বনানী চৌধুরী (ছায়াচিত্র তারকা)

গত ৩০শে জানুয়ারী, ভারতের ইতিহাস এক দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমায় আচ্ছাদিত হ'য়ে গেছে। যে নিষ্ঠুরতম, জঘন্যতম ঘটনা সেদিন ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীর বুকে অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল, তার তুলনা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই। সেদিনও দিল্লীর আকাশে সূর্য উঠেছিল, দিল্লীর বাতাসে গান ধ্বনিত হয়েছিল—কিন্তু কে জানতো, সেদিনের সন্ধ্যায় দিল্লীর গৌরব-সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হ'য়ে যাবে, দিল্লীর বাতাস শোকে মুহ্যমান হ'য়ে উঠবে। সেই অন্ধকারময় সন্ধ্যায় ঘৃণিত আততায়ীর গুলি বর্ষণের সাথে সাথে সারাভারত বজ্রাহত হ'লো—অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কোনো আলো নেই, কোনো আশা নেই—এক মুহূর্তে ভারতের সমস্ত আলো নিভে গেছে, ভারতের বুকে নিবিড় অন্ধকারের রাজ্য নেমে এসেছে। বিশ্বের মহামানব, ভারতের জাতীয়
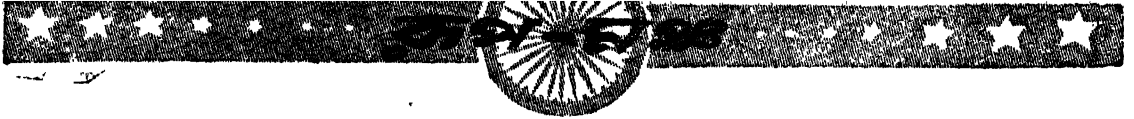
জনক সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে দীর্ঘ তিরিশ মিনিট ধরে তাঁর বিদীর্ণ রক্তাপ্লুত বক্ষ দিয়ে অতি কষ্টে একটি একটি করে নিশ্বাস গ্রহণ করলেন—জীবনদীপ স্তিমিত হ'য়ে এলো—নিশ্বাস থেমে গেল। পিতৃহত্যার পাপে জর্জরিত ভারত-বাসী হাহাকার করে উঠলো।

বাপুজী! তুমি আজ আমাদের মধ্যে নেই। প্রেম, মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার প্রতীক ছিলে তুমি। তোমার পার্থিব দেহের অবসান ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের অন্তরে তোমার যে সুমহানরূপ অংকিত হ'য়ে রয়েছে, সেই রূপের মধ্যেই তুমি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করবে। আজ জলভরা চোখের ওপর ক্ষণে ভেসে উঠ্‌ছে তোমার পবিত্র মূর্তি, যুক্তকর,—নমস্কারের ভংগীতে—মধুর হাসিতে ভরা ক্ষমা-সুন্দর মুখখানি তোমার কল্যাণধারায় সিঞ্চিত, প্রীতির সুষমায় মণ্ডিত।

মহাত্মাজীর আজন্ম সাধনার ধন ছিল ভারত—তাঁর স্বপ্নের ভারত, তাঁর সুন্দর ভারত। তাঁর ভারত হবে জগৎ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, মহামানবতার মিলনক্ষেত্র, শান্তি ও মৈত্রীর অগ্রদূত। ধ্যানগম্ভীর, সুমহান ভারতের এই রূপই ছিল তাঁর সাধনার লক্ষ্য এবং এই আদর্শ সম্মুখে রেখেই তিনি সারাজীবন নিয়োজিত করেছেন। তাঁর ভারতে থাকবেনা কুসংস্কার, থাকবেনা সাম্প্রদায়িক-হানাহানি, থাকবেনা উচ্চনীচের ভেদাভেদ। তাঁর ভারতে সকলে হবে এক, সকলের থাকবে সমান অধিকার—চিন্তায়, কার্যে আদর্শে। ভারতবর্ষ ধন্য হ'য়েছিল যে তার বুকে মহাত্মা গান্ধীর মত মহামানব জন্মলাভ করেছিলেন—কিন্তু হতভাগ্য, নির্বোধ ভারতবাসী সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির প্ররোচনায় বিপথগামী হ'লো। সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল ভারতকে পদানত করে রাখতে, দুর্বল ক'রে রাখতে—ভারতের স্বাধীনতার পথে কণ্টক বিকীর্ণ করে দিতে। এবং তারই অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলো divide and rule নীতি। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত ক'রেছিল বিভিন্ন দলকে। মানবতার উর্ধ্বে উঠেছিল সম্প্রদায়ের স্বার্থ—ফলে বিরোধ এবং আত্মকলহের সুরু হলো। মহাত্মা বহুবার জাতির কাছে আত্মনিবেদন ক'রেছেন—তাঁর অহিংসা এবং শান্তির পথে আত্মবিরোধের সমাধি রচনা করবার জন্যে আহ্বান ক'রেছেন—অনেকে শুনেছে, আবার অনেকে শোনেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায় ভারতবর্ষ ডুবে গেল অতলে—ভ্রাতৃহত্যার যজ্ঞ আরম্ভ হ'লো—মনুষ্যত্ব বিদায় নিল মনুষ্যসমাজ থেকে—নেমে এল পশুত্বের রাজত্ব। সহস্র সহস্র নারী পুরুষ, শিশু সন্তানের রক্তে রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো ভারতের আকাশ বাতাস। মানুষের অসহায় দুঃখে মানুষের অমানুষিক পাশবতায় মহাত্মাগান্ধী শিশুর মত বিচলিত হ'য়ে উঠলেন।

তাঁর অন্তর হতাশায়, ব্যথায় জর্জরিত হয়ে গেল। তিনি অসহায়ভাবে প্রার্থনা জানালেন ভগবানের কাছে,—"ভগবান এদের সুমতি দাও, এদের বাঁচাও—ভারতবাসীর এই দুঃখ, এই নীচতা আমি আর সইতে পারি না।" ভগবান হয়তো তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন—অধীর আগ্রহে তিনি বেরিয়ে পড়লেন নোয়াখালী অভিমুখে। এখানে আমরা দেখেছি—এক ক্ষীণ দেহ অশীতিপর বৃদ্ধ নোয়া-খালীর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গৃহ থেকে গৃহান্তরে, তাঁর শান্তির বাণী, অহিংসার বাণী বহন করে চলেছেন। ধর্মের নামে, দেশের নামে, মানবতার নামে তিনি দেশবাসীর কাছে প্রার্থনা করেছেন মনুষ্যত্বকে ফিরিয়ে আনতে, ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করতে। তাঁর আবেদন ফলপ্রসু হয়েছে। মহাত্মার জীবনের শেষ অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে এই নোয়াখালী অভিযান থেকে। এই অধ্যায় তাঁর বিরাট মহামানবতার স্পর্শে ধন্য হ'য়েছে। নোয়াখালীর পর বিহার, তারপর ক'লকাতা এবং সর্বশেষে দিল্লী। বিহারে ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ওঁর দু'চোখ ভরে গেছে জলে—ব'লেছেন, মানুষের দ্বারা মানুষের যে এরূপ ক্ষতি সাধিত হতে পারে, তা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

ক'লকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরুর ভয়ে ভীত, ত্রস্ত—তখন মহাত্মা অনশন উদযাপন ক'রে যে শান্তির ও মৈত্রীর বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলেন, তার ফলে ক'লকাতায় সত্যই ফিরে এসেছিল অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং মৈত্রী। ক'লকাতার অধিবাসীর হৃদয় বিগলিত হ'য়ে মহাত্মাজীর
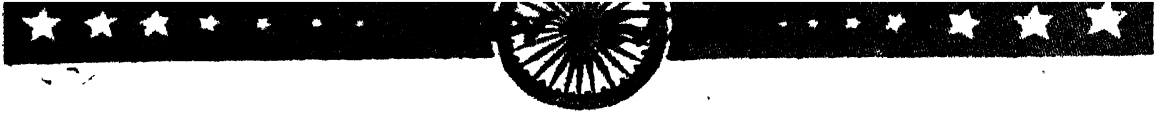
প্রতি অজস্রধারায় বর্ষিত হ'য়েছিল তাদের কৃতজ্ঞতা এবং আশীর্বাদ। দিল্লীতে-ও ঐ একই অবস্থা হ'য়েছিল। দিল্লীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহ নির্যাতনে মহাত্মা বিচলিত হ'য়েছিলেন। অনাথ শিশুর অশ্রু, অসহায় নারীর হৃদয়বিদারক বিলাপ মহাত্মা সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর ঐতিহাসিক অনশন এবং অহিংসার বাণী দ্বারা দিল্লীতেও শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই শান্তি অভিযান ভারতের কোন কোন বিপথগামী দল সহ্য করতে পারেনি। তাদেরই ঘৃণ্য কর্ম-তৎপরতায় এই মহামূল্য মহাজীবনের পরিসমাপ্তি হলো। স্বাধীনতা মন্ত্রের পুরোহিত, অহিংসাবাণীর অগ্রদূত, প্রেমের মূর্ত প্রতীক জাতির পিতাকে আমরা হত্যা করেছি, এ দুঃখ—এ গ্লানি রাখবার জায়গা আমাদের নেই। বিশ্বের দরবারে সমগ্র ভারত আজ নত মস্তকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। কবে যে আমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে জানি না।

মহাত্মাজীর নশ্বর দেহের বিনাশ হয়েছে সত্য—কিন্তু আমাদের প্রিয় বাপুজীর মৃত্যু কোনদিনও হ'তে পারে না। তাঁর বাণীর মধ্যেই আমরা তাঁর মঙ্গলহস্তের স্পর্শ অনুভব ক'রবো। তাঁর আদর্শের মধ্যেই তিনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে জীবিত থাকবেন। আর্তের সেবার মধ্যে, অসহায় মানুষের অশ্রুমোচনের মধ্যে, নির্যাতিত নরনারীর দুঃখে এবং সহানুভূতির মধ্যে মহাত্মাজীকে আমরা অনুভব ক'রবো। মহাত্মা গান্ধীর অমর আত্মা আজ তাঁর প্রিয় সংগীত রামধুনের রঘুপতি রাঘবের মাঝে, ঈশ্বর ও আল্লার মাঝে লীন হয়ে গেছে। তাই, যখনই আমরা এই গান গাইব, যখনই রঘুপতি রাঘব, ঈশ্বর বা আল্লার নাম স্মরণ ক'রবো—তখনই ওতপ্রোতভাবে মহাত্মাজীর শান্তির বাণী আমাদের অন্তরকে প্রেমে, কারুণ্যে সিঞ্চিত ক'রে দেবে।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম,
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সবকো সুমতি দে ভগবান।

স্মরণ-তীর্থে যিনি অমৃতময়

খ্যাতনামা প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্যাল

লক্ষ লক্ষ লোকের স্মরণ-তীর্থে যিনি অমৃতময়—তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর কিছুই নেই—তাঁর শ্রদ্ধার আসন স্বয়ম্প্রতিষ্ঠিত। শুধু একটা কথাই বারবার মনে হয় যে, নিজেকে স্বাধীন ভারতবাসী বলে যখন সম্মান করি—তখন সে সম্মান তাঁরই কাছে পৌঁছোয়—সমস্ত ভারতের আত্ম-বোধের যিনি অধিকারী - তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সকল বলাকওয়ার বাইরে।

মানুষ যখন প্রথম সাগর দর্শন করে, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলো যেমন হঠাৎ তার মনের মধ্যে বিস্ময়ের তাণ্ডব সুরু করে দেয়, এই বিরাট মানুষটির জীবনের কথা ভাবলে, আমাদের মনেও ঠিক তেমনি দোলাই লাগে। লক্ষ কোটী পরাধীন মানুষের মুক্তির জন্য, একটী মানুষের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও ঘটেনি—মানুষকে তিনি যে প্রেমের আদর্শ দিয়ে গেলেন—সে আদর্শ শুধু এদেশেরই নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বের! আজ যুদ্ধশেষে ভারক্লান্ত জগৎ সমগ্র অমিসম্বাদীরূপে একথা মেনে নিয়েছে যে, সারা পৃথিবী যখন গোলার বারুদে আর কাড়াকাড়িতে অস্থির হয়ে উঠেছিল—তখন তাদের মঙ্গলের জন্য আর একটি মানুষ এক পরাধীন দেশের স্বল্পপরিবেশের ভেতর থেকে অক্লান্তভাবে উচ্চারণ ক'রেছে শান্তির মন্ত্র, প্রচার করেছে সাম্যের বাণী, যে মন্ত্রের বিদ্যুৎ-প্রবাহ আণবিক শক্তির মত উল্কাবেগে ছুটে চ'লেছে দিক্‌ থেকে দিগন্তরে! মানুষের পৃথিবীতে মানুষের পাশে মানুষ নির্ভয়ে বাস করতে পারে না—যে ভয়ঙ্কর স্বার্থবুদ্ধি মানুষজাতিকে এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে চলেছে, তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম—সে সংগ্রাম রক্তের সংগ্রাম নয়, সে হোল প্রেমের সংগ্রাম, যুক্তির সংগ্রাম, ত্যাগের সংগ্রাম—সে সংগ্রামে তিনি জয়ী হ'য়ে গেছেন তাঁর নিজের জীবন দিয়ে। সমস্ত ভারতবাসীর মনে হিংসার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরাট ক্লেদস্তূপ গ'ড়ে উঠেছিল—জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষের পবিত্র শোণিতে আজ তা চিরকালের মত ধুয়ে যাক—আজ এই হোক আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—আমরা তাঁরই মত

বলি—"অসতো মা সদ্গময়"—"মৃত্যোর্মা অমৃত গময়" আমাদের তুমি অমঙ্গল থেকে মহামঙ্গলের দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চল—আমরা বলি রণভারাক্রান্ত পশ্চিমের মত নিজের স্বার্থগণ্ডি রচনাই ভারতীয় জন-জীবনের একমাত্র আদর্শ নয়—আমরা বলি আমাদের স্বাধীনতার সংগে আমরা আবার সব ফিরে পেয়েছি—আমাদের আদর্শ—আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ত্যাগ, আমাদের সমস্ত কিছু মৌলিকতা, আমাদের বিরাট জাতীয়বাদের সকল বৈশিষ্ট্য আর সকল শক্তি।

বহুদিনের ক্লান্তিহীন সংগ্রামের ফলে যে স্বাধীনতা তিনি আমাদের তুলে দিয়ে গেলেন, সে স্বাধীনতাকে কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয়—নিজের জীবনকালের শেষদিন পর্যন্ত দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তিনি আমাদের তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন—নিজের জীবন দিয়েও আদর্শকে যিনি মূর্ত ক'রে গেলেন, তাঁর স্মৃতিমূর্তির বেদীমূলে দাঁড়িয়ে সেই আদর্শ রক্ষাই হোক্ আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের একমাত্র পণ—আজ তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই আমার একমাত্র ঐকান্তিক প্রার্থনা—ওঁ শান্তি !!

●

"সম্ভবামি যুগে যুগে"

নাট্যকার ও চিত্র-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত শাস্ত্রবাক্য আছে যে, সাধুগণের পরিত্রাণ হেতু, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ হেতু এবং ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন হেতু ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন। দেশ, জাতি ও সমাজকে রক্ষা করেন। শাস্ত্রের যুগে, যাঁরা শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করেন, মহাত্মাজীর মহিমায় জীবনের দিকে তাঁদের দৃষ্টিদান করতে বলি। ভারতের মাটী সে সকল মহামনীষীর চরণ-স্পর্শে খাঁটি হয়ে উঠেছে—তাঁদের পথ ও মন এক। তাই, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য থেকে মহাত্মাজী পর্যন্ত ভারতের সকল সন্ন্যাসীই সেই মহাসত্য অহিংসার পথ বেছে নিয়েছেন। এইত সেদিন সারা দুনিয়া শস্ত্রসাধনায় মেতে উঠেছিল জয়ের নেশায়—তারা নানা রকম মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছিল। বোমা ! বিষাক্ত বাষ্প ! বিষ ! এমনি কত কি ! এ্যাটম্ বোম্ ত গ্রামের পর গ্রাম, জনপদ উজাড় করে তার শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু সেদিনও ভারতের মহাযোগী মহাত্মাজী অবিচলিত ছিলেন তাঁর ধ্রুব সত্যের উপর নির্ভর করে। তিনি জানতেন—হিংসার মধ্যে ধ্বংস অনিবার্য। অহিংসার মধ্যে যে জয়—সে জয় হবে জ্যোতির্ময়। সত্যই আজ অহিংসা পৃথিবীর কাছে জয়লাভ করেছে—জ্যোতির্ময় রূপে। তাঁর সুনিশ্চিত জয় সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ জাতির হাতে সব দায়িত্ব ন্যাস্ত করে পরপারে যাত্রা করেছেন। তিনি যে আলোক-বর্তিকা আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন, নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে যে শশ্মান চিতা রচনা করে গেছেন—সে আলোক বর্তিকা ও চিতাগ্নি ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীকে উজ্জল করে তুলেছে ! আমি সেই স্মরণীয় চিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলি—হে মহাপুরুষ ! তোমার যুগে সৌভাগ্যক্রমে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলেই পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হলাম। তোমায় প্রণাম ! প্রণাম !!

●

প্রেরণার উৎস

চিত্রসাংবাদিক পঙ্কজ দত্ত

গান্ধীজী কোনদিনই চলচ্চিত্রানুরাগী ছিলেন না। ১৯৪৪ সালে জেল থেকে বাইরে এসে কয়েকজনের অনুরোধে তিনি 'এ মিসন টু মস্কো' ছবিখানি দেখেন এবং তারপর ভারতীয় ছবির প্রতি গান্ধীজীর অবজ্ঞা আছে, ভারতীয় চিত্রনির্মাতারা এমন একটা ক্ষোভ প্রকাশ করায় তাঁদের সেই ধারণা দূর করার জন্যে তিনি 'সন্ত তুকারাম' 'সন্ত তুলসীদাস' প্রভৃতি খানকয়েক দেশী ছবির নির্বাচিত অংশ দেখেন-এছাড়া গান্ধীজীকে চলচ্চিত্র দর্শকরূপে আর কখনও দেখা গিয়েছে বলে জানা যায়না।

চলচ্চিত্র যে গান্ধীজীকে কোনদিনই আকৃষ্ট করতে পারেনি একটি ঘটনা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। গোলটেবিল বৈঠকের সময় একদিন এক দর্শনপ্রার্থীর

কার্ড সামনে এনে ধরতে গান্ধীজী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, 'চার্লি চ্যাপলীন! ভদ্রলোক কে বলুনতো? অথচ চার্লি তখনই জগতের শ্রেষ্ঠব্যক্তিদের অন্যতম ব'লে প্রচারিত। কিন্তু দেখা হবার পর রসিকশ্রেষ্ঠ চার্লিকে উল্টে গান্ধীজীই সর্বক্ষণ হাসিয়ে রেখেছিলেন। কোনরকমেরই প্রমোদানুষ্ঠানে তাঁর অনুরাগ ছিল কিনা বোঝা যায় না; জীবনে তিনি কোন রঙ্গালয়ের চৌকাঠ পার হননি। তবে তাঁর প্রার্থনা সভায় অথবা অবসর সময়ে গীতাদির যে ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে তাতে মনে হয় যে, মানুষের ভক্তি, ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সুশোভন ক'রে তুলতে যা দরকার, তার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল; মাঝে মাঝে তিনি ফরমায়েস দিয়েও বিশেষ কোন গান শুনতেন। সাধারণ কোন জিনিষই তাঁর দৃষ্টিকে ধরতে পারেনি। পণ্ডিতজীর কথায়, Gandhigi had little sense of beauty or artistry in man made objects though he admire natural beauty. The Tajmahal was for him an emdobimnt of forced labour and little more. His sense of smell was feeble. And yet in his own way he had discovred the art of living and had made of his life an artistic whole. Every gesture had meaning and grace, without a false touch. There were no rough edges or sharp corners about him, no trace of vulgarity or commonness in which unhappily, our middle-classes excel (75th Birthday Commemoration-volume)। গান্ধীজী সুন্দর ও মঙ্গলদায়কের ভক্তই ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল সৌন্দর্যের আকর। তাঁর প্রবর্তিত ধারা ও রীতি, জীবনযাত্রা প্রণালী, তাঁর মত ও পথ এবং তাঁর সমগ্র পারিপার্শ্বিকই এমন অনবদ্য সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল যা শ্রেষ্ঠশিল্পসৃষ্টিতে প্রেরণার উৎস ছিল।

দুঃখের মধ্যে আমাদের চলচ্চিত্র এই প্রেরণার উৎসটিকে বরাবরই অবহেলা ক'রে এসেছে। মাঝে মাঝে সংবাদচিত্র এবং নামমাত্র কয়েকখানি ছবিতে তাঁর মতবাদের সামান্য আভাস ছাড়া গান্ধীজীকে অথবা তাঁর প্রবর্তিত মত ও পথকে সুস্পষ্টভাবে আমাদের ছবির মধ্যে রূপান্তরিত হ'তে দেখা যায়নি। ভারতীয় চলচ্চিত্র এইদিক দিয়ে তাঁর আসল কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে সত্যিই কেবল 'commonness ও vugarity'-রই আকর হয়ে রয়েছে। গান্ধীজীর মত ও নির্দেশগুলিকে ছবির মধ্যে দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করলে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন হ'তো এবং তার জন্যে ভারতীয় চিত্র গান্ধীজীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদও লাভ করতো যা ভারতীয় চিত্রের বিশুদ্ধতা ও মহত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'য়ে থাকতো চিরকাল। এ সুযোগটা ছেড়ে দেওয়ায় আমাদের চিত্র শিল্পের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে গেল। আজ গান্ধীজীর অবর্তমানে আমাদের চিত্রশিল্পের সচেষ্ট হওয়া উচিত সমগ্র জাতিকে গান্ধীবাদে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করা। তাঁর অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদকতা বর্জন, গ্রাম্যপরিচ্ছন্নতা, কৃষক ও শ্রমিক উন্নয়ন, প্রাথমিক ও বয়স্কশিক্ষা প্রভৃতি অগণিত কর্মসূচীকে কার্যকরি করে তোলায় সর্বশক্তি ও সামর্থ্য যাতে নিয়োজিত ক'রতে পারি সেইদিকেই যেন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

জয়তু মহাত্মা

চিত্রপরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

তের শত বর্ষাধিক কাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেও পুনরায় আজ ভারত স্বাধীন হতে সমর্থ হ'ল এর কারণ কি?......কৈ জগতে তো অন্য কোন জাতি এমন দীর্ঘকাল শৃঙ্খল দশা ভোগ করবার পর আবার স্বাধীনতা ফিরে পায় নাই।—এর একমাত্র কারণ, এই সুদীর্ঘ পরাধীনতার সময়েও ভারতের সাংস্কৃতিক পরাজয় হয়নি—কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অংশের দীর্ঘ পরাধীনতা এনে দিয়েছে—সাংস্কৃতিক অপমৃত্যু। সংস্কৃতি জাতির জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদ থেকে জাতি বঞ্চিত

হলে তার আর উদ্ধারের কোন পথই থাকেনা। সমস্ত ক্রমবিকাশের দ্বারই অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ভারত আজ যে স্বাধীনতা লাভ করলো—সে স্বাধীনতা প্রচলিত ঐতিহাসিক উপায় অবলম্বনে আসে নাই—এল এমন এক পথ ধরে—যা সম্পূর্ণ অভিনব—এতদূর অভিনব যে পৃথিবীর এতখানি বয়সেও এর কোন পূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় না।

আরও আশ্চর্য—পুরাতন পৃথিবীতে স্বাধীনতার বাহক হয়েছে বড় বড় যোদ্ধাগণ—তাদের অস্ত্রের পরাক্রমে পৃথিবী বারে বারে শোণিতস্নাত হয়েছে। বিজীতের লাঞ্ছনায় যে বিজয়ের গৌরব বর্ধিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতের আজকের বিজয়, এই নূতন স্বাধীনতা এমন এক বীরের হাত ধরে এল, যে-হাত কখন অস্ত্রধারণ করেনি......যাঁর হাত আমরণ ছিল সদাযুক্ত ..যাঁর পরাক্রম দেহ-বল আশ্রয় করে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করেনি, পরন্তু দুর্বার মনোবল দ্বারা পুরাতন পৃথিবীকে করেছে নূতন রূপদান...যাঁর কাছে পরাজয় মেনে বিজেতা নিজেকে লাঞ্ছিত মনে করেনি—গ্লানি বোধ করেনি—জেনেছে এ'তার পুরাতন পৃথিবীর পুরান ইতিহাসের পরাজয় নয়। নূতন পৃথিবীতে নূতন ইতিহাসের গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনায় এ পরাজয় তার গৌরবময় অবদান।

পৃথিবীতে এমন যুদ্ধ কখনও হয়নি। যে যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রকাশ পেল—নবতর মহিমা। এই মহিমা হ'ল মানবাত্মার স্বরূপ—আর ১৩শ বছরের অধীনতাও ভারতের আত্মাকে তমসাচ্ছন্ন করতে পারেনি—বারে বারে সেই জ্যোতিষ্পতি ভারতীয় আত্মার মহিমা নিজেকে প্রকাশ করেছে নব নব রূপে—নব নব ভাবধারায়—যার জ্যোতিতে পৃথিবীর স্বাধীন অংশের লোকেরও চোখ ঝলসে দিয়েছে—মানসম্ভ্রম এনে দিয়েছে। এই আত্মা-জ্যোতি ভারতের কল্যাণের জন্য সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য—এবার প্রকাশিত হয়েছিল গান্ধীজীর আত্মাকে আশ্রয় করে—এ জ্যোতির মহিমা আমরা দেখলাম, পৃথিবী দেখলো। আলোচনা-বিচার, অনুধাবন-সমালোচনা কত হ'ল ভারত জুড়ে—পৃথিবী জুড়ে তার ইয়ত্তা নেই। জীবনে তিনি হয়ে ছিলেন মহিমান্বিত, মৃত্যুতেও তাই, কিন্তু এ হ'ল তাঁর নিজের দিক—। এছাড়া আর একটা দিক্ যে-দিক্‌টা দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে ছিল,যার প্রভাব থেকে উচ্চ নীচ-কেও বাদ পড়েনি সেই দিকটা হলো সঙ্কল্পময়ী শক্তির খেলা। সঙ্কল্পই হলো জগতের অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন পুরুষের শরীর হ'তে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হ'তে থাকে আর তাঁর নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করে। এইরূপ মহাপ্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন পুরুষ সমূহের মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয়। আমাদের মহাত্মা তেমনি মহাপুরুষ। তাই না গোটা ভারতবর্ষটার অগণিত আত্মা—তাঁর সঙ্কল্পকে মেনে নিয়েছিল।

হে জগৎবাসী, বিশেষ করে হে ভারতবাসী, তোমরা নিশ্চয় জেনো যে, আত্মাকে অগ্নি, বায়ু, জল, জরা কোন কিছুই নষ্ট করতে পারেনা—তাহাকে কয়েকশত বৎসরের পরাধীনতাই কি বিনষ্ট করতে পারে! না, পারে না—ভারতপুরুষ—এ সত্য বারে বারে প্রমাণ করে গেছেন—আর তার শেষ এবং চরম প্রমাণ-মহাত্মা গান্ধীর মহা-আত্মা—একযোগে সারা ভারতের দলিত আত্মাকে আপন স্বভাবে ফিরিয়ে আনলেন।

অহিংসা, প্রেম, প্রত্যয়, বৈরাগ্য—ভারতের সহজ সাথী। স্বাধীনতার অধীনতায় এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই ভারত মরেও মরেনি,—মহাত্মা আমাদিগকে পুরাতন সত্য নূতন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন আপন জীবনে—ঐ ধর্মগুলির অমোঘ শক্তিসমূহকে পুনঃ প্রকাশিত করে। মহাত্মার মহিমার বিরাটত্বকে মাপ. জোক করে প্রতিপন্ন করতে যাওয়া শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র।

হিমালয়ের চূড়ায় পতাকা পোঁতায় একটা দুঃসাহসিক পৌরুষ আছে সত্য, কিন্তু তাই করতে পারলেই কি আমরা হিমালয়ের বাণী শুনতে পাব, না তার মর্ম উদ্ধার করতে পারবো? সে বাণীর মর্ম উদ্ঘাটন করতে গেলে যোগীশ্বর মহেশ্বরের মত কৈলাশ শৃঙ্গে—সমাধীস্থ হওয়া

ছাড়া গত্যান্তর নাই। মহাত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে গেলে—তিনি কার চেয়ে কত বড় এ বিচার অচল, —চাই জীবনে সেই চেষ্টা, যে চেষ্টা, আপন জীবনটাকে করে তুলবে এই বিরাট জীবনের প্রতিচ্ছবি।

এইরূপ চেষ্টাই মহাত্মার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায়। ভারতের প্রতিটী আত্মা তাঁর মত শুদ্ধ হ'লে—সৎ হ'লে মহাত্মার আত্মা পরিতৃপ্ত হ'বেন—নচেৎ নয়।

কিন্তু ভারত ধর্ম বলছে—মাভৈঃ— "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা……"কোথা ভয়……নাহি ভয়। আমরা স্বভাবতঃই শুদ্ধ ও সৎ। ধূলো ঝেড়ে উঠে পড়—ভাই—।

জয়তু মহাত্মা!

"মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ"

জনপ্রিয় চরিত্রাভিনেতা লেঃ হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম, আর, এ, এস ; এফ, আর, ই, এস ; এফ, আর, এস, এ, (লণ্ডন)

৩০শে জানুয়ারী গোধূলি লগ্নে ভারতের বিনির্মল আকাশ থেকে সহসা যে বজ্রপাত হ'ল তার অকম্পিত আঘাতে ভারতের অন্তরাত্মা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। আঘাত কঠিন হ'লেও আততায়ীর অগ্নিগোলার অন্তরালোকে সমগ্র জগত আজ আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব—মহাত্মা গান্ধীজীর তিরোধানে ভারতের যে কতবড় একটা ক্ষতি হ'য়ে গেল—এই দুর্দিনে আমরা মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি কচ্ছি এবং সংগে সংগে অনুভব কচ্ছি আমাদের প্রকাণ্ড অসহায়তা। মহাত্মাজী যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন—আজ একথা এক বাক্যে পৃথিবীর ছোট বড় সকল ব্যক্তিই স্বীকার করে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধদেবের পর, ত্রাণকর্তা যীশুখৃষ্টের পর—মহাত্মাজীর মতন মহামানব আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন ভারতের গৌরব, ভারতবাসীর গর্বের বস্তু। তিনি ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর নিকট ধনী, দরিদ্র, পতিত, অস্পৃশ্য সকলেই সমান। তিনি ভারতের এই মহাদুর্দিনে শান্তির বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি জাতির পিতা (Father of theNation) নামে সকলের কাছে পরিচিত, পূজ্য, সর্ব-বরেণ্য ছিলেন। জীবনে যাঁর একমাত্র ব্রত ছিল—ভারতকে স্বাধীন করা, ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা—এই দৃঢ় পণ নিয়ে তিনি আজীবন যুদ্ধ করে এসেছেন। ভারতে তাঁর দান অতুলনীয়, অপরিসীম, অপরিমিত। তিনি ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত। অহিংসানীতিতে সমৃদ্ধ। আজ কী না সেই মহাপুরুষের মৃত্যু হ'ল—এক উগ্রবুদ্ধি, বর্বর, ঘৃণ্য আততায়ীর হিংস্র আঘাতে। লজ্জায়, ঘৃণায় শির নত হ'য়ে আসে যে, এই মহাপ্রাণের মৃত্যু হ'ল কিনা তাঁর নিজের স্বদেশবাসীর হাতে। সত্যের আশ্রয়ে যিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা—যিনি ছিলেন অহিংসার জীবন্ত প্রতীক—যিনি চেয়েছিলেন হিংসানল. শান্তিবারি সিঞ্চন করে চিরনির্বাপিত কর্তে —তাঁরই উপর কিনা শেষে এই হিংসার আঘাত। এই কিনা তাঁর জীবনের পরিণাম—আর এই কিনা আমাদের প্রতিদান! এ কলঙ্ক কালিমার দাগ ভারতের গা থেকে কখনও মুছে যাবে না। জগত চিরদিন উচ্চঃস্বরে সাক্ষ্য দেবে—ভারতের দুর্ণাম। ইতিহাসের পাতায় এই কলঙ্কের কথা চিরদিন লিখিত থাকবে।

এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা আমার প্রয়াস নয়-শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাই আমার চরম লক্ষ্য। তাঁর অমূল্য জীবন একটী ইতিহাস। যতই কেন বলিনা, যত কিছুই তাঁর উদ্দেশ্যে লিখিনা কেন—তবু যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়—সব কথা বলে কিংবা লিখে শেষ করা যায় না। আজ তিনি অমরধামে গেছেন। তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি। প্রার্থনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে যুক্ত করে বলি—হে মহাত্মন! তোমার দেবত্ব ও মানবত্বের মধ্যে যে সামান্য ব্যবধানটুকু ছিল, সেদিন এক ঘাতকের অগ্নিগোলায় তা অপসারিত হ'য়ে গেল। আঘাতের বেদনা উপশম হতে না হতেই—দেখলাম মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি সমুন্নত গরিমায় সর্বত্র সমুজ্জল হ'য়ে রয়েছ। দেখলাম হিমাদ্রী হ'তে কুমারীকা পর্যন্ত ভারতের

প্রভি অংগে রয়েছে তোমারই পদচিহ্ন। হে মহাত্মাজী! হিংসার যুপকাষ্ঠে আত্মবলিদান দিয়ে তোমার মহান্ আদির্শকে অমর করে রেখে গেলে। অমরলোক থেকে আশীর্বাদ কর—তোমার ঐ সত্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে যেন আমরা তোমার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করে তোমার আত্মার তৃপ্তিসাধন কর্তে সক্ষম হই। আমাদের মন থেকে অজ্ঞতা, নীচতা, হীনতা, ভেদাভেদ, হিংসাপ্রবৃত্তি, মালিন্য সব দূর করে দাও। তোমার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে যেন পৃথিবীর সাম্‌নে নিজেদের পরিচয় দিতে পারি। তুমি যে একদিন আমাদের জয়যাত্রার ক্রম-বিজয়ের সুদীর্ঘ পথে সেনানায়করূপে পথপ্রদর্শক ছিলে একথা যেন কোনদিন আমরা বিস্মৃত না হই। তোমাকে আমরা আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করে, তোমাকেই আমাদের আদর্শরূপে যেন চিরদিন স্মরণ করে চলতে পারি। তোমার জীবদ্দশায় তোমাকে যে সম্মানে আমাদের ভূষিত করা উচিৎ ছিল, তা আমরা করি নাই—কর্তে পারি নাই। আমরা অজ্ঞ, মূঢ়, অবিবেচক—তোমার মহত্ত্ব বুঝতে পারিনি। আজ তোমার অবর্তমানে তোমার অভাব উপলব্ধি কর্তে পাচ্ছি। ভ্রমান্ধ হ'য়ে তোমার জীবদ্দশায় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমার কার্যের কতনা সমালোচনা করেছি। তখন বুঝতে পারিনি তোমার অহিংসানীতির মর্ম, তোমার ধর্ম, তুমি যেটাকে সত্য বলে জেনেছিলে, যেটাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলে, তুমি যে ধর্মকে সাধারণের কাছে প্রচার কর্তে চেয়েছিলে। তুমি আমাদের সকল ত্রুটি মার্জনা কর। আমাদের অজ্ঞতা দূর করে দাও। আজ অনুতপ্ত ভারতবাসীকে তুমি ক্ষমা কর। তুমি তোমার নিজের এই অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেলে—সত্যের আলোক, সন্ধান দিয়ে গেলে বৃহত্তর মানবতার স্বর্ণমন্দিরের, দেখিয়ে দিয়ে গেলে ত্যাগের পথ কত মহত্তর। 'অহিংসা পরম ধর্ম'—এ মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রচার করে দিয়ে গেলে। তুমি আজ তোমার জীবনপাত করে দেবত্ব লাভ করে গেলে। তুমি এক্ষণে স্বর্গবাসী—স্বর্গ থেকে আমাদের শুধু নির্দেশ দাও।

তোমার মধুর বাণী আর শুনতে পাব না। তোমার চির হাস্যময় মুখ আর দেখ্‌তে পাব না। এখন তোমার পুণ্য স্মৃতিই আমাদের কাছে যেন চিরদিন আদর্শরূপে জাগরিত থাকে। ঈশ্বরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করি—তোমার অমর আত্মার শান্তি হউক।

হে মৃত্যুঞ্জয়ী সত্যদ্রষ্টা,
হে বীর নির্ভয়,
দেহ দিয়ে গেয়ে গেলে
জীবনের জয়।

●

শ্রদ্ধা-তর্পণের ছ'টো দিক

—শ্রীমতী ছায়া দেবী [চিত্র-তারকা]

মহাপুরুষের তিরোভাবে পণ্ডিত-মূর্খনির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা-নিবেদন করার অধিকার আছে। শিল্পীদের তরফ থেকে সে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়ে রূপ-মঞ্চ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সময়োপযোগী কর্তব্য-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রদ্ধা প্রকাশের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রশ্ন এখানে উঠে না। যিনি সমগ্র জাতিকে পিতৃহীন করে গেছেন, সে জাতির সন্তানরা তাদের দুঃসহ বেদনাকে প্রকাশ করতে ভাষার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীচৈতন্যের মত যিনি জাতি ভেদের বৈষম্য দূর করে, এ জগতে প্রচার করে গেছেন—সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের বাণী এবং শুধু প্রচার নয়—প্রমাণ রেখে গেছেন তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মে—আত্মার আত্মীয়ের মত সকল মানুষের অন্তরে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন আপন বৈশিষ্ট্যে।

মানুষের পাপের ভার লাঘব করার জন্যই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে যুগ-সন্ধিক্ষণে। আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবনে যে সব পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, গান্ধীজী তাদেরই বিলোপ সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। লজ্জার কলঙ্ক রেখে সার্থক হলো যাঁর আত্ম বলিদান, আজ

সে কলঙ্ক বিমোচনের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে রইল জাতির অবলম্বন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী থেকে যিনি নিলেন শেষ বিদায়—তাঁর কামনা ও সাধনা অতৃপ্ত রেখে—এ যুগের মানুষ যদি তার মর্ম বুঝে তাঁর অসমাপ্ত সাধনা সফল করে তুলতে পারে—তবেই পিতৃ-বিয়োগে জাতির শ্রদ্ধা তর্পণ সফল হবে। গান্ধীজীর আদর্শ ও তাঁর জীবন ধারার আলোচনার মধ্যে সাড়ম্বরে শোক প্রকাশের সমারোহটাই যদি বড় হয়ে উঠে—তা হ'লে তাঁর আত্মাকে তৃপ্ত করবার এ আয়োজন একেবারেই ব্যর্থ হবে।

গান্ধীজীর নামে রাস্তার নাম-করণ ক'রে, তাঁর তৈল-চিত্র উন্মোচন বা মর্মর মূর্তি স্থাপন ক'রে বড় জোর আমরা আমাদের নাগরিক দায়িত্বের পরিচয় দিতে পারি। কিন্তু গান্ধীজির নাম নিয়ে আরও যে সব যথেচ্ছাচার চলছে, ২৮শে ফেব্রুয়ারীর দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী তার প্রতিবাদ করেছেন। এই যথেচ্ছাচার অবিলম্বে বন্ধ করবার দিকে তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহাপুরুষের স্মৃতিপূজার শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা আমরা শহরের ও বাহিরের বিভিন্ন 'মিশন্' বা মঠগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বেশ বুঝতে পারি। অন্তরে ময়লা আর বাইরে গেরুয়া, সকল সাধনার শেষ দেখতে পাই এখানেই।

মহাভারতের মত সহজপাঠ্য তাঁর জীবন ও উপদেশ। সে উপদেশের ভাষা যেমন সরল তেমনি সহজবোধ্য। সমগ্র-ভাবে সক্ষম না হলেও অন্তত আংশিক ভাবে তাকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সত্য করে তুলতে না পারা পর্যন্ত, তাঁর স্মৃতিপূজার প্রচেষ্টা শুধু আড়ম্বরেই সমাপ্তি লাভ করবে। আমরা অভিনয়ের জন্য যেমন নিত্য-নূতন-ভাবে ভোল বদলাই, তেমনি শুধু খদ্দর পরে ভদ্দর সাজার সাজার মধ্যেই যাঁরা গান্ধী-ভক্তির চরমোৎকর্ষতার সন্ধান করেন—তাঁরা আমাদেই মত বহুরূপী। এই নকলের অভিনয় থেকে আত্মাকে শুদ্ধ করবার দিন আজ সমাগত। রঙ্গালয়ে এবং ছবিতে গান্ধীজীর আদর্শ আমরা কত না বিচিত্র উপায়ে প্রচার করছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি যে অপপ্রচার তা উপলব্ধি করতে এ যুগের শিক্ষিত এবং চতুর দর্শকদের বিলম্ব ঘটছে না। সস্তায় কিস্তিমাতের উদ্দেশ্যে আরোপিত এধরণের মুষ্টিযোগ আর কাজ দেয় না। হিরোর মুখে লম্বা লম্বা লেকচার দিয়ে গান্ধীবাদ প্রচারের হাস্যকর প্রচেষ্টা না করাই ভাল। আজকে মানুষ এমন হিরো ও হিরোইনের সাক্ষাৎ পেতে চায়—যাঁরা বক্তা নয়, কর্মী এবং যে কর্মীর জীবন-সাধনা সমগ্র নাটকের মধ্য দিয়ে বিচিত্র ঘটনায় অভিব্যক্ত। মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শ নাটকের মাঝ দিয়ে এই ভাবে রূপায়িত হওয়া উচিত। নিছক পাটোয়ারী মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ-হাসিলের উদ্দেশ্যে যারা শুধু গান্ধীর ছবি বা তাঁর সারমন্ ছরাচ্ছেন শ্রদ্ধা প্রকাশের নামে, তাঁদের এ অপচেষ্টা দেখে দুঃখ বোধ করি।

পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তাঁর সদ্য প্রদত্ত বেতার বক্তৃতায় যে কথাগুলি বলেছেন (২৭-২-৪৮ রাত্রে, স্থানীয় ষ্টেশন থেকে)—তার মধ্যে গান্ধীজীর সত্যকারের স্মৃতি-পূজার নির্দেশ পরিস্ফুট হয়েছে। সত্য এবং স্পষ্টবাদীতার দিক দিয়ে এ নির্দেশটি অমূল্য। প্রসংগত কয়েকটি লাইন মাত্র তুলে দেবার লাভ সামলাতে পারলেম না।

"যিশুখৃষ্ট যখন আপন অন্তিমকাল সমুপস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি আপন শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি যেমন ভাবে তোমাদের ভালবাসিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস, ইহা আমার নির্দেশ।' মহাত্মা গান্ধীও আমাদের কাছে যে প্রেম ও প্রীতির বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।"

"আমি কল্পনা বিলাসী নই। আমি নিজেকে আদর্শপ্রিয় কর্মী বলে মনে করি। অহিংসা শুধু মুনি-ঋষিরই পালনীয় নয়। সাধারণ লোকেও অহিংস হ'তে পারে। হিংসা যেমন পশুর ধর্ম অহিংসা তেমনি মনুষ্যের ধর্ম।"— — — —

আমরা সবাই—

— — — — — — — 'গান্ধী মহারাজের শিষ্য—

নিউথিয়েটার্স লিঃ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার (নিউ থিয়াটার্স লিঃ, কলিকাতা)

জীবনই যাঁর বাণী, মূর্তি যাঁর প্রতি নর নারীর অন্তরে রয়েছে আঁকা—ক্ষণভঙ্গুর মর্ম-মূর্তি গড়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মধ্যে গর্ব থাকতে পারে—গৌরব থাকতে পারেনা। তাঁর আদর্শ লক্ষ্য করে যদি আমরা কায়মন প্রাণে অগ্রসর হ'তে পারি, যদি পারি সেই পথচলা সার্থক ও সফল করতে তবেই হবে সেই যুগাবতার মহাত্মা গন্ধীর পুণ্য স্মৃতিমূলে সত্যিকার শ্রদ্ধা জানান। তবেই তাঁর জ্যোতির্ময় আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকবে আমাদের চলার পথ।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্র মিত্র (ছোটাই বাবু) (এসোসিয়েটেড প্রডাকসন্স লিঃ এর পক্ষ থেকে)

হে মহামানব, সত্য ছিল তোমার কর্ম, অহিংসা ছিল তোমার ধর্ম—শক্তিহীন সহায়হীন নিপীড়িত জনগণের মনে সত্যাশ্রয়ী বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দেওয়া ছিল তোমার কর্ম! লুপ্ত প্রায় মুমূর্ষু মানবতা তোমার সান্নিধ্যে পেয়েছিল পরম প্রকাশ। হে সত্যাশ্রয়ী বিপ্লবী, তুমি ক্লিষ্ট মানবাত্মাকে যে জ্যোতির্ময় সম্ভাবনার পথ দেখালে সেই পথের পায়েই রইল আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ-এর তত্ত্বাবধায়ক শ্রীঅজিত সেন (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ, টালিগঞ্জ)

জীবন যাঁর যুগান্তকে স্পর্শ করে গেল, তিনি স্মরণাতীত কাল ধরে দেশ, জাতি আর সমাজের পূজা পেয়ে আসবেন। কিন্তু এই ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের কালে জন্মে আমরা একধারে যেমন সৌভাগ্য বলে মনে করছি অপর দিকে তেমনি দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে শংকিত হ'য়ে উঠছি। ভাবছি, যুগ যুগান্তরের তপস্যায় আমরা যাঁকে পেয়েছিলাম, তিনি কি আবার এই মাটিকে ধন্য করতে ফিরে আসবেন!

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ-এর প্রধান চিত্রশিল্পী শ্রী সুরেশ দাস (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ, টালিগঞ্জ)

মানুষের ভগবান যুগে যুগে মানুষের দ্বার প্রান্তে আসিয়া লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে যান। বিংশশতাব্দীর মানুষও সেই ভুল করিল। এই ভুলের প্রতিকার নাই, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আছে। বহুদিন ধরিয়া ভারতবর্ষকে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ-এর প্রধান শব্দযন্ত্রী শ্রী গৌর দাস (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ, টালিগঞ্জ)

জীবনকে যিনি তাঁর বাণী বলে গ্রহণ করতে বলে গেছেন—আজকের এই ব্যথা-বেদনার দিনে শুধু সেই বিরাট কর্মময় জীবনের দিকে সকলকে দৃষ্টি দান করতে বলি। তাঁর মধ্যেই ফিরে পাব তাঁর পূজার ফুল।

প্রবীণ চিত্র পরিচালক ও চিত্রাভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (ডি, জি, পিক্‌চার্স)

প্রাণ দিয়ে যিনি প্রেমকে জয় করলেন, তাঁর প্রভাব থাকবে জাতির অন্তরে চির জাগরুক। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে যিনি জাতির হৃদয় জুড়ে ছিলেন, তাঁর দেহের লয় হলেও দেহীর লয় হয়নি। আজ আমরা তাঁর মত ও পথকে যদি আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি, তবেই হবে যথাযোগ্য পূজা!

কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব

নবাগত অভিনেতা দেবীপ্রসাদ (ওরিয়েণ্ট পিকচার্স)

বিশ্বমানব কল্যাণে আত্মাহুতি দিয়ে, হে মহাত্মা, তুমি অহিংসার যে অমর নাটক রচনা করে গেলে, ভারত নাট্য-মঞ্চের তেত্রিশ কোটি নট-নটী যেন অকলঙ্ক অভিনয় করে তা সার্থক করে তুলতে পারে, এই প্রার্থনা করি।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ-এর কর্মীবৃন্দ (অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ, কলিকাতা)

বিশ্ব মানবতার মূর্ত প্রতীক, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা যেন কেবলমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশের মধ্যেই আবদ্ধ না থাকে—শ্রদ্ধা যেন আমাদের কার্যের মধ্যে রূপ নেয়—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বাংলার চিত্র জগতের অন্যতম কর্ণধার চিত্রপরিবেশক ও প্রযোজক শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় (রাঁতেন এণ্ড কোঃ, এম, পি, প্রডাকসন প্রভৃতির পক্ষ থেকে)

মহাত্মার মৃত্যু নাই। নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অশান্ত বিশ্বলোকে যুগেযুগে ঈশ্বরের শান্তিদূতের আবির্ভাব হয়। যুগে যুগে দয়াহীন পৃথিবীতে নৃশংস নির্যাতন ও স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া তাঁহারা মনুষ্যলোকে করুণা বিতরণ করেন। তাঁহাদের আত্মত্যাগের মধ্যে বিপর্যস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও সংহতি ফিরিয়া আসে—মানুষ খুঁজিয়া পায় আদর্শ। নির্বাণহীন জ্যোতিষ্কের মতো মহাকালের অসীম আকাশে আলোকতীর্থ রচনা করিয়া ইহারা অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহাদের আবির্ভাব আছে, তিরোভাব নাই। মানুষের হৃদয়গগনে এই সব মহাসূর্যের উদয় আছে, অস্ত নাই।

সত্য, প্রেম ও অহিংসার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীও চিরদিন অমর রহিলেন। অন্ধকার করিয়া আসিলে যুগে যুগে এই সূর্য সারথীর কাছে আমরা আলোক চাহিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন। মোহ, ভয়, স্বার্থ ও হিংসায় অন্ধ হইয়া মানসচক্ষু নিমীলিত করিয়া আমরা যেন এই মহাসূর্যকে কখনও অস্বীকার না করি। গান্ধীজির জয় হোক।

পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ, নবরূপম, হাওড়া ও রূপম, কলিকাতা।

ভারত বিভক্ত হইলে আমার দেহ খণ্ডিত হইবে—গান্ধীজির এই আশংকা নির্মম সত্যে পরিণত হইয়াছে। এ পাপের দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের নহে। এ পাপের দায়িত্ব সকল ভারতবাসীর। ইহার জন্য আমাদের সকলকেই আজ কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

শ্রীখগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (হারুদা)

(রাঁতেন, ডি, লুক্স এম, পি প্রভৃতি)

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি নাই বলিয়া দুঃখ আমার নাই। কারণ, মহাত্মাজীর দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার বহুবার হইয়াছে। যতদিন এই পৃথিবীতে একটি মানুষের হৃদয় থাকিবে, ততদিন মহাত্মা বাঁচিয়া থাকিবেন। জয়তু গান্ধীজী!

বিশ্বভারত ফিল্মস লিমিটেড (কলিকাতা)

মরেও যারা অমর—ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত—হিন্দু মুসলীম মিলনের প্রতীক—অহিংসার পতাকাবাহী বাপুজীর সাহাদাতে জানাই আমাদের গভীর বেদনা সারা দুনিয়াকে। আসুন, এই চরম বেদনার মুহূর্তে শহীদ বাপুজীর অহিংসা, প্রেম, শান্তি, মিলন ও মানবতার অমর বাণীকে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া তুলিবার সংকল্প গ্রহণ করি। বাপুজী জিন্দাবাদ।

নবীন প্রযোজক সুকুমার বসু (ভ্যারাইটি ফিল্মস)

আমাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দের আন্তরিক বেদনা দিয়ে বাপুজীর দেহগত জীবনের স্মৃতি-তর্পণ কচ্ছি। বাপুজীর দেহাতীত জীবন অমর—অক্ষয়।

প্রবীণ চিত্র ব্যবসায়ী নলিনী বসু (ভ্যারাইটি পিকচার্স)

ভারতের মহামানব মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে আজ সমস্ত বিশ্ব শোকে নিমজ্জিত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য মহাত্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন সত্য ও অহিংসার বাণী নিয়ে। তাঁর দেহগত জীবনের

– – – – – এক জায়গায় আছে মোদের মিল,—

পূর্বক্ষণ অবধি তিনি সে সাধনায় মগ্ন ছিলেন। দেহাতীত জীবন ধারণ করে তিনি আমাদের মাঝ থেকে অন্তর্হিত হলেও, তাঁর আদর্শ রেখে গেছেন আমাদের জন্য! সেই আদর্শের আলোকচ্ছটায় আমাদের চলার পথের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সত্য ও সুন্দর বিকশিত হয়ে উঠবে।

জনপ্রিয় অভিনেত্রী মলিনা দাসী (কলিকাতা)

মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণে অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তিনি আমাদের স্বাধীকারের মর্যাদা দিয়েছেন—এইটাই শুধু তাঁর সম্পর্কে বড় কথা নয়। নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তি সংগ্রামের তিনি জয়ী সৈনিক, তাইত মানবাত্মার এই মরমী মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে সমস্ত বিশ্বমানবের হৃদয় আজ শোকে উদ্বেলিত। হে শাশ্বত মহাপুরুষ, তুমি অজয় অমর—তোমার আদর্শ আমাদের মনের তমসা নাশ করে সত্যকে বিকশিত করে তুলুক।

খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক নীরেন লাহিড়ী (ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্স, কলিকাতা)

হে মহাত্মা, তুমি নাই একথা আজও মনে প্রাণে মানিতে পারিতেছি না। গান্ধীহীন ভারতে কি লইয়া—কেমন করিয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিব—তুমিই হে গান্ধীজী, তুমিই তাহা অলক্ষ্য লোক হইতে আমাদের বুঝাইয়া দাও। পথ দেখাইয়া দাও।

বাংলা চিত্রপরিবেশনা ও প্রযোজনা ক্ষেত্রের অন্যতম কর্ণধার শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ (এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ)

জয়তু গান্ধীজী,

মৃত্যুঞ্জয়ী মহাত্মার নশ্বর দেহের অকাল অবদানের জন্য দায়ী করেছি আমরা এক ঘৃণ্য ঘাতককে। কিন্তু স্থিরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তাঁর প্রকৃত হত্যাকারী আমরা—তাঁর স্বধর্মাবলম্বী দেশবাসীরা—যারা তাঁকে বাহিরে সম্মান দিয়েছি, মৌখিক আনুগত্য দেখিয়েছি কিন্তু পরোক্ষে প্রতি পদে তাঁর স্বপ্ন ও সাধনাকে বাধা দিয়েছি—সার্থকতার দিকে এগুতে দেইনি। তাঁর মত ও পথকে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। এই অবিশ্বাস তিনি সহ্য করতে পারলেন না—অভিমানে চলে গেলেন আমাদের ত্যাগ করে—এ তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু হত্যাকারীতো উপলক্ষ্যমাত্র।

পাপ আমরা করেছি—পিতৃহত্যার পাপ। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করবার অধিকার আছে এবং সময়ও আছে। এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারলেই পাব আমরা তাঁর ক্ষমা—জাতি হবে ধন্য। স্বার্থ, দ্বন্দ্ব এবং সংশয় ত্যাগ করে আমাদের বরণ করে নিতে হ'বে তাঁর সত্য, প্রেম ও অহিংসার পথকে এবং সফল করে তুলতে হবে তাঁর একজাতিত্বের স্বপ্নকে। যেদিন আমরা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা লাভ করবো আত্মশুদ্ধি এবং নিশংসয়ে বরণ করে নিতে পারবো তাঁর সত্য, প্রেম ও অহিংসার পথ, সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, তাঁর অবিনশ্বর আত্মা আমাদের সকলের মধ্যে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে—আমাদের পথ দেখাচ্ছেন তিনিই, যাঁকে একদিন আমরা অবিশ্বাসের এবং সংশয়ের বশবর্তী হ'য়ে হত্যা করেছি। তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়ী! অন্তরীক্ষ থেকে তিনি আজো আমাদের কল্যাণ কামনাই করছেন। আমাদের কাছে ধরা দেবেন। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য কার্য করাই হবে আমাদের সাধনা এবং এতেই হবে তাঁর পুণ্যাত্মার চরম তৃপ্তি। জীবিতাবস্থায় আমরা ভুয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁকে অনেক ঠকিয়েছি, আজ আবার কেবল বাক্যের দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যেন তাঁর আত্মার অবমাননা না করি।

ক্ষণিকের আর্তনাদ করে শোক জ্ঞাপন না করে আজ হ'তে প্রত্যহ আমাদের স্মরণ করতে হবে, সেই শান্ত-সৌম্য মূর্তিকে আর সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে—"হে জাতির পিতা—আমাদের সকল দুর্বলতা, সকল অক্ষমতা ও সকল অপরাধ ক্ষমা করো—আমাদের সুবুদ্ধি ও সৎসাহস দাও, সত্যের সন্ধান দাও—তোমার পূজার যোগ্য কর।"

গরীব মেরে ভরাই না পেট —

জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী রাণীবালা
(রঙমহল নাট্য-মঞ্চ)

রাম আর রহিমের একখানা জাহাজ ছিল—পুরুষানুক্রমে তারা সেই একই জাহাজে বাস করতো—কোনদিন কোন অধিকার বা স্বত্ব নিয়ে দেখা দেয়নি তাদের মধ্যে কোন বিরোধ। হঠাৎ একদিন রহিম বললে, আমাকে আমার ভাগ পেতে দাও। রাম বোঝাবার চেষ্টা করলে কিন্তু রহিম নাছোরবান্দা। অতএব জাহাজ ভাগ হ'ল, দু'জনে দু'দিকে থাকলেও একটিমাত্র দিগদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে চলতো সেই জাহাজ। এমনি ভাবেই চললো কিছুকাল—অকস্মাৎ ৩০শে জানুয়ারী বিকেল ৫টায় মন কষাকষির মুখে রামের ছেলে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেললে জাহাজের বহুকালের প্রাচীন সেই দিগদর্শন যন্ত্রটা। জাহাজ তখন মাঝ সমুদ্রে। হে ঈশ্বর, এবার তুমি রক্ষা করো—তোমার রাম আর রহিমকে।

সাহিত্যিক ও খ্যাতনামা প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পাল (প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ, কলিকাতা)

মানুষের স্বার্থ আর হিংসা, দুর্বলতা আর ভীরুতার পৃথিবীতে সকল মানুষই মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করে নিতে সক্ষম হবে—এতবড় বিশ্বাস আজও আমরা খুঁজে পাইনি। তবু দেখেছি লাঞ্ছিত যারা, ভাগ্যবিড়ম্বিত যারা, নানা অশান্তি ও সমস্যার বন্ধন-জর্জর অসহায়তা ও নিষ্ফল আক্রোশের জ্বালায় যারা জ্বলছে, তাদের কাছে মহাত্মাজীর জীবনাদর্শ শান্তির একটী স্নিগ্ধ অবিকল্পিত আশ্বাসের মত দাঁড়িয়েছিল। যারা তাঁর কাছে পৌছতে পেরেছে তারা ধন্য, যারা পারেনি পৃথিবীর দূর দুরান্ত থেকেও তারা দেখতে পেয়েছে সেই আলো। নানা বিরোধ ও বাধা অতিক্রম করে সেই আলোর আহ্বানে এ কদিন সকলকেই অন্তর হ'তে সাড়া দিতে হবে—সেই স্বপ্নের মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর আয়ু।

মানবতার সেই শিখা গুপ্ত ঘাতকের দল দিয়েছে নিভিয়ে কিন্তু তারা জানেনা—সেই আলো চূর্ণিত আভা হ'য়ে প্রবেশ করল আমাদের আগামী যুগের সাধনার জীবনকে পথ দেখাতে।

খ্যাতনামা সুরকার ও কৌতুকাভিনেতা রঞ্জিত রায় (কালিকা নাট্য-মঞ্চ)

যে মহাপুরুষ সমস্ত জীবন একটী মাত্র উদ্দেশ্যের মহাপরিণতির প্রতি নিবেদিত ছিলেন—তিনিই সত্য। যে মহাযোগী—সমগ্র মানব গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনায় বিনিদ্র দিন রজনী তপস্যায় মগ্ন ছিলেন—তিনিই শিব। যে মহাঋষি—কর্ম এবং ধর্মের জীবন-যজ্ঞে দেবতা আর দানবের মধ্যে একই অবিনাশী আত্মাকে প্রণাম করেছিলেন-তিনিই সুন্দর।

গত ৩০শে জানুয়ারী আমরা আমাদের মধ্যেকার সেই সত্য-শিব-সুন্দরকে হত্যা করে আমরা আত্মহত্যা করেছি। হে ভগবান, এবার তুমি অসত্য-অশিব আর অসুন্দরের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।

নবীন প্রযোজক সুনীল বসু মল্লিক
(ওরিয়েণ্ট পিকচার্স)

যখনই দেশের সংকটময় অবস্থায় আমরা দিশাহারা হইয়াছি, তখনই মহাত্মাজী ঈশ্বরের প্রেরিত দূতের ন্যায় আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এতদিন আমরা যেন এক মহীরুহের ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতেছিলাম কিন্তু আজ কোথায় সেই মহীরুহ!

বাপুজী নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শ আছে—অন্ধকারে সেই আদর্শই আমাদের পথ দেখাইবে। আমরা যেন সেই আদর্শের নির্দেশ মেনে পথ চলিতে পারি।

নাট্য-পরিচালক ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত
(ষ্টার থিয়েটার)

অধর্মের গ্লানি হ'তে পৃথিবীকে পরিত্রাণ করতে যুগে যুগে ভগবান নর দেহ ধারণ করেন। ঘাতকের নির্মম আঘাতে যে মহামানবকে আমরা হারালুম—বিশ্বকল্যাণে তাঁর দান অবতার পুরুষের চেয়ে এতটুকু কম নয়। মহাত্মার বাণীকে কর্মের ভেতর দিয়ে যদি জাগ্রত

— — — — — ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট,

করে রাখতে পারি—তবেই হবে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

সর্বজন প্রিয় অভিনেতা ভূমেন রায় (স্টার থিয়েটার)

হে অমর লোকচারী মহামানব, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

অভিনেতা জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (ষ্টার থিয়েটার, কলিকাতা)

পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাল। এযে জগতের কত বড় ক্ষতি—তা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই।

অভিনেতা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (ষ্টার-থিয়েটার, কলিকাতা)

বাপুজী, তোমায় নমস্কার। তোমার নির্দেশিত অহিংসা সাম্য ও মৈত্রীর পথে আমরা যেন চলতে পারি।

অভিনেত্রী শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল) (ষ্টার থিয়েটার)

যুগ-সূর্য অস্ত গেল। আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই।

মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী অপর্ণা দেবী (ষ্টার থিয়েটার)—সারা ভারত হ'তে যেদিন সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার বিষ আমরা মুছে ফেলতে পারবো—সেদিনই সার্থক করে তুলতে পারবো মহাত্মার সাধনা।

মঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী ছায়া দেবী (ছোট) (ষ্টার থিয়েটার)

হে, আলোক পথচারী মহাজন, আমাদের যাত্রাপথ তোমার করুণালোকে উদ্ভাসিত হউক।

জনপ্রিয় সুরশিল্পী ধীরেন দাস (স্টার থিয়েটার কলিকাতা)

সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরা শোকে মুহ্যমান
আসেনি কখনও পূর্বে হেন মহাপ্রাণ।

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও চিত্র-কাহিনী রচয়িতা শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা)

যিনি তাঁর জীবিতকালে শত মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, তাঁর মৃত্যু-কল্পনার মত মূর্খতা শুধু ধর্মোন্মাদের পক্ষেই সম্ভব। গান্ধীজী নিহত না হ'লেও মানুষের ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকতেন। এখনও থাকবেন। তাই, শোক আমি করবো না। আমার দুঃখ শুধু এই যে, অখ্যাত এক মারাঠী যুবক শাশ্বত মানুষকে মারতে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় ফাঁকি দিয়ে নিজের জন্য একটা জায়গা দখল করে রাখলো—আর রাখলো আগামী কালের কাছে—চিরকালের মত হিন্দুর মাথা হেঁট করে; সুযোগ দিয়ে রাখলো একথা বলবার যে, বিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুকে হত্যা করেছিল একজন হিন্দু। আজকের পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, ধর্মের নামে যে কল্যাণের বদলে শুধু অকল্যাণই সাধিত হচ্ছে, এই মর্মান্তিক ঘটনা তারই আর একটী প্রমাণ।

বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে বলেন ঃ

মহাত্মার মহান আত্মবলিদান কখনও বৃথা যাবে না।

খ্যাতনামা অভিনেত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে লিখেছেন ঃ

আজ এই ঘোর ঝড় তুফানে আমরা মাঝিহারা হ'য়ে পড়েছি। হে মহাত্মা! রক্ষা কর—ক্ষমা কর—শান্তি দাও। বাপুজীর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জানাবার ভাষা আমার নাই। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-তর্পণে চোখের ডালি পাঠালাম।

নবাগতা অভিনেত্রী অলকাদেবী লিখেছেন ঃ

'মহাত্মাজী এই জগতে আর নাই' এই ক'টি কথা সেদিন আমি কলিকাতার বেতার কেন্দ্র অফিসে বসে শুনতে পেলাম।

আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।' - - - - -

সেদিনকার নাটকের একটী চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য তৈরী হচ্ছি, হঠাৎ বীরেন ভদ্র মহাশয় এসে ঐ মর্মান্তিক ঘটনাটির কথা আমাদের শুনালেন। এই নিদারুণ দুঃসংবাদের কথা শোনামাত্রই আমরা সকলে শোকে-দুঃখে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। এই মহাপুরুষের কথা ভাবতে তাঁর আত্মার প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধায় আমার দু'চোখে জলের ধারা আপনি গড়িয়ে পড়লো এবং মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম যে, ভগবান এই মহামানবের মহান আদর্শ যেন আমরা অন্তরে চির জাগ্রত রাখতে পারি।

শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় (প্রযোজক, শ্যামলের স্বপ্ন)

ক্রুশ-বিদ্ধ এশিয়ার প্রাণ-শক্তির পবিত্রতম প্রতীক্ পুনর্বার প্রাণ-বিসর্জন দিলো নিষ্ঠুর অবিবেচকের হাতে—সভ্যতার মুখোসপরা পৃথিবীর বুক থেকে মহত্বের এই বিয়োগান্ত পরিণতির অবসান হবে কবে?

হিন্দি ও বাংলা চিত্রজগতের জনপ্রিয় অভিনেতা পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়— (কলিকাতা)

একদা ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমন্বয় করতে এসে যে মহামানব নিষ্ঠুর ব্যাধের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন, মহাত্মাজীর নশ্বর দেহাবসানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই করুণতম বিয়োগের পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

চিত্রপরিচালক রতনলাল চট্টোপাধ্যায়

যুগে যুগে যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছে, তখনই যে সব মহামানব এসেছেন উৎপীড়িতা ধরিত্রীকে মুক্তি দিতে, মহাত্মাজী তাঁদের কনিষ্ঠ বটে, কিন্তু নির্ভীক সত্যের সাধনায় তিনিই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ। তাঁর তিরোধান আমাদের সত্য-পথের নির্দেশ দিক।

চিত্রপরিচালক ধীরেশ ঘোষ

ব্যক্তিগতভাবে মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বা সামর্থ আমার নাই—মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণে বিশ্ববাসী যে শোক প্রকাশ করিয়াছে—যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছে তাহারই সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমিও বলিতেছি যে, হে মহামানব, মহাবিস্ময়ের মত তুমি আমাদের মনে চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে।

আমাদের স্মৃতিপূজা

শ্রী কেশব দত্ত (রূপশ্রী লিমিটেড)

ভাষায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অতি কঠিন কাজ—বিশেষ করে গান্ধীজী সম্বন্ধে। মহাভারতের মত এই মহাপুরুষের কথা আমাদের কাছে অমৃত সমান। যে অমৃত তিনি পরিবেশন করে গেছেন, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ না রেখে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য —আমরা তাঁর উত্তরাধিকারী।

পার্থ পেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রথের সারথীরূপে। সেই কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে পাণ্ডবদের অভিযান সার্থক হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে গান্ধীজী আমাদের সারথী ও উপদেষ্টা। তাঁরই নায়কত্বে প্রায় দুইশতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানি বিদূরিত হয়ে ভারতের আকাশে হ'ল নব অরুণোদয়। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সাধনার ধন আজ তাদের করতল গত। ভারতের নব ভাগ্যোদয়ের যিনি ঋত্বিক ও পুরোহিত —জনকল্যাণে তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের কথা আজ সারা পৃথিবীর বিস্ময় উদ্রেক করেছে।

যে চক্ষুহীন সেও সূর্যের উত্তাপ অনুভব করে। আমার কাছে তিনি আদিত্যের মত ভাস্বর ও তেজোময়। তাঁর উত্তাপ উপলব্ধি না করে উপায় নেই। কিন্তু তাঁকে প্রকাশ করা, ভাষায়, উচ্ছ্বাসে বা অলংকারের আতিশয্যে—অমার পক্ষে এটা মর্মান্তিক ব্যাপার।

পূজার কোন বিশেষ মন্ত্র আমার জানা নেই। তার ভাষা বা উচ্চারণের কায়দাও আমার অজ্ঞাত। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—শুধু এইটুকু উপচার নিয়ে অতি সন্তর্পণে আমি আপনাদের সকলের পশ্চাতে অত্যন্ত সংকোচের সংগে এসে দাঁড়াবার দুঃসাহস করলাম। মহাপুরুষের স্মৃতি পূজার এ আয়োজন চিত্র শিল্পের তরফ থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রূপ-মঞ্চ পত্রিকার কর্মীরা তা সার্থক করে তোলায় তাঁদের শুভ প্রচেষ্টার তারিফ করি। আলেয়া এবং রূপশ্রীর তরফ থেকে এই টুকুই আমার ঐকান্তিক নিবেদন।

রূপ-মঞ্চ : মহাত্মা স্মৃতি তর্পণ সংখ্যা : ১৩৫৪ : চিত্রগ্রহণ : রূপ-মঞ্চ (ধীরেন সরকার)
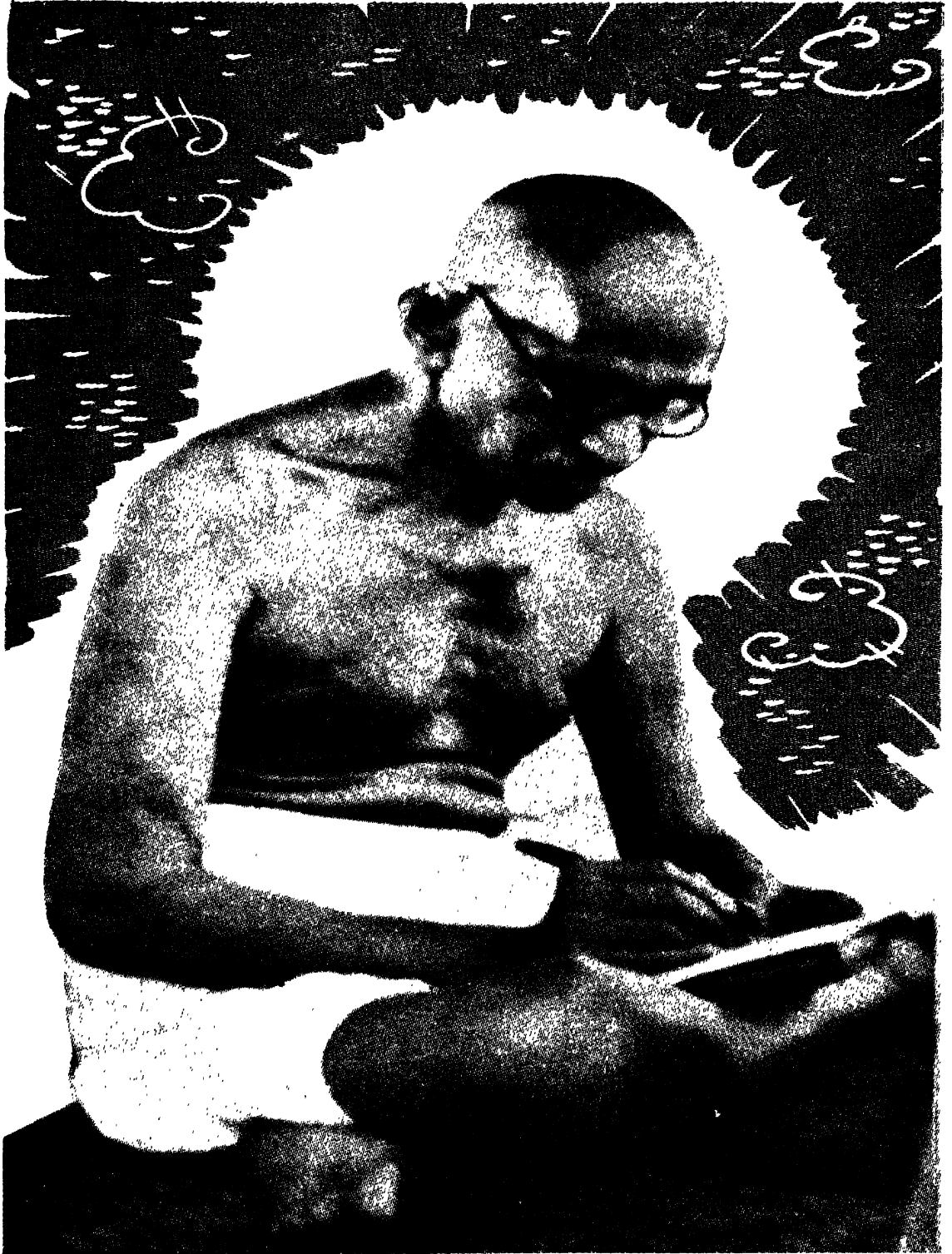
**"তুমি চিরজীবি, এ তমসা-তীরে যুগে যুগে রবে জ্যোতির্ময়,
স্মরণে তোমার মরণ-ভীতেরা সকলে হউক বিগতভয়।"**

মহাত্মা স্মৃতি-তর্পণ সংখ্যা

—১৩৫৪—

মহাত্মাজীর স্মরণে

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র
প্রখ্যাত সুরশিল্পী ও সংগীত পরিচালক

৩০ শে জানুয়ারী শুক্রবার, সন্ধ্যার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বসে গল্প করেছিলুম—অকস্মাৎ শুনলুম নতুন দিল্লীতে মহাত্মাজী এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। এ দুঃসংবাদ একান্ত অপ্রত্যাশিত—তাই শুনে বিস্ময়ে ও বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেলুম। উদ্বেগ অধীর চিত্তে কেবলই ভাবতে লাগলুম এও কি সম্ভব? বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ মহামানব গান্ধীজি যিনি ভারতবাসীর পরাধীনতার বন্ধন ও শতপ্রকার দুর্গতি মোচনের জন্যে নিজেকে সর্বোতভাবে উৎসর্গ করে বিদেশী শাসকজাতির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছেন—সেই মহাগৌরবদীপ্ত বিচিত্র জীবন তাঁরই একজন স্বদেশবাসীর দ্বারা শেষ হলো! যিনি ছিলেন সত্য, নিষ্ঠা ও অহিংস ভাবের বিরাট প্রাণময় প্রতীক—এক হিংস্র ঘাতকের দ্বারা তাঁরই জীবনের অবসান—একথা মনে হলে হৃদয়ের রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে যায়। মহাত্মাজীর এই শোচনীয় মৃত্যু আজ আমাদের মনে আবার যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, কারণ এই দুই মহাপুরুষের দেহত্যাগের ঘটনায় বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

মহামানবের সঙ্গলাভ একান্তই দুর্লভ। বহু সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ কেউ এই সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়। মহাত্মাজীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ বিচিত্র জীবনের আশ্চর্য ঘটনাবলী লোকের মুখ থেকে আমি প্রায়ই শুনতুম। এই জন্যে ছেলেবেলা থেকেই অন্তরের নিভৃত কোণে একটি গোপন বাসনা মাঝে মাঝে জেগে উঠতো যে, মহাত্মাজীর পূর্ণ সংস্পর্শে কোন গতিকে আমাকে একবার আসতেই হবে। সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হয়েছিল ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে। মহাত্মাজীর সংগে ছিলেন মাতাজী (৺কস্তুর বা গান্ধী), রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আরো কয়েকজন। মহাত্মাজীকে অতিথিরূপে পাওয়া—এ সৌভাগ্য স্বপ্নেরও অগোচর। কংগ্রেসের তরফ থেকে মহাত্মাজীকে ষ্টেশন থেকে সম্বর্ধনা করে আনবার আয়োজন করা হয়েছিল এবং আমার উপর ভার পড়েছিল যে গান গেয়ে মহাত্মাজীর কণ্ঠে মালা অর্পণ করতে হবে। উঃ! ষ্টেশনে সে কি ভিড়! সেচ্ছাসেবকেরা অতিকষ্টেই ব্যবস্থা করে কোন রকমে ভিড়ের চাপ বাঁচিয়ে আমাদের মহাত্মাজীর ট্রেণের কামরার নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন। ট্রেণের কামরার ভিতরেই আমি এবং আমার ভাইপো তরুণ যথাক্রমে মহাত্মাজী এবং মাতাজীর কণ্ঠে সংগীত সহযোগে পুষ্পমাল্য অর্পণ করলুম। মনে পড়ে মহাত্মাজীর সে সময়কার প্রশান্ত দৃষ্টি এবং তাঁর আশীর্বাদ। তখন আমার বয়স ছিল ১২ বৎসর। আমার মনস্কামনা ওই অল্প বয়সে পূর্ণ হওয়ায় আমি আনন্দে বিভোর হয়ে পড়েছিলাম।

মহাত্মাজী যে কয়দিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন প্রত্যেক-দিনই সেই মহামানবের কাছে যাবার সুযোগ কয়েকবার পেতুম। তিনি ত গান শুনতে খুব ভালবাসতেন সেইজন্যে নানা কাজের মধ্যেও যদি একটু সময় কখনও পেতেন, অমনি তাঁর অনুচরদের মধ্যে কাহাকেও বলতেন "Call my young friend." এই ভাবে যখনই তাঁর কাছে আমার ডাক পড়ত, অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমি তৎক্ষণাৎ হাজির হতুম। গান্ধীজীকে গান শুনাবার সুযোগ ও স্পর্শ করবার সৌভাগ্য লাভ করে আমি ধন্য হয়েছিলুম। গান্ধীজী ভজন গান শুনতে খুব ভালবাসতেন এবং মীরাবাই, সুরদাস ও কবীরের ভজন গাইতে বলতেন। আমি যে গানগুলি গাইতুম তার মধ্যে দু'একটি গান তিনি একাধিক-বার শুনতে চাইতেন। তখন কিন্তু গান্ধীজির কাছে রাম-ধুন সংগীত গাওয়া হত না। যদিও ওঁর সংগে যাঁরা এসে-ছিলেন তাঁরা কেউ গান গাইতে পারতেন না কিন্তু গান্ধীজি আমাদেরও কখনও 'রঘুপতি রাঘব' গান গাইতে বলেননি। গান্ধীজি কবে এবং কি করে এই গানটির এত ভক্ত হয়ে পড়লেন তা ঠিক জানি না। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, গান্ধীজি যে বছর গয়াতে যান সেই বছরের শেষে ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ ৺পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর যিনি বর্তমান যুগের বহু বড় বড় গায়ক ও গুণীর গুরু, তিনি

গয়াতে গিয়ে ওই 'রঘুপতি রাঘব' গানটি গেয়ে সারা গয়া মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরের সংগে সংগে চার পাঁচ সহস্র শ্রোতার সমবেত সংগীত আজও ভুলিনি। ৺পণ্ডিতজীই গয়াতে ওই গানটির প্রচলন ক'রে দিয়ে এসেছিলেন। গান্ধীজি ও পণ্ডিতজীর মধ্যে কে গানটির এত অধিক প্রচলন করেছেন তা আমার ঠিক জানা নেই।

মহাত্মাজী যে কয়দিন আমাদের গৃহে ছিলেন, সে কয়দিনই এক অনাবিল আনন্দস্রোত যেন সেখানে প্রবাহিত হত। এমনি আনন্দময় পুরুষ তিনি ছিলেন।

মহাত্মাজীর মত কর্মবীর তাঁর শত কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও কলা-শিল্পের প্রতি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি সঙ্গীতবিদ্যা ভালবাসতেন এবং বহু বিশিষ্ট গুণীর গান অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনেছেন। ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ গোলামালী খাঁর গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় এবং আরো অনেক শিল্পী তাঁকে গান শুনিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে মুক্তকণ্ঠ-প্রশংসা লাভ করেছেন।

কবিগুরুর রচিত গান তাঁর খুব ভাললাগত এবং তাঁর কয়েকটি বাছাই করা গান যেগুলি মহাত্মাজীর প্রিয় ছিল, সেগুলি ইদানিং তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য শ্রবণীয় বিষয় ছিল। মহাত্মাজীর সুরের গভীর অনুভূতি ছিল। তাঁর গয়া থাকাকালীন লক্ষ্য করেছি যে, কোন গানে ভাব ও ভাষার সংগে ঠিক সুরটি সংযুক্ত না হলে বা খাপ না খেলে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের অমর গীতি 'বন্দেমাতরম' গানে অনেকে আজকাল নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সুর জুড়ে গাইতে সুরু করেছেন কিন্তু এটা মহাত্মাজীর ভাল লাগত না বলে তিনি তাতে আপত্তি করেছিলেন। তিনি 'বন্দেমাতরম' গানের বহু সুরই শুনেছিলেন আর তার মধ্যে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের কাফি রাগে 'বন্দেমাতরম' গাওয়াও উনি শুনেছিলেন কিন্তু কোন সুরটিই তিনি অন্তরের সংগে অনুমোদন করতে পারেননি। কে জানে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যেমন এই গানে মল্লার সুর অনুমোদন করেছেন এবং আনন্দমঠে তা উল্লেখ করে গেছেন, সেই রকম মহাত্মাজীরও অন্তরে হয়তো এই শ্রেষ্ঠ গীতের জন্য কোন বিশিষ্ট সুরের রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় তিনি সেরূপ কোন আভাস দেননি।

গান্ধীজি এতবড় একজন জ্ঞানী এবং ভাগবদ হয়েও শিশুর মতো কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি যখন গয়াতে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন তখন আমরা তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলেই, তিনি কৌতুক করে তাঁর পা ভাল করে কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে বলতেন, "পাঁও তো ছুহী হ্যায়।" তখন আমরাও ছোট ছিলুম আর মহাত্মাজীর স্মিত মুখ, কৌতুকভরা চোখ এবং বলবার ভংগী দেখে আমরাও খুব আমোদ অনুভব করতুম আর হাসতুম।

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য ক'রেছিলুম যে, মহাত্মাজী কাউকেও নিরাশ করতেন না। সারাদিনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে যত ক্লান্তই তিনি হো'ননা কেন, সময়ে হোক অসময়ে হোক আগত দর্শনার্থীদের কোন দর্শন-প্রার্থীকে তিনি নিরাশ করেননি।

মহাত্মাজী তিন দিন গয়াতে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন এবং চতুর্থ দিনে গয়া থেকে চলে যান। এর পরে কখনও আর তাঁকে কাছে পাইনি। দূর থেকে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান সময়ে সসম্ভ্রমে তাঁর প্রশান্ত বদন বহুবার দেখেছি এবং তাঁর বাণীও শুনেছি। কলকাতায় যখন তিনি শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর গৃহে কিছুদিন ছিলেন, সে সময় আমার তাঁকে গান শোনাবার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ আমি সে সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং মহাত্মাজীও তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন বলে আর সে সুযোগ ঘটে উঠলনা।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান ভারতের তিনজন মহামানব—স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি। তাঁরা একে একে চলে গেলেন কিন্তু তাঁদের আরব্ধ কর্ম তো শেষ হয়নি। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতে তার অধিবাসীকে কে মুক্তি, মহত্ব, জ্ঞান ও ঐক্যসাধনের পথ প্রদর্শন করবেন? নিরাশা ও হতাশার ঘন ঘোর তমিস্র অন্ধকারে আজ কে এনে
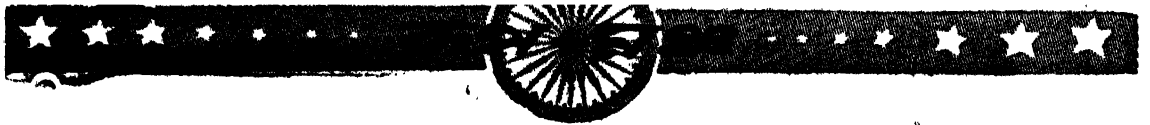
দেবেন আশা ও উৎসাহের উদ্ভিন্ন আলোক? জগৎ সভায় ভারতের গৌরবের আসন কার দ্বারা সংরক্ষিত হবে?

যুগে যুগে ভারতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছে—যাঁরা ভারতকে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত করে গেছেন কিন্তু বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল নক্ষত্ররা যখন ভারতের ভাগ্য গগন আঁধার করে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছেন, তখন একমাত্র গান্ধীজিকে অবলম্বন ক'রে এই বিশাল ভারতের অধিবাসীরা আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যু এযে ভারতের কত বড় ক্ষতি এবং ভারতকে কতখানি মসীলিপ্ত করে তুলল, তা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই।

ভারতবাসীর কাছে নেতাজী চিরদিন অমর হয়ে রইলেন। ভারতের এই চরম দুর্দিনে নেতাজী কোথায় তা জানিনা। তিনি জীবিত কি মৃত তা আজো দুর্ভেদ্য রহস্যজালে ঢাকা আছে। কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসী নিবিড় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সংগে তাঁকে চিরদিন স্মরণ করবে। ভারত আজ স্বাধীন কিন্তু সেই স্বাধীনতা পেতে তাকে অসংখ্য অমূল্য জীবন বলি দিতে হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, সেই স্বাধীনতা অর্জনের পরও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকে স্বীয় জীবন আহুতি দিতে হলো।

আজ তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে শুধু এই কথাই মনে হয় যে, মহান আদর্শের জন্যে মহাত্মাজী দধিচীর ন্যায় আত্মত্যাগ করলেন, তাঁর পবিত্র রক্তপাতের সংগে সংগে ভারতে সেই মহান আদর্শ যেন চিরদিন অক্ষয় ও অটুট থাকে। গান্ধীজির চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্খা যেন এইবার সফল হয়। এই ভারত যেন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী বৌদ্ধ সকল জাতির মিলন-ক্ষেত্র হয়। হিংসা, দ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাক এবং মহামানবের শেষ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও ভালবাসা নিয়ে এই মিলনতীর্থকে নূতন করে গড়ে তুলি। আর হে মানবমৈত্রী, সত্যনিষ্ঠ ও অহিংসভাবের মহান্ ঋত্বিক ও জ্যোতির্ময় জীবন্ত প্রতীক, তোমার কাছে ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে এই প্রার্থনা জানাই: তোবার স্বদেশ-বাসীদের মধ্যে যারা ভ্রান্ত ও মানববিদ্বেষী, তাদের তুমি উদার প্রসন্নতাপূর্ণচিত্তে ক্ষমা ও আশীর্বাদ করো।

জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা শ্যামলাহা (হুয়া)

নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ কতরকম ভঙ্গীমারই না আশ্রয় গ্রহণ করে। তবু পারে না সম্পূর্ণরূপে নিজকে ব্যক্ত করতে। হাসি মানুষের একটি প্রধান অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রনেতাদের হাসির মধ্যে নাকি অনেক প্রকার কুটনৈতিক অর্থ থাকে। কিন্তু গান্ধীজী শুধু রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহাত্মা—পৃথিবীতে ভগবান প্রেরিত শান্তির দূত।

রাষ্ট্রনৈতিক তর্কবিতর্কের গুরুত্বের মাঝখানে গান্ধীজীর হাসি তর্কের তিক্ততা কতখানি উপশম করতে পারত, কঠোর মতামতকে কতখানি সংযত ও শান্তভাবে ব্যক্ত করবার সহায়তা করত তা আমরা দেখিনি। কিন্তু জনসাধারণের মাঝখানে যখনই এই মহামানব এসে তাঁর অপূর্ব হাস্যমুখ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখনই দেখেছি জনতার বিক্ষোভ গেছে শান্ত হ'য়ে—মানুষেরা ভুলেছে বেদনা, গ্লানি, কাপুরুষতা ও ভয়। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষেরা যখন বুঝতে পারেনি তাঁর কথা, তখন তাঁর হাসি সেই কথা তাদের বলে দিয়েছে। মানুষের অন্তরলোকে পড়েছে সেই হাসির ছায়া—তারা পেয়েছে সান্ত্বনা, নিয়েছে অহিংসার ধর্মে দীক্ষা।

সেই অপরূপ হাস্যসুষমামণ্ডিত মুখখানি পৃথিবীতে আর দেখা যাবে না। কিন্তু তাঁর হাসিটি যাদের হৃদয়ের কোঠায় বাঁধান হয়ে আছে, তারা আর কখনও ভুল পথে চলবে না।

মহাত্মা গান্ধি

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

মহাত্মাজির সঙ্গে আমার দেখা—১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে—পুনায়। সেখানকার হাঁসপাতালে তিনি তখন শুয়ে—সবে আপেণ্ডিসাইটিস কাটাকুটির পর। তখনো তিনি ধরতে গেলে জেলে—কেন না জেল থেকেই তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠানো হয়। তবে সে সময়ে তিনি অসুস্থ ব'লে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা সহজেই তাঁর দর্শনের অনুমতি পেত।

সকাল বেলা। আকাশে সকালের সোনা ছড়িয়ে গেছে।

★ ★ ★ ★ ★

তাঁকে প্রণাম ক'রে বললাম: "বাঙ্গালোর থেকে পুনা এসেছি শুধু আপনাকে দর্শন করতে।"

মহাত্মাজি হেসে বললেন: "Oh, that is kind of you indeed!"

তাঁর পাশেই বসিয়ে নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নাম শুনেই শ্রীমতী সরোজিনী মন্তব্য বলে উঠলেন: "ও! তুমি সেই গাইয়ে দিলীপ রায়, না?—যে য়ুরোপে ঘুরে ঘুরে গান শিখছিল ও দেশের হার্মনি এদেশের মেলডিতে আমদানি করতে?"

"ইংলণ্ডে ও জার্মানিতে আমি ওদেশের সঙ্গীত সামান্য একটু আধটু শিখেছি বটে," আমি বললাম কায়দাদুরস্ত বিনয় বচনে, "তবে আমাদের সঙ্গীতে ওদের হার্মনি আমদানি করবার কোন দুরভিসন্ধিই আমার ছিলনা কোনোদিন।"

"কিন্তু তুমি যে গাইয়ে একথা তুমি ফাঁশ ক'রে ফেলেছ বন্ধু," মহাত্মাজি বলে উঠলেন, "কাজেই বলো এখন—এহেন এক রুগ্ন বেচারিকে তুমি কয়েকটা গান গেয়ে শোনাবে কিনা। আমার ঔৎসুক্য ঐখানেই।"

"আপনাকে গান শোনাবার সৌভাগ্য আমার যে হবে এ আমি ভাবি নি মহাত্মাজি। আমি আমার তম্বুরা নিয়ে আসব কখন বলুন--বিকেলে?"

"বিকেলে এলে চমৎকার হবে—ওহো, রোসো," বলে মহাত্মাজি ঘরের ইংরাজ নার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আমার এ-বন্ধুটি যদি বিকেলে এখানে একটু গান করেন তাহলে এখানকার অন্যসব রোগীদের অসুবিধা হবে কি?"

শ্বেতাঙ্গিনী হাসিমুখে বললেন: "একটুও না মিস্টার গান্ধি। তুমি যত ইচ্ছে গান শুনতে পারো।"

মহাত্মাজি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে বললেন: "তাহলে আজই বিকেলে—ধরো পাঁচটায়, কেমন।"

"নিশ্চয় মহাত্মাজি—কেবল ক্ষমা করবেন একটা প্রশ্ন—গান আপনি সত্যি ভালোবাসেন তো?"

"গান না ভালোবাসে কে?—আমি গানভক্ত ছেলেবেলা থেকে—বিশেষত ভজন। তবে তোমাকে ব'লে রাখা ভালো গানের সমজদার যাকে বলে তা আমি নই—মানে গানের টেকনিকের আমি কোন ধারই ধারি না। তবে সেজন্যে আমি যে খুব আত্মগ্লানি বোধ করি এ-ও বলতে পারিনে। গান আমার হৃদয় স্পর্শ করে—ব্যস আর কী চাই? কী বলো?"

"কিন্তু গানের টেকনিক জানলে কি গানের প্রতি ভালোবাসা আরো বাড়ে না?"

"হবে। তবে আমি এধরণের বিশেষজ্ঞ হবার জন্য খুব ব্যস্ত নই। গান থেকে আমি চাই প্রেরণা পেতে, আনন্দ পেতে। এ যদি আমি পাই তাহ'লেই আমি খুসি।

"আমার আজো মনে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় এম্নি এক হাঁসপাতালের কথা। সেখানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় যখন আমি প'ড়ে, তখন আমার অনুরোধে আমারই এক বন্ধুর মেয়ে প্রায়ই আমাকে গেয়ে শোনাতেন ওদের বিখ্যাত একটি ভজন: "Lead kindly light," সে গানে আমার সমস্ত অঙ্গের বেদনা ও তাপ যেন ভাল হয়ে যেত। সে মেয়েটির কাছে আমি

কত যে কৃতজ্ঞ! এবার কী বলবে তুমি? আরো প্রমাণ চাই আমি গান ভালোবাসি কি না?"
ঘরে হাসির কলরোল উঠল।

★ ★ ★ ★ ★ ★

অপরাহ্নের স্বর্ণরাগ ঘরে বিছিয়ে গেছে। মহাত্মাজির চরণপ্রান্তে গিয়ে বসলাম তাম্বুরা হাতে। গাইলাম মীরাবাইয়ের গান:
মনে চাকর রাখো জী......
......আধি রাত প্রভু দরসন দৈহেঁ প্রেমনদীকে তীরা।
মহাত্মাজির চোখে জল চিক চিক করে ওঠে। কতক্ষণ যে কেউ কথা কয় না!

★ ★ ★

মহাত্মাজিই প্রথম কথা কন:
"মীরার ভজন! সুন্দর না হয়ে পারে?"
"আপনারা নিশ্চয় গুজরাতে মীরার ভজন প্রায়ই শোনেন?"
"মীরার অনেক গানের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে—আমার সাবরমতী আশ্রমে গাওয়া হয় মাঝে মাঝেই। এমন অনাবিল আনন্দ খুব কম গানেই মেলে।"
এত ভালো লাগলো...হিন্দি ভাষায় মীরা ও কবিরের তুলনা কোথায়? বললাম: "মীরার গানের বিশেষত্ব কোন্‌খানে আপনার মনে হয়?"
"কোনখানে? তার অকৃত্রিমতায়—আর কোথায় বলো? মেকির ঝুটোর নামগন্ধও নেই মীরার উচ্ছ্বাসে। মীরা গান গেয়ে গেছেন না গেয়ে থাকতে পারেন নি ব'লেই। সোজা হৃদয় থেকে উঠেছে স্বভাব-উৎসের মতন—পড়েছে ফেটে। যশের মোহ বা পাঁচজনের বাহবা তো এ গানের লক্ষ্য ছিলনা—যেমন থাকে অনেক চারণ চারণীর গানে। ঐ খানেই না তার আবেদন—যা কখনও পুরানো হবার নয়।"
"আমাদের এমন সুন্দর গান আমাদের শিক্ষায় সংস্কৃতিতে আজ অবধি ঠাঁই পেয়েছে কত কম।"
"সে কথা ঠিক," মহাত্মাজী বললেন, "আর এ কি কম দুঃখের কথা? জাগার সময়ও এসেছে এখন। কারণ যদি জনসাধারণের অনাদর ঔদাসিন্যের ফলে এ-গানের মরণ দশা ঘনিয়ে আসে তাহ'লে সে দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না। একথা আমি বার বারই বলেছি।"
মহাদেও দেশাই বললেন, "সত্যি, একথা উনি প্রায়ই বলে থাকেন।"
বললাম: "একথা শুনে এতো ভালো লাগলো মহাত্মাজি যে কী বলব? কারণ—কিছু মনে করবেন না—আমার বরাবরই ধারণা ছিল যে আপনার কঠোর জীবন-সাধনায় কারুকলার কোন স্থানই নেই। বলতে কী, আমার অনেক সময়েই ভয় হয়েছে যে আপনি সঙ্গীতের প্রতি বিরূপ।"
"বিরূপ! বিরূপ!! আর সংগীতের প্রতি!!!" মহাত্মাজি বলে উঠলেন। আমি একটু যেন লজ্জাই পেলাম—এতটা খোলাখুলি কথা না বললেই হ'ত হয়ত।
কিন্তু মহাত্মাজির মুখে বরাভয়ের স্মিতহাসি ফুটে ওঠে তক্ষনি: "না না তোমার কোন অপরাধই হয়নি দিলীপ। আমি জানি—বুঝি-ও—কেন এমনতর কথা রটে আমার সম্বন্ধে—তবে কী করব বলো? আমার সম্বন্ধে এত রকমের উদ্ভট ধারণা আকাশে বাতাসে চারিয়ে গেছে যে এখন আর কোনো উপায় নেই।"
কেউ কেউ একটু হাসলেন।
"কিন্তু এসব রটনার ফলে হয়েছে এই যে আমার প্রিয় বন্ধুরাও হাসেন যখন আমি বলি যে আমি নিজেকে সত্যিই একজন শিল্পী বলে মনে করি। তারা ·ভাবে এরকম ঠাট্টা আমার মুখ দিয়ে কমই বেরিয়েছে।"
সবাই এবার আরো হেসে ওঠে।
"আমিও যে একথায় হাসছি এতে দোষ নেবেন না মহাত্মাজি," বললাম আমি, "কিন্তু এ-ও কি হতে পারে না যে আপনার কৃচ্ছ্র সাধনার দরুণই এধরনের ধারণা পাঁচ-জনের মনে আজ বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে? কারণ সত্যি, পাঁচ-জনকে খুব দোষ দেওয়াও তো যায় কি যদি তারা কৃচ্ছ্র বা সন্ন্যাসের সঙ্গে শিল্পপ্রীতিকে এক করে দেখতে না পারে?"
"কিন্তু কেন তারা বুঝবে না যে সন্ন্যাসই হল জীবনের সবচেয়ে বড় শিল্প?"

"সন্ন্যাস - শিল্প ?"

"নয় ? শিল্প আসলে কি ? না, সরল সুষমা বটে তো ? আর সন্ন্যাস কী ? না, সরলতম সুষমাকে প্রতিদিনের জীবনে পরম সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা—সব চোখ ধাঁধানো কৃত্রিমতা ও ভান বাদ দিয়ে প্রতি পদে খাঁটি থাকার সাধনা। তাই তো আমি প্রায়ই বলি যে সাঁচ্চা সন্ন্যাসী শুধু যে শিল্পের সাধনা করে তাই নয়—তার জীবনটাই একটা অখণ্ড শিল্পকারু।"

মহাত্মাজির কণ্ঠস্বরে আবেগের ঈষদুত্তাপ ফুটে উঠে: "ভাবতে পারো, এ-ই যার মত তাকে কিনা লোকে বলে সঙ্গীতের প্রতি বিরূপ—শুধু এই কারণে যে সে স্বভাব-সন্ন্যাসী!—অমি হলাম কিনা সঙ্গীতবিমুখ— যে-আমি ভারতের ধর্মজীবন ও সঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কথা ভাবতেও পারি না ! এর পরে কী-ই বা বলবো বলো দেখি !" মহাত্মাজির মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে।

"কিন্তু তা হ'লে আপনাকে সবাই সঙ্গীতশিল্পবিমুখ মনে করল কি অপরাধে ?"

"কিছু হয়ত আছে অপরাধ," মহাত্মাজী ফের হাসেন অল্প, "একটা সম্ভবত এই যে জীবনে অনেক কিছু শিল্প ব'লে শিরোপা পায় যাদের মধ্যে আমি কোন মহিমাই দেখতে পাইনে। এর মানে অবশ্য এই যে আমার মনের প্রাণের মূল চাহিদাগুলিই আলাদা—my values are different. যেমন ধরো আমি তাকে মহৎ শিল্প বলি না যার কদর শুধুই বিশেষজ্ঞদের কাছে—অর্থাৎ টেকনিকের অন্ধি-সন্ধি না জানলে আর কোন মাথামুণ্ডুই পাওয়া যায় না। আমি মনে করি যে মহৎ শিল্পের আবেদন ঠিক প্রকৃতির সৌন্দর্যের মতন বিশ্বজনীন্। চুলচেরা বিচার নিয়ে মাথা ঘামানোর নামই যে শিল্পবোধ এ আমি ভাবতেই পারি নে। খাঁটি রসবোধের সঙ্গে সমজদারিয়ানা বা ভানটানের চেকনাইয়ের কোন সম্বন্ধই নেই। তার ভূষা হবে সরল—তার প্রকাশ হবে সহজ—ঐ যে বললাম ঠিক প্রকৃতির প্রাঞ্জল ভাষার মতন।"

মহাত্মাজির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রাসাদে—৪ঠা নভেম্বর ১৯২৪ : বিকেল বেলা। নামজাদা সবাই হাজির : দেশবন্ধু, কেলকার, তুলসীচরণ, শেরওয়ানি, জয়াকর, শরৎ বসু, রাজাগোপালাচারী, আবুল কালাম আজাদ আরো কত অধিনায়ক যে!

ঘরে ঢুকে মহাত্মাজিকে প্রণাম করতেই তিনি হেসে বললেন : "তোমার দুর্ধর্ষ তম্বুরাটি কোথায় ? (Where is your instrument of torture ?)

আমি বললাম :"সেটাকে রেখে এসেছি, মা ভৈঃ। আগে নেতারা তো আপনাকে বেহাই দিন।"

মহাত্মাজি হেসে বললেন, "আচ্ছা," দেশবন্ধুর দিকে ফিরে : "তুমি তাহ'লে দিলীপের জেলর হ'তে রাজি আছোতো ? দেখো, আমাকে গান না শুনিয়ে যেন না পালায়।"

আমি বললাম : "সে-দুর্ভাবনা করবেন না। মেরে না তাড়ালে গান না শুনিয়ে আমি নড়ছি নে।"

* * * * *

আমি গাইলাম কবীরের একটি বিখ্যাত গান :

জিনকে হৃদিমে সিরি রাম বসে

* * * * *

উন রাম নামন লিয়ে ন লিয়ে॥

বোধ হয় ১৯২৫ কিম্বা ১৯২৬ সালে আমি বরোদায় ফৈয়স খাঁর কাছে উনচল্লিশ টাকা খরচ করে দু'খানি মাত্র গান শিখে বিষণ্নমনে যাই আমেদাবাদে বন্ধুবর বিখ্যাত বস্ত্রবণিক আম্বালাল সারাভাইয়ের অথিতি হয়ে। তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে মহাত্মাজির কাছে একদিন সকালে।

★ ★ ★

মহাত্মাজি নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর আশ্রমে গান করতে সেদিন সন্ধ্যায়।

প্রার্থনার পরে খোলা মাঠে করলাম মীরাবাই ও কবীরের গান। এর পরে মহাত্মাজির সাথে দেখা হয় নি আমার পণ্ডিচেরি-প্রয়াণের আগে। ১৯২৮ সালে আমি পণ্ডিচেরী যাই, সেখানে মহাত্মাজির দু'একটি পেয়েছিলাম মাত্র। একটিতে তিনি আমার গানের সম্বন্ধে কিছু লেখেন। তাতে মনে হয় মহাত্মাজি ভজন

গান সত্যিই ভালোবাসেন। যারা গানবাজনা ভালো-বাসা বলতে বোঝে বিশেষজ্ঞতার ওপর-চালাকি তাদের সঙ্গে আমার মতে কোনদিনই মেলেনি। মহাত্মাজি যে ভজনে মুগ্ধ হন এইটিই বড় কথা।

১৯৩৮ সালে মার্চ মাসে মহাত্মাজি যখন কলকাতায় ছিলেন শ্রীশরৎ বসুর বাড়িতে। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই আমি কলকাতায় পৌঁছি। দেখা করতেই মহাত্মাজি কী যে খুশী! সেই পরিচিত প্রাণখোলা হাসি।

"গান শোনাচ্ছ কবে?"

"আজ সন্ধ্যায়, প্রার্থনার পরে—ছাদে?"

"জো হুকুম।"

বন্ধুবর শ্রীধরণীকুমার বসুর মেয়ে উমা (হাসি) আমার কাছে তখন রোজ গান শেখে। নিয়ে গেলাম তাকেও। মহাত্মাজি তার মুখে মীরাবাইয়ের "মেরে তো গিরিধর গোপাল" গানটি শুনে এত খুশী যে তাকে উপাধি দিলেন "নাইটিঙ্গেল" স্বহস্তে লিখে। এখানে আর একটা প্রমাণ পেলাম যে যারা বলে মহাত্মাজি গান ভালোবাসেন না তারা ভ্রান্ত। মহাত্মাজি মিষ্ট কণ্ঠে আবেগপূর্ণ ভজনে সত্যিই মুগ্ধহন, না হ'লে হাসিকে এত আদর করতেন না। তারপরে আর একদিন গেছি, উমাকে ঘরে না এনে ছাদেই রেখে এসেছি। মহাত্মাজি বললেন: "একি! নাইটিঙ্গেলকে আনো নি যে?"

হাসিকে ডাক দিলাম। মহাত্মাজি কি বলেছেন তাকে ব'লে মহাত্মাজিকে বললাম, "ওতো ভারি খুসি।"

"কেন?"

"আপনি ওকে নাইটিঙ্গেল বলে ডেকেছেন কি না।"

"ডাকব না? I will always call her Nightingale" (আমি ওকে চিরকাল বুলবুল বলে ডাকব)।

ঘরে হাসির সাড়া পড়ে গেল।

বললাম: "সুতরাং আপনাকে ও বুলবুলেরই গান শুনাবে আজ। কিন্তু বাংলায়।"

মহাত্মাজি বললেন: "তথাস্তু"

আমি বললাম: "গানটির ইংরাজি অনুবাদ আমি করেছি অবাঙালিদের জন্যে শুনুন আগে:

My sole of Nightingale! On dreams of rose

* * * * *

Pledged to thy song-heart's cry of
self-surrender.

প্রার্থনার পরে হাসি প্রথমে গাইল মীরার "মেরে গিরিধর গোপাল"—তারপর গাইল

বুল বুল মন, ফুল সুরে ভেসে

* * *

চির চরণের শরণের রেশে।

* * *

এর পরে কাশ্মীর যাই ১৯৩৮শের অক্টোবরে। মহাত্মাজি তখন পেশোয়ারে। আমি তাঁকে পত্র লিখি যে,আমার বোন মায়ার হঠাৎ স্বামী বিয়োগ হওয়ায় আমি কাশ্মীর এসেছি তাকে নিয়ে। সঙ্গে আছে উমা—তাঁর ভাষায় "নাইটিঙ্গেল"। পেশোয়ারে যেতে চাই মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা করতে—যদি মহাত্মাজির আমাদের মনে থাকে ইত্যাদি।

মহাত্মাজি আমাকে তার করেন ও সঙ্গে সঙ্গে লেখেন (১৭-১০-৩৮) একটা পোষ্টকার্ডে:

"I may forget Uma, the Nightingale, though that seems improbable, but how could I forget you?...I am sorry for your brother-in-law's death. My love and sympathy for your sister."

★ ★ ★

পেশোয়ারে গিয়ে উঠলাম বন্ধুবর শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরীর মহাশয়ের বাড়ী।

★ ★ ★

মহাত্মাজি তখন সীমান্ত গান্ধি আবদুল গফুর খাঁর পল্লীনিবাসে বন্ধুর অতিথি—পেশোয়ার থেকে চব্বিশ মাইল দূরে উৎমানজই গ্রাম। গেলাম মোটর যোগে সেখানে।

★ ★ ★

পরদিন আমরা সবাই মিলে গেলাম। মহাত্মাজিকে

প্রণাম করতেই, মহাত্মাজি আমার ভাগনি এষার দিকে তাকালেন। আমি বললাম: "এরই কথা আপনি লিখেছিলেন আপনার পোষ্টকার্ডে। ও আপনাকে ওর নাচ দেখাবেই পণ করে এসেছে।"

মহাত্মাজি ঘাড় নেড়ে খুব হাসলেন।

আমি বললাম হেসে: "এতে আপনি খুসি, না অখুসি মহাত্মাজি?"

মহাত্মাজি কাগজে লিখলেন:"গীতার ভাষায় বলতে গেলে—আমার হওয়া উচিত না খুসি, না অখুসি।"

(In the language of the Gita I should be neither glad nor sorry). আমি বললাম: "কিন্তু হৃদয়ের ভাষায়?" (But in the language of the heart ?) মহাত্মাজি তৎক্ষণাৎ লিখলেন সর সর ক'রে। "The heart has no language, it speaks to the heart." (হৃদয়ের কোনো ভাষা নেই, সে শুধু কথা কয় হৃদয়ের সঙ্গে)।

প্রথমে উমা ও আমি ডুয়েট গাইলাম মীরাবাইয়ের "চাকর রাখো জি।" তারপর এষা নাচল, সঙ্গে উমা গাইল:

আজ সখী সুন বাজত বাঁসরিয়া

* * *

চন্দনগন্ধা নন্দনছন্দা প্রেমী মন হরিয়া।

* * *

বিদায় নেবার সময়ে মহাত্মাজি কাগজে লিখলেন, "Do you want me to say many thanks? It looks so utterly ridiculous. But if you want the ridiculous you may have them."
(তোমরা কি চাও যে আমি বলি বহু ধন্যবাদ? এক্ষেত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন যে কী হসনীয়! তবে যদি তোমরা হসনীয়কেই চাও তবে নাও)।

ঘর শুদ্ধ সবাই ফের হেসে ওঠে।

When you do lough, each tear dewed petal swings
With the far sky-radiant lilt : your magic heart
To our earth cag d life would ever impart
Love's limpid light : soul's vision of aerial wings.

তুমি যবে হাসো—প্রতি শিশির অশ্রুর-ফুলদল
গগন-গরিমা ছন্দে দুলে ওঠে: অন্তর তোমার
পৃথ্বী-পিঞ্জরিত প্রাণে আনে প্রেম-নীলিমা উজ্জ্বল:
তোমার আত্মার স্বপ্ন-অনন্তের পাখার ঝঙ্কার।

পণ্ডিচেরির সর্বজন-খ্যাত শ্রীদিলীপ কুমার রায় বহুবার মহাত্মা গান্ধীকে গান শুনিয়ে তৃপ্ত করেছেন। সংগীত ও শিল্পকলা সম্পর্কে তিনি গান্ধীজীর সংগে বিশদভাবে যে আলাপ আলোচনা করেছেন তাঁর 'তীর্থংকর' পুস্তকে মহাত্মা গান্ধী প্রসংগে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। সংগীত ও শিল্প কলা সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত যাঁদের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছে—'তীর্থংকর' তাদের সে ভ্রান্ত ধারণা দূর করবে। আমরা উক্ত আলোচনার কিছু অংশ এখানে উধৃত করে দিলাম। সম্পাদক—রূপ-মঞ্চ॥ — — —

জেঠাশঙ্কর ঠক্কর (বম্বে পিকচার্স করপোরেশন লিঃ)

মহাত্মাজী সারাজীবন ধরিয়া দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মানুষের আত্মার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন সে সংগ্রাম অহিংস—পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব, অবিস্মরণীয়। তাঁহার কাছে মানুষের নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী মনই সবচেয়ে অমোঘ অস্ত্র। সে অস্ত্রের ব্যবহারে তাঁহার নিজের কখনও ভুল হয় নাই। তিনি কখনও পরাজয় মানেন নাই।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি জয়ী হইয়াছেন, হরিজনদের জন্য তিনি মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের হিংস্র কলহের মাঝখানে তিনি গিয়া দাঁড়াইতে মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে কলহ হইতে বিরত হইয়াছে। ভয়, হিংসা ও দুঃখকে তিনি জয় করিয়াছেন। তিনি চিরজয়ী।

মৃত্যুকেও তিনি জয় করিয়াছেন। কারণ তাঁহার আদর্শের পথে সমগ্র ভারতকে চলিতেই হইবে। তাঁহার অগ্রগতির পদধ্বনি শুনিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহার মহান্ আত্মাকে প্রণাম জানাই।

উপন্যাস

(১১)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

●

সমস্ত ঝড় ঝাপটের মধ্য দিয়ে পাঁচকড়ি বালিকা বিদ্যালয়টি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—ওদিকে ইউরোপে মহাযুদ্ধের মহাগ্নি প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তি তারস্বরে ঘোষণা করলো—এ যুদ্ধ পৃথিবীর নিপাড়িত মানবাত্মার মুক্তিযুদ্ধ। এই মহাব্রতে ভারত যদি যোগদান না করে, মানবতার দিক থেকে কী কৈফিয়ৎ সে দেবে? ভারত সহজ এবং সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলো, বিশ্ব প্রেমের কথা থাকনা আপাততঃ। ভারতের মুক্তির সন্ধান আছে কী এই মহাযুদ্ধে—মিত্রপক্ষের পার্শ্বে স্বাধিকারের মর্যাদা পাবে কী সে? সাম্রাজ্যবাদী উত্তর দিল, নিশ্চয়ই—তবে স্বাধীন জাতি রূপে নয়—দাস জাতি রূপে। ভারত পালটা জবাব দিল, তবে থাক। মানবতার মহাব্রতে নাইবা টানলে ভারতকে। সাম্রাজ্যবাদী ভয় দেখায়, দেশটাকে তাহ'লে উচ্ছোন্নেই দিতে চাও! চক্রশক্তি যে পিশে মেরে ফেলবে। ভয়হীন ভারতের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো,দরকার নেই বাবা তোমাদের সে ভাবনা ভেবে! এতদিন ত অনেক ভাবলে! এবার নিজেদের পথ দেখোত। যাও সরে পড়—চট্‌পট্ সরে পড়ো। ব্রিটিশ রাজশক্তি স্তম্ভিত। দীর্ঘ দ্বিশতাব্দী ধরে যে জাতিকে শোষণ ও নিষ্পেষণে জর্জরিত করে রেখেছে—তার মুখ থেকে এই স্পর্ধার বাণী কেমন করে সহ্য করবে? না—এই ঔদ্ধত্য কিছুতেই সহ্য করবে না। যেমন করে হউক—এই স্পর্ধার সমুচিত শিক্ষা দেবে। চোখ রাঙিয়ে—ব্যায়নেট দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চাইলো ভারতের প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিতে। নেতাদের কারারুদ্ধ করে ব্রিটিশ রাজশক্তি মনে করলো, ভারতের আত্মাকে তারা বেঁধে ফেলেছে। ভারতের কণ্ঠ থেকে আর কোন প্রতিবাদের সুর উঠবে না। ভারতের জনবল—অর্থবল পূর্ণভাবে এবার তারা সর্বগ্রাসী যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগাতে পারবে। কিন্তু তারা বুঝলো না—নেতাদের নির্দেশিত পথ চুম্বন করে কত সৈনিক আত্মোৎসর্গের মহাব্রতে দীক্ষিত হ'য়ে নিয়েছে। ভারতের নৈতিক শক্তি একা গান্ধীতে নয়—একা জওয়াহরলাল বা আজাদেও নয়। ভারতের নৈতিক শক্তি মিশে আছে ভারতের বিরাট জনশক্তির মাঝে। ভারতের এই সুপ্ত শক্তি যেন কোন যাদুমন্ত্রে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। দেখা দিল গণবিক্ষোভ। "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে শত সহস্র জন বুক পেতে দিল ব্যায়নেটের সামনে—গলা বাড়িয়ে দিল ফাঁসির মঞ্চে। কারার লৌহ প্রাচীর বুঝি অসংখ্য সত্যাগ্রহীর পদভরে চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়ে! ভারতের বাইরে—ভারতের অভ্যন্তরে শেষবারের মত মুক্তি সংগ্রামে মেতে উঠেছে ভারতের নৈতিক আত্মা! ভিতর আর বাইরে ওদের কোন প্রভেদ নেই। ওরা নিরাকার—চির মুক্ত—কারার লৌহ প্রাচীরে ওদের আবদ্ধ করে রাখবার শক্তি কারোরই নেই। অপূর্ব ভট্টাচার্যের দলেরও সবাই মিশেছে ওদের সংগে। কতক প্রাণ দিয়ে শহিদ হ'য়ে গেল—কারাবরণ করে নতুন দলকে দায়িত্ব দিয়ে গেল—আবার বিদেশী শাসকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করে সংগ্রামকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চললো। ব্রিটিশ রাজশক্তিও হার মানবার পাত্র নয়। এই বিরাট জনশক্তির বিরুদ্ধে আরম্ভ হলো তাদের চরম স্বৈরাচার। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। এই মহাসংকটে কে দেখাবে পথ! কোথায় পথ! ভারতের জীবনী-শক্তি শুষ্ক, আর্ত। ভারতের আকাশে বাতাসে সে কী হাহাকার ও চীৎকার। শুধু মুখের গ্রাস-কেড়ে নিয়েই নয়—রসদ ও অর্থ সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হ'লো না বিদেশী—তার লালসাগ্রস্ত বেতনভুক সৈনিক ও কর্মীদের কামনার বহ্নিতে শত শত নারীর সতীত্বকে দিতে হ'লো বিসর্জন! ভারতের সহর থেকেই শুধু নয়—গ্রাম গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে নারী সংগৃহীত হ'তে লাগলো ব্যাপক যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে। ভাড়াটিয়া প্রচার কর্তারা আদর্শের বড় বড় বুলি তুলে ধরতে
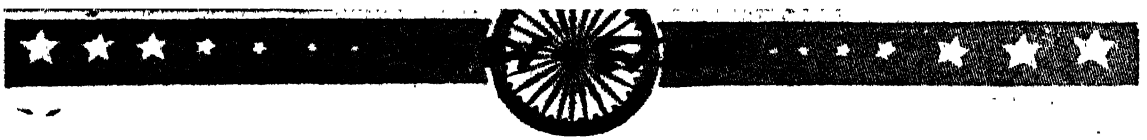
লাগলো তাদের সামনে। তাদের এই ফাঁদে পা দিল অনেকেই। ব্রিটিশ প্রভুদের এতদিন যারা ত্রাতা বলে মনে করে এসেছে—স্বদেশদ্রোহী সেই মীরজাফরের দল সামনের সাড়িতে যেয়ে দাঁড়ালো। চতুর ব্রিটিশ রাজশক্তি অর্থ-নৈতিক শোচনীয়তায় যাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেংগে দিতে সফল হ'য়েছিল—তারাও এসে যোগ দিল। যোগ দিল তারা—যারা রাজধর্মের ঘোরালো প্যাঁচে জড়িয়ে পড়েছিল। মফঃস্বলের বহু গীর্জা থেকেও লোক সংগৃহীত হ'তে লাগলো। পাদ্রী সাহেবদের মুখে মানবতার ব্যাখ্যা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। জলিরপাড় গীর্জা থেকেও দলে দলে যুদ্ধের কাজে লোক পাঠানো হ'তে লাগলো। কেউ গেল ইরাক—ইরাণে-করাচী ও বম্বে—মণিপুর ও ইম্ফল রণাঙ্গনে। কেউ হাতিয়ার ধরে যুদ্ধ করে—গানসেলফ্যাক্টরীতে কার্তুজ তৈরী করে—কেউ যানবাহনকে সচল রাখে—সংগীত ও নৃত্যে সৈনিকদের চিত্ত বিনোদনে অংশ গ্রহণ করে—হাসপাতাল ও রেডক্রসের কাজে আত্মনিয়োগ করে। আরো কত বিভাগেই না কতজন যোগদান করলো। কেবল মাত্র মেয়েদের নিয়ে গঠিত হ'লো ওয়াক-কোম্পানী। দলে দলে মেয়েরা যোগদান করলো। মিস লাইট মনে করলেন, গীর্জার গণ্ডির বাইরে যাবার এই মহাসুযোগ। লংকে ধরে পড়লেন তিনি। তিনিও যাবেন যুদ্ধে। লং বাঁধা দিলেন প্রথমে। কেন প্রাণটাকে মৃত্যুর মুখে তুলে দেবে! নিজের সম্ভ্রম ও সোয়াস্তিকে কেনই বা টেনে নেবে একটা অনিশ্চিয়তার মাঝে! মিস লাইট তাঁর উদ্দেশ্যের কথা খোলা খুলি ভাবে মিঃ লংকে বললেন। বললেন—ও যেতে চায় আরো বিস্তীর্ণ আকাশের তলে—ও আরো শিখবে—আরও জানবে। ও চায় সমাজের অন্ধকারের মাঝখানে থেকে নারীর পূর্ণ মর্যাদায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে। ওর এই মহাব্রতে মিঃ লং নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। মিঃ লং আর কোন প্রতিবাদ করতে পারেন না। মিস লাইটের তেজস্বিতা ও আত্মবিশ্বাসে অভিভূত হ'য়ে পড়েন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ মা, নিশ্চয়ই তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য আমি করবো। তুমি জয়যুক্ত হও। ভগবান যীশু তোমার মঙ্গল করুন।'

মিঃ লং পাদ্রী সাহেবকে সব বুঝিয়ে বললেন। বললেন একটু ঘুরিয়ে, যাতে তিনি আর অমত করতে না পারেন। বললেন, রোজ খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ও বেটির মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে—ও বলে—যুদ্ধে যাবে। সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করবে। দাওনা সাহেব ওকে পাঠিয়ে! ঘুরেত আবার এখানেই আসবে। আমরা এক রকম কাজ চালিয়ে নেবো। এই মহৎ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্য ওর মন কেঁদেছে—ওকে বাঁধা দেওয়া ঠিক হবেনা।

পাদ্রী সাহেব একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়েন। মিস লাইটের অনুপস্থিতি অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করবে। অথচ যুদ্ধের প্রয়োজনের কথাও তিনি ভুলতে পারেন না। আজ যুদ্ধের প্রয়োজনই যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তিনি আর অমত করতে পারেন না। দু' চার দিনের ভিতর গীর্জা থেকে যে দলের যাবার কথা আছে—তাদের সংগে মিস লাইটকে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন মিঃ লংকে। বলেন, 'মিস লাইটকে আমি নিজেও জিজ্ঞাসা করে দেখছি—অগত্যা এই দলের সংগেই নয় ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।'

যথা নির্দিষ্ট দিনে জলিরপাড় গীর্জা থেকে আর একদল মেয়ে কোলকাতায় রওনা হ'লো। মিস লাইট তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। পাদ্রী সাহেব নিজে ওদের স্টীমারে তুলে দিতে গেলেন—সংগে গেলেন মিঃ লং এবং গীর্জার আরো বহু লোকজন। মিস লাইট এই প্রথম মহানগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন। মনে তাঁর একদিকে ভয় ও আশংকা—অন্যদিকে অপার আনন্দ। অপরিসর জীবনের গণ্ডি ভেদ করে ও আজ বিরাট ও বিস্তীর্ণ জীবনের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছে—এই বিরাটের হাতছানি ওঁর মনে এক অপূর্ব পুলকের সৃষ্টি করেছে। মিঃ লং কোনদিন কোলকাতায় যাননি—কিন্তু যেদিন থেকে মিস লাইট পাদ্রী সাহেবের অনুমতি পেয়েছেন, সেদিন থেকেই নানা উপদেশ

দিচ্ছেন তাঁকে। সেখানে যেয়ে কী ভাবে থাকতে হবে—কেমন ভাবে চলতে হবে—এমনি আরো কত কী! তাঁর উপদেশের ধরণ দেখে কে বিশ্বাস করবে যে মিঃ লং কোনদিন কোলকাতায় যাননি। স্টীমার ঘাটায় এসেও তাঁকে নানান উপদেশ দিচ্ছেন। যেন শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রায় পালিত পিতা কণ্বের মনের সেকী অপরিসীম অস্থিরতা! মিস লাইট মিঃ লং-এর সমস্ত উপদেশ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথা পেতে নিচ্ছেন।

ওরা স্টীমারে যেয়ে উঠেছে। স্টীমার ছেড়ে যাবার হুইসিল পড়লো। সিড়ি উঠে গেল। একটু একটু করে মোড় ঘুরে স্টীমারটি নদী-বক্ষে যেয়ে দাঁড়িয়েছে—পাদ্রী সাহেব ক্রস চিহ্ন এঁকে ওদের যাত্রাপথের মঙ্গল কামনা করলেন। ওরা সবাই রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। স্টীমারটি তার গতিপথ বেয়ে চলতে সুরু করলো—ওরা রুমাল উড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় অভিনন্দন জানালো। স্টীমারটির বেগ বেড়েছে—নদীর জল কেটে দু'পার কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে। ওরা অনেকেই ভিতরে যেয়ে দাঁড়িয়েছে। মিস লাইট তখনও দাঁড়িয়ে। আব-ছায়ায় দেখতে পান, মিঃ লং একটু দূরে সড়ে যেয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে ওদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে আছেন। স্টীমারটি বাঁক ঘুরলো—স্টেশনটা—পাদ্রী সাহেব—গীর্জার দল-বল—মিঃ লং একে একে মিস লাইটের দৃষ্টি পথ থেকে সরে গেল। গীর্জার উঁচু গম্বুজটা তখনও দেখা যাচ্ছে। এতদিনের পরিচিত সকলের মাঝ-খান থেকে মিস লাইট চলে যাচ্ছেন এক অজানা জগতের মাঝে। আর হয়ত ফিরবেন না এদের মাঝে। আপসোস নেই সেজন্য। পিছনের দিক ফিরে তাকালে সামনে পা বাড়ানো যাবেনা। কিন্তু ঐ অনাত্মীয় বুড়ো লংটার কথাই বা ভুলবেন কেমন করে! তাঁর স্নেহ মিস লাইটকে সামনের দিকেই এগিয়ে দিয়েছে—তাই, যতদিন চলতে থাকবেন মিঃ লংও তাঁর মনের সংগে থাকবেন জড়িয়ে।

মিস লাইট পূর্ব ব্যবস্থামত তাঁদের দলবল নিয়ে কলকাতায় এসে উঠলেন ওদেরই গীর্জার সংশ্লিষ্ট একটী মেয়ে বোর্ডিং-এ। মিস লাইট এবং আরো কয়েকটি মেয়ে এখানেই রয়ে গেলেন—বাকী ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন স্থানে। মিস লাইট প্রথমে যোগদান করলেন আর্মি ইউনিটের এক অস্থায়ী হাস-পাতালে। কর্ণেল দে এখানকার 'attending physician'। তাঁর সংগে আলাপ হলো। বেশ লোক তিনি! চল্লিশের কোঠায় পা পড়েছে - অথচ কী কর্মঠ! কাজেই বা তাঁর কি নিষ্ঠা! প্রথম প্রথম মিস লাইট বেশ খানিকটা আড়ষ্ট ছিলেন। ডাঃ দের সহায়তায় সে জড়তা কাটিয়ে উঠতে তাঁর বেশী বেগ পেতে হয়না। যুদ্ধাহত সৈনিকদের অবস্থা দেখে প্রথম প্রথম ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়তেন। ডাঃ দে তাঁকে সাহস দিতেন। উদ্দীপিত করে তুলতেন ওদের বেদনার ভার লাঘব করতে। কারোর পা নেই—হাত নেই—মাথাটা আঘাতে বিকৃত হয়ে গেছে। সর্বগ্রাসী যুদ্ধের এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে দেখতে মিস লাইট হাঁপিয়ে ওঠেন। এঁদের অসহ্য যন্ত্রণার হা-হুতাশ মিস লাইটকে অভিভূত করে তোলে। তিনি মন প্রাণ ঢেলে দেন ওদের সেবায়। রোগীদের পরিচর্যার জন্য মিস লাইটের অধীনে আরো সেবিকা রয়েছেন কিন্তু তিনি এদের হাতে সম্পূর্ণ ভার দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। সেবায় এদের নিষ্ঠা নেই—এরা যেন এসেছে কোন রকমে কাজ সেরে যেতে। মিস লাইট যতটুকু সময় পান, রোগীদের কাছে বসে, রোগীদের মাঝে থেকে

সে সময়টুকু অতিবাহিত করে দেন। সেবা শুশ্রূষা ছাড়া এদের ব্যক্তিগত বহু ঝুক্কিও নিজে হাতে গ্রহণ করেন। আত্মীয়স্বজনের চিঠি পড়ে শোনান। প্রয়োজন বোধে উত্তর লিখে দেন। প্রথম প্রথম এদের ক্ষত দেখে তিনি ভয় পেতেন—ধীরে ধীরে সে ভয় দূরে চলে যায়—ক্ষতের বেদনাটাই বড় হ'য়ে তাঁর মন জুড়ে বসে। তিনি যতখানি পারেন—তাঁর অকৃত্রিম সেবায় এদের বেদনাকে ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সপে দিয়েছেন এদের সেবায়।

বোর্ডিং-এ এসে মিস লাইটের সময় কাটে নার্সিং সম্পর্কে বিভিন্ন বই পড়ে। কোন কোন সময় কাটে হালকা উপন্যাস ও পত্র-পত্রিকা পড়ে। ডাঃ দে নার্সিং সম্পর্কে ভাল ভাল বই সংগ্রহ করে দিতেন। জটিল অধ্যায়গুলি হাসপাতালে নিজের কক্ষে বসে পড়ে বুঝিয়ে দিতেন মিস লাইটকে। ডাঃ দের প্রতি মিস লাইটের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। কী সহজ ভাবে মেশেন তিনি নার্সদের সংগে! কোন জড়তা নেই—পদাধিক্যের কোন গর্বও নেই। কাজ করতে করতে ভুল হ'লে হয়ত একটা চিমটি কেটেই দিলেন কৌতুক করে। আবার খুশী হ'য়ে একটা ঝাকুনী দিয়ে দিলেন কাউকে। ডাঃ দের মনখোলসা সহজ সরল ব্যবহার মিসলাইটের মনকে আকর্ষণ করলো অতি সহজেই। অনেক সময় ডাঃ দে কাজের পর পৌছে দিতেন মিস লাইটকে তাঁর বোর্ডিং-এ। 'ডিউটি' সেরে মিস লাইটের বেরোতে একটু দেরী হ'লে অপেক্ষাও করতেন মাঝে মাঝে।

একবার একটা 'ষ্টেটিস্কোপ' কিনে উপহার দিলেন মিস লাইটকে। 'ফার্ষ্ট এইডের' একটি বাক্স দিলেন আর একবার। একদিন দৈনন্দিনের মত রিপোর্ট সই করাতে মিস লাইট যখন সাধারণ কলমটিই এগিয়ে ধরেছেন—বাঁধা দিয়ে ডাঃ দে বলে উঠলেন, 'থাক আর ও কলম দিতে হবেনা।' নিজের পকেট থেকে একটা দামী ঝরণা কলম বের করে সই করলেন। কলমটা মিস লাইটের পানে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'নিন, এখন থেকে এইটেই দেবেন। আপনারই রইল এটা।'

মিস লাইট বাধা দিয়ে বলেন, 'না-না, অত দামী কলমের আমার প্রয়োজন নেই, আপনার কাছেই থাক।' ডাঃ দে উত্তর দিলেন, 'কলমটা অবশ্য দামী, তবে দাম দিয়ে কিনতে হয়নি। অনেক আছে আমার। আপনার নেই। একটা না হয় আপনাকে দিলামই।'

মিস লাইট কোন উত্তর করেন না। মাটির দিকে চেয়ে থাকেন। ডাঃ দে বলেন, 'কী চুপ করে রইলেন যে? নিতে আপত্তি আছে কী?'

মিস লাইট কৃতজ্ঞ চিত্তে উত্তর দিলেন, 'না আপত্তি থাকবে কেন! ভাবছি, কতদিক দিয়েই না আপনি আমায় ঋণগ্রস্ত করছেন। আপনার এ ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারবোনা।' মিস লাইট কলমটি গ্রহণ করলেন। অন্যান্য দিনের মত কর্ণেল দে ডিউটি শেষে মিস লাইটকে তাঁর বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়ে এলেন। মিস লাইট সিড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন—বোর্ডিং-এর একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'গাড়ীতে তুমিই বুঝি এলে?' তার প্রশ্নে একটু শ্লেষ জড়িয়ে রয়েছে। নমিতা নামে আর একটি মেয়ে তেমনি ভংগীতে উত্তর দিল, 'হর্ণ শুনেও কর্ণেল দে'র গাড়ী চিনতে পারোনি?' নমিতা নার্সের কাজ করে। মিস লাইট মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন,'ভারি বাহাদুর ত! হর্ণ শুনেই গাড়ীর মালিকের নাম বলে দিতে পার?' নমিতা সংগে সংগে উত্তর দিল, 'হর্ণ শুনেই নয়, ডাঃ দের গাড়ী চড়বার সুযোগ তুমি একাই পাওনি, আরো অনেকের হয়েছে।' মিস লাইট কোন উত্তর দেন না। নিজের ঘরে চলে যান। এদের সংগে কথা বলা বৃথা। কিন্তু ডাঃ দে সম্পর্কে মেয়েটি যে ইংগিত দিল, তা' বার বার মিস লাইটের মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। ও মেয়েটিওত নার্স—সেই সূত্রেই ডাঃ দে'র সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে থাকবে। কিন্তু তাতেই বা কী হয়েছে! ও-ত ডাঃ দে'র সংগে কমদিন মিশছে না। কৈ ডাঃ দে'র চরিত্রের সে রকম কোন কিছুইত ওর চোখে পড়েনি। না—দোষ ওদের মনের। মেয়ে পুরুষের সহজ সান্নিধ্যকে ওরা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেনা—ওদের মনেরই

দোষ। বড্ড নীচু ওদের মন।

হাতমুখ ধুয়ে পোষাক পালটে মিস লাইট আয়নার সামনে চুল আচড়াতে বসলেন। চুলে বড্ড জটা ধরে গেছে। নিয়মমত আজকাল আর চুল আচড়ানো হ'য়ে ওঠেনা। নিজের দিকে তাকাবার যেন সময়ও নেই তাঁর। আয়নার ভিতর নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে মিস লাইট অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। কত পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। নিজেকে নিজেই যেন চিনতে পাচ্ছেন না। ভারী ভাল লাগে নিজেকে নিজের। কিছুক্ষণ প্রতিফলকের প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ঝাকি দিয়ে নিজেকে যেন সচেতন করে নেন। না—কী ছাইপাস ভাবছে! আবার চুল আচড়াতে থাকেন। কতদিন তেল পড়েনি। তাড়াতাড়ি কেবল স্যাম্পু করে বেরিয়ে পড়তেন। চুলগুলি আজ মাথার চারদিক ঘিরে ফেনায়িত হ'য়ে উঠেছে। বড্ড কোমল—বড্ড নরম—সাবানের ফেনার মত নরম। চুল আচড়াতে আচড়াতে মনে পড়ে তাদের কথা যারা ওর চুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। মনে পড়ে সুবোদির কথা। যখনই মাথায় সাবান দিয়ে তাঁর সামনে হাজির হয়েছে, কতদিন কতবার বলেছে, 'আমার বড্ড হিংসে হয়রে তোর চুল দেখে।' মনে পড়ে দেবুদার কথা—সে শুধু মৌখিক প্রশংসায় ক্ষান্ত হতোনা—চুল ধরে টানাটানি করতো—আর বলতো, 'ভারি ভাল লাগেরে তোর চুলগুলি! রোজ সাবান দিবি।' না—মিস লাইটের আজ যেন কী হয়েছে। যতসব আজে বাজে ভাবছে। কী দরকার ওর সেসব কথা ভেবে। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলি অতীতের খাতায়ই বন্ধ হয়ে থাক। যাক। ভেসে যাক। ধু'য়ে যাক। মুছে যাক ওর অতীত ওর মনের মাঝ থেকে। বর্তমান ছাড়া ও আর কিছুই ভাববেনা। কীইবা আছে ভাববার ওর অতীত জীবনের। যতবড় অভিশাপই হউকনা কেন, ও বর্তমানের সেই অভিশাপই মাথা পেতে নেবে।

(১২)

মিস লাইট কোলকাতায় এসে মিঃ লং ও পাদ্রীসাহেবকে যথারীতি চিঠি পত্র লিখতেন। কখন কী রকম থাকেন না থাকেন, কাজ কর্মে কী রকম মন লাগছে না লাগছে—সব বিস্তারীত লিখে জানাতেন। আর্মি-ইউনিটের হাসপাতালে কাজ করতে প্রথম প্রথম তাঁর একটুকুও মন বসতে চায়নি। তা ছাড়া কোলকাতায় এসে যেন নিজেকে কোন মতেই আর সকলের সংগে খাপ খাইয়ে চলতে পাচ্ছিলেন না। মিস লাইট পাদ্রীসাহেবকে লিখেছিলেন, রেডক্রসের কোন ইউনিট অথবা অন্য কোন সরকারী হাসপাতালে যদি বদলীর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ত ভাল হয়। আজ ঘুম থেকে একটু দেরীতেই মিস লাইট উঠেছেন। গত রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। শুতেও বড্ড দেরী হ'য়েছিল। স্নানাগার থেকে ফিরে দেখেন, বোর্ডিং-এর নেপালী ঝিটা তাঁর বিছানার ওপর দৈনিক কাগজের সংগে কয়েকখানা চিঠি রেখে গেছে। একটা এসেছে জলিরপাড় গীর্জা থেকে। পাদ্রী সাহেবের চিঠি। তিনি লিখেছেন, গীর্জার কাজে ব্যস্ত থাকাতে চিঠি দিতে দেরী করে ফেলেছেন। তবে মিস লাইটের বদলী সম্পর্কে যে তদ্বিরের দরকার, তা তিনি করে রেখেছেন -হয়ত ইতিমধ্যেই ওপর থেকে মিস লাইট নির্দেশ পেয়ে থাকবেন। আর একখানা চিঠি মিস লাইট তুলে নিলেন। খামের ওপর 'On Active Service' লেখা। হ্যাঁ, মিস লাইটের বদলীর চিঠিই বটে। তবে রেড-ক্রস-এর কোন ইউনিটে নয়। তাঁকে যোগদান করতে হবে স্থানায় একটি সরকারী হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট আর্মি ইউনিটেই। এবং হাসপাতালের

নার্সদের কোয়াটারেই তাঁর থাকতে হবে। চিঠির শেষ লাইনটাতে আরো লেখা রয়েছে, 'যদি মিস লাইট এখানে যোগদান করতে না চান, তবে যেন এক সপ্তাহের ভিতরই জানিয়ে দেন।' চিঠিটা পড়ে মিস লাইট একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। নতুন কাজে যোগদান করবেন কি, করবেন না। তাঁর বর্তমান কাজে থানিকটা মন বসে গেছে। আর এ বদলীর কোন অর্থই হয়না। রেডক্রসের কাজের প্রতি মিস লাইটের একটু বেশী ঝোঁক ছিল। তাই যখন হ'লোনা—তখন আবার নতুন কাজে যেয়ে লাভ কী! তা ছাড়া কোয়াটারে থাকতে হবে! যখন তখন বেরোতে পারবেন না! না—একাজে যোগদান করে কোন লাভ নেই। যাক্, এসে ভেবে দেখা যাবে। চিঠিগুলি বিছানার নীচে রেখে মিস লাইট খেয়ে দেয়ে বেড়িয়ে পড়লেন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। না জানি কতই দেরী হয়ে গেছে! আজ আবার একটা অপারেশন-এর কেস আছে। হাসপাতালে পৌছেই টেবিলের ওপর মিস লাইট ডাঃ দে'র একটা স্লিপ দেখতে পান। তিনি আসবা মাত্রই দেখা করতে বলেছেন। ব্যাগটা রেখেই মিস লাইট ডাঃ দে'র কামরায় যেয়ে হাজির হলেন। ডাঃ দে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ না তুলেই বলে উঠলেন, "You are a bit late to day Miss. জানেন মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন আসছেন—Bed No-Five-এর অপারেশন।" মিস লাইট অপরাধীর মত উত্তর দিলেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এক্ষুনি সব ঠিক করে রাখছি।"

ডাঃ দে হাতের কাজ রেখে আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন মিস লাইটকে কিন্তু মিস লাইটের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যান তিনি। জিজ্ঞাসা করেন, "একী? Why are you looking so pale? শরীরটা কী ভাল নেই?" মিস লাইট মুখে হাসির রেখা টেনে উত্তর দেন, "না, ভালই আছে, তবে শুতে একটু দেরী হয়েছিল, রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি।" ডাঃ দে "ও"—বলে নিশ্চিন্ত হন। টেলিফোনের হাতল তুলতে তুলতে বললেন, "আচ্ছা আপনি যান, সব ready হ'লে আমায় খবর দেবেন।"

অপারেশন নির্বিঘ্নে হ'য়ে গেল। পা একখানা হারাতে হ'লো রোগীর। একখানা নকল পা লাগিয়ে দিতে হবে। গ্লাডষ্টোন চলে গেছেন। মিস লাইট অন্যান্য নার্সদের নির্দেশ দিয়ে তাঁর ঘরে যেয়ে একটু বিশ্রাম করছেন। ডাঃ দে যেয়ে হাজির হলেন সেখানে। মিস লাইট ডাঃ দে'কে দেখেত হচ কচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাঃ দে বল্লেন, "মাপ করবেন—বিরক্ত করতে এলাম আপনাকে।"

মিস লাইট একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে উত্তর দিলেন, "কী যে বলেন? বসুন।" ডাঃ দে চেয়ারে বসে পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে টানতে থাকেন। মিস লাইট তখনও তাঁর টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পাইপ থেকে ধূম নির্গত করতে করতে ডাঃ দে বলেন, "Take your seat." মিস লাইট সংকুচিত ভাবে তাঁর চেয়ারে বসে পড়েন। ডাঃ দে পাইপ টানতে টানতে বলেন, "চলুন, আজ একটা ছবি টবি দেখে আসি। বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। আর আপনার মনটাও ভাল বলে মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে একটু-আধটু recreation দরকার।"

মিস লাইট টেবিলের ধারটায় হাত বুলাচ্ছেন আর ভাবছেন—নমিতার কথাগুলি তাঁর মনে ভেসে উঠছে। নিজেই আবার তাকে চাঁপা দিচ্ছেন। নাঃ—ওদের কথাকে মোটেই তিনি আমল দেবেন না। মিস লাইটকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাঃ দে বলে ওঠেন, "কী ভাবছেন? যাবেন—কী যাবেন না-এইত!" মিস লাইট হেসে ফেললেন ডাঃ দের কথায়। উত্তর দেন, "না তা' নয়। যেতে হ'লে আবার কাপড়-চোপর পালটে নিতে হবে।"

ডাঃ দে বলেন, "ও এই কথা! চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আমিও একটু বাড়ী ঘুরে আসবো। ততক্ষণ আপনি তৈরী হ'য়ে নেবেন, কেমন!!"

মিস লাইট সম্মতি না দিয়ে পারেন না।

বিকেলের প্রদর্শনীতে যাবার কথা ছিল। ডাঃ দে ইচ্ছা করেই একটু দেরী করে এলেন। মিস লাইট তৈরী
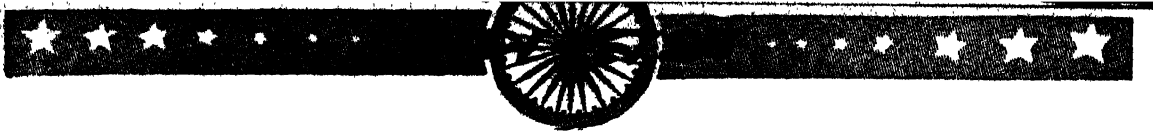
হ'য়েই ছিলেন। গাড়ীতে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেরী হ'য়ে গেলনা—" ডাঃ দে যেন শুনেও মিস লাইটের কথা শোনেনি এমনি ভাবে গাড়ী স্টার্ট দিলেন। মানিকতলা ষ্ট্রীটের ধারে মিস লাইটদের বোর্ডিং হাউস। বোর্ডিং হাউস ছাড়িয়ে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউতে পড়তেই মিস লাইটকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি যেন কি বলছিলেন—" মিস লাইট পিছনের সিটে বসেছিলেন। সপ্রতিভ ভাবে বল্লেন, "শো হয়ত আরম্ভ হ'য়ে গেছে।" গাড়ীর বেগ থামিয়ে ডাঃ দে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "তাইত! বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে। চলুন ওর চেয়ে একটু বেরিয়ে খেয়ে-দেয়ে আসি—" মিস লাইট কোন জবাব দিলেন না—ডাঃ দের গাড়ী এস-প্ল্যানেড মুখে ছুটে চললো।

মিস লাইট-এর চোখ রাস্তার দু'ধার অনুসরণ করে চলেছে। কোনস্থানে একটা মিলিটারীকে ঘিরে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে মজা দেখছে। কোন স্থানে কোন বাড়ীর ঝুলবারান্দার নীচে ভিখিরীর দল সংসার পাতিয়ে বসেছে। বৌবাজারের মোড়ে একটা ডাস্টবিন থেকে একদল খাবার খুঁটে খাচ্ছে—একটা মিলিটারী এসে ফটো তুলে নিচ্ছে। মিস লাইট যেন হাপিয়ে উঠেছেন—ব্রিটিশের ন্যায় সংগত শাসনাধীনে ভারত কী শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীনই না হ'য়েছে! অথচ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। ধিক্কার আসে মিস লাইটের নিজের ওপর। তিনি নিজেও একজন ভারতবাসী হয়ে এই ব্রিটিশের সংগেই সহযোগিতা কচ্ছেন! গাড়ী এসে এসপ্লানেডের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের কাছে বাঁধা পেয়ে থামলো। একটা মিলিটারী কনভয় রাস্তা অতিক্রম কচ্ছে—ডাঃ দে নিজের মনেই বলে উঠলেন'—"আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আর কী!" তারপর পাইপটা ধরিয়ে টানতে সুরু করলেন এই ফাঁকে। মিস লাইট নির্বাক। তাঁর মন ভারাক্রান্ত। আবার আর একদল ভিখিরী মিলিটারীদের ঘিরে জটলা পাকাচ্ছে। মিলিটারীর দল এই নতুন দেশে এসে যেন খেলা পেয়ে গেছে। এই মজার ব্যাপারের নিদর্শন ওদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য রোলে রোলে ছবি তুলছে। ওরা সভ্য দেশের মানুষ বলে বড়াই করে—সভ্যতার এই নির্লজ্জ রূপ দেখে ওদের লজ্জা আসেনা—অনুকম্পা জাগেনা। মিস লাইটের ইচ্ছা হয় ওদের হাত থেকে ক্যামেরাগুলি কেড়ে নিয়ে চুরমার করে দেন—কিন্তু ইচ্ছা করলেই তা পারবেন কী করে!

ট্রাফিক পরিষ্কার হ'লে ডাঃ দে ধর্মতলা বেয়ে এগিয়ে চললেন—মিস লাইটের মন বল্লভপুরের কথায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে। ওর মা—ওর বাবা—বেচে আছে কিনা কে জানে! না, মিস লাইট ভাববে না তাঁদের কথা। অতীত অতীতের খাতায়ই বন্ধ থাক। অতীতকে প্রশ্রয় দেবে না কোন মতেই।

মিঃ লাইটের চমক ভাংলো ডাঃ দের ডাকে। শিয়ালদহের কাছাকাছি একটা বাড়ীর সামনে তিনি গাড়ী দাঁড় করিয়ে নেমে পড়েছেন, "আসুন, কিছু খেয়েনি এখান থেকে।"

মিস লাইট ডাঃ দেকে অনুসরণ করে বাড়ীটার ভিতরে প্রবেশ করলেন। বাড়ীটা বাইরে থেকে পুরোন বলে মনে হয়। ব্লাক আউটের অন্ধকারের সংগে তার রং যেন মিশে গেছে। কিন্তু ভিতরের চাকচিক্য বেশ আকর্ষণীয়। আলোক সজ্জায়ও চোখ ঝলসে দেয়। বা দিকে বার জাতীয় রেঁস্তোরা। ডান দিকের সিড়িটা উপরে উঠে গেছে। ডাঃ দে সিড়ির কাছে মিস লাইটকে দাঁড় করিয়ে রেঁস্তোরার ভিতর যেয়ে ম্যানেজারের সংগে কী যেন কথা বলে এলেন। একটি বয় সংগে সংগে বেরিয়ে এলো। ডাঃ দে মিস লাইটকে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন। বাইরের ব্লাক অউট যেন সিড়িটাকেও গ্রাস করে রেখেছে।
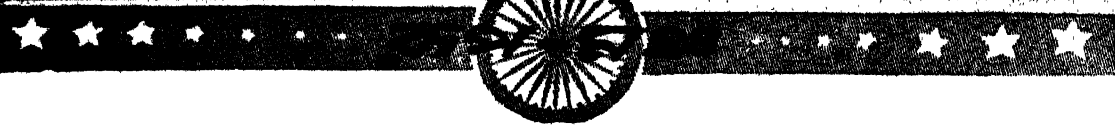
সিড়ি বেয়ে দোতালার ছাদে এসে মিস লাইট যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ছাদের অর্ধেকটা জুড়ে কয়েকটা ঘর—বাকীটা খোলা—চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। একটা কাঁঠাল গাছ এসে তার ওপর হুমরী খেয়ে পড়ে ছাদটায় বেশ খানিকটা অন্ধকারকে ডেকে এনেছে। মিস লাইট ছাদটায় পায়চারী কচ্ছিলেন—বয় ঘর খুলে ততক্ষণ আলো জ্বালিয়ে নিয়েছে। ডাঃ দে বয়কে কী কী নির্দেশ দিয়ে মিস লাইটকে ডাক দিলেন, "আসুন ভিতরে বসা যাক।"

মিস লাইট ঘরে ঢুকতে ঢুকতে উত্তর দিলেন, "এ কোথায় এনে হাজির করলেন? কেবল আলো ছায়ার খেলা যে।" ডাঃ দে মিস লাইটের সূক্ষ্ম ইংগিত উপলব্ধির জন্য মাথা না ঘামিয়ে স্থূল ভাবে হেসে উত্তর দিলেন, "তা যা বলেছেন আর কী?"

মিস লাইট ও ডাঃ দে যে-ঘরে যেয়ে বসলেন—এই ঘরটায় কয়েকটি শোফা রয়েছে আর রয়েছে ডাইনিং টেবিল। মিস লাইট ঘরটার এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আর একটা ঘর দেখতে পেলেন—এঘরটা কারো বাসের ঘর হবে। বিছানা পাতা রয়েছে—রেডিও সেট একটা মাথার ধারে। দু'চার খানা ছবিও দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে—অথচ লোকজন নেই। মিস লাইট একটু আশ্চর্য হয়ে পড়লেন—ডাঃ দেকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"একী এসব ঘরে কেউ থাকেন না?"

ডাঃ দে উত্তর দেন, "কে আর থাকবে! এটা হচ্ছে আমাদের rest-house. বন্ধুবান্ধব মিলে এখানে বসে একটু গল্প-গুজব করি। মাঝে মাঝে উপরওয়ালাদের নিয়ে এসে একটু আপ্যায়িতও করি।"

"তাহলে বলুন শীকার ধরবার আস্তানা! তা মন্দ নয়!" মিস লাইটের কথা শেষ হবার পূর্বেই বয় খাবার নিয়ে এল দু'ভাগে। ডাঃ দে কাটা চামচে হাতে নিয়ে মিস লাইটকে বল্লেন, "নিন আরম্ভ করুন।"

মিস লাইট অভিভূতের মত খাবারের ডিসগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কত খাবার! আর কিছুক্ষণ পূর্বেই যে বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে এলেন—এত সহজে তাকে ভুলবেন কী করে? মানুষের পৃথিবীতে মানুষে মানুষে এত ভেদা ভেদ!

ডাঃ দে খেতে আরম্ভ করেছেন। মিস লাইট তখনও চুপটি করে বসে আছেন দেখে বলে উঠলেন, "আরে ভাবছেন কী? নিন-নিন আরম্ভ করুন।"

মিস লাইট একটু মোড়া-মোড়ি দিয়ে বলে উঠলেন, "এত খাবো কী করে? তুলে নিতে বলুন।" ডাঃ দে বল্লেন, "তুলে নিতে হবেনা-যা পারেন শেষ করুন—বাকী থাকে ত আমি তুলে নেবোখন!"

মিস লাইট উত্তর দিলেন, "এঁটো হয়ে যাবে যে"- ডাঃ দে হেসে উঠলেন, জোরে। তাঁর এই ধরনের হাসির সংগে মিস লাইট ইতি পূর্বে পরিচিত ছিলেন না।

"এঁটো হয়ে যাবে—না? এঁটো টা অন্য সময় বাঁচিয়ে চলি—এখানে আর কোন ছুঁতমার্গের কারবার নেই। We are all human beings—গান্ধী মহারাজের শিষ্য। Equality of mankind pervades here."

মিস লাইট কোন জবাব দিলেন না। একটু একটু করে খেতে আরম্ভ করলেন। ডাঃ দে'র স্বরূপটি স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠছে তাঁর মনে। এই গৃহের পংকিলতায় যেন তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। বুকটা দুর দুর কচ্ছে। হাতের কাটা চামচে ঠক ঠক করে কাঁপছে। বুঝি মিস লাইট আর নিজেকে ধরে রাখতে পাচ্ছেন না। না, তাঁকে ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা। আজ আর সে ততটা নিঃসহায় নয়। বল্লভপুরের ছোট্ট গণ্ডীর মাঝে তাঁর ভবিষ্যৎ সীমাবদ্ধ নয়। ডাঃ দে জিজ্ঞাসা করেন, "ওকী খাচ্ছেন না যে—"

মিস লাইট নিজেকে সংযত করে উত্তর দেন, "জানেন ত, রাত্রে ঘুম হয়নি। বড্ড মাথা ধরেছে।"

বয় আবার এলো। কতগুলি পানীয় রেখে গেল। মিস লাইট সেগুলির দিকে একবার তাকালেন। ডাঃ দে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে মিস লাইটকে জিজ্ঞাসা করলেন, "Do You require?"

মিস লাইট উত্তর দিলেন "No, thanks."

ডাঃ দে গ্লাসটা তুলে নিয়ে বল্লেন, "কেন! prejudice আছে নাকী? মাঝে মাঝে একটু এ্যালকোহল পান করা ভাল। আজকালত বহু মেয়েরাই খান—তা ছাড়া শরীরটা ভাল নেই—একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠতেন!" মিস লাইট গা ছাড়া ভাবে উত্তর দিলেন, "বহুর মাঝে থাকতে চাই না।"

ডাঃ দে এক চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "Then-any other drinks? Vimto Soda or Orange-crash?"—মিস লাইট দীপ্তস্বরে উত্তর দিলেন. "Excuse me' nothing of the kind. I am quite O. K."

ডাঃ দে আর অনুরোধ করতে সাহস পেলেন না। তিনি নিজেই পর পর ঢালছেন আর খাচ্ছেন। মিস লাইট নির্বাক শ্রোতার মত দেখছেন। বাইরে কোন বিকার নেই—কোন চিন্তা নেই। ভিতরে ভিতরে কিন্তু এই পরিবেশ থেকে মুক্তির চিন্তায় তিনি বিভোর। কিছুক্ষণ বাদে যেন পথ খুঁজে পেলেন। আরো নিশ্চিন্ত হয়ে গাটা একটু ঝাড়া দিয়ে ডাঃ দেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার দে, আপনি নমিতা বলে একটি মেয়েকে চেনেন কী?" ডাঃ দে গ্লাসটা নামিয়ে উত্তর দিলেন, "কেন বলুনত? আমার বিষয়ে অনেক কিছু বলেছে বুঝি আপনাকে?"

মিস লাইট জবাব দিলেন, "তাহলে আপনি চেনেন দেখছি।"

মিস লাইট কিছু বলবার পূর্বেই ডাঃ দে বল্লেন,"ও মেয়েটার কথা আর বলবেন না! বড্ড vulgar." মিস লাইট ডাঃ দের কাছ থেকে আরো কিছু শুনবার জন্য তার কথায় সায় দিয়ে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়। আমাদের বোর্ডিং-এই থাকে। সেদিন আপনার সম্বন্ধে বিশ্রী একটা ইংগিত করলো।"

ডাঃ দে বল্লেন, "তাত করবেই। কারোর ভাল করতে নেই মিস লাইট! খেতে পেতো না। আমি ওকে কাজ যোগার করে দি। দু'চারজন বন্ধুবান্ধবের সংগে পরিচয় করিয়ে দি। ব্যস! চোখ খুলে গেল। এখন আমাকেই চিনতে পারেনা। আমার দুর্ণাম করে বেরায়। Drink. করাও শিখেছে।"

মিস লাইট বল্লেন, "কেন, Drink-এ ত দোষ নেই! এইত আমাকেইত আপনি offer করেছিলেন"—

ডাঃ দে একটু থতমত খেয়ে জবাব দেন, "খাওয়াটা খারাপ নয়। তবে পরিমাণ মত হওয়া চাই। এখানে এসে একদিন কী কাণ্ডটাইনা করলো!"

মিস লাইট একটু বক্র দৃষ্টি হেনে বল্লেন, "তাহলে আমাকেই আজ এখানে নতুন আনেন নি!" ডাঃ দে'কে ততক্ষণ রঙ্গিন নেশা বেশ রাঙ্গিয়ে তুলেছে। তিনি জড়ি কণ্ঠে বল্লেন, "ওদের কথা থাক মিস লাইট, ওদের সংগে কী তোমার তুলনা চলে!" কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে আবার বলেন—"লাইট,জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি—কিন্তু তোমার মত আর একটিও দেখিনি।"

মিস লাইট সংযত ভাবে উত্তর দেন, "অতটা উচ্চ ধারণা করবেন না"—

ডাঃ দে বাধা দিয়ে বলেন—"না-না মিস লাইট, সত্যি তুমি আলোকশিখার মত দেদিপ্যময়ী—'আমার আঁধার ঘরের আলো সখি জ্বালো,সখি জ্বালো—'চলো-এখান থেকে আমরা চলে যাই, দূরে—বহু দূরে—সেখানে যেয়ে নীড় বাধবো—শুধু থাকবো তুমি আর আমি—"

মিস লাইট কৃত্রিম প্রশংসায় উত্তর দেন, "সত্যি আপনি কত মহৎ – কত উদার! এতখানি সম্মান যে আমায় দেবেন তা ভাবতেও পারিনি! আসুন, আমি একটু ঢেলে দিচ্ছি।"

ডাঃ দে উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠেন, "দাও,

'দাও পিয়ালা, প্রিয়া আমার অধরপুটে পূর্ণ ক'রে।
যাক অতীতের অনুতাপ আর ভবিষ্যতের ভাবনা মরে॥'

ডাঃ দে ওটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াতে গেলেন কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। মিস লাইট তাড়াতাড়ি উঠে তাকে ধরে বল্লেন, "চলুন আপনাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।" ডাঃ দে কবিতার সুরে বলে উঠলেন—"আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখী– আমিত পথ চিনিনা—" মিস লাইট পাশের ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বল্লেন—"ফ্যানটা খুলে দি' আপনি একটু ঘুমুন দেখি"—

"হ্যাঁ ঘুমোচ্ছি কিন্তু তুমি কোথাও যেওনা মিস লাইট—"

"কোথায় যাবো—? দেখি রেডিওটা খুলে দিচ্ছি। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ুন"—মিস লাইট রেডিওটা খুলে দিলেন। আস্তে আস্তে সংগীত ভেসে আসতে লাগলো। ডাঃ দে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মিস লাইট একবার বাইরে এসে দেখলেন সিড়ির পাশে অন্ধকারে ডাঃ দে'র বয়টা ঝিমোচ্ছে। তিনি ফিরে এসে দরজাটায় শিকল এঁটে তাকে পাশ কাটিয়ে পা টিপে টিপে নিচে নামতে লাগলেন—বাইরে লোক সমাগম আগের চেয়ে অনেকটা কমে এসেছে। ম্যানেজার যেন ক্যাশ নিয়ে ব্যস্ত। মিস লাইট—এই সুযোগ মনে করে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। রাস্তায় দিগন্তব্যাপী অন্ধকার—কিন্তু অন্ধকারে যে আজ আর তাঁর ভয় নেই—নির্ভয়ে তিনি দ্রুতপদে তাঁর বোর্ডিং-এর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। শিক্ষা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছে—বল্লভপুরের মেঝকর্তা আর এদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? কোথাও নেই—বরং তাকে চেনা যায়, এদের চেনা দায়। এঁরা শিক্ষা ও সভ্যতার মুখস পড়ে যে অন্যায় কচ্ছে—তার প্রতিবিধান করবে কে? কে এঁদের মুখোস খুলে এদের নগ্নরূপটি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরবে!

যে হোটেলটি থেকে মিস লাইট নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে চলে গেলেন—সেই হোটেলটির দোতলার একটু ইতিহাস আছে। সর্বগ্রাসী যুদ্ধ মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তার লিপ্সার ইন্ধন জুগিয়ে মানব সভ্যতাকে কতখানি অধঃপতনের মাঝে টেনে নিয়ে গেছে তার সন্ধান সব মানুষের পক্ষে জানবার কথা নয়। মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে—শত শত জীবনের শোচনীয়তায় মানুষ হ'য়েও মানুষের বুক কেঁপে ওঠেনি। মানুষের অর্থগৃহ্নুতা শুধু মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি—যে মহিমময়ী নারী যুগ যুগ ধরে মানবসভ্যতার ইতিহাসে পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে এসেছে—সেই নারীকে নিয়েই পণ্যের মত কতই না বেচা কেনা চলেছে। ডাঃ দে'র এই আস্তানাটি তারই একটা জলন্ত নিদর্শন। এখানে এই সভ্য নগরীর বুকে রাতের অন্ধকারে নারীদেহ নিয়ে এরা বেসাতি খুলে বসে। ডাঃ দের মত উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসক—ভদ্র হোটেল ব্যবসায়ী—শাসকগোষ্ঠীর উর্ধ্বতন কর্মচারী দু' একজন মিলিত ভাবে এই ব্যবসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন—এখানকার খরিদ্দারের দলও হোমড়া চোমড়া গোছের। কেউ কর্ণেল—কেউ ক্যাপ্টেন—কেউ মিলিটারী এস-ডি-ও-কালোবাজারের রুই কাতলা—আরও কতজনই না আসে এখানে। অভাবের তাড়নায় কত ভদ্রনারীকেই না আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে এদের প্ররোচনায়। অথচ এরাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বড়াই করে সভ্যতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেড়ায়! সমাজ ও রাজদ্বারে এদের চেয়ে আর কেউ উচ্চ সম্মান লাভ করতে পারে না!

হোটেল ম্যানেজার রামলোচন বাড়ুজ্জে যুদ্ধের দৌলতে মিঃ আর, বোনার্জি হ'য়েছেন—ডাঃ দে তখনও নামছেন না দেখে ক্যাশ বন্ধ করে উপরে যেয়ে ওঠেন। সিড়ির দরজায় অন্ধকারে বয়টার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই বয়টা হচকচিয়ে ওঠে। তখনও তার ঘুমের নেশা কাটেনি। ম্যানেজার সাহেব চোস্ত হিন্দিতে মেজাজ চড়িয়ে বলেন, "নিদ যাতা হ্যায় উল্লুক।" তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বয়টি উত্তর দেয়, "জি হুজুর!" ম্যানেজার সাহেব ধমকে ওঠেন, "জি হুজুর!" বয়টির টনক নড়ে। ধরফর করে সেলাম ঠুকে উঠে দাঁড়ায়। ম্যানেজার সাহেব গলার স্বর খাটো করে জিজ্ঞাসা করেন, "দে সাহেব নিকাল গিয়া!" বয়টি চোখ ডলতে ডলতে উত্তর দেয়, "নেহি ত!" ম্যানেজার সাহেব ছাদের ওপর এসে সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে থাকেন কিছুক্ষণ। তাদের সাংকেতিক প্রথানুসারে দরজায় টোকা মারেন কয়েকটা—না—কোন সাড়া শব্দ নেই। কিছুক্ষণ অস্থির ভাবে পায়চারী করে আবার দরজার কাছে যান। দরজায় ঘা দেন কয়েকটা—কোন প্রতিশব্দ শুনতে পান না। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন দরজায় শিকল দেওয়া। দরজা খুলে প্রথম ঘরটায় কাউকে দেখতে পান না—কেবল অভুক্ত খাবার ও পানের সরঞ্জামগুলি এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। কোন লোকজন নেই। ভিতরের ঘরটায় ঢুকলেন। খাটের ওপর ডাঃ দে বিভোর হ'য়ে

ঘুমোচ্ছেন। আর কেউ নেই ঘরে। রেডিওটা থেকে খস-খস-শব্দ হচ্ছে—তার প্রোগ্রাম অনেকক্ষণ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। রেডিওটা বন্ধ করে মিঃ বোনার্জি ডাঃ দে'র শিয়রে যেয়ে বসলেন। ডাক দিলেন দু' তিনবার। কোন সাড়া নেই। আবার ডাকলেন। ডাঃ দে ঘুমের ঘোরে "লাইট—লাইট" বলে অস্ফুট গুঞ্জন করে উঠলেন। মিঃ বোনার্জি কিছু না বুঝে উত্তর দিলেন, "লাইটত জ্বলছে।" ডাঃ দে পাশ ফিরে শুলেন। ম্যানেজার সাহেব এবার ধাক্কা দিয়ে বল্লেন, "ডক্টর দে—উঠুন—উঠুন—" ডাঃ দে'র চমক ভাঙলো। গলার স্বরটা যেন বেসুরো লাগছে—হাতের স্পর্শ টাও আশানুরূপ বোধ হচ্ছে না। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন ম্যানেজার বসে। কিছু বুঝতে না পেরে তড়াক করে উঠে বসলেন। জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলেন ম্যানেজারের দিকে। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার?—একা যে! শিকার পালিয়েছে নাকি?"

এবার ডাঃ দে'র চৈতন্য হ'লো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মাথাটা তখনও তার ভো—ভো—কচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। ম্যানেজার সাহেব বল্লেন, "আর তাকিয়ে লাভ কী? সত্যই পালিয়েছে। হিসাবে ভুল করেছিলেন?"

ডাঃ দে গম্ভীরভাবে উত্তর দেন, "পালিয়ে যাবে কোথায়—পালায়নি—আমিই একটু বেহুস হ'য়ে পড়েছিলাম। তাই হয়তো চলে গেছে। টোপ ফেলেছি যখন তখন গেঁথে আনবোই।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাঃ দে চমকে উঠেন। "Oh! my God! বারোটা বেজে গেছে!—না, যাই ম্যানেজার। আর দেরী করা চলে না—কাল দেখা হবে—বাই—বাই"—ডাঃ দে টলতে টলতে এসে গাড়ীতে ওঠেন। ম্যানেজারের কাছে হার স্বীকার না করলেও—নিজের মনের কাছে আজকের পরাজয়কে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না কোন মতেই।

(১৩)

মিস লাইট ওদিন রাত্রের ঘটনা ঘটবার পর তাঁর নতুন কাজে যোগ দিতে আর দ্বিধা করেননি। আসবার সময় রুগীদের কাছ থেকে এক ফাঁকে বিদায় নিয়ে এসেছেন। ডাঃ দে'র সংগে দেখা করবার আর তাঁর প্রবৃত্তি হয়নি। ডাঃ দে'র জিনিষপত্রগুলি প্যাকেটে বেঁধে একটা চিঠি লিখে অফিসে রেখে এসেছিলেন। লিখেছিলেন, "আপনার এগুলি রেখে গেলাম। যে উপকার পেয়েছি সেজন্য কৃতজ্ঞ। আমার বদলীর খবর হয়ত শুনে থাকবেন। আশা করি আমার সম্পর্কে আপনার ভুল ধারণা ভেংগেছে।"

মিস লাইটের এই নতুন কাজটি একটী সরকারী মেডিক্যাল কলেজ সংশ্লিষ্ট আর্মি ইউনিটেই হ'য়েছে। বর্তমানে অস্থায়ী ভাবে তাঁকে বহাল করা হ'লেও—যুদ্ধের পর তাঁকে বেসামরিক বিভাগে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হ'য়েছে। এই ইউনিটে সাধারণতঃ ইউরোপীয় নার্সদেরই গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। তাছাড়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টানদের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা বিচার করে মাঝে মাঝে সুযোগ দেওয়া হ'লেও, এই নির্বাচনে খুব কড়া নিয়ম পদ্ধতি অনুসৃত হ'য়ে থাকে। একটী গীর্জার পাদ্রী সাহেব মিস লাইটকে অনুমোদন করেছিলেন বলেই এই বিভাগে সুযোগ পেতে মিস লাইটের ততটা বেগ পেতে হয়নি। এখানে একজন সাধারণ সেবিকারূপেই মিস লাইট যোগদান করেছেন। এই বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও নার্সদের প্রতি গোয়েন্দা বিভাগের যেমনি অলক্ষ্য কড়া দৃষ্টি রয়েছে—সৈন্য বিভাগের কড়া আইন কানুনের বিরুদ্ধেও তেমনি কারো কিছু বলবার বা করবার উপায় নেই। আহতদের সংগে রোগ সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আলাপ আলোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কারণ, ভারতের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত—ব্রহ্ম—ইম্ফল—প্রভৃতি রণাঙ্গনে আহত বহু সৈনিকদের এখানে আনা হ'য়ে থাকে। মিলিটারী ও সিভিল হাসপাতালের নার্সরা একই কোয়ার্টারে বিভিন্ন ব্যারাকে থাকে—পরস্পরের সংগে অবসর সময় আলাপ আলোচনায় কোন বাধা নিষেধ না থাকলেও তাদের গতিবিধির ওপরও কড়া নজর রাখা হয়। এরই ভিতর দিয়ে
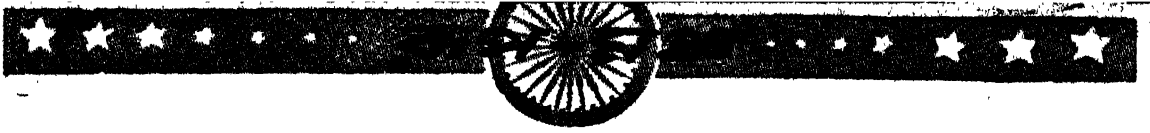
মিস লাইট ধীরে ধীরে পরিচিত হ'য়ে উঠলেন বিভিন্ন বিভাগের নার্সদের সংগে। পরিচিত হ'য়ে উঠলেন—বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রদের সংগে। নিয়মবাঁধা কাজের ফাঁকে নানান গল্প গুজব ও আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়ে দিনগুলি মন্দ কেটে যেতে লাগলো না। একবার সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের নার্সরা মিলে রেডক্রসের সাহায্যার্থে এক জলসানুষ্ঠান করলো। মিস লাইট বেশ সক্রিয় অংশ নিলেন এই অনুষ্ঠানে। তাছাড়া কয়েকখানা গান গেয়ে খুবই খ্যাতি অর্জন করলেন। কলেজ ইউনিয়নের ছেলেরা মাঝে মাঝে তাঁদের ছোটখাটো ঘরোয়া অনুষ্ঠানে মিস লাইটকে আমন্ত্রণ জানায়। মিস লাইট সানন্দে তাদের সংগে যেয়ে যোগ দেন। এখানে রাজনীতির কোন কচকচানী নেই। ব্রিটিশরাজকে ভারত থেকে তাড়াবার জন্যও কেউ কোমর বেধে লাগেনি বা দল পাকায় নি! এরা সেবাব্রতে দীক্ষিত—সেবার নিশানা উড়িয়ে শাসকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে তোলে। দেশপ্রেমের কোন বালাই নেই এদের ভিতর—অন্ততঃ তার কোন বহিঃপ্রকাশ ব্রিটিশরাজের বেতনভুক গোয়েন্দাদের সন্দিহান করে তোলেনি। এরা রেডক্রসের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে—যুদ্ধ তহবিলকে ফাঁপিয়ে তোলে—মানবতার দোহাই দিয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। এঁদের কোন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে কোন ভারতীয়দের ডাক পড়ে না—ডাক পড়ে খাস সাদা চামড়াদের। তাই স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন গোয়েন্দারাও এদের সন্দেহের চোখে দেখবার সুযোগ পায় না।

সরকারের যেমনি কড়া দৃষ্টি ছিল হাসপাতালের আর্মি-ইউনিটের ওপরে—ছাত্র এবং নার্সরা মিলে গোপনে গোপনে যে দলটি গড়ে তুলেছিল, তাদেরও তেমনি লোলুপ দৃষ্টি ছিল এই বিভাগটির ওপর। জাপানের নৃশংস বর্বরোচিত অভিযানের কথা বৃটিশ সরকার বারবার তারস্বরে প্রচার করছেন—কিন্তু এই প্রচার কার্য অনেকেই বিশ্বাস করতে পারল না—তাঁরা নিজেদের বিবেকের কাছে বার বার এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—যদি এই অভিযান জাপানের বর্বরতার অভিব্যক্তিই হবে—তবে অভিযানকারীরা জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন লাভ করলো কী করে? নিশ্চয়ই এই প্রচার কার্যের অন্তরালে এমন কোন রহস্য আছে ভারত ও ভারতের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে যার রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ! এই অভিযানকারীদের প্রকৃত স্বরূপ জানবার জন্য সকলেই কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অপরাজেয় যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধ্যানের কথা ইতিমধ্যেই প্রচারিত হ'য়ে পড়েছে—সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা শুধু তাঁর অন্তর্ধ্যানের কথাই নয়—তাঁর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করেও চলছিলেন। জনসাধারণ সরকারের প্রচার-কার্যের ঢক্কানিনাদ ভেদ করে প্রকৃত সত্য সব সময় আবিষ্কার করতে না পারলেও, তাদের মনও সন্দেহ দোলায় দোল খেতে লাগলো—তাঁদের মনেও বার বার ঐ একই প্রশ্ন ঘুর পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো—কে ঐ অভিযানকারীদের পরিচালনা করছে, কী তাদের উদ্দেশ্য—জাপানের রাজশক্তিই কী এর মূলে? জাপানের রাজ্যলিপ্সাই কী সর্বস্ব গ্রাস করে এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে? না—নিশ্চয়ই নয়। জনসাধারণের মন মাঝে মাঝে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হলেও সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা নিশ্চিত ছিলেন। তাঁরা জানতেন, ঐ অভিযানকারীরা এগিয়ে আসছে ভারতকে জাপ রাজ-শক্তির নাগপাশে বেঁধে ফেলতে নয়—এগিয়ে আসছে দীর্ঘ দ্বিশতাব্দী ধরে বৃটিশ রাজশক্তির বন্ধন জর্জরিত ভারতের আত্মাকে মুক্তি দিতে। এঁদের পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন ভারতের দামাল ছেলে বিপ্লবী বীর সুভাষ-চন্দ্র। তাইত ওদের অভিযানকে জয় মণ্ডিত করে তুলতে ভারতের অভ্যন্তরে সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা ব্রিটিশসরকারের যুদ্ধ তৎপরতার গোপন তথ্য সংগ্রহ করে ওদের সরবরাহ করতে তৎপর হ'য়ে উঠেছেন। এদের সন্ধানী দৃষ্টি বার বার এই হাসপাতালটির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ফিরেছে—কিন্তু সুযোগ পায় নি। শাসকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি অগ্রসর হতে পারে নি। মিস লাইট আসাতে এঁরা যেন নতুন পথ দেখতে পেল।
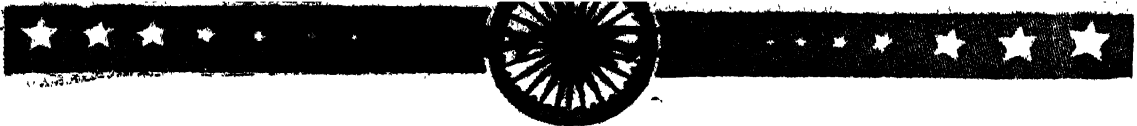
নানান ভাবে প্রথম যাঁচাই করে নিল তাঁকে। শিপ্রা বলে একটী নার্স প্রথমে ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে তোলে মিস লাইটের সংগে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য কয়েকবার সে চাঁদা চেয়ে নিয়ে গেল মিস লাইটের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে ওর কাঁচা মনটাকে খুঁচিয়ে নিতে লাগলো শিপ্রা। একটু খোঁচা দিলেই উচ্ছসিত হ'য়ে ওঠেন মিস লাইট। শিপ্রা সে উচ্ছাসকে দমিয়ে রাখতে হুসিয়ার করে দেয়। ওরা বুঝলো, হ্যা এ-মন নিয়ে ওদের কাজ চলবে। হয়ত তৈরী করে নিতে সময় লাগবে কিছুটা। ওরা প্রথম প্রথম বৃটিশের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। মেদিনীপুর-বিহার—কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে গণ-আন্দোলন আজ কী ব্যাপক রূপ লাভ করেছে—কী ভাবে বিপ্লবকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ওরা—মিস লাইটকে সে সব কথা বলে উত্তেজিত করে তোলে। জয়প্রকাশের দল কী ভাবে আত্মগোপন করে বৃটিশের এতদিনের ধাপ্পাবাজীর সমুচিত শাস্তি দিতে প্রস্তুত হয়েছে—ওরা গোপন বৈঠকে মিস লাইটকে ডেকে নিয়ে বলে। কংগ্রেসের সমস্ত বাম-পন্থীরা পরস্পরের সংগে কী ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে বিপ্লবকে ব্যাপকভাবে মূর্ত করে তুলেছে—ওরা বলে আর মিস লাইট শোনে। সবই তাঁর কাছে নতুন। শুনতে শুনতে মিস লাইটের মন ও দেহ শিহরিত হ'য়ে ওঠে। কোথায় কী ভাবে রেল লাইন উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে—কতকগুলি থানা ও গ্রাম দখল করে বিপ্লবীরা কী ভাবে সেখানে অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছে—অরুণা আসফআলী—লোহিয়া এঁরা কী ভাবে বৃটীশের চোখে ধুলো দিয়ে সমস্ত ভারত সফর করে বেড়াচ্ছেন—কী ভাবে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে ওরা সংবাদ আদান প্রদান করে চলেছে—ফরিদপুরের পূর্ণ দাসের দল—যতীন ভট্টাচার্যের দল—অপূর্ব ভট্টাচার্যের দল কী ভাবে সুভাষ-চন্দ্রের সংগে যোগাযোগ রক্ষা কচ্ছে—ভারতের কোন উপসাগর বেয়ে কোন বেলা-ভূমিতে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে নোঙর ফেলবে—ওরা তা বিলিয়ে দেবে বিপ্লবীদের মাঝে। তারপর এক সংগে জ্বলে উঠবে কন্যাকুমারিকা হতে হিমাচল অবধি বিপ্লবের অনল—শেষবারের মত ওরা বৃটিশ রাজশক্তিকে সংঘবদ্ধ ভাবে আঘাত হেনে ভারতের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত বেদনার অবসান ঘটাবে—ওরা বলে আর মিসলাইট শোনে। মিস লাইট অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি যেন এক নতুন জগতে এসে পড়েছেন—নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছেন না। তাঁর চোখে জ্বলে ওঠে বিপ্লবের অগ্নিশিখা—তাঁর দেহ ও মন যেন একসংগে হুঙ্কার দিয়ে উঠতে চায়! শিপ্রা নিজেও বলতে বলতে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। সে বলতে থাকে, "এই মহাপ্রস্তুতিতে দেশকে যাঁরা ভাল-বাসেন—দেশের স্বাধীনতা যাঁরা কামনা করেন, তাঁদের উচিত নয় কী জীবন পণ করে ঝাপিয়ে পড়া?"

মিস লাইট দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেন, "নিশ্চয়ই।" শিপ্রা দু পা এগিয়ে মিস লাইটের একখানা হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আসবে, আসবে মিস লাইট এই মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে?"

মিস লাইট তন্দ্রালু ভাবে উত্তর দেন, "আমার সে যোগ্যতা কোথায় বোন? এভাবে এর পূর্বে কেউ ত আমার দৃষ্টি খুলে দেয়নি।"

শিপ্রা বলে, "যদি আমরা যোগ্য বলে মনে করি—আমরা যদি তোমায় যোগ্য করে তুলি।"

মিস লাইট শিপ্রার একখানা হাত দু'হাত দিয়ে টেনে নিয়ে বলেন, "বল ভাই, আমায় কী করতে হবে?" শিপ্রা বলে, "আপাততঃ তেমন কঠিন দায়িত্ব কিছু তোমায় না দিলেও খুব সতর্ক থাকতে হবে। প্রাণ গেলেও দলের গতিবিধি বা কারোর নাম প্রকাশ করবে না।"

মিস লাইট দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেন, "আজ থেকে নিজেকে

তোমাদের কাজে উৎসর্গ করলাম। তোমরা যা বলবে তাই করবো।"

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বিমলেন্দু গলার স্বর খাটো করে বলতে লাগলো, "আমরা খবর পেয়েছি, আপনাদের ওয়ার্ডে রেঙ্গুণ ও সিঙ্গাপুর রণাঙ্গন থেকে বহু আহতদের আনা হ'চ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি, সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসেছেন। এবং এক অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন—ওরা সুভাষচন্দ্রের জাতীয়বাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিল কিনা- এবং তাঁদের অগ্রগতি সম্পর্কে যত কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন খুব সতর্কতার সংগে বের করে আনতে হবে।"

মিস লাইট এই গুরু দায়িত্ব মাথা পেতে গ্রহণ করেন।

কোন রণাঙ্গন থেকে কোন সৈন্যরা এসেছে ইতিপূর্বে এসম্পর্কে মিস লাইটের মনে কোন কৌতূহলই জাগতো না। তিনি তাঁর নিয়ম বাধা কাজ করে যেতেন। তাছাড়া সরকারী নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে অযথা নিজের কৌতূহলকে কোন দিনই তিনি প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু এখনকার কথা পৃথক। মিস লাইট যেন এক নতুন জগতের মানুষ হ'য়ে উঠেছেন। দেশের মুক্তি আন্দোলনে যে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন —তা সম্পাদনে কতই না তাঁর নিষ্ঠা। একদিন-দু'দিন তিনদিন-চারদিন—এমনিভাবে কতদিন কত আহত সৈনিকদের কাছ থেকে সতর্কতার সংগে গল্পচ্ছলে কত সংবাদই না জেনে নিয়ে গুপ্ত দলের কাছে ব্যাক্ত করেন। একদিনত প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলেন আর একটু হ'লে ইউরোপীয় মেট্রোনের কাছে। ভারতের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত থেকে আনাত একটি আহত সৈনিককে শুশ্রূষা করবার সময় সে আপনা থেকেই বলে ওঠে— তার দেশীয় গাড়োয়ালী ভাষায়, "বিবি সাহেব—ছেড়ে দিন-ছেড়েদিন আমায় আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নেই। ইংরেজের হাতে পড়ে দেশের কী সর্বনাশটাই না করেছি।" মিস লাইট একটু খুঁচিয়ে ফিস ফিস করে বলেন, "কেন, কী হ'য়েছে! সরকারত কত দয়ালু!" সৈন্যটি উত্তেজিত ভাবে বলে, "রেখে দিন, ও শালালোক হারামি আছে। আমাদের সামনে ঠেলে দিয়ে ওরা থাকে পিছনে। কিন্তু যদি আহত না হতাম—তবে কী আর ফিরতাম! সুভাষ বাবুর দলে যোগ দিতাম। আমাদের দলের কতলোক সেখানে গেছে—তারা ইংরেজ তাড়িয়ে তবে ছাড়বে। ওরা বলে, জাপানী লোক আসছে, সব ঝুটা হ্যায়। যারা আসছে তারা সুভাষবাবুর লোক।" মিস লাইট কী যেন বলতে যাবেন, এমন সময় দেখেন মেট্রোন দূর থেকে তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। কড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করলো মিস লাইটকে—"What are you doing so long?"—মিস লাইট নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেন, "He is not allowing the bandage."মেট্রোন রোগীকে এক ধমক দিয়ে ওঠেন। মিস লাইট ব্যাণ্ডেজ শেষ করে ফেলেন। মেট্রোন একটু বক্র দৃষ্টি হেনে চলে যান।

মিস লাইট প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে গুপ্ত দলের কাছে পৌঁছে দেন। পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানীদের কাহিনী শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে যান। সুভাষ চন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এর দুর্জয় অভিযানের কথায় বিস্মিত হ'য়ে ওঠেন। কী ভাল বাসাটাইনা এঁরা দেশকে বেসেছে! ভারতের বাইরে—ভারতের অভ্যন্তরে যাঁরা দেশের স্বাধীনতা অন্দোলনে সর্বস্ব পণ করে আত্মোৎসর্গ করেছেন—তাঁদের প্রতি মিস লাইটের মন কানায় কানায় শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। অন্তরের দেবতার কাছে মিনতি জানিয়ে বলেন, ভগবান, এঁদের অভিযানকে সার্থক করে তোলো। অস্থির চাঞ্চল্যে বার বার নিজের মনের মাঝে একই প্রশ্ন ঘুর পাক খেয়ে বেড়ায়—কবে-কবে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত ভেদকরে সুভাষের দুর্জয় অভিযানকারীরা আসবে দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্ত করতে-দিল্লীর লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হবে—পরাধীনতার তমসানাস করে স্বাধীনতা সূর্য ভাস্কর হ'য়ে দেখা দেবে—!

(আগামী বারে সমাপ্য)

বীর-বন্দনা

[নাটিকা]

মনোজিৎ বসু

★

[রংগমঞ্চের পিছনে একটি নীল রঙের পর্দা। তাহার সম্মুখ-মধ্যভাগে স্থাপিত হইয়াছে বীর-বেদিকা'। শ্বেত-মর্মরে উহা প্রস্তুত। অজস্র পুষ্প-স্তবকে ও মাল্যে তাহা সুশোভিত। বেদিকার উভয়-পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভে প্রদীপ জ্বলিতেছে। শুভ্র-বেশ-পরিহিত সূত্রধারের প্রবেশ। তাহার প্রবেশের সংগে সংগে রংগমঞ্চের আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিবে। নেপথ্যে মৃদু যন্ত্র-সংগীত। 'বীর-বেদিকা'র দিকে তাকাইয়া উদাত্ত কণ্ঠে সূত্রধার বলিতে থাকিবে—]

চরিত্র :—সূত্রধার, কিশোর, কিশোরী, পুরু, আলেক্‌জাণ্ডার, রাণা-প্রতাপ, অনুচরবৃন্দ, রাজপুত-কিশোর ও কিশোরী, প্রতাপাদিত্য, বন্দী পর্তুগীজ, সত্যবান, রুদ্রনারায়ণ, মারাঠা-তরুণবৃন্দ, শিবাজী, সিরাজ, লক্ষ্মীবাঈ, গোরা সৈনিক, নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সৈনিকগণ।

সূত্রধার :—বীরপ্রসবিনী ভারতমাতা! তোমার বীর সন্তানদের লক্ষ কোটি প্রণাম। বন্দনা করি, তোমার সেই তেজস্বী মহাবীর্যবান্ সন্তানদের, যাঁরা সংগ্রাম করেছেন দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। যুগ থেকে যুগান্তরে ভারতের সেই বীরত্ব-গাঁথা কীর্তিত হবে লোকের মুখে মুখে,—প্রতিধ্বনিত হবে দেশ থেকে দেশান্তরে। পরাধীনতার দুর্গ-প্রাচীর আজ ভেঙে খান্ খান্। আজ তাই গ্রামে, নগরে, বন্দরে, পথে শুনি সেই ভারত-বীরের বন্দনা-গান—

[সূত্রধারের প্রস্থান। সেই সংগেই গান গাহিতে গাহিতে কয়েকটি কিশোর-কিশোরীর প্রবেশ। উহাদের পরণে গৈরিক-বেশ। কণ্ঠে শুভ্র-মালিকা। হাতে জাতীয়-পতাকা।]

[গান]

গাহি বন্দনা-গান।
ভকতি-অর্ঘ লইয়ো মোদের
ওগো বীর-সন্তান।
তোমাদের লাগি গৌরবে পথ চলি
ভুবনে ভারত উঠিয়াছে, উজ্বলি—
অন্যায় সনে করিয়াছ রণ
তোমরা বীর্যবান।
স্বাধীনতা লাগি পুরুষ-রমণী
ভারতের যত বীর—
যুগে যুগে তারা হাসিমুখে দিল
বুকের লাল রুধির।
ইতিহাসে রবে তাঁহাদের নাম জানি
গাহিবে ভারত অতীতের বীর-বাণী।
তাঁহাদের কথা স্মরিয়া মোদের
গর্বে নাচিবে প্রাণ॥

[কিশোর-কিশোরীদের প্রস্থান। সূত্রধারের পুনঃপ্রবেশ। দর্শকের দিকে মুখ করিয়া সে বলিবে—]

সূত্রধার :—খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। এই যুগে শুধু যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মই স্থাপিত হয়েছিল তা নয়, রাজনৈতিক জগতেও এ সময় মহা-বিপ্লবের সূচনা হ'য়েছিল। হিন্দুকুশ পর্বত পার হ'য়ে ম্যাসিডোনিয়ার প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেক্‌জাণ্ডার এলেন ভারতবর্ষে। রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক'রে চল্‌লেন তিনি। তিনি দেখলেন ভারতে বীর নেই, তাঁকে বাধা দেবার মতো শক্তি ধরে না ভারতবাসী। গ্রীকবীর তাই মনে মনে সমগ্র ভারত অধিকারের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রইলেন। কিন্তু পঞ্জাবের এক হিন্দু-রাজা আলেক্‌জাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার ক'রলেন না। হাইডাস্‌পিস্ নদীর তীরে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হ'লো। যুদ্ধে হিন্দু-বীর পুরুর অসীম সাহসিকতা দেখে আলেক্‌জাণ্ডার বিস্ময়ে অভিভূত হ'লেন। পুরু পরাজিত হ'লেও মাথা নোয়ালেন না।

[এই সময় রংগমঞ্চ অন্ধকার হইয়া যাইবে। একটু
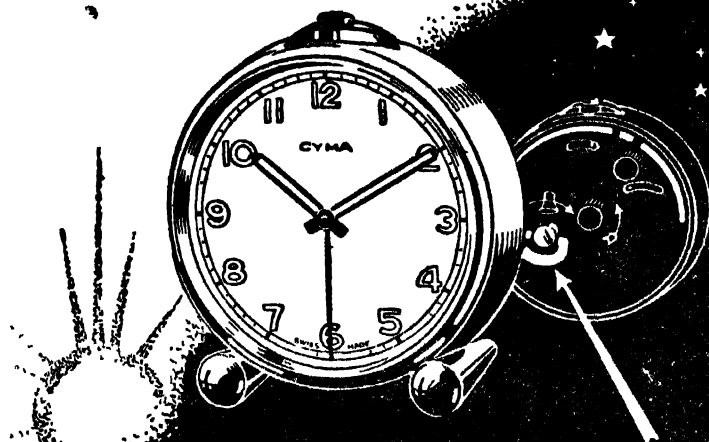
Price Rs. 45/- each

—Sole Agent—

ANGLO-SWISS WATCH Co,

6-7, Dalhousie Square, Calcutta.
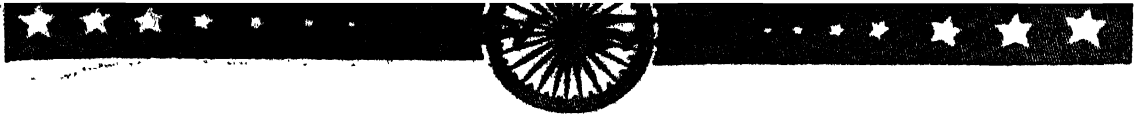
পরেই ধীরে ধীরে আলো জ্বলিয়া উঠিতে দেখা যাইবে দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়াছে। সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট্ আলেক্‌জাণ্ডার। সম্মুখে বন্দী পুরু। তাহার উভয় পার্শ্বে গ্রীক প্রহরী।]

আলেক্‌জাণ্ডার :—এইবার বলুন তো রাজা পুরু, আপনার প্রতি আমার এখন কি রকম ব্যবহার করা উচিত?

পুরু :—[দৃঢ়কণ্ঠে] রাজার সংগে রাজা যেমন ব্যবহার করে, গ্রীক্‌বীর আলেক্‌জাণ্ডার!

আলেক্‌জাণ্ডার :—[স্তম্ভিত] কি বল্‌লেন? রাজার সংগে রাজা যেমন ব্যবহার করে! [আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পুরুকে শৃঙ্খলমুক্ত করিলেন] ধন্য বীর! ধন্য আপনি! জীবনে শুনিনি এমন কথা। দেখিনি এমন মানুষ। আমি স্বীকার করছি ভারতে বীর আছে, আর সে বীর আমারই সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্রতী তুমি, কে তোমায় পরাজিত করবে বন্ধু? গ্রীক্ সম্রাটের হৃদয় জয় করেছ তুমি, বিজয়ী বীর তুমি মুক্ত।

[রংগমঞ্চের আলো আবার নিভিয়া যাইবে। নতুন আলোকে পূর্বের দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সূত্রধার বলিতে থাকিবে—]

সূত্রধার :—আমাদের অতীত ইতিহাস, বীরত্বেরই ইতিহাস। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠার গর্বের ইতিহাস। বীরত্বে, আধিপত্যে, নির্ভীকতায়, তেজস্বিতায়—ভারতের বুকে দেখা দিয়েছে বীর সন্তানেরা। বিদেশীর অন্যায় আক্রমণ, অন্যায় অধিকার তাঁরা সহ্য করেনি কোনদিন। ......ষোড়শ-শতাব্দীর ভারতবর্ষ। বিদেশী মোগলের শাসনে শাসিত সেই ভারতবর্ষ। কিন্তু এ শাসন মানেনি রাজপুত, মাথা নত করতে চায়নি তাঁরা। দুর্ধর্ষ বীর রাজপুত। মোগল সম্রাট্ আকবর তাঁদের সংগে বন্ধুত্ব ক'রলেন। হাত ক'রতে লাগলেন এক এক ক'রে সকলকে। জয়পুর, বিকানীর, যোধপুর...সকলের সংগে পারিবারিক বিবাহ-সূত্রে আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগলো। ধীরে ধীরে প্রায় সমস্ত রাজপুতানাই দিল্লীতে আকবর বাদ্‌শাহের রাজ-সভা আলো ক'রে বস্‌লেন—কিন্তু এলো না শুধু মেবার। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ কোন কৌশলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেননি কোনদিন। আকবরের সংগে বন্ধুত্ব ক'রতে তিনি অস্বীকৃত হলেন। ফলে যুদ্ধ বাধলো, কেবলমাত্র বাইশ হাজার রাজপুত ও ভীলসৈন্য নিয়ে একা প্রতাপ যুদ্ধ করলেন প্রবল পরাক্রান্ত মোগল-সম্রাট্ আকবরের সংগে। হল্‌দীঘাটের গিরিপ্রান্তরে ভীষণ যুদ্ধ হ'লো। অগণিত মোগলসৈন্যের সংগে শেষ পর্যন্ত রাজপুত-যোদ্ধারা পেরে উঠ্‌লেন না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাণাপ্রতাপ ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরে এলেন। আশ্রয় নিলেন অরণ্যে পর্বতে। গোপনে চল্‌তে লাগলো স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি।

[রংগমঞ্চের আলো নিভিয়া যাইবে। ধীরে ধীরে একটা রক্তিম-আলোকরশ্মি ফুটিয়া উঠিবার সংগে সংগে নূতন দৃশ্য চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে। মহারাণা প্রতাপ তাঁহার অনুগামীদের শপথ গ্রহণ করাইতেছেন—]

রাণা প্রতাপ :—আমি মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ, তোমাদের বল্‌ছি—শপথ কর রাজপুত। মায়ের নামে শপথ কর,—চিতোরের স্বাধীনতার জন্য তোমরা প্রয়োজন হ'লে প্রাণ বিসর্জন ক'রতে কুণ্ঠিত হবে না।

অনুগামীরা :—[তরবারি স্পর্শ করিয়া] মায়ের নামে শপথ করছি, প্রয়োজন হ'লে আমরা জন্মভূমি চিতোরের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেব।

রাণা প্রতাপ :—[উৎসাহিত হইয়া] আর, একথাও আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয় ততদিন ভূর্জপত্রে আহার ক'রবে, তৃণশয্যায় শয়ন ক'রবে, বেশভূষা পরিত্যাগ ক'রবে।

অনুগামীরা :—[তরবারি স্পর্শ করিয়া] যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন ভূর্জপত্রে আহার ক'রবো, তৃণশয্যায় শয়ন ক'রবো, বেশভূষা পরিত্যাগ ক'রবো।

রাণা প্রতাপ :—আর বল, বিদেশী মোগলের দাসত্ব কখনো আমরা সহ্য ক'রবো না। বিদেশী শাসনের উদ্যত অসি আমরা খান্ খান্ ক'রে ভেঙে ফেলব। [সংগীতের সুর শোনা যাইবে] কে! কে গায়? কারা আসছে স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে?

জনৈক অনুগামী :—ওরা মহারাণা প্রতাপের অনুগামী রাজপুত কিশোর-কিশোরী। পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলে ওরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে আমাদেরই সাহায্যের জন্য।

[যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত রাজপুত কিশোর-কিশোরীরা সমবেত কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। পর্বতশীর্ষে দাঁড়াইয়া মহারাণা বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন—]

[গান]

স্বাধীনতা যাঁহাদের জন্মের অধিকার
মৃত্যুকে ক'রে তাঁরা তুচ্ছ,
স্বদেশের লাগি দেয় নিজেদের বলিদান
তাঁহাদের শির চির উচ্চ।
পণ কর যতদিন নাহি হয় আমাদের
স্বাধীনতা স্বদেশের মুক্তি
ততদিন কেহ মোরা ভুলিব না মোহজালে
শুনিব না ছলনার যুক্তি।
কোনদিন ভুলে কভু পরিব না অঙ্গে
বিলাসের কোন সাজ-সজ্জা,
পালঙ্ক নাহি পাক্ কিবা ক্ষতি আসে যায়
ধরণীই হবে মোর শয্যা।
ভোজনের কালে যদি নাহি জোটে ব্যঞ্জন
শুধু নুন দিয়ে মাখ অন্ন,
স্বাধীনতাকামী যাঁরা ভোজনের বিলাসিতা
কভু নহে তাঁহাদের জন্য।
মনে রেখ পৃথিবীতে নাহি হেন বলবান
তরুণের গতি করে রুদ্ধ,
দুর্বার তেজে বীর জ্ব'লে ওঠো দিকে দিকে
স্বাধীনতা লাগি কর যুদ্ধ।
ভেঙ্গে ফেল শৃঙ্খল শাসনের নাগপাশ
করো সবে চিরতরে ছিন্ন,
স্বপ্নে কি জাগরণে ভাবিওনা বিপরীত
স্বদেশের স্বাধীনতা ভিন্ন ॥

[দৃশ্য পরিবর্তন। সূত্রধার বলিতে থাকিবে]

সূত্রধার : — মহারাণা প্রতাপ হয় তো সেদিন মোগল-সম্রাটের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বীরত্ব সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিল। হিন্দুস্থানের কীর্তিমান বীর্যবান মহাপুরুষ তিনি। তাঁর উদ্দেশ্যে আজ আমরা স্বাধীন ভারতবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। রাণা প্রতাপের বল আমাদের সঞ্জীবিত করুক, উদ্দীপিত করুক স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায়।

আরাবল্লীর পাহাড়ে পাহাড়ে একদিন যখন মহারাণা প্রতাপ একাকী মোগলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, সেদিন আমাদের এই বাংলাতেও আর এক প্রতাপ, সেই মোগলশক্তির বিরুদ্ধেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রাজা প্রতাপাদিত্য।

"যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ,
নাহি মানে পাত্‌শায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"

পর্তুগীজ জলদস্যু আর দুর্ধর্ষ মগদের অত্যাচারে বাংলা-দেশ তখন জর্জরিত। তাদের হাত থেকে বীর প্রতাপাদিত্য সোনার বাংলাকে রক্ষা করেছিলেন—তিনিই তখন দেশের তরুণদের আহ্বান করে ব'লেছিলেন—

[দৃশ্য পরিবর্তন। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজসভা। বন্দী পর্তুগীজগণ। সভাসদ্ ও কিশোর সত্যবান—]

প্রতাপাদিত্য :—দেশের তরুণদের আজ আহ্বান করছি, তোমরা ওঠো, তোমরা জাগো। সাহাস শক্তিতে দীপ্তিমান্ বাংলার বীর সন্তানেরা তোমরা সংঘবদ্ধ হও—এদেশ থেকে বিদেশীদের নির্মূল কর, পর্তুগীজ জলদস্যুদের তাড়িয়ে দাও।

জনৈক বন্দী পর্তুগীজ (কোয়েল্ হো) :—হাম্‌রা হাপ্‌নার কি করিলো ?

জনৈক ব্যক্তি (রুদ্রনারায়ণ) :—কি করিলো! জানেন মহারাজ, এই দস্যুই আমার কন্যা কল্যাণীর বিবাহ-উৎসব ভেঙে দিয়েছে, নির্বিচারে নারী-শিশুর ওপর অত্যাচার করেছে, হত্যা করেছে—

প্রতাপাদিত্য :—সত্য, কোয়েল্ হো ?

কোয়েল্ হো (পর্তুগীজ দস্যু নায়ক) :—হাম্‌রা কি

করিবে। জমিদার রুদ্রনারায়ণ আমাদের তকা দিলে না, ঔরৎ দিলে না—

সত্যবান :—সাবধান কোয়েল্ হো!

প্রতাপাদিত্য :—কে তুমি যুবক?

রুদ্রনারায়ণ :—মহারাজ প্রতাপ। এই যুবক সত্যবানই আমাদের রক্ষা করেছে, বিবাহ-উৎসবে কল্যাণীর মর্যাদা রক্ষা করেছে এই যুবক। অদ্ভুত শক্তি ও সাহস এই তরুণের। প্রবল পরাক্রান্ত বাংলার সন্তান।

প্রতাপাদিত্য :—ধন্য সত্যবান। তুমিই ধন্য! তোমরাই আমার আশা ভরসার স্থল। নবযুগের বাংলা তোমাদের মতো তরুণের কাছ থেকেই পাবে শক্তি, সাহস। বীরত্বের ও মনুষ্যত্বের আদর্শে বাংলার তরুণদের তোমরা উদ্বুদ্ধ কর, রাজা প্রতাপের শক্তি বৃদ্ধি কর। এই সব নরঘাতী, লোভী, পিশাচ, ফিরিঙ্গী জলদস্যু ও মগ'দের চিরতরে বাংলার মাটি থেকে নির্বাসিত কর—বাংলাকে বাঁচাও, স্বদেশকে বাঁচাও।

[দৃশ্যপরিবর্তন। সূত্রধার বলিতেছে—]

সূত্রধার—মহারাজ প্রতাপের আহ্বানে সেদিন সারা বাংলার তরুণশক্তি জেগে উঠেছিল বীর বিক্রমে। তিনি নিজেই সংগ্রাম ক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা ক'রে নিয়ে গেছেন, অসীম শৌর্যে করেছেন ভীষণ সংগ্রাম—নদীনালায় প্রেরণ করেছেন তাঁর সুশিক্ষিত নৌবাহিনী। বাংলাদেশ নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার থেকে, অসভ্য মগদের নির্মম পীড়ন থেকে। বাংলার বীর রাজা প্রতাপাদিত্যকে তাই আজ আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। বাংলার মহা গৌরব তিনি। তারপর কেটে গেছে বহু দিন, বহু মাস, বহু বৎসর বিদেশী মোগলদের রাজত্ব তখনও চলছে ভারতবর্ষে। মোগল-ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব। মহাবলশালী, তেজস্বী, নির্ভীক সম্রাট্। তাঁর ভয়ে সমগ্র ভারত প্রকম্পিত। কিন্তু আর সকলে বশ্যতা স্বীকার করলেও স্বাধীনচেতা মহারাষ্ট্রনায়ক ছত্রপতি শিবাজী তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেননি। মুক্তিকামী বীর তিনি, কে তাঁকে ধরে রাখবে কারাগারে, কে তাঁকে বেঁধে রাখবে শৃঙ্খলে? সহস্র প্রহরীবেষ্টিত মোগল কারাগার থেকে মিষ্টান্নের ঝুড়িতে তাঁর অন্তর্ধান এবং কয় মাস পরে সন্ন্যাসীর বেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি বীরত্বের পরিচায়ক। সমগ্র মারাঠাজাতির অন্তরে তিনি যে অপূর্ব জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন, আজও তা নিভে যায়নি ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের মতো। আজও যেন আকাশে বাতাসে শুনতে পাই মহাবীর শিবাজীর সেই রণনাদ—"হর হর মহাদেও, হর হর মহাদেও—

[দৃশ্য পরিবর্তন। একটি রক্তিম আলো চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার সংগে সংগে দেখা যাইবে—উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে একদল মারাঠা তরুণ নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিতেছে। গানের সংগে তাহারা নাচিবে। তাহাদের নৃত্যের ভংগীতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, মৃত্যুকে তাহারা ভয় পায়না, তাহারা যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রস্তুত—]

[গান]

(হর হর মহাদেও! হর হর মহাদেও !!)
জাগো মারাঠা ভাই, জাগো মারাঠা ভাই—
মুক্তির ডাক এসেছে আজিকে—
দেরী নাই, দেরী নাই।
আমরা দেশের বীর সৈনিক মৃত্যু করি না ভয়
সংগ্রামে দেশ করিব রক্ষা, আমাদেরী হবে জয়।
মুক্ত আলোতে, মুক্ত বায়ুতে বাঁচিবারে মোরা চাই।
(হর হর মহাদেও, হর হর মহাদেও !!)
সমুখ পানে এগিয়ে চলো
থাক্ না পিছন প'ড়ে—
নতুন আলোর পরশ পেয়ে
আঁধার যাবে স'রে।
বিঘ্ন বিপদ মানব না ভাই, রাখব দেশের মান
এই স্বদেশের মুক্তি লাগি মোদের অভিযান।
দেশের নেতা বীর শিবাজীর বিজয়-গীতি গাই ॥
(হর হর মহাদেও, হর হর মহাদেও ॥)

[শিবাজীর প্রবেশ]

শিবাজী—তোমরা তবে প্রস্তুত?

সকলে

[তরবারি দ্বারা অভিবাদন করিয়া] প্রস্তুত মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজী!

শিবাজী:—বেশ। তবে আর দেরী নয়। এগিয়ে চলো মারাঠার নির্ভীক তরুণ দল, এগিয়ে চলো চাষী, মজুর পাহাড়িয়া ভাই সব। তোমাদের চলার ছন্দে বেজে উঠুক মহাকালের প্রলয়-ডম্বরু। জীবন মরণ পণ আমাদের। বিদেশী মোগল-শাসনের অবসান ঘটাতে আজ আমাদের বিরাট অভিযান। তোমরা সকলে যদি সংঘবদ্ধ হও, তা'হলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তোমাদের পরাস্ত ক'রতে পারবেনা। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্যে-প্রাণ দিতে প্রস্তুত হও বীর সব।

সকলে:—আমরা প্রস্তুত। শিবাজীর নির্দেশ আমরা বর্ণে বর্ণে পালন ক'রব।

শিবাজী:—ধন্য। ধন্য মারাঠার সন্তান। তোমাদেরি জন্যে আমি এতকাল ধ'রে শক্তি সঞ্চয় ক'রে এসেছি। তোমাদেরি জন্যে বহন ক'রে এসেছি 'ভাগোয়া জেন্দা' —মারাঠার জাতীয় পতাকা। ঘরে ঘরে উড়িয়ে দাও এই গৈরিক পতাকা—তাকে নমস্কার ক'রে অগ্রসর হও শত্রুর সংগে যুদ্ধ ক'রতে। মনে রেখো ক্রীত-দাসত্বের মত বড় পাপ এ-সংসারে নেই। কিন্তু এই সংগে এ কথাও মনে রেখো, মোগল আমাদের শত্রু হ'লেও তাদের ধর্মকে আমরা অবহেলা ক'রবো না; তাদের কোরাণ তাদের মস্‌জিদের সংগে আমাদের যুদ্ধ নয়—আমাদের সংগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যবাদের সংগে। মনে রেখো, মোগলরমণী আমাদের জননী ও ভগ্নীরই তুল্য। মারাঠারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বটে, কিন্তু ধর্ম ও নারীর সম্মান তারা রক্ষা ক'রতে জানে। জয়, মারাঠার জয়, জয় মারাঠার জয়।

সকলে:—জয় মারাঠার জয়, জয় মারাঠার জয়। মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজীর জয়।

[দৃশ্য পরিবর্তন। সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার:—বীর শিবাজী সমগ্র ভারতের গৌরব। তাঁকে আমাদের সহস্র প্রণাম। তাঁর পরে আবর্তিত হয়েছে কত শীত কত গ্রীষ্ম, কত বসন্ত। কত পতন-অভ্যুত্থানের ইতিহাস রচিত হয়েছে সেই সংগে। মোগলদের আধিপত্য হয়ে এসেছে সংকুচিত। জেগে উঠেছে মহারাষ্ট্র, জেগেছে পাঞ্জাব। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে আমরা পেয়েছি মহাবীর বাজীরাও আর শিখ নেতা গুরু গোবিন্দ সিং-কে। বিদেশীদের আক্রমণকে তাঁরা করেছেন প্রতিহত। পারস্য সম্রাট্ নাদির শাহের আক্রমণে তখন ভারতবর্ষে ভয়াবহ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হ'লো। স্ত্রীপুত্র নির্বিশেষে রাজধানী দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী নিধনের মধ্যে সেই বর্বর-পুরুষ কি আনন্দ সেদিন পেয়েছিল তা জানিনা, কিন্তু মহারাষ্ট্র-নায়ক বীর বাজীরাও অমিত-বিক্রমে তাকে আক্রমণ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষ বিদেশী অত্যাচার নীরবে সহ্য করে না ও করবেনা। বাজীরাওয়ের শক্তি ও বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষে মারাঠারা বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রে দেশে সুখ ও শান্তির জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। কিন্তু দেশের সুখ, দেশের শান্তি রইলো কোথায়। বাণিজ্যের ছল ক'রে ভারতে এলো—বিদেশী পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ। ধীরে ধীরে চল্‌লো শোষণ,—শাসনের রূপ দেখা দিল তারপর, নবাব-সিরাজদ্দৌলার আমলে। মীরজাফর ও ক্লাইভের ষড়যন্ত্রে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীন ভারতের শেষ সূর্য অস্তমিত হ'লো।

[দৃশ্যপরিবর্তন। নীলাভ আলোর মধ্যে দেখা গেল দুইটি কবর। লাল আলো গিয়ে পড়িল একটি কবরের উপর। তাহার মধ্য হইতে ছিন্ন মলিন বেশ ছায়া মূর্তির মত আবির্ভূত হইলেন, নবাব সিরাজ। নেপথ্য হইতে একটি ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

নেপথ্য কিশোর:—কে! কে তুমি? কে তুমি কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এলে এই নিশীথ-রাত্রে?

[কিশোরের প্রবেশ]—

কিশোর:—[বিস্মিত কণ্ঠে] সিরাজ? বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা?

সিরাজ:—হ্যাঁ। আমিই সেই হতভাগা,—মহম্মদী-বেগ-

নহত সিরাজের প্রেতাত্মা। আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ না তুমি? কে তুমি নির্ভীক-বালক?

কিশোর:—আমি বাংলার কিশোর। তোমার কবরে একান্ত গোপনে, আমাদের অন্তরের ফুল চন্দন নিবেদন ক'রতে এসেছিলাম। তোমাকে নমস্কার। তোমাকে কুর্ণিশ।

সিরাজ:—বিস্মিত ক'রলে বালক। পলাশীর যুদ্ধে কোথায় ছিলে তোমরা? কোথায় ছিল এই তরুণ শক্তি, দেশনেতার জন্যে এই অকপট ভক্তি? তাইতো পারিনি আমি কুটিল মীরজাফরের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ ক'রে দিতে, তাইতো পারিনি আমি বর্বর ক্লাইভের শঠতা, প্রবঞ্চনার পরিসমাপ্তি ক'রতে। বিশ্বাসঘাতকতার বিষনিঃশ্বাসে বাংলার মাটি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, পরাধীনতার শৃঙ্খল পরলো ভারতবাসী। সেই বেদনায় আজও আমি কবরের অন্তরালে নিশ্চিন্তমনে থাকতে পারিনা, অশান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াই ভারতের আকাশে বাতাসে, নিশীথ রাত্রে সুপ্ত কিশোর, ঘুমন্ত তরুণের কানে কানে বলি—"ওরে তোরা জাগ্, তোরা জাগ্। বিদেশী জাদুকরের মোহে আর তোরা অচেতন হ'য়ে থাকিসনা। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে এক সাথে আবার তোরা সংগ্রাম কর, বিদেশী বণিকদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দে; পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত কর, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত কর—

[দৃশ্য পরিবর্তন। সূত্রধারের প্রবেশ]—

সূত্রধার—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চেয়েছিলেন মীর-কাশিম। কিন্তু দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায়, ইংরাজদের সম্মিলিত চক্রান্তে তাঁর সকল চেষ্টা, সকল সংগ্রাম ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল। মীরকাশিমের রাজত্বেই অস্তগামী স্বাধীনতা সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও চিরতরে মিলিয়ে গেল। সারা দেশ পরাধীনতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'লো। একশো বছর পরে দেখা দিল নতুন ক'রে সংগ্রামের প্রস্তুতি, শোনা গেল বিদ্রোহের মহা-আহ্বান। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সীপাহী বিদ্রোহের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসে। বিদ্রোহী বীর নানাসাহেব, আজিমুল্লা, তাঁতীয়া টোপী, বাহাদুর শাহ্, বীরাঙ্গনা ঝাঁন্সির-রাণী-লক্ষ্মীবাঈ সকলকে তাই আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় সারা ভারতবর্ষে ইংরাজের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিদ্বেষানল জ্বলে উঠেছিল, তাই হ'লো স্বাধীনতা লাভের প্রথম চেষ্টার অপূর্ব প্রকাশ। 'মেরি ঝাঁসি নেহি দেউংগী' ব'লতে ব'লতে —ভারতরমণী লক্ষ্মীবাঈ অগণিত ইংরাজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ক'রেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। বীর প্রসবিনী ভারত মাতার নাম সার্থক হ'য়েছিল সেদিন।

[দৃশ্য পরিবর্তন। রঙ্গমঞ্চের আলো নিভিয়া যাইবার সংগে সংগে বোমা বিদীর্ণের শব্দ শোনা যাইবে। রক্তিম-আলোক ফুটিয়া উঠিতে দেখা যাইবে, যুদ্ধ-সাজে সজ্জিতা লক্ষ্মীবাঈ তরবারি হস্তে রণ-নৃত্যে মাতিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে ইংরাজের প্রতীক হিসাবে দুই-তিন জন গোরা সৈনিক বন্দুক হাতে রণ-নৃত্য করিতেছে। নেপথ্যের সংগীতের ভাব লইয়া এই নৃত্যটি রচিত হইবে। সংগীতের সংগে মৃদু যন্ত্র-সংগীত বাজিয়া একটা অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিবে—

(লক্ষ্মীবাঈয়ের মনের ভাব)

[নেপথ্য-সংগীত]—দূরে যাও ইংরাজ, দূরে যাও ইংরাজ,
অগ্নির মত উঠেছে জ্বলিয়া
ভারত-ললনা আজ।
দেব না, দেব না, ঝাঁসী।
বাজিছে মরণ-বাঁশী,—
এ সমর-অনলে কেন গো আসিয়া
প্রাণ দিবে বলো আজ?
দূরে যাও ইংরাজ, দূরে যাও ইংরাজ॥

(গোরা-সৈনিকদের মনের ভাব)—সাবধান! সাবধান!
অগ্নি-অস্ত্র করিবে তোমার তরবারি খান্ খান্।
ঝাঁন্সী আমরা চাই—
জানি, শকতি তোমার নাই
রক্ষা করিতে রাজ্য তোমার
যত পারো রণ-সাজ।

(লক্ষ্মীবাঈয়ের মনোভাব)—দূরে যাও ইংরাজ! দূরে যাও ইংরাজ!!

দেব না, দেব না, ঝাঁসী
তীর্থ আমার, স্বর্গ আমার
তারে আমি ভালোবাসি।
পরাধীন হ'য়ে থাকিবনা কভু বিদেশী বণিক রাজ।
দূরে যাও ইংরাজ! দূরে যাও ইংরাজ॥

[নৃত্য শেষে গোরা-সৈনিকগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়নের ভংগীতে প্রস্থান করিবে। সংগে সংগে দৃশ্য পরিবর্তিত হইলে দেখা যাইবে, সূত্রধার বলিতেছে—

সূত্রধার :—প্রথম-যুদ্ধে সুশিক্ষিত ইংরাজ-সৈন্যেরা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে পরাভব স্বীকার ক'রে পলায়ন করেছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে তাদেরই জয় হয়েছিল। কিন্তু যে বীরত্ব, যে তেজস্বিতা সেদিনের সেই বীরঙ্গনার মধ্যে ফুটে উঠেছিল, তা দেখে ইংরাজ সমর-অধিনায়কেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ভারত-রমণীর শৌর্যের কথা তাঁরা মুক্তঃকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন সেদিনের সেই সমর প্রাঙ্গণে।

তারপর, কেটে গেছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। স্বাধীনতার নবীন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে ভারতবাসী পরাধীন দেশে জেগেছে মুক্তির উন্মাদনা। অহিংস-গণবিপ্লব, সহিংস জন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে-বন্দরে। কত শহীদের রক্তে রাংগা হ'য়েছে ভারতের শ্যামল প্রান্তর, কত বীরের আবির্ভাব হয়েছে এই দেশে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই বীর-যোদ্ধাদের প্রণাম জানাই উদ্দেশ্যে। প্রণাম করি দেশগৌরব, বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজী, আমাদের প্রিয় সুভাষচন্দ্রকে। সুচতুর ইংরাজ প্রহরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে, বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে সুদূর প্রাচ্যে উপস্থিত হয়ে যিনি গড়েছিলেন আজাদ হিন্দ্-ফৌজ, হিন্দু মুসলমান শিখ, ভারতের সকল যোদ্ধাকে সম্মিলিত ক'রে যিনি যুদ্ধ করেছিলেন,—স্বদেশের মুক্তিলাভের জন্য, সেই বীর-যোদ্ধা জনগণমন-অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রকে।

[দৃশ্য পরিবর্তন। যুদ্ধ-বেশে আজাদ-হিন্দ্ সৈনিকদল। তাহাদের পুরোভাগে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয়-পতাকা হস্তে জনৈক সেনা। নেপথ্যে—'কদম কদম বাড়ায়ে যা'—সংগীতের বাজনা। সেই পরিবেশে রণসাজে সজ্জিত সুভাষচন্দ্র জলন্ত-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিতেছেন—

সুভাষচন্দ্র :—আমাকে তোমরা রক্ত দাও। আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো। বুকের রক্ত দিয়ে ভারতের মুক্তিলাভের জন্যে প্রস্তুত হও ভারতের বীর সৈনিকদল। ঐ দেখ—'দূরে বহুদূরে, ঐ নদী ছাড়িয়ে, ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়িয়ে, ঐ পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে আমদের দেশ। ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করেছি, ঐ দেশে আমরা আবার ফিরে চলেছি। শোন, ভারত আমাদের ডাকছে। ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে, আটত্রিশ-কোটি আশীলক্ষ দেশবাসী আমাদের আহ্বান ক'রছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাকছে। ওঠ, নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের নেই। অস্ত্র হাতে নাও। দেখ, যে-পথ আমাদের পথপ্রদর্শকেরা তৈরী ক'রে গিয়েছেন, সেই পথ তোমাদের সামনে। আমরা সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হবো। শত্রুসেনার মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নেবো। ভগবান যদি চান, আমরা শহীদের মত মৃত্যু বরণ ক'রব। যে-পথ দিয়ে আমাদের সেনাদল দিল্লীতে পৌছবে, শেষশয্যা গ্রহণ করবার সময় সেই পথ চুম্বন ক'রে নেব। দিল্লীর পথ, স্বাধীনতার পথ।—চলো দিল্লী। জয় হিন্দ্।

সৈনিকগণ—জয় হিন্দ্! নেতাজী কি জয়। ভারত মাতা কি জয়। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ। স্বাধীনতা-সংগ্রাম অক্ষয় হোক।

[দৃশ্য পরিবর্তন। সূত্রধারকে মধ্যে রাখিয়া কিশোর কিশোরী, তরুণ-তরুণী, নর-নারীর প্রবেশ।—দক্ষিণে পুরুষগণ, মধ্যে সূত্রধার ও বামে নারীগণ দাঁড়াইবে। পুরুষগণের পরিধানে গৈরিক বেশ, সূত্রধারের শুভ্র ও নারীদের সবুজ-সজ্জা। পশ্চাতে উচ্চ বীর-বেদিকা। সূত্রধার বলিতে আরম্ভ করিবে—

সূত্রধার—অক্ষয় হয়েছে তোমাদের সংগ্রাম; বুকের রক্ত দিয়ে জয়লাভ করেছে ভারতের স্বাধীনতাকামী বীর-যোদ্ধারা। স্বাধীনতার নবসূর্য উদিত হয়েছে ভারতের

মুক্ত-গগনে। আজ তোমরা কোথায়, হে বীর সন্তানেরা? তোমাদের নতুন ক'রে অভ্যুদয় হোক, স্বাধীন ভারতের সন্তান-সন্ততির মধ্যে। বীর্যশালী, শক্তিশালী হোক্, ভারতের এই নতুন মানুষেরা। মুক্তকণ্ঠে তারা যেন ব'লতে পারে—

[নারী ও পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠ-সংগীত]

[গান]

জয়তু ভারত, জয়তু ভারত
আমরা ভারতবাসী
স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা
অক্ষয় অবিনাশী।
ধমনীতে বয় বীরের রক্ত,
আমরা বীর যে স্বদেশভক্ত,
স্বদেশের ভিৎ করিব শক্ত
সকল শত্রু নাশি।
দুর্বল জনে রক্ষা করিয়া
আমরা গড়িব দেশ,
সোনার-ভারতে রহিবেনা আর
হিংসা-কলহ-দ্বেষ।
মিলনের গান গাহিব সকলে
এই সে জাতীয়-পতাকার তলে,
মিলিব আমরা ধনী ও গরীব
বণিক-মজুর-চাষী॥

"তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, – – – – –

মহামানব মহাত্মা গান্ধী

মঞ্চসম্রাজ্ঞী সরযূবালা

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য যখন রূপ-মঞ্চ পত্রিকা থেকে আমন্ত্রণ এলো—বার বারই আমার মনের মাঝে ঐ একই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো—আমার কী অধিকার আছে এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার ?—নেই কোন অধিকার। আমি একজন নগণ্য নারী—এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার যোগ্যতাই বা আমার কোথায়! কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমার এ ধারণাত সম্পূর্ণ ভুল। যিনি মহাত্মা—তাঁর কাছেত যোগ্য অযোগ্যের বিচার নেই। তিনি সকলকেই বুকে টেনে নেন—তিনি নিজেই যে সকলকে স্বাধীকারের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তোলেন। প্রকৃতির পুষ্পসম্ভারের শ্রেণীবিভাগ মানুষই করে থাকে—তারাই যোগতা অযোগ্যতা বিচার করে দেবতার পায়ে উৎসর্গীকৃতের অধিকার দেয়। কিন্তু প্রকৃতির চোখেত কোন তারতম্য নেই—তার বিধানে সমস্ত পুষ্পরাজিরই দেবতার পায়ে ঝরে পড়বার অধিকার আছে। তাই আমারই বা কেন অধিকার থাকবেনা মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার? এই মহামানবের প্রতি আমার মনের ঐকান্তিকতা দিয়েই আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি—প্রণাম জানাচ্ছি। রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে এর পূর্বে রোজ অন্ততঃ দুপাতা করে পড়তাম আর ভাবতাম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের মত মুর্খ জ্ঞানহীনাদের বুঝবার জন্য এইসব মূল্যবান উপদেশগুলি কত সহজ ও সরলভাবেই না বলে গেছেন! তখন প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যেতাম। মহাত্মা গান্ধীকে তখনও ভাল করে জানিনি, বুঝিনি—যেটুকু বুঝেছিলাম, দেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতা ছাড়া অন্য কোন রূপে তিনি তখনও আমার মনে স্থান লাভ করেননি। যুদ্ধ লাগার সংগে সংগে তিনি যেন নতুন রূপে আমার মনে স্থান লাভ করতে লাগলেন। যতই শুনি তাঁর কথা, ততই শুনতে ইচ্ছা হয়—যতই জানতে লাগলাম তাঁর কথা—তাঁকে জানবার আগ্রহ ততই যেন বেড়ে যেতে লাগলো! এই মহাপুরুষের দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে কী অসম্ভব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। হৃদয়ের জিনিষ শুধু হৃদয়ের কাছেই ব্যক্ত করা চলে। প্রত্যহ দৈনিকের পাতা থেকে মহাত্মার প্রার্থনা-সভার বাণী পাঠ করতে লাগলাম। তাঁর প্রার্থনা সভার-বাণী দৈনিকের হরফের ভিতরই নিবদ্ধ থাকে না - সে বাণী শব্দায়িত হ'য়ে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের মতই অন্তরে প্রবেশ করে সত্যের নির্দেশ দেয়। কথামৃতের বাণীর মতই তা সহজ ও সরল। তাই এই দুই মহাপুরুষ পাশাপাশি আমার মনে বিরাজ করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালে, লেক ময়দানে মহাত্মাজীকে দর্শনলাভ করে আমি ধন্য হই। ৩০ শে জানুয়ারী, শুক্রবার, রেডিওতে ভারতবর্ষ নাটক অভিনীত হ'বার কথা ছিল। আমিও রেডিও স্টেশনে গিয়েছিলাম উক্ত অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে—অভিনয় আরম্ভ হ'তে কিছুটা বিলম্ব আছে। নাট্য-প্রযোজক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের নির্দেশানুসারে আমি আমার অভিনয়াংশ বার বার দেখে নিচ্ছি, কিছুপরে বীরেন বাবু হন্তদন্ত অবস্থায় এসে আমাকে বল্লেন, 'অভিনয় হবে না। সর্বনাশ হয়েছে। জাতির ভাগ্যাকাশে এমন সর্বনাশ আর হয়নি।' আমি কিছুই বুঝতে পারলুমনা। হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তিনি ভগ্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'জাতির ভাগ্যবিধাতা আর নেই—জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন।' আমি কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারলুমনা। কিন্তু বীরেনবাবুর বার বার ঐ একই উত্তর এবং তাঁর মানসিক অবস্থা আমার সে-অবিশ্বাসের বাঁধ ভেঙ্গে দিল! এই নির্মম সত্যকে মাথা পেতে নিতে হ'লো।

নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,

আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারবো না— এ অবস্থা বুঝিয়েও বলা যায়না— আমার মত কত নর-নারীইকে না এই নির্মম আঘাত বুক পেতে নিতে হয়েছে। তবে শুধু এইটুকু বলতে পারি—অনেকদিন পূর্বে আমার একটি ছেলে মারা যায় এবং সে যখন মারা যায় আমার মনে হয়েছিল—আমার একটা পাঁজর ভেঙ্গে গেল। আর এদিনও আমার মনের অবস্থা ঠিক অনুরূপ হয়েছিল। যে মা পুত্র হারিয়েছেন, তিনিই বুঝতে পারবেন, পুত্রশোকের কী অসহ্য যাতনা! বেতার কেন্দ্র থেকে বাড়ী ফেরার পথে দেখলাম, দোকানপাট তেমনি খোলা রয়েছে—যানবাহন ও লোকচলাচল অব্যাহত গতিতেই চলছে—বুঝলাম, এই নিদারুণ দুঃসংবাদ তখনও এঁরা পায়নি। এই নির্মম সংবাদ যখন এঁদের কানে আসবে—তখন আমারই মত এদের হৃদয় ভেঙ্গে পড়বে—এদের আকুল আর্তনাদ মহা-নগরীর সমস্ত কোলাহলকে ছাপিয়ে দিগন্তকে আলোড়িত করে তুলবে।

বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলাম গাড়ী থেকে যেন নামতে পাচ্ছিনা—গাড়ীর শব্দশুনে আমার মেয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে সে জিজ্ঞাসা করলো, "মা, যা শুনছি তা কী সত্যি ?' আমি ভাঙ্গা গলায় অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ মা, সত্যি।" তারপর তার হাত ধরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রবিবার পর্যন্ত নির্জলা উপবাসে কোথা দিয়ে কেটে গেল, বুঝতে পারলাম না।

মহাত্মার বাণীগুলি পাঠ করা আমার দৈনন্দিন কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। সেই বাণীর মর্মোদ্ধার করে যে নির্দেশ পাই, নিজেকে সেই ভাবেই চালিয়ে নিতে চেষ্টা করি। জানিনা, আমার এই চেষ্টা সফল হবে কি না। যদি আংশিক সফলতাও লাভ করি, আমি বুঝবো, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার যোগ্যতা আমি লাভ করেছি।

সেদিন ব্যারাকপুর গিয়েছিলাম—বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মর্ম-কথা বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা পাঠ করে মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পুরুষ ও মেয়েদের এরূপ একক সমাবেশ জীবনে আমি আর কখনও দেখিনি। তাম্রপাত্রে রক্ষিত মহাত্মার পুণ্য চিতাভস্ম যখন পুণ্যসলিলা জাহ্নবীবক্ষে নিমজ্জিত করা হ'লো, আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পালুম না ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম—আমার সে কান্নার সংগে আরো কতজনই না যোগ দিল! আমার দিদি আমার সংগে ছিলেন—তিনি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন! কিন্তু কে কাকে আজ সান্ত্বনা দেবে—কেই বা শুনবে সে সান্ত্বনা। আজ যে সবার হৃদয়ই এক মহাশোকে উদ্বেলিত—সবার হৃদয়েই একই ঝর বইছে। বাড়ীতে ফিরবার সময় পথে দেখলাম, দীন ভিখারীও কাঁদছে আর গাইছে—

"জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতা রাম॥"

প্রবীণ অভিনেতা রবীন্দ্র মোহন রায়

(রঙমহল নাট্যমঞ্চ, কলিকাতা)

৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার, দিবা অবসানের সংগে সংগে নগরের পথে রোল উঠলো—দারুণ রোল—'হত গান্ধীজী—হত গান্ধীজী!' বিশ্বাস হলোনা, ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম পথে—দেখি অগণিত লোক অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে নগরের পথ চলেছে—দোকানপসারা যে যার দোকানপাট বন্ধ করছে—জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। ধীরে ধীরে নগরীর পথ অন্ধকার হয়ে এল—পথের আলোগুলিও যেন স্তিমিত। চারিদিকে জমাট অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। যে মহাপুরুষ শত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে, নিজের অমূল্য জীবনকে বিপন্ন করে বন্ধুর পথে নির্ভীক চিত্তে আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে আমাদের স্বাধীনতার দ্বারে পৌঁছে দিলেন—জাতির কলঙ্ক এক নর-পশু জাতির সেই পথ প্রদর্শককে করলে নির্মমভাবে হত্যা। যার ফলে জাতিকে বিরাট বিপর্যয়ের মাঝে ফেলে ভারতের

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ

ভাগ্যবিধাতা মহামানব, সত্যদ্রষ্টা ঋষি, যুগাবতার—তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অবিনশ্বর আত্মা নিয়ে চলে গেলেন অমৃত লোকে।

"ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে
তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।"

বিদ্বেষ বিষ তো নাশ হলো না। অহিংসা মন্ত্রের পূজারী—হিংসার অনলেই তাঁর জীবন আহুতি দিলেন। সমগ্র বিশ্বের ভয়াবহ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে—স্বজাতির ব্যাভিচারে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অতিষ্ঠ—নিজেরই তাঁর আর বাঁচবার ইচ্ছা ছিল না। সমগ্র বিশ্বে প্রেমের বাণী, মিলনের বাণী, অহিংসার বাণী প্রচার করে, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাই তিনি চলে গেলেন কৈবল্যধামে। আর তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য রেখে গেলেন তাঁর বাণী, তাঁর আদর্শ, তাঁর তিতিক্ষা, তাঁর ত্যাগ, তাঁর কীর্তি।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায়
কীর্তিরে তোমার বারংবার।"

হে মানব শ্রেষ্ঠ! হে নবভারতের যিশুখৃষ্ট! স্বার্থলেশহীন মানব হিতে তুমি তোমার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছ—তোমাকে প্রণাম—শত সহস্র লক্ষ কোটি প্রণাম। হে মানব দেহধারী মহান আত্মা, আশীর্বাদ কর যেন তোমার মহান বাণী আমাদের জীবনের সম্বল হয়—যেন তোমার মহান্ আদর্শকে সামনে রেখে আমরা আমাদের বন্ধুর পথে চলতে পারি। যেন তোমার প্রেমের পতাকা হস্তে আমরা বিশ্বে ভ্রাতৃ প্রেমের মিলন বেদী রচনা করতে পারি। আশীর্বাদ কর দেব আশীর্বাদ কর যেন তোমার পতাকা বহন করবার শক্তি আমরা পাই—

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥"

বিংশ শতাব্দীর ভগবান

চিত্র-পরিচালক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় একটা আধা-আধ্যাত্মিক গানের সংগে পরিচয় হয়েছিল; তার প্রথম দু'টো পংক্তি আজও ভুলতে পারিনি:—

জগৎখানা নটবরের যেন নাট্য-মঞ্চ।
সে যে একা সেজে নানা সাজে
ভাঙে গড়ে এ-প্রপঞ্চ॥

সেদিন সন্ধ্যায় অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে যখন বর্তমান জগতের জীবন নাট্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা—মহাত্মা গান্ধীজীর—অতি নাটকীয় তিরোধানের কথা কানে এল, তখন ঐ দু'টি পংক্তিই মনে পড়ল প্রথম।—দু'দিন আগেও মহাত্মাজী বলেছিলেন, তিনি ১২০ কি ১৩০ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবেন। তাঁর কথা আমি মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাস না করার কোনো সংগত কারণ ছিলনা। তাঁর মত কর্মযোগী ঋষির পক্ষে ইচ্ছামত বেঁচে থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। আবার দু'দিন পরে যখন শুনলুম, তিনি কোনও এক আততায়ীর গুলীতে প্রাণ দিয়েছেন, তখনও তা অবিশ্বাস ক'রতে পারলুমনা ঠিক সমানই কারণে। প্রার্থনা সভায় তাঁর ওপর বোমা ফেলা হ'ল; তবু তিনি বললেন—প্রার্থনাতে যোগ দিতে যারা আসবে, তাদের কোনও মতে search করা চলবেনা—আসুক তারা বোমা এবং পিস্তল-বন্দুক নিয়ে। কাজেই আততায়ীর হাতে মৃত্যু তিনি বরণ ক'রেই নিয়েছেন। তিনি প্রমাণ ক'রে গেছেন যে, তিনি ইচ্ছা মৃত্যুই বরণ করলেন।

জগৎ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল যে, মহাত্মাজীর মত মহামানবকেও মারতে লোকের হাত ওঠে। ক্রুশবিদ্ধ যীশু বলেছিলেন, "ভগবান্, ওদের ক্ষমা কর—ওরা জানেনা, ওরা কি অপরাধ করছে।" মহাত্মার মত মহামানবকেই তো তাঁর দেশের এবং ধর্মের লোক ভুল বুঝে মারবে—বিধর্মীর হাতে প্রাণ গেলেই সেইটেই হ'ত বিস্ময়ের কথা। এই সেদিন "মাসিকবসুমতী"র পাতায় দেখলুম, কে-একজন

দেখা যেন সদা পাই

লিখেছেন, মহাত্মাজী নাকি গত জন্মে ছিলেন সম্রাট আলমগীর—তিনি এ-জন্মে হিন্দুর ঘরে জন্মেছেন হিন্দুরই নিধনের জন্মে।—কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। যে লোক অপরের অপরাধে নিজে উপবাস ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করে, সে লোক যে নিজের ধর্মাবলম্বীর ক্ষুদ্রতম অপরাধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীর শত অপরাধকেও ক্ষমার চক্ষে দেখবে, এ-তো জানা কথা। তিনি যে মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন।

গান্ধীজীর নশ্বর দেহ আর ইহজগতে নেই, কিন্তু গান্ধীজী আজও জগতে আছেন এবং যতদিন জগৎ আছে, ততদিন থাকবেন।—সেক্সপীয়রের "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের সমালোচনা-প্রসংগে একজন বলেছেন, "জীবন্ত সীজারের চেয়ে মৃত সীজার ঢের বেশী শক্তিমান।" গান্ধীজীর সম্বন্ধেও সমান কথাই খাটবে। গান্ধীজীর দেহাতীত আত্মার প্রভাব দেহধারী গান্ধী থেকে যে কত বেশী, সে কথা যত দিন যাবে, ততই আমরা বেশী ক'রে উপলব্ধি করব। গান্ধীজী হচ্ছেন—বিংশ শতাব্দীর ভগবান।

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ

সুধী প্রধান, সংগঠন-সম্পাদক, শিল্পীসংঘ

কথাটা আমার ভাল লাগেনি। সর্দার প্যাটেলের রেডিও প্রথম থেকে এই "মহাপ্রয়াণ" সুরু করলে এবং অন্যরা অনেকে বুঝে এবং অধিকাংশ না বুঝে পুনরাবৃত্তি করলেও কথাটা আমি মানতে পারিনা। কেন তার কতগুলি ব্যক্তিগত কথা আপনাদের বলব—কারণ, কথাগুলো আর ব্যক্তিগত নেই। আপনাদের কাগজ যাদের নিয়ে লেখে—সেই শিল্পীদের অনেকের কাছে অনেক আগে সে-গুলি বলেছি।

আপনারা জানেন, আমার একটা রাজনীতি আছে। তবু যেটা জানেন না—সেইটা হচ্ছে এই যে, ভারতের বহু লোকের মত আমিও ১৯২১ সালে স্কুলে পড়তে পড়তে জীবনে প্রথম গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিলাম।

কাজেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি আমার হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, এ কথা গর্বের সংগে স্বীকার করি। তারপর অল্পদিন পর থেকেই তাঁর সংগে বিরোধ হয় অর্থাৎ গান্ধীবাদের সংগে সন্ত্রাসবাদের বিরোধ। অথবা অহিংস-গণআন্দোলনের সংগে সহিংস ব্যক্তি-ভিত্তিক গুপ্ত আন্দোলনের বিরোধ। যাঁদের কাছ থেকে এ আন্দোলনের শিক্ষা পেয়েছিলাম তাঁদের অনেকেই আজ বাংলা কংগ্রেসের কর্ণধার। তাঁরাই আমাদের কানে এসে গান্ধীবাদ বিরোধী কথা ঢোকান। এখন তাঁরা মস্ত গান্ধীভক্ত—কিন্তু তাঁরা অহিংসও নন—গণ আন্দোলনকারীও নন।

আমি মনে করি, আমি এখনও গান্ধীজীর প্রকৃত শিষ্যই আছি। কারণ, আমি গণআন্দোলনে বিশ্বাসী এবং হিংসাটাকে আমি 'মিনিমামের' উপর অথবা ডাক্তারী ভাষায় রোগের অস্ত্রোপচারের জন্য যতটুকু, ততটুকুর বেশী মূল্য দিতে একেবারেই রাজী না। যারা শ্রমিক, কৃষকের উপর গুলি-লাঠি চালিয়ে এবং এত বড় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করেও বলেন, ভারত অহিংস উপায়ে স্বাধীন হয়েছে, তারা মিথ্যা বলেন। গান্ধীজী এই মিথ্যা ভাষণ বরদাস্ত করতে পারেন নি—তাই তাঁর প্রাণ দিতে হ'ল। কারণ, তিনি জানতেন, কোন দেশে হিংস বিপ্লবের জন্যেও এত রক্তপাত হয়নি, যত এই ভারতে গত বছরে হয়েছে। গান্ধীজীর আন্দোলন তো দূরের কথা—বৈপ্লবিক এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও এত বৃটিশ মারেনি—যত হিন্দু মুসলমান নিজেরা গত বছর নিজেদের মেরেছে। শুধু তাই নয়, বৃটিশের সদাশয়তার উপর বিশ্বাস এবং নিজ দেশের লোকের উপর এইরূপ অবিশ্বাস আর কখনো দেখা যায়নি। গান্ধীজী সবচেয়ে বড় জননেতা। জনসাধারণের শুভশক্তির উপর বিশ্বাস জননেতাদের সমস্ত শক্তির উৎস। এ বিশ্বাস সমস্ত দেশকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তিনি আমাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার যে আত্মদানকারী চেষ্টা

দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু

করেছেন, সে চেষ্টার মধ্য দিয়ে তিনি আবার আমাদের কাছে টেনে ছিলেন। শত রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও আন্তরিকভাবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছি—আর পুরানো দিনের উন্মাদনা বোধ করেছি।

এবার আমার ব্যক্তিগত কথাগুলি জানাই। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বেনারস এবং লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের প্রতাপ—কংগ্রেসের ভিত্তি তাদের হাতে চলে যাচ্ছে। ওখানে কাগজে দেখি—আর, এস, এস রাজার বাড়ীতে ও চোরাকারবারীদের বাড়ীতে হাজার হাজার জনসমাবেশ করে এবং গান্ধীজী ও নেহেরুর অপসারণ দাবী করে। অমৃতবাজার কাগজের এলাহাবাদ সংস্করণে দেখলাম দিল্লীতে আর, এস, এসের, সভা হয়েছে—আলোয়ারের রাজপ্রাসাদে। আর, এস, এস, নেতা মিঃ গোলোয়ানকর এবং আলোয়ারের রাজা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দুই একটি আর, এস, এস ছেলের সংগে কথাবার্তা বলে আমার ধারণা হ'ল যে, অবস্থা খুবই গুরুতর যা বাংলায় বসে আন্দাজ করা যায়না। আমার দলবল এবং কাগজ ঐ বিষয়ে বহুদিন ধরে সতর্ক করছিল কেন তার গুরুত্ব যেন এখানে এসে বুঝলাম। কলকাতায় যেদিন ফিরলাম, তার পর দিন আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির বৈঠক ছিল। সেখানে সকলকে এইসব গল্প করছিলাম—এমন সময় বন্ধু সতু সেন এবং কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের কয়েকজন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। ইতি মধ্যে দেখলাম সর্দার প্যাটেল লাক্ষ্ণৌ গিয়ে বললেন,আর এস এসরা ভাল ছেলে—তাদের ধমকালে চলবেনা। বুঝিয়ে সুজিয়ে কংগ্রেসে আনতে হবে। আমিতো অবাক—! গান্ধীজীর হত্যার পর সাহিত্য সংঘের একটি কর্মী এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, "সুধী বাবু, আপনার কথার পর আমরা আলোচনা করেছিলাম তখন, তখন আমাদের একজন বলেছিলেন, সুধী বাবু একটু বেশী করে বলেছেন। তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, সুধীর বাবু গলায় ভীতির স্বর ফুটে উঠেছে কিন্তু। আমার এই ভয়পূর্ণ কণ্ঠস্বর অনেক শিল্পী ও ডাইরেক্টারও শুনেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীদের মনে হয়েছিল, বাবাবাবি আর এখন সর্দার প্যাটেলের প্রচার যন্ত্র বলছে, বামপন্থীয় এটার উপর রাজনৈতিক মুনাফা করছে।

চিত্রসাংবাদিক বিশ্ববন্ধু রায়চৌধুরী (কর্মাধ্যক্ষ, বিজলী সিনেমা)

নিদ্রিত ভারতের ঘুম ভাঙালো কে?
কে জাগাল স্বাধীনতার চেতনা?
তুমি!
তুমিই তো দিলে জাতির নবজন্ম!

হে জাতির পূজ্য পিতা, তোমায় পূজা করবার যে মন্ত্র জানি না। বিভেদের বিষ পান করে তুমি নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ী! হে মহাপুরুষ! হে বিরাট! হে মহাত্মা!—ভাষা তো জানি না, তোমায় পূজা করব। ধ্যানস্তিমিত চক্ষু দিয়ে তোমার বিরাট বিশ্বরূপ কল্পনা করেও তোমার মাহাত্মের নাগাল পাই না—হে মহাত্মা! হে জনক! সন্তানরূপে শুধু এই প্রার্থনা, তোমার ব্রত ও তোমার সাধনার মন্ত্রে আমাদের জাতীয় জীবন উজ্জল হয়ে উঠুক। প্রার্থনা শুধু, সাম্প্রদায়িক মনের দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে—সমবেত মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন বিশ্বের কল্যাণ কামনা ক'রে সমবেত: কণ্ঠে ডাকতে পারি:

ঈশ্বর—আল্লা
তেরে নাম
সবকো সুমতি
দে ভগবান॥

প্রখ্যাতনামা সংগীত পরিচালক ও সুরশিল্পী কমল দাশ গুপ্ত (হিজ মাস্টার্স ভয়েস)

রূপ-মঞ্চ পত্রিকা মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শনের সুযোগ দিয়ে যেমন কৃতজ্ঞতা পাশে আমাদের বেঁধেছেন তেমনি সেই সংগে অভিযোগও করবার আছে। কারণ, আমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে গান্ধীজীর মতো মহামানবের মহাপ্রয়াণে কিছু লেখা বা

"পরকে করিলে ভাই।"

কিছু বলা—এর কোনটাই শোভা পায়না। কিন্তু তবুও এই শুভপ্রচেষ্টার কথা ভেবে বেশ একটু আনন্দ পেলাম। ভাবলাম আজ যে মহামানবকে আমরা এতটুকু প্রেম ভিক্ষা দিতে অস্বীকার ক'রে পৃথিবীর বুক থেকে জোর ক'রে, বিশ্বাসঘাতকের মতো অন্যায় ভাবে চিরদিনের মতো বিদায় ক'রে দিলাম—এই হীনতম অনুষ্ঠানের অংশীদার আমরাই, এ'কথা জোর গলায় সারা পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এবং তার শাস্তি গ্রহণ ক'রতে হব।

"আমরা ভারতবাসী" এই শব্দ ক'টি কিছুদিন পূর্বেও আমরা উন্নতমস্তকে ও উচ্চস্বরে সমস্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে ব'লতাম. এবং গর্ব অনুভব ক'রতাম। কিন্তু আজ ঘরের কোনে অন্ধকারে চুপি চুপি নিজেকে ভারতবাসী ব'লতে নিজেই ঘৃণা বোধ ক'রছি। লজ্জায় বাইরে আলোর সামনে এসে দাঁড়াতে পারছিনা। এই আমরা গর্ব করি আমাদের শিক্ষার, আমাদের দীক্ষার আর আমাদের সভ্যতার! কিন্তু সত্যিই কি এই ভারতের, এই পৃথিবীর এতটুকুও ক্ষতি হ'ত যদি আমরা মানুষ না হয়ে পশুর মতো বনে জঙ্গলে বাস করতাম! কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে! তাই মনে হয়, আজো কি আমরা সেই মহামানবের পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রতে প্রস্তুত আছি! কুলি, মজুর, চাষী, শিল্পী, পণ্ডিত, ধর্মযাজক—সবাই মিলে জাতি, ধর্ম, উচু, নীচু ধনী, দরিদ্র, ইত্যাদির প্রভেদ দূর ক'রে ধুয়ে মুছে ফেলে নতুন দিনে নতুন ক'রে সারা পৃথিবীর মানুষকে মানুষ এবং ভাই ব'লে সম্বোধন ক'রে আমাদের দেশের পিত—পৃথিবীর পিতার আত্মার প্রতি আমাদের হৃদয়ের—শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ক'রতে পারি? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তা' পারি। সে সাহস, সে শক্তি আর সে আত্মত্যাগের মহামন্ত্র আবার আমরা ফিরে পাই; যেন আবার সেই চিরশান্তি বিরাজ করে এই নতুন পৃথিবীর বুকে। যেখানে সারা পৃথিবীর মহামানব নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মানুষের কল্যাণ কামনায় ধ্যানমগ্ন হ'য়ে আছেন।

খ্যাতনামা সুরশিল্পী শ্রীঅনাদি কুমার দস্তিদার (এইচ, এম, ভি)

মহাত্মাজীর মহৎ জীবন যা সূর্যালোকের মতই প্রদীপ্ত, সেই আলোক আমাদের ইংগিত করেছে মানুষের মাঝে প্রকৃত মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে। পরস্পর প্রীতি ও শুভেচ্ছার মধুর সম্পর্কে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে, তাঁর অমর বাণী যেন আমাদের যুগ যুগান্তরের পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত করে "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই মহাসত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায্য করে। সত্য ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক সেই মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। ওঁ শান্তিঃ।

প্রয়োজক শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্তী (লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ, কলিকাতা)

বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যাঁর আবির্ভাব তাঁর তিরোভাবেও তেম্‌নি কল্যাণই নিহিত থাকে। জীবিতকালে যাঁকে বুঝতে পারিনি—যাঁকে চিনতে পারিনি—আজ লোকান্তরিত হবার পর তাঁর অভাব প্রতিক্ষেত্রে অনুভব কচ্ছি। এই অভাবের বেদনার ভিতর দিয়েই যেন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি।

চিত্র পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত ও হাওড়া পারিজাত সিনেমার কর্তৃপক্ষ (পারিজাত চিত্র প্রতিষ্ঠান)

যাঁর আজীবন সাধনায় আমরা আত্মসচেতন হ'য়ে উঠেছি, যিনি আজীবন জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে গেছেন—জাতির সেই জনক আজ আর আমাদের মাঝে নেই। যখনই দুষ্টবুদ্ধির তাড়নায় আমরা দিশেহারা হ'য়ে পড়বো—আমাদের চলার পথ সমস্যা-কণ্টকিত হ'য়ে উঠবে কে সেই মহাপুরুষ যিনি আমাদের শক্তি দিয়ে উৎসাহীত করবেন—সহাস্যে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করবেন? আজ জাতি সত্যই পিতৃহারা। হে জাতির জনক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো।

কোয়ালিটি ফিল্মস-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দুর্গা মল্লিক মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী শ্রীমতী প্রমীলা বালা দাসী একটি গানের ভিতর দিয়ে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

—বাপুজী স্মরণে—

প্রভাত সূর্য অস্ত গিয়াছে
নিখিল বিশ্ব করি আঁধার।
গিয়াছ চলিয়া দেবতা ভিখারী
মুক্ত করিয়া স্বর্গদ্বার॥
যে অমৃত তুমি বিলায়ে গিয়াছ
পান করি তাহা গৌরবে—
সন্তান তব স্মরিবে তোমায়
যুগে যুগে ফুল সৌরভে!
পুণ্য পরশে রক্তের লেখা
ঘুচুক মোদের হিংসার রেখা
অমর হইতে পড়ুক ঝরিয়া
তোমার স্নেহের-আশীষ ধার॥

অরুণ কুমার বিশ্বাস (সেনহাতা, কানপুর)

হে মোর বরণীয়
তুমি থাকিবে গো সবাকার মনে হ'য়ে চিরস্মরণীয়,
তুমি যে গানের সুর
সবার কণ্ঠে তব জয়নাম বাজিবে সুমধুর।

দেব কুমার চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক, বঙ্গ সাহিত্য সমিতি, ক্ষেত্রেশ কুমার রোড, মজঃফরপুর, বিহার)

রাষ্ট্রপিতা বাপুজীর মৃত্যুতে সমস্ত জগত শোকে অভিভূত। তিনি ছিলেন বর্তমান যুগের দধিচী—দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের জয়ের নিমিত্ত তাঁর জীবনদান নয়—তাঁর জীবনদান মানব কল্যাণের নিমিত্ত। আমাদের রূপ-মঞ্চ মহাত্মাজীর স্মৃতি পূজার জন্য যে বিশেষ স্মৃতি-সংখ্যা প্রকাশ করছেন, তার জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাদের। মহাত্মাজীর আশার ভারত—তাঁর স্বপ্নের ভারত যেন তাঁরই আদর্শে গড়ে তুলতে পারি—এই প্রতিজ্ঞা করেই মহামানব মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কচ্ছি। জয় হিন্দ।

শ্রীনিতাই চরণ সেন রবীন সেন ও ফটিক দত্ত (কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস)

এক আততায়ীর গুলিতে এযুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধীর দেহাবসান হ'য়েছে বললে ভুল বলা হবে। মহান যাঁর আত্মা তিনি কখনও কারো দ্বারা হত হতে পারেন না। এ তাঁর স্বেচ্ছা মৃত্যু। জাতির অধোগতির কথা চিন্তা করেই মহাত্মা আমাদের মাঝখান থেকে অমরলোকে চলে গেলেন। তাঁর এই মহাপ্রয়াণ ব্যর্থ হবার নয়। তাঁর যে পুণ্য রক্ত ধরণী ধারণ করেছে—তা থেকেই পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত অশান্তি ও বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। হে মহাত্মা, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো।

শ্রীসুভাষ ধর ও সুহাস ধর (ধর টিন ফ্যাক্টরী)

আমাদের হৃদয়ের সমস্ত পাপ ধুয়ে যাক, মুছে যাক। আমরা যেন মহাত্মাজির মহান আদর্শ জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে পারি। তিনি সেই আশীর্বাদই করুণ আমাদের।

তপতী দেবী (কম্বুলিয়া টোলা লেন, কলিকাতা)

হে মহাত্মা, তোমায় স্মরণ করি। ভেদাভেদ ভুলে হে শান্তির প্রতীক, তোমায় প্রণাম করি! উদাত্ত কণ্ঠে বলি, হে জ্যোতির্ময় তোমারই হোক জয়। তুমি আজ নেই। তোমার নরদেহ আজ মহাশূন্যে বিলীয়মান—কিন্তু স্থির জানি যে, তোমার অমর আত্মা চিরদিনই আমাদের মাঝে বিরাজ করবে। হে পরমাত্মা, তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক, তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক, তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক!

তোমার আরব্ধ যে কাজ তুমি আমাদের জন্য রেখে গেছ, তা যেন আমরা সুশৃঙ্খলভাবে শেষ করতে পারি। কাজের মাঝে তোমার কণ্ঠের অভয় বাণী শুনতে পাব কি? হে মহামানব, শক্তি দাও—শক্তি দাও—ভয়কে জয় করবার শক্তি দাও। বিপদকে ও বাধাকে দূরে সরিয়ে দেবার শক্তি দাও। আমাদের আছে আদর্শ, তুমি আমাদের দাও নিষ্ঠা, দাও একাগ্রতা, দাও তোমার শুভাশীর্বাদ। আজ
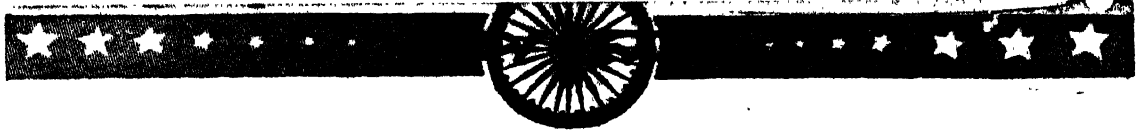
অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমগ্র জাগ্রত তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছে—

"তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

জয়তু মহাত্মা।

অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (শিবাজী প্রেস, নিউ দিল্লী)

সত্য ও ত্যাগ যাঁর জীবন—তাঁর মৃত্যু শুধু মহাকালের সমাধিই রচনা করে। মহামানব মৃত্যুঞ্জয়-মহাত্মাজি চির অমর।

শ্রীপরিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য (আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য)

অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানবধর্মকে রক্ষা করার জন্য মহাত্মাজী যখন নোয়াখালিতে অবস্থান কচ্ছিলেন, তখন ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তাঁকে ত্রিপুরারাজ্যে পদধূলি দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বাপুজী সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আসতে সময় পান নি। তাঁর ত্রিপুরা রাজ্যে আগমনের কথা দু'দিন 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'তে প্রচার করা হয়েছিল। তিনি আগরতলায় আসবেন, এই নিয়ে এখানে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সবার মুখেই এক কথা—'মহাত্মা গান্ধী কবে আসবেন'। বাপুজী স্বর্গীয় মহারাজের আমন্ত্রণ-লিপি পেয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন, এখানে সেটা উধৃত করা হ'লো। চিঠিটা তিনি বাংলাতেই লিখেছিলেন এবং বাংলাতেই নাম স্বাক্ষর করেন। আজ তাঁর অকাল মৃত্যুতে এই কথাটাই বার বার মনে পড়ছে যে, "কীর্তিযস্য স জীবতি।" মানুষ মরে যায় কিন্তু রেখে যায় তাঁর কীর্তি—আদর্শ ও কর্মপন্থা। আমরা যেন তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থাকে সফল ও পূর্ণ রূপ দিতে পারি। আমি রূপ-মঞ্চ মারফৎ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন কচ্ছি। ভগবান তাঁর আত্মার শান্তি দিন। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

(স্বর্গতঃ মহারাজ সাহেবের নিকট লিখিত মহাত্মাজীর পত্র)

শ্রীরামপুর, নোয়াখালী,
১৪।১২।১৯৪৬

মহারাজা সাহেব,

আপনার ৯ তারিখের অনুগ্রহ লিপি দেওয়ান বাহাদুর বিজয় কুমার সেন মহাশয়ের হস্তে গতকাল পৌঁছিয়াছে, তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। পত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন দেওয়ান বাহাদুরের সংগে তাহা আমি বিস্তারীতভাবে আলোচনা করিয়াছি। তিনি আমার বক্তব্য স্বয়ং আপনার নিকট জানাইবেন। সেজন্য পত্রে আর উহা উল্লেখ করিলাম না।

শুনিলাম, আপনি জানুয়ারী মাসে কলিকাতা হইতে ফিরিবেন। সেই সময় আসার পথে নোয়াখালীতে যদি কিছু সময় পাওয়া যায়, তবে সাক্ষাৎ হইলে বিশেষ সুখী হইব। ইতি—

ভবদীয়
মোঃ কঃ গান্ধী।

শ্রীশোভা ভট্টাচার্য (মার্কেট রোড, নিউ দিল্লী)

(আজি) মায়া-মঞ্চ ছাড়ি, কায়াপরি হরি,
বিভুপদে হের, হাসে।
অমর আত্মা, গান্ধী মহাত্মা,
বিভুপদে হের রাজে।

ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কলিকাতা)

মহাপুরুষের মৃত্যু নাই। তাই মহাত্মার নশ্বর দেহ ভষ্মিভূত হলেও তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়েই আছেন। জাতি ও দেশকে গড়ে তোলার যে অসমাপ্ত কাজ তিনি রেখে গেছেন, ভারতবর্ষের যে ছবি তিনি মনের মধ্যে অঙ্কিত করেছিলেন, তা সার্থক ও সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করে তাঁর পথকে অনুসরণ করতে হবে। তবেই তাঁর বিদ্রোহী আত্মা পাবে তৃপ্তি এবং তবেই তাঁর স্মৃতিকে আমরা যথার্থ রক্ষা করতে পারবো।

শ্রীমতী দুর্গাবতী দেবী (কলিকাতা)

৩০ শে জানুয়ারী ঘুম ভেঙ্গেছিল অত্যন্ত একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙ্গলো কিন্তু চোখের জল থামলো না, আর থামলো না বুকের কাঁপন। সেদিন প্রতিটি মুহূর্ত কি যেন অস্বস্তি আর অশান্তিতে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। কেবলই মনে হ'তে লাগলো, দুর্ণিবার কোন ক্ষতি আঘাত হানতে এগিয়ে আসছে। অতিপরিচিত ঘনিষ্ঠ কারও অমংগলের আশংকায় ভয় থর থর হৃদয়ের কাছে অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত সংবাদ এসে পৌঁছলো, বিশ্বজনের পরমাত্মীয় গান্ধীজী আর নেই। চোখে জল এলোনা, এলো জ্বালা। মনে হ'লো বাতাস থেমে গেছে, নিঃশ্বাস পড়ছেনা। স্তব্ধ হ'য়ে গেছে বুকের কাঁপন—সারা পৃথিবী বুঝি মুহূর্তে পাষাণে পরিণত হয়ে গেলো। হয়ত ভগবানই শুধু জানেন, মহামানবের আবির্ভাব ও তিরোধানের লাভ ও ক্ষতির রহস্য। যীশুখৃষ্ট জীবন দিয়ে যে ধর্মের প্রচার করেছিলেন, মৃত্যু দিয়ে সেই ধর্মকে অনন্তকালের জন্য মানব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছেন। অহিংসা ব্রতচারী মহাত্মাজীর আদর্শ তাঁর জীবন কালে বুঝি ভ্রান্ত মানুষকে কল্যাণের যে নবচেতনায় হয়ত সম্পূর্ণ করে জাগাতে পারেনি, সেখানে তাঁর মহান মৃত্যুর কঠোর আঘাত দিয়ে হয়ত জাগানোর প্রয়োজন ছিল। যাঁদের জন্মের চেয়ে মৃত্যু আরো বড় ঘটনা, তাঁরা পৃথিবীতে অমর। জয়তু গান্ধীজী।

কুমারী রমা বসু (কাঁথি, মেদিনীপুর)

জাতির জনকের এই আকস্মিক তিরোধান সত্যই আমাদের শোকে মুহ্যমান করিয়াছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যেন তাঁর সাধনা সফল করিয়া তুলিতে পারি।

শ্রীচন্দ্রশেখর প্রসাদ দে (জামালপুর, ময়মনসিংহ)

হে মহামানব, তোমাকে বুঝি নাই, চিনি, নাই, তোমার কথা শুনি নাই। তোমার আত্মার শান্তি হউক। তোমার আত্মাই আমাদের সত্য ও অহিংসার পথে চালনা করবে। আত্মা অবিনশ্বর। তোমার আত্মার উদ্দেশ্যে আমার নতি জানাইতেছি। তোমার মৃত্যু নাই।

অরোরা ফিল্মস করপোরেশন লিঃ

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রযোজিত খণ্ডচিত্র মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শনার্থ প্রস্তুত আছে। গান্ধীজির বিভিন্ন কার্য কলাপ এবং কলিকাতা, বারাকপুর ও এলাহাবাদের দৃশ্য-গুলিকে কেন্দ্র করে উক্ত খণ্ডচিত্রখানি নির্মিত হয়েছে। এই চিত্রে রামধুন সংগীত ও একখানি কবীরের ভজন গেয়েছেন পণ্ডিচেরীর শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

মজুমদার স্বামী প্রডাসন লিঃ

মামুলী রোমান্স প্লাবিত ছবির আসরে নতুন চিন্তার খোরাক দিতে বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে যে ছবিখানির আবির্ভাবের কথা বর্তমান সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হলো, তাহার নাম 'সর্বহারা'। বাংলার দুর্গত, অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত চাষী-মজুর ও কিষাণদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি যে কত কষ্টের হতে পারে 'দুঃখীর ইমান' নাটকের মধ্যেই দেখে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তারও আগে শ্রীবিজন ভট্টাচার্য-এর 'নবান্ন' নাটকে এদেরই কথা পরিবেশিত হয়েছে। চাষী-কিষাণের জীবনেও রোমান্স আছে। সে রোমান্স বেদনায় মলিন। পেটে যাদের দাবাগ্নি জ্বলছে। মনের ক্ষুধা মেটাবার সময় তাদের কোথায়! এই ক্ষুধা মেটাবার দাবী জানাতে; জাগ্রত ভারতে যাদের সুরু হ'ল আজ নব অভিযান—কেমন তার পরিণাম ও পরিসমাপ্তি? সভ্যতার নামে যারা শোষণ করে এদের, তাদের পাপের ভার লাঘব করতেই এই অভিযান। সর্বহারা—সুখী মনুষের সাজানো ড্রইংরোমের চোখ ঝলসানো চিত্র নয়। এর অন্তরালে ফুটে উঠেছে শতাব্দীর মহাপাপ ও অবহেলার অশ্রু। বাণী চিত্রে রূপান্তরীত 'দুঃখীর ইমান' 'সর্বহারা' নামে সেই কাহিটাকে আবার নতুন করে প্রকাশ করবে। ছবিখানির প্রয়োগ কর্তা স্বনামধন্য চলচ্চিত্র-সেবক সুশীল মজুমদার এবং তার অংশীধার ডি, ডি, স্বামী। পরিচালনার দাবী অলঙ্ঘ্য সুশীল বাবুর নিজস্ব।

রূপশ্রী লিঃ

কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহকে একত্রিভূত করবার নতুন দাবী নিয়ে রূপশ্রী লিঃ এর নতুন বাণীচিত্র সম্ভবত বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বেই ছায়া, কালিকা ও আলেয়াতে মুক্তি লাভ করবে। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের মূল কাহিনীটাকে কেন্দ্র করে শাঁখা সিঁদুর গড়ে উঠেছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী, দীপক, মলিনা, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নিভাননী হরিধন, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। চিত্রখানির পরিচালনা ও সুর সংযোজনা করেছেন যথাক্রমে শ্রী মনুজেন্দ্র ভঞ্জ ও গোপেন মল্লিক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান

গত ২ রা ফেব্রুয়ারী শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ সরকারের সভাপতিত্বে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারী সমিতির অধীনস্থ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখা হয়।

জয়শ্রী পিকচার্স লিঃ

নবগঠিত জয়শ্রী পিকচার্স লিঃ-এর প্রথম চিত্র 'কৈফিয়ৎ' গড়ে উঠবে খ্যাতনামা কাহিনীকার শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্যের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। চিত্রখানি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন শ্রী কণক মুখোপাধ্যায়। ইনি ইতিপূর্বে পরিচালক বিমল রায়ের সহকারী চিত্রশিল্পী ও পথের-দাবী চিত্রের সহকারী পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ছিলেন। বর্তমানে কণক বাবু চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত আছেন। আমরা এই নতুন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

কল্পচিত্র মন্দির

এঁদের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন 'ওরে যাত্রী' ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। 'ওরে যাত্রীর' কাহিনী রচনা করেছেন শ্রী নিতাই ভট্টাচার্য। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা চিত্রসম্পাদক শ্রীরাজেন চৌধুরী। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন রেণুকা, প্রভা, নমিতা, অনুভা, দীপক, উত্তম, ডি, জি জ্যোতি, নবদ্বীপ, হরিদাস, অমল, সুশান্ত। সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন শ্রী কালীপদ সেন।

ভ্যারাইটি ফিল্মস

এতদিন সে গায়ের রক্ত জল করে কত পরিশ্রম করে স্কুলটিকে গড়ে তুলল আর আজ এল প্রধান শিক্ষক হ'য়ে কলকাতার আধুনিক ও বিলাসী পৌঢ়। সে কি স্কুল চালাতে পারবে? যার পরিশ্রমে আজ গড়ে উঠেছে এই গ্রামে একটা হাইস্কুল, এতদিন পরে সে হবে তৃতীয় মাষ্টার—উপায় নেই। তাকে সহ্য করে থাকতেই হবে-সে-ইত স্কুলের সব। এই আদর্শবাদী যুবক আর কেউ নয়, সে আমাদের 'রবীনমাষ্টার'। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের এই উপন্যাসটি নিছক কাহিনী নয়—বাস্তবের নিখুঁত ছবি। রবীন মাষ্টারের চরিত্রটিকে সজীব করে তুলেছেন উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা করেছেন জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

ওরিয়েণ্ট পিকচার্স

নাট্যকার ও চিত্র পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর বর্তমান বাংলা চিত্রে বিচারক-এর কাজ শেষ করে ফেলেছেন। বিচারকের কাহিনীটিও দেবনারায়ণ বাবুই রচনা করেছেন। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অলকা দেবী, ঝরণাদেবী, রাজলক্ষ্মী, কনক ঘোষ, অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, সন্তোষ দাস, দেবীপ্রসাদ, মণি মজুমদার (এঃ) কালী চক্র, বাণীবাবু প্রভৃতি। চিত্রখানির আবহ সংগীত সংযোজনা করেছেন হিন্দুস্থান অর্কেষ্ট্রা লিঃ এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন পূর্ণ মুখোপাধ্যায়।

পিকচার্স সিণ্ডিকেট অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

এদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'স্বর্ণ-শৃঙ্খল' এর শুভ মহরৎ উৎসব কালীফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীবিজয় গুপ্ত এবং পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীঅশ্বিনী মিত্র। বিভিন্নাংশে দেখা যাবে সন্তোষ সিংহ, ভরত চৌধুরী, অমর রায়, অভি ভট্টাচার্য, শৈলেন পাল, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস প্রভৃতিকে।

এস, পি, সিণ্ডিকেট লিঃ

সরোজ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় এদের প্রথম চিত্র 'শ্যামলের স্বপ্ন' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীরতন চট্টোপাধ্যায় এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পারুল কর, রাজলক্ষ্মী, তুলসী চক্রবর্তী, নিভাননী প্রভৃতি।

সাইন রেডিও কলেজ (৩৭এ, শ্যামানন্দ রোড) ভবানীপুর

এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে রেডিও তৈরী, মেরামত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তা ছাড়া শব্দ গ্রহণ, চিত্র প্রদর্শনও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার রয়েছে এবং বহু মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত হয়েছে। এই বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ যন্ত্রবিদ্ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে। আমরা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি এবং উৎসাহী শিক্ষার্থীদের কাছে এদের অনুমোদন করি।

ক্যালকাটা অলিম্পিক প্লেয়ার্স

গত ২৮া ফেব্রুয়ারী রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এদের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও শ্রীহরিশঙ্কর পালের উপস্থিতে বিধায়কের 'রক্তের ডাক' নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি পরিচালনা করেন সৌখীন অভিনেতা গোপাল চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে ছিলেন, আশু বোস, জীবন গোস্বামী, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, গৌতম, ধরণী, হিমাংশু, রমানাথ, অরুণ, পূর্ণেন্দু, রাধানাথ প্রভৃতি।

নিবেদিতা মণিমেলা

গত ১১শে ফেব্রুয়ারী নিবেদিতা মণিমেলার সভ্যসভ্যাবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুচক্র' অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু।

ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্স

"একজন তার খেয়ালমত খুশীমত অবহেলা করবে, করবে উপেক্ষা আর অপমান, আর আমি মুখ বুজে, মাথা হেঁট করে পরের দয়া আর ভিক্ষায় জীবনটা কাটিয়ে দেব? না, না অত সাধারণ মেয়ে আমি নই?" এই অসাধারণ মেয়েকে নিয়েই গড়ে উঠছে পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর আগামী বাংলা বাণীচিত্র 'সাধারণ মেয়ে'। মহরৎ-সট-এ 'সাধারণ মেয়ে' দীপ্তি রায়ের মুখের এই অসাধারণ

সংলাপ সেদিন অনেকেই শুনেছিলেন। সাধারণ মেয়ের কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে দেখা যাবে পাহাড়ী সান্যাল, দীপ্তি রায়, শ্যাম লাহা, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেককে। চিত্রখানির সুর সংযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

মহাজাতি পিকচাস লিঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ নন্দীর প্রযোজনায় শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় রচিত 'পল্লীর পথে' শীঘ্রই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হ'য়ে উঠবে। চিত্রখানির সুর সংযোজনা ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত ও জ্যোৎস্নাময় মিত্র। সুসাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এদের উপদেষ্টার কার্যভার গ্রহণ করেছেন। চিত্রখানির একমাত্র পরিবেশক মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ।

দি নিউ এরা ফিল্‌ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

এদের প্রথম চিত্রনিবেদন 'মণি-কোঠার' মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরলোকে কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী

কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী সম্প্রতি তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার ৬৯ বৎসর বয়স হয়েছিল। বহুদিন ধরে তিনি অম্লশূল, হাঁপানি প্রভৃতি রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা, দুই পুত্রবধূ, দুই জামাতা ও বহু পৌত্র পৌত্রী রেখে গেছেন। আমরা কবির মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ কচ্ছি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।
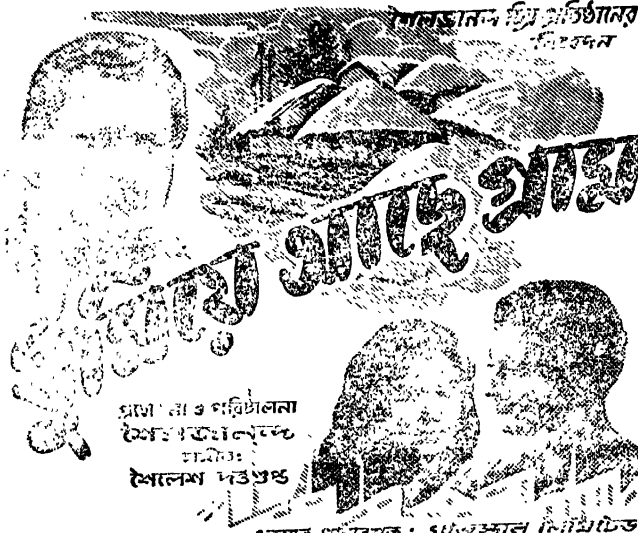
লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ

"লালপাঞ্জা আজ পর্যন্ত কোনও অন্যায় অত্যাচার করেনি, বরং সেখানে পুলিশের হাত নেই, সেখানে সে দুর্বৃত্তের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করেছে। কিন্তু তবু, দেশের আইনের চোখে সে অপরাধী; কারণ, আইনকে ডিঙ্গিয়ে নিজের হাতে শাসনের ভার তুলে নেবার অধিকার কারুর নেই।" বৈদেশিক শাসকের তথাকথিত ন্যায়সংগত শাসনাধীনে এমনি কত নিরপরাধকে শাস্তি পেতে হয়েছে। যখনই কোন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ভিতর থেকে প্রতিবাদ উঠেছে, অমনি তাদের টুটি চেপে ধরা হয়েছে। কিন্তু তবু সত্য ও ন্যায়কে কোনদিনই তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি। লালপাঞ্জাও এমনি অনাচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে তার ন্যায়সংগত দাবী নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তথাকথিত আইন ও নিয়মশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেও সত্যিই কী সে ধরা পড়েছিল? না—তার মহিমাকে শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে এলো আর একজন মহিমময় স্বার্থত্যাগী! এরই হদিস পাবেন লীলাময়ী পিকচার্সের মুক্তি প্রতীক্ষিত 'দেবদূত' চিত্রে। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লালপাঞ্জা' কাহিনীটিকে কেন্দ্র করে চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। দেবদূত পরিচালনা করেছেন শরদিন্দুবাবুর সুযোগ্য পুত্র নবীন পরিচালক অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিনয় গোস্বামী। এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অভি ভট্টাচার্য, অমিতা দেবী, অজন্তা কর, ভাস্কর দেব, সন্তোষ চৌধুরী, প্রণব বাগচী শেখর মুখুজ্জে, রমাপদ, হারাধন, চিত্ত, অচিন্ত্য, তুলসী প্রভৃতি আরো অনেক। অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ-এর পরিবেশনায় চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবে।

ডাকব্যাক রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত ৩০শে জানুয়ারী রঙমহল রঙ্গমঞ্চে ক্লাবের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে মন্মথ কুমার চৌধুরী রচিত 'হে বীর পূর্ণ কর' নাট্যাভিনয় হয়।

নিখিল ভারত প্রদর্শনী (ইডেন গার্ডেনস্, কলিকাতা)

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার বেলা ৩-৩০ মিনিটের সময় বাংলার গভর্ণর মাননীয় শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নিখিল ভারত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মাননীয় গভর্ণর তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন এবং জনসাধারণকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে অনুরোধ করেন। এই প্রসংগে তিনি আরো প্রকাশ করেন যে, এই প্রদর্শনীর মোটা অংশ বাংলা সরকারকে দেওয়া হবে বাংলার জনহিতকর কার্যের জন্য। প্রদর্শনীর কার্যকরী সমিতির সভাপতি বাংলার অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার এবং পরামর্শ-বোর্ডের চেয়ারম্যান বাংলার মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ও সভায় বক্তৃতা করেন। আমরা প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা সাইন্টিফিক পাবলিসিটি এবং সম্পাদকদ্বয় শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও শ্রীএস, মজুমদারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্বাধীন ভারতে এইরূপ প্রদর্শনী এই প্রথম। এবং এমন ব্যাপকাকারে ইতিপূর্বেও খুব কম প্রদর্শনী আমরা দেখেছি। তবে প্রদর্শনীর নির্মাণ পরিকল্পনার মূলে এমন কতকগুলি ত্রুটি থেকে গেছে, যে জন্য জনসাধারণকে খুবই বেগ পেতে হচ্ছে। প্রথম কথা, এই প্রদর্শনীতে শিক্ষনীয় ও ব্যবসায়গত বিষয়গুলিকে পৃথক করে রাখা উচিত ছিল। অর্থাৎ যেমন মনে করুন, বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন শিল্পকলা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, সেগুলি একই স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠাই উচিত ছিল। যেমন মনে করুন—মোশন পিকচার্স কোর্ট, দামোদর ভ্যালি, সেনা ও যন্ত্রপাতি বিভাগ, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা এমনি আরো যেগুলি কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সংগ্রহ করেছেন এবং যার ভিতর শিক্ষা ও জ্ঞানের ভাগটাই মুখ্য —সেগুলি যদি একত্রিভূত হতো—তবে জনসাধারণকে অনেকখানি কষ্টস্বীকার করতে হত না। তারপর যে সব ষ্টল ব্যবসায়ীরা নিয়েছেন তাদের ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত উদ্যোগ ও ঝুক্কিতে গড়ে উঠেছে—সেগুলিও পৃথক আর একদিকে সন্নিবেশিত

হওয়া উচিত ছিল। জনসাধারণের পক্ষে যে অসুবিধা হচ্ছে তা' হ'লো যে তারা কয়েকটী শিক্ষনীয় বিষয় দেখেইক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এবং অন্যান্য অনেকগুলিই তাদের এড়িয়ে যেতে হচ্ছে। এতে প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতে বসেছে। অবশ্য একথা স্বীকার করবো যে, প্রথম প্রচেষ্টায় যে গলদ রয়ে গেল—তা থেকে আমরা কম অভিজ্ঞতা লাভ করলাম না। এবং ভবিষ্যতে এগুলি শুধরে নিতে পারবো। তারপর স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যাটা খুবই কম। এবং যারা রয়েছেন তাঁরাও দর্শকদের ঠিক নির্দেশ দিতে সক্ষম হন না। কারণ, তারাও প্রদর্শনীর সমস্ত বিভাগ সম্পর্কে ওয়াকীফহাল নন। এসব ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও আমরা এই প্রদর্শনী জনসাধারণকে দেখতে অনুরোধ করছি। বর্তমান সংখ্যায় প্রদর্শনীর কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা কচ্ছি।

মোশন পিকচার্স কোর্ট

চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে জনসাধারণের মনে প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চার করবার জন্য এই বিভাগটি খোলা হয়েছে। চিত্রজগতের কয়েকজন ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও সুধীবৃন্দকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছিল। চিত্রপরিচালক শ্রীবিমল রায় ও চিত্রশিল্পী শ্রীসুধীশ ঘটক—এঁদের সংগঠন শক্তিই এই বিভাগটির সাফল্যের মূলে নিহিত রয়েছে। এবং এই প্রসংগে অক্লান্ত কর্মী শ্রীমনীন্দ্র দত্তের নামও উল্লেখযোগ্য। রূপমঞ্চ পত্রিকার তরফ থেকে এই বিভাগটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এবং বহু তথ্য এদের সরবরাহ করা হয়েছে। রূপমঞ্চ সম্পাদকও কার্যকরী সমিতির একজন কর্মী। কি ভাবে চিত্র গ্রহণ করা হয়—মুদ্রণ, সম্পাদন ও প্রদর্শন করা হয় এই বিভাগে তা দেখানো হয়েছে মডেল ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে। মোটকথা ষ্টুডিও এবং চিত্র-নির্মাণ ও প্রদর্শন সম্বন্ধীয় জটিল বিষয়গুলি সংক্ষেপে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হ'য়েছে। তা ছাড়া পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পে ভারত ও বাংলার স্থান কোথায়—সংখ্যার দ্বারা সেগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশীয় চলচ্চিত্রের যাঁরা জনক, তাঁদের প্রতিকৃতি ও পরিচয়ও সংগ্রহ করা হয়েছে। ষ্টুডিও পরিদর্শন
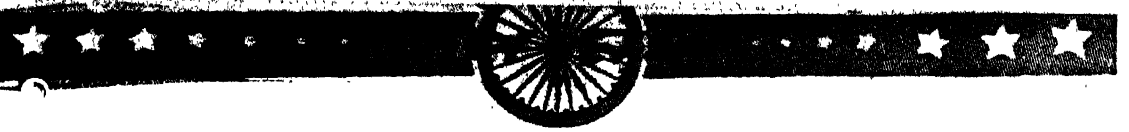
করতে যে সব আগ্রহশীল পাঠক ও দর্শকসাধারণ আমাদের কাছে আসেন—মোশন পিকচার্স কোর্ট তাদের অনেকখানি কৌতূহল নিবৃত্ত করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা তাদের এই বিভাগটি পরিদর্শন করতে অনুরোধ কচ্ছি। এই প্রসংগে আর একটা কথাও বলা দরকার, যে সব কর্মী ও শিল্পী চলচ্চিত্র শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন এই বিভাগ পরিদর্শন করতে তাঁদের কোন প্রবেশ মূল্য লাগবে না এবং শিশুদেরও প্রবেশ মূল্য থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা

এই বিভাগটির কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীঅমল হোম ও তাঁর সহকর্মীদের। সাংবাদিকরূপে শ্রীযুক্ত হোম যে সুনাম ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, এই বিভাগটি পরিকল্পনায় তিনি তা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। একদিকে দেশীয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার ক্রম-বিকাশের ধারা অপর দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সন্নিবেশ। তাছাড়া বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের পত্র-পত্রিকাগুলিকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বাংলার যুগ প্রবর্তক রামমোহন রায়ের মূর্তি ও অন্যান্য অগ্রণীদের প্রতিকৃতিও এই বিভাগটির মান বৃদ্ধি করেছে। আমরা শ্রীযুক্ত হোম ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রদর্শনী বেতারকেন্দ্র

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের কতৃপক্ষ প্রদর্শনীতে এক অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। অল্পপরিসর স্থানের ভিতর এই কেন্দ্রটি যেমন দেখতেও সুন্দর হয়েছে তেমনি তার প্রয়োজনীয়তাকেও আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো। বেতারযন্ত্র আমাদের অনেক পরিবারেই স্থান লাভ করেছে—নাগরিক জীবনে আমরা অনেকেই বেতার মারফৎ আলোচনা, সংবাদ—সংগীত প্রভৃতি শুনে থাকি। কিন্তু কী ভাবে এগুলি বেতারযন্ত্র মারফৎ আমাদের কানে আসে এবং বেতার কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞগণ কী ভাবে বেতার যন্ত্র পরিচালনা করেন বুদ্ধিজীবি অনুশীলনপ্রিয়দের জানা থাকলেও জনসাধারণ অনেকেই এবিষয়ে অজ্ঞ। মূলতঃ জনসাধারণের মনে বেতার কেন্দ্রের কারসাজি সম্পর্কে একটু প্রাথমিক জ্ঞান-সঞ্চার করে তাদের কৌতূহলকে কতকাংশে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই অস্থায়ী কেন্দ্রটি স্থাপিত হ'য়েছে। কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যেমনি মহৎ তেমনি সে উদ্দেশ্য যে সাফল্যলাভ করছে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। সম্প্রতি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে স্থানীয় সাংবাদিকদের এক চা, পানে আহুত করা হয়। এবং সেখান থেকে সাংবাদিকদের এই অস্থায়ী বেতার কেন্দ্রটি পরিদর্শন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত যন্ত্রবিদ খুব যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সাংবাদিকদেব সমস্ত জটিল বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের নবীন পরিচালক শ্রীঅশোক সেন মহাশয় সাংবাদিকদের আপ্যায়নে সব সময়েই খুব সতর্ক ছিলেন। এবং তিনিও সব সময় সাংবাদিকদের সংগে থেকে তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমরা সমগ্রভাবে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের এবং পরিচালক অশোক সেনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তা ছাড়া পৃথক ভাবে সহকারী পরিচালকদ্বয় শ্রীযুক্ত নন্দী ও শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা এবং প্রোগ্রাম পরিচালকদ্বয় শ্রীযুক্ত রণেণ আচার্য ও গৌরী চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যতম কর্মী বিমান ঘোষকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রদর্শনীর অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। তবে আর একটি অমার্জনীয় ত্রুটির কথা উল্লেখ করে আমাদের বর্তমান আলোচনা শেষ কচ্ছি। যদিও একটি অস্থায়ী নাট্য মঞ্চ প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করেছে, তবু নাট্য-জগত সম্পর্কে কোন বিভাগই বর্তমানে খোলা হয় নি। সমস্ত ভারতবর্ষে কেবলমাত্র বাংলার নট্য-মঞ্চই জাতীয় কৃষ্টি ও কলাকে পরিপুষ্ট করে এসেছে, অথচ এত বড় বিরাট পরিকল্পনার মাঝে তার কোন স্থান হ'লোনা। বাংলার নাট্য-মঞ্চ ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যদি কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেন, তবে খুবই সুবিবেচকের কাজ করতেন।

কলিঙ্গ কলামন্দির

গত বাসন্তী পঞ্চমীর দিন এঁদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'শান্তির'র শুভ মহরৎ উৎসব ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি 'উড়িয়া' ভাষায় গৃহীত হবে এবং উড়িষ্যার একটী জনপ্রিয় কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছে। চিত্রখানির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন সুযোগ্য চিত্র সম্পাদক বীরেন্দ্র নাথ গুহ।

রঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিঃ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ প্রযোজিত 'সাহারা' চিত্রখানি মুক্তির দিন গুণছে।
চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীসুনীল মজুমদার। এবং সংলাপ রচনা করেছেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের কাছ থেকে আমরা একটী সুন্দর টিন-প্লেটে মুদ্রিত দেয়াল পঞ্জি উপহার পেয়েছি। শ্রীযুক্ত সিংহকে এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুভ পরিণয়

গত ১৩ই ফাল্গুন ৭৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীগৌর মোহন পাইনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যচরণ পাইনের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান চুনীলাল পাইনের শুভ বিবাহ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীমানিকলাল মল্লিক মহাশয়ে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুশোভনার সংগে সুসম্পন্ন হয়েছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পাইনের বাড়ীতে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। আমরা নবদম্পতির মধুজীবনের শুভকামনা কচ্ছি।

ঘুমিয়ে আছে গ্রাম (সমালোচনা)

শৈলজানন্দ রচিত, পরিচালিত ও প্রযোজিত নতুন বাংলা ছবি 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' আমরা দেখে এসেছি। সুক্ষরস-বিচারের দিক থেকে সবসময় শৈলজানন্দকে অভিনন্দন জানাতে না পারলেও,তাঁর ইতিপূর্বেকার বেশীরভাগ চিত্রগুলি জনপ্রিয়তার গৌরব লাভে সমর্থ হয়েছে, সে কথা কোন দিনই যেমন আমরা অস্বীকার করিনি, তেমনি সেজন্য অভি-নন্দন জানাতেও মোটেই কার্পণ্যের পরিচয় দেই নি। কিন্তু আলোচ্য চিত্রখানি দেখে যে আমরা হতবাক হয়ে গেছি। কী বলবো! ছবিখানি দেখে প্রেক্ষাগৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় জনৈক দর্শকের মন্তব্য কানে এলো—'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম'-এর ঘুম ভাঙাতে যেয়ে শৈলজানন্দ নিজেই যে ঘুমিয়ে পড়লেন। বস্তুতঃ এই মন্তব্যের ভিতরই বর্ত্তমান ছবির সমালোচনা নিহিত রয়েছে। এবং বর্তমানের এই নিরাশার বেদনা তখনই ভুলতে পারবো—যদি ভবিষ্যতে শৈলজানন্দ এমন কোন পরিচয় দেন যাতে বুঝবো, ঘুমিয়ে আছে গ্রামের ঘুম ভাঙ্গাতে যেয়ে শৈলজানন্দ ঘুমিয়ে পড়েননি, সাময়িক ভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যে কোন সৃষ্টিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে—চাই আন্তরিকতা, একখানি চিত্র সৃষ্টি করতে যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন, তাদের আন্তরিকতা থাকলে সে চিত্র কখনও এমন ভাবে ব্যর্থ হয় না। ঘুমিয়ে আছে গ্রাম দেখতে দেখতে এই কথাই বার বার মনে হয়েছে—ইতিপূর্বে কর্মী ও শিল্পী গোষ্ঠীর যতখানি সহযোগিতা শৈলজানন্দ পেয়ে এসে-

ছেন আলোচ্য চিত্রে যেন তার অনেকখানি অভাব রয়েছে। এ দোষ কার? শৈলজানন্দের, না তার সহযোগিদের? যে বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করে শৈলজানন্দ বর্তমান চিত্র গঠনে হস্তক্ষেপ করেছিলেন—সে মূল উপপাদ্য বিষয় আর মূল হয়ে দেখা দেয়নি। যেন মনে হ'য়েছে, তিনি নিজেও ভালভাবে তৈরী হয়ে কাজে নামেন নি। নইলে একটা কথা বলতে যেয়ে আর একটা কথা বলতে যাবেন কেন? অপ্রয়োজনীয় চরিত্র দাঁড় করিয়েও বা প্রয়োজনীয়ের প্রতি অবিচার করবেন কেন? তার রাইজীর চরিত্রের ভিতর যে ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল তা তিনি নিজেই নষ্ট করেছেন। তবু এই চরিত্রটির জন্য তাঁকে প্রশংসা করবো।

অভিনয়ে কয়েকজন নূতনকে তিনি সুযোগ দিয়েছেন। সম্পূর্ণ নূতন বলা না গেলেও পরিচালক শৈলজানন্দের প্রতিভায় আকৃষ্ট হ'য়ে এরা অনেকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও নাকি বর্তমান চিত্রে অভিনয় করতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। একথা যদি সত্য হয়—তাহ'লে শৈলজানন্দের প্রতি তাঁরা তাঁদের শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শৈলজানন্দ সে মর্যাদা রাখতে পারলেন কৈ! এই প্রসংগে বিশেষ করে অনুভা ও অলকার কথা বলতে চাই। এরা জনসাধারণের প্রশংসাত দূরের কথা নিন্দার ভাগই কী কুড়িয়ে নিলেন না? অথচ অন্ততঃ এই দুইটি শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা খুবই আশাবাদী এবং উপযুক্ত পরিচালকের হাতে পড়লে যে এদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে, তাও দুরাশা নয়। আর একজন নবাগতা শ্রীমতী সুধা রায় বি, এ। তাঁর সম্পর্কে আমরা অবশ্য খুব আশা পোষণ করি না, তবু শৈলজানন্দের বর্তমান চিত্র তাঁর শিল্পজীবনের ক্ষীণতম দীপশিখাটিও যে নিভিয়ে দিল—গভীর বেদনার সংগেই একথা বলতে হচ্ছে।

অভিনয়ে ঘুমিয়ে আছে গ্রাম-এ কাউকেই প্রশংসা করতে পারবো না। নটসূর্যকেও না। অবশ্য সেজন্য এঁরা কেউই অপরাধী নন—কারণ, এঁদের অভিনয় প্রতিভার পরিচয় ত আমরা পূর্বেই পেয়েছি। 'ঘুমিয়ে আছে গ্রামে'র সমগ্র অভিনয় দর্শক মনে স্থান করে নেবে—তার উচ্চমানের জন্য নয়—নিম্নস্তরের অভিনয় নিদর্শনের জন্য। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণত উল্লেখযোগ্য ভাবে নিন্দনীয়। দৃশ্য-রচনায় তবু প্রশংসা করবো। আর প্রশংসা করবো সংগীত পরিচালক শৈলেশ দত্তগুপ্তকে। বিশেষ করে এই প্রসংগে 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' সংগীতটির কথা উল্লেখ করতে চাই। সম্ভবতঃ শ্রীমতী কল্যাণী দাস গেয়েছেন এই গানখানি। —শীলভদ্র

শেষনিবেদন (সমালোচনা)

ডি, জি পিকচার্সের 'শেষনিবেদন' রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের 'আলোছায়া' কাহিনীকে কেন্দ্র করে শেষ নিবেদন গড়ে উঠেছে। চিত্ররূপ দিয়েছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সরযু, ছবিবিশ্বাস, মলিনা, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী, ডি, জি, নবদ্বীপ, কমল চট্টো প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিনোদ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালনা করেছেন ডি,জি।
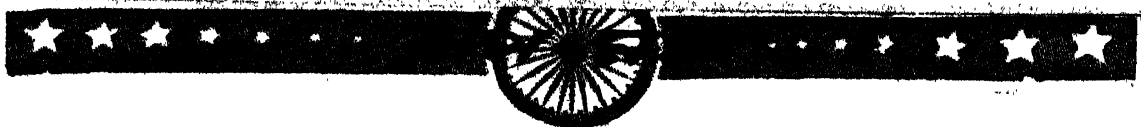
নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে আমাদের আস্থা অর্জন করেছিলেন কিন্তু আলোচ্য চিত্রে সে-আস্থা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত আকার দেখিয়ে তিনি নিজের দুর্বলতার কথা কোনমতেই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবেন না। যে কয় পাতার কাহিনীই হউকনা কেন—কাহিনীর মূলধম রেখে তাকে রূপ দেওয়া যেত। এবং এমন অনেক নাটকীয় পরিস্থিতির আভাষ শরৎচন্দ্রের মূল কাহিনীতে ছিল, যেগুলি চিত্র-রূপদাতার মোটেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তারপর নায়ক নায়িকা নির্বাচনেও শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির মর্যাদা হানি হয়েছে। সুরমাকে যখন আনা হয় বৃন্দাবন থেকে, তখন তার বয়স তেরোর বেশী ছিলনা এবং যজ্ঞদত্তের আঠারো। সেখানে যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকা রূপে ছবি বিশ্বাস ও মলিনা দেবীকে কোন দর্শক-মনই মেনে নেবে না। তারপর চিত্ররূপে যে কাহিনীর সংগে আমাদের পরিচয় হয়েছে তার ঘটনা সংস্থাপনাকেও প্রশংসা করতে পারবো না। অনেক অবান্তর চরিত্র ও ঘটনা মূল কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করেছে।

অভিনয়াংশে মলিনা, সরযূ, ছবি বিশ্বাস, নবদ্বীব নিভাননী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ছবিটির সংগীত্ত পরিচালনাকে প্রশংসা করবো। তাও বৃন্দাবনের কীর্তনের দৃশ্যে অহী সান্যালের বিকৃত মুখভংগী রুচি বিগর্হিত। —সুশীল মণ্ডল

কেন সে এ পথে এলো ?— কেন সে এলো অধঃপতনের ও পাপের পথে ?—
কেন বাংলার এই অনামী তরুণ সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেবা করতে গিয়ে নিজে হল রিক্ত, বঞ্চিত, অধঃপতিত ?

সমাজ ও সংসার-জীবনের জাগ্রত আলেখ্য

—অপরাংশে—

আশু, জহর, অহী, নৃপতি, অলকা তুলসী, মাষ্টার লক্ষ্মী ও আরো অনেকে।

★

কলিকাতার বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তি প্রতীক্ষায় !

আপনার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান

ছায়া ও কায়া লিমিটেড

(ভারতীয় আইনে সমিতিবদ্ধ)

অনুমোদিত মুলধন—৫০০০,০০০ টাকা **বিক্রিত মুলধন—১৮০,০০০**

সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি সুপরিচিত পরিচাকবর্গ ও ম্যানেজিং এজেন্টস দ্বারা পরিচালিত—কোম্পানীর অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য উত্তম সর্ত্তে, উচ্চ বেতনে ও কমিশনে ভারতের সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষ ও মহিলা প্রভিন্সিয়াল ও ডিষ্ট্রিক্ট অর্গানাইজার ও এজেন্ট চাই।

সৎ ও কর্ম্মঠ অর্গানাজারদের কোম্পানীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে স্থায়ী কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে। আমাদের যশোহর ও খুলনার শেয়ার হোল্ডারদের টাকা,খুলনার ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়নে ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা লওয়া হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্
মেসার্স বিল্লা ব্রাদার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ
১৬।১৭ কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

রূপ-মঞ্চ

৪র্থ বর্ষ] পৌষ—মাঘ, ১৩৫১ [১২শ সংখ্যা

মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্য-কলার সচিত্র মাসিক।

বঙ্গীয়-চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র।

কার্যালয়ঃ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন ঃ বি, বি, ঃ ৪২৯২

প্রতি বাংলা মাসের ৩০শে রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হয়।

মূল্য আট আনা।

সডাক এক বছরের গ্রাহক মূল্য আট টাকা।

এক বছরের কম কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না।

নূতন লেখকদের উপযুক্ত রচনা রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হয়।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠাবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

—পৃষ্ঠপোষকতায়—

নিতাইচরণ সেন
এন, সি, ঘোষ
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
বিভূতি ভূষণ দত্ত
এস, কে, রায়
এইচ বোর্ণ

আমাদের আজকের কথা—

দেশীয় ছবি দিন দিন দেশবাসীর অশ্রদ্ধার ভাগই কুড়িয়ে নিচ্ছে বেশী—দেশীয় ছবি সম্পর্কে এই অভিযোগ কানের পরদায় বার বার এসে আঘাত করছে। এই অভিযোগকে নেহাৎ অযৌক্তিক বলে আমি উড়িয়ে দিতে চাই না, তবে, আমি অভিযুক্ত করবো দেশীয় ছবিকে নয়—ছবির বিরুদ্ধে যাঁরা অভিযোগ এনে থাকেন, তাঁদের।

মাটির একটা 'ডেলা' সুনিপুণ ভাস্করের হাতে কেমন সুষ্ঠু রূপ পায়—অপটু পটুয়ার হাতে যদি তার সেরূপ ফুটে উঠতে না দেখি, দোষ টা কী ঐ মাটির 'ডেলা'টার—না অনিপুণ হাতের?

মার্কিনী-বিলেতী-ও রুশীয় ছবির জৌলুষে যদি আমাদের চোখ ঝলসে যেতে পারে তবে আমাদের দেশীয় ছবিতে সে জৌলুষ থাকবে না কেন? না-থাকলে যদি ছবির ভাগ্য নিয়ন্তাদের অভিযুক্ত করা হয়, সে-অভিযোগ অস্বীকার করবার মত কী যুক্তি থাকতে পারে?

ছবির ভাগ্য নিয়ন্তা বলতে যাঁরা ছবির সৃষ্টি করেন এবং যাঁদের জন্য ছবি সৃষ্টি করা হয়। একদিকে প্রযোজক (পরিচালক, শিল্পী ও বিশেজ্ঞ, গোষ্ঠী এদেরই আওতায়) অপর দিকে দর্শক। অর্থনীতির দৃষ্টিতে তিনটী Factor-ই দেখতে পাই, বিক্রেতা—পণ্য ও ক্রেতা ও বিক্রেতা হচ্ছেন প্রযোজক। ছবি তৈরী করে যিনি ব্যবসা করেন। পণ্য হচ্ছে ছবি। ক্রেতা হচ্ছি আমরা দর্শকেরা।

বিক্রেতা ও ক্রেতা অর্থাৎ ছবির প্রযোজক এবং দর্শকদের তিন তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম প্রযোজকদেরই কথা বলি। (১) নিছক শিল্পদৃষ্টিতে যাঁরা ছবি তোলেন—এই শ্রেণীর প্রযোজক দেশীয় প্রযোজকদের ভিতর আদৌ নেই। (২) ব্যবসাও হ'লো শিল্পও বাঁচলো এই শ্রেণীর প্রযোজকদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—হাতের কর গুণে বলা যায়। (৩) নিছক ব্যবসায়ী শ্রেণী—ব্যবসায়ী শ্রেণী ঠিক

নয়, ব্যবসায়ে ফড়িয়া শ্রেণীর প্রযোজকের সংখ্যাই বেশী। ব্যবসায়ী হিসাবে এদের বুদ্ধি মত্তার প্রশংসা করা চলে না। এরা আত্মঘাতী শ্রেণীর ব্যবসায়ী। ও দেশীয় ব্যবসায়ী-দের মত এদের হাত পেকেও ওঠেনি—পাকাতেও এরা নারাজ। এরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'দুদিন বইত নয়' দলীয়। অর্থাৎ ব্যবসায় ক্ষেত্রে বনেদ এদের কায়েমী নয়। তাই দেখতে পাই দু'দিন বাদেই এদের ভিত নড়ে ওঠে—বেড়া খসে পড়ে।

দর্শকদেরও তিনটী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) সাংবাদিক শ্রেণীর দর্শক—অনুসন্ধিৎসু যাঁরা। দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে এই দেখা আর শোনা সম্পর্কে যাঁদের বিচার শক্তি জন্মেছে—perception যাঁদের অন্যান্য শ্রেণীর দর্শকদের চেয়ে অনেক বেশী। (২) শিক্ষিত, সুরুচি সম্পন্ন দর্শকেরা পড়েন এই শ্রেণীতে—যাদের সংখ্যা সাংবাদিক শ্রেণীর দর্শকদের মতই মুষ্টিমেয়, হয়ত কিছুটা বেশী সংখ্যাতে (৩) শতকরা প্রায় ৭০ জন দর্শককে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা চলে—যাদের রুচি এবং শিক্ষার প্রশংসা করা যায় না।

আমার বর্তমান আলোচনা থেকে প্রযোজকদের বাদ দিলাম। আমি যা বলতে চাই তা আমাদেরই নিয়ে। দেশীয় ছবির বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে, আমরা তার প্রতিকার করতে পারি কি না—যে কোন দরদী দর্শকের তাই কি ভেবে দেখা উচিত নয়? ধরে নিলাম দেশীয় ছবির উন্নতি বর্তমান প্রযোজক গোষ্ঠীর দ্বারা সম্ভবপর নয়—মেনে নিলাম বেশীর ভাগ ঐ 'দুদিন বইত নয় দলীয়'—ব্যবসা ক্ষেত্রে পচা মাল চালিয়ে যারা ট্যাক ভারি করে চম্পট দিতে চান কিন্তু মালটা পচা কী তাজা তা বেছে কিনবার যদি আমাদের যোগ্যতা থাকে—আমরা যদি তাই কিনি, তাহলে তাদের ঐ পঁচা মাল কী গুদাম জাত হয়েই পঁচতে থাকবেনা? ব্যবসা জগতে তাদের স্থায়ীত্ব কী দু'দিন থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে আসবেনা? হয় তাদের পঁচা মালের ঝোলা ঝুলি ঝেড়ে নূতন করে ব্যবসা পাততে হবে, নয় পূর্বের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাই আমরা কিন্তু যাদের শতকরা ৭০ জন—যারা মাল বেছে কিনতে পারিনা—অর্থাৎ ৭০ জন দর্শক যারা বিচার বুদ্ধি দিয়ে ছবির মান নির্ণয় করতে অক্ষম—শতকরা ৩০ জনের এদের দলে তুলে নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এদের বিচার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করতে হবে; এই জন্য সর্ব প্রথম সর্বশ্রেণীর দর্শকদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ৭০ ভাগ যদি ৩০ ভাগের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে—তখন ছবিখানি ভাল কী মন্দ তা বেছে নিতে বেগ পেতে হবেনা এবং বাজারের ঐ পঁচা মাল অর্থাৎ যে ছবির রুচির দিক থেকে—শিল্পের দিক থেকে—শিক্ষার দিক থেকে—জাতীয়তার দিক থেকে কোন মূল্যই থাকবে না—তার বিরুদ্ধে আর কিছু না পারলেও অসহযোগ আন্দোলন সুরু করা যাবেত? দর্শক-সাধারণকে সংঘবদ্ধ করে জনমত গঠন করা—দেশ এবং জাতির অগ্রগতির সহায়করূপে চলচ্চিত্র শিল্পকে নিয়োজিত করাই বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মূল উদ্দেশ্য। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির প্রচেষ্টা আজও জয়যুক্ত হয় নি—গঠন-মূলক পরিকল্পনার কথা ছেড়েই দিলাম—এখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে দর্শক সাধারণকে সংঘবদ্ধ করতেও আমরা পারিনি—বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির একজন উদ্যোক্তা হয়ে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে একটুও লজ্জা বোধ করি না। এই দায়িত্বশীল প্রচেষ্টা সেদিনই জয়যুক্ত হবে, যেদিন সর্ব শ্রেণীর দর্শকদের মিলিত সহযোগীতা এবং সাহায্য আমাদের শক্তিশালী করে তুলবে। তাই দেশীয় চিত্রের উন্নতকামী প্রত্যেক দর্শকদের কাছে আবেদন,—পাড়ায় পাড়ায়, শহরে শহরে—যেখানে প্রেক্ষাগার রয়েছে অন্ততঃ কমপক্ষে দশজন দর্শক একত্রিত হয়ে কেন্দ্রীয় সমিতির সংগে যোগাযোগ রেখে এক একটি শাখা সমিতি গড়ে তুলুন। প্রতি দশজন মিলে যে সমিতি গড়ে তুলবেন—বিচার-বুদ্ধিতে যিনি অপর দর্শকদের বিশ্বাসভাজন হবেন—তাকে দল রক্ষকরূপে নির্বাচিত করা হবে। কোন ছবি দেখে তার দোষগুণ বিচার করে কেন্দ্রীয় সমিতিতে পাঠাতে হবে। বর্ষশেষে বিভিন্ন শাখাগুলির মতামত রূপমঞ্চে আলোচনা করা হবে। একই সহরে একাধিক সমিতি গড়ে উঠলে পরস্পরের ভিতর

যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। এমন কী কোন পরিবারে দশজনের বেশী দর্শক থাকলে—পরিবারের নিজস্ব আওতায় এভাবে শাখা সমিতি গড়ে তুলতে অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিবারের যিনি কর্তা অথবা মাননীয় তিনিই দলরক্ষক হবেন—এবং অন্যান্যদের ছবি দেখে এসে ছবির দোষগুণ বাতলে দেবেন।

চতুর্থ শ্রেণীর চিত্রের বিরুদ্ধ-সমালোচনা প্রকাশিত হলেও Box অফিসের বাহার দেখে অনেক সময় অনেক প্রযোজক প্রতিষ্ঠানই হুমকি দেখিয়ে থাকেন এবং প্রায়ই আমাদের কাণে আসে—"আরে মশায়, আপনারা গলাবাজি করলে কী হবে—দেখেছেন দর্শকেরা কী ভাবে ছবিখানাকে নিয়েছে।" ছবির গুণাগুণ বিচার করে যদি দর্শকেরা ছবি দেখতে যান তাহলে ঐ Box অফিসের বাহার নিমিষেই ঘুরে যাবে—এবং পরবর্তী চিত্র প্রয়োজনার সময় অন্ততঃ একটু ভেবে কর্তৃপক্ষ অগ্রসর হবেন। তাই অযথা দেশীয় ছবির বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে দেশীয় ছবির উন্নতির পথে যে দায়িত্বটুকু রয়েছে আমাদের দর্শকদের হাতে, তাই কি সর্বপ্রথমে করা উচিত নয়?

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

গত বসন্ত

(গল্প)

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সুশীল বাবু এক মক্কেলকে টেলিফোন করিতেছিলেন।

এটর্নী সুশীল বসুর বয়স হইয়াছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কলিকাতার সহরে বাড়ীর পর বাড়ী তুলিয়া, নানা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের একাউণ্ট খুলিয়া, নানা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ও কটনমিলের অংশীদার হইয়া জীবনকে তিনি সোনালী স্বপ্নে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছেন। সে জীবনে কোন দ্বন্দ্ব নাই, কোন জটিলতাও না। অফিসের কাজ কর্ম সারিয়া সুশীলমাধবের বাড়ী ফিরিতে পাঁচটা বাজিত। বাড়ী ফিরিয়া অল-ওয়ার্ল্ড রেডিও সেটটা খুলিয়া দিয়া খুশীমত খানিকটা গান ও খবর শোনার সংগে সংগে চলিত চা-পান ও জলযোগ। স্ত্রী অমিতা এবং ছোট দুটি ছেলেমেয়ে থাকিত সামনে বসিয়া— এই সময়টুকুই সমস্ত দিনমানের মধ্যে সুশীলমাধবকে একান্ত সাংসারিক ভাবে পাইবার দুর্লভ অবসর। জলযোগের সংগে ছোট খাট পারিবারিক আলোচনার পর সুশীলমাধব অমিতা ও ছেলেমেয়ে দুইটিকে লইয়া মোটরে খানিকটা ঘুরিয়া আসেন। বাড়ী ফিরিয়া বিস্তীর্ণ লনের একাংশে খানিকটা পায়চারী করেন। তারপর এক কাপ কফি কিম্বা কোকো পান করিয়া নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া চামড়া বাঁধান মোটা মোটা কেতাবগুলোর মধ্যে ডুবিয়া যান। এমনি করিয়া কাটে রাত এগারটা পর্যন্ত। তারপর নৈশ আহার সারিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। সকাল আটটা হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আবার সেই মোটা মোটা বই, মামলা-মকদ্দমার নথি-পত্র, বিভিন্ন কোম্পানীর ডিরেক্টারদের সভাব কার্য বিবরণী পাঠ এবং বাকী আধঘণ্টার মধ্যে আহারাদি সারিয়া ঠিক এগারটার সময় মোটরে চড়িয়া অফিস-যাত্রা। সংক্ষেপে ইহাই সুশীলমাধবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং পনের বছর ঠিক এমন ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেদিন হঠাৎ—

সুশীলমাধব অফিস হইতে তাঁহার কোন মক্কেলকে টেলিফোন করিতেছিলেন। টেলিফোনের সংযোগ সবেমাত্র সাধিত হইয়াছে, সুশীলমাধব ভাবিতেছিলেন, এইবার তাঁহার মাড়োয়ারী মক্কেলের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রকট হইয়া উঠিবে; কিন্তু সেরকম কিছুই হইল না; সুশীলমাধবের হঠাৎ মনে হইল, টেলিফোনের ধাতুনির্মিত শ্রবণ যন্ত্রটার মধ্যে সুরের স্রোত বহিতেছে।

মৃদু, মসৃণ, কোমল নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল: আপনি কি সুশীল বাবু?' সুশীল বাবু কি উত্তর দিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে অপর প্রান্ত হইতে সেই সঙ্গীত-সুমধুর কণ্ঠস্বর আবার শুনা গেল: আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেচি। আপনার গলার স্বর ঠিক আগের মতই আছে।'

সুশীলমাধব বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, নতুন এক জগৎ হইতে কে যেন তাঁহার সহিত কথা বলিতেছে। সে জগৎ কেবল ফুলের গন্ধ আর পাখীর গান, নূপুরের রিনিঝিনি এবং ঝর্ণার কলতান দিয়া গড়া, কলিকাতা সহর হইতে তার দূরত্ব যেন দশ বিশ হাজার মাইলেরও বেশী।

প্রায় মিনিট খানেক পরে সুশীলমাধব বলিলেন, কিন্তু-আপনাকে……'

অপর প্রান্তবর্তিনীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

'ঠিক চিনতে পারচেন না, এই তো? চেনা একটু শক্ত বৈকি! কিন্তু দেখুন, আমার ঠিক মনে আছে।'

সুশীলবাবু নিজের কাছেই লজ্জায় অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। অপর প্রান্তবর্তিনী এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের পরিচয় দিলেন।

"আপনাদের কলেজের পাশেই আমাদের বাড়ী ছিল। যে ঘরটায় আপনাদের ইতিহাসের ক্লাস হোতো, সেইঘর থেকে আমাদের বাড়ীর একখানা ঘর পরিষ্কার দেখা যেত। এইবার আশা করি মনে করতে পারচেন।'

সুশীলমাধব কোন রকমে ঢোক গিলিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। টেলিফোনে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, তাই…'

'কতদিন আগের কথা বলুন তো? প্রায় বাইশ বছর হবে কি বলুন? কিন্তু একদিন আসুন না আমাদের বাড়ীতে? আমি…'
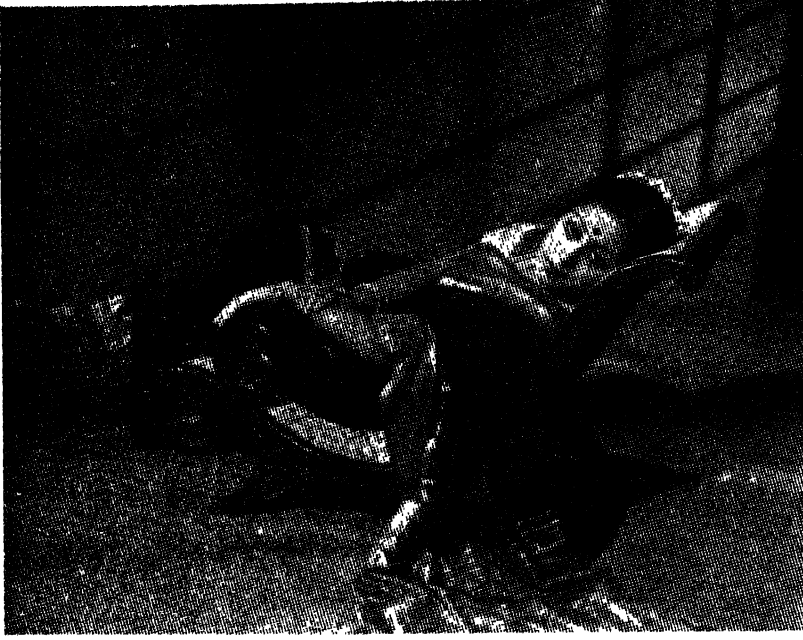
প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'সংসার' চিত্রে কানন দেবী

পাখাটা আর একটু জোর করিয়া চালাইয়া দিবার হুকুম দিলেন।

শনিবার, অফিসের আর সবাই সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছে। সুশীলমাধব অসহায়ের মত একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কোটের বুক পকেট হইতে দামী চামড়ার সিগার কেশ বাহির করিলেন। সিগারটা ধরাইয়া কতকক্ষণ যে অন্যমনস্কের মত ধুঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন তাহার কোন হিসাবই রহিল না।

গল্প কিন্তু কেবল মাত্র এই দিনটিকে লইয়া নয়, ইহার আগেকার দিনগুলিকেও লইয়া।

সুশীলমাধব বলিলেন, কিন্তু আপনার বাড়ীর নম্বর তো—'

অপর প্রান্ত হইতে উত্তর আসিল: কবীর রোড ···নম্বর। নাম বললেই বাড়ী সকলে দেখিয়ে দেবে। নিশ্চয়ই আসছেন তো?'

'নিশ্চয়।'

'কবে বলুন তো?'

'ধরুন, আজই।'

'সত্যি বলছেন? আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্চে না।'

'সত্যি, বিশ্বাস করুন।'

'নম্বরটা ভুলেযাবেন না কিন্তু!'

'লিখে রাখলাম।'

বাঁ হাতে পেন্সিল দিয়া সুশীলমাধব নম্বরটা ব্লটিং প্যাডের উপর লিখিয়া লইলেন, তারপর টেলিফোনের রিসিভারটা নামাইয়া তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন। অফিসের বেয়ারাটাকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে বলিলেন; বেয়ারার হাত হইতে কাচের গ্লাসটা নিজের হাতে লইয়া, ইলেকট্রিক

সুশীলমাধব তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়েন। ইতিহাসের ক্লাসটা ছিল কবিতা লিখিবার, ছবি আঁকিবার লিজার পিরিয়ড। সুশীলমাধব কবিতাও লিখিতেন না, ছবিও আঁকিতেন না। কখনও পাশের ছেলেদের সংগে চুপি চুপি গল্প করিতেন,কখনও বা অন্যমনস্কের মত বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার বসিবার আসনটা ছিল ক্লাসের পিছন দিকে এবং তাহার পাশেই ছিল প্রকাণ্ড একটা জানালা। জানালার পাশেই অতি-প্রশস্ত একটা গলি। গলির অপর দিকটায় সারিসারি কতকগুলি বাড়ী। সামনের বাড়ীর ছাদ এবং একটা ঘরের কিয়দংশ ক্লাস হইতে দেখা যাইত। দেখিবার মত উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কিন্তু ঘটিত কদাচিৎ। কখনও হয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটী বালক ঘুড়ি উড়াইতে উঠিত, কখনও ঝি আসিয়া ভিজা কাঁথা শুকাইতে দিয়া যাইত। কখনও এক বৃদ্ধা ছোট একটি লাঠি হাতে করিয়া ঘরের চৌকাটে বসিয়া ছাদে শুকাইতে দেওয়া বড়ি পাহারা দিতেন। একদিন কিন্তু পট-পরিবর্তন হইয়া গেল। সুশীলমাধব অন্যমনস্কভাবে ছাদের দিকে চাহিয়াছিলেন; হঠাৎ এক সময় তিনি আবিষ্কার

করিলেন অর্ধ-উন্মুক্ত কাচের জানালার ফাঁক দিয়া ঘন কালো দুইটি চোখ তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে। আবিষ্কারটা উপলব্ধি করিবার সংগে সংগেই সুশীলমাধব ঘামিয়া উঠিলেন, মুখটা রাঙ্গা হইয়া উঠিল কিনা—সামনে আয়না না থাকায় ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন, মেয়েটি কিন্তু সরিয়া গেল না। পর পর চার পাঁচ দিন ঠিক এই ব্যাপার ঘটিল। তারপর একদিন ট্রামে একেবারে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ, আলাপ এবং পরিচয়। প্রথম পরিচয়ের সে দিনগুলির বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্ব কথা দিয়া বলিয়া বুঝান যায় না, কবিত্ব করিয়া বলা যায়, হঠাৎ সুশীল-মাধব যেন বাঁচিবার অর্থ নতুন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কলিকাতা সহরকে হঠাৎ তাঁহার কাছে স্বপ্ন-পুরীর মত মোহময় মনে হইয়াছিল। সহজ কথায় ট্রামের পরিচয় হইতে একদিন সীমাদের অন্দর-মহলে প্রবেশের অনুমতি মিলিয়াছিল। সীমাদের বাড়ীর সবাই ছিলেন অতি-আধুনিক রুচি ও নীতিতে অভ্যস্ত। কাজেই পরিচয়ের খেলাঘর হইতে অন্তরঙ্গতার অন্দর-মহলে পৌঁছিবার কোন অসুবিধা ছিল না। প্রথমে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ, তারপর কাহারও জন্মতিথি অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবং শেষ পর্যন্ত বিনা-ভূমিকায়, বিনাকারণে সুশীলমাধব সীমাদের বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করিয়াছিলেন। সুশীলমাধব খুব বেশী কথা বলিতে পারেন না কোনদিনই, কাজেই তখনও তিনি সীমার কলকণ্ঠের মুখরতার মাঝখানে অধিকাংশ সময় চুপ করিয়াই বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু সেই চুপ করিয়া থাকাটাই নিজের কাছে আশ্চর্যরকম উপভোগ্য মনে হইত। হাসিতে হাসিতে সীমা যখন ঘর হইতে বাহিরে যাইত সেই সময় দৈবাৎ তার আঁচলের প্রান্ত সুশীলমাধবকে ছুঁইয়া গেলে কি বিচিত্র একটা অনুভূতি সুশীলমাধবের চেতনাকে শিথিল করিয়া ফেলিত; সীমার বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই মনে হইত আবার সেখানে ফিরিয়া যাই। সীমার প্রশ্রয়ের স্নেহচ্ছায়ায় দু'জনের মধ্যে যে নৈকট্য রচিত হইয়াছিল সেটা যে হঠাৎ

'কতদূরে'-এ জহর, মলিনা ও ছয়া

ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে একথা কোন দিন মনেও হইত না। দু'জনেই যেন জানিত, তাহাদের এই পরিচয়ের মধুরতম পরিসমাপ্তি একদিন সামাজিক ভাবেই ঘটিবে। অন্ততঃ পক্ষে সুশীলমাধবের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মানুষের যে পা'টা দুর্বল সেইটাই নাকি খানায় পড়ে। তাই সুশীলমাধব এই বিবাহে তাঁর বাবাকে কিছুতেই রাজী করাইতে পারেন নাই। সুশীলমাধবের বাবা সুনীলমাধব ছিলেন কলিকাতার বনেদী বাসিন্দা। কলিকাতায় প্রকাণ্ড একটি বাড়ী ছাড়া আর সবই তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সেবায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কাজেই এক বিলাত ফেরতের মেয়েকে বউ করিয়া ঘরে আনিবার কল্পনাটা পরিপাক করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

সেইখানেই সুশীলমাধবের জীবনের এই অধ্যায়টার উপর যবনিকা পড়িয়াছিল। তিনি নিজের ইচ্ছায় আর কোনদিন সেই নিষ্ঠুর যবনিকা তুলিয়া দেখিবার কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই। এক সহরে বাস করিতে গেলে যেটুকু খবর অনিচ্ছা সত্বেও রাখিতে হয় সেইটুকুই সুশীলমাধব এতদিন রাখিতেন, তার বেশী একতিলও নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বছর পনের

আগে সুশীলমাধব কি-একটা অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে গিয়া শুনিতে পান, কৃতি এক ব্যারিষ্টারের সংগে সীমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আরও বছর পাঁচেক পরে কি-একটা সূত্রে সুশীলমাধব খবর পাইয়াছিলেন, সীমার সেই ব্যারিষ্টার স্বামী হঠাৎ মোটর এক্সিডেন্টে মারা গিয়াছেন। চেষ্টা করিলে সুশীলমাধব হয়ত সীমার ঠিকানা জোগাড় করিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সব কিছুই তিনি করেন নাই। এই তো বছর পাঁচেক আগেকার কথা, সেদিন তাঁহার ছেলেবেলার এক বন্ধু আসিয়া বলিল, সীমা রেডিও এবং রেকর্ডে গান দিয়েচে। কি অপূর্ব কণ্ঠ, যেন সুরের ঝর্ণা! সমস্ত বাঙ্গালা দেশে তার জয়ধ্বনি!' একদা সেই সুর-ঝরণার মধুময় শীতল জল প্রাণ ভরিয়া, অঞ্জলি ভরিয়া পান করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল—তবু তিনি আজ পর্যন্ত এই নায়িকার গানের একখানি রেকর্ড কিনিয়া বাড়ীতে বসিয়া শুনিবার চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু কতবছর, কতমাস, কতদিন ও রাত্রির ব্যবধান এক নিমিষে দূর করিয়া দিয়া সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর আজ যখন কাণে পৌঁছিল, তখন কেন যে সুশীলমাধবর নিজের কাছেই হঠাৎ একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন, সে কথা বলা শক্ত। সবপ্রথম যে কথাটি তাঁহার মনে হইয়াছিল সেটা এই যে, সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের আজও এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই।

শুধু কণ্ঠস্বর নয়, সুশীলমাধবের মনে হইতে লাগিল বাইশ বছর আগেকার সেই মেয়েটির কিছুরই কোন পরিবর্তন হয় নাই; লীলা, লাস্য, সপ্রতিভ লজ্জা এবং অকুণ্ঠিত উচ্চহাস্য...সব দিক দিয়া সীমা ঠিক সেই আগের মতই আছে। মাঝখানে বাইশটা বছর পার হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সময়ের সেই জলস্রোত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

সুশীলমাধব বেয়ারাকে গাড়ি হাজির করিবার হুকুম দিলেন। হুকুম প্রতিপালিত হইতে দেরী হইল না। তিনি

মোটরের পিছন দিকের সীটে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন। শনিবারের অপরাহ্নে অফিস পাড়ায় জনগণের অসম্ভব ভিড়। ড্রাইভার দক্ষতার সংগে ভিড় কাটাইয়া বাড়ীর দিকে গাড়ি লইয়া যাইতেছিল। সুশীলমাধব ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইয়া মার্কেটের দিকে যাইতে বলিলেন এবং পিছনের সিটে হেলান দিয়া ঠিক তেমনই বসিয়া রহিলেন। মনে হইল উনিশ' তেতাল্লিশ খৃষ্টাব্দের কর্মব্যস্ত এক শনিবারের অপরাহ্ণ পার হইয়া তিনি কত দিনের কত পরিচিত সন্ধ্যা, রাত্রি ও অপরাহ্নের স্বপ্নময় অনুভূতির রাজ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। আজ তাঁহাকে নেশায় ধরিয়াছে। অদ্ভুত, উগ্র এক নেশা। সেই নেশার রঙে মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র জ্যোৎস্না রাত্রির মত অবাস্তব মনে হইতেছে, মনে হইতেছে তিনি যেন দিগ্বিজয় শেষ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন, আর পথের দুইধারে কাতারে কাতারে লোক জমা হইয়াছে তাঁহারই সাড়ম্বর সম্বর্ধনার জন্য। এই জনস্রোত ভেদ করিয়া তিনি যখন রাজপুরীতে পৌঁছিবেন তখন বাইশ বছরের প্রতীক্ষারত একটি হৃদয় ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে।

রাজপুরীতে পৌঁছিবার আগেই কিন্তু মার্কেটের সামনে মোটরের চাকা থামিয়া গেল। সুশীলমাধব মার্কেটের সমস্ত ফুলের স্টলগুলি বাছিয়া বাছিয়া একরাশ গ্ল্যামোরাস লিলি কিনিয়া ফেলিলেন। ফুলগুলি রীতিমত দুর্লভ হঠাৎ সেদিন আসিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই দোকানদার রীতিমত চড়া দামই আদায় করিল। ফুলগুলি হাতে লইয়া সুশীলমাধব আবার মোটরে গিয়া বসিলেন। পাতলা কাগজে মোড়া ফুলগুলির উপর আস্তে আস্তে হাত রাখিয়া তিনি যেন আবার স্বপ্নের সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন।

ড্রাইভারকে বলিলেন, কবীর রোড।

এদিকে ভিড় তখন অপেক্ষাকৃত কম, মোটর চল্লিশ মাইল স্পীডে ছুটিতে লাগিল। আর গাড়ির ভিতরে বসিয়া সুশীলমাধব ভাবিতে লাগিলেন প্রথম সম্ভাষনের সঙ্কট মুহূর্তটি কিভাবে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সীমা প্রথমেই কি বলিতে পারে?

'সত্যিই এলেন তা হলে?'

'বাইশ বছর পরে সময়ের স্রোত থেমে গেল, ঠিক তাই নয়—?'

'সংসার' চিত্রে জহর, ছবি ও কানন

'ভাগ্যে টেলিফোনে গলার স্বর চিনতে পেরেছিলাম, নইলে আরও কত বাইশ বছর কেটে যেত কে জানে!'

এর যে-কোনটি এবং সব কয়টি প্রশ্নই হয়ত সীমা করিতে পারে। কিন্তু সুশীলমাধব তাহার কি উত্তর দিবেন? সলজ্জ একটু হাসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার বয়স কবে পার হইয়া গিয়াছে। পাল্টা অভিযোগ বা অভিমান প্রকাশ করাটাও নিতান্তই ছেলেমানুষী। তা-হলে—?

অর্ধসমাপ্ত চুরুটটা হাত হইতে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া

সুশীলমাধব নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হইলে… ?

এমন সময় ড্রাইভার হঠাৎ বলিয়া উঠিলঃ গাড়ীতে তেল কম আছে, হুজুর, এক গ্যালন নিয়ে নিলে ভাল হ'তো।

'কুপন আছে সংগে ?'

'আজ্ঞে, আছে।'

'টাকা—?'

'আজ্ঞে, না। আপনার কাছে—?'

'আমার কাছেও নেই।'

ড্রাইভার বলিল,—তা হলে—?'

অফিসে আসিবার সময় সুশীলমাধব কোন দিনই সংগে বেশী টাকাকড়ি লইয়া আসেন না, কারণ দরকার হয় না এবং অ-দরকারে সংগে বেশী টাকা রাখিবার মত বে-হিসাবী লোক এটর্নী-সুশীলমাধব নন। আজ সংগে যা' ছিল তা' গ্ল্যামোরাস লিলির দাম মিটাইতেই শেষ হইয়া গিয়াছে। সুশীলমাধব মনে মনে ড্রাইভারের উপর চটিয়া উঠিলেন।

লোকটা একেবারে বুদ্ধি বিবেচনাহীন। ফুল কিনিবার আগে সে যদি বলিত গাড়ীতে পেট্রল কম আছে, তা' হইলে কিছু ফুল কম কিনিয়া লইলেই চলিত, কিম্বা না কিনিলেই বা কি এমন ক্ষতি হইত!

সুশীলমাধব একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিলেন, পৌছান যাবে তো?'

ড্রাইভার বলিল, আজ্ঞে তা যাবে।'

সুশীলমাধব বলিলেন— তা' হলে চলো। ফেরবার সময় যা হয় করা যাবে।'

বলিলেন বটে, কিন্তু কেবলই মনে হইতে লাগিল, অফিস হইতে বাড়ীতে গিয়া, বিকালের দিকে সংগে টাকাকড়ি লইয়া বাহির হইলেই ভাল হইত। সহরের এই অঞ্চলে তাঁহার যাতায়াত খুব কম, এদিককার কোন পেট্রোলের দোকানের মালিকের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। নাঃ, বাড়ি হইতে ঘুরিয়া আসাই সব দিক হইতে উচিত ছিল। বাড়ীর কথা মনে হইবার সংগে সংগে সুশীল মাধব ভাবিতে লাগিলেনঃ অমিতা এতক্ষণে কি করিতেছে। শনিবার অফিসে তাঁহার কাজকর্ম কিছুই থাকে না, দেড়টা হইতে দুইটার মধ্যে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া যান; কোন দিন তাহার বেশী দেরী হয় না। প্রতি শনিবার বাড়ী ফিরিয়া তিনি দেখিতে পান তাঁহার ঘরের কালো পাথরের টেবিলটার উপর লেবুর সরবত শাদা পাথরের গ্লাসে সরপোশ ঢাকা রাখা আছে। অন্যদিন হইলে আজ এতক্ষণে তিনি ইজিচেয়ারটায় পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িতেন, খবরের কাগজ কিম্বা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তাঁহার দুই চোখে হালকা ঘুমের আমেজ নামিয়া আসিত; মুখের চুরুটটা কখন নিভিয়া যাইত তাহা তিনি টেরও পাইতেন না।

সুশীলমাধব নিজের উপর হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠিলেন। নাঃ বয়স বাড়িলেও সত্যিই তাঁহার বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারেই হয় নাই। নহিলে টেলিফোনে আকস্মিক আমন্ত্রণ পাইয়া কেউকি এই প্রচণ্ড গরমে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; ফুল কিনিয়া পকেটের সমস্ত পয়সা খরচ করিয়া ফেলে, গাড়ীতে বাড়ী ফিরিবার মত পেট্রল

রহিল কি না তার খবরটা রাখিতে ভুলিয়া যায়!

আর এত জিনিষ থাকিতে হঠাৎ, তাড়াতাড়ি এত পয়সা খরচা করিয়া এতগুলি ফুল কিনিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? ফুল কিনিয়া কবিত্ব করিবার বয়স কি এখনও আছে? আর, কোট প্যাণ্ট পরা অবস্থায় হাতে একরাশ ফুল লইয়া সীমার সামনে গিয়া দাঁড়ানও কি সত্যই সম্ভব? খুঁজিলে হয়ত সীমার গালের ঠিক উপরের দিকের চুলগুলির মধ্যে দুই একটি রূপালী রেখা দেখা যাইবে, সে দিনের লাস্যচপলতার পরিবর্তে হয়ত দেখা যাইবে ভাবনিবিড়, প্রশান্ত গাম্ভীর্য. তাহার সম্মুখে গ্ল্যামোরাস লিলির গুচ্ছ কি বিষদৃশতার লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়িবে না? তাহার চেয়ে ফুলগুলি ড্রাইভারের মারফতে

'দ্রৌপদী' চিত্রের নায়িকা সুশীলারাণী

সীমার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই সব চেয়ে শোভন ও সঙ্গত। শুধু ফুলগুলি পাঠাইয়া দেওয়ার মধ্যে হয়ত অভদ্রতার একটু রেশ থাকিয়া যাইবে। ওই সংগে কয়েক ছত্রের একটা চিঠি যদি লিখিয়া দেওয়া যায়. তা হইলে সে অভিযোগ হইতেও বেকসুর খালাস। চিঠিতে কি লেখা যায় সুশীলমাধব মনে মনে তাহারই খসড়া করিতে লাগিলেন।

'বান্ধবী'—সে বড় বেখাপ্পা শোনায়; তাহার চেয়ে সুচরিতাসুই ভাল! এই শব্দটিতে সম্বোধনগত সব রকম ত্রুটি অনায়াসেই ঢাকিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তারপর?

'হঠাৎ একটা জরুরী কাজে যাইতে পারিলাম না।' না, এটা অত্যন্ত মামুলী এবং অভদ্রতা; যে সীমা বাইশ বছর পরেও তাঁহার কণ্ঠস্বর অনায়াসে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার সহিত এই রকম অশোভন ব্যবহার করিবার কোন অর্থ হয় না। তাহার চেয়ে অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় সংক্ষেপে অথচ কবিত্ব করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাক—"বাইশ বছর যাহাকে স্মৃতির বেদীতে বসাইয়া পূজা করিয়াছি সামনা সামনি দাঁড়াইয়া যদি আমার এত দিনের ধ্যান মূর্তির সংগে তাহার কোন সাদৃশ্য খুজিয়া না পাই, সেই ভয়ে দূর হইতে পূজার অর্ঘ পাঠাইলাম।" হ্যাঁ, এই বেশ চমৎকার শুনাইবে। অনাদৃতা বাঙ্গলা ভাষার উপর এখনও তাঁহার এতখানি দখল আছে মনে করিয়া সুশীলমাধব মনে মনে গর্ব বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটু পরে নিজের কাছেই যেন লজ্জা হইতে লাগিল। 'বাইশ বছর যাহাকে স্মৃতির বেদীতে বসাইয়া...শুনিতে এবং পড়িতে বেশ রোম্যান্টিক, কিন্তু এই বাইশ বছরের প্রথম কয়েকটা মাস ছাড়া সুশীলমাধব কি আর বাইশটা দিনও তাকে স্মৃতির

বেদীতে বসাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন? অথচ এত বড় একটা মিথ্যা কথা লিখিয়া এক বিগতযৌবনা নারীকে সহসা উন্মনা করিবার সার্থকতা কতটুকু? তা ছাড়া, চিঠিতে এই রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ, এক দিক দিয়া ভাবিতে গেলে রীতিমত বিপজ্জনক। ড্রাইভারের দোষে কিম্বা সীমারই অসাবধানতায় চিঠিখানা যদি আর কারও হাতে পড়ে তাহা হইলে? কেউ কি এই চিঠিখানাকেই অবলম্বন করিয়া ব্ল্যাক মেলিংএর সুযোগ লইতে পারে না?

বিগতযৌবন সুশীলমাধবের আইনজীবী মন বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই পারে। ড্রাইভারই ইচ্ছা করিলে এই চিঠিখানা লইয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে পারে। সুতরাং, এই ফুলের ডালি যদি সীমার কাছে পৌঁছাইয়া দিতেই হয় তাহা হইলে নিজের হাতেই পৌঁছাইয়া দেওয়া ভাল। কিন্তু সত্যই কি ভাল? একদা যে মেয়েটি সত্য সত্যই তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, যাহার সম্বন্ধে অন্যমনস্ক ভাবে দুই একটি কবিতাও তিনি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, যে মেয়ের চোখের দিকে চাহিয়া আকাশ ও পৃথিবীকে তাঁহার নূতন করিয়া ভাল লাগিয়াছিল, বাইশ বছর পরেও কি তাহার সামনে গিয়া দাঁড়ান নিরাপদ? আজও যদি সেই দুটি চোখে বাইশ বছর আগেকার মোহাঞ্জন মাখান থাকে আর সেই নীরব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার মত শক্তি তিনি নিজের মনের মধ্যে খুঁজিয়া না পান?

চোখ বুজিয়া সুশীলমাধব কল্পনা করিতে লাগিলেন, সীমা তাঁহাকে সংসার হইতে, অমিতার কাছ হইতে অনেক, অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। সীমার কণ্ঠের গান শুনিতে শুনিতে সময় মত আফিসে যাওয়া হইতেছে না, এক সপ্তাহ পরে যদি বা একদিন অফিসে যাওয়ার অবকাশ ঘটে, বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারা যায় না। তখনই আবার সীমার কাছে ছুটিয়া যাইতে হয়।......

সুশীল মাধব জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, ড্রাইভার গাড়ি ঘুমা লেও।

সুশীল মাধব নিজের কাছে নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন: এই বাইশ বছরের প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রি দিয়া এই কলিকাতা সহরের বিশেষ এক রাস্তার বিঘে খানেক জমির উপর যে দুর্ভেদ্য দুর্গ, নিশ্চিন্ত বিশ্রামের যে দুর্লভ স্বর্গ তিনি নিজের সাধনা, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও বুদ্ধি দিয়া রচনা করিয়াছেন সেখান হইতে এমন অনায়াসে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার অধিকার তিনি কাহাকেও দিবেন না। লোকে হয়ত তাঁহাকে কাপুরুষ বলিবে কিন্তু কামনার কল্পলোকের লোভে নিশ্চিত প্রাপ্তির স্বর্গ ছাড়িয়া যাইবার সাহস তাঁহার নাই।

সুশীলমাধব বাড়ী ফিরিতেই অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, আজ এত দেরী? খুব কাজ ছিল বুঝি?

সুশীলমাধব কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, না, কিছু ফুল কিনে আনলাম। এগুলি হাতে নিয়ে আজ তোমাকে একটি গান গাইতে হবে। সেই আগেকার মত।'

অমিতা বলিল, তবু ভাল। আমি ভাবলাম কি না কি! বাবাঃ, তুমি এত ভাবিয়ে তুলতেও পারো।'

Use Less Paper,

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

—মনোজিৎ বসু

বাঙ্‌লা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যশস্বী নাট্যকার বলেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু কবি হিসাবে বিশেষ করে সঙ্গীত-রচয়ীতা হিসাবেও বাঙ্‌লাসাহিত্যে তাঁর দান বড় কম নয়। রবীন্দ্রযুগে এতবড় একটা প্রতিভা আর দেখা যায় নি বল্লেই চলে। রবীন্দ্রনাথের যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে দ্বিজেন্দ্রলালের গানেরও তেমনি আছে নিজস্ব একটা ভঙ্গিমা যার সংগে আর কারও মিলবার জো নেই। এক সময় রবীন্দ্র-ভক্ত আর দ্বিজেন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে এই সঙ্গীত সম্পর্কে রীতিমত রেষারেষি চল্‌ত।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানকে নানাশ্রেণীতে ফেলা চলে। কতগুলো গান নিছক হাসির গান, কতগুলো দেশপ্রেমের গান। সম্ভবতো তাঁর সব গানের মধ্যে এ'দুই শ্রেণীর গানেই দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব বেশী ক'রে ফুটে উঠেচে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান আজকাল হয়তো তেমন শোনা যায় না. কিন্তু এমন সময় ছিল, যখন হাসির গান বলতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানই বোঝাত। বিলেত থেকে ফিরে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখলেন বাঙ্‌লা ভাষায় হাসির গান, হাসির কবিতার বড় অভাব। সেই অভাব তিনি সত্যিই পূরণ করেছিলেন। তার 'আষাঢ়ে' বিখ্যাত হাসির কবিতার বই। রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন—"এরূপ প্রকৃতির রহস্য কবিতা বাঙ্‌লা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং আষাঢ়ের কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা, ভঙ্গী বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।" দ্বিজেন্দ্রলালের 'কর্ণ বিমর্দন' 'ইংরাজ-স্তোত্র' 'ডিপুটি-কাহিনী' 'বাঙ্গালী-মহিমা'র মত হাসির কবিতার তুলনা একরকম নেই বল্লেই চলে। এই সব হাসির অন্তরালে ছিল প্রসন্ন ব্যঙ্গ।

সেগুলি নিছক ঠাট্টাতামাসা নয় বা লঘুশ্রেণীর হাস্যরসও তাতে নেই। ঐ সব হাসির আবরণে কবির হৃদয়ের পরিচয় আছে, ব্যঙ্গ আছে কাপুরুষতার প্রতি, নির্লজ্জতার প্রতি, অন্যায়ের প্রতি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির পাতা উল্টালেই এই ধরণের হাসির কবিতা বা গান আমাদের চোখে পড়ে। কবি তার "কল্কি-অবতার" প্রহসনে লিখেছেন—

"যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট,
করেছেন যাঁরা হিন্দুসমাজ বিভ্রাট,
দেবেন তাঁদের সাজা কল্কি-সম্রাট
—রাজার উপরে রাজা যিনি, লাটের উপরে লাট।
বিলেত ফের্তা চয়, দেখবে কি হয় ;
বড় পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে চুরুট খাওয়া নয়।
চোখ বুজে পার পাবে না ব্রাহ্ম-সমুদয় !
নব্যহিন্দু লুকিয়ে খাওয়া কত দিন সয়।
দিন রাত এর ওর ঠ্যাঙ্ আর ঝোল
নেও এবার ঠ্যালা সব—বাজারে ভাই ঢোল ॥"···

ইত্যাদি।

সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বা ভণ্ডামির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্লেষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি লিখেচেন—

"কিসের প্রায়শ্চিত্ত ! theft murder ও করিনি
কারুর wife seduce করে নিয়ে আসি নি
তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নাই—
আসল এ sin গুলোর জন্যে। প্রায়শ্চিত্ত চাই
মুরগী আর শূকর খেলে, বিলেত গেলে চলে;
কিম্বা বাপ cholera কি বাজ পড়ে মলে।
এ প্রায়শ্চিত্তের অর্থ যে কি পাইনেক' খুঁজে—
এ প্রায়শ্চিত্তের Value বা কি উঠিনিও বুঝে
A society মানবে কে ? priests রা সব চোর—
আর এ society ও আজ rotten to the core,

কি খেলে দোষ আর কি খেলে নয়, বিলেত গেলে জাত যায় আর কোথায় গেলে যায় না, এই সব সামাজিক সংস্কার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের বিদ্রূপ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেচেন—

হাঁস খেলে দোষ নেই, মুরগী খেলে দোষ
প্যাঁজ খাওয়া দোষ আর হিং খাওয়া নয় ;
চীন গেলে ধর্ম থাকে, বিলেতে গেলে যায় !

'কল্কি-অবতার' প্রহসনখানির হাস্য আর ব্যঙ্গের নতুন

ভঙ্গিমা সমঝদারদের কাছে বিশেষ সমাদার লাভ করে। এই প্রহসনেরই আছে তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি হাসির গান। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রিফর্মড্ হিনডুস্” “আমরা পাঁচটি ইয়ার।” দ্বিজেন্দ্রলালের আরেকখানি বিখ্যাত প্রহসন ‘বিরহ’। আমাদের কাছে বিরহের একটা দিকই আছে, সেটা ‘করুণ’। কিন্তু হাসিররাজ্যে যার একচ্ছত্র আধিপত্য তাঁর কাছে বিরহের রহস্যের দিকটাই ধরা পড়েছে! ‘ষ্টার-থিয়েটারে’ যাঁরা ‘বিরহ’ নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন, এমন অনেকের মুখে শুনেছি,—নাট্যকার তখনও বিশেষ পরিচিত নন, কিন্তু এ বিরহে-ই তাঁর প্রশংসা। দ্বিজেন্দ্রভক্ত এখনও যাঁরা আছেন, তাঁরা বিশেষ করে “হেসে নাও দু’দিন বইতো নয়, “আর তোমার বিরহে সই রে দিবানিশি কত সই” গান দু’খানির উল্লেখ করে থাকেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের আরেকখানি বিখ্যাত প্রহসন—‘ত্র্যহস্পর্শ”। এই প্রহসনখানি এখনও মাঝে মাঝে অভিনীত হতে দেখা যায়। “পারত জন্ম না কেউ বিষ্যুৎ-বারের বারবেলা”’র মত নির্মল আনন্দরসের গান এই ত্র্যহস্পর্শেই স্থান পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের আগে বা পরে এমন গান হয়নি বল্লে বোধ করি বাড়িয়ে বলা হবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের ‘প্রায়শ্চিত্ত’—প্রহসনের ‘নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো” গানখানি এখনও আমরা প্রসঙ্গক্রমে হামেসাই উল্লেখ ক’রে থাকি। আসলে এই ধরণের হাসির গানেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের ভিত্তি মজবুত হয়েচে।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও ছিলেন একজন সুগায়ক। বিলেতে থাকবার সময় তিনি বহু বিলাতী অভিনয়ের আসরে, নাচের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজী গানও তিনি গাইতে পারতেন বেশ। তাঁর নিজস্ব একটা গানের সুর ছিল, যার প্রভাব খুব বেশি ক’রে তাঁর কৃতীসন্তান আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক দিলীপ রায়ের ওপর পড়েচে।

হাসির গানের পরই মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ প্রেমের গানগুলি। ভাবে, ভাষায়, সুরে তাঁর এই গানগুলির মর্যাদা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকবে ব’লে আমাদের বিশ্বাস। অন্তরে যদি সত্যিকারের দেশপ্রীতির স্পর্শ তিনি অনুভব না করতেন, তাহ’লে কি “ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা” কিংবা “বঙ্গ আমার জননী এর আমার” মত প্রাণ মাতানো রক্তনাচানো গান লিখতে পারতেন? এই গান দু’খানির সুরও তাঁরই দেওয়া।

'শিঁরি-ফরহাদ' চিত্রে রাগিনী ও জয়ন্ত

আজও এই গান বাংলার কিশোর কিশোরীদের সমবেত কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তখন মনে পড়ে সেই কবিকে, —তিনি যদি আজও বেঁচে থেকে এই ধরণের গানে গানে বাংলার প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুলতে পারতেন! দ্বিজেন্দ্র-লালের এই শ্রেণীর গানের মধ্যে "ভারতবর্ষ" "আমার ভাষা পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে" প্রভৃতি কয়েকটি গান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই 'ভারতবর্ষ' গান দিয়েই দ্বিজেন্দ্র-লাল ভারতবর্ষ মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা করে যান। তাঁর

'সাধের বীণা' 'বঙ্গভাষা' 'ভারত আমার' গানও এই শ্রেণীর। সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা ১৩২০, ২য় সংখ্যায় স্বর্গত স্যার গুরুদাস এসম্বন্ধে যা লিখে গেছেন, তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন—"তাঁহার রচিত "আমার জন্মভূমি" "আমার দেশ" "আমার ভাষা" প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি তাঁহার বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রেমিকতার পরিচয় দেয় এবং চির-কাল বাঙ্গালী জাতির কণ্ঠে গীত হইবে।" স্যার গুরুদাসের এই উক্তি সফল হয়েছে। "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানের প্রসঙ্গে বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বিপিন পাল একদিন ব'লেছিলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারা জন্মলাভ করিয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের আমার দেশে" তাহা প্রবাহিত হইয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে॥"

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন আসলে একজন কবি। তাই তাঁর নাটকের ভাষাতেও কাব্যের ছড়াছড়ি। বাঙলা-দেশ গানের দেশ তাই গানকে তিনি ভালো করে আয়ত্ত করেছিলেন কণ্ঠে ও লেখনীতে। তাঁর সুরের বিশেষত্বই তাঁর গানের মহিমাকে বাড়িয়ে তুলেছে আর গানের ভাষা করেছে সেই গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বাঙলার তরুণদের কণ্ঠে যদি চটুল সিনেমা-সংগীতের পরিবর্তে খাঁটি স্বদেশী-গানের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, তাহলেই তাঁরা দ্বিজেন্দ্র-লালের যথেষ্ট সম্মান বজায় রাখবেন; তাঁর খানকয়েক নাটকের নাম মুখস্ত করলেই তাঁর গৌরব বৃদ্ধি পাবে না!

ছবি কথা কয়—

প্রদ্যোতকুমার মিত্র

(ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা)

ছবি কথা বলে, ছবি চলা-ফেরা করে, এ-খবর আজকে আর তোমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হয় না। যেন' ছবি চিরদিনই কথা ক'য়ে আসছে, চলা-ফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। সামান্য কয়েক বছরেই ব্যাপারটা এমন সহজ হ'য়ে গিয়েছে, যেন অন্যরকম কিছু হওয়াই অসম্ভব।

কিন্তু প'নের বছর আগেও মানুষ যদি শুনত, ছবি কথা কয়, তবে আশ্চর্যে অভিভূত হ'য়ে যেত। প্রথম যখন "টকি" বা সবাক-চিত্র এল দেশে, মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছিল এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখবার জন্যে। অবশ্য, মানুষ আজও 'টকি' দেখবার জন্যে পাগল, কিন্তু সে অন্য কারণে।

ছবি কিন্তু কথা ব'লতে শিখল অনেক পরে, আগে তা'র চলা-ফেরার ইতিহাস।

একটা মজার কথা এই যে, আসলে ছবিগুলো একেবারেই নড়ে না. আমাদের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্যেই এই রকম মনে হয়। জানি, তোমরা এই কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই তাই। চলন্ত মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির কতকগুলো স্থিরছবি খুব দ্রুত আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায় ব'লে আমরা তাড়াতাড়িতে ছবির স্থিরভাব ধ'রতে পারি না; এক ভঙ্গির পর আর এক ভঙ্গি চোখের পর্দায় ঘা দিতে থাকে, আর আমরা মনে করি, ছবি চ'লছে।

প্রথম যে-দিন বৈজ্ঞানিক রোজেট মানুষের চোখের সম্বন্ধে এই সত্য কথাটি আবিষ্কার ক'রলেন, সেই দিনই সম্ভাবনা দেখা দিল আজকের এই ছায়া-ছবির।

১৮২৪ সালে বিলাতের বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় পেটার মার্ক রোজেট ঘোষণা ক'রলেন যে, মানুষের চোখের ওপর গতিশীল বস্তুর স্থায়িত্ব অতি অল্প সময়। রোজেটের এই কথায় তখনকার দিনের বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা একেবারে 'থ' বনে গেলেন। তাঁরাও চিন্তা ক'রতে লাগলেন, গবেষণা করতে লাগলেন এই কথা নিয়ে।

নয় বছর ধরে এই কথা নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা করার পর, অবশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ডব্লিউ, জি, হর্নর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অদ্ভুত এক বায়োস্কোপ দেখাতে সক্ষম হলেন। অবশ্য তাঁর আবিষ্কার করা যন্ত্রের নাম বায়োস্কোপ নয়—জিওট্রোপ (Zeotrope)। এই জিওট্রোপই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সিনেমা। পৃথিবীর এই প্রথম সিনেমা সম্বন্ধে তোমরা কি ভাবছ, জানি না। কিন্তু যদি একবার তার রূপ-বর্ণনা শোন, তবে পিত্তি জ্ব'লে যাবে।

হর্নর একখানা বড় কাঠের রোলারে একটি ধাবমান ঘোড়ার বিভিন্ন স্থির ভঙ্গী এঁকে রাখলেন। তারপর যাতে রোলারটা দেখা না যায়, শুধু ছবিই দেখা যায়, সেইভাবে একখানা ফুটোওয়ালা তক্তা লাগিয়ে দিলেন রোলারটার সামনে। দর্শকরা যখন সেই ফুটোর ভেতর দিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তখন হর্নর রোলারটা ঘোরাতে লাগলেন, আর সকলের মনে হতে লাগল যে, ঘোড়াগুলো চ'লতে সুরু করেছে। ফেরিওয়ালারা যে-বায়োস্কোপ মাথায় করে নিয়ে বেড়ায়, ব্যাপারটা তার চেয়েও খারাপ। কিন্তু, ছবি একবার যখন চলতে সুরু করেছে, তখন আর তার রক্ষা নাই। মানুষের ইচ্ছার পিছু পিছু ছুটতে হবে তাকে। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যে সকলে উঠে পড়ে লেগে গেলেন একবার।

এরও কুড়ি বছর পরে, একজন অষ্ট্রেলিয়ান সামরিক কর্মচারী ম্যাজিক লণ্ঠন আবিষ্কার করায় ব্যাপারটা সহজও হয়ে এল অনেকখানি। কিন্তু সহজ বলে নিশ্চয়ই অত সহজ নয়।

নানা লোকে নানারকম পরীক্ষা ক'রে যখন কিছুতেই ছবিকে বাগে আনতে পারছিলেন না, সেই সময়ে গ্রামোফোনের আবিষ্কারক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন, আসরে নামলেন। কর্মী হিসাবে নাছোড়বান্দা ছিলেন এডিসন ব্যর্থ হওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল না, সুতরাং ব্যাপারটাকে সহজে ছাড়লেনও না তিনি। যতই দোষ-ত্রুটি বেরুতে

'চল চলরে নওজোয়ান' চিত্রে অশোককুমার

লাগল তাঁর কাজে, ততই নতুন করে পরীক্ষা ক'রতে লাগলেন এডিসন; শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিভাবলে অনেক উন্নতিও করলেন এই পদ্ধতির।

এই সময়েই ফ্রিজ গ্রীণ নামের এক বৈজ্ঞানিক আরও উন্নত ধরণের সিনেমা-যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে অনেক কষ্টে, মাত্র অল্প সময়ের জন্য চলন্ত ছবি দেখাতে পারলেন। কিন্তু কোডাক ক্যামেরার আবিষ্কারক ঈষ্টম্যানই প্রকৃত প্রস্তাবে, সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রের রাজপথ উন্মুক্ত ক'রলেন বলা চলে।

১৮৮১ সালে ঈষ্টম্যান ফিল্ম আবিষ্কার করেন এবং ১৮৯০ সালে তিনিই সেলুলয়েডের রোল ফিল্ম-এর প্রবর্তন করেন। রোল ফিল্ম একবার যখন আবিষ্কার হ'ল, তখন আর ভাবনা কিসের? রোল ফিল্ম যে-বছর আবিষ্কার হয়, সেই বছরই ই, জে, মারে নামক এক ভদ্রলোক অতি সুন্দর-ভাবে অনেক সময় ধরে চলন্ত ছবি দেখাতে সমর্থ হলেন।

এইবার অসাড় ছবি বাধ্য হ'ল মানুষের; আর, দ্রুত উন্নতি হতে লাগল চলচ্চিত্র শিল্পের। এরপর, ১৮৯৫ সালে লুই এবং অগার্তে লুমিয়ার নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন-যন্ত্র আবিষ্কার করায় অথবা প্রজেক্টর আরও অনেক সহজ

হয়ে গেল ব্যাপারটা। এই বছরই আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার টমাস আর্মট আধুনিক ধরনের সিনেমা প্রজেক্টর আবিষ্কার করেন এবং একবছর পরে, লণ্ডনের রবার্ট পল যন্ত্রটির আরও উন্নতি করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই সমগ্র পৃথিবীতে চলন্ত ছবির ব্যবসা সুরু হয়ে গেল।

চলন্ত ছবি, অর্থাৎ বায়োস্কোপের ব্যবসা চ'লতে লাগল সারা জগতে সাধারণ মানুষ খুশী মনেই দেখতে লাগল এই আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এতেও সন্তুষ্ট নন; তাঁদের মন খালিখুঁৎ খুঁৎ ক'রতে লাগল, এর পর ছবিকে কথা কওয়ান যায় কেমন করে?

বোবা মানুষকে কথা বলাতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিকরা, আর বোবা ছবির মুখে কি তাঁরা ভাষা দিতে পারবেন না? অনেকে উঠে পড়ে লেগে গেলেন এই সাধনায়। কিন্তু বেশী কষ্ট তাঁদের করতে হ'ল না। গ্রামোফোন আবিষ্কার করে এডিসন আগেই এই কাজ অনেকটা সহজ ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। এখন বাকী থাকল শুধু চলা আর বলার মধ্যে সমন্বয় সাধন। ছবি মুখ নাড়ছে, শব্দও পাওয়া যাচ্ছে রেকর্ড-এর কল্যাণে, কিন্তু দু'টোকে এক করা যায় কেমন ক'রে, এই হল তাঁদের সাধনা। ফটো ইলেক্‌ট্রিক সেল (Photoelectric cell) আবিষ্কার হওয়ায় সেই সমস্যারও সমাধান হ'য়ে গেল শেষপর্যন্ত।

'চল চলরে নওজোয়ান' চিত্রে সুন্দরী নাসিম

গ্রামোফোনের একখানা রেকর্ড নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ

তোমরা। দেখবে, তার গায়ে ছোট-বড়-মাঝারি আকারের অসংখ্য সূক্ষ্ম দাগ আঁকা রয়েছে। গ্রামোফোনের পিন যখন এই দাগগুলোরওপর দিয়ে চ'লে যায় তখন, বিভিন্ন আকারের গর্তে পড়ে বিভিন্ন ধরণের শব্দ তুলতে থাকে আর সাউণ্ড বক্সের মারফৎ-এ সেই সব শব্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে গানের রূপ নিয়ে ধরা দেয় আমাদের কাছে। সিনেমায় যেমন চলন্ত দৃশ্যের বিভিন্ন স্থির ভঙ্গী পরপর দেখান হয়, রেকর্ডেও সেই রকম। কোন একটানা কথা বা গানের ভগ্নাংশই হচ্ছে ওই এক-একটা দাগ। সিনেমার এক-একটা ছবির সঙ্গে রেকর্ডের এক-একটা দাগের তুলনা করা যেতে পারে। এখন, এই সব ছবির ভগ্নাংশ আর কথার ভগ্নাংশ সমান সমানভাবে শোনাবার উপরই ছবির কথা বলা নির্ভর করে।

এইবার সবাক্ ছবির কিছুটা ফিল্ম পরীক্ষা ক'রে দেখ তোমরা। দেখবে, ছবির পাশে পাশে গ্রামোফোনের রেকর্ডের খাঁজের মত কেমন যেন কতকগুলো দাগ রয়েছে একটানা। ঐ দাগগুলোই কিন্তু ছবির ভাষা। কথা এবং নড়া-চড়ার মধ্যে সমন্বয় বিধান করেই ঐ গুলো বসান হয়ে থাকে। ধর, ছবি গান গাইছে, "জনগণ মন অধিনায়ক" এই কথা বলার জন্যে যে খানে যে-রকম মুখ নাড়ার দরকার, ঠিক সেইখানে সেই রকম শব্দ মিলিয়ে রাখা হয় চলচ্চিত্রের ফিল্ম-এর সঙ্গে। প্রজেক্টরে যখন ফিল্ম চলতে সুরু করে, তখন একই সময় ছবি হাত পা মুখ নাড়ে আর কথা বলে। ছবিকে কথা বলাতে কিন্তু গ্রামোফোনের মত কোন পিন্-এর দরকার হয় না। বৈজ্ঞানিকরা এমন এক অদ্ভুত আলো আবিষ্কার ক'রেছেন, তাতেই পিনের কাজ চ'লে যায়। যে-ভাবে গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরী হ'ত, সেভাবে ছবিকে কথা বলান মোটেই সহজ ছিল না; অনেক গণ্ডগোল ছিল এই পদ্ধতির। তাই, যতদিন না ফটো ইলেকট্রিক সেল আবিষ্কার হ'ল, ততদিন দেরী ক'রতে হ'ল সকলকে।

তোমরা হয়ত মনে ক'রছ, এখন ছায়াছবির যে-রকম উন্নতি হ'য়েছে, সেইটাই চূড়ান্ত। এর-পর আবার কি উন্নতি করা যেতে পারে? কিন্তু তোমরা শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবে, এই ছায়াছবিকে সত্যকার রক্ত-মাংসের মানুষের রূপ দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার অন্ত নেই। যাতে ছবিকে ছবি ব'লে মনে হতে না পারে, সেই জন্যে তাঁরা অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি, ষ্টিরিওস্কোপ পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রে এই বিষয়ে অনেকটা সফলও হয়েছেন বৈজ্ঞানিকরা। সাধারণতঃ সিনেমার ছবিগুলোকে সমান (Plain) দেখা যায়। কিন্তু ষ্টিরিওস্কোপের ছবি সাধারণ মানুষের মতই সামনে পিছনে উঁচু-নীচু থাকে। ষ্টিরিওস্কোপের কোন ছবি যদি বন্দুক তুলে গুলি করে, তোমরা নির্ঘাৎ মনে ক'রবে যে, সত্যিকার বন্দুক তুলে তোমাকে গুলী করা হ'ল, আর ভয়ে এমন আঁৎকে উঠবে যে, পাশের ভদ্রলোকরা হাসি সামলাতে পারবেন না।

এইবার, তোমরা যদি পার, একদিন সিনেমার সুটিং দেখে এস, কোন ষ্টুডিওতে গিয়ে। সেখানে দেখবে, কেমন ক'রে আলাদা আলাদা ভাবে ক্যামেরায় আর রেকর্ড-যন্ত্রে ছবি ও কথা নেওয়া হ'চ্ছে এবং পরে সম্পাদনা ক'রে (এডিটিং) সেগুলোর সমন্বয় (adjust) করা হচ্ছে। সেখানে দেখবে, মাথার এক বিঘত ওপরে ঝুলছে মাইক্রোফোন (শব্দ গ্রহণের যন্ত্র), সামনে ক্যামেরা, (চিত্র গ্রহণের জন্য), আর পেছনে সিন।

কিন্তু ষ্টুডিওর ব্যাপার দেখবার পর সিনেমা দেখার মোহ কেটে যাবে, অনেক বড় বড় আশ্চর্য ঘটনাকে মনে হবে ছেলেখেলা। তার চেয়ে সেখানে না যাওয়াই সব চেয়ে ভাল।

চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে নৃত্যকলার দুর্গতি

প্রহ্লাদ দাস

দিনের পর দিন নৃত্য কলার আদর বেড়ে চলেছে যতই, ততই লোকের প্রাণে কৌতূহল জেগে উঠছে—নিত্য নূতন দেশের নাচ দেখবার ও নাচ সম্বন্ধে জানবার জন্যে। ছন্দে, লালিত্যে, ও ভাবধারার সমন্বয়ে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছে আজ—ভারতীয় নৃত্য কলা। গত দশ-বার বৎসর পূর্বে এ ধারণা ছিল না কারো মনে—যে ভারতীয় নৃত্য কলা এত উচু ধরণের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নৃত্যগুরু উদয় শঙ্করই করেছেন মৃত প্রায় নৃত্যকলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পরিবর্তনের দিনে সিনেমা ও থিয়েটারের নাচের হোলনা কোনই পরিবর্তন। সেই পুরান যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে একই ধরণের নাচ। এর মূলে রয়েছে কর্তৃপক্ষের অবহেলা। নৃত্য-কলা যে অভিনয়ের বিশেষ অঙ্গ তার প্রমাণ রাজনর্তকী, কুমকুম, শঙ্কর পার্বতীর অভিনয় দেখলেই বোঝা যায়। শুধু নৃত্যের প্রাধান্যের জন্যই ঐ বই গুলি চলেছে এতদিন ধরে। তা বলে কর্তৃপক্ষ যেন মনে না করেন—যেখানে সেখানে বিনা প্রয়োজনে—যাকে তাকে দিয়ে একটা নাচ করিয়ে ছবিতে জুড়ে দিলেই, ছবির কাট্তি বেশী হবে। উদয়ের পথে যে নাচ তা না থাকলেও ছবির কাট্তির কোন ক্রটী হতোনা। কারণ লেখকের লেখার জোরেই লোকের মনে জাগিয়ে দিয়েছে জাগরণের সাড়া। সন্ধ্যা ছবির সর্পনৃত্য, যার কোন মানেই হয় না, সন্ধি ছবির বিবাহ বাসরের নৃত্য খাপ ছাড়া, তার কারণ ছবির পরি-চালক তার ইচ্ছা মতই মেয়েরা অর্থাৎ নৃত্য শিল্পীরা যে নাচ জানে সেই নাচটারই আগের টা পেছনে ও পেছনের টা আগে এনে কোন রকমের জোড়া তালি দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে ছবি তুলে নিলেন। কিন্তু একবারও ভাবলেন না তাতে নাচের ছন্দ বজায় থাকবে কী না। ধ্রুপদ খেয়াল উচ্চাঙ্গের সংগীত যদি না শেখা থাকে তাহলে কারোর ঐ ধরণের গান শুনলে শুধু বিচার করা যায় গায়কের কণ্ঠস্বরেরই তাল, লয় এবং রাগ রাগিনী সম্বন্ধে সমালোচনা করা যায় না, তেমনি নাচ সম্বন্ধে ভাল করে শিক্ষা না করে বহু দিনের ছবির পরিচালনার অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বেচ্ছাচারীতা করা যায় শুধু অভিনয় নিয়েই, নাচ নিয়ে নয়। রঙ্গমঞ্চের অবস্থা ছবির চেয়েও শোচনীয়। কারণ প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই এক একজন নৃত্য শিক্ষক বেতন ভোগী হয়ে আছেন তদের সেই সত্য যুগের নাচ সেই কোমর দোলান আর চোখ ঠারা সব বইয়েতেই এক ধরণের। আজ কাল আবার কোন কোন নৃত্য শিক্ষক আধুনিক নাচের সো দেখে তার পোষাক নিয়ে আসেন। অনুকরণ করে কিন্তু টেকনিকত আর মনে রাখা যায় না, তাই নূতন বইয়ে কর্তৃপক্ষ অথবা পরিচালককে বললেন নূতন পোষাক করে দিতে হবে নূতন নাচের জন্যে। যেমন বার্মিজ পোয়ে নাচের পোষাক পরে নর্তকীরা নাচছে হায়দারাবাদের নিজামের দরবারে। বার্মিজ পোষাকই আছে কিন্তু টিক্নিক নেই। কর্তপক্ষ মনে করলেন নূতন ধরণের পোষাক, সুতরাং নূতনত্ব। পরিচালনায় নৃত্য কলার এমন দুর্গতি এটা দুঃখের বিষয় নয় কী? আশা করি কর্তৃকক্ষ ও পরিচালক মণ্ডলী এ বিষয় সংশোধনের চেষ্টা করবেন, তাতে অভিনয়ের উন্নতি বই অবনতি হবে না।

কালিকায় বৈকুণ্ঠের উইল

অধুনা-প্রতিষ্ঠিত কালিকা রঙ্গমঞ্চে আজ কিছুদিন যাবৎ শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল" অভিনীত হচ্ছে। "বৈকুণ্ঠের উইল"-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন, শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় কুমার, রঞ্জিৎ রায়, বেচু সিংহ, ফণী রায়, মলিনা, উমা, রমা, বেলা প্রভৃতি।

"বৈকুণ্ঠের উইল"-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে এ'র নাট্যরূপের কথাই ধরা যাক। শরৎ-সাহিত্যের এই অন্যতম জনপ্রিয় কাহিনীটির নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে অনেকগুলি মৌলিক নাটক রচনা করে এবং 'বিপ্রদাস'-এর নাট্যরূপ দিয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন; কিন্তু, আলোচ্য নাটকে তাঁর সে সুনামে গ্রহণ লেগেছে বলেই মনে হয়।

সৎ-ভাই বিনোদের প্রতি গ্রাম্য অশিক্ষিত দোকানদার গোকুলের যে গভীর ভালবাসা, তাকে কেন্দ্র করেই শরৎ-চন্দ্রের এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। মূল কাহিনীতে আমরা যে-সমস্ত পার্শ্ব-চরিত্রের পরিচয় পাই, কেবল গোকুলের মনোধর্মের পরিচয় দেওয়ার জন্যেই তাদের প্রয়োজন। মূলকাহিনীতে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলেন গোকুলের বিমাতা, বৈকুণ্ঠের স্ত্রী। আলোচ্য নাটকে আমরা দেখতে পাই, নাট্যকার যথেচ্ছভাবে নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং অপ্রয়োজনীয় ও স্বল্প প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলোকে এত বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন যে আমরা তার নিন্দা না করে পারি না। এই সম্পর্কে ধরা যাক। মায়া চরিত্রকে। যদি স্বীকারও করি যে বিনোদের চরিত্রের একটা দিক দেখাবার জন্যে মায়ার দরকার ছিল; কিন্তু তবু মায়াকে নিয়ে অতখানি বাড়াবাড়ি করা যে-কোন রসিক দর্শককে পীড়া দেয়। তারপর রমা চৌধুরী নামে যে-মেয়েটি এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তাঁর আড়ষ্টতা অপটুতা ও মঞ্চ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এত বেশী বিরক্তিকর যে তাকে অভিনেত্রী হিসাবে মনোনীত করার জন্যে আমরা কর্তৃপক্ষকে নিন্দা না করে পারি না।

শুধু রমা চৌধুরীর কথাই নয়। ভূমিকা বণ্টনে আমরা এমন আরও অনেক পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাই। নায়ক গোকুলের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হ'চ্ছেন, তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একেবারেই নবাগত। যদি কোন শক্তিশালী নতুন অভিনেতাকে এই ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ দেওয়া হ'ত, আমাদের ব'লবার কিছুই থাকত না; কিন্তু, জ্যোতির্ময় কুমারের মত একজন অপটু অভিনেতাকে এই চরিত্রের রূপদান ক'রতে দেওয়ায় শরৎচন্দ্রের কল্পিত চরিত্রের অমর্যাদা করা হ'য়েছে বলেই আমরা মনে করি। আশ্চর্য, দর্শকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে হাত-তালি তিনি পাচ্ছেন, কিন্তু সে তাঁর অভিনয় গুণে নয়, সংলাপের জন্যে।

বিচার করতে গেলে "বৈকুণ্ঠের উইল" নাটকের পরিচালনার, অভিনয়ের ও রূপসজ্জার অসংখ্য ত্রুটির উল্লেখ করা যায়, কিন্তু তার জায়গা এখানে নাই। আমা-দের শুধু প্রশ্ন যে, "মাটীর ঘর", "বিশ বছর আগে", "তাইতো" প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা এবং "বিপ্রদাস"-এর নাট্যরূপদাতার এই অধঃপতন কেন? এই সম্পর্কে খবর নিয়ে জনৈক শিল্পীর কাছে আমরা যা শুনেছি, তা যেমন আপত্তিকর, তেমনই নিন্দনীয়। "কালিকা"র কর্তৃপক্ষ নাকি নাট্য রচনায়, ভূমিকা বণ্টনে, পরিচালনায় এমন কি অভিনয় ব্যাপারেও এতবেশী হস্তক্ষেপ করেন যে, শিল্পী ও নাট্যকারের পক্ষে আপন রুচি অনুযায়ী কাজ করা একেবারে অসম্ভব। শোনা কথা অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে অধুনা "অচল প্রেম"-এর উদ্বোধন পর্যন্ত আমরা 'কালিকা' কর্তৃপক্ষের যে মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, তাতে বাজারে শোনা কথা যে জনসাধারণে বিশ্বাস করতে পারে, এ-আশঙ্কা আমাদের আছে।

যাই হোক, কলকাতায় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং সিনেমার মোহময় আকর্ষণে যখন তাদেরও অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সেই সময়ে একটা নতুন রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা সত্যিই আনন্দের

বিষয় এবং নাট্যরসিক হিসাবে 'কালিকা' রঙ্গমঞ্চের ওপর আমাদের মমতা কারও চেয়ে কম নয়। তাই এই প্রসঙ্গে "কালিকা" কর্তৃপক্ষকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই নতুন মঞ্চটিকে বাঁচিয়ে ও বজায় রাখবার জন্যে তাঁদের যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার।

"বৈকুণ্ঠের উইল"-এ যে প্রশংসনীয় ও উপভোগ্য কিছু নাই, এমন কথা আমরা বলি না। এই নাটকের সংলাপ বেশ প্রাঞ্জল এবং টিম-ওয়ার্কও মোটামুটি মন্দ নয়। সব চেয়ে তৃপ্তি দেয় শ্রীমতী মলিনার অভিনয়। শরৎ-চন্দ্রের মাতৃরূপ ইনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং দর্শকদের সামনে তা যথাযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিমাই রায়ের ভূমিকায় নরেশ মিত্র, বিনোদের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য এবং গোকুলের স্ত্রীর ভূমিকায় উমা মুখার্জীর অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসনীয়। কালিকা সম্প্রদায়ের অভিনয় শিক্ষক যিনি, তাঁর জ্ঞান ও ধারণা অনেকটা পিছনে প'ড়ে আছে ব'লে মনে হয়। যুগের প্রয়োজনেও তাঁর আর কিছুটা আধুনিক হওয়া দরকার। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর আকর্ষণে বইখানা কিছুদিন 'কালিকায়' চলতে পারে বলে মনে হয়।

উদীয়মানা অভিনেত্রী রেণুকা রায়

"প্যারাডাইস"-এ দ্রৌপদী

অবশেষে, "প্যারাডাইস" প্রেক্ষাগৃহে বহু বিজ্ঞাপিত চিত্র দ্রৌপদী মুক্তিলাভ ক'রেছে। দ্রৌপদীর নামভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন শ্রীমতী সুশীলারাণী এবং কাহিনী ও চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। পরিচালনা ক'রেছেন "ফিল্ম ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেল।

দ্রৌপদীর নায়িকা ও পরিচালকের মধ্যে কি সম্পর্ক, সেই সম্বন্ধে স্থানান্তরে বলা হ'য়েছে, Directed by the one man who has the privilege to direct her. কথাটায় একটু pun (অর্থাৎ, গোলমাল) আছে। আর, দ্রৌপদীর আগাগোড়াই কিছু-না-কিছু গোলমাল। চিত্র পরিচালনা ব্যাপারেও আমরা দেখতে পাই, প্রথমে

শ্রীমতী সান্তা আপ্তে

এর পরিচালনা করছিলেন শ্রীযুক্ত বাবুরাও পেণ্ডারকর, তারপর, একদা সুপ্রভাতে দেখলাম, ফিল্ম ইণ্ডিয়ার সম্পাদকপ্রবর এর পরিচালক হয়ে বসেছেন; আবার দেখছি, চিত্রনাট্য ও কাহিনী লিখেছেন, নায়িকা সুশীলারাণী। এই সব গোলমেলে ব্যাপারের কৈফিয়ৎ হিসেবেই কি বড় বড় অক্ষরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, **Directed by the one man** ইত্যাদি?

ছবিখানি নায়িকাপ্রধান। মহাভারতের এক বিশিষ্ট চরিত্র দ্রৌপদী। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্ররোচনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ভারতের এই মহীয়সী নারীর চরিত্রের অপর এক দিক নিয়েই দ্রৌপদী চিত্রের সৃষ্টি; কিন্তু অভিনেত্রী হিলাবে শ্রীমতী সুশীলারাণী এমই দুর্বল এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব এতই অল্প যে, দ্রৌপদী চিত্রের সমস্ত সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

জুয়াখেলার কুফল যে কী মারাত্মক, ছবিখানির বিষয়-বস্তু তাই। এদিক দিয়ে আমরা কাহিনী রচয়িত্রীর প্রশংসাই করব; কিন্তু, তাঁর রচনাশক্তির দুর্বলতার জন্যে দর্শকের মনে বক্তব্য বিষয় ছাপ রাখতে পারে না একেবারেই। পরিচালনা ব্যাপারেও ছবিখানিতে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান, সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয় 'দ্রৌপদী'র পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্য পরিকল্পনা। বোতলে করে মদ খাওয়া, পদ্মফুলের ভেতর ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব, সস্তা ভাঁড়ামো এ-সবের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কতকগুলো পার্শ্বচরিত্রের কাপড়-চোপড় দেখলে, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, ১৯৪৫ সালের ব্যক্তিরা দ্রৌপদীর সঙ্গে কথা বলছে কেমন করে? পার্শ্বচরিত্র ছাড়াও, নায়ক-নায়িকাদের পোষাক পরিচ্ছদ যা, যে কোন মেলোড্রামার অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও তাই পরান হয়।

বস্ত্র হরণ ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরেই "দ্রৌপদী"ও শেষ। কিন্তু বস্ত্র হরণের সময় অতবড় লেক্‌চার এবং তারপর একখানা গান দিয়ে দর্শকদের বোধ হয় বিমোহিত ক'রবার চেষ্টা না করাই উচিত ছিল। পরিচালক প্রবরের climax—anticlimax সম্পর্কে একটু জ্ঞান থাকলে এ-রকম হোত ব'লে আমাদের মনে হয় না। মোট কথা, "দ্রৌপদী", পরিচালক হিসাবে শ্রীযুক্ত বাবুরাও প্যাটেলের ব্যর্থতার মস্ত বড় সাক্ষী। অতঃপর আমরা তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যেন পত্রিকা সম্পাদনা কার্যেই ব্যাপৃত থাকেন; অহেতুক চিত্র পরিচালনা ক'রতে এসে প্রযোজক, দর্শক এবং অন্যান্য সকলকে উত্যক্ত না করেন।

"দ্রৌপদী"তে আমাদের ভাল লেগেছে, ভীম-বেশী ডেভিড এবং দুঃশাসন বেশী চন্দ্রমোহনের অভিনয়। রামগোপালের নাচখানাও বেশ ভাল, কিন্তু সম্পাদকের কাঁচির মাথায় তার আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। ছবিখানির আলোক-চিত্র ও শব্দগ্রহণ বোম্বাইয়ের তুলনায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট।
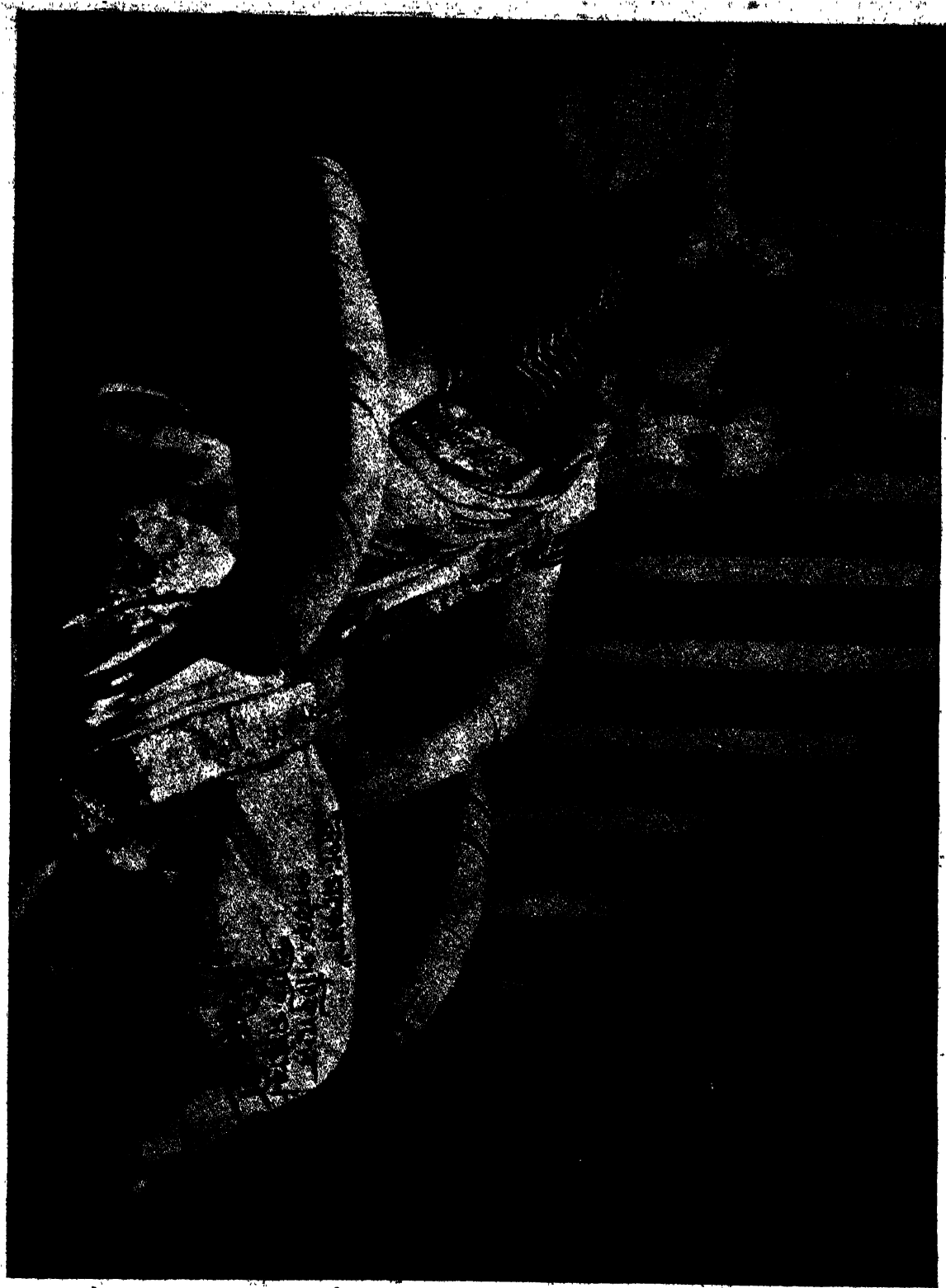
সম্পাদকের দপ্তর

অনিতা বসু (ইয়ংরোড, মধুপুর)

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরবর্তী ছবি কি? নীতীন বসু বর্তমানে কি কোন বাংলা ছবি পরিচালনা করছেন? শ্রী ভারত লক্ষ্মী—ইন্দ্রপুরী—ইষ্টার্ণ টকীজ ও চিত্র ভারতীর পরবর্তী ছবি কি?

: প্রমথেশ বড়ুয়া নিউ টকীজের সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন—তাঁর চিত্রের আর কিছু সম্পর্কে এখন পর্যন্তও আমরা ওয়াকিবহাল নই। নীতীন বসু বম্বের ফিল্মিস্তানের হয়ে একখানি চিত্র তুলবেন। চিত্রখানির সম্ভবতঃ শুধু হিন্দি সংস্করণই গৃহীত হবে। শ্রী ভারতলক্ষ্মী—গৃহলক্ষ্মী, ইন্দ্রপুরী কলঙ্কিনী—ইষ্টার্ণ টকীজ—অভিনয় নয়—চিত্র ভারতীর পরিবর্তী চিত্রের এখন অবধি কোন খবর পাইনি। তবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি'কে চিত্ররূপ দেবার ইচ্ছা শ্রীযুক্তা শাসমল পোষণ করেন।

প্রভাত শিশির বোস ও যুথিকা বোস (কলিকাতা)

: পদ্মাদেবী ও সুমিত্রা দেবীর মধ্যে কে অধিকতর সুন্দরী।

: সুমিত্রা দেবী

প্রভাস রায় (সেণ্ট জেমস স্কয়ার, কলিকাতা)।

: অশোক-কাননের যে ছবি উঠবার কথা ছিল তার কতদূর বাকী?

: অশোককুমারের সংগে কাননের যে ছবি তুলবার কথা ছিল তা গুজবেই পর্যবসিত হ'য়েছে। পি, আর, প্রডাকসন্সের যে চিত্রখানিকে ভিত্তি করে এই গুজব উঠেছিল—তাতে কানন দেবীর বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছেন বম্বে থেকে আগত শ্রীযুক্ত উমাকান্ত। এন, আর আচার্য পরিচালিত উলঝন চিত্রে আমরা উমাকান্তের অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি। চিত্রখানির নাম দেওয়া হয়েছে বনফুল।

রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৩৩৩, ইন্দ সুব—সেক—C/o এ, পি, রো)

দুর্গাদাস স্মৃতিরক্ষাকল্পে কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে কি? একমাত্র আপনাদের দুর্গাদাস স্মৃতি সংখ্যা ছাড়া আর কোন পত্রিকায় কি তার সম্পর্কে কোন সংবাদ বাহির হয় নাই? (২) পরিচালক বড়ুয়া চিত্র জগতের গ্লানি দূর করিবার জন্য চিত্র জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন নাকি?

: কিছুই হয়নি। তবে এবার বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে দুর্গাদাস স্মৃতিপদক দেওয়া হবে। সংবাদ বেরিয়েছিলো সব কাগজে। (২) না, বিদায় গ্রহণ করেন নি। নিউ টকীজের সংগে সম্ভবত তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চিত্রজগতের গ্লানি অপসরণ করতে না পারলেও, শ্রীযুক্ত বড়ুয়া যে গ্লানি জড়িয়ে নিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী (কৃষ্টরাম বোস ষ্ট্রিট, কলিঃ)

: 'মা-বাপ' চিত্রের বীণা দেবী কি বাঙ্গালী? অশোককুমার কি কোন অভিনেত্রীর ভাই?

: না। ছায়া দেবীর সম্পর্কে তিনি ভাই হন।

ছোটদের উপযোগী আমোদ প্রমোদের আন্দোলনে হিন্দু-বয়েজ স্কুল ছাত্র-সমিতি—

আজকাল যে সমস্ত চলচ্চিত্র আমাদের দেশে প্রদর্শিত হ'চ্ছে, তা'র কোনটিই কিশোরোপযোগী নহে। কিশোররা দেশের ভাবী কর্মীবৃন্দ, তা'রা দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ভারতের বাহিরে ইউরোপে, রুশিয়ায় আমেরিকায় সর্বত্র হাজার হাজার কিশোরোপযোগী চলচ্চিত্র প্রতি বছর গৃহীত ও প্রদর্শিত হচ্ছে; এমন কি সেখানে কিশোরদের জন্য পৃথক প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত নির্মিত হ'চ্ছে এবং অনেক হয়েছেও। আমদের এখানে বর্তমানে সারপেনটাইন লেনস্থ হিন্দু বয়েজ স্কুল ছাত্র সমিতির তরুণ সভ্যবৃন্দ এই দাবী নিয়ে এক আন্দোলন চালাচ্ছেন। তাঁরা বাংলার সমস্ত ছোট-বড় সঙ্ঘ, সমিতি, ক্লাব, স্কুল বা ঐরূপ কিশোর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এক কেন্দ্রীয় সমিতি গড়ে এই আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে চালাতে চান। এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, ডাঃ বিধান রায়, মৌমাছি, সুনির্ম্মল বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কালীশ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (অভিনেতা) প্রভৃতি।

: আমরা হিন্দু বয়েজ স্কুল ছাত্র সমিতির এই শুভ প্রচেষ্টার শুভ কামনা করি।

চিত্রসাংবাদিক বনাম অভিনয়শিল্পী

চিত্রসাংবাদিকদের ওপর অভিনয়শিল্পীদের মনোভাব যে কি রকম তার পরিচয় কতকগুলি ঘটনা থেকে বেশ স্পষ্ট জানা যায়। বছর কয়েক আগে শান্তা আপ্তে চড়াও হয়ে বাবুরাও প্যাটেলকে বেত্রাঘাত করে আসে, বাবুরাওয়ের অপরাধ শান্তা আপ্তে সম্পর্কে কিছু লিখেছিলেন তিনি। লাহোরের মনোরমা দু'বছর আগে তার বিরুদ্ধে কিছু লেখার জন্যে 'আকাশ' পত্রিকার সম্পাদকের নামে মামলা করে। মাস কয়েক আগে তার ভবিষ্যত কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় শান্তা হুবলীকার এক সাংবাদিককে অপমান করে। মাস দুই আগে বীণা বম্বের কোন উর্দ্দু কাগজের সম্পাদক আরেবিয়ানকে ষ্টুডিওতে একলা পেয়ে নিজে এবং আর পাঁচজনকে দিয়ে প্রহার করে। গত মাসে এক নৈশ ভোজে সাধনা বোস রামমূর্তি নামক এক সাংবাদিককে চপেটাঘাত করে বসে। আর এ সবকে ছাপিয়ে গিয়েছে মাদ্রাজের এক নৃশংস ব্যাপার যাতে লক্ষ্মীনাথম নামক এক সাংবাদিককে একেবারে খুনই করা হ'য়েছে যার জন্যে মাদ্রাজের অতি নামকরা একজন অভিনেতা ও একজন পরিচালক গ্রেপ্তার হ'য়েছে।

সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত হওয়ার প্রধানত এই কারণ যে তারা অভিনয় শিল্পীদের সম্পর্কে ভুল খবর প্রকাশ করে অথবা এমন কথা ফাঁস ক'রে দেয় যা অভিনয়শিল্পীরা গোপন রাখতে চায় অথবা এমন সমালোচনা করে যা অভিনয় শিল্পীদের মনোপুতঃ হয় না। কিন্তু এর জন্য দোষ কি অভিনয়শিল্পীদেরই নয়? তারা নিজেদের এমনি উঁচু ধাপের লোক বিবেচনা করে যে সামান্য সাংবাদিকদের ধারেবাড়ে ঘেঁষবার উপায়ই থাকে না সেক্ষেত্রে জনসাধারণের কৌতূহলের চাপ থেকে রেহাই পেতে সাংবাদিকদের কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। আমার সহযোগী কোন চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে চিত্রজগতের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছেন; যাতে কারুর সম্পর্কে কোন রকম ভুল কিছু না প্রকাশিত হয়, তার জন্যে সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা ক'রে তাদের মুখ থেকে শুনে তাদেরই সামনে লিপিবদ্ধ করে চলেছেন, কিন্তু তার কাছে শুনলুম যে এমন লোকেরও সামনে তিনি পড়েছেন যিনি নিজের সম্পর্কে কিছু জানাতে শুধু অস্বীকার করেনি, বেশ দু'কথা শুনিয়েও দিয়েছেন। বিচিত্র ব্যাপার! সাংবাদিকরা প্রতিনিধি হ'চ্ছে জনসাধারণের আর সেই জনমনোরঞ্জনেই আত্মনিয়োগ করেছে চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এবং জনসাধারণের অধিকার আছে তাদের পরিচয় জানবার। সাংবাদিকরা জনসাধারণের সেই অধিকারটা খাটিয়ে নিতে চায় বৈ তো নয়। তাছাড়া এটাও একটা মস্ত বড় কথা যে আজকালকার দিনে সাংবাদিক ও সমালোচকদের সহযোগীতা না থাকলে যে দরেরই গুণী লোক হোক, কি খ্যাতি আর কি মর্যাদা কোন মতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না।

বাংলা ছবির আসন্ন বিপদ

কলকাতায় সম্প্রতি একটা নতুন হিড়িক দেখা দিয়েছে। বম্বের প্রযোজক এখানে আসছে ছবি তুলতে। এদের মধ্যে পথ প্রদর্শক হলো সান রাইজ পিকচার্স। একখানা ছবি তোলা প্রায় শেষ ক'রেছে এরা; শোনা গেল পরের দু'খানা ছবিও এখানেই তোলার ব্যবস্থা হ'য়েছে। দেখাদেখি আরও অনেকেই এখানে আসবে ব'লে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এখানে ছবি তুলতে আসার প্রধান কারণ হ'চ্ছে খরচ কম হয় ব'লে আর বম্বের চেয়ে অপেক্ষাকৃত গুণী শিল্পী এবং কলাকুশলীও পাওয়া যায় এখানে। এই নিয়েই তো আশঙ্কা। অর্থাৎ এখানেও বম্বের প্রযোজকরা নিজেদের ভিতর প্রতিযোগিতা ক'রে দর বাড়িয়েই যাবে. না শুধু, সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শিল্পী ও কলাকুশলীদের হিন্দী ছবিতে বেশী পয়সায় নিযুক্ত রেখে বাঙলা ছবি তোলায় ব্যাঘাত ঘটাবে যথেষ্টই এবং সে ব্যাঘাত ক্রমে বাঙলা ছবিকে উচ্ছেদ ক'রে দিতেও তো পারে। পাঞ্জাবে তো এই ব্যাপারই ঘটে গেল। বম্বের লোক ছবি তুলতে

গিয়ে পাঞ্জাবী ছবি তোলা উঠিয়েই দিলে, এখন তোলা হ'চ্ছে খালি হিন্দী ছবি। এখানেও অনুরূপ বিপদই ঘটবার সম্ভাবনা অবশ্য যদি বাঙলার প্রযোজক ও ষ্টুডিওর মালিকরা এ বিষয়ে তৎপর হন তাহ'লে অন্য কথা।

এক অসুখী মানুষ

প্যারাডাইসে 'দ্রৌপদী' মুক্তিলাভ করার ঠিক পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যায় বম্বে মেল একটা ছোট্ট দলকে ক'লকাতা থেকে বিদেয় ক'রে নিয়ে গেল। দলের মধ্যে ছিলেন 'দ্রৌপদী'র হর্তা-কর্তা-বিধাতা বাবুরাও প্যাটেল, তস্য সেক্রেটারী অভিনেত্রী সুশীলারাণী এম-এ, এল-টি, তস্যা মাতা, নিউ হলের জেনারেল ম্যানেজার মধুকর গুপ্তে আর ব্যবস্থাপক প্রমথেশ বসু, এদের কারুরই মুখে সন্তোষের কোন ভাবই ছিল না কিন্তু সেদিন এবং সকলের চেয়ে অসুখী ছিল নিশ্চয়ই বাবুরাও প্যাটেল নিজে, বেচারা! কলকাতায় আসবার মুখে দিল্লীতে ট্রেণে উঠে কত জমকালো ছবিই না মনে এঁকে নিয়েছিলেন বাবুরাও— হাওড়ায় নামবামাত্র কাতারে কাতারে লোক আসবে তাদের দর্শনের জন্য, ফুলের মালায় আর তোড়ায় বন হ'য়ে যাবে ষ্টেশনটা, সুশীলারাণী আর তার জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলবে, লোকের মুখে মুখে থাকবে শুধু 'দ্রৌপদী'—সুশীলারাণী—বাবুরাও, ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাড়ীর সামনে কলকাতার যত প্রযোজক, পরিচালক চিত্রজগতের বড় বড় চাঁই আর কাগজওয়ালারা 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কাগজে কাগজে কত রকমের বিবরণ বের হবে, সব মিলিয়ে এমনি এক আলোড়নের সৃষ্টি হবে যার ঢেউ ভারতের সহরে সহরে গড়িয়ে গিয়ে এমনি এক অবস্থার সৃষ্টি ক'রবে যা ভূ-ভারতে কখনও ঘটেনি এর আগে। তারপর তো তাঁরা এলেন ক'লকাতায়—সে কি নিশ্চুপ ঘটা—ষ্টেশনে কাপুরচাঁদের জনতিনেক পাণ্ডা আর এক ক্যামেরাম্যান শুধু তাও কর্তৃপক্ষ সহরের সব কাগজে এদের আগমন বার্তা জাহির ক'রে দেওয়া সত্বেও। রাস্তার কেউ ফিরেও চায়নি, বাড়ীতে 'কিউ'ও নেই। পাঁচদিনের অবস্থান কোন মতেই আর স্মরণীয় করিয়ে তুলতে পারলে না বাবুরাও। ডিনার পার্টি হ'য়েছিল মাত্র একটা তা-ও দিয়েছিল বম্বেরই প্রযোজক-পরিচালক ভি-এম-ব্যাস—এই একটি সুযোগ পেয়েই বাঙলার চিত্র-শিল্পের রথীদের একচোট নিয়ে ফেলেছেন—বাকী তো ফিল্মিণ্ডিয়ার জন্যে তোলাই আছে! 'দ্রৌপদী'র প্রশংসা ক'রলে রোষের ডিগ্রী হয়তো কিছু কমতো কিন্তু তা-ও যা বেরিয়েছে তাতে রক্ষে পাবার কোন আশাই নেই—একেই এই মনসা তার ওপর ধুনোর গন্ধ ছিটিয়েছেন কমল দাশগুপ্ত বাবুরাওয়ের আগামী ছবি 'মাতোয়ালী মীরা'র সুর যোজনায় অপারগতা জানিয়ে। কি অশান্তি বাবুরাওয়ের! এত সাধের ছবি—এত ঢাক পিটিয়েও তারিফ পেলে না কারুর কাছে! এত বছর ধরে ফিল্মিণ্ডিয়ায় এত গালাগালি ক'রেও নিজের মর্যাদা কিছুই বাড়ানো গেল না।

রূপ-মঞ্চের বেতার বিভাগ

বহুদিন থেকে রূপ-মঞ্চের অগনিত পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ সত্বেও আমরা বেতার বিভাগ খুলতে পারিনি। সম্প্রতি রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে একটী রেডিও সেট' ক্রয় করা হ'য়েছে—এবং দু' এক মাসের ভিতরই আমরা বেতার বিভাগ খুলতে পারবো বলে আশা করি। 'বেতার' সংক্রান্ত প্রবন্ধ—স্থানীয় বেতারকেন্দ্র সম্পর্কিত অলোচনা উক্ত বিভাগে প্রকাশিত হবে। এ বিষয়ে পাঠকবর্গের সহযোগীতা কামনা করি।

সম্পাদক ঃ রূপ-মঞ্চ

চিত্র সংবাদ ও নানাকথা

নিউথিয়েটার্স লিঃ

মাই সিসটার—হেমচন্দ্র পরিচালিত নিউথিয়েটার্সের হিন্দী চিত্র মাই সিসটার বম্বেতে গত ৫ই জানুয়ারী মুক্তি লাভ করেছে। চিত্রখানি ইতিমধ্যেই নাকি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কাহিনীর মৌলিকত্ব—পরিচালনার অভিনবত্ব—সংগীতের অপূর্ব মূর্ছনায় 'মাই সিসটার' বম্বেবাসীদের পাগলা করে দিয়েছে বল্লেই চলে! মাই সিসটারের কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত বিনয় চট্টোপাধ্যায় এবং সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক।

চন্দ্রাবতী, সুমিত্রা দেবী, সুক্তিধারা, আখতার জাহান, সায়গল, দেবী মুখার্জি এবং আরো অনেকেই 'মাই সিসটারের' চরিত্র রূপায়ণে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

কলিকাতায় মুক্তিলাভ করলে মাই সিসটার সম্পর্কে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারবো।

ওয়াশীয়াৎনামা—

বড়দিনের ছুটি উপভোগ করবার পর পরিচালক সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় 'ওয়াশীয়াৎ নামা'র কাজ আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, অসিতবরণ এবং সুমিত্রা প্রভৃতিকে নিয়ে একটী বিরাট দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। অহীন্দ্র বাবু কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। একখানি চীন দেশীয় তক্তাপোষে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। এই তক্তাপোষ খানার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে চীনের পিকিং সহরে সুযোগ্য চীন দেশীয় মিস্ত্রি দ্বারা তৈরী করান হয়। এবং তখনকার দিনে এর খরচা পড়ে প্রায় ৩০,০০০ হাজার টাকা। এই তক্তাপোষ খানার মালিক কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনী। তক্তাপোষখানা ৩০,০০০ টাকার মূল্যে ইনসিওর করা হয়েছে।

ডি, লুক্স পিকচার্স

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় এদের সংসারের কাজ এগিয়ে চলেছে। সংসারের সংগীত পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মিত্র ও রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন তুলসী লাহিড়ী, রবি রায়, জহর গাঙ্গুলী, শ্যাম লাহা, রণজিৎ রায়, প্রভা, পূর্ণিমা এবং আরো অনেকে। সংসার চিত্রের নায়ক নায়িকারূপে অভিনয় করছেন শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস ও কানন দেবী—এই সর্বপ্রথম এঁদের একসংগে দেখা যাবে।

ইষ্টার্ণ টকীজ

ইষ্টার্ণ টকীজ পরিবেশিত কালী ফিল্মএর 'অভিনয় নয়' রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি প্রতীক্ষায়। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের আগামী চিত্র 'পথের সাথী'র মহোরৎ উৎসব অরোরা ষ্টুডিওতে গত ২৫শে জানুয়ারী সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র।

ইউরেকা পিকচার্স

ইউরেকা পিকচার্সের 'দোটানা'র চিত্রগ্রহণ কার্য শেষ হয়েছে—চিত্রখানি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতুল ঘোষ। সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত কালী সেন। সুদক্ষ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেশ দাশের পর ছিল চিত্র গ্রহণের ভার। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়নে জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, রবি রায়, ছয়া, লতিকা, প্রভা, রমা ব্যানার্জি, কানু বন্দ্যোঃ প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—পরোক্ষভাবে 'দোটানা'র অভিনয়াংশের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রযোজক শ্রীযুক্ত উমানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় অবদান দর্শক সাধারণের প্রশংসার্জনে সমর্থ হউক সেই আশাই আমরা করি।

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় ডাঃ কুমার মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে। মন্‌-কী-জীৎ, শিরি ফরহাদ, চাঁদ প্রভৃতি হিন্দি চিত্রও আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিউ সেঞ্চুরী প্রযোজিত শৈলজানন্দ পরিচালিত বাংলা ছবি 'মানে-না মানা' এদেরই পরিবেশনায় প্রদর্শিত হবে। শ্রীভারতলক্ষীর গৃহলক্ষীও মুক্তির অপেক্ষায় আছে। গৃহ-

জন্মীর পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত গুণময় বন্দোপাধ্যায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ও পদ্মা দেবীকে ছুটি বিশেষ অংশে বিশেষ রূপসজ্জায় দেখা যাবে।

সংস্কৃতি পরিষদ ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি

সংস্কৃতি পরিষদ ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মত এবারও এক জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হবে। সংস্কৃতি পরিষদের তরফ থেকে ১৯৪৪ সালের স্থানীয় নাট্যমঞ্চে অভিনীত নাটকের নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী—সুরকার, মঞ্চশিল্পী, পরিচালক প্রভৃতি শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে এক প্রতিযোগীতা আহ্বান করা হবে। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্যোগেও ১৯৪৪ সালের চিত্রশিল্প সম্পর্কিত শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে দর্শক সাধারণের নিকট হতে প্রতিযোগীতা আহ্বান করা হবে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী রূপ-মঞ্চের ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

গত ২৬শে জানুয়ারী রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবার পর আমাদের নাট্যকলা ও চিত্র শিল্পকে জাতীয়তার ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলবার জন্য রূপ-মঞ্চের মারফতে প্রচার কার্য করবার জন্য এ বৎসরও রূপ-মঞ্চের কর্মীবৃন্দ দৃঢ়তার সংগে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির ৭৪।১, আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থিত কার্যালয়ে সদস্যগণের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন উৎসব সুসম্পন্ন হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত মিত্র স্বাধীনতার বাণী পাঠ করেন।

স্বর্গত মন্মথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিবার্ষিকী

গত ২৭শে জানুয়ারী রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস, আর দাসের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাদশ স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সভাপতি লুপ্তপ্রায় রাগরাগিণীর পুনরুদ্ধারে মন্মথনাথের গবেষণা ও বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ করে তবলায় দক্ষতার কথা উল্লেখ করে সভায় বক্তৃতা করেন। এবং মৃতের শিষ্যবৃন্দ ও সুযোগ্য পুত্র কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এটর্ণী-এ্যাট-ল প্রভৃতিকে স্বর্গত গঙ্গোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ এক জলসার আয়োজন করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র ব্যানার্জি, রাম কিশন মিশ্র, প্রঃ মোস্তাক আলী খাঁ, মাস্টার আসফাক হোসেন, লক্ষ্ণৌর স্বর্গত খলিফা আবেদ হোসেন খাঁর পৌত্র, খলিফা নাজেদ হোসেন খাঁ (লক্ষ্ণৌ), শ্রীযুক্ত রাধিকা মৈত্র প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ জলসায় অংশ গ্রহণ করেন।

সংস্কৃতি পরিষদ

সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে এ বৎসরও ৭৮।১ আমহার্স্ট স্ট্রীটে সরস্বতী পূজা হয়। শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা তৈরী করেন।

ভবানীপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সারস্বত সম্মেলন

গত ২০শে জানুয়ারী ২৩নং গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোডস্থ ভবানীপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবে সারস্বত সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কণ্ঠসঙ্গীতে অসিতবরণ, বিমলভূষণ, রেবতীভূষণ ও মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী এবং যন্ত্র-সঙ্গীতে সন্ধ্যা রায় ও ভোলাবাবু, গিরীণ চক্রবর্তী, নলিন দত্ত, সুপ্রভাত মিত্র ও বিমলভূষণ শ্রোতাদের তৃপ্তি দান করেন। প্রধান অতিথি বাণীকুমার এবং পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর অভিভাষণ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী সংখ্যা হইতে রূপ-মঞ্চ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিবে। আগামী সংখ্যা ফেব্রুয়ারীর শেষে প্রকাশিত হইবে। এর পূর্বে গ্রাহকদের টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন নিম্ন ঠিকানায় এক বৎসরের গ্রাহক-মূল্য ৮৲ মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইতে পারেন। কর্মসচীব—রূপ-মঞ্চ

৩০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা